সীরাত বিশ্বকোষ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد السادس

সীরাত বিশ্বকোষ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ খণ্ড; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৪)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
যুলকা'দা ১৪২৪
পৌষ ১৪১০
ডিসেম্বর ২০০৩

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৪৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-০৭৬৪-২
Classification No. : ২৯৭.২৪০৩

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 6th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 December 2003
web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail L info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 350.00; US$: 15.00

সম্পাদনা পরিষদ

লেখকবৃন্দ

- মুহাম্মদ ইসমাইল
- আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
- খান মুহাম্মদ ইলিয়াস
- মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম
- ডঃ আবদুল জলীল
- মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
- ডঃ মোঃ শামছুল হক ছিদ্দিকী
- ডঃ আ.ক.ম. আবদুল কাদের
- ডঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম
- মাসউদুল করিম
- মুহাম্মদ এনামুল হক
- আহমদ আবুল কালাম
- ডঃ আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম
- ডঃ আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক
- আ.ম. কাজী হারুনুর রশীদ
- আবদুল্লাহ আল-মীযান
- ফয়সল আহমদ জালালী
- আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের সাথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত ৫টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবনচরিত সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত। বর্তমান ৬ষ্ঠ খণ্ডটি উহারই ধারাবাহিকতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার দশ (১০) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন চরিত সম্পর্কিত। বর্তমান খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ৬ষ্ঠ খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে করীম (স)-এর জীবন চরিতের ৩য় খণ্ড। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরও আটটি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও দশটি খণ্ড প্রণয়নের পরিকল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দুআ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাদের সকলকে আহ্সানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন খাতিমুন নাবিয়্যীন শাফীউল মুয্নিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সফল সমাপ্তির পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আর ইহার অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুল সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন, আশরাফুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম, অতঃপর তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবনচরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রাসূলকে মানব সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের উপর অবতীর্ণ সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবনচরিতকেই বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা ইউনুস, ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হেদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনই বা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমে দৃষ্টান্তমূলক অনুসরণীয় জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনচরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয়, বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মাহ্‌র জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল কারীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ ঃ ৪)।

কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দুইজন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সীরাত তথা জীবনচরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্‌র সচেতন আলিমগণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইহাদের মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্‌ন হায্‌ম, ইবন আবদিল বার্‌র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্‌ন সায়্যিদিন্নাস, ইবনুল কায়্যিম, ইব্‌ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাস্‌তাল্লানী, আল-হালাবী ও আয-যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিদগণের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল-আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্‌যাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ-শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, হিফযুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলাবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ। সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় সেইগুলি সংগ্রহ করিতে আমাদেরকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণা বহুল ও পরিশ্রম সাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। অধিকন্তু সীরাত বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলা কমপক্ষে এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে চেষ্টিত হওয়ায় আমাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য নিরলস চেষ্টা-তদবীরের ফলে কাজের গতি পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমান গতি অব্যাহত থাকিলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুন পর্যন্ত প্রকল্প নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিবে। যাহা হউক, কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের ৬ষ্ঠ খণ্ডটিও আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হওয়ায় আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডে হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ইয়াকূব (আ) পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত ইউসুফ (আ) হইতে হযরত শামূঈল (আ) পর্যন্ত ১৩ জন এবং তৃতীয় খণ্ডে হযরত দাঊদ (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ৬ জন নবী এবং কুরআন

উল্লিখিত ৩ জন মহাপুরুষ (হযরত লুকমান, হযরত মার্‌য়াম ও যুলকারনায়ন)-সহ সর্বমোট ৩০ জন নবী-রাসূল ও ৩ জন মহাপুরুষের সীরাত স্থান পাইয়াছে। আর ইহার মাধ্যমে আম্বিয়া-ই সাবেকীন-এর অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নবী-রাসূলদের জীবনচরিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে নবীকুল শিরোমণি সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের সূত্রপাত ঘটিয়াছে, বর্তমান খণ্ডে যাহার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে এবং যাহা পরবর্তী অনেকগুলি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীনসহ পরিষদের অপরাপর সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। এতদসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুহতারাম ডঃ সিরাজুল হক বর্তমানে বার্ধক্য জনিত পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় বর্তমান পরিষদ সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। অপর সদস্য অধ্যাপক শাহেদ আলী বেশ কিছুকাল আগেই ইন্তিকাল করেন। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে অধ্যাপক শাহেদ আলীর রূহের মাগফিরাত এবং ডঃ সিরাজুল হক সাহেবের রোগমুক্তির জন্য কায়মনে মুনাজাত করিতেছি। সেই সংগে সীরাত বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি সীরাত বিশ্বকোষের ব্যাপারে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন অতঃপর সচিব, অর্থ পরিচালক, পরিকল্পনা পরিচালক ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সংগে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সংগে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন এবং ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা দোআর বিনীত প্রার্থী।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ : ৪৫-৪৬)।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ
(আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ)

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَاهِدُوا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র (বিধানসমূহ পালন ও বাস্তবায়নের) পথে যেইভাবে জিহাদ করা উচিত (২২ : ৭৮)। অর্থাৎ পূর্ণ ইসলাম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ-সুখ্যাতির উদ্দেশ্য ব্যতীত পরিপূর্ণ মাত্রায় জান, মাল ও সার্বিক শক্তি এবং কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করিতে হইবে (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ২৩৬; মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., ২৮৮)।

জিহাদ ইসলামী শরী'আত তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা বিধিবদ্ধ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সর্বোত্তম আমল ও সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে জবাবে তিনি কখনও জিহাদকে সর্বাগ্রে এবং কখনও যথাসময়ে সালাত আদায় ও পিতা-মাতার খিদমতের পরপরই জিহাদকে সর্বোত্তম আমল (افضل الاعمال) এবং আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদকে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীছ নং ২৬; কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ২৭৮২, ২৭৮৬, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১খ., পৃ. ৬২)।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে অধিকাংশ সময় জিহাদের পূর্ণাংগ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তিনি জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন ইসলামের পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন ঘটাইয়া উম্মতের জন্য ইহার সুবিন্যস্ত, সুদৃঢ় ও আদর্শ ধারাক্রম রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং জিহাদের মূলনীতি ও সামরিক আইনের ধারা-উপধারার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই পবিত্র কুরআনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াতে ও হাদীছের বিশাল পরিসরে জিহাদ সংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা ও দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখানে পবিত্র কুরআনের সেই সব আয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন করা হইল যাহাতে জিহাদ ও উহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত বিধি-বিধান এবং আনুষংগিক বিষয়সমূহের বিবরণ বিধৃত হইয়াছে।

ক্রমিক নং ।	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	বাকার- ২	১০৯	জিহাদের অনুমোদন ও আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কাফিরদের দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের জবাব ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রদান করা।
২	বাকারা -২	১৫৪	জিহাদে জীবন উৎসর্গকারিগণ (শহীদ) মৃত নয়, জীবিত। সবরকারীদের বিশেষ পুরস্কার ও রহমতের আশ্বাসবাণী।
৩	বাকারা- ২	১৯০	অগ্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের আদেশ ও সীমালংঘন না করিবার নির্দেশ।
৪	বাকারা- ২	১৯১	কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধের আদেশ, যুদ্ধে হানাহানির অপেক্ষা কুফরের ফিত্না জঘন্য হওয়ার বিবরণ এবং কাফির পক্ষ মসজিদুল হারামে যুদ্ধে অবতীর্ণ মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণের বৈধতা অনুমোদন।
৫	বাকারা- ২	১৯৩	কুফরী ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালাইয়া যাওয়ার আদেশ এবং কাফিররা নিবৃত্ত হইলে বাড়াবাড়ি না করা।
৬	বাকারা- ২	১৯৪	পবিত্র (হারাম) মাসসমূহে কাফিররা যুদ্ধে অগ্রণী হইলে মুসলমানদেরও পাল্টা আক্রমণ করার বৈধতা অনুমোদন।
৭	বাকারা -২	১৯৫	আল্লাহ্র পথে জিহাদে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জিহাদ বর্জন করিয়া নিজেদের ধ্বংসোন্মুখ না করিবার নির্দেশ।
৮	বাকারা- ২	২১৪	চরম সংকট ও নিরাশার মুহূর্তে আল্লাহ্র সাহায্য সন্নিকট হওয়ার আশ্বাস।
৯	বাকারা- ২	২১৬	জিহাদ ফরয হওয়ার ঘোষণা এবং বাহ্যত কষ্টকর ও অপসন্দনীয় বিষয় হইলেও পরিণামে উহা শুভ ও কল্যাণকর হওয়ার সান্ত্বনাবাণী।
১০	বাকারা- ২	২১৭	পবিত্র (হারাম) মাসে যুদ্ধ গর্হিত হওয়ার তুলনায় কাফিরদের অত্যাচার-অনাচার অধিক গর্হিত। কুফরী

			ফিতনা যুদ্ধের খুনাখুনি অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় এবং মুরতাদ্দ হওয়ার পরিণতি।
১১	বাকারা- ২	২১৮	মহান আল্লাহ্‌র পথে হিজরত ও জিহাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্বাসবাণী।
১২	বাকারা- ২	২৩৯	যুদ্ধ ও অন্যান্য সংকট ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে আরোহী ও পদব্রজে চলমান অবস্থায় সালাত আদায়ের বিধান।
১৩	বাকারা- ২	২৪৪	মহান আল্লাহ্‌র পথে হত্যা ও জিহাদের প্রত্যক্ষ আদেশ।
১৪	বাকারা- ২	২৪৬-২৫১	বানূ ইসরাঈলের যুদ্ধ বাসনার পরে উহাতে অনীহা এবং খাটি মুজাহিদদের বিজয়ের বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা।
১৫	আলে ইমরান-৩	২৮	মু'মিনগণ কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করার নির্দেশ, আল্লাহর সহিত সম্পর্কের ছিন্নতা তবে সতর্কতা ও কৌশল অবলম্বনের বিষয়টি ব্যতিক্রম।
১৬	আলে ইমরান-৩	১১১	কাফিরগণের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন।
১৭	আলে ইমরান-৩	১১৮-১১৯	অমুসলিমদের সংগে অন্তরংগ বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। তাহাদের মুখ হইতে কখনও কখনও উচ্চারিত মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য অপেক্ষা তাহাদের মনোভাব আরও গুরুতর হওয়া।
১৮	আলে ইমরান-৩	১২০	বিরূপ পরিস্থিতিতে সবর ও তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ।
১৯	আলে ইমরান-৩	১২৪-১২৭	জিহাদে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফিরিশতাগণের আগমন।
২০	আলে ইমরান-৩	১২৮	যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং কাফিরদিগকে ক্ষমা অথবা শাস্তি প্রদান ।
২১	আলে ইমরান-৩	১৩৯	হীনবল না হওয়ার নির্দেশ এবং 'মুমিন' হওয়ার শর্তে মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান।
২২	আলে ইমরান-৩	১৪০	কাফিরদের হতাহত হওয়ার উল্লেখ এবং মুসলমানদের হতাহত হওয়ার বিষয়ে সান্ত্বনা।

২৩	আলে ইমরান-৩	১৪০-১৪১	যুদ্ধে জয়-পরাজয় আবর্তিত হয়। জিহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত মুমিন চিহ্নিত করা। শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন মুমিনদিগকে পরিশুদ্ধ এবং কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করা।
২৪	আলে ইমরান-৩	১৪২	জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম পূর্বশর্ত হইল জিহাদ করা এবং উহাতে ধৈর্য ধারণের পরিচয় দেওয়া।
২৫	আলে ইমরান-৩	১৪৩	জিহাদ ও শাহাদাত কামনার পরে উহাতে শৈথিল্য প্রদর্শনে ভর্ৎসনা।
২৬	আলে ইমরান-৩	১৪৫	মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, নির্ভয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া আখিরাতের ছওয়াব অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।
২৭	আলে ইমরান-৩	১৪৬-১৪৮	পূর্ববর্তী নবীগণের বিশিষ্ট অনুসারিগণের জিহাদে সাহসিকতা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহাদের কায়মনোবাক্যে দু'আ এবং তাহাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের বিবরণ দ্বারা এই উম্মতকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করা।
২৮	আলে ইমরান-৩	১৫১	কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে মুসলমানদের মনে সাহস বৃদ্ধি করা।
২৯	আলে ইমরান-৩	১৫২	অবিচলতা ও শৃংখলা রক্ষার সুফলরূপে বিজয়, অন্তর্বিরোধ ও সেনাপতির অবাধ্যতায় পরাজয় এবং মুসলমানদের পরীক্ষার বিবরণ।
৩০	আলে ইমরান-৩	১৫৩-১৫৪	যুদ্ধে জয়-পরাজয়, পলায়নে জীবন রক্ষা পায় না এবং জিহাদের পরীক্ষা দ্বারা মুমিনদের সংশোধন।
৩১	আলে ইমরান-৩	১৫৫	নিজেদের মন্দ আমলের কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শয়তানের প্রতারণার সুযোগ; অবশ্য আল্লাহ মার্জনা করিয়াছেন।
৩২	আলে ইমরান-৩	১৫৬-১৫৭	যুদ্ধে মৃত্যুভয় প্রদর্শনকারীদের (মুনাফিক) নিন্দা এবং তাহাদের অনুসরণ না করিবার শিক্ষা। জীবন-মরণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে। শাহাদাত মুমিনের পরম কাম্য।
৩৩	আলে ইমরান-৩	১৬৫-১৬৮	যুদ্ধে হতাহত হওয়ায় সান্ত্বনা। যুদ্ধে মুমিন ও মুনাফিকদের পরীক্ষা। পলায়ন করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।
৩৪	আলে ইমরান-৩	১৬৯-১৭১	আল্লাহ্র পথের শহীদগণ অমর জান্নাতী খাবার আস্বাদন করিয়া আনন্দিত এবং পৃথিবীতে তাহাদের

			সহযোগী মুজাহিদদের শাহাদাতের সুমহান মর্যাদার সুসংবাদ জানাইয়া অনুপ্রাণিত করণ।
৩৫	আলে ইমরান-৩	১৯৫	স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হিজরতকারী, জিহাদে অবতীর্ণ ও জীবনদানকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।
৩৬	আলে ইমরান-৩	২০০	সবর ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সীমান্ত প্রহরায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ।
৩৭	নিসা- ৪	৭১	আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবস্থাভেদে ছোট ছোট দলে কিংবা সম্মিলিত বাহিনীসহ যুদ্ধাভিযানে গমনের আদেশ।
৩৮	নিসা- ৪	৭২-৭৩	জিহাদে অনুপস্থিত থাকিবার সুযোগ সন্ধানী অথচ গণীমত লোভীদের নিন্দা।
৩৯	নিসা- ৪	৭৪	চূড়ান্ত সফলতা (জান্নাত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি) অর্জনের জন্য জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া।
৪০	নিসা- ৪	৭৫	নিপীড়িত নির্যাতিত অসহায়দের সাহায্য ও সুরক্ষায় জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার অনুপ্রেরণা।
৪১	নিসা- ৪	৭৬	মুমিনদের জিহাদ আল্লাহ্র পথে তাঁহার আদেশ ও বিধান অনুসারে তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং কাফিরদের যুদ্ধ শয়তানের আনুগত্যের জন্য।
৪২	নিসা- ৪	৭৭	উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য আদিষ্টদের পক্ষ হইতে জিহাদের অনুমোদন লাভের তাগাদা এবং জিহাদের আদেশ প্রদানের পর ভয় বা শংকা প্রকাশ ও আদেশ মুলতবী রাখিবার আবেদনের নিন্দা ও ভর্ৎসনা।
৪৩	নিসা- ৪	৭৮	মৃত্যু অবধারিত; সুরক্ষিত, সুউচ্চ দুর্গে অবস্থান করিয়াও মৃত্যুর নাগাল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না (সুতরাং যুদ্ধে মৃত্যুভীতি অমূলক)।
৪৪	নিসা- ৪	৮৪	প্রয়োজনে একাকী রাসূলুল্লাহ (স)-কে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ এবং মুমিনদের অনুপ্রাণিত করিবার আদেশ। (একাকী হওয়ার ক্ষেত্রেও) আল্লাহ্র সমরশক্তি কাফিরদের সমরশক্তি অপেক্ষা অধিক হওয়ার ঘোষণা দ্বারা সাহসিকতা প্রদান।

৪৫	নিসা- ৪	৯০	মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকা ও অনাক্রমণাত্মক চুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান না করিবার আদেশ।
৪৬	নিসা- ৪	৯১	দুরভিসন্ধিমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ লোকেরা সন্ধিভংগ ও আক্রমণে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে গ্রেফতার ও হত্যা (যুদ্ধ) করিবার আদেশ।
৪৭	নিসা- ৪	৯৪	আক্রমণের পূর্বে পূর্ণাংগ অনুসন্ধান করা এবং বাহ্যত মুসলমান হওয়ার আলামত পাওয়া গেলে, প্রকৃত মুসলমান নয় এই অজুহাতে এবং গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে আক্রমণে নিষেধাজ্ঞা।
৪৮	নিসা- ৪	৯৫-৯৬	জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ ও বিনা ওযরে বাড়িতে অবস্থানকারী মু'মিনদের সমমর্যাদাসম্পন্ন না হওয়ার বিবরণ, ওযরসম্পন্নদের অব্যাহতি। মুজাহিদদের সুউচ্চ মর্যাদা।
৪৯	নিসা- ৪	১০১-১০২	জিহাদ অভিযানকালে শত্রুভীতির কারণে বিশেষ পদ্ধতিতে 'সালাতুল খাওফ'-এর অনুমোদন। সর্বাবস্থায় সতর্কতা ও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ।
৫০	নিসা- ৪	১৪৪	মুমিনদের বিপরীতে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা।
৫১	মাইদা- ৫	৩৫	তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জন, বিশেষত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ, সফলতার আশাবাদ।
৫২	মাইদা- ৫	৫১	ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা।
৫৩	মাইদা- ৫	৫৪	মুমিনরা দীন ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইলে নিষ্ঠাবান নূতন মুজাহিদ দল তৈরীর হুমকি।
৫৪	মাইদা- ৫	৫৭	দীনকে উপহাসকারী কিতাবী ও কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে নিধেধাজ্ঞা।
৫৫	মাইদা- ৫	৬৭	আল্লাহ কর্তৃক তাঁহার রাসূলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা প্রদান।
৫৬	আনফাল- ৮	১	গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর বণ্টনবিধি।

৫৭	আনফাল- ৮	১৫-১৬	যুদ্ধক্ষেত্র ও সম্মুখ সমর হইতে পলায়ন নিষিদ্ধ। তবে আত্মরক্ষা ও সমর কৌশলরূপে কিংবা মূল বাহিনীর সংগে যুক্ত হওয়ার জন্য পশ্চাদঅপসারণের অনুমতি।
৫৮	আনফাল- ৮	৩৯	'ফিতনা' (কুফরী) নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এবং সামগ্রিকরূপে আল্লাহ্র আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখিবার চূড়ান্ত আদেশ।
৫৯	আনফাল- ৮	৪১	গনীমত বন্টনবিধি।
৬০	আনফাল- ৮	৪৫	জিহাদে অবিচল ও সুদৃঢ় থাকা এবং আল্লাহ্র যিকির অব্যাহত রাখা এবং সফলতার আশাবাদ।
৬১	আনফাল- ৮	৪৬	আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের অপরিহার্যতা, অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হইলে প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হইবে। যুদ্ধে অবিচলতার আদেশ।
৬২	আনফাল- ৮	৪৭	মুসলিম মুজাহিদগণকে সর্বদা দম্ভ ও লোক দেখানোর মনোভাব বর্জন করিতে হইবে।
৬৩	আনফাল- ৮	৫০	জিহাদে ফেরেশতাদের আগমন এবং কাফির নিধনে অংশগ্রহণ।
৬৪	আনফাল- ৮	৫৫-৫৭	কাফিরদের, বিশেষত চুক্তি ভংগকারীদের নিন্দাবাদ। যুদ্ধবাজ ও সন্ধি ভংগকারীদের উপর কঠোর আঘাত হানিয়া অন্যান্য কাফিরদের ভীত-সন্ত্রস্ত করিবার আদেশ। প্রতিপক্ষের সন্ধিভংগের আশংকার ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই সন্ধি বাতিল করিবার ঘোষণা দেওয়ার আদেশ।
৬৫	আনফাল- ৮	৫৮	প্রতিপক্ষের সন্ধিভংগের আশংকার ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই সন্ধি বাতিল করিবার ঘোষণা দেওয়ার আদেশ।
৬৬	আনফাল- ৮	৬০	আল্লাহ্র দুশমন ও মুসলমানদের দুশমনদের প্রতিরোধে সর্বাত্মক সমরসজ্জা ও সমর প্রস্তুতি অব্যাহত রাখিবার আদেশ এবং সেই উদ্দেশ্যে অকাতরে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধকরণ।
৬৭	আনফাল- ৮	৬১-৬২	প্রতিপক্ষ সন্ধি সম্পাদনে আগ্রহী হইলে (এবং তাহা মুসলমানদের জন্য উপযোগী বিবেচিত হইলে) আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখিয়া সন্ধিতে সম্মত হওয়ার

			অনুমোদন। কাফিরদের প্রতারণার ব্যাপারে আল্লাহ্ই যথেষ্ট হওয়ার ঘোষণা।
৬৮	আনফাল- ৮	৬৪-৬৫	আল্লাহ তা'আলা এবং মুমিনদের শক্তি যথেষ্ট। মুমিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রথমদিকে দশ গুণ পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ের আশ্বাস।
৬৯	আনফাল- ৮	৬৬	পূর্বোক্ত বিধান লঘু করিয়া অন্তত দ্বিগুণ কাফির শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার আশ্বাস।
৭০	আনফাল- ৮	৬৭	শত্রু কাফিরদের বন্দী করিয়া মুক্তিপণ আদায় করিবার স্থলে প্রচুর শত্রু নিধন করিয়া তাহাদের সমরশক্তি খর্ব করিয়া দেওয়ার আদেশ।
৭১	আনফাল- ৮	৬৯	অবশেষে (পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ থাকিবার বিধান পরিবর্তন করিয়া) উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য গনীমত বৈধ হওয়ার ঘোষণা।
৭২	আনফাল- ৮	৭০-৭১	কাফির বন্দীদের নিষ্ঠাবান হওয়ার শর্তে তাহাদের ভবিষ্যত কল্যাণময় হওয়ার আশ্বাস, তাহাদের প্রদত্ত মুক্তিপণের দুঃখ লাঘবের সান্ত্বনা এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানদের ক্ষতি না হওয়ার আশ্বাস।
৭৩	আনফাল- ৮	৭২,৭৪,৭৫	হিজরতকারী ও জান-মাল দ্বারা জিহাদকারী মুমিনগণ এবং তাহাদিগকে সাহায্য ও আশ্রয়দানকারী আনসারগণ পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। তাহারাই প্রকৃত মু'মিন।
৭৪	তাওবা- ৯	১-২	রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের বিশেষ শ্রেণীতে চার মাসের অবকাশ প্রদান।
৭৫	তাওবা- ৯	৩	সাধারণ কাফিরদের (যাহারা চুক্তিবদ্ধ নয়) প্রতি অসহযোগিতার চূড়ান্ত ঘোষণা।
৭৬	তাওবা- ৯	৪	চুক্তিবদ্ধ বিশেষ শ্রেণীর জন্য চুক্তির সময়সীমা সম্পন্ন করিবার ঘোষণা।
৭৭	তাওবা- ৯	৫	চুক্তিবদ্ধ নয় এমন সকল কাফিরের 'পবিত্র মাস' অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যেখানে পাওয়া যাইবে

			সেখানেই হত্যা, গ্রেফতার ও অবরুদ্ধ করিবার আদেশ এবং একমাত্র ঈমান আনয়ন ও জরুরী ইসলামী বিধানের আনুগত্যের শর্তে অব্যাহতি দেওয়ার বিধান ঘোষণা।
৭৮	তাওবা- ৯	৬	নিরাপত্তাপ্রার্থী মুশরিকদের নিরাপত্তা প্রদান এবং আল্লাহ্‌র বাণী ও (ইসলামের আহ্বান) মর্ম অনুধাবনের সুযোগ প্রদান ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দেওয়ার আদেশ।
৭৯	তাওবা- ৯	৭-১০	কাফিরদের চুক্তিভংগের অভ্যাস, সুযোগ পাইলেই চুক্তি ভংগ করিয়া মুসলমানদের যথাসাধ্য ক্ষতি সাধনে পারংগমতা এবং মসজিদুল হারামের সন্নিকটে চুক্তি সম্পাদনকারীরা চুক্তি রক্ষা করিয়া চলিলে মুসলমানদেরও চুক্তি রক্ষার আদেশ।
৮০	তাওবা- ৯	১১	চুক্তিভংগকারীরা (আত্মসমর্পণ করিয়া) ঈমান ও ইসলামী বিধানের আনুগত্য করিতে সম্মত হইলে তাহাদিগকে মুমিন ভাইরূপে গ্রহণের বিধান।
৮১	তাওবা- ৯	১২-১৩	চুক্তি ভঙ্গকারী ও দীনের বিরূপ সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, বিশেষত নেতৃস্থানীয় কাফিরদের নিধনের আদেশ এবং নির্ভয়ে চুক্তি ভংগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার অনুপ্রেরণা।
৮২	তাওবা- ৯	১৪	যুদ্ধ করিতে থাকিলে মুসলমানদের সাহায্য করিবার ও কাফিরদের লাঞ্ছিত করিবার আগাম ঘোষণা।
৮৩	তাওবা- ৯	১৬	যুদ্ধবিধান দ্বারা প্রকৃত মুজাহিদদের পরীক্ষা সম্পাদন।
৮৪	তাওবা- ৯	১৯	আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং মসজিদুল হারাম ও হাজ্জীগণের সেবাকারীরা (কাফির) সমান না হওয়ার বিবরণ।
৮৫	তাওবা- ৯	২০-২২	হিজরতকারী ও জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সুমহান মর্যাদার অধিকারী হওয়ার ঘোষণা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ঘোষণা।
৮৬	তাওবা- ৯	২৩	ঈমানের বিপরীতে কুফরী পসন্দকারীরা পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আপনজন হইলেও তাহাদের সহিত অন্তরংগ সম্পর্ক স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা।

৮৭	তাওবা- ৯	২৪	পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতা-বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী ও সমাজসহ ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়িঘর ইত্যাদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কঠিন শাস্তির হুমকি।
৮৮	তাওবা- ৯	২৫-২৬	মুজাহিদদের অন্তরে সংখ্যাধিক্যের ভরসা ও দম্ভ অপসন্দনীয় ও ক্ষতিকর । আল্লাহ্‌র উপর ভরসা প্রশান্তি ও আসমান্য সাহায্য লাভের উপায়।
৮৯	তাওবা- ৯	২৮-২৯	মুশরিকদের মাসজিদুল হারাম তথা 'হারাম' এলাকার সীমানায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, আল্লাহ্‌তে প্রকৃত ঈমান আনয়ন, আখিরাতের বিশ্বাস এবং দীনের বিধান পালনে অস্বীকৃত কিতাবীদের বিরুদ্ধেও সার্বিক সমরাভিযানের নির্দেশ এবং জিযয়া বিধান অর্থাৎ জিয্‌য়া প্রদানের মাধ্যমে প্রতীকী আনুগত্য স্বীকারকারীদের ছাড় দেওয়ার অনুমোদন।
৯০	তাওবা-৯	৩৬	মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার বিপরীতে মুসলমানদেরকেও তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সমরাভিযান পরিচালনার আদেশ।
৯১	তাওবা- ৯	৩৮-৩৯	আল্লাহ্‌র পথে অভিযানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে শিথিলতা বা অনীহার বিরুদ্ধে সতর্কতা, পর্থিব জীবনের প্রতি মোহ ও আকর্ষণের ভর্ৎসনা ও নিন্দা।
৯২	তাওবা- ৯	৪১	হাল্‌কা ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং প্রয়োজনানুসারে ছোট কিংবা বড় সেনাদল সহকারে জান ও মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ।
৯৩	তাওবা- ৯	৪৪-৪৫	প্রকৃত মুমিনরা জানমাল দ্বারা জিহাদ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত। তাহারা অযৌক্তিক অজুহাতে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে মুনাফিক ও সন্দেহবাদীরা বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক অজুহাতে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে।
৯৪	তাওবা- ৯	৭৩, ৮৮	কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া এবং উহাতে কাঠোরতা অবলম্বনের আদেশ। জান-মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ রাসূলুল্লাহ (স) ও মুমিনদের শুভ পরিণতির আশাবাদ।

৯৫	তাওবা- ৯	৯১-৯৩	দুর্বল, অসুস্থ (বিকলাংগ), অভাবগ্রস্থ ও আর্থিকভাবে অসমর্থ এবং সমরোপকরণের ব্যবস্থা করিতে অপারগ আন্তরিকভাবে অগ্রহী মুজাহিদদের অব্যাহতি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং সামর্থ্যবান অজুহাত অন্বেষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘোষণা ও নিন্দা।
৯৬	তাওবা- ৯	১১১	জান ও মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ, তাওরাত ও ইনজীলসহ কুরআনে অভিন্ন প্রতিশ্রুতির ঘোষণা এবং মুবারকবাদ।
৯৭	তাওবা- ৯	১২৩	মুসলমানদের সন্নিকট অবস্থানের কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোরতার সহিত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ।
৯৮	নাহল-১৬	১১০	হিজরত, জিহাদ ও সবরকারীদের জন্য মাগফিরাতের ঘোষণা।
৯৯	নাহল-১৬	১২৬	প্রাথমিক স্তরে সমপরিমাণ প্রতিশোধের অনুমোদন এবং প্রতিশোধ না নিয়া সবর উত্তম হওয়ার ঘোষণা।
১০০	হজ্জ-২২	৩৮-৩৯	প্রতিরোধমূলক জিহাদের অনুমোদন, জিহাদ অনুমোদনের প্রথম আদেশ–আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণের অনুমতি প্রদান ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশ্বাস।
১০১	হজ্জ-২২	৪০-৪১	জিহাদের লক্ষ্য সালাত, যাকাত, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান ।
১০২	হজ্জ-২২	৫৮-৫৯	হিজরতের পরে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য উত্তম রিযিক ও পসন্দনীয় নিবাসের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান।
১০৩	হজ্জ-২২	৬০	সমপর্যায়ের প্রতিরোধ ও আক্রমণের পরে নির্যাতিত হইলে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সাহায্যের আশ্বাসবাণী।
১০৪	হজ্জ-২২	৭৮	আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুসারে জিহাদে আত্মনিয়োগের আদেশ।
১০৫	আনকাবূত-২৯	৬	প্রকৃত জিহাদের সুফল মুজাহিদের জন্যই, সম্মিলিত কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিবার বিবরণ।

১০৬	আহযাব-৩৩	৯-১০	সম্মিলিত কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত বাহিনীর দ্বারা সাহায্য করিবার বিবরণ।
১০৭	আহযাব-৩৩	১৬-১৭	মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়নের পূর্বে পার্থিব জীবন ক্ষণিকের। আল্লাহর কুদরতী হাত হইতে কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না।
১০৮	মুহাম্মাদ-৪৭	৪, ৬	রক্ত প্রবাহিত করিয়া নিস্তেজ ও শক্তি খর্ব না হওয়া পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ (হত্যা করা) অব্যাহত রাখিবার আদেশ, অতঃপর বন্দী করা। যুদ্ধবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া মুক্তি দেওয়ার অনুমোদন। শহীদগণের আমল নিষ্ফল না হওয়ার দৃঢ় নিশ্চয়তা ও জান্নাতে প্রবেশের ঘোষণা।
১০৯	মুহাম্মাদ- ৪৭	৭	জিহাদে অবতীর্ণ হইয়া আল্লাহ্কে সাহায্য করিলে আল্লাহও সাহায্য করিবেন মর্মে ওয়াদা।
১১০	ফাত্হ-৪৮	১০	জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হাতে বায়'আতকারিগণ মূলত আল্লাহ্র কাছে বায়'আতকারী, এই বায়'আত ভংগকারী নিজেই বায়'আত ভংগের পরিণতি ভোগ করিবে এবং বায়'আত প্রতিপালনকারী বিশাল প্রতিদানে ভূষিত হইবে।
১১১	ফাত্হ-৪৮	১৬	প্রতিপক্ষ ইসলাম গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত জিহাদ চালাইয়া যাইতে হইবে।
১১২	হুজুরাত-৪৯	১৫	সর্বপ্রকার দ্বিধা ও সন্দেহমুক্ত হইয়া জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারিগণই প্রকৃত মুমিন।
১১৩	হাদীদ-৫৭	১০-১১	আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ব্যয়কারী ও জিহাদে অংশগ্রহণকারীরা মর্যাদায় সম্মান না হওয়ার বিবরণ। জিহাদের ব্যয় আল্লাহ্কে 'করয' প্রদানতুল্য।
১১৪	হাশর-৫৯	৫	জিহাদে প্রতিপক্ষের মনোবল ভাংগিয়া দেওয়ার প্রয়োজনে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নিসংযোগের অনুমোদন।
১১৫	হাশর-৫৯	৬-৮	যুদ্ধে বিজয়ে মূল শক্তি আল্লাহ্প্রদত্ত। 'ফায়' জাতীয় গনীমত রাসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত অধিকারভুক্ত হওয়ার বিধান।

১১৬	মুমতাহিনা-৬০	১	রাসূলুল্লাহ (স) ও মুমিনদের দেশত্যাগে বাধ্যকারী আল্লাহ্র দুশমন ও মুমিনদের দুশমনের সংগে বন্ধুত্ব ও অন্তরংতা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা।
১১৭	মুমতাহিনা-৬০	৮-৯	মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া কাফিরদের সহিত বাহ্য সুসম্পর্ক রক্ষা ও সদাচরণ নিষিদ্ধ নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, বহিষ্কার, যুদ্ধ, আক্রমণে উদ্যত কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।
১১৮	সাফ্ফ ৬১	৪	সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী মুজাহিদগণ আল্লাহ্র প্রিয়।
১১৯	সাফ্ফ-৬১	১০-১৩	আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান এবং জান-মাল দ্বারা জিহাদে আত্মনিয়োগকে একটি সফল 'বাণিজ্য' ঘোষণা করিয়া উহাতে জান্নাত ও 'নিকটবর্তী বিজয়ের' সুসংবাদ প্রদান।
১২০	তাহরীম-৬৬	৯	কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র ও বাক্যাস্ত্র প্রয়োগে কঠোর অবস্থান গ্রহণের জন্য মহানবী (স)-এর প্রতি আদেশ।
১২১	মুয্যাম্মিল-৭৩	২০	আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত মুমিনদের প্রশংসা ও স্তুতি।

ইতা ব্যতীত বহু আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত বড় বড় যুদ্ধাভিযানের (যেমন বদর, উহুদ, খন্দক বা আহযাব, হুদায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাইফ, হাওয়াযিন ও তাবূক প্রভৃতি যুদ্ধের) বিবরণ বিধৃত হইয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ১২১-১২৯, ১৪৪-১৪৫, ১৫১-১৫৮ ১৬১, ১৬৪-১৭৫; ৪ ঃ ৭১-৮০, ১০২; ৫ ঃ ১১, ৮ঃ ৫-১৪, ১৭-২৪, ৪২-৪৪, ৪৮-৫০, ৬৭-৭৫; ৯ঃ ১-৮, ১০-১৫, ২৩-২৭, ৩৮-৫২, ৫৬-৫৭, ৮৬, ৯৪-৯৯, ১০৭, ১১৭-২১, ১১৮; ৩৩ ঃ ৯-২০, ২২, ২৫-২৭; ৪৮ঃ ১, ১০-১২ ঃ ১৫-১৬, ১৮-২৭; ৫৯ ঃ ২-৭, ১১-১৪; ৬০ ঃ ১-২ এবং অন্যত্র) এবং বহু আয়াতে পরোক্ষরূপে জিহাদ সংশ্লিষ্ট (যেমন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্কে করয দেওয়া, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি) বিষয়সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। সিহাহ সিত্তাসহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এবং ফাতাওয়া ও ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে জিহাদ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

জিহাদের সংজ্ঞা

আরবী জিহাদ (جِهَادٌ) শব্দটি একটি ক্রিয়ামূল (মাসদার, বাবে মুফা'আলাহ হইতে জাহাদা, ইয়ুজাহিদু)-এর মাসদারঃ জিহাদুন মুজাহাদাতুন, ইহার ধাতুমূল জীম-হা-দাল (جَهْدٌ বা ج-ه-د) প্রথম বর্ণে যবর (جَهْدٌ) ও পেশ (جُهْدٌ)-সহ ব্যবহৃত হয়, যাহার আভিধানিক অর্থ চেষ্টা-সাধনা, মেহনত, শ্রম, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা অথবা কোন কাজে ও ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। 'জিহাদ ও মুজাহাদা' অর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে ও প্রতিপক্ষের প্রতিরোধে অবতীর্ণ হওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে কথা ও কর্ম (এবং সম্পদ) জাতীয় যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণাংগ পরিমাণে অকাতরে ব্যয় করা। কুরআনুল-কারীম-এর শব্দকোষ গ্রন্থ 'আল-মুফরাদাত' এবং লিসানুল আরাব নামক আরবী ভাষার বিশ্বকোষে জিহাদ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এইভাবে وَالْجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِىْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ "জিহাদ ও মুজাহাদা হইল শত্রুর প্রতিরোধের শক্তি সামর্থ্য পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করা" (রাগিব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ১০১) এবং اَلْجِهَادُ مُحَارَبَةُ الْاَعْدَاءِ وَالْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِى الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ "জিহাদ হইল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা কথা কাজ পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া"। তদ্রূপ جَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا قَاتَلَهُ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "শত্রুর সংগে যুদ্ধ করা ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা" (ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ১খ., পৃ. ৭০৮-৭১০; আরও দ্র. বাদাই', ৬খ., পৃ. ৫৭; তাফসীরে মাজহারী, ৭খ., পৃ. ২১৬; মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., ২৮৮, ৪৮৫, ৭১৬ ও স্থা.; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৫; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নাবী, ৫খ., পৃ. ২১০)।

জিহাদ-এর পারিভাষিক অর্থ

জীবন, সম্পদ ও বক্তব্য (কথা) দ্বারা সত্য দীনের প্রতি আহবান করা এবং উহাতে অন্তরায় সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তি (নফ্‌স), শয়তান ও প্রকাশ্য শত্রু কাফির (ও মুনাফিক)-দের বিরুদ্ধে সার্বিক শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম করা। আল-ফাতওয়া আলমগীরীতে আছে ঃ

اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ اِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَعَ مَنْ اِمْتَنَعَ عَنِ الْقَبُوْلِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ.

"জিহাদ হইল জান ও মাল দ্বারা সত্য দীনের প্রতি আহবান এবং উহা গ্রহণে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা" (ফাতওয়া আলগমীরী, ২খ., পৃ. ১৮৮; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., ১১৯ পৃ.)।

বাদাই গ্রন্থে আছে ঃ

وَشَرْعًا يُسْتَعْمَلُ فِى بَذْلِ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ اَوِ الْمُبَالَغَةُ فِيْهِ.

"শারী'আতে জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয় মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধের জন্য এবং জান, মাল ও কথা দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা কিংবা উহাতে সব ব্যাপারে আতিশয্য প্রদর্শন" (বাদাই, ৬খ., পৃ. ৫৭, কিতাবুস সিয়ার; আরও দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৫; মুফরাদাত, পৃ. ১০১, শিরো.; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬খ., পৃ. ৬০১, শিরো.)।

পারিভাষিক অর্থের তুলনামূলক বিশদ ব্যাখ্যায় শিবলী নু'মানীর সীরাতুন্নাবী গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ জিহাদ শব্দটির পারিভাষিক অর্থও উহার আভিধানিক অর্থের কাছাকাছি। অর্থাৎ হক ও সত্যের উন্নতি বিধান, উহার প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা-সাধনা, কুরবানী ও ত্যাগ-তিতীক্ষা, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বান্দাকে প্রদত্ত যাবতীয় দৈহিক, আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ব্যয় করা, এমন কি প্রয়োজনে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন ঘনিষ্ঠজনের এবং গোত্র ও সম্প্রদায়ের সকলের জীবন কুরবান করিয়া সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী ও দুশমনদের সকল অপচেষ্টা প্রতিহত করা, তাহাদের কূটকৌশলসমূহ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া, তাহাদের সব ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন দেখা দিলে যুদ্ধের ময়দানে তাহাদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকাই জিহাদ এবং এই জিহাদ ইসলামের অন্যতম অংগ ও অতি বড় ইবাদত" (সীরাতুন্নাবী, ৫খ., পৃ. ২১০)।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কুরআন, হাদীছ, সীরাত ও ইতিহাস এবং ফিক্হ গ্রন্থসমূহে আরও কতিপয় শব্দ 'জিহাদ'-এর সমার্থক ও প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

কিতাল (قِتَالٌ) অর্থ সশস্ত্র লড়াই, যুদ্ধ, হানাহানি ও খুনাখুনি। শারী'আত অনুমোদিত জিহাদের বিশেষ ও চূড়ান্ত স্তরে কিতালের হুকুম রহিয়াছে এবং পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ও বহু হাদীছে শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার রহিয়াছে।

হারব (حَرْبٌ) অর্থ যুদ্ধ, হানাহানি, বিদ্রোহ, লুটতরাজ ইত্যাদি। কাফিরদের যুদ্ধের উসকানী, যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তি, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও সশস্ত্র যুদ্ধ এবং ধ্বংসাত্মক কার্য (ফাসাদ) অর্থে পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে (দ্র. ৫ ঃ ৩২; ৫ ঃ ৬৪; ৮ ঃ ৬০, ৪৭ ঃ ৪ ইত্যাদি)।

সিয়ার (سِيْرَةٌ -এর বহুবচন سِيَرٌ) অর্থ পন্থা ও রীতি-প্রকৃতি। হাদীছ, ফিক্হ, ফাতাওয়া, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে জিহাদের রীতি-নীতি, পথ ও পন্থা এবং বিধি-বিধান সম্বলিত বিষয়সমূহের অধ্যায়কে 'কিতাবুস সিয়ার বা কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার নামে অভিহিত করা হইয়াছে (হাদীছ ও ফিক্হ-ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহ দ্র.)।

গাযওয়া ও মাগাযী (غَزْوَةٌ - বহুবচনে غَزَوَاتٌ এবং مَغَازَاةٌ-এর বহুবচন مَغَازِىٌّ অর্থ যুদ্ধাভিযান, যুদ্ধাভিযানের কাহিনী ও যোদ্ধাদের যুদ্ধালেখ্য। হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানকে গাযওয়া এবং এই সকল গাযওয়ার বিবরণ সম্বলিত খণ্ড বা অধ্যায়কে কিতাবুল মাগাযী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)। মূলত জিহাদের নীতিমালা ও বিধি-বিধানের 'সিয়ার' এবং

জিহাদের কাহিনী ও ঘটনাবলীকে 'মাগাযী' নামে আখ্যায়িত করিয়া পারিভাষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে সীমিত পর্যায়ে (أَوْ كَانُوا غُزًّى (৩ ঃ ১৫৬) এবং হাদীছ শরীফে বহুল পরিমাণে (যেমন ঃ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا-غُزَاةٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ خَلَفَ غَازِيًا) শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে। হাদীছ যুদ্ধাভিযানী মুজাহিদকে 'গাযী' (বহুবচনে غُزًّى- غُزَاةٌ) বলা হইয়াছে। অপর এক পরিভাষায় যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদকে 'শহীদ' এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জীবন্ত প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদকে 'গাযী' অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছ।

সারিয়্যা (سَرِيَّةٌ বহুবচনে سَرَايَا) অর্থ ঃ নৈশ অভিযাত্রী দল, সেনাবাহনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ যাহারা গোপনে বা রাতের অন্ধকারে চলাচল করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজ ও নৈশকালীন মহাজাগতিক ভ্রমণকে 'ইসরা' (اِسْرَاءٌ) বলা হইয়াছে, যাহা একই ধাতুমূল হইতে উৎপন্ন। হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কোন সাহাবীর নেতৃত্বে ও সেনাপতিত্বে প্রেরিত ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানকে সারিয়্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সারিয়্যা ও গাযওয়ার অপর একটি পারিভাষিক অর্থ 'জিহাদের সংখ্যা' প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হইবে।

বা'ছ (بَعْثٌ বহুবচনে بُعُوْثٌ অর্থ প্রেরণ, প্রেরিত দল, সামরিক বাহিনী, যোদ্ধাদলঃ বৃহৎ আকারের যুদ্ধাভিযান কালের (غَزْوَةٌ) অভিযানের পরিপূরকরূপে বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ অঞ্চল, গোত্র বা ব্যক্তিকে পদানত করিবার উদ্দেশ্যে মূল বাহিনীর বাছাইকৃত বা ক্ষুদ্র অংশকে বা'ছ বলা হয়।

খুরূজ (خَرَجَ-خُرُوْجٌ) 'বহির্গমন করাঃ কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফে শব্দটি যুদ্ধাভিযানে বাহির হওয়ার বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ -২ ঃ ২৪৩, خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا -৮ ঃ ৪৭, لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ -৯ ঃ ৪৭; فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ -৯ ঃ ৮৩; اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ -৬০ ঃ ১)।

নুফূর (نَفَرَ - نُفُوْرٌ) ঃ অর্থ বহির্গমন করা, অভিযানে বাহির হওয়া (দ্র. فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ... -৪ ঃ ৭১; انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -৯ ঃ ৩৮; انْفِرُوْا خِفَافًا... -৯ ঃ ৪১; لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ... فَلَوْلَا نَفَرَ -৯ ঃ ১২২)।

ইয়াওম (يَوْمٌ বহুবচনে اَيَّامٌ) অর্থ ঃ দিন, বিশেষ অর্থ ঘটনা, কাহিনী। সাধারণত বড় ধরনের এবং দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ঘটনাকে আরবী ভাষায় 'ইয়াওম' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। জাহিলী যুগের সুদীর্ঘ কালব্যাপী চলমান 'বু'আছ' যুদ্ধকে يَوْمُ بُعَاثَ বলা হয়। উহুদ যুদ্ধে আপাত বিজয়ের পরে তখনকার কাফির বাহিনীর প্রধান আবূ সুফয়ান বলিয়াছিলেন يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ অর্থাৎ 'আজিকার ঘটনা বদরের ঘটনার বদলা'। পবিত্র কুরআনে হুনায়ন যুদ্ধকে يَوْمَ حُنَيْنٍ বলা হইয়াছে (৯ ঃ ২৫)।

মোটামুটিভাবে উল্লিখিত শব্দসমূহ যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইগুলির মধ্যে 'কিতাল', 'হারব' ও 'ইয়াওম' শব্দগুলি জাহিলী যুগে এবং পবিত্র কুরআন-হাদীছে ব্যবহৃত হইয়াছে। সীরাত শব্দ শুধু ইসলামী পরিভাষায় নবী জীবন-চরিত এবং তাঁহার যুদ্ধাভিযানসমূহের বিবরণ সংবলিত কিতাবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ইব্ন হিশামের 'সীরাতুন্নাবী'। হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে ইসলামী জিহাদের বিধিবিধান ও ফযীলাত ইত্যাদির বিবরণকে 'কিতাবুল জিহাদ' ও 'কিতাবুস সিয়ার' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের বিবরণ সংবলিত কিতাব অথবা সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবেশিত এতদসংক্রান্ত অংশকে 'কিতাবুল মাগাযী' (বা বাবুল মাগাযী) নামে অভিহিত করা হয়। 'জিহাদ', 'গাযওয়া', সারিয়্যা', ও 'বা'ছ' শব্দগুলি মূলত ইসলামী পরিভাষা (কেননা ইসলাম-পূর্ব যুগের যুদ্ধাভিযান অর্থে এই সকল শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না)। আবার জিহাদ শব্দটির দীনের জন্য চেষ্টা-সাধনাড় ব্যাপক অর্থ দেয়। ইহাতে যুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত। দীনের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ ইহার খণ্ডিত অর্থ (পরবর্তী 'জিহাদ ও কিতাল' চালোচনা দ্র.)।

জিহাদের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত) মানবজাতিসহ প্রাণীকুল, আকাশ, পৃথিবী এবং এই দুইয়ে বিদ্যমান বিশালতম হইতে ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু এবং যাবতীয় জড়-অজড় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও লালিত-পালিত বিধায় তাঁহার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। তাঁহার ঘোষণামতে বিশ্বজগত মানবের সেবায় নিবেদিত خَلَقَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" (২ ঃ ২৯) اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً এবং মানুষ পৃথিবীতে তাঁহার খলীফা-প্রতিনিধি।

মানব সৃষ্টির লক্ষ্য বিশ্বময় আল্লাহ্‌র ইবাদত-আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ "আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন ও মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬)। ইবাদত প্রতিষ্ঠা ও খিলাফত পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে হিদায়াত তথা নবী-রাসূলের আগমন ধারা।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى - "যখনই আসিবে আমার পক্ষ হইতে হিদায়াত" (২ ঃ ৩৮; মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১৯৮, ২০১)। এই হিদায়াত ও নবুওয়াত-রিসালাতের ধারায় সকলের শেষে আগমন করিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী বিশ্বনবী সায়্যিদুল মুরসালীন ও খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। অপরদিকে খলীফা মনোনয়নের ঘোষণার সূচনাকাল হইতেই সূত্রপাত ঘটিল সংঘাত ও সংঘর্ষের। খলীফার পথ-পরিক্রমা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুবিধ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সহকারে বিরোধিতা, বরং খিলাফত প্রক্রিয়াকে নস্যাত করিবার সদম্ভ ঘোষণা প্রদান করিয়া স্বঘোষিত শত্রুতায় অবতীর্ণ হইল বিতাড়িত ইবলীস শয়তান। ফলে প্রথম দিন হইতেই শুরু হইল হক ও বাতিলের সংঘাত, ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই।

হযরত ঈসা (আ)-কে উর্ধ্বাকাশে তুলিয়া নেওয়ার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবী ছিল নবী-রাসূল শূন্য। এই সুযোগে জাতশত্রু ইবলীস বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করিল তাহার শয়তানী রাজত্ব। পৃথিবীময় ইবলীসি রাজত্বের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে খিলাফাতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার কঠিনতম দায়িত্ব অর্পিত হইল বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর। তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ণতায় নাযিল হইল প্রথম ওহী যাহাতে তিনি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন (দ্র. ৯৬ ঃ ১-৫)। তখনও তিনি তাবলীগ বা দীন প্রচারে আদিষ্ট হন নাই। কিন্তু নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালন ও উহাতে সম্ভাব্য বিরোধিতার চিন্তায় তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া হযরত খাদীজা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ (আমি আমার নিজের ব্যাপারে ভয় করিতেছি)। হাদীছ ব্যাখ্যাকারগণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা ছিল দীন প্রচারের কারণে ভবিষ্যতের কঠিন পরিস্থিতির শংকা। এই প্রসঙ্গে ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল স্বগোত্রের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর নির্যাতন ও তাঁহাকে দেশান্তরিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন (দ্র. বুখারী, বাদউল ওয়াহী, হাদীছ নং ৪; মুসলিম, ১খ., বাদউল ওয়াহী)। অতঃপর (তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ারপর তিনি তাবলীগ ও দীন প্রচারে আদিষ্ট হইলেন। নাযিল হইল, قُمْ فَاَنْذِرْ সতর্কীকরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর (৭৪ ঃ ২)। ক্রমান্বয়ে তাবলীগের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিকটাত্মীয়গণকে সতর্কীকরণের আদেশ দেওয়া হইল وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ দ্বারা ["তোমার নিকটাত্মীয়গণকে সতর্ক কর" ২৬ ঃ ২১৪]। তৃতীয় পর্যায়ে নিজ সম্প্রদায় ও গোত্রকে সতর্কবাণী শুনাইবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইল لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ধরনের আয়াত দ্বারা, "আপনি সেই সম্প্রদায়কে সতর্ক করিবেন যাহাদের পিতৃপুরুষকে সতর্ক করা হয় নাই, সেই কারণে তাহারা গাফিল ও অমনোযোগী রহিয়াছে" (৩৬ ঃ ৬)। চতুর্থ পর্যায়ে উম্মুল কুরা (মক্কা) ও উহার পরিপার্শ্বে অবস্থানকারী বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সতর্কবাণী শুনাইবার ফরমান দেওয়া হইল وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا দ্বারা, "আপনি উম্মুল কুরা-মক্কা ও উহার চারিপার্শ্বের লোকদিগকে সতর্ক করিবেন" (৪২ ঃ ৭ এবং ৬ ঃ ৯২)। অতঃপর চূড়ান্ত ও পঞ্চম পর্যায়ে নবুওয়াত ও রিসালাতকে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন স্তরে উন্নীত করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীকে দাওয়াত প্রদান ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে বিভিন্ন আয়াতে। যেমন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

"বলুন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল" (৭ ঃ ১৫৮)।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا.

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি" (৩৪ ঃ ২৮)।

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ. لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"ইহা তো কেবল উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন; যাহাতে সে (রাসূল) সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে" (৩৬ : ৬৯-৭০; আরও দ্র. সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নাবী, ৪খ., পৃ. ৩৩৭-৩৩৯; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩২১ এবং অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর)।

রাসূলুল্লাহ (স) ঐশী নির্দেশের ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সতর্কীকরণের পরিধি সম্প্রসারিত করিতে থাকিলেন। মৌলিকভাবে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হইল। (এক) কুরায়শ বংশ এবং মক্কা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের পৌত্তলিক কাফিরগণ; (দুই) মদীনা ও খায়বার প্রভৃতি অঞ্চলের ইয়াহূদীগণ; (তিন) আরব ভূখণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চলের খৃস্টান ও অগ্নিপূজারিগণ (সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নাবী, ৪খ., পৃ. ৩৫৯-৩৬০)। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শেষ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) সমকালীন সম্রাট ও রাজন্যবর্গের নিকট, বিশেষত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারাস্য সম্রাট খসরু পারভেয, মিসরের (আলেকজান্দ্রিয়ার) রাজা মুকাওকিস, আবিসিনিয়ার (হাবশা) রাজা নাজাশীসহ আঞ্চলিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজা, গোত্রপতি ও সর্দারদের নিকট দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করা হইলে প্রতিপক্ষের দিক হইতে বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি, বিরোধ ও প্রতিরোধ শুরু হইয়া গেল। নিকটাত্মীয়গণকে সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সম্ভাব্য বিরূপ পরিস্থিতির আশঙ্কায় আদেশ প্রতিপালনে দ্বিধান্বিত হইলে জিবরীল (আ) এই বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে একটি ভোজসভার আয়োজন করিতে বলিলেন এবং তাঁহার কন্যাগণ, চাচা-ফুফীগণসহ গোত্রের প্রায় চল্লিশজন নিকটাত্মীয়কে দাওয়াত করিলেন। এক বর্ণনামতে তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সকলকে সমবেত করিয়া ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং উহা অস্বীকার করিলে আযাবের ভয় দেখাইলেন। ইহাতে তাঁহার আপন চাচা আবূ লাহাব ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে গালাগালি করিল এবং জবাবে আল্লাহ তা'আলা আবূ লাহাবকে নিন্দা করিয়া ও হুমকি প্রদান করিয়া সূরা লাহাব নাযিল করিলেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৭০৪; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩৪৯-৩৫১; তাফসীরে মাজহারী, ৭খ., পৃ. ৮৬-৮৮, নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২১০-২১১;সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩১৭; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৬৪ এবং সকল তাফসীর গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থের কাফিরদের নির্যাতন অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (স) ক্রমান্বয়ে নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয়, স্বগোত্র, মক্কাবাসী ও পরিপার্শ্বের গোত্রসমূহ এবং হজ্জের মৌসুমে ও উকায প্রভৃতি মেলায় সমবেত সমগ্র আরব হইতে আগত মানুষদের নিকটে দীনের দাওয়াতের পরিধি সম্প্রসারিত করিতে থাকিলেন। প্রতিপক্ষ আত্মীয়-অনাত্মীয় কাফিরদের বিরূপ সমালোচনা ও বিভিন্ন পদ্ধতির উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে

থাকিল। শয়তানের নিরংকুশ রাজত্বে তাওহীদের বাণী প্রচণ্ড মাত্রা কম্পন সৃষ্টি করিল এবং প্রতিশোধের আগুন ধরাইয়া দিল। শয়তানের একান্ত অনুগামী কাফির সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত গোষ্ঠী ও তাহাদের আজ্ঞাবহরা নূতন দীনের দাওয়াতকে তাহাদের পূর্বপুরুষের আচরিত পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত বলিয়া মনে করিয়া উহার পরিণতিতে সমগ্র আরবে কুরায়শীদের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কায়েমী স্বার্থ বিনাশের আশংকা দেখা দিল। জনবল ও সম্পদ শক্তিতে বলিয়ান মক্কার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বার্থহানির আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া পড়িল।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন বানূ হাশিমের লোক, পক্ষান্তরে আবূ সুফ্য়ান ও কতিপয় বিশিষ্ট নেতা ছিলেন বানূ উমায়্যার লোক। অন্যান্য গোত্রের দৃষ্টিতে বানূ হাশিমের একক উত্থান আশঙ্কা এবং নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলের চারিত্রিক ও নৈতিক অপকর্মে নিমজ্জিত থাকিবার কারণে ইসলামের প্রসার ও প্রতিপত্তিতে তাহাদের নেতৃত্বের অবসান ইত্যাদি কারণসমূহ তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করে। সেই কারণেই তাহারা মুসলমান ও তাহাদের নেতা নবী 'আলায়হিস সালামকে নির্যাতিত-নিপীড়িত করিবার কাজে সর্বশক্তি, বুদ্ধি ও মেধা নিয়োগে উজ্জীবিত হয় (দ্র. শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২১২-২১৯)।

ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গোলাম, বাদী ও দুর্বল গোত্রের লোকদিগকে আবূ জাহল ও তাহার দোসররা দ্বিপ্রহরের তপ্ত মরুর বালুর উপর শোয়াইয়া দিয়া বুকে ভারী পাথর ও গরম বালু ছড়াইয়া দিত, কখনও লোহা উত্তপ্ত করিয়া সমস্ত শরীরে দাগ দিত, কখনও জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়াইয়া বুকে পাথর চাপা দিয়া রাখিত। হযরত খাববাব, হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, তৎ পিতা ও মাতা হযরত ইয়াসির ও সুমাইয়া [আবূ জাহল সুমাইয়া (রা)-কে লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করিয়া শহীদ করিয়াছিল], হযরত সুহায়ব রূমী, হযরত আবূ ফুকায়হা, হযরত লুবায়না, হযরত যুলায়বা (রা) প্রমুখ পুরুষ ও নারী সাহাবীগণ দাসদাসী ও দুর্বল গোত্রের হওয়ার কারণে কুরায়শী কাফিরদের লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন। হযরত উছমান, হযরত সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (হযরত উমার (রা)-এর ভগ্নিপতি), হযরত ফাতিমা (উমার রা-এর ভগ্নী), হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম, হযরত আবূ যার (রা)-এর ন্যায় সবল ও প্রভাবশালী গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারিগণও নিজ গোত্র ও পরিবারের মুরব্বীদের হাতে লাঠিপেটা, বেত্রাঘাত, নাকে ধোঁয়া দেওয়া ধরনের নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন, এমনকি হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর ন্যায় সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া দেশত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন।

নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয় হইলে এক সময় রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের হাবশায় (আবিসিনিয়া, বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করিবার অনুমতি দিলেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান হযরত জা'ফার ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নেতৃত্বে জন্মভূমির মায়া বিসর্জন দিয়া দীনের খাতিরে বিদেশ বিভূঁইয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলেন। পরবর্তীতে এক সময়

মক্কাবাসী সকলের ইসলাম গ্রহণের গুজব শুনিয়া ইহাদের অনেকে মক্কায় ফিরিয়া আসিলে পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ নির্যাতনের শিকার হইতে লাগিলেন (দ্র. শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., ২২১-২৫৬ ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থ)।

এই ছিল নূতন ধর্ম গ্রহণকারী সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণীর মুসলমানদের নিপীড়িত হওয়ার অবস্থা। অপরদিকে এই নূতন দীনের বাহক মহানবী মুহাম্মাদ (স) কুরায়শের শ্রেষ্ঠ শাখা ও কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের বংশধর হওয়ার সুবাদে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকিলেও এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব চাচা আবূ তালিবের হিফাজতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপরও নানাবিধ নির্যাতন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। প্রথমে উতবা, শায়বা, আবূ সুফয়ান, আবূ জাহল প্রমুখ কাফির সর্দাররা আবূ তালিবকে ভ্রাতুষ্পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিবার ব্যাপারটি তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার অথবা আবূ তালিবকে তাহাদের সহিত সম্মুখ রণাংগণে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান করিল। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান রাসূলুল্লাহ (স) চাচার অসহায় অবস্থা অনুধাবন করিয়া বিরূপ ও কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দীনের প্রচার-প্রসারে অবিচল থাকিয়া চাচার সান্ত্বনা ও সাহায্য দ্বারা উজ্জীবিত করেন (নাদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২১১, বরাত সীরাতে ইবন হিশাম, পৃ. ৮৫)। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ আল্-কুরআনের বিরূপ, বিরুদ্ধে জঘন্য ও মিথ্যাশ্রয়ী সমালোচনা শুরু করিল। তাঁহাকে কল্পনা বিলাসী, কবি, জ্যোতিষী (গণক), পাগল, উন্মাদ, মিথ্যাবাদী, যাদুকর অভিধায় অভিহিত করিতে এবং পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা, মনগড়া রচনা, কল্পকাহিনী বলিয়া অপপ্রচার করিতে লাগিল। সেই সাথে আল্-কুরআন ও উহার বাহকের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস, ঠাট্টা, অবজ্ঞা, বিদ্রূপ ছিল কাফির দলের সর্বক্ষণিক কাজ। পবিত্র কুরআনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াতে কুরআন ও উহার বাহকের প্রতি আরোপিত এই সকল অপবাদ ও কটূক্তির উল্লেখ রহিয়াছে এবং বেশ কিছু আয়াতে উহার অলংকারপূর্ণ জবাব দেওয়া হইয়াছে। যেমন

الاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ .

"সে তো তোমাদের মতই একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া জাদুর কবলে পড়িবে" (২১ ঃ ২)?

بَلْ قَالُوْآ اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ .

"উহারা ইহাও বলে, এই সমস্ত (কুরআনের বাণী) অলীক কল্পনা; হয় সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি" (২১ ঃ ৫)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ اِفْكُ نِ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْا ظُلْمًا وَّزُوْرًا . وَقَالُوْآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً .

"কাফিরগণ বলে, ইহা (কুরআন) মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। (এই কথা বলিয়া) তাহারা অতি বড় জুলুম ও মিথ্যায় লিপ্ত হইয়াছে। উহারা (আরও) বলে, এইগুলি তো সেই পূর্বকালের উপকথা (রূপকতা ও কল্পকাহিনী) যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে। এইগুলিই সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়" (২৫ : ৪-৫)।

তদ্রূপ انَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ (রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া) "তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী" (১৬ : ১০১), انْ هٰذا الاَّ اخْتِلاَقٌ (৩৮ : ৭); افْتَرَاهُ "সে উহা রচনা করিয়াছে" (১০ : ৩৮; ৪৬ : ৮) "ইহা (কুরআন) এক মনগড়া উক্তি মাত্র" (৩৮ : ৭); هٰذَا افْكٌ قَدِيْمٌ "ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা" (৪৬ : ১১); تَقَوَّلَهُ "এই কুরআন তাহার নিজের রচনা" (৫২ : ৩৩); انَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "তাহাকে (রাসূলকে) ইহা শিক্ষা দেয় এক মানুষ" (তাঁহার পরিচিত এক খৃস্টান দাস) (১৬ : ১০৩); انْ هٰذَا الاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ. انْ هٰذَا الاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ "ইহা তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন কিছু নহে; ইহা মানুষেরই কথা (৭৪ : ২৪-২৫)। قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ "যখন উহাদের নিকট সত্য (কুরআন) উপস্থিত হয় তখন কাফিররা বলে, ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু" (৪৬ : ৭); انْ هٰذَا الاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ "ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে" (৩৭ : ১৫)। وَانْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ "উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহা তো চিরাচরিত যাদু" (৫৪ : ২)। انْ تَتَّبِعُوْنَ الاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا "তোমরা (মুসলমানরা) তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ" (১৭ : ৪৭; তদ্রূপ ২৫ : ৮); قَالَ الْكٰفِرُوْنَ انَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ "কাফিররা বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু" (১০ : ২); هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ "এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী" (৩৮ : ৪); اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ "আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে (প্রতিমাসমূহকে) বর্জন করিব" (৩৭ : ৩৬)? وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ "এবং তাহারা (কাফিররা) বলে, সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল" (৪৪ : ১৪) بِهٖ جِنَّةٌ "সে কি উন্মাদনাগ্রস্ত" (২৩ : ৭০)। اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ "সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ" (৩৪ : ৮)।

وَاذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا الاَّ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ وَقَالُوْا مَا هٰذَا الاَّ افْكٌ مُّفْتَرًى وَّقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ انْ هٰذَا الاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

"ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার ইবাদত করিত, এই ব্যক্তি তো কেবল তাহার ইবাদতে বাধা দিতে চাহে। ইহারা আরও বলে, ইহা (কুরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু" (৩৪ : ৪৩)।

فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَ مَجْنُوْنٍ.

"তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ" (৫২ঃ২৯; আরও দ্র. ৬৮ঃ২)।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ. وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

"ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর" (৬৯ ঃ ৪১-৪২)।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِداً اِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ عُجَابٌ .... اِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ يُّرَادُ .

"সে কি বহু ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। উহাদের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমাদের দেবতার পূজায় অবিচলিত থাক। নিশ্চয় এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক" (৩৮ ঃ ৫-৬)।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ.

"কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। উহারা বলে, এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে" (২১ ঃ ৩৬) ?

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ. وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ.

"তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে বিদ্রূপ করে" (৩৭ ঃ ১২-১৩)। وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا "যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে" (৪৫ ঃ ৯)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে 'হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" (৫ ঃ ৫৭; অদ্রূপ ৬ ঃ ৭০)।

এইরূপে যাদুকর, উন্মাদ ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার বিষয়টি ছিল সর্বযুগের কাফিরদের মজ্জাগত অভ্যাস। যেমন ঃ

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ.

"এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর অথবা উন্মাদ" (৫১ ঃ ৫২)।

এইরূপই ছিল কাফিরদের বিরূপ সমালোচনা, বিদ্রূপ ও উপহাসের ধারা ও মাত্রা, যাহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনদের প্রতি তাহাদের মৌখিক ও বাস্তব নির্যাতন। কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও স্বার্থান্বেষী হইলে তাহার পক্ষে নিন্দা, বিদ্রূপ ও সমালোচনা সহ্য করিবার যুক্তি ও কারণ

থাকিতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ সত্যবাদী ও আল্লাহ প্রেরিত হইলে এবং তাঁহার বক্তব্য আল্লাহ্র নিকট হইতে আগত হইলে উহার বিরুদ্ধে এহেন জঘন্য ও যুক্তিহীন বিদ্রূপ ও সমালোচনার মর্মযাতনা শুধু ভুক্তভোগী বুঝিতে পারেন। কিন্তু কাফিররা ইহাতেই ক্ষান্ত ও তুষ্ট ছিলনা, বরং তাহার সহিত যুক্ত করিয়াছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি দৈহিক নির্যাতন। পাপিষ্ঠরা আল্লাহর কালাম পাঠেও কঠোরভাবে বাধা দান করিত ঃ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর" (৪১ ঃ ২৬)।

পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার বিদ্বেষে অস্থিরচিত্ত কাফিররা এই কুকর্ম শুরু করিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল অপারগ হইয়া তাহার লোকদিগকে এইরূপে উদ্বুদ্ধ করিল যে, মুহাম্মাদ (স) কুরআন পাঠ করিতে শুরু করিলে তোমরা তাহার সম্মুখে গিয়া হৈ চৈ, চিৎকার ও শোরগোল করিবে, যাহাতে লোকেরা তাঁহার আওয়াজ শুনিতেই না পায়। কাহারও মতে কাফিররা হাততালি দিয়া ও শীষ দিয়া এবং কুরআন পাঠের মধ্যে হরেক রকম কথা বলিয়া উহা শ্রবণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার অপচেষ্টা করিত (মুফতী শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., পৃ. ৬৪৭, বরাত তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরে মাজহারী, ৮খ., পৃ. ২৯১)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে তাহার আপন চাচা আবূ লাহাব ছিল তাঁহার প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষপরায়ণ। নিকটাত্মীয়-স্বজনকে সতর্কীকরণ ও দীনের দাওয়াতের জবাবে আবূ লাহাবের গালাগালির বিষয়টি পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে হজ্জের মৌসুমে এবং সমকালীন আরবে প্রচলিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মেলায় সমগ্র আরব হইতে আগত বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর লোকদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু আবূ লাহাব ও আবূ জাহল এই সকল স্থানে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার দাওয়াতী কাজে বাধা প্রদান করিত এবং তাঁহাকে পিতৃধর্মত্যাগী, পিতৃধর্ম ও উহার পূজনীয় প্রতিমাসমূহের সমালোচনাকারী, যাদুকর, কবি, গণক, মিথ্যাবাদী, আত্মীয়দের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বলিয়া এবং তাঁহার মুখে মাটি ও ধূলা ছুড়িয়া মারিয়া লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। তাঁহার চলাচলের পথে কাঁটা ছড়াইয়া রাখিত। এমন কি সালাতরত অবস্থায় হৈ চৈ ও কাপড় জড়াইয়া হেঁচকা টান দিয়া ফেলিয়া দাগ বসাইয়া দিত, মাটিতে ফেলিয়া দিয়া এবং মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া হাসাহাসি করিত ও আনন্দ উপভোগ করিত।

একবার তাঁহার সিজদারত অবস্থায় তাহারা উটের নাড়িভুঁড়ি তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাঁহার অসহায়ত্ব অবলোকন করিয়া আনন্দ-স্ফূর্তিতে মত্ত হইয়া উঠে। এক পর্যায়ে তাহারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিকাশ লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং কাফির গোত্রের সম্মিলিত জোট রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজ গোত্র বানূ হাশিমের বিরুদ্ধে সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ফলে বন্ধু হাশিমের সহিত বেচাকেনা ও যাবতীয় লেনদেন, বিবাহ-শাদী ও তাহাদের সহিত উঠা-বসা, চলাফেরা ও কথাবার্তা তথা সকল প্রকার সম্বন্ধ ও যোগাযোগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইহাতে বানূ হাশিম গোত্রের মুসলিম, অমুসলিম ও

নারী-পুরুষ, শিশু-আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই 'আবূ তালিব গিরি সংকটে' অবরুদ্ধ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল। তিন বৎসর যাবত অভুক্ত শিশুদের কাতর কান্নায় মক্কার আকাশ-বাতাস ভারী হইতে থাকিল। আদম সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া জীবনর নিঃশ্বাস টিকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইল (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ২১৬, ৪৪৮; সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২১০-২৫৬; আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ৫০, ১১৯)।

এই ছিল আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁহাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার অপরাধে তাঁহার স্বগোত্র বানূ হাশিমের প্রতি এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কাফিরদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের করুণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত চিত্র। তবুও এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেও চাচা আবূ তালিবের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিম্মত ও সান্ত্বনার শেষ সম্বল। নবুওয়াতের দশম বর্ষে প্রিয়তমা, সহৃদয়া জীবন-সঙ্গিনীর ইনতিকালের দুঃখে রাসূলুল্লাহ (স) অতি কাতর হইলেন। এই সময় চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু ভগ্ন হৃদয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহ্যিক শেষ সম্বলও কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিল। এই সুযোগে নিষ্ঠুর কাফিরদের লোমহর্ষক নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। এইভাবে নির্যাতনের মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়িয়া গেলে মহানবী (স) মক্কার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের নিকট দীনের দাওয়াত এবং উহাতে তাহাদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের চেষ্টায় যত্নবান হইলেন। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের নিকট সত্য প্রচার করিয়াও কোথাও কোন আশার আলো দেখিতে পাইলেন না। এমন কি তাইফবাসীরা তাঁহাকে নির্যাতনে রক্তাক্ত ও মৃতপ্রায় করিয়া ছাড়িল। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ أُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذِىْ اَحَدٌ وَاُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلاَثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِىْ وَلاَ لِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ الاَّ مَا يُوَارِىْ اِبِطُ بِلاَلٍ.

"আমি আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে নির্যাতিত হইয়াছি যদ্রূপ কেহ নির্যাতিত হয় নাই। আমাকে আল্লাহর পথে এমন ভয় দেখানো হইয়াছে যদ্রূপ কাহাকেও ভয় দেখানো হয় নাই। একাধারে আমার জীবনে এমন ত্রিশটি দিবারাত্রও অতিক্রান্ত হইয়াছে যে, আমার ও বিলালের জন্য কোন প্রাণী আহার করিতে পারে সেইরূপ কিছু ছিল না, বিলালের বগলের নিচে (পুঁটলীতে) লুক্কায়িত যৎসামান্য খাদ্য ব্যতীত" (বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৬২; বরাত মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ২৮৬, নং ১৪১০১)।

হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জীবনে কি উহুদ অপেক্ষা কঠিন কোন দিন আসিয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ

لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِك مَالَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلىٰ مَا اَرَدْتُّ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلىٰ وَجْهِىْ.

"আমি তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এমন নির্যাতন ভোগ করিয়াছি যাহা 'আকাবার দিনে'র নির্যাতন অপেক্ষাও কঠিন ছিল। সেই দিন আমি ইব্ন আবদ ইয়ালীল ইব্ন আবদে কুলাল-এর নিকট তৌহীদ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তখন আমি অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে সম্মুখে অগ্রসর হইলাম" (বুখারী, বাদউল খালক, বাব ৭, নং ৩২৩১; মুসলিম, ২খ., পৃ. ১০৯, নং ৪৬৫৩/১১১; আরও দ্র. সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪১৯-৪২৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৬৬-১৭৯; সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ২৫০-২৫৬)।

কাফিরদের নির্যাতনে অতীষ্ঠ হইয়া মুসলমানদের একটি অংশ হাবাশায় হিজরত করিয়াছিল। কিন্তু সকলের জন্য হিজরত করিবার সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা ছিল না এবং মক্কার কাফিরদের ইসলাম গ্রহণের ভুল সংবাদের ভিত্তিতে হাবশায় হিজরতকারী অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এইদিকে আবূ তালিবের মৃত্যু হইলে রাসূলুল্লাহ (স) এবং মুসলমানগণ বাহ্যত কিছুটা অসহায় হইয়া পড়েন। ফলে কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল এবং পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহাদের জীবনের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা দেখা দিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার চক্রান্তও চলিতে লাগিল। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন আরবজাতি ছিল একটি দুর্ধর্ষ ও সাহসী জাতি। খুনের নেশা ও বীরত্ব ছিল তাহাদের মজ্জাগত। ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের দেহেও প্রবহমান ছিল আরব বীরত্বের এই শোণিত ধারা। তদুপরি তাওহীদ তথা একমাত্র আল্লাহতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ফলে তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাহাকেও ভয় না করিবার ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান।

সাহাবীদের ঈমানী শক্তির অবস্থা তো ছিল এইরূপ যে, যেই আবূ যার গিফারী (রা) ঈমান আনয়নের পূর্বে আত্মপরিচয় ও মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভের উপায় খুঁজিতেছিলেন, তিনিই ঈমান আনয়নের পর মুহূর্তে হারাম শরীফের চত্বরে যুদ্ধংদেহী মুশরিকদের মুখের উপর নিজের মুসলমান হওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদানে দুঃসাহসী হইয়া উঠিলেন। আর হযরত উমার (রা)-এর আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হওয়ামাত্র তাঁহারা প্রকাশ্যে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করিবার হিম্মত প্রদর্শন করিলেন। অপর দিকে হযরত বিলাল, হযরত আম্মার ও তাঁহার পিতা-মাতা হযরত ইয়াসির ও হযরত সুমাইয়া, হযরত সুহায়ব, হযরত খাববাব, হযরত আবূ ফুকায়হা, হযরত লুবায়না, হযরত যুলায়বা, হযরত নাহদিয়া, হযরত উম্মু উমায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ফলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হন। কোন প্রকার প্রতিরোধ ব্যতিরেকে কাফিরদের কটুবাক্য ও লোমহর্ষক নির্যাতন মানিয়া নেওয়া তাহাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতেও বিধ্বস্তপ্রায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে এই অবস্থার প্রতিকার এবং সঙ্কট উত্তরণের জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করিলেন। জবাবে তাঁহাদিগকে এইরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বনপূর্বক দীনের উপর কায়েম থাকিবার উপদেশ

দিলেন এবং প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণের জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিলেন।

সহীহ বুখারীতে খাব্বাব ইব্নুল আরাত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া দেখিলাম তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় চাদর বিছাইয়া দেয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসিয়া আছেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ হইতে চরম পরিস্থিতির শিকার ছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমাদের নির্যাতিত হওয়ার অবস্থা তো আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এই অবস্থায়) আপনি কেন আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন না? কেন আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিতেছেন না? কেন কাফিরদের বদ-দু'আ করিতেছেন না? ইহা শুনিয়া তাঁহার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল এবং তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন ঃ

كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّوْهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَعَصَبٍ وَمَا يَصُدُّوْهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتَمَّنَّ هٰذَا الاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَ مُوْتَ لاَ يَخَافُ اَحَدًا اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

"তোমাদের পূর্বে এমনও ঘটিয়াছে যে, কোন ব্যক্তির জন্য (ঈমান আনার অপরাধে) মাটিতে গর্ত খনন করিয়া তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত এবং করাত দ্বছরা তাহাকে দুই টুকরা করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু ইহাও৮তাহাকে তাহার দীন হইতে বিচ্যুত করিতে পরিত না। কছহাকেও লোহার চিরুনী দ্বারা তাহার ঘাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত গোশত ও শিরাসমূহ আঁচড়াইয়া তুলিয়া ফেলা হইথক্ষ এই কঠিন শাস্তিও তাহাকে তাহার দীন হইতে বিরত রাখ্িতে পারিত না। আল্লাহ্র কসম! এই (দীনের) বিষয়টি (আল্লাহ কর্তৃক) এমনভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে যে, কাফিরদের অস্তিত্ব ও তাহাদের নির্যাতন খতম হইয়া যাইবে এবং এমন নিরাপদ ও শান্তিময় পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজ করিবে যে, একজন আরোহী সান'আ হইতে হাদরামাওত পর্যন্ত এইরূপ ও নিরাপদে সফর করিতে পারিবে যে, তাহার জন্য আল্লাহ্র ভয় এবং তাহার পশুপালের জন্য নেকড়ের ভয় ব্যতীত আর কোনও ভয় থাকিবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫১০, ৫৪৩ এবং হাদীছ নং ৩৬১২, ৩৮৫২; অদ্রূপ ৬৯৪৩; আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ২খ., পৃ. ৩৫৮; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৭৭; শিবলী ও নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২৫৭; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৭১৬)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীদিগকে আরও সবর ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের শিক্ষা দিলেন এবং তাহাদিগকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি প্রদান

করিলেন। পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে বিষয়টির অনুরূপ বিবরণ রহিয়াছে এবং অত্র হাদীছে উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

"আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, দুভিক্ষ এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে" (২ ঃ ১৫৫)।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থসঙ্কট ও দুঃখ- ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁহার সহিত ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসিবে? জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই" (২ ঃ ২১৪)।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই" (৯ ঃ ১৬)।

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ এবং লোকেরা ভাবিল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাদিগকে ইচ্ছা করি তাহারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) উদ্ধার পায়। অপরাধী (কাফির) সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না" (১২ ঃ ১১০)।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেন" (২৪ ঃ ৫৫)।

আরও বহু আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, আয়াতগুলিতে সাহাবায়ে কিরামের নির্যাতিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং আরও উল্লেখ্য যে, তাঁহাদের পরবর্তী ইতিহাস তাঁহাদের প্রতি ঘোষিত বিজয় ও সাফল্যের প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু যাহারা মক্কায় ধনবান ছিলেন— তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন মান-মর্যাদার অধিকারী ছিলাম, ঈমান আনয়ন করিবার পর আমরা লাঞ্ছনার পাত্র হইয়া গেলাম (সুতরাং আমাদিগকে প্রতিরোধের আদেশ করুন)। তিনি (স) বলিলেন, أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ "আমি ক্ষমা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। সুতরাং তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইও না" (জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ১খ., পৃ. ২৫৬)।

জাহিলী যুগে যুদ্ধ ছিল সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। অতি তুচ্ছ কারণে ও যে কোন অলীক অজুহাতে যুদ্ধ লাগিয়া যাইত। খুনের নেশা ছিল তাহাদের মজ্জায় ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই সকল যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নেহায়েত খুন করা, প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ করা, গোত্রীয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি পরের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। সুতরাং এই সকল যুদ্ধে কোন প্রকার নীতি বা বিবেকের দংশনের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু ইসলামে জিহাদ একটি পবিত্র ইবাদত। সুতরাং ব্যক্তিগত বা দলগত সুখ্যাতি, নিছক প্রতিপত্তি বিস্তার, ব্যক্তিগত, দলীয় ও গোত্র-সম্প্রদায়গত ক্ষোভ নিরসন, প্রতিশোধ গ্রহণ তথা জাত্যাভিমান ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অধীনে ও সম্পদের লোভে হানাহানি ও খুনাখুনি জিহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এক কথায় আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করা (اعلاء كلمة الله)। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর অনুমতি প্রদান এবং সাহাবীগণকে আল্লাহর সৈনিক বা মুজাহিদরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বাগ্রে ও একান্তরূপে প্রয়োজন ছিল তাঁহাদের বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি ও মানসিক প্রশিক্ষণ। প্রয়োজন ছিল ব্যক্তি ও দল-সম্প্রদায়গত ক্ষোভ ক্রোধ প্রশমন, প্রতিশোধ মনোবৃত্তি, সম্পদ হরণ ও লুট-তরাজ ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্য ও পার্থিব লাভ-লোকসানের হিসাবের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁহার নির্দেশিত পন্থা ও সীমারেখায় অবস্থান করিয়া আল্লাহর সৈনিকরূপে তাঁহার দীনকে সমুন্নত করিবার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায়

উজ্জীবিত হওয়া এবং মানসপটে উহা সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হওয়া। প্রশিক্ষণের এই বিষয়টিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'আমি ক্ষমা মার্জনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি' বক্তব্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বস্তুত এই মানবিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের মক্কা শরীফে অবস্থানের তের বৎসর পর্যন্ত সবর ও ধৈর্য ধারণ, ক্ষমা ও মার্জনা এড়াইয়া চলা, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা এবং প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। পবিত্র কুরআনের ৭০-এর অধিক আয়াতে এই ধরনের সবর, দুর্ব্যবহারের জবাবে সদ্ব্যবহার এবং মার্জনা ও নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ তথা লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকিবার আদেশ ঘোষিত হইয়াছে। কাসতাল্লানী লিখিয়াছেন, তাহারা আহত, ক্ষত-বিক্ষত ও নির্যাতিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি বলিতেন, اصْبِرُوْا فَانِّىْ لَمْ اُؤْ مَرْ بِالْقِتَال "তোমরা সবর কর, আমি লড়াই করিবার জন্য আদিষ্ট হই নাই"। এইরূপে সত্তরের অধিক আয়াতে ধৈর্য ধারণ ও মার্জনা করা এবং যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিবার হুকুমের পরে অবশেষে হিজরতের পর যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪৬৭; আল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৩৩৪; মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ২৭০)। জাসসাস লিখিয়াছেন, এই বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য রহিয়াছে যে, হিজরত-পূর্বকালে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর কারণে اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ "মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা" (৪১ : ৩৪)। فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ "তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর"(৫ : ১৩)। فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ "তোমার কর্তব্য তো কেবল পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ" (১৩ : ৪০); অদ্রূপ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ "সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ (জিহাদ সংক্রান্ত) কোন নির্দেশ দেন" (২ : ১০৯) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً।(৫৯ : ১০৯) "লোকে যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল" (৭৩ : ১০)। خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ. "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়াইয়া চল" (৭ : ১৯৯; অদ্রূপ ৪ : ১৪০; ৬ : ৬৮, ১০৬; ১৫ : ৯৪; ৩২ : ৩০; ৫৩ : ২৯; উপেক্ষা কর/ অপেক্ষা-প্রতীক্ষায় থাক / وَارْتَقِبْ انْتَظِرْ ১০ : ২০; ১০২; ১১ : ১২২; ৩৭ : ১৭৫; ৪৪ : ১০; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না (لاَ تَحْزَنْ) ২৭ : ৬৯; ১৬ : ১২৭; সবর কর, সবরের পরাকষ্ঠা দেখাও, সবরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর; পরস্পরকে সবরে উদ্বুদ্ধ কর (اصْبِرْ – اصْبِرُوْا صَابِرُوْا) ৭ : ৮৭; ১০ : ১০৯; ১৬ : ১২৬, ১২৭; ১৮ : ২৮, ২০ : ১৩০; ৩৮ : ১৭; ৪০ : ৭৭; ৪৬ : ৩৫; ৫২ : ৪৮; ৭৬ : ২৪; ৩ : ১৯৯; ৩ : ২০; ৪ : ৮০; ৫ : ১১; ৬ : ১০৪; ১০ : ৪১; ৯৯, ১০৮; ১১ : ১২, ১২১; ১৩ : ৪৩; ১৬ : ১২৫; ১৮ : ২৯; ২২ : ৬৮; ২৩ : ৯৬; ২৫ : ৫৬; ২৬ : ২১৬; ২৮ : ৫৪; ২৯ : ৪৬; ৩৫ : ১৪; ৪২ : ৪৮; ৪৫ : ১৪; ৮৮ : ২১, ২২।

ইহা ছিল জিহাদের অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পর্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মক্কা শরীফের তের বৎসর সবর প্রশিক্ষণ দ্বারা এই প্রয়োজনটি সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রস্তুতি পর্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, মক্কা শরীফের ও আশপাশের প্রতিটি গোত্রেই কিছু মুসলমান ছিল এবং প্রায় প্রতিটি ঘরেই কেহ মুসলমান, কেহ কাফির ছিল। সুতরাং এই অবস্থায় জিহাদের অনুমোদন দেওয়া হইলে মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষায় প্রয়োজনীয় নিরাপদ আশ্রয়ের কঠিন সমস্যা দেখা দিত এবং বিপুল সংখ্যাধিক্য সম্পন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা ধরিয়া নিলেও উহা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করিত এবং রক্তবন্যা প্রবাহিত হইত, তদুপরি ভবিষ্যত মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হইয়া পড়িত। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কুদরতী ব্যবস্থা হইল— মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় তথা আনসারীদের পালাক্রমে ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের ব্যবস্থা। নবুওয়াতের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষে যথাক্রমে মদীনা (ইয়াছরিব) হইতে মক্কায় হজ্জ উপলক্ষে আগত পৌত্তলিক আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ছয়জন, বারজন এবং বাহাত্তর বা পঁচাত্তর জন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদিগকে মদীনায় আশ্রয় ও সার্বিক সহযোগিতা দানের চুক্তিতে (বায়'আত) আবদ্ধ হইলেন। ফলে মক্কার নির্যাতিত মুসলমানরা একে একে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি লইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতে লাগিলেন।

এক সময় মক্কার প্রায় সকল মুসলমান হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ছাড়া হিজরতে অপারগ কিছু দুর্বল অসহায় মুসলমান এবং কাফিরদের দ্বারা অন্তরীণ বা অবরুদ্ধ মুসলমানগণ হিজরত করিতে সমর্থ হইলেন না। তবুও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান মদীনায় হিজরত করিলেন।

কিন্তু মদীনায় মুসলমানদের আবাসনের কারণে আগত সংকট সম্পর্কে কুরায়শদের গভীর ধারণা ছিলনা। এক্ষণে হিজরতের কাজ প্রায় সমাপ্ত হওয়ার পর তাহাদের টনক নড়িল এবং ভবিষ্যত বিপদের আংশকায় তাহারা প্রমাদ গণিতে লাগিল। ইব্‌ন ইসহাকসহ বিভিন্ন সীরাতবিদের মতে কুরায়শরা দেখিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য তাঁহার অনুসারী একটি সুসংগঠিত দল বিদেশের মাটিতে তৈরী হইয়া গিয়াছে এবং মক্কাত্যাগী মুহাজিরগণ মদীনাবাসীদের সঙ্গে জোট বাঁধিতেছে। কুরায়শরা বুঝিতে পারিল যে, মুসলমানগণ তো একটি স্বতন্ত্র নিবাসের অধিকারী হইয়া গেল এবং তাহারা ইসলামের বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা একটি সমর শক্তিতে পরিণত হইতেছে। তাহারা আরও বুঝিতে পারিল যে, মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে একটি জোট শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতকে তাহাদের জন্য একটি বড় সংকটের বিষয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তাহারা তাহাদের দারুন নাদওয়ার জাতীয় পরামর্শ গৃহে রাত্রিবেলা এক গোপন ও রুদ্ধদ্বার বৈঠক আহ্বান করিল। বৈঠকে রাসূল-বিদ্বেষী সকল শীর্ষ নেতা ও গোত্রপ্রধান সমবেত হইল। তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, "এই লোকটির পূর্বাপর অবস্থা তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে। আমাদের অঞ্চল ব্যতীত অন্য যেসব লোক তাহার অনুসারী হইয়াছে, আল্লাহ্র কসম— এখন আমরা আমাদের বিরুদ্ধে তাহার আক্রমণের আশংকা হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। সুতরাং আজ অবশ্যই আমাদিগকে তাহার ব্যাপারে একটি সম্মিলিত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে হইবে" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪৮০; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২১৪; নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২৬৮-২৬৯)।

বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার দীনের দাওয়াতকে নির্মূল করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন হইল এবং চিরতরে রাসূলের অস্তিত্ব মিটাইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪৮১; বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২১৫, ২১৬; নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ২৬৯-২৭০)। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

"স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য। তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী" (৮ ঃ ৩০)।

আল্লাহ্র রাসূল ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইলেন এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে স্বীয় গৃহ ত্যাগ করিয়া মদীনাতে পৌঁছিলেন। মক্কার মুসলমানগণ হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার পর পরিস্থিতির এমন উন্নতি হইতে পারিত যে, মক্কার কাফিররা ঝামেলা চুকিয়া গিয়াছে মনে করিয়া নীরবতা অবলম্বন করিত এবং মদীনায় মুসলমানরাও নিজেদের দীন ও জীবন নিয়া নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিত। কিন্তু ইতিহাসের গতিধারা তেমন হয় নাই। মক্কার কাফিররা আকর্ষণীয় শিকার হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভে, ক্রোধে ও প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিতে লাগিল এবং সেই সাথে বিগত সুদীর্ঘ দিনের নির্যাতনের জবাবে মুসলমানদের পক্ষ হইতে আক্রান্ত হওয়ার কাল্পনিক দুশ্চিন্তা তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। মুসলমানরা অবশ্য অবসাদ, ক্লান্তি ও দুঃখ-বেদনা উপশমের লক্ষ্যে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের প্রত্যাশী হইয়া দীন পালন ও সংসার জীবন যাপনে মনোযোগী হইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উস্কানী চলিতে থাকিল এবং আল্লাহর ইচ্ছাও অন্য রকম বলিয়া প্রতিভাত হইল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল সংঘাতের মাধ্যমে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটাইয়া হককে বিজয়ী করা। لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ "সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করিবার জন্য" (৮ ঃ ৭) এবং بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ "কিন্তু আমি সত্য

দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়" (২১ ঃ ১৮)।

এই কারণে মক্কার মুশরিকরা নূতন করিয়া ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতে লাগিল এবং মুসলমানদের জন্য নিশ্চিন্তে জীবন যাপন তো দূরের কথা, নিরাপদ রাত্রিবাসও দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। মদীনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন এবং ইয়াহূদীদের সহিত সমঝোতাপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তিতে (ঐতিহাসিক মদীনা সনদ) আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু মক্কার মুশরিক কুরায়শ ও তাহাদের অনুগামী কাফির গোত্রসমূহ এবং তাহাদের সহযোগীরূপে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র চলিত থাকিল। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় স্থায়ী নিবাস স্থাপন করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সাহায্য দ্বারা ও মুমিন বান্দাদের দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিলেন। মদীনাবাসীদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। মহানবী (স)-এর মদীনায় আগমনের অল্প দিনের ব্যবধানে বদর যুদ্ধের পূর্বেই কুরায়শরা মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি তাহার অনুগামী আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় পৌত্তলিকদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিল ঃ

اِنَّكُمْ اٰوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَاِنَّا نُقْسِمَ بِاللّٰهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْلَتُخْرِجَنَّهُ اَوْ لَنَسِيْرَنَّ اِلَيْكُمْ بِاَجْمَعِنَا حَتّٰى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَائَكُمْ.

"তোমরা আমাদের লোকটিকে আশ্রয় দিয়াছ। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, হয় তোমরাই তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা তাহাকে বহিষ্কার করিবে। অন্যথায় আমরা সম্মিলিত বাহিনীসহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করিব এবং তোমাদের নারী ও শিশুদিগকে বৈধ (দাসদাসী) করিয়া লইব"।

এই পত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি ও তাহার অনুগামী মুনাফিকদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। মহানবী (স)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি-এর নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, কুরায়শরা তোমাদিগকে চূড়ান্ত হুমকি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু তোমরা (আমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে) নিজেদের যেই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করিবে তাহারাও (যুদ্ধ করিতে আসিলে) তোমাদের উহার অধিক কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমরা কি তোমাদের নিজেদের পুত্রদের ও ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিবে? (আবূ দাঊদ, ২খ, পৃ. ৪২৩; বনূ নাযীর প্রসংগ; নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৩০৫-৩০৬)।

এখানে উল্লেখ যে, মুসলমানরা নির্যাতিত হইয়া হাবশায় হিজরত করিবার পরও কুরায়শরা তাহাদের প্রতিহিংসা ও জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার মানসে হাবশী (আবিসিনীয়) সম্রাটের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া মুসলমানদের ফিরাইয়া আনিবার অথবা সম্রাট কর্তৃক

তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। অবশ্য সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতা ও দূরদর্শিতা এবং মুসলমানদের মুখপাত্র হযরত জা'ফরে ইব্ন আবূ তালিবের সত্য ভাষণ ও সাহসিকতার ফলে মুশরিক প্রতিনিধিদল ব্যর্থতার গ্লানি সহকারে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

মূল কথা এই যে, মদীনায় পৌঁছিয়াও রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানরা তাহাদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শিকার হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভে ও ক্রোধে অন্ধ কুরায়শ কাফিররা এবং তাহাদের মিত্রপক্ষ ও মদীনার কুচক্রী ইয়াহূদী ও মুনাফিকরাই মুসলমানদের প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছে। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ও তাঁহার দলটি রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতার চক্রান্ত করিয়াছে।

প্রসংগত আনসারী আওস গোত্রের প্রধান নেতা হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ও মক্কার অন্যতম কাফির সর্দার আবূ জাহ্লের মধ্যকার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হযরত সা'দ (রা) এবং মক্কার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উমায়্যা ইব্ন খাল্ফের সহিত দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল এবং সা'দ (রা) মুসলমান হওয়ার পরেও তাহা অক্ষুণ্ন ছিল। তাহারা মক্কা-মদীনায় একে অপরের মেহমান হইত। হিজরতের অল্পদিন পরে (যুদ্ধের সূচনা হওয়ার পূর্বে) একবার সা'দ (রা) উমরা করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করিলেন এবং যথারীতি উমায়্যার মেহমান হইলেন। একদিন সা'দ (রা) বন্ধু উমায়্যাকে সাথে নিয়া কা'বা শরীফ তাওয়াফ করিতে গেলেন। ঘটনাচক্রে আবূ জাহ্লও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উমায়্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে? উমায়্যা বলিল, বন্ধু (মদীনার নেতা) সা'দ। আবূ জাহ্ল ক্ষিপ্ত হইয়া সা'দ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমরাই তো আমাদের ধর্মত্যাগী লোকগুলিকে মদীনায় আশ্রয় দিয়াছ। তোমরা মদীনার লোকেরা কা'বা শরীফের নিকট আসা-যাওয়া করিবে, ইহা আমার নিকট অত্যন্ত অসহনীয় ব্যাপার। আল্লাহ্র কসম! এই মুহূর্তে উমায়্যার সঙ্গে না থাকিলে তুমি জীবিত ফিরিয়া যাইতে পারিতে না। জবাবে সা'দ (রা) বলিলেন, তোমরা আমাদিগকে হজ্জে (উমরায়) বাধা দিলে আমরাও তোমাদের মদীনার পথ রুদ্ধ করিয়া দিব অর্থাৎ বাণিজ্যের জন্য মদীনার পথে সিরিয়া গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিব। ফলে তোমাদের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তোমরা আর্থিক ভাবে পর্যুদস্ত হইবে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৬৩; নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., ৩৬)।

এই ঘটনাও প্রমাণ করে যে মুসলমানদের জন্য বিদেশ বিভূইয়ে আসিয়াও নিরাপদ জীবন যাপনের অবকাশ ছিল না এবং পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হইতেছিল। কেননা কুরায়শরা শুধু মদীনায় চরমপত্র পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই এবং পত্রের হুমকি অনুসারে তাহারা মদীনায় আক্রমণ করিয়া মুসলমানদের উৎখাত করিবার প্রস্তুতিও গ্রহণ করিতে লাগিল। এমনকি হিজরত পরবর্তী কালে প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (স) শত্রুর আক্রমণের আশংকায় প্রায়ই নিদ্রাবিহীন রাত্রি যাপন করিতেন।

বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ হযরত উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ الْمَدِيْنَةَ وَاَوَتْهُمُ الاَنْصَارُ رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ وَالْيَهُوْدُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَشَمَّرُوا لَهُمْ عَنْ سَاقِ الْعَدَاوَةِ وَالْمُحَارَبَةِ وَصَاحُوْابِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتّٰى كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ يَبِيْتُوْنَ الاَّ فِى السِّلاَحِ وَلاَ يُصْبِحُوْنَ الاَّ فِيْهِ فَقَالُوْا نُرٰى نَعِيْشُ حَتّٰى نَبِيْتَ مُطْمَئِنِّيْنَ لاَ نَخَافُ الاَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ٠

"রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার (মুহাজির) সাহাবীগণ যখন মদীনায় আগমন করিলেন এবং আনসারীগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন তখন আরববাসী মুশরিক এবং ইয়াহূদীরা অভিন্ন ধনুকে তাহাদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল, তাহাদের প্রতি শত্রুতা ও লড়াইয়ের কার্যক্রম শুরু করিল এবং চতুর্দিক হইতে ধ্বনি তুলিল (ও যৌথভাবে শত্রুতা ও আক্রমণ আরম্ভ করিল)। এমনকি তখন মুসলমানগণকে সকাল পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে হইত। এই পরিস্থিতিতে সাহাবীগণ বলিতে লাগিলেন, সেই দিন কবে দেখিব যখন আমরা নিরাপদে রাত্রি যাপন করিব এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ভয়ে ভীত থাকিব না"? তখন আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনাবাণী ও প্রতিশ্রুতি বাক্য নাযিল করিলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ٠

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেন" (২৪ ঃ ৫৫; সুবুলুল হুদা, ৩খ, পৃ. ৫; শিবলী ও নদবী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৩০৮)।

উপর্যুক্ত আলোচনার মূল লক্ষ্য হইল এই দাবি প্রমাণ করা যে, নির্যাতিত মুসলমানরা মদীনায় আবাসন গ্রহণ করিবা মাত্র কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে ঝাপাইয়া পড়েন নাই, বরং তাহারা ছিলেন ক্ষমা প্রদর্শন ও ধৈর্যধারণ সংক্রান্ত আদেশ এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে জিহাদের অনুমোদন প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে নিবেদিতপ্রাণ। কাফির, মুশরিক ও ইয়াহূদীরাই তাহাদিগকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং আল্লাহ তা'আলার অনুমোদন পাওয়ার পরই তাঁহারা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জিহাদের অনুমোদনের জন্য অপরিহার্য বিষয়রূপে বিবেচিত দুই পূর্বশর্ত ঃ (১) মুসলমানদের নিজস্ব স্বতন্ত্র কেন্দ্র (সংরক্ষিত সেনা ছাউনী) এবং (২) মুজাহিদদের সার্বিক ও

পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে জানমাল উৎসর্গের মনোবৃত্তি সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়ার পরই প্রথম পর্যায়ে নির্যাতন প্রতিহত করিবার লক্ষ্যে জিহাদের অনুমোদন দেওয়া হইল।

কাসতাল্লানী লিখিয়াছেন, সত্তরের অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিবার অর্থাৎ সবর ও ক্ষমার আদেশের পর হিজরত-পরবর্তী কালে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হইল। জুলুম-নির্যাতন-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাহাদের রক্তপাত হালাল করিয়া দেওয়া সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার রাসূলের উপর অবতীর্ণ প্রথম আয়াত। উরওয়া ইবনুয যুবায়র ও অন্যান্য আলিমদের অভিমত অনুসারে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ জিহাদের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রথম অবতীর্ণ আয়াত হিসাবে বিবেচিত ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

"(যদিও এতদিন পর্যন্ত যৌক্তিক কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এখন) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা (কাফিরদের পক্ষ হইতে) আক্রান্ত হইয়াছে এই কারণে যে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে (ইহা জিহাদ বৈধ হওয়ার যুক্তি)। আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য ও বিজয়ী করিতে সম্যক সক্ষম। (তাহাদের নিপীড়িত হওয়ার বিবরণ এই যে,) যাহারা অকারণে নিজেদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ হইয়াছে শুধু এই অজুহাতে যে, তাহারা বলে ঃ 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। (অর্থাৎ কাফিরদের সীমাহীন নির্যাতন ও সমস্ত ক্রোধের সূত্র ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপন। একমাত্র এই কারণেই এত জুলুম ও দেশান্তরিত হওয়া। সম্মুখে জিহাদের হিকমত ও যৌক্তিকতার বিবরণ)। আল্লাহ্ যদি (সর্বদা) মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করিতে থাকিতেন (অর্থাৎ মাঝে মধ্যে হকপন্থিগণকে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করিতে না থাকিতেন) তাহা হইলে (নিজ নিজ যুগে) খৃস্টান সংসারবিরাগীদের (রাহিব) নির্জন ইবাদতখানা ও গীর্জাসমূহ, ইয়াহূদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ, যাহাতে অধিক হারে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়, বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ্ন) হইতে থাকিত। (জিহাদে ইসলাম ও ঐকান্তিকতার ভিত্তিতে বিজয়ের সুসংবাদ বাণী) আল্লাহ নিশ্চয় তাহাকে সাহায্য করিবেন যে তাঁহাকে (দীনকে) সাহায্য করিবে (অর্থাৎ যে শুধু আল্লাহ্‌র কলেমাকে বুলন্দ করিবার খাঁটি নিয়াতে জিহাদ করিবে)। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান ও

পরাক্রমশালী। (তিনি যাহাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দান করিবার ক্ষমতা রাখেন। ইহাদের মাহাত্ম্য এই যে) আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা (ও হুকুমত) দান করিলে ইহারা নিজেরাও সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং (অন্যদেরকেও) সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে। আর সকল কর্মের পরিণাম তো আল্লাহ্রই এখতিয়ারে। (সুতরাং মুসলমানদের ভবিষ্যত পরিণতি বর্তমান অবস্থার চাইতে ভিন্নরূপ হইতেই পারে যেমন বাস্তবে হইয়াছিল)" (২২ ঃ ৩৯-৪১; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ২৬৯)।

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"এবং (যদি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হইতে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পবিত্র যিলকদ মাসে ও পবিত্র হারাম সন্নিহিত অঞ্চলে তোমাদের উপর আক্রমণের আশংকায় শংকিত হও তবে তোমরাও পবিত্র মাস ও হারামের কারণে চিন্তিত না হইয়া বরং) যাহারা (চুক্তি ভঙ্গ করিয়া) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হয় তোমরা (দ্বিধামুক্ত হইয়া দীনদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদের নিয়াতে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, কিন্তু (তোমরা অগ্রে আক্রমণ করিয়া) সীমা লঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসেন না" (২ ঃ ১৯০; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৬৫-৪৬৬)।

ইমাম রাযী ও ইব্ন জারীর আত্-তাবারী প্রমুখ রাবী' ইব্ন আনাস, অবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ও আবুল আলিয়া প্রমুখের সূত্রে সূরা বাকারার পূর্বোক্ত আয়াতকে জিহাদের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রথম আয়াত বলিয়াছেন এবং মুফাসসিরগণের অনেকে এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। অপরদিকে হযরত আবূ বাক্র (রা) হইতে একটি বর্ণনায় এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একাধিক বর্ণনায়, অদ্রূপ মুজাহিদ, দাহ্হাক, উরওয়া ইব্নুয যুবায়র, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্ন হায়্যান, সুদ্দী, যুহ্রী, যায়দ ইব্ন আসলাম, সুফ্য়ান ছাওরী (র) প্রমুখ সূরা হজ্জের ৩৯-৪০ আয়াত (وَقَاتِلُوْا)-কে যুদ্ধের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রথম আয়াত বলিয়াছেন। ইমাম আহমাদ, আবদুর রাযযাক, ইবনু আবী শায়বা, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, ইব্ন হিব্বান, আবদ ইব্ন হুমায়দ, হাকেম (তাঁহার মুসতাদরাকে), বায়হাকী (তাঁহার দালাইলে), ইব্ন 'আইয আওফী, ইবনুল মুন্যির, বাযযার, ইব্ন জারীর প্রমুখ নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিরমিযী বর্ণনাটিকে হাসান এবং হাকেম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় হিজরতকালে আয়াতটি নাযিল হওয়ার বিবরণ আছে (কুরতুবী, ২খ., পৃ. ৩৪৭)। অন্যান্য বর্ণনামতে আয়াতটি হিজরতের পরপর মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার তথ্য রহিয়াছে।

জিহাদ অনুমোদনের প্রথম আয়াত সংক্রান্ত উল্লিখিত দুইটি মতের মধ্যে বিভিন্নরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে। সায়্যিদ সুলায়মান নদবী লিখিয়াছেন, যে আয়াতই প্রথম হউক উহাতে মূল বিষয়ে কোন তারতম্য দেখা যায় না। কেননা উভয় আয়াতে শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার

অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত বিচারে মুসলমানগণকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল (সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৩০৯)।

বিশেষজ্ঞগণ সূরা হজ্জের আয়াত প্রথম হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। (১) কুরতুবী লিখিয়াছেন, এই (أُذِنَ لِلَّذِيْنَ) আয়াত কুরআনে বিদ্যমান ক্ষমা করা, সবর করা, বর্জন করা. উপেক্ষা করা, এড়াইয়া যাওয়া অর্থাৎ যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত সকল বিধানকে রহিত (মানসূখ) করিয়াছে। সুতরাং উহা জিহাদ অনুমোদনের প্রথম আয়াত (কুরতুবী, ৬/১২ খ., পৃ. ৬৮)।

(২) সূরা হজ্জে أُذِنَ (অনুমতি দেওয়া হইল) শব্দ এবং ظُلِمُوْا শব্দ (নির্যাতিত হওয়াকে অনুমতি প্রদানের কারণ সাব্যস্ত করা) নির্দেশ করে যে, ইহাই ছিল জুলুমের বিপরীতে প্রতিরোধের প্রথম অনুমোদন। ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করিবার (قِتَالٌ) কথা বলা হয় নাই।

(৩) আর বাকারার আয়াতে যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার قَاتِلُوا الَّذِيْنَ (يُقَاتِلُوْنَكُمْ) কথা বলা হইয়াছে।

(৪) ইহা ছাড়া বাকারার এই আয়াতের সংযুক্ত আয়াতে ব্যাপক যুদ্ধের এবং মক্কা শরীফ হইতে কাফিরদের বহিষ্কার করিবার আদেশ (وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ) রহিয়াছে। ইহা বিষয়টি বেশ পরবর্তী (হুদায়বিয়া সন্ধির পরের বৎসরে) হওয়া নির্দেশ করে এবং সে ক্ষেত্রে বাকারার উল্লিখিত আয়াতের বিধানকে রহিত (মানসূখ) বলিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

(৫) সর্বোপরি সূরা বাকারার উক্ত আয়াতের প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত শানে নুযূলে বলা হইয়াছে যে, উহা এবং উহার পরবর্তী কতিপয় আয়াত রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ কাযা উমরা করিতে আসিলে কাফিরদের চুক্তিভঙ্গ ও পবিত্র মাসে যুদ্ধ করিবার আশংকা দেখা দেয়। ইহাতে মুসলমানগণ পবিত্র হারাম মাসে ও পবিত্র হারাম শরীফে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ার বিষয়ে শংকিত হইয়া পড়িলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শংকা দূরীকরণ ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট আদেশ প্রদান করিয়া এই আয়াতসমূহ নাযিল করেন (সুয়ূতী, লুবাব ফী আসবাবিন নুযূল, সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে নুযূল; থানবী, বায়ানুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১০৯; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৬৫, ৪৭০)।

সুতরাং এইভাবে বলা যায় যে, জুলুমের প্রতিরোধে জিহাদ করিবার সাহাবীগণের আকাংক্ষার প্রেক্ষিতে সূরা হজ্জের أُذِنَ لِلَّذِيْنَ আয়াত দ্বারা জিহাদের মৌলিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করা বা না করিবার বিষয়টি এই আয়াতের মুখ্য বিষয় নহে। আর বাকারার (وَقَاتِلُوْا) আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের অনুমোদনের বিষয়টি মুখ্য যাহা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনায় স্পষ্ট হইয়াছে। আলূসী লিখিয়াছেন, যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ

করে اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (২ ঃ ১১০) অর্থাৎ যাহারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (প্রয়োজনে হারাম মাসে ও হারাম শরীফেও) সম্পূর্ণ বৈধ এবং ইহাতে দ্বিধান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই। ইহা ছিল আবুল 'আলিয়া সূত্রের বর্ণনা অনুসারে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বিধান (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২খ., পৃ. ৭৪)। ইব্ন কাছীর লিখিয়াছেন, কেননা যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে (اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ-২ ঃ ১৯০)। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা যেরূপে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তোমরা মুসলমানগণও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়, এই বর্ণনাধারা মূলত وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً "তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ কর যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে" (৯ ঃ ৩৬)-এর প্রায় সমতুল্য নির্দেশ। এই আয়াত দ্বারা যুদ্ধ শুরু করিবার অনুমতি প্রদানই শুধু নহে, বরং ইহা দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে সমানে সমানে লড়িতে উদ্বুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ "এবং যেইখানে তাহাদিগকে পাইবে সেইখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং যে স্থান (মক্কা শরীফ) হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবে" (২ ঃ ৯১)। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল হইয়া আসিলে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য সশস্ত্র জিহাদকেও ফরয করিয়া দিলেন। যেমন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমাদের উপর জিহাদকে ফরয (বিধান) করা হইল, যদিও (স্বভাবগত কারণে) তোমাদের নিকট উহা অপ্রিয়। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, তোমরা কোন বিষয় অপসন্দ কর তাহা (বাস্তবে) তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন বিষয় তোমাদের প্রিয় মনে কর তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না" (২ ঃ ২১৬)।

এই আয়াতে মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয করা হইয়াছে। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, জিহাদ, যুদ্ধযাত্রী মুজাহিদ ও আবাসে অবস্থানকারী সকলের উপর ওয়াজিব। আবাসে অবস্থানকারীর কর্তব্য, তাহার নিকট সাহায্য চাওয়া হইলে সাহায্য করা। যুদ্ধ গমনের জরুরী ও ব্যাপক আহবান জানানো হইলে যুদ্ধাভিযানে বাহির হইয়া পড়ো। এইরূপ প্রয়োজন দেখা না দিলে বাড়িতে অবস্থান করা যাইবে (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ২৫২)। তদ্রূপ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ "তোমরা কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, এখন (যুদ্ধ হইতে) তোমাদের হস্ত সংবরণ কর (বিরত থাক) এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করিতে থাক। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মত

অথবা তদপেক্ষা অধিক এবং বলিতে লাগিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না” (৪ ঃ ৭৭; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৫২৫; বয়ানুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৩৫; মা'আরিফুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৪৭৯; আরও দ্র. ৪৭ ঃ ২০ আয়াত ও উহার তাফসীর)।

মোটকথা, দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদকে অবশ্য পালনীয় ফরয সাব্যস্ত করা হইল এবং ক্রমান্বয়ে উহার পরিধি বিস্তার করা হইল। প্রথমত, কাফির মুশরিকদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল ঃ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا “যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; তবে সীমা লঙ্ঘন করিও না” (২ ঃ ১৯০)।

পরবর্তী স্তরে জিহাদের পরিধি বিস্তীর্ণ করিয়া নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার আদেশ দেওয়া হইল ঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً “হে ঈমানদারগণ! সেই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়” (৯ ঃ ১২৩)।

এই আয়াতে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্রমধারা বর্ণনা করা হইয়াছে। দীন প্রচার ও দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেরূপে প্রথমে নিকটাত্মীয় হইতে শুরু করিবার আদেশ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) দেওয়া হইয়াছিল এবং ক্রমান্বয়ে পরিধি সম্প্রসারিত করিয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (রোম, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল) পৌঁছানো হইয়াছিল, তদ্রূপ জিহাদও প্রথমত মদীনার সন্নিহিত অঞ্চল হইতে শুরু করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য নিকটবর্তী হওয়ার মানদণ্ড যেমন স্থানের নৈকট্য হইতে পারে, তদ্রূপ রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক সূত্রের নৈকট্যও হইতে পারে। জিহাদের এই ক্রমধারা রক্ষার্থেই রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার নিকট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের বিভিন্ন মুশরিক গোত্র জুহায়না, মুযায়না, বানূ দামরা প্রভৃতি গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন এবং যুদ্ধাভিযান পরিচালনায় অন্যান্য গোত্র ও অঞ্চলের পূর্বে নিকটবর্তী বানূ নাযীর, বানূ কুরায়যা ও খায়বারের ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিলেন। অতঃপর আরব ভূখণ্ডের সমগ্র অঞ্চলের প্রতি নজর দেওয়া হইল এবং মক্কা-মদীনাসহ খায়বার, তাইফ, ইয়ামান, ইয়ামামা, হিজর, হাদারামাওতসহ সমগ্র 'জাযীরাতুল আরব' করতলগত হওয়ার পর এবং সকল স্থানের বসবাসকারী গোত্রসমূহ আনুগত্য স্বীকার করিল। এই ধারায়ই রাসূলুল্লাহ (স) আরব সীমান্তের সর্বাধিক নিকটবর্তী রোমান খৃস্টানদের বিরুদ্ধে তাবূক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে খুলাফা-ই রাশিদীন এবং তাঁহাদের উত্তরসুরিগণ এই ক্রম সম্প্রসারণ অনুসরণ করিয়া জিহাদ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৪০১, ৪০২; বায়ানুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ১৩৫; মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৪৯৩, ৪৯৪)।

পরবর্তী স্তরে সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী জিহাদের আদেশ বিঘোষিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও একাধিক আয়াতে। যেমন وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ "তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তাহাদিগকে পাইবে" (২ ঃ ১৯১); وَقْتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ "এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হইয়া যায়" (২ ঃ ১৯৩); وَقٰتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً "এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিতে থাকিবে যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিয়া থাকে" (৯ ঃ ৩৬) ইত্যাদি।

মূলত সর্বাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে দুই ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা বিদ্যমান ছিল এবং সমকালীন প্রচলিত সমরনীতি ও ঐশী-বিধানে বৎসরের চারটি পবিত্র (যিলকাদ, জিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব) মাসে এবং কা'বা শরীফ সন্নিহিত পবিত্র হারাম অঞ্চলে যুদ্ধ অবৈধ ও নিষিদ্ধ হওয়া যাহা সাধারণত মুশরিকরাও প্রতিপালন করিয়া চলিত। দুইঃ ইতোমধ্যে কোন কোন কাফির গোত্র এবং খোদ কুরায়শদের সহিত সম্পাদিত অনাক্রমণ ও যুদ্ধ নয় চুক্তি এবং উহার আনুষংগিকতা (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৭০, ৪৭২; ৪খ., পৃ. ২৩২)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ

"পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যাহার পবিত্রতা অলংঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর" (২ ঃ ১৯৪)।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ـ

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে ফিরাইয়া না দেয় , যদি তাহারা সক্ষম হয়"(২ ঃ ২১৭)।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন" (৯ ঃ ৩৬)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا. اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً. سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا.

"যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ অথবা যাহারা তোমাদেরই নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না। তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে আহ্বান জানানো হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। যদি ইহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে গ্রেফতার করিবে ও হত্যা করিবে। আমি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের সুস্পষ্ট অধিকার দিয়াছি" (৪ ঃ ৮৯, ৯০, ৯১)।

اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لاَ يَتَّقُوْنَ. فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ... وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ.

"উহাদের মধ্যে তুমি যাহাদের সহিত (একাধিক বার) চুক্তিতে আবদ্ধ, তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না। যুদ্ধে উহাদিগকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে উহাদিগকে উহাদের পশ্চাতে যাহারা আছে, তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে উহারা শিক্ষা লাভ করে" (৮ : ৫৬-৫৭)।....
"এবং যদি তাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নহে" (৮ : ৭২)।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ... وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ.

"আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বলবৎ থাকিবে? তবে যাহাদের সহিত তোমরা মসজিদুল হারামের সন্নিকটে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যাবত তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে" (৯ : ৭)। ..."যদি তাহাদের চুক্তির পর তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর। ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যাহাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়" (৯ : ১২)।

মোটকথা, এইরূপে জিহাদের ক্রমবিস্তার ঘটাইয়া উহাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইল। আরব-অনারব, কিতাবী (ইয়াহূদী, খৃস্টান) অকিতাবী, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজারী পারসিক নির্বিশেষে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় এমন সকল কাফির-মুশরিকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কঠোর উপদেশ দেওয়া হইল— প্রতিপক্ষের রক্ত প্রবাহিত করিয়া আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়া আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু ও পর্যুদস্ত করিবার জন্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ.

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৮ : ৬৭)।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ... فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا.

"ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। .... অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। (৪৭ ঃ ৩-৪)।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতায় আরবের কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের পরপরই একত্ববাদ ও আখিরাতে বিশ্বাসের দাবিদার কিতাবীদের (ইয়াহূদী-খৃস্টান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

"যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্য়া দেয়" (৯ ঃ ২৯)।

মোটকথা পূর্ব বর্ণিত মুশরিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ঘোষণা এবং উহার পরিসমাপ্তিতে إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا "মুশরিকরা তো নিছক অপবিত্র। সুতরাং বর্তমান (৯ম হিজরী) বর্ষের পর উহারা যেন মসজিদুল হারাম-এর কাছে আসিতে না পারে" (৯ ঃ ২৮) এবং কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশসমূহ দ্বারা ইসলামের জিহাদ বিধানকে উহার পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত করা হইয়াছে এবং মহানবী (স) নিজে এই আদেশ বাস্তবায়নের পথ রচনা করিয়া উহার বুনিয়াদী কাজ ও পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অংশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং হযরত উমার (রা) তাঁহার খিলাফতকালে সমগ্র আরবকে মুশরিক ও ইয়াহূদীমুক্ত করিয়া মহানবীর আদেশ ও বাসনা সুসম্পন্ন করিয়াছেন (বায়ানুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ১০৫)। এই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ইব্ন কাছীর কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও উহাতে কঠোরতা অবলম্বনের আদেশ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতের (৯ ঃ ৭৩) তাফসীরে লিখিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (স)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও উহাতে কঠোরতার আদেশ দিয়াছেন— যেইরূপ তাঁহার অনুসারী মুমিনদের প্রতি কোমলতার নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) চার ধরনের তরবারি সহকারে প্রেরিত হইয়াছেন ঃ (১) একটি তরবারি মুশরিকদের বিরুদ্ধে فَاِذَا انْسَلَخَ الاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

الْمُشْرِكِيْنَ (৯ : ৫); (২) আহলে কিতাবের কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি তরবারি قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ (৯ : ২৯); (৩) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি তরবারি جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ (৯ : ৭৩) এবং (৪) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি তরবারি فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ “যাহারা বিদ্রোহ করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে” (৪৯ : ৯)। তবে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ তাহাদের প্রকাশ্য অবস্থানে আসিবার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩৩৬, ৩৭১)।

দাহ্হাক বলিয়াছেন, “সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতসমূহ মহানবী (স) ও মুশরিকদের যে কোন দলের মধ্যকার সকল সন্ধিচুক্তি ও দায়-দায়িত্ব এবং সকল সময়সীমা ও মেয়াদ রহিত করিয়াছে”। আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, “বারা'আত (সূরা তওবা-র দায়মুক্তি ঘোষণা) নাযিল হওয়ার সময় হইতে মুশরিকদের কাহারও জন্য চুক্তি ও দায় বাকী থাকিল না (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩৩৬)। ইউসুফ সালিহী লিখিয়াছেন, “হিজরতের পর কাফিররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। একদল লোক মহানবী (স)-এর সহিত এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হইল যে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবে না এবং তাঁহার শত্রু পক্ষকেও সাহায্য করিবে না। তাহারাও কুফরী অবস্থায় জানমালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। একদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শত্রুতা করিল ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং একদল সন্ধিও করিল না, আবার যুদ্ধও করিল না, বরং তাহারা দুই পক্ষের (মুসলিম ও কুরায়শ) শেষ অবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষার নীতি গ্রহণ করিল। ইহাদের একটি অংশ মনেপ্রাণে তাঁহার বিজয় ও সাফল্য কামনা করিত এবং অপর অংশ তাঁহার শত্রুদের বিজয় ও প্রতিপত্তি কামনা করিত। আর একটি অংশ উভয় পক্ষ হইতে নিরাপদ থাকিবার মনোবৃত্তিতে প্রকাশ্যে তাঁহার সঙ্গে এবং গোপনে তাঁহার শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিত (বরং মানসিকভাবে তাহারা শত্রুপক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল)। ইহারাই মুনাফিক দল।

মহানবী (স) তাঁহার মহান প্রতিপালকের নির্দেশ অনুসারে ইহাদের প্রত্যেক দলের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিলেন। মদীনার ইয়াহূদীদের প্রধান তিন গোত্র বানূ কায়নুকা', বানূ নাযীর ও বানূ কুরায়জা-র সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। ইহাদের সকলে চুক্তি ভঙ্গ করিল এবং যথাসময়ে উহার যথাযোগ্য পরিণতি ভোগ করিল। যাহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সহিত চুক্তি রক্ষা করিয়া চলিতে, চুক্তিভঙ্গের আশংকার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পন্থায় চুক্তি প্রত্যাহার করিতে এবং চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। খায়বার, মক্কা বিজয়, তাইফ, হুনায়ন ও সর্বশেষ তাবূকে তাঁহার প্রত্যক্ষ সেনাপতিত্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ সর্বাত্মক জিহাদেরই ধারাবাহিকতা। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَاْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَيُصَلُّوْا صَلٰوتَنَا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَّا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَّا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ.

"আমি আদিষ্ট হইয়াছি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যতক্ষণ না তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং যতক্ষণ না তাহারা আমাদের কিবলা অনুসরণ করে, যাকাত আদায় করে, আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করে এবং আমাদের সালাত আদায় করে। এই সকল কাজ করিলে তখনই আমাদের জন্য তাহাদের জীবন ও সম্পদ হারাম হইয়া যাইবে— তবে উহার হক-এর কারণে। অর্থাৎ তখন সে সব নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে যাহা মুসলমানগণ ভোগ করে এবং সে সব কর্তব্য পালন করিবে যাহা মুসলমানগণ পালন করে" (সুবুলুল হুদা, ৩খ., পৃ. ৬; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩৩৬; বরাত বুখারী, ১খ., পৃ. ৭৫; মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩৭ (৫৩); তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬০২-২৬০৬; নাসাঈ, ৭খ., পৃ. ৭৫; ইব্ন মাজা, পৃ. ৭১; মুসনাদে আহমাদ, ২খ., পৃ. ৩৪৫; দারিমী, ২খ., পৃ. ২১৮; বায়হাকী, সুনান, ১খ., পৃ. ৮৪; হাকেম, মুসতাদরাক, ১খ., পৃ. ৩৮৬; তাবারানী, তাফসীর, ১৫খ., পৃ. ৫৮; তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ২খ., পৃ. ৩৪৭; মুসান্নাফ আবদির রায্যাক, হাদীছ নং ৬৯১৬; দারা কুতনী, ২খ., পৃ. ৯২)। মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে আছে وَيُؤْمِنُوْا بِمَا جِئْتُ بِهِ "আমি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছি উহাতে ঈমান আনিবে"। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ "ইহাতে তাহারা আমা হইতে তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে" (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩৭)। সুতরাং এই সকল হাদীছের মর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ অথবা ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের) আনুগত্য স্বীকার না করা পর্যন্ত সর্বাত্মক জিহাদ চলিতে থাকিবে।

প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক জিহাদ

যুদ্ধ সর্বদা দুই ধরনের হইয়া থাকে। এক ঃ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর উহার প্রতিরোধে আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ, যাহার উদ্দেশ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নিজেরা অগ্রবর্তী হইয়া আক্রমণ না করার নীতি অবলম্বন করা। দুই ঃ শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের আগাম প্রতিরোধ অথবা ভবিষ্যতে আক্রমণের সুযোগ না দেওয়ার লক্ষ্যে পূর্বেই আক্রমণ করিয়া শত্রুর শক্তি ও প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া দেওয়া অথবা নিছক প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ, রাজ্য বিস্তার, সম্পদ লুণ্ঠন কিংবা ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন ও পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের ও স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কারণে-অকারণে আক্রমণ করা। প্রথম প্রকার দিফা'ঈ বা প্রতিরক্ষামূলক এবং দ্বিতীয় প্রকার ইকদামী বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নামে অভিহিত।

ইসলাম মূলত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে বিশ্বাসী হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে কতিপয় মূলনীতির ভিত্তিতে ও শর্তসাপেক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বৈধতাও ইসলামে স্বীকৃত। ইহা বাস্তব সত্য যে, কাফিরদের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার মুসলমানদের আকাংখা-আবেদন সত্ত্বেও এবং ইসলামের পছন্দনীয় জিহাদের প্রশিক্ষণমূলক মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ তাহাদেরকে সবর, ধৈর্য ধারণ ও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথম পর্যায়ে মজলুম হওয়ার কারণে (بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا) প্রতিরোধমূলক জিহাদের অনুমোদন এবং পরবর্তী সময়ে 'যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার' (اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ২ ঃ ১৯১) আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে এবং সশস্ত্র যুদ্ধে জীবননাশের আশংকা রহিয়াছে বিধায় উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুসলিম বিশেষজ্ঞদের একটি দল ইসলামের অনুমোদিত জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে সীমিত থাকিবার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই সংগে কতিপয় অমুসলিম বুদ্ধিজীবীও মুসলমানদেরকে জিহাদ বিমুখ রাখিয়া ইসলামের সুরক্ষা ও অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত ও ক্রমান্বয়ে স্তিমিত করিবার মানসে উক্ত অভিমতকে উপেক্ষা করিবার প্রয়াস চালাইয়াছেন। এই অভিমতে বাহ্যত ইসলামকে 'শান্তিপ্রিয়' প্রমাণিত করিবার অপরিপক্ক চিন্তাধারা কার্যকর রহিয়াছে। অপরদিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের জিহাদ বিষয়ক ভাষ্যসমূহে জিহাদের প্রতি অনুপ্রেরণা ও উদ্বুদ্ধকরণ, উহার লক্ষ্য- উদ্দেশ্য, উহাতে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গিত করিবার সওয়াব ও ফযীলাত, উহার জন্য সার্বিক ও সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির আদেল, জিহাদে অনীহার নিন্দা, জিহাদ হইতে পলায়নে কঠোর শাস্তির বিধান এবং নবী-রাসূল প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং জিহাদ ইসলামের সর্বশেষ ইবাদত হওয়া ও শরী'আতের বিধিবদ্ধ ইবাদতসমূহের মধ্যে জিহাদের শীর্ষ অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত আয়াত ও হাদীছসমূহ ও আক্রমণাত্মক জিহাদের বৈধতা, বরং অপরিহার্যতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে। কেননা জিহাদের অনুমোদন, বৈধতা ও আজ্ঞায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ তথা (১) কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিরোধ এবং উহার উৎস নির্মূল করা (ظُلِمُوْا), ইবাদতখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হকপন্থীদের দ্বারা বাতিলপন্থীদের প্রতিহত ও প্রদমিত করিয়া ফাসাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল করা (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَ الْاَرْضُ ২ ঃ ২৫১), (৪) জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ও সরকারীভাবে সালাত কায়েম ইত্যাদির বাস্তবায়ন (اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ২২ ঃ ৪১) এবং (৫) সর্বোপরি আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করিয়া অপর সমস্ত দীনের উপরে জয়যুক্ত করিবার জন্য সমস্ত জিহাদে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ.
هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না। তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন অপর সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করিবার জন্য মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও" (৯ ঃ ৩২-৩৩; আরও দ্র. ৪৮ ঃ ২৮ এবং ৬১ ঃ ৮-৯)।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল" (৪৮ ঃ ২৯)।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ.

"এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" (৮ ঃ ৩৯; ২ ঃ ১৯৩) এবং "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইয়াছে" (২ ঃ ২১৭)-তে কাফিরদের পক্ষ হইতে আক্রান্ত হওয়া বা না হওয়ার শর্ত উল্লিখিত না থাকা এবং এই ধরনের আরও বহু আয়াতের মর্ম অনুসারে সমগ্র বিশ্ব হইতে কুফরীর ফিতনা নির্মূল করা, কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া, আল্লাহর পসন্দনীয় দীনের বিশ্বায়ন তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আল্লাহর কলেমা সমুন্নত করা এবং সর্বব্যাপী ও সার্বজনীনরূপে দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের প্রতিপত্তি-প্রাধান্য সর্বত্র পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান করা এমন এক লক্ষ্য যাহা শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়; বরং উহার জন্য বহু ক্ষেত্রে অগ্রে আক্রমণমূলক জিহাদ অথবা অন্তত উহার জন্য যথাসাধ্য সেনা ও সমরোপকরণ প্রস্তুতি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। তদ্রূপ পূর্ববর্তী 'সর্বাত্মক জিহাদ' প্রসংগে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছসমূহের দাবি, খন্দক যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ "এখন হইতে আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করিব, তাহারা আর যুদ্ধ করিতে আসিবে না" (বুখারী, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়, ২খ., পৃ.. ৫৯০) এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহ দ্বারা আক্রমণাত্মক জিহাদের বৈধতা প্রতীয়মান হয়।

এই কারণেই উল্লিখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে সকল স্তরের মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ব্যতিরেকেও মুসলমানদের পক্ষ হইতে কতিপয় নীতি ও শর্ত সাপেক্ষে জিহাদের সূচনা বৈধ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. তাফসীরে বায়ানুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১০৯, টীকা নং ৪, পৃ. ১১০; মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৭১; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ;২৮; হিদায়া, ২খ., পৃ. ৩৫, কিতাবুস সিয়ার; তাফসীরে কুরতুবী, ২খ., পৃ. ৩৫৩-৩৫৪; জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ১খ., পৃ. ২৫৬-২৬৩; ফাতওয়া আলমগীরী, ২খ., পৃ. ১৮৮; ৬খ., পৃ. ৫৭; রাদ্দুল মুহতার (দুররুল মুখতার), ৬খ., পৃ. ১৯৩)।

এখানে একটি প্রশ্নের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে যে কোন উপায়ে কুদরতীভাবে কাফিরদিগকে প্রদমিত ও নাস্তানাবুদ করিয়া বিশ্বময় তাঁহার দীন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিরংকুশ ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং উহার জন্য যুদ্ধ বাঁধাইয়া খুনাখুনি ও জীবন নাশের এবং মুসলমানদের সীমাহীন ক্লেশ ও দুর্ভোগে পতিত করিবার প্রয়োজন কি? কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলিতেছেন, وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ "নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে (মুসলমানগণকে) সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম" (২২ ঃ ৩৯) এবং وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ "আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে (কাফিরদিগকে) শাস্তি দিতে পারিতেন" (৪৮ ঃ ৪)। উক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় মুমিন বান্দাগণকে তাহাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে পুরস্কৃত করিতে চাহেন। জিহাদের দু:খ-কষ্ট ও জীবনদান দ্বারা সবরের পরীক্ষা, খাঁটি ঈমানদার ও প্রকৃত মুজাহিদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং শাহাদাতের মর্যাদায় সৌভাগ্যশালী করিতে চাহেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান এই যে, وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ "আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন, যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে" (২২ ঃ ৪০)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি ও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থানসুদৃঢ় করিবেন" (৪৭ ঃ ৭)।

মূলত জিহাদ মুসলমানদের সবরও ঐকান্তিকতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মর্যাদার অধিকারী হইতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ "এবং অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংঘর্ষসংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণকারীগণ" (২ ঃ ১৭৭)।

ইব্ন কাছীর ও অন্যান্য মুফাস্সির لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهَ ও اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ আয়াত সমূহের তাফসীরে লিখিয়াছেন, "আল্লাহ যুদ্ধ করা ব্যতীতই তাঁহার মুমিন বান্দাগণকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু তিনি চাহেন যে, তাঁহার বান্দাগণ তাঁহার ইবাদত অনুসারে নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করুক। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ.

"ইহা এইজন্য আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি চাহেন যে, তোমাদের একজনের দ্বারা অপরজনকে পরীক্ষা করিবেন" (৪৭ ঃ ৪)।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে আর কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও প্রকাশ করেন নাই" (৩ ঃ ১৪২)?

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ.

"আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি" (৪৭ ঃ ৩১)।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ.

"তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন, মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন এবং তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন" (৯ ঃ ১৪-১৫)।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُوْلِهٖ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَّاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা যাহা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত" (৯ ঃ ১৬।

জিহাদ ও উহার ধারাবাহিকতা ঃ পূর্ববর্তী উম্মত

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দীন কায়েমের জন্য জিহাদ শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সীমিত নহে, বরং পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতেও জিহাদের বিধান ছিল। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ও বহু হাদীছে পূর্ববর্তী নবীগণের রাজত্ব, সেনাবাহিনী, সমরাস্ত্র তৈরী, সমরসম্ভার, যুদ্ধ পরিচালনা ও গনীমত ইত্যাদির বিধিবিধানের উল্লেখ রহিয়াছে। মূলত হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিরন্তন। ইবলীস শয়তান হযরত আদম (আ)-কে সিজ্‌দা করিতে অস্বীকার করায় বিতাড়িত হয়। সেই মুহূর্ত হইতে শয়তান বাতিলের প্রতিভূ এবং কাফির-মুশরিকদের দোসর। রাসূলগণ হক-এর ধারক ও বাহক, আল্লাহর মনোনীত সিপাহসালার। মুমিনগণ তাঁহাদের সৈনিক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন এবং কুফ্‌রী প্রদমিত করিয়া আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করিবার জন্য আল্লাহ্‌র রাজ প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জিহাদ এক অনিবার্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ.

"যাহারা মু'মিন তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" (৪ ঃ৭৬)।

বিগত নবীগণের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ "এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে, যাহাদের সহিত অনেক 'আল্লাহওয়ালা' ছিল" (৩ ঃ ১৪৬)।

হযরত মূসা, হযরত হারূন, হযরত ইউশা ইব্‌ন নূন, হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান এবং হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ নবী এবং বানূ ইসরাঈলের বহু যুদ্ধাভিযানের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়, তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআন এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে" (৯ ঃ ১১১; আরও দ্র. ৪৮ঃ ২৯)।

اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلاَّ نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ.

"তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি। সে বলিল, 'এমন তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না'? তাহারা বলিল, আমরা যখন স্ব স্ব আবাস ভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করিব না? অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল" (২ ঃ ২৪৬)।

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ "দাউদ জালূতকে হত্যা করিল" (২ ঃ ২৫১)।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ.

"আর আমি তাহাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে" (২১ ঃ ৮০)।

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ.

"এবং আমি তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর" (৩৪ ঃ ১০-১১)।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ.

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে— জিন্ন, মানুষ ও বিহংগকুল এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে" (২৭ ঃ ১৭)।

সাবার রাণী বিলকীসের বিরুদ্ধে সেনাঅভিযান পরিচালনার হুমকি প্রদান করিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য ঃ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا "আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই" (২৭ ঃ ৩৭)। (বিষয়টির জন্য আরও দ্র. ২ ঃ ৫৮; ২৪৩-২৬০; বায়ানুল কুরআন, ১খ., ৩৩-৩৪; ৫ ঃ ২১-২৪; বায়ানুল কুরআন, ৩খ., পৃ. ২০; ৭ ঃ ১৩৭; ২৭ ঃ ১৫-৪৪; ২১ঃ৭৮-৮২; ৩৪ ঃ ১০-১৪; ৩৮ ঃ ১৭-৪০; ৫৭ ঃ ২৫ এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর)।

জিহাদের বিস্তারিত রূপরেখা ও উহার প্রকারভেদ

জিহাদের সংজ্ঞা ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শুধু কাফির নিধন বা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অর্থেই সীমিত নহে এবং উহা জিহাদের মূল লক্ষ্যও নহে। শুধু চূড়ান্ত স্তরে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধ অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জিহাদের মূল অর্থ ও মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ্র দীন কায়েমের সার্বিক সাধনা হওয়ার সুবাদেই সশস্ত্র যুদ্ধ উহার অন্তর্ভুক্ত। দীন কায়েমের সার্বিক সাধনার প্রথম স্তরেই মানুষের ব্যক্তি জীবন। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বভাবজাত ও জন্মগত যাবতীয় চাহিদা, কামনা -বাসনা, ক্রোধ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ প্রদমিত রাখিয়া এবং এই সবের উর্ধ্বে উঠিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করা, নিজের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরিবর্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানকে কর্মে পরিণত করাই জিহাদের প্রথম সোপান। পরবর্তী পর্যায়ে জিহাদের পরিসর ক্রমান্বয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রথম স্তরের সাধনা ও জিহাদ দ্বারা সংগঠিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ধাপে ধাপে সুগঠিত পরিবার এবং সুগঠিত পরিবারসমূহের সমন্বয়ে সুগঠিত নাগরিক সমাজ ও উহার সমন্বয়ে কল্যাণ রাষ্ট্র সম্বলিত বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠাই হইতেছে জিহাদের লক্ষ্য। তবে বিস্তীর্ণ পরিসরে প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম সাধনাও অবশ্যই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই সাধনা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে ফিল্লাহি (আল্লাহ্র জন্য) এবং 'ফী সাবীলিল্লাহি' (আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে তাঁহারই প্রদর্শিত রূপরেখায়— পথে ও পন্থায়)। এই কারণে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীছের বাণীসমূহে জিহাদের সংগে 'ফী সাবীলিল্লাহ' 'ফীনা ' (আমাতে) এবং 'ফিল্লাহি' (আল্লাহ্তে) কথাটি প্রায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমস্ত জিহাদের প্রতিশব্দ 'কিতাল'(লড়াই)-এর সহিত ফী সাবীলিল্লাহ সংযুক্ত করা হইয়াছে যাহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, যুদ্ধ আল্লাহ্র জন্য ও আল্লাহ্র পথে হইলেই

ইহা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহরূপে স্বীকৃতি লাভ করিবে, অন্যথায় নহে। কুরআন ও হাদীছের বর্ণনাধারায় ব্যক্তিজীবন আল্লাহ্র পছন্দনীয় কাঠামোতে গঠন করা হইতে শুরু করিয়া জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ ও পন্থায় তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁহার বিধান প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ যে কোন চেষ্টা, বিদ্যা-বুদ্ধি, কৌশল, চিন্তা-চেতনা, মেধা ও জীবন ব্যয় করাই জিহাদরূপে স্বীকৃত। 'এই কারণেই কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্র দুশমন ও মুসলমানের দুশমন আখ্যায়িত করিবার পাশাপাশি মানবের অপর দুই দুশমন শয়তান ও নফস (কুপ্রবৃত্তি)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে এবং আল্লাহ্র দীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ ব্যতীত দাওয়াত ও তাবলীগ, মৌখিক ওয়াজ, বক্তৃতা-ভাষণ, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি যে কোন প্রচেষ্টাকে জিহাদ অভিহিত করা হইয়াছে; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র জিহাদের তুলনায় এই ধরনের জিহাদকে বৃহৎ (كَبِيْرٌ) ও বৃহত্তম (اَكْبَرُ) বলা হইয়াছে। যেমন ঃ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ "তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ" (২২ ঃ ৭৮)। কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ও সাধ্য ব্যয় করা এবং সেইজন্য চূড়ান্ত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করাকে জিহাদ ও মুজাহাদা' বলা হয়। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের কথা, কর্ম ও সকল প্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। এই কারণে উহাকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَاد (যথার্থ জিহাদ) দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণাংগরূপে আল্লাহ্র জন্য ইখলাস ও ঐকান্তিকতা সহকারে ত্যাগ স্বীকার করা যাহাতে পার্থিব খ্যাতি, প্রসিদ্ধি অথবা গনীমতের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ না থাকে। আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন,

هُوَ اسْتِفْرَاغُ الطَّاقَةِ فِيْهِ وَاَنْ لاَّ يَخَافُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَهُوَ حَقُّ الْجِهَادِ.

"জিহাদে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং কোন ভর্ৎসনা-সমালোচনার পরোয়া না করা— ইহাই যথার্থ জিহাদ"।

দাহহাক ও মুকাতিল বলিয়াছেন, اِعْمَلُوْا لِلّٰهِ حَقَّ عَمَلِهٖ وَاعْبُدُوْهُ حَقَّ عِبَادَتِهٖ "তোমরা কাজ করিবে আল্লাহ্র জন্য যেইভাবে তাহা করা উচিৎ এবং ইবাদত করিবে আল্লাহ্র জন্য যেইভাবে তাহা করা উচিৎ"।

অনেক মুফাস্সিরের মতে এখানে জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ইবাদত ও আল্লাহর হুকুমসমূহ প্রতিপালনে নিজের সমগ্র শক্তি পূর্ণাংগ ইখলাসের সহিত ব্যয় করা এবং حَقُّ الْجِهَاد -এর অর্থ নিয়াত একান্তরূপে আল্লাহ্র জন্য হওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলিয়াছেন, এখানে জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের নফ্স ও প্রবৃত্তি এবং উহার অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং ইহাই যথার্থ জিহাদ (حَقُّ الْجِهَاد)।

উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম বাগাবী ও বায়হাকী (র) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত একখানি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন কালে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ.

"তোমরা প্রত্যাবর্তন করিয়াছ উত্তম প্রত্যাবর্তন (অপর বর্ণনা মতে, আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম) ছোট জিহাদ হইতে বড় জিহাদের দিকে"। লোকেরা বলিল, বড় জিহাদ কি? তিনি বলিলেন, مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ "নিজে প্রবৃত্তিজাত কু-চাহিদার বিরুদ্ধে বান্দার সাধনা" (তাফসীরে মাজহারী, ১খ., পৃ. ২৩৯; ৬খ., পৃ. ৩৫৩; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ২৮৯; বরাত তাফসীরে বাগাবী, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর; বায়হাকী, কিতাবুয যুহ্দ)।

তদ্রূপ কুরআনের বাণী প্রচারকে বড় জিহাদ বলা হইয়াছে ঃ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করিও না এবং কুরআনের সাহায্যে তাহাদের মুকাবিলায় প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া যাও" (২ ঃ ৫২)। যেহেতু আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, সুতরাং ইহাতে জিহাদ দ্বারা সমস্ত জিহাদ উদ্দেশ্য হওয়ার অবকাশ নাই। কেননা তখন পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বিধান নাযিল হয় নাই। এই কারণেই জিহাদের আজ্ঞা (جَاهِدْهُمْ)-এর সহিত بِهٖ (উহা দ্বারা) সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কুরআন দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলায় বড় ধরনের জিহাদ করুন। কুরআন দ্বারা জিহাদের মর্ম উহার বিধি-বিধানের প্রচার-প্রসার এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার সকল ধরনের চেষ্টা— উহা জিহবা (বক্তব্য-ভাষণ) দ্বারা হউক অথবা লিখনী দ্বারা অথবা অন্যান্য পন্থায়। এই সব বিষয়কেই এখানে বড় জিহাদ বলা হইয়াছে (মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৪৭৯, ৪৮৫; তাফসীরে মাজহারী, ৭খ., পৃ. ৪২)।

তদ্রূপ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ "যে কেহ সাধনা করে সে তো নিজের জন্য সাধনা করে" (২৯ ঃ ৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৬৭৩-৬৭৪)।

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্র দুশমন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে এবং নফসের বিরুদ্ধে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিহত করিবার ব্যাপারে জিহাদ করিবে সে তো নিজের লাভের জন্যই জিহাদ করিবে (তাফসীরে মাজহারী, ৭খ., পৃ. ১৯১)। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, একজন মানুষ জীবনের একটি দিনও তরবারি দ্বারা আঘাত করে নাই, কিন্তু সে তাহার কুপ্রকৃতি দমনে তৎপর সেও জিহাদ করিতে থাকে (তাফসীরে ইব্ন কাছীর ৩খ., পৃ. ৪০৪)।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "যাহারা আমার (আল্লাহ্র) উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার পথে পরিচালিত করিব" (২৯ ঃ ৬৯; তাফসীরে মাজহারী, ৭খ., পৃ. ২১৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৭১৬)।

তদ্রূপ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ "তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও" (৬৬ ঃ ৯)। আয়াতে একই সংগে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থাৎ তাহাদিগকে অন্তরে ঘৃণা করা ও মুখে প্রতিবাদ করাকে বলা হইয়াছে।

সূরা আনফালের (৮ ঃ ২৪) আয়াতে সকল আত্মীয়
ব্যবসা-বাণিজ্যের আকর্ষণ ও ভালবাসা যদি আল্লাহ, তাঁ
(جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় সেই ক্ষে
হইয়াছে। অথচ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় জি
মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের 'জিহাদ'-কে হিজরত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন এই যুক্তিতে যে, তখন হিজরত করা ফরয ছিল এবং বাস্তবতার নিরিখে হিজরতই পরিবর্তী সময়ে জিহাদের পথকে সুগম করিয়াছিল অর্থাৎ হিজরতও অন্যতম জিহাদ। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আয়াতে হিজরতের জন্য জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৩৪০)।

জিহাদের রূপরেখা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে ইব্ন হাজার (র) লিখিয়াছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ যেমন জিহাদ, তদ্রূপ নফস, শয়তান ও কাফিরদের বিরুদ্ধে 'মুজাহাদা' (সার্বিক তৎপরতা)-ও জিহাদ। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হইল দীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা লাভ করা, অতঃপর তদনুসারে আমল করা, অতঃপর উহার শিক্ষা বিস্তার। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ তাহার উপস্থাপিত অবৈধ কামনা-বাসনাসমূহ প্রতিহত করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হইবে হাত (শক্তি), সম্পদ, জিহ্বা (বক্তৃতা-বিবৃতি)লিখন ও অন্তর দ্বারা। ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হইবে শক্তি, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা" (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৫,কিতাবুল জিহাদ)। রাগিব ইস্ফাহানী লীখয়াছেন, জিহাদ তিন প্রকার। প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, (অদৃশ্য শত্রু) শয়তানের বিরুদ্ধে লড়ই এবং নফসের বিরুদ্ধে লড়াই।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র) তাঁহাদের সীরাতুন্নাবী গ্রন্থে (৫খ., পৃ. ২১০-১১৬) জিহাদের রূপরেখা ও উহার প্রকারভেদ সুবিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, "সাধারণত জিহাদ বলিতে যুদ্ধ ও খুনাখুনিকে মনে করা হয় যাহা নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তিপূর্ণ। 'জিহাদ'-এর আভিধানিক অর্থ যে কোন ধরনের 'চেষ্টা ও শ্রম সাধনা'; উহার পারিভাষিক মর্মও প্রায় অনুরূপ অর্থাৎ সত্যকে সমুন্নত করা। উহার প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের নিমিত্ত সকল ধরনের চেষ্টা-সাধনা, আত্মত্যাগ ও অপরকে অগ্রাধিকার প্রদানের মনোবৃত্তি এবং বান্দাদিগকে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত দৈহিক, আর্থিক ও মেধাজাতীয় যাবতীয় শক্তি তাঁহার পথে ব্যয় করা। এমনকি এই উদ্দেশ্যে নিজের এবং নিজ আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, পরিবার-পরিজন, গোত্র-সম্প্রদায়ের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করা এবং সত্যের শত্রু ও বিরোধীদের সকল চেষ্টা নস্যাত করা, তাহাদের সকল কূটকৌশল ব্যর্থ করিয়া দেওয়া, তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা, এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে সেইজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা— ইহাই জিহাদ এবং এই জিহাদ ইসলামের অন্যতম অঙ্গ (রুকন) ও অতি বড় ইবাদত।

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তীর্ণ বিষয় যাহা ব্যতীত পৃথিবীর কোন আন্দোলন কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই এবং হইতে পারে না, ইসলামের বিরোধী পক্ষ ইহাকেই শুধু দীনের

...র সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। মূলত বারংবার
...য়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) যে শিক্ষা (তা'লীম) ও শরীআত
...ন উহা শুধু চিন্তাধারা, মতবাদ ও দর্শন স্তরেই সীমাবদ্ধ নহে,
...ই সমষ্টি। তাঁহার শরী'আতে মানবের মুক্তি লাভের উপায় ও
তাত্ত্বিক ধ্যান, যোগ-সাধনা ও উর্ধ্ব জাগতিক বা অতি-
...কল্পনা বিলাসের প্রতি নির্ভরশীল নহে, বরং আল্লাহ্র একত্ব
...ন ও (জান্নাত-জাহান্নামের) পুরস্কার-শাস্তি বিষয়ে বিশ্বাস
...ই সকল বিশ্বাসের স্পষ্ট বাস্তবায়নে নেক আমল, সৎকর্ম ও
...ষ্টা ও সাধনার উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই পবিত্র
...বসা বা বসিয়া থাকা (قُعُوْدٌ) উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার মর্ম
পালন না করা (ও নিষ্কর্মা তাত্ত্বিক দার্শনিক হইয়া থাকা)। সূরা

لاَ يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তাহারা পরস্পর সমান নহে। যাহারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন" (৪ ঃ ৯৫)।

এই আয়াতের 'বসিয়া থাকা' ও 'জিহাদ করা' -এর পরস্পর বৈপরীত্য দ্বারা এই বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায় যে, বসিয়া থাকা, অলসতা করা ও আরাম-আয়েশ অন্বেষণের (তত্ত্ববাদী নিষ্কর্মা জীবন যাপনের) বিপরীতেই জিহাদের তাৎপর্য ও মৌলিকত্বের অবস্থান। এখানে আর একটি সন্দেহ নিরসন করা জরুরী। অধিকাংশ মানুষ জিহাদ ও কিতালের (قتال যুদ্ধ, লড়াই) অর্থ অভিন্ন মনে করিয়া থাকে। অথচ উহা সঠিক নয়। পবিত্র কুরআনে শব্দ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কারণে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ) ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহ্র পথ যুদ্ধ বা লড়াই) বাক্যদ্বয়ের অর্থ এক নহে; বরং কিতাল ও শত্রুর সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ করা জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে শুধু দুইটির প্রয়োগ ও ব্যবহারে পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যেমন সূরা নিসার উল্লিখিত আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে জিহাদের দুইটি প্রকারের প্রতি দিকনির্দেশ করা হইয়াছে ঃ (১) নফ্স দ্বারা জিহাদ, (২) মাল দ্বারা জিহাদ অর্থাৎ নিজের জীবন ও সম্পদ ব্যয় করিয়া জিহাদ করা। জীবন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদের অর্থ সত্যের সমর্থন ও সহযোগিতায়

ব্যয় করিয়া জিহাদ করা। জীবন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদের অর্থ সত্যের সমর্থন ও সহযোগিতায় নির্দ্বিধায় সব ধরনের দৈহিক কষ্ট সহ্য করা। মাল ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করিবার অর্থ সত্যকে সাফল্যমণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিজের সকল মালিকানা উৎসর্গ করা ও নিজের যাবতীয় সম্পদ বিসর্জন দেওয়া।

তাহারা আরও লিখিয়াছেন, 'উন্নতি ও সৌভাগ্যের এই গূঢ়তত্ত্ব শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কেই শিখানো হইয়াছিল এবং তিনিই এই তত্ত্ব তাঁহার উম্মতকে শিক্ষা দিয়াছেন। জিহাদের প্রেরণা ও উহার বিপুল ছাওয়াব হাসিল করিবার বাসনাই ছিল এমন একটি বিষয় যাহার কারণে মুসলমানগণ মক্কা শরীফে দীর্ঘ তের বৎসর পর্যন্ত সব ধরনের নির্যাতনের মুকাবিলা করিয়াছেন, মরুভূমির আগুন ঝলসানো খরতাপ, ভারি ভারি শিলাখণ্ডের চাপ, শিকল, বেড়ি ও লৌহ গলবন্ধের ভারি বোঝা, প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা, বর্শা-বল্লমের বিষাক্ত ঘা, তরবারির প্রচণ্ড ধার, সন্তান-সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্নতা, ধন-সম্পদ ও বাড়িঘর হইতে উৎখাত ইত্যাদির কোন কিছুই তাহাদের অবিচলতায় ফাটল ধরাইতে পারে নাই।

শিবলী ও নদবীর মতে, জিহাদের প্রকারসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) জিহাদে আকবার বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঃ জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকার মানুষের নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং পরিভাষায় উহাকেই জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ) বলা হইয়াছে। খতীব বাগদাদী হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যুদ্ধ ফেরত একটি দলকে রাসূলুল্লাহ (স) খোশআমদেদ জানাইয়া বলিলেন, "তোমাদের আগমন বরকতময় হউক! তোমরা ছোট জিহাদ হইতে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। বড় জিহাদ হইল বান্দার নফসের বিরুদ্ধে তাহার লড়াই।" হাদীছের অন্যান্য কিতাবেও এই ধরনের আরও রিওয়ায়াত রহিয়াছে (দ্র. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল জিহাদ, ২খ., পৃ. ২৮৮)।

ইব্ন নাজ্জার হযরত আবূ যার (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, "সর্বোত্তম জিহাদ এই যে, মানুষ নিজের নফস ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে"। হাদীছটি দায়লামীর বর্ণনায় "সর্বোত্তম জিহাদ এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্য নিজের নফস ও নিজের বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে"। কবি আবুল আতাহিয়ার কবিতায় আছে, اشد الجهاد جهاد الهوى "কঠিনতর জিহাদ হইল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ" (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮খ., পৃ. ৬০১ ; জিহাদ শিরোনাম)। উল্লিখিত হাদীছ মূলত ১৯ ঃ ৬৯ আয়াতের তাফসীর।এই সূরার ('আনকাবূত) পূর্বাপর প্রতিপাদ্য বিষয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে মুসলমানদিগকে যে কোন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময়ে অবিচল ও ভয়-ভীতিমুক্ত থাকিবার শিক্ষা প্রদান। এই উদ্দেশ্যে পূর্ণ সূরায় পূর্ববর্তী নবীগণের কীর্তি, কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁহাদের অবিচলতার বিবরণ এবং অবশেষে তাঁহাদের শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবার ও নবীগণকে কামিয়াব করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। সূরার প্রথমদিকে আছেঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

"যে কেহ জিহাদ (সাধনা) করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। আল্লাহ তো বিশ্বজগত্ হইতে অমুখাপেক্ষী" (২৯ ঃ ৬)।

আর সূরার শেষে (৬৯ নং আয়াতে) ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আমার (আল্লাহ) কাজে অথবা স্বয়ং আমার সত্তা লভিবার জন্য অথবা আমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে যে জিহাদ করিবে, শ্রম-সাধনা করিবে, আমি তাহার জন্য আমার পর্যন্ত পৌছিবার পথ পরিছন্ন করিয়া দিব। আমি নিজেই তাহাকে আমার পথ দেখাইয়া দিব"। এই সাধনাই সফলতার সিঁড়ি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সূত্র। সূরা হজ্জে আছে ঃ

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ.

"এবং তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)" (২২ ঃ ৭৮)।

(২) জিহাদের অন্যতম প্রকার জিহাদ বিল-ইল্ম (জ্ঞানযুদ্ধ)ঃ পৃথিবীর সকল অনিষ্ট ও মন্দের মূল হইল অজ্ঞতা ও মূর্খতা । ইহার খারাপ পরিণতি দূরীভূত করা প্রত্যেক সত্যান্বেষীর জন্য অতীব জরুরী। একজন মানুষের নিকট বিদ্যাবুদ্ধি এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো থাকিলে উহা দ্বারা অপরাপর অন্ধকার অন্তরগুলিকে আলোকিত করা তাহার কর্তব্য। কিন্তু তরবারি দ্বারা অন্তরে সেই প্রশান্তি ও স্থিরচিত্ততা সৃষ্টি হইতে পারে না যাহা যুক্তিপ্রমাণের শক্তিমত্তায় মানব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়" (১৬ ঃ ১২৫)।

মহান আল্লাহ্র দীনের দিকে আহবানের এই পন্থা যাহা সম্পূর্ণরূপে ইলম ও বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল উহাও জিহাদের অন্যতম প্রকার এবং এই পন্থাটির নাম 'জিহাদ বি-ইলমিল কুরআন'। কেননা কুরআন উহার স্বকীয় অবস্থানে নিজেই যুক্তি-প্রমাণ, নিজেই উপদেশ ভাণ্ডার ও উত্তম বিতর্ক- উপাদান। একজন দক্ষ ওঅভিজ্ঞ কুরআনবিদ আলিমের জন্য আল-কুরআনের সত্যতা ও প্রামাণ্যতা নিরূপণ করার জন্য আল-কুরআন বহির্ভূত কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহকে পরাস্ত করিবার রূহানী জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে এই আল-কুরআন তরবারি হিসাবে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই কাফির ও মুনাফিকদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন নির্মূল করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا .

"সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করি ও না এবং এই কুরআনের সাহায্যে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া যাও" (২৫ : ৫২)।

আল-কুরআন দ্বারা কাফিরদের মুকাবিলা করাকেই বড় জিহাদ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কুরআনের দৃষ্টিতে ইলমী জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বিজ্ঞ আলিমগণ এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই জিহাদকে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে স্থান দিয়াছেন। আল-কুরআন বিশেষজ্ঞ ইমাম আবূ বাক্র আর-রাযী আল-হানাফী তাঁহার 'আহকামুল কুরআন' নামক তাফসীরে এই প্রসংগে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জ়ান দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিন্-নাফ্স) ও মাল দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিল-মাল) এতদুভয়ের চেয়েও ইলমী জিহাদের গুরুত্ব সমধিক (আহকামুল কুরআন, কন্সটান্টিনোপল মুদ্রণ, ৩খ., পৃ. ১১৯)। প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য দীনের সাহায্য ও সত্যের সহায়তার উদ্দেশ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করিয়া এই সমুদয়কে এই পথে ব্যয় করা এবং অন্যান্য যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে সহায়ক হইতে পারে উহাও অর্জন করা, যাহাতে উহা দ্বারা দীনের প্রচার-প্রসার ও উহার প্রতিরক্ষার কর্তব্য সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়। ইহাই ইলমী জিহাদ যাহা আলিম সমাজের অবশ্য পালনীয় বিষয়।

(৩) সম্পদ দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিল-মাল) : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে ধন-সম্পদ দান করেন উহার লক্ষ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা তাঁহার পথে ব্যয় করা। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত, নিজের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনের সুখ-শান্তির জন্য অনিবার্যরূপে যাহা ব্যয় করিতে হয় উহাতেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ কাম্য। দুনিয়ার কাজের জন্য অর্থ ও সম্পদ অপরিহার্য। দীন ও সত্যের সাহায্য-সহায়তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের উপর নির্ভশীল। সুতরাং জিহাদ বিল-মালের গুরুত্বও কোন অংশে লঘু নহে। সমাজ গঠনে অন্যান্য আন্দোলনের ন্যায় ইসলামের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পদ বা পুঁজি অপরিহার্য। এই পুঁজি ও আর্থিক উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে নিজেদের সার্বিক অর্থনৈতিক শক্তি নিবেদিত করা ও অন্যান্য প্রয়োজনের অপেক্ষা ইহাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার প্রদানও মুসলমানদের কর্তব্য। ইহাই সম্পদ দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিল্-মাল)। হযরত রাসূলুল্লাহ (স)–এর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের বরকতে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁহাদের দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা সত্ত্বেও ইসলামের কঠিনতম ও গভীর সংকটময় দিনগুলিতে অকাতরে সম্পদ উৎসর্গীত করিয়া যেভাবে মালী জিহাদ করিয়াছেন তাহা ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগের মাধ্যমেই নবুওয়াতের কাজ সহজতর হইয়াছিল। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে জিহাদকারী সাহাবীগণের সম্পদ ব্যয়ের দ্বারা সফলতা ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হইয়াছে। যেমন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا... أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে, আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে ... তাহারাই প্রকৃত মু'মিন; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে" (৮ ঃ ৭২-৭৪)।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"কিন্তু রাসূল এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারই সফলকাম" (৯ ঃ ৮৮)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে। (ইহাতে) আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী-নালা প্রব'হমান, এবং (চতুর্থত) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহা সাফল্য" (৬১ ঃ ১০-১৩; আরও দ্র. ২ ঃ ১৯৫, ২৪৫, ২৬১; ৩ ঃ ১৩৪; ৪ ঃ ৯৫; ৮ ঃ ৬৯; ৯ ঃ ৮; ৭৩ ঃ ২০)।

জিহাদ বিল-মাল-এর গুরুত্ব

এইখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রণের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জিহাদের আদেশ সংক্রান্ত এমন আয়াত খুবই কম পাওয়া যাইবে যাহাতে মাল দ্বারা জিহাদ করার উল্লেখ নাই। আরও লক্ষণীয় যে, প্রায় সর্বত্র মাল দ্বারা জিহাদের কথা জীবন দ্বারা (بِاَنْفُسِكُمْ) জিহাদের কথা-এর পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ... فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ (৪ ঃ ৯৫; এই আয়াতে দুইবার)। جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ (৮ ঃ ৭২); جٰهَدُوْا فِيْ

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ;(৯ ঃ ২০) سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
(৯ ঃ ৪১; ৯ ঃ ৪৪, ৮১, ৮৮; ৪৯ ঃ ১৫ ও অনত্র)।

মাল দ্বারা জিহাদকে জীবন দ্বারা জিহাদের অপেক্ষা অগ্রবর্তী করিবার কারণ এই যে, (১) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত ও দৈহিকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ সম্ভব নাও হইতে পারে, কিন্তু অর্থ ও সম্পদ দ্বারা অংশগ্রহণ করা সকলের জন্য সহজ। (২) জিহাদে দৈহিক উপস্থিতির প্রয়োজন সর্বদা দেখা দেয় না; কিন্তু সম্পদ দ্বারা জিহাদের প্রয়োজন সার্বক্ষণিক। (৩) মানুষের স্বভাবজাত অন্যতম দুর্বলতা এই যে, অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের ভালবাসা জীবনের ভালবাসার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাখে। এই কারণে সম্পদের বিষয়টি প্রাণের চেয়ে অগ্রবর্তী রাখিয়া মানুষকে তাহার স্বভাবজাত দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। (৪) যে কোন নেক কাজ ও ফরয সম্পাদনের জন্য নিজের জীবন, সম্পদ, মেধা প্রভৃতি শক্তি ব্যয় করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

মহিলারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমরাভিযানে অর্থাৎ সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, لَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ "তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হইল সুসম্পাদিত হজ্জ" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ২৭৮৪)।

হযরত আয়েশা (রা) সশস্ত্র জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহাকেও তিনি বলিলেন, جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ "তোমাদের (নারীদের) জন্য জিহাদ হইল হজ্জ" (ঐ, হাদীছ নং ২৮৭৫, ২৮৭৬; ইব্ন মাজা, কিতাবুল মানাসিক, বাব ৪৪)।

অর্থাৎ অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিয়া পবিত্র হজ্জের সফর ও অন্যান্য বিধান সম্পাদন করাই দুর্বল অবলা শ্রেণীর জন্য জিহাদ। জনৈক (ইয়ামানী) সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া কোন সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, أَحَيٌّ وَالِدَاكَ "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে"? সেই ব্যক্তি 'হাঁ' বলিলে তিনি বলিলেন ঃ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "তবে তুমি তাহাদের খিদমতে (আত্মনিয়োগ করিয়া)-ই জিহাদ কর"। পিতা-মাতার কোন একজন জীবিত থাকার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হাদীছ আছে (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৩০০৪; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৬৩; মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি প্রসঙ্গ)। ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার খিদমত করাও অন্যতম জিহাদ।

তদ্রূপ জটিল ও ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবনবাজী রাখিয়া নির্ভীক চিত্তে সত্য কথা প্রকাশ করাও বড় ধরনের জিহাদ। নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"জালিম শাসকের সম্মুখে ইনসাফের (সত্য) কথা বলাও বড় জিহাদ" (বরাত, তিরমিযী, ফিতান ১২-১৩; আবূ দাউদ, মালাহিম, বাব ১৭ ও অন্যান্য)।

একটি হাদীছে আছে ঃ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ "মুমিন জিহাদ করে তাহার তরবারি ও জিহ্বা দ্বারা" (মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৫৬-৪৬০; ৬খ., পৃ. ৩৮৭)।

(৫) জীবনবাজির জিহাদ— জিহাদ বিন্ নাফ্স ঃ নিজের দেহ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করা জিহাদের পূর্বোল্লিখিত সকল প্রকারকেই শামিল করে, যাহাতে মানুষের কোন না কোন প্রকার দৈহিক শ্রম ও কষ্ট ব্যয় হয় এবং যাহার চূড়ান্ত পর্যায় নিজের জীবনও আল্লাহর পথে কুরবানী করিয়া দেওয়া। কখনও দীনের দুশমনদের সহিত লড়াই বাঁধিয়া গেলে এবং তাহারা সত্যের বিরোধিতায় অনমনীয় হইলে তাহাদিগকে পথ হইতে হটাইয়া দেওয়া এবং ইহাতে তাহাদের প্রাণ হরণ করা কিংবা নিজের প্রাণ দিয়া দেওয়া জানবাজি জিহাদের চূড়ান্ত প্রতিফলন। এইরূপ বান্দার জন্য মহাপুরস্কার এই যে, যেহেতু সে তাহার প্রিয়তম বস্তুটি আল্লাহর পথে কুরবানী করিয়াছে, সুতরাং ঐ বস্তুটিই তাহাকে স্থায়ীরূপে দান করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ অস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু জীবনের পরিবর্তে তাহাকে চিরন্তন ও অক্ষয় জীবন দান করা হয় এবং শরী'আতের পরিভাষায় তাহাকে শহীদ খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

"যাহারা আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদিগকে কখনও মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে জীবিকা দেওয়া হয়..." (৩ ঃ ১৬৯, ১৭০; তদ্রূপ ২ ঃ ১৫৪; পূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নাবী, ৫খ., পৃ. ২১০-২১৫)।

আল্লামা শিবলী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী অবশেষে চিরন্তন ও স্থায়ী জিহাদের আলোচনা উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র জিহাদ এমন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে উহার সুযোগ নাও আসিতে পারে এবং কাহারও ভাগ্যে সুযোগ আসিলেও উহা জীবনে এক দুইবারই আসিয়া থাকে। কিন্তু সত্যের পথে চিরন্তন জিহাদ সেই জিহাদ যাহার সুযোগ যে কোন মুসলমান যে কোন সময় লাভ করিতে পারে। এই কারণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যেক উম্মতের কর্তব্য দীনের সাহায্য-সহায়তা, ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার, সত্যের পক্ষাবলম্বন, গরীব-দুঃখীদের সেবা, নির্যাতিত-শোষিতদের প্রতি সহমর্মিতা, পথহারাদের পথের দিশা দেওয়া, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জুলুম প্রতিহত করা এবং আল্লাহ্র হুকুমসমূহ প্রতিপালনে কায়মনোবাক্যে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকা। ফলে তাহার জীবনের সকল অবস্থান একটি জিহাদে পরিণত হইবে এবং সমগ্র জীবনই জিহাদের এক অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে পরিদৃষ্ট হইবে। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান, যাহাতে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধের বিধিমালা ও ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, উহার শেষ আয়াত নিম্নরূপ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যাবতীয় সংকটে অবিচল থাকিবে, মুকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবে, কাজে-কর্মে নিরবচ্ছিন্নভাবে লাগিয়া থাকিবে এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তবেই তোমরা

সফলকাম হইবে" (৩ ঃ ২০০; সীরাতুন্নবী, ৫খ., পৃ. ২১৬; আরও দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, জিহাদ শিরোনাম)।

মূলত মুসলমানের জীবনে জিহাদের কোন না কোন রূপ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। ন্যায় ও সত্য এবং অন্যায় ও অসত্যের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে; যাহা কিছু ন্যায় তাহা নিজে করা ও অপরকে করিতে উদ্বুদ্ধ করা, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা; যাহা কিছু অন্যায় তাহা নিজে না করা, অপরকে না করিতে অনুপ্রাণিত করা এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দেওয়া, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জুলুম উৎখাত করা— প্রয়োজনে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন এবং বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন এই জিহাদের বিরতিহীন কর্মধারা। ইহাই পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বিধান। ইহাই যাবতীয় উপদেশ ও ঘটনার সারমর্ম এবং ইহাই নবী জীবনের অনুপম আদর্শ— উস্ওয়াতুন হাসানাহ্ (৩৩ ঃ ২১)। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ·

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর" (৩ ঃ ১১০; ৩ ঃ ১০৪, ১১৪)।

وَالْعَصْرِ·اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ·اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ·

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু উহারা নহে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়" (১০৩ ঃ ১-৩; আরও দ্র. ৬১ ঃ ১০-১৪; ৪৮ ঃ ২৯; ৯ ঃ ১১১-১১২; ৬ ঃ ৫৪)। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) -কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

"তোমাদের যে কেহ কোন অন্যায় দেখিবে সে তাহার হাত (শক্তি) দ্বারা উহা প্রতিহত করিবে, যদি উহাতে সমর্থ না হয় তবে তাহার জিহবা (মুখের কথা) দ্বারা উহা প্রতিহত করিবে; যদি উহাতেও সমর্থ না হয় তবে অন্তর দ্বারা উহা করিবে এবং ইহাই হইল দুর্বলতম ঈমান" (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৫১, কিতাবুল ঈমান; তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, নাসাঈ, কিতাবুল ঈমান; আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, হাদীছ নং ২৪২৫; মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ২০ ৪৯; ইব্ন মাজা, ফিতান)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ اُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّمَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বের যে কোন নবীকে কোন উম্মতের নিকট পাঠাইয়াছেন, সেই উম্মতের কিছু লোক তাঁহার হাওয়ারী (একান্ত সহযোগী) হইত এবং কতক সাহাবী যাহারা তাঁহার সুন্নাত ও আদর্শ ধারণ করিত এবং তাঁহার হুকুম পালন করিত। অতঃপর তাহাদের কতক উত্তরসুরি পয়দা হইল, যাহারা তাহা বলিত যাহা করিত না এবং তাহা করিত যাহা করিতে আদিষ্ট ছিল না। (এইরূপ পরিস্থিতিতে) যাহারা হাত (শক্তি) দ্বারা তাহাদের সহিত জিহাদ করিবে তাহারা মু'মিন, যাহারা জিহবা (কথা) দ্বারা তাহাদের সহিত জিহাদ করিবে তাহারাও মু'মিন, যাহারা দিল্ দ্বারা জিহাদ করিবে তাহারা মু'মিন এবং ইহার বাহিরে সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমানেরও অস্তিত্ব নাই" (মুসলিম, ১খ., ৫২, কিতাবুল ঈমান)।

আল্লামা শাববীর আহমাদ উছমানী (মুল্লা আলী কারীর আল-মিরকাত কিতাবের বরাতে) লিখিয়াছেন, যেহেতু হাদীছে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন (لِيُغَيِّرَه) ও জিহাদ করিবার جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِه কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং উহা দ্বারা শুধু অন্তরের ঘৃণা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কেননা ঘৃণা করিবার অর্থ মন্দ জানা। অথচ এই মন্দ জানা যথেষ্ট নহে, বরং উহার সহিত কর্মের সংযোগ থাকিতে হইবে। অর্থাৎ সর্বদা অন্তরে এই সংকল্প পোষণ করিতে হইবে এবং চিন্তা ও সুযোগের প্রতীক্ষায় লাগিয়া থাকিতে হইবে যে, সুযোগ ও সামর্থ্য হাসিল হওয়া মাত্রই উহাকে পরিবর্তন করা হইবে। অন্যায়কে উৎখাতের পরিকল্পনা অন্তরে অন্তরে করিতে থাকিবে এবং পরিবর্তনের যে কোন উপায় অবলম্বনের হিম্মত ও সাহসিকতার পরিচয় দিবে। তবেই উহা হইবে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন ও অন্তরের জিহাদ (ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৭৮; বরাত মিরকাত শরহে মিশকাত)।

ইসলামের জিহাদ-দর্শন ও তত্ত্বকথা

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদেশে সর্বকালের স্বীকৃত সুন্দর কর্ম। অসহায় দুর্বলের পক্ষাবলম্বন, জুলুম প্রতিরোধ, আল্লাহদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূল করা, মহাসন্ত্রাস নির্মূলের মাধ্যমে আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দর্প চুর্ণ করিয়া পৃথিবীতে শক্তিমত্তার ভারসাম্য সৃষ্টি, দুশমন কাফিরদের হুমকি প্রতিহত করিয়া, আল্লাহদ্রোহীদের সমর শক্তি খর্ব করিয়া অন্যায় যুদ্ধের সম্ভাবনার দুয়ার রুদ্ধ করা এবং আল্লাহর মনোনীত দীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও দীনের রক্ষা এই সকলই গ্রহণযোগ্য ও সুন্দর কর্মরূপে স্বীকৃত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের প্রতি জিহাদের বিধান ছিল (দ্র. মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ২৭০)।

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, যাহা উচিত ও সুন্দর তাহা সর্বদা শুধু মুখের কথায় এবং সদুপদেশ, ওয়াজ-নসীহত কিংবা বক্তৃতা-ভাষণ দ্বারা এবং কোন মতবাদ, চিন্তাধারা ও দর্শনের

চর্চা দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না। কেননা পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হইতেই মানবের প্রবল কূটকুশলী প্রতিপক্ষরূপে স্বঘোষিত দুশমন ইবলীস এবং সর্বযুগে ইহার দোসর কায়েমী স্বার্থবাদীরা সদা তৎপর রহিয়াছে। সুতরাং সর্বকালেই সত্য ন্যায় ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে বাধা সৃষ্টিকারী ঐ অপশক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মূলত বৃহত্তর লক্ষ্য ও মহোত্তম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজনে আপাত আপত্তিযুক্ত ও কষ্টদায়ক কিংবা বাহ্যত ক্ষতিকর কিন্তু প্রকৃত বিচারে সুফলদায়ক উপায় ও পন্থা অবলম্বন একটি যুক্তি-সংগত ও স্বীকৃত বুদ্ধিমত্তার বিষয়। পৃথিবীর দেশে দেশে বিদ্যমান বহুবিধ দণ্ডবিধি ও শাস্তি বিধানের মূল সূত্রও ইহাই এবং এই কারণেই উহাতে কাহারও জীবন বা সম্পদের ক্ষতি হইলেও বৃহত্তর স্বার্থের যুক্তিতে কোন বুদ্ধিমানই উহাকে অসুন্দর বা অযৌক্তিক বলে না। ইসলামের অনুমোদিত ও নির্দেশিত জিহাদ বিশেষত উহার চূড়ান্ত স্তর 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধও বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আপাত বাহ্য আপত্তিযুক্ত একটি বিষয়।

لاَتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُوْلٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র-ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহারাই আল্লাহ্‌র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হইবে" (৫৮ ঃ ২২)।

অর্থাৎ হিযবুল্লাহ কখনও হিযবুশ শয়তানের সঙ্গে আপোষ করিতে পারে না এবং হিযবুশ শয়তানের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক রাখিতে পারে না। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানকে ভাল ও কুফরকে মন্দ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং মন্দকে প্রতিহত করিতে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষের জীবন সংহার এবং নিজেদের জীবন বিলাইয়া দিতে কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার বিপরীতে কোন প্রকার আপোষকামিতা, শিথিলতা, সত্য প্রকাশ ও প্রতিরক্ষায় অসহযোগিতা, অলসতা, দুর্বলতা, কিংবা জিহাদে কোন প্রকার অনীহার ক্ষেত্রে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا

"যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না" (৯ ঃ ৩৯)।

আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং তাঁহার কঠোর ও মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের জিহাদ করা অপরিহার্য।

ইসলামের জিহাদ দর্শনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ তত্ত্ব এই যে, উহা নিছক রাজ্য বিস্তার, ক্ষমতার প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ, সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে পরিচালিত নহে, বরং উহা সর্বোতভাবে ও যে কোন বিচারে শুধু আল্লাহর পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) ও আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সবরের পরীক্ষা ঃ অর্থাৎ যে কোন বিরূপ, কঠিন ও অসহনীয় পরিস্থিতিতেও আত্মহারা ও বল্গাহীন হইয়া কোন কিছু না করিয়া বরং সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আল্লাহ্র হুকুম পালনে যুদ্ধ করা, যুদ্ধাস্ত্র উত্তোলন ও অবনমিত করা, ব্যক্তিগত ক্রোধ বা জিদ্ মিটাইবার জন্য কোন কিছুই না করা। মক্কা শরীফে সাহাবায়ে কেরামের তের বৎসরের নির্যাতিত জীবন কালে প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া আল্লাহ্র হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করিয়া রাখা ছিল এই সবরের মূল ভাবধারা এবং পরবর্তী কালে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত আঘাত-প্রতিঘাতও ছিল এই সবরের সুফল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা আল্লাহ প্রকাশ নাই" (৩ ঃ ১৪২)?

২. প্রকৃত মু'মিন শনাক্ত করাঃ ইরশাদ হইয়াছে, وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "আমি মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির আবর্তন ঘটাই যাহাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে জানিতে পারেন...." (৩ ঃ ১৪০) এবং وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "এবং যাহাতে আল্লাহ মু'মিনদিগকে পরিশোধন করিতে পারেন..." (৩ ঃ ১৪১; আরও দ্র. ৩ ঃ ১৫২, ১৫৪) "কে মু'মিন ও কে মুনাফিক তাহা জানিবার জন্য" (৩ঃ ১৬৬, ১৬৭)।

৩. প্রকৃত মুজাহিদ শনাক্তকরণ ঃ আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিনদের ব্যতীত কাহারও সহিত অন্তরংগ বন্ধুত্ব না থাকার বিপরীত যাচাই করিবার জন্য। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً...

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই..." (৯ ঃ ১৬)।

তদ্রূপ "আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি" (৪৭ ঃ ৩১)।

৪. পিতা-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কিছুর মায়া-মোহ ত্যাগ করিয়া সব কিছু আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করিবার মনোবৃত্তি তৈরী ও উহার পরীক্ষা গ্রহণ (দ্র. পূর্বোল্লিখিত ৯ ঃ ২৩, ২৪; ৪৯ ঃ ১৫)।

৫. শুভ পরিণাম অর্জন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জন ও জান্নাতের পথ সুগম করাঃ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "এবং তোমার তাঁহার পথে জিহাদ কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার" (৫ ঃ ৩৫)। তদ্রূপ পূর্বোল্লিখিত إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ৯ ঃ ১১, ১২০; ৪১, অদ্রূপ ২ ঃ ২১৪, ২১৬; ৩ ঃ ১৪২, ১৫৭, ১৯৫; ৪ ঃ ৭৪, ৭৬; ৮ ঃ ৭৪; ৪৭ ঃ ৬, ৬১ ঃ ১০-১৩)।

৬. আল্লাহ্‌র পথে জীবন দান করিয়া শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করা ঃ

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ "এবং তোমাদের মধ্যে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন...." (৩ ঃ ১৪০; ২ ঃ ১৬৩-১৬)।

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

"বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তারা আনন্দিত" (৩ ঃ ১৬৯-১৭০)।

এই সব কিছুর মূলমন্ত্র একটিই, উহা হইল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তে নিবেদিত ও উৎসর্গকৃত হওয়া। এই কারণেই আল্লাহতে যথাযথ জিহাদ করিবার আদেশ প্রদানের পর مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ "তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম" (২২ ঃ ৭৮)। অর্থাৎ যেইরূপে ইবরাহীম (আ) কঠিন ও লোমহর্ষক পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া প্রিয়তম পুত্রের গলায় পর্যন্ত ছুরি চালাইয়া আল্লাহ্‌তে নিবেদিত হওয়ার প্রমাণ দিয়াছিলেন, মু'মিন মুজাহিদগণকেও তদ্রূপ উত্তীর্ণ হইয়া আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হইতে হইবে।

শান্তির ধর্ম ইসলাম এবং জিহাদ ও কিত্তাল

"ইসলাম শান্তির ধর্ম" ইহা একটি শ্বাশত বাক্য যাহার অতিশয় প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। আবার পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা রহিয়াছে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই" (২ ঃ ২৫৬)। অথচ ইসলামে সমস্ত জিহাদ তথা যুদ্ধের অনুমোদন

রহিয়াছে, বরং প্রয়োজনের সময় উহাকে ফরয করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাবে উহার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও হইয়াছে এবং ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ অধ্যায়ের অতিশয় ব্যাপক বিস্তৃতি রহিয়াছে। জিহাদের এই বিধি ও বিস্তৃতি 'শান্তির ধর্ম' ও দীনে জবরদস্তি না থাকিবার দাবির সহিত সংগতিপূর্ণ নহে, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধের বিস্তৃতি এবং হাদীছ, সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থসমূহে উহার ততোধিক ব্যাপকতা ও বিশদ বিবরণ সাধারণ পাঠকের মনে আপত দৃষ্টিতে উক্ত প্রশ্নটি জাগিতে পারে। শিবলী নোমানী ও সুলায়মান নদবী লিখিয়াছেন, মুসলিমগণ গাযওয়া ও জিহাদের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকার হইয়াছে। শুধু ইসলাম বিরোধীরা নহে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বনকারী চিহ্নিত ব্যক্তিও এই ভ্রান্তির শিকার। কিন্তু ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। কেননা এমন সতর্ক বাস্তব কারণ রহিয়াছে যাহাতে এইরূপ ভ্রান্তির ক্ষেত্রে বন্ধুদের তো বটেই, শত্রুদেরও মার্জনা করা যায় (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৫৭৪)।

তবে বাস্তবতা এই যে, প্রতিপক্ষের সুচতুর বুদ্ধিজীবিগণ ইহাকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করিবার জন্য এবং ইসলামের নবীকে যুদ্ধবাজরূপে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে। অনেক অদূরদর্শী মুসলিম বুদ্ধিজীবীও বাস্তবতা বিশ্লেষণ না করিয়া এই ভ্রান্তির প্রবাহে নিজেদের গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। অথচ যুদ্ধ ঘটনাবলীর বাস্তব বিশ্লেষণ এবং ইসলামের জিহাদের সঠিক অনুধাবন এই সকল আপত্তি নিঃশেষ করিয়া জিহাদের যথার্থতা ও বাস্তবানুগ গ্রহণযোগ্যতা ও প্রকৃত সৌন্দর্য সপ্রমাণ করিবে।

শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রসঙ্গে মুসলিম দার্শনিক ও বিদ্বান মনীষিগণের বক্তব্য এই যে, ইসলাম শুধু তাত্ত্বিক ও কিতাবী দর্শনের নাম নহে যাহা কতক বুলি ও আপ্তবাক্য আওড়ানোর মধ্যেই সীমিত থাকে, বাস্তবে এই স্থানে প্রযোজ্য হইতে পারে না; বরং ইসলাম তো বাস্তব জীবন এবং জীবনের ক্ষুদ্রতর পরিসর হইতে শুরু করিয়া বৃহত্তর পরিসর সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসর পর্যন্ত বাস্তবায়নযোগ্য এবং সুষ্ঠু ও সুষম আদর্শ জীবনধারা ও অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সংবিধানের নাম। সুতরাং ইহার বাস্তবায়নের জন্য রহিয়াছে সুবিন্যস্ত বিধি-মালা, বিশাল কর্মসূচী এবং উহার বাস্তব নমুনার জন্য রহিয়াছে নবী জীবনের উত্তম আদর্শ (উস্ওয়াতু হাসানা)। আবার এইসব বিধি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রহিয়াছে দাওয়াত ও তাবলীগ, চিন্তা, মেধা, মনন ও সাধনা প্রয়োগের আহবান এবং একান্ত প্রয়োজনে যুক্তিসম্মত পন্থায় শক্তি প্রয়োগ ও অস্ত্রধারণের আহবান।

ইসলাম তাহার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, আদর্শ ও বিধিমালায় সম্পূর্ণ আপোষহীন। এইগুলি বিসর্জন দিয়া অথবা শিথিলতা ও আপোষরফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি অন্বেষণের নাম ইসলাম নয়। এতদসংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না" (৫ : ৪৮)।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ.

"এবং (কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে) তুমি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও, যাহাতে আল্লাহ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করিতে পারে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী" (৫ : ৪৯)।

এইখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত-ইনজীলের অনুসারী হওয়ার দাবিদার 'আহলে কিতাব' ইয়াহূদী- খৃষ্টানদের সহিত আপোষ-রফাকেই 'খেয়াল-খুশীর' অনুসরণ বলা হইয়াছে এবং উহাতে সতর্ক থাকিবার আদেশের সহিত তাহাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রূপ :

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلاً وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ.

"বল, 'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব— যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন'? আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে" (৬ : ১১৪-১১৬)।

অর্থাৎ আল্লাহর কোন বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ বা সামান্য হেরফের ও শিথিলতার অবকাশ নাই।

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

“বল, ‘তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহবান কর তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে’। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না” (৬ ঃ ৫৬)।

তদ্রূপ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا “সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদের সহিত প্রবল জিহাদ চালাইয়া যাও” (২৫ ঃ ৫২)।

ইহাতে কাফিরদের সহিত কোন প্রকার আপোষরফা না করিয়া কুরআনের বিধানের উপর অনমনীয় থাকিবার স্থির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

“সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রহিয়াছ” (৪৩ ঃ ৪৩)।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

“ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না” (৪৫ ঃ ১৮)।

সুতরাং শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র বিধান পরিত্যাগ করিয়া বা কিছু ছাড় প্রদান করিয়া কাফির অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর সহিত সমন্বয় বিধান ও আপোষরফার বিষয়টি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৃত জিহাদ মানে কখন ও শুধু মারামারি, খুনাখুনি ও রক্তারক্তি নয়। জিহাদ মানেই রক্তের বন্যা প্রবাহিত করা ও মানুষের জীবন নিয়া রক্তের হোলিখেলা নয়। লড়াই মানেই শুধু সশস্ত্র যুদ্ধ ও কিতাল নয়; বরং জিহাদ ও কিঁতালে রহিয়াছে ব্যুৎপত্তিগত, উদ্দেশ্যগত ও নীতিগত সুস্পষ্ট ও দুস্তর ব্যবধান। আভিধানিক অর্থে জিহাদ ও কিতাল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বিষয়। ‘কিতাল’ অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ এবং জিহাদ অর্থ চেষ্টা-সাধনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জিহাদের মুখ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর হইতেছে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অর্থাৎ মানুষের জন্মগত ও স্বভাবজাত কু-চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার বিরামহীন ও অক্লান্ত সাধনা। ইহাকে জিহাদে আকবার বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও একচ্ছত্র মালিকানাধীন বিশ্বে আল্লাহ্‌র কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহ্‌র বিধানকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, তা‘লীম-তরবিয়ত, তর্ক-বিতর্ক এবং লিখনী জাতীয় পর্যায়ের যে কোন প্রচেষ্টা, সাধনা-সংগ্রাম, আন্দোলন ইত্যাদি সবই জিহাদরূপে স্বীকৃত। আবার প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সহিত সশস্ত্র সংগ্রাম ও অস্ত্র

প্রতিযোগিতার সমরাভিযানে লিপ্ত হইয়া উহাতে জীবনদান ও প্রাণ হরণও পারিভাষিক জিহাদের চূড়ান্ত স্তরের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদের এই স্তরটি বাহ্যত কিতাল-এর সমার্থক এবং পবিত্র কুরআন-হাদীছেও কিতাল শব্দটি ইসলামী জিহাদের এই চূড়ান্ত স্তরের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু নীতিবিধান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার বিচারে 'জিহাদ'-এর সমার্থক 'কিতাল' এবং প্রচলিত অর্থের কিতাল অভিন্ন নয়। কেননা কুরআন ও হাদীছে যেভাবে জিহাদের আদেশ-নির্দেশের সঙ্গে 'ফী সাবীলিল্লাহি' (আল্লাহ্র পথে) বা 'ফিল্লাহি' (فى الله আল্লাহ্তে—আল্লাহ্র জন্য) কথাটি সংযুক্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ (জিহাদের সমার্থক) 'কিতাল' বা যুদ্ধের আদেশ-নির্দেশ ও ফযীলাত বর্ণনার আয়াত ও হাদীছসমূহেও 'ফী সাবীলিল্লাহি' বাক্যাংশটির সহিত ফিতনা নির্মূল হওয়া, দীন ও আনুগত্য আল্লাহ্র জন্য হওয়া ইত্যাদি মহত উদ্দেশ্য বিধায়ক বাক্যাংশ সংযুক্ত রহিয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৯০ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه ; আরও দ্র. ১৫৪, ১৯৩; ৩ ঃ ১৪৬, ১৬৯; ৪ ঃ ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৪; ৮ ঃ ৩৯; ৯ ঃ ১১১ ও অন্যত্র এবং সহীহ বুখারী, ৩১২৬ ও অন্যান্য অসংখ্য হাদীছ)।

সুতরাং যে 'কিতাল' (সশস্ত্র যুদ্ধ) ফী সাবীলিল্লাহ না হইয়া 'তাগূত' ও শয়তানের পথে (৪ ঃ ৭৪) হইবে অথবা রাজ্য বিস্তার ও শুধু গনীমত বা সম্পদ লুণ্ঠন হইবে উহা জিহাদের সমার্থক কিতাল নয়। মানব ইতিহাসে মানুষ হত্যার সূচনা ঘটিয়াছিল হযরত আদম (আ)-এর এক পুত্র কাবীল কর্তৃক অন্যায়ভাবে আপন ভাই হাবীলকে হত্যার মধ্য দিয়া। পবিত্র কুরআনে এই দুর্ঘটনার প্রাসংগিক মন্তব্যরূপে জীবনের মূল্য ও খুনের পরিণতি প্রকাশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল। আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল" (৫ ঃ ৩২)।

যেই ইসলামের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, একটি প্রাণ হত্যাকে (মুসলিম ও বিধর্মী নির্বিশেষে) বিশ্ববাসীকে হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে, সেই ইসলামে শুধু মানুষ খুনের জন্য জিহাদ অনুমোদনের অপবাদ সম্পূর্ণ অবান্তর। এই আয়াতের ব্যাখ্যামূলক হাদীছে মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ (ظُلْمًا) الاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْهَا .

"কোন মানুষকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাহা হইলে হত্যাকারী হিসাবে আদম-সন্তান কাবীলের উপর উহার আংশিক পাপ বর্তাইবে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ১০১৪, কিতাবুদ দিয়াত)।

তদুপরি মানব জীবন রক্ষা ও হত্যা প্রতিরোধে 'কিসাস' বিধান দেওয়া হইয়াছে ঃ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا أُولِى الْأَلْبَابِ "হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে জীবন" (২ ঃ ১৭৯)।

প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ; পুরুষ, নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, বিকলাংগ ও পূর্ণাগ দেহধারী, মৃত্যুপথযাত্রী ও সম্পূর্ণ সুস্থ, এমনকি মুসলিম ও সংখ্যালঘু (যিম্মী) অমুসলিম এই সকলের মধ্যেই কিসাসের ক্ষেত্রে সমতার বিধান দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ চক্ষুর বদলে চক্ষু, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য যখমের ক্ষেত্রেও সমতার বিধান দেওয়া হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৭৮; ৫ ঃ ৪৫; এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইহার ব্যাখ্যা এবং হাদীছ-ফিক্হ গ্রন্থসমূহের কিতাবুল কিসাস ও কিতাবুদ দিয়াত)। এমনকি শরীআতের বিধানমতে এক ব্যক্তির হত্যাকারী একাধিক বা অসংখ্য ব্যক্তি হইলেও তাহাদের সকলকেই এক ব্যক্তির বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামানের রাজধানী সান'আয় পাঁচ ব্যক্তি (অথবা সাত ব্যক্তি) একত্র হইয়া এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে খলীফা তাহাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডের (কিসাস) ফরমান জারী করিলেন এবং সাহাবীগণের সমক্ষে এই ঘোষণা প্রদান করিলেন ঃ لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلٰى قَتْلِهِ جَمِيْعًا لَقَتَلْتُهُمْ "সমগ্র সান'আবাসী একত্রে মিলিয়া তাহাকে খুন করিলেও আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকে হত্যা করিতাম"। উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁহার এই ঘোষণার সহিত সর্বসম্মত ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করিয়াছিলেন (দ্র. মুআত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল উকূল, হত্যার প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪১; বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, ২খ., পৃ. ১০১৮)।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের দণ্ডবিধি (কিসাস ও হুদূদ) মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম এই তিনটি বিষয় লইয়াই আবর্তিত এবং উহা সরাসরি আল্লাহ্ ও রাসূল (কুরআন ও হাদীছ) কর্তৃক স্থায়ীরূপে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহাতে কোন আদালত বা কাযী কিংবা সংসদ অথবা আইনজীবীর আইন প্রণয়নের কোন অবকাশ রাখা হয় নাই। উহাতে সমধিক গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্বনবী (স) সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। হযরত আবূ বাক্রাহ, ইব্ন আব্বাস ও জারীর (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের ভাষণের প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ্ সমবেত জনতাকে নিরবতা অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিলেন, অতপর বলিলেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا الِيَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ (فَأَعَادَهَا مِرَارًا) (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

"তোমরা কি জান আজিকার এই দিনটি কোন দিন? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) সমধিক অবহিত। তিনি নীরবতা অবলম্বন করিলেন, এমনকি আমরা ধারণা করিলাম যে, হয়তো তিনি উহার প্রচলিত নাম ব্যতীত অন্য কোন নামকরণ করিবেন। তিনি বলিলেন, ইহা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এইটি কোন মাস? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) সমধিক অবহিত। তিনি নীরবতা অবলম্বন করিলেন, এমনকি আমরা ধারণা করিলাম, হয়তো তিনি উহার প্রচলিত নাম ব্যতীত অন্য কোন নামকরণ করিবেন। তিনি বলিলেন, ইহা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এইটি কোন নগর? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) সমধিক অবহিত। তিনি নীরবতা অবলম্বন করিলেন, এমনকি আমরা ধারণা করিলাম, হয়তো তিনি উহার প্রচলিত নাম ব্যতীত অন্য কোন নামকরণ করিবেন। তিনি বলিলেন, ইহা কি সম্মানিত নগরী নয়? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের মানসম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য এই মাস, এই নগরী ও এই দিনের পবিত্রতার ন্যায় পবিত্র ও সম্মানিত। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাত করিবার (কিয়ামতের) দিন পর্যন্ত (এই বিধান বলবৎ থাকিবে)। কয়েকবার তিনি কথাটির পুনরুক্তি করিলেন এবং মাথা উপরের দিকে তুলিয়া বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন" (বুখারী, ১খ., পৃ. ২৩৪, কিতাবুল হজ্জ, মিনায় খুতবা অনুচ্ছেদ, হাদীছ নং ১৭৩৯; অদ্রূপ হাদীছ নং ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৩১৯৭, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮ এবং সকল হাদীছ গ্রন্থে মিনা-আরাফাত-মুযদালিফায় ভাষণ প্রসঙ্গ)।

এইরূপে মানব জীবনের নিরাপত্তার জন্য পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় বিধানের পাশাপাশি প্রাণ হত্যার কারণে আখিরাতের ভয়াবহ ও কঠোর শাস্তির বিধান ও হুমকি পূর্ণ বহু আয়াত ও হাদীছ উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا.

"কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন" (৪ঃ ৯৩)।

এমনকি হাদীছে চুক্তিবদ্ধ (সংখ্যালঘু) অমুসলিমকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ জান্নাত হইতে বঞ্চিত হওয়ার হুমকি প্রদান করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) মহানবী (স) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ (نَفْسًا) مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَانَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"যে ব্যক্তি কোন 'মুআহিদ' (সংখ্যালঘু চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ব্যক্তি)-কে হত্যা করিবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাইবে না। অথচ উহার সুঘ্রাণ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইতেও পাওয়া যায়" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৪, কিতাবুল জিহাদ, যিম্মী হত্যা প্রসঙ্গ; ২খ., পৃ. ১০২১, কিতাবুদ দিয়াত; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩১১; হাদীছ নং ৩১৬৬)।

মোটকথা, ইসলামী শরী'আতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানবহত্যা মহাপাপ। সাধারণ ইতর বা কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবনও সুরক্ষিত এবং অকারণে উহার হত্যার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে অথবা জবাবদিহি করিতে হইবে। ইতর প্রাণীর প্রাণ রক্ষাও মুক্তির উপায় হইতে পারে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِه.

"একটি কুকুর একটি কূপের চতুষ্পার্শ্বে চক্কর দিতেছিল, পিপাসায় উহার জীবননাশের উপক্রম হইয়াছিল। বানূ ইসরাঈলের এক পতিতা উহা দেখিতে পাইল। সে নিজের মোজা খুলিল (এবং নিজের ওড়না ছিড়িয়া রশি বানাইল) ও পানি তুলিয়া কুকুরটিকে পানি পান করাইল। ইহার কারণে তাহাকে ক্ষমা করা হইল" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৯৩, ৪৬৭)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِىَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الاَرْضِ.

"এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হইবে। সে উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ফলে উহার মৃত্যু ঘটে, উহার কারণে সে (নারী) জাহান্নামে প্রবেশ করিল। কেননা সে উহাকে খাদ্যও দিল না, পানীয়ও দিল না অথচ আটকাইয়া রাখিল, আবার উহাকে ছাড়িয়াও দিল না, যাহাতে সে পৃথিবীর পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ খাইতে পারিত" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৯৫, ৪৬৭, ১০৩)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

نَزَلَ نَبِىٌّ مِّنَ الاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجِهَازِه فَاُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَاُحْرِقَ بِالنَّارِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً.

"কোন একজন নবী একটি গাছের তলায় অবতরণ করিলেন। একটি পিপীলিকা তাঁহাকে কামড় দিল। তিনি তাঁহার সামানপত্র সরাইবার আদেশ দিলে তাহা গাছের নিচ হইতে সরানো

হইল এবং পুনরায় তিনি আদেশ করিলে পিপীলিকার বাসা পোড়াইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন, মাত্র একটি পিপীলিকা নয় কেন" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৬৭)।

এমন কি হাতের নিশানা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন প্রাণীকে (মুরগী, কবুতর বা ছাগল ইত্যাদি) বাঁধিয়া রাখিয়া চাঁদমারি করিবার প্রশিক্ষণ অবৈধ ও অভিশাপযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এমন কতিপয় কিশোরের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন যাহারা একটি মুরগীকে বাঁধিয়া চাঁদমারির তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা ইব্‌ন উমার (রা)-কে আসিতে দেখিয়া পালাইয়া গেল। ইব্‌ন উমার (রা) বলিলেন, কাহারা এই কাজ করিয়াছে? যাহারা এই কাজ করে নবী (স) তাহাদিগকে লানত করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮২৮, কিতাবুয যাবা'ইহ; মুসলিম, ২খ., ১৫২-৩)।

ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

"রাসূলুল্লাহ (স) সেই ব্যক্তিকে লানত করিয়াছেন যে এমন কিছুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানায় যাহার প্রাণ রহিয়াছে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৩; ১খ., মুকাদ্দিমা)।

এমন কি যেসব প্রাণী হালাল হওয়ার কারণে শরী'আতে উহা যবেহ করা বৈধ উহাতে কঠোরতা বর্জন করিয়া যথাসাধ্য সুন্দররূপে প্রাণীটি যাতনা লাঘব করিয়া যবেহ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে দুইটি বিষয় সংরক্ষণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللهَ كَتَبَ الاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ يُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে দয়া প্রদর্শন ফরয করিয়াছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করিবে সুন্দররূপে হত্যা করিবে এবং যখন তোমরা যবেহ করিবে তখন উত্তমরূপে যবেহ করিবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তাহার ছুরিটি ধারাল করিয়া নেয় এবং যবেহের প্রাণীটিকে (যথাসম্ভব) আরাম দেয়" (মুসলিম, ২খ., ১৫২; আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৮৯, কিতাবুয যাবা'ইহ)।

সুতরাং ইসলামের বিরুদ্ধে মানব হত্যার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ অনুমোদনের অভিযোগ অপবাদ মাত্র। ইসলামে জিহাদ উহার দাওয়াত ও প্রচারেরই একটি অংশ। এই কারণেই ইসলাম জিহাদের ময়দানে এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলাকালে ও দীনের প্রতি আহ্বানের বিধান প্রদান করিয়াছে। যাহার ফলে বহু ক্ষেত্রেই প্রায় সংঘটিতব্য যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। মূলত ইসলাম চলমান যুদ্ধাবস্থায়ও মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অতুলনীয় ও প্রায় অকল্পনীয় বিধি প্রণয়ন করিয়াছে, যাহার কারণে মুসলিম মুজাহিদদের জীবন সংহারকারী দুর্ধর্ষ শত্রুকে তরবারি ও

মারণাস্ত্রের নাগালে পাওয়ার পরও তাহার মস্তকোপরি উত্তোলিত তরবারি নিমিষে নিস্তেজ হইয়া নিচে নামিয়া আসে। ফলে জীবন সংহারকারী সেই শত্রুই সহোদর ভাইয়ের চাইতে আপন হইয়া যায়। কোন কাফিরের হাতে শাহাদত বরণকারী মুজাহিদ এবং সেই হত্যাকারী শত্রু (পরে মুসলমান হইলে) দুইজনেরই জান্নাতে যাওয়ার অনুপম কাহিনীও হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। একটি হাদীছে আছে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপনীত হইলাম তখন যখন খায়বার বিজয়ের পর তিনি সেইখানে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকেও (গনীমতের) হিস্সা দিন। তখন সা'ঈদ ইবনুল আস-এর কোন পুত্র (আবান ইব্ন সা'ঈদ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে হিস্সা দিবেন না (কেননা সে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই)। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, 'এই লোকটি তো (উহুদ যুদ্ধে নু'মান) ইব্ন কাওকাল-এর হত্যাকারী'। তখন সা'ঈদ ইবনুল আসের পুত্র বলিলেন, 'হায় আশ্চর্য! দাল' পাহাড় হইতে নামিয়া আসা (গেঁয়ো) জংলী লোকটি কী বলিতেছে! সে একজন মুসলমানকে হত্যার অভিযোগ আমার নামে উত্থাপন করিতেছে যাহাকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে (শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভে) সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমাকে তাঁহার হাতে (কাফির অবস্থায় নিহত হওয়া দ্বারা) লাঞ্ছিত করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই বক্তব্য নীরব সমর্থন দ্বারা অনুমোদন করিলেন (বুখারী, ১খ., কিতাবুল জিহাদ, হত্যাকারী কাফির মুসলমান হওয়া প্রসঙ্গ, হাদীছ নং ২৮২৭/২৬২২; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪৭-৮৮)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

"দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হাসিবেন যাহারা একে অপরকে হত্যা করিয়াও জান্নাতবাসী হইবে। একজন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত (শহীদ) হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করিলেন (সে ইসলাম গ্রহণ করিল) এবং পরে শহীদ হইয়াছে" (বুখারী, ১খ., ঐ, হাদীছ নং ২৮২৬/২৬২১)।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলের প্রিয়তম চাচা হযরত হামযা (রা)-রে হত্যাকারী হাবশী গোলাম ওয়াহশী পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ওয়াহশী 'রাদিয়াল্লাহ আনহু' হইয়াছিলেন (এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ড মুসায়লামাকে হত্যা করিয়া হামযা হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন)। তদ্রূপ যে (আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী) হিন্দ হামযা (রা) নাক-কান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করিয়া গলার মালা বানাইয়াছিল এবং তাঁহার কলিজা চর্বন করিয়া পৈশাচিক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিল সেও একদিন সাহাবিয়া হইয়া রাসূলের প্রীতিভাজন হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে অগণিত। মূলত ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ ও আন্তরিক বাসনার বাস্তব প্রতিফলন। কেননা হিজরত-পূর্বকালে তাঁইফবাসিগণকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জবাবে সর্দারদের নির্দেশে

কিশোর বালকদের ছোড়া ঢিল-পাথরে রক্তাক্ত হইয়া প্রায় অচেতন অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সময় হযরত জিবরীল (আ) যখন পাহাড়-পর্বতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিয়াছিলেন, আপনি হুকুম করিলে মালাকুল জিবাল দুই পর্বত একত্র করিয়া কাফিরদিগকে পিষিয়া মারিবে। তখন দয়ার নবী বলিয়াছিলেন ঃ

بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

"বরং আমি আশা করিতেছি যে, আল্লাহ ইহাদের ঔরসে এমন সন্তান সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না" (বুখারী ১খ., কিতাবু বাদইল খালক, বাব ৭, হাদীছ নং ৩২৩১; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩৬০; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, ২খ., পৃ. ১০৮)।

সুতরাং মানুষ খুন করিয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে আল্লাহর রাসূলের জন্য তরবারির যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না, বরং তিনি তাহা ফেরেশতার মাধ্যমেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল কাফিরদেরকে প্রভাবান্বিত করিয়া ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে তাহাদের অন্তরের পর্দা অপসারিত করিয়া ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য অনুধাবনের সুযোগ করিয়া দেওয়া। সুতরাং মহত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে ইসলাম সশস্ত্র জিহাদ অনুমোদন করিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষ খুন করা উহার লক্ষ্যও নহে, কাম্যও নহে; বরং প্রত্যক্ষ ও ঘোরতর যুদ্ধ চলাকালেও মূল লক্ষ্য অর্জনে ইসলাম যেসব বিধি-বিধান অপরিহার্য করিয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) শিশু, নারী, বৃদ্ধ, ধর্মযাজক, সাধু-সন্যাসী, বিকলাঙ্গ-প্রতিবন্দী, সাধারণ শ্রমজীবীদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়) হত্যা করা নিষিদ্ধ।

(২) মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি সাধনের পরও তাহাদের উত্তোলিত তরবারির নিচে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া বা কলেমা পাঠ করামাত্র তাহাকে হত্যা নিষিদ্ধ।

(৩) কোথাও আযান ধ্বনি শ্রুত হইলে (বা অন্য কোন সূত্রে মুসলমান বসতি হওয়ার ধারণা পাওয়া গেলে) আক্রমণ করা নিষিদ্ধ।

(৪) আক্রান্ত হইয়া আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলে আঘাত করা নিষিদ্ধ।

(৫) যে কোন সাধারণ মুসলমান, এমনকি কোন নারী ও কোন অমুসলিমকে 'নিরাপত্তা' প্রদান করিলে তাহাকে আঘাত করা নিষিদ্ধ।

(৬) প্রতিপক্ষ সন্ধি প্রস্তাব করিলে— এমনকি বাহ্যত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য শর্তে হইলেও কোন কারণে সেই সন্ধি প্রত্যাহার করিতে হইলে সম্পূর্ণ সমপর্যায়ে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। হঠাৎ একতরফাভাবে সন্ধি প্রত্যাহার করিয়া অতর্কিতে আক্রমণ নিষিদ্ধ।

(৭) ক্ষমতা প্রদর্শন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ কিংবা নিছক গনীমত ও সম্পদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জিহাদ না করিবার বিধান রহিয়াছে।

সীরাতুন্নবী (উর্দূ) গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (৪খ., পৃ. ৩৫০) ঃ অজ্ঞ লোকেরা আরও একটি বিষয়ের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে। ইসলাম উহার শান্তিপ্রিয়তার কারণে এই বিধান স্থির করিয়াছে যে, প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির মুহূর্তেও সন্ধি ও সম্প্রীতির চিন্তা বর্জন করা হইবে না; বরং অস্ত্র দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পূর্বে শত্রুপক্ষের নিকট দুইটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হইবে ঃ (এক) অমুসলিমরা কলেমা শাহাদাত পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলে তাহারা দীন, হুকুমাত ও মর্যাদার অধিকারসমূহে মুসলমানদের সমতাসম্পন্ন হইয়া যাইবে। (দুই) অমুসলিমরা নিজেদের ধর্মে বহাল থাকিয়া মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও শাসন কর্তৃত্ব মানিয়া লইলে তাহাদের হিফাজত ও নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব মুসলমানদের উপরে ন্যস্ত হইবে।

রক্তপাত এড়াইবার জন্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে নিবেদিত সর্বশেষ প্রচেষ্টার এই বিধান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীরা হযরত নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার অনুসারিগণকে তরবারির জোরে মুসলমান বানাইবার অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবার সময় সেনাপতিকে হিদায়াত ও বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতেন। হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কাহাকেও কোন বৃহত বা ক্ষুদ্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিলে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির পন্থা অনুসরণ এবং তাহার সহযোদ্ধা মুসলমানদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়ার বিশেষ নির্দেশ (ওসিয়াত) প্রদান করিয়া বলিতেন ঃ

أُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ أُغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْداً وَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ اَوْ خِلاَلٍ فَاَيَّتُهُنَّ مَا اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ (ثُمَّ) ادْعُهُمْ اِلَى الاِسْلاَمِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا اَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْئِ شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَاِنْهُمْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنَّهُمْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ.

“তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর, যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তোমরা গনীমত আত্মসাৎ করিবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, (মৃতদেহের) অংগ বিকৃতি ঘটাইবে না, কোন শিশু বালককে হত্যা করিবে না। তুমি যখন

তোমার মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটি প্রস্তাবের প্রতি আহবান করিবে, তাহারা ইহার যেই কোনটিতে সাড়া দিলে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে। (এক) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইবে। তাহারা ইহাতে সাড়া দিলে তুমিও তাহা গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের আবাসভূমি হইতে মুহাজিরগণের আবাসভূমিতে চলিয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে অবহিত করিবে যে, এইরূপ করিলে তাহারা মুহাজিরগণের সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং তাহাদের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করিবে। তাহারা দেশত্যাগে অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে অবহিত করিবে যে, তাহা হইলে তাহারা 'বেদুঈন' মুসলমানদের সমপর্যায়ে থাকিবে এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি প্রযোজ্য আল্লাহ্র বিধানও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। তাহারা (যুদ্ধলব্ধ) গনীমত ও 'ফায়' কোন অংশ পাইবে না, তবে পাইবে যদি তাহারা মুসলমানদের সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করে। (দুই) তাহারা ইহাও অস্বীকার করিলে, তুমি তাহাদের নিকট জিযয়া দাবি করিবে। তাহারা ইহাতে সম্মত হইলে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। (তিন) ইহাতেও তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে (এবং যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অনড় থাকিলে) তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৮২, কিতাবুল জিহাদ, আমীর ও সেনাপতির প্রতি ওয়াসিয়াত প্রসঙ্গ)।

রক্তপাত ও যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ইহাই ইসলামের সমরনীতি। কাহাকেও তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা ইসলামের বিধান নয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগেও (হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে) (পারস্য সম্রাটের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও মুসলিম বাহিনী তিন দিন পর্যন্ত তরবারি খাপবদ্ধ রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিল। হযরত সালমান ফারসী (রা), যিনি ইরানী বংশোদ্ভূত সংগ্রামী মুসলিম ছিলেন, তিন দিন পর্যন্ত পারসিকদের এই বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, আরবরা আমার পরিচালনাধীন রহিয়াছে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিলে আমাদের সমান অধিকার ভোগ করিবে। আর যদি তোমরা তোমাদের ধর্মেই বহাল থাকিতে চাও তবে জিয্য়া প্রদান করিয়া থাকিতে পার। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের অধীনতা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে (সীরাতুন্নাবী, ৪খ., পৃ. ৩৫১; বরাত তিরমিযী, আবওয়াবুস সিয়ার)। ইহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও দুশমনকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয় নাই, বরং তাহাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার দ্বারও উন্মুক্ত ছিল।

ইয়ামামার অধিবাসী বানূ হানীফা গোত্রের নামকরা সর্দার ছিলেন ছুমামা ইব্ন উছাল (রা)। আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, মহানবী (স) নাজ্দ অভিমুখে একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহারা বনূ হানীফা গোত্রের ছুমামা ইব্ন উছাল নামের এক ব্যক্তিকে ধরিয়া নিয়া আসিল এবং তাহাকে মসজিদে নববীর একটি থামের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। মহানবী (স) তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ "ছুমামা! এখন তোমার মতামত (মনের অবস্থা) কি"? সে বলিলঃ

عِنْدِيْ خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ اِنْ تَقْتُلْنِيْ ذَا دَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدَ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ

"আমার মনোভাব উত্তমই, হে মুহাম্মাদ। তুমি আমাকে হত্যা করিলে একজন শোণিতধারী ব্যক্তিকে হত্যা করিবে। আর অনুগ্রহ করিলে একজন কৃতজ্ঞতাবোধসম্পন্ন লোককে অনুগ্রহ করিবে। আর তোমার ধন-সম্পদের (মুক্তিপণের) চাহিদা থাকিলে বল, দেওয়া হইবে"।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে স্বঅবস্থায় থাকিতে দিলেন। দ্বিতীয় দিন মহানবী (স) একই প্রশ্ন করিলে ছুমামা একই জবাব দিল। তৃতীয় দিনও মহানবী (স) বলিলেন, এখন তোমার অভিমত কি? সে বলিল, আমার অভিমত তাহাই যাহা আগে বলিয়াছি। তখন মহানবী (স) তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। বাঁধনমুক্ত ছুমামা ততক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। সে মসজিদের সন্নিকটে একটি খেজুর বাগানে গিয়া গোসল করিল এবং পুনরায় মসজিদে আসিয়া বলিল, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল); অতঃপর বলিল ঃ

يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ اِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَيَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلاَدِ اِلَيَّ.

"আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট পৃথিবীতে আপনার চেহারা অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য চেহারা কোনটি ছিল না। এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট আপনার দীন অপেক্ষা অধিক অপসন্দনীয় দীন কোনটি ছিল না; এখন আপনার দীনই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট আপনার শহর অপেক্ষা অধিক অপসন্দনীয় কোন শহর ছিল না, এখন আপনার শহরই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়" (বুখারী ২খ., পৃ. ৬২৭-৮, কিতাবুল মাগাযী, বনূ হানীফা প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে, নং ৪৩৭২; সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৩৫০-৩৫১; বরাত, বুখারী, তিরমিযী, বন্দীকে মসজিদে বাঁধিয়া রাখা অনুচ্ছেদ, আরও দ্র. হাদীছ নং ৪৬২, ৪৬৯, ২৪২২, ২৪২৩)।

জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও মুসলমান বানাইতে হইলে (অথবা শত্রু নিধনই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে) ছুমামার ঘটনা কি ভিন্নরূপ হইতে পারিত না? বদরের যুদ্ধবন্দীদিগকে কি তরবারির আঘাতে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাইত না ? কিন্তু তাহা করা হয় নাই এবং পরবর্তীতে যুদ্ধবন্দীদের সহিত উত্তম আচরণই করা হইয়াছে। যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে কুরআনের বিধান হইল ঃ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً "হয় অনুগ্রহ করিয়া বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া" (৪৭ ঃ ৪)। বদরের সত্তরজন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অপরদিকে হাওয়াযিন গোত্রের হাজার হাজার বন্দী মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরেও বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেওয়া হইল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৮ ও অন্যত্র)।

খায়বার যুদ্ধে একের পর এক দুর্গ বিজিত হইয়াছিল। একটি দুর্গ দুর্জয় হইয়া দেখা দিলে সেইটি পদানত করিবার জন্য হযরত আলী (রা)-এর হাতে সেনাপতির ঝাণ্ডা তুলিয়া দেওয়া হইল। আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিব? তিনি বলিলেন ঃ

أُنْفُذْ عَلى رِسْلِكَ حَتّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الاِسْلاَمِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَ اللّٰهِ لاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِداً خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"ধীর-স্থিরভাবে অগ্রসর হও। তাহাদের আঙ্গিনায় পৌঁছিয়া প্রথমে তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান করিবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ তা'আলা তোমার মাধ্যমে মাত্র একজন লোককেও হিদায়াত দান করিলে উহা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের পাল হইতেও অধিক উত্তম হইবে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪২২, কিতাবুল জিহাদ, ২খ., পৃ. ৬০৬, কিতাবুল মাগাযী, খায়বার অভিযান অধ্যায়, হাদীছ, নং ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০)।

অবশ্য খায়বারবাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত তরবারি খাপবদ্ধ করিয়া তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় (সীরাতুন্নাবী, ৪খ., পৃ. ৩৬২)।

যেই ধর্মে দাওয়াতের মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তির হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া এত অধিক মূল্যবান ও গুরুত্ববহ, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তপাত করিবার এবং তরবারির জোরে ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিবার অভিযোগ নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ও অমূলক।

এই তো ছিল যুদ্ধ শুরু করিবার পূর্ব সময়ের বিধান। আর যুদ্ধ শুরু হইয়া যাওয়ার পরে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কেহ কলেমা উচ্চারণ করিয়া বসে এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করে তবে সেই মুহূর্তে সে মুসলমান বিবেচিত হইবে। সুতরাং তখন তাহার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন বা তাহাকে আঘাত করিবার বৈধতা থাকিবে না, বরং উহা হইবে গুরুতর অপরাধ যাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। কাফিররা মুসলমানদের এই নীতি সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার কারণে অনেক সময় তাহারা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গীণ মুহূর্তে (হয়তোবা) নিজের জীবন সংকটাপন্ন হওয়ার মুহূর্তে জীবন রক্ষার জন্য কলেমা উচ্চারণ করিয়া ফেলিত। ফলে সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত ও আক্রমণোদ্যত মুসলিম মুজাহিদকে বাধ্য হইয়া তাহার ক্রোধ সংবরণ করিতে হইত এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উত্তোলিত তরবারি নামাইয়া আনিতে হইত। এই কথা বলিবার বা ভাবিবার অবকাশ বা বৈধতা থাকিত না যে, হয়তো লোকটি জীবন রক্ষার জন্য তথা জানের ভয়ে কলেমা পাঠ করিয়াছে, আন্তরিকভাবে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নয় (সীরাতুন্নাবী, ৪খ., পৃ. ৩৫৩)।

এই প্রসঙ্গে হযরত মিকদাদ ইব্ন আম্র (ইব্নুল আস্ওয়াদ) আল-কিন্দী (রা)-এর নিজের ঘটনা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হইয়াছে। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বিষয়ে আপনার নির্দেশ কি, আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হইলাম এবং যুদ্ধে লিপ্ত হইলাম। এক সময় সে আমার একটি হাত কাটিয়া ফেলিল। অতঃপর সে কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল এবং বলিয়া উঠিল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম (অথবা বর্ণনান্তরে আমি তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে সে বলিয়া উঠিল, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ; ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এই কথা বলিবার পর আমি তাহাকে হত্যা করিব কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, لاَ تَقْتُلْهُ (তুমি তাহাকে হত্যা করিবে না)। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো একটু পূর্বেই আমার একটি হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর নিজের জান বাঁচাইবার জন্য ঐ কথা বলিয়াছে। তবুও কি আমি তাহাকে হত্যা করিব না? তিনি বলিলেন ঃ

لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَةَ الَّتِىْ قَالَ.

"তুমি তাহাকে হত্যা করিবে না। কেননা এই অবস্থায়ও তাহাকে হত্যা করিলে তুমি তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিল সে সেই স্তরে পৌছিয়া যাইবে এবং সেই ব্যক্তি তাহার এই কলেমা উচ্চারণের পূর্বে যে স্তরে ছিল তুমি (তাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যার করিবার কারণে) তাহার স্তরে পৌছিয়া যাইবে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৭৩, ১০১৪; মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৭)।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীছে আরও আছে, নবী করীম (স)-মিকদাদ (রা)-কে বলিলেন ঃ

اِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِىْ اِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَاَظْهَرَ اِيْمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذٰلِكَ كُنْتَ اَنْتَ تُخْفِىْ اِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ.

"যখন কোন মুমিন ব্যক্তি কাফিরদের সহিত অবস্থানকালে তাহার ঈমান গোপন করিতেছিল, পরে (মুসলিম বাহিনীর নিকট) তাহার ঈমান প্রকাশ করিল, তখন তুমি তাহাকে হত্যা করিলে? অথচ তুমিও তো এমনই ছিলে যে, মক্কায় তোমার ঈমান গোপন করিয়া রাখিতে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ১০১৪)।

পবিত্র কুরআনেও এই বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উহা লংঘনে কঠোর নিন্দা করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে 'সালাম' করিলে পার্থিব জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে বলিও না, 'তুমি মুমিন নহ'। কারণ আল্লাহ্র নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে। পূর্বে তোমরা তো এইরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করিয়া লইবে" (৪ ঃ ৯৪)।

হাদীছ ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ছাগল চরাইতেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ তাহার পার্শ্ব দিয়া যাওয়ার সময় সে তাহাদিগকে সালাম দিল। কিন্তু তাহার সালাম প্রদানকে অবিশ্বাস করিয়া এবং জানমাল রক্ষার জন্য প্রতারণামূলক মনে করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইল এবং তাহার ছাগলগুলি গনীমতরূপে জব্দ করা হইল। এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য এই আয়াত নাযিল করা হয়। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক বর্ণনামতে মুজাহিদগণের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী, হযরত মিকদাদ (রা) যাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন, নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিলে সেখানকার সকলে পলায়ন করিল। কিন্তু এক ব্যক্তি, যাহার নিকট অঢেল সম্পদ ছিল, সে সাহাবীগণের সম্মুখে أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ উচ্চারণ করিল। মিকদাদ (রা) তাহার কলেমা উচ্চারণকে জানমাল রক্ষার জন্য (প্রতারণামূলক) মনে করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। অপর এক সাহাবী কলেমা পাঠের পরে তাহাকে হত্যার ব্যাপারে আপত্তি করিলেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিলে তিনি মিকদাদ (রা)-কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং অত্যন্ত শক্ত ভাষায় তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন ঃ হে মিকদাদ! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবার পরও তুমি একজন মানুষকে খুন করিলে? কিয়ামতের দিন যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ তোমার বিরুদ্ধে দাবিদার হইবে তখন তুমি কি জবাব দিবে (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৫৩৯; বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৬০; তাফসীরে মাজহারী, ২খ., পৃ. ৩৮৯; মা'আরিফুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৫১-৫২০; বরাত, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, বাযযার ও অন্যান্য)?

জুহায়না গোত্রের আবাসভূমি হুরুকাত অভিমুখে একটি সারিয়া (ক্ষুদ্র বাহিনী) প্রেরিত হইয়াছিল। হযরত উসামা (রা) বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন ঃ আমরা অতি প্রত্যূষে আক্রমণ করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিলাম। আমি এবং জনৈক আনসার (সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস) প্রতিপক্ষের এক ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলে সে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলিল। ইহাতে আনসার ব্যক্তি আঘাত করা হইতে বিরত থাকিল। আমি আমার বল্লম দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলাম। আমরা (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) বিষয়টি অবহিত হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ "হে উসামা! লোকটি لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলিবার পরও তুমি তাহাকে হত্যা করিলে"? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বারবার তাঁহার কথাটির (اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ....) পুনরুক্তি

করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "তুমি তাহার কলিজা বিদীর্ণ করিলে না কেন?"

হযরত জুন্দুব (রা)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মুসলমান ও মুশরিকরা যুদ্ধে লিপ্ত হইল। মুশরিকদের এক সুচতুর ব্যক্তি সুযোগ বুঝিয়া এক একজন মুসলমানকে আঘাত করিতেছিল। মুসলমানদের এক ব্যক্তি ঐ কাফিরের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নাম উসামা ইব্ন যায়দ (রা)। লোকটির উপর তরবারি উত্তোলন করা হইলে সে বলিয়া উঠিল, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ; তবু উসামা (রা) তাহাকে হত্যা করিলেন। সংবাদবাহক যুদ্ধের ঘটনাসহ এই ঘটনাটিও মহানবী (স)-কে অবহিত করিলে তিনি উসামা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তাহাকে হত্যা করিলে কেন? উসামা (রা) বলিলেন, সে তো মুসলমানদিগকে বেদনাহত করিয়া দিয়াছিল এবং অমুক অমুককে হত্যা করিয়াছিল। উসামা (রা) ঐ ব্যক্তির হাতে নিহত কয়েকজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আক্রমণ করিবা মাত্র সে যখন তরবারি দেখিল তখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন أَقَتَلْتَهُ তুমি তাহাকে হত্যা করিলে? উসামা (রা) 'হাঁ' বলিয়া দায় স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামতের দিন যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ লইয়া উপস্থিত হইবে তখন তুমি উহার কি জবাব দিবে"? উসামা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন! কিন্তু মহানবী (স) শুধু ঐ কথাটিই বলিতে থাকিলেন। ঘটনার গভীরতা ও উহার ভয়ংকর পরিণতি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম অসন্তুষ্টি অনুধাবন করিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার এমন বাসনা হইল যে, হায় যদি আজিকার পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করিতাম! হায় যদি আমি আজই মুসলমান হইতাম (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৮, কিতাবুল ঈমান; বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২, ১০১৫)।

লক্ষণীয় যে, বাস্তব ঘটনা ও অভিযোগ-অপবাদের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান। বাস্তব ঘটনা তো এই যে, স্বাবাভিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষরূপে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলিবার সংকটময় মুহূর্তেও কাফির সৈনিক একের পর এক মুসলমান মুজাহিদকে হত্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে অথচ যখন সে আক্রান্ত হইয়া নিজের সাক্ষাত মৃত্যুর লক্ষণ দেখিতে পাইতেছে সেই চরম উত্তেজনা ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামের অতুলনীয় বিধানের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। কারণ সেই কাফির মুশরিক অবগত রহিয়াছে যে, কলেমা পড়িবার পরে যত বড় ক্ষতিকর দুশমনই হউক মুসলমান তাহার দীনের বিধানের কারণেই তাহাকে আঘাত করিতে পারিবে না। সুতরাং মোক্ষম মুহূর্তে সে কলেমা উচ্চারণ করিয়া জীবন রক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবে। ঘটনার এই বাস্তবতা সম্পর্কেই অভিযোগ এই যে, ইসলাম মানুষ খুন করিবার জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে; ইসলাম তরবারির ধারালো মাথা দ্বারা কাফিরদিগকে কলেমা পাঠে বাধ্য করে। ইহাই কি বাস্তবতা, ইহাই কি প্রকৃত সত্য এবং ইহাই কি ঐতিহাসিকের সততা, বিশ্বস্ততা (সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৩৫৪)!

বুখারী শরীফে ইব্ন উমার (রা)-এর বর্ণনামতে, খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা) বানূ জাযীমাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে তাহারা (ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে কিংবা ইসলামী পরিভাষা উত্তমরূপে রপ্ত না থাকিবার কারণে এবং উহাতে অভ্যস্ত না হইবার কারণে 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি' (أَسْلَمْنَا) কথাটি উত্তমরূপে বলিতে পারিল না। তাহারা তাহাদের প্রচলিত ভাষায় صَبَأْنَا (আমরা ধর্মান্তরিত হইয়াছি) বলিতে লাগিল। কিন্তু খালিদ (রা) (শব্দটির বাহ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অথবা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া) আক্রমণ চালাইলেন এবং তাহাদেরকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন, পরে বন্দীদের এক একজনকে তাহার সহযোদ্ধাদের দায়িত্বে অর্পণ করিলেন। পরের দিন (ভোর রাত্রে) খালিদ (রা) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যিম্মায় অর্পিত বন্দীকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) উহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করিব না এবং আমার সঙ্গীদের কেহই তাহার বন্দীকে হত্যা করিবে না। এই অবস্থায় আমরা মহানবী (স)-এর নিকট পৌঁছিলাম এবং তাঁহাকে সকল বিষয় অবহিত করিলাম। মহানবী (স) তাঁহার দুই হাত উপরে তুলিয়া বলিতে লাগিলেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ "ইয়া আল্লাহ! আমি খালিদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আপনার নিকট দায়মুক্তির আবেদন করিতেছি"। অন্যান্য বর্ণনামতে পরে মহানবী (স) নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের দিয়াত (রক্তপণ) এবং সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিহত কুকুরের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২, মক্কা বিজয়ের আনুষংগিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গ; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৫৩৫; সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৬০৫, বরাত তাফসীর তাবারী, ৩খ., পৃ. ৬৬৫)।

নারী, শিশু, অতিবৃদ্ধ, যাজক, পাদ্রী, সন্যাসী প্রভৃতি হত্যা প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনের যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতে (২ ঃ ১৯১) যুদ্ধবাজ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সীমালংঘন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে وَلَا تَعْتَدُوْا বলিয়া। এই সংক্ষিপ্ত নিষেধাজ্ঞায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নহে এমন যে কোন শ্রেণীর লোককে হত্যার নিষেধাজ্ঞা বিবৃত হইয়াছে। হাদীছে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত নিষেধাজ্ঞার বরাতে মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াতে মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা শুধু সেই সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে যাহারা কোন প্রকারে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে। সুতরাং যুদ্ধে কোন প্রকার ভূমিকা পালনকারী নহে এমন নারী, শিশু, অতি বৃদ্ধ, সংসার বিরাগী, দুনিয়া বিমুখ, নিজ নিজ ধর্মীয় সাধনায় নিমগ্ন রাহিব, পাদ্রী, যাজক, সাধু-সন্যাসী এবং বিকলাংগ, প্রতিবন্ধী ও কাফিরদের অধীনস্ত শ্রমিক-মজদুরদের জিহাদকালে হত্যা করা জাইয নহে (দ্র. তাফসীরে কুরতুবী, ২খ., পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ২২৬; তাফসীরে মাযহারী, ১খ., পৃ. ১৯৭; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৬৯; সীরাতুন্নাবী (উরদু), ১খ., পৃ. ৬০৭)।

ইব্ন উমার (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীছে আছে ঃ মহানবী (স) কোন যুদ্ধাভিযানে একটি নারীর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া উহাতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধে নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪২৩, কিতাবুল জিহাদ; মুসলিম, ২খ., পৃ. ৮৪, ঐ; আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৬২, ঐ; মুআত্তা ইমাম মালিক, পৃ. ১৬৭, কিতাবুল জিহাদ)।

হযরত আবূ বাক্র (রা) সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফ্য়ান (রা) ছিল এই বাহিনীর সেনাপতি। বাহিনীর বিদায়কালে খলীফা আবূ বাক্র (রা) ইয়াযীদের বাহনের পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিলেন এবং তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

انَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوْا اَنَّهُمْ حَبَسُوْا اَنْفُسَهُمْ لِلّٰهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوْا اَنَّهُمْ حَبَسُوْا لَه ... وَانِّىْ مُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَاَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ كَبِيْرًا هَرِمًا وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَتُخْرِبَنَّ عَامِرًا وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا الاَّ لِمَاْكُلَةٍ وَلاَ تُحَرِّقَنَّ نَخْلاً وَلاَ تُفَرِّقَنَّه وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْبُنَ.

"তুমি এমন একদল লোক দেখিতে পাইবে যাহারা নিজদিগকে আল্লাহ্র জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিবার (সংসার বিরাগী যাজক সন্যাসী হইবার) দাবি করিবে। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় থাকিতে দিবে। আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের ওসিয়াত করিতেছি ঃ (১) কোন নারীকে হত্যা করিবে না, (২) কোন শিশু (অপ্রাপ্তবয়স্ক)-কে নয়, (৩) কোন অতি বৃদ্ধকে নয়, (৪) কোন ফলবান গাছ কাটিবে না, (৫) আবাদ অঞ্চলকে অনাবাদ করিবে না, (৬) (সেনাবাহিনীর) খাবারের প্রয়োজন ব্যতীত অহেতুক ছাগল ও উটের পা কর্তন করিবে না, (৭) খেজুর (ফলের) বাগান পোড়াইবে না, (৮) এবং পানিতে তলাইয়া দিবে না, (৯) আত্মসাৎ করিবে না এবং (১০) ভীরুতাও কাপুরুষতা দেখাইবে না" (মুআত্তা ইমাম মালিক, পৃ. ১৬৭, কিতাবুল জিহাদ)।

মোটকথা, শুধু স্বাভাবিক অবস্থায়ই নহে, বরং যুদ্ধ চলাকালেও শত্রু পক্ষীয়দের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে ইহাই ইসলামের সমরনীতি।

মুসলমানদের নিকট শত্রু পক্ষীয়দের নিরাপত্তা প্রার্থনা

কোন মুশরিকের আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হইল ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُوْنَ.

"মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থনে পৌছাইয়া দিবে। কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক" (৯ ঃ ৬)।

অর্থাৎ কেহ আশ্রয়প্রার্থী হইলে আশ্রয় দিতে হইবে। তাহার প্রশ্নাদির জবাব দিয়া তাহার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসন করিতে হইবে। অতঃপর তখনই তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বলা যাইবে না; বরং তাহাকে তাহার পসন্দমত নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করাও মুসলমানদের দায়িত্ব যাহাতে সে চিন্তা-ভাবনা করিয়া ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করিয়া স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে মুসলমান হইতে পারে (দ্র. মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৩১৮; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩৩৭)।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অথবা প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কাফির মুশরিককে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টিকে করা হইয়াছে ব্যাপক ভিত্তিক। হাদীছের গ্রন্থসমূহে হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট সুরক্ষিত তাঁহার সহীফায় উদ্ধৃত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"মুসলমানদের যিম্মাদারি এক ও অভিন্ন। তাহাদের সাধারণ ব্যক্তিও এই যিম্মাদারি গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং ফেরেশতাগণের ও সকল মানুষের" (বুখারী, ১খ., পৃ. ২৫১, ৪৫০, ৪৫১)।

অর্থাৎ কোন কাফিরকে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার একজন অতি সাধারণ মুসলমানেরও রহিয়াছে। রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শুরু করিয়া যে কোন নগণ্য ও সাধারণ মুসলমানও কাহাকেও নিরাপত্তা প্রদান করিলে উহা বৈধ হইবে এবং উহা প্রতিপালন করা সকল মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে। উহার বিরুদ্ধাচরণ বা ভঙ্গ করা মারাত্মক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে। হযরত উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কালে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে স্বাগতম (مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ) জানাইলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হুবায়রার পুত্র অমুককে আশ্রয় দিয়াছি। আমার মায়ের পেটের ভাই আলী বলিতেছে যে, সে তাহাকে হত্যা করিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ "হে উম্মু হানী! তুমি যাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ আমরাও তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫২, ৪৪৯ ও অন্যত্র; আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৩৮০)।

হাদীছ বিশারদ ও ফকীহগণ লিখিয়াছেন, "বিশিষ্ট ও সাধারণ, পুরুষ ও নারী স্বাধীন ব্যক্তি ও মুসলিম বাহিনীতে অবস্থানরত দাস-দাসী, এমনকি বৃদ্ধ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন কোন বালক (مُرَاهِقٌ) -ও কোন অমুসলিমকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করিলে তাহা সমগ্র মুজাহিদ বাহিনী ও মুসলিম জাতির পক্ষে পালনীয় সাব্যস্ত হইবে (দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩১৬,

৩২৩, হাদীছ নং ৩১৭২, ৩১৭৯; হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬৪; বরাত, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, তাবারানী)।

এই হইল নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে অমুসলিমের জান-মাল রক্ষার ইসলামী বিধান। ইসলামের জিহাদ বিধানে নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক ও অলংঘনীয়। যে কোন ভাষায় নিরাপত্তা দেওয়া হউক এবং নিরাপত্তা প্রদানের উক্তি ও ভাষ্য প্রত্যক্ষ হউক অথবা পরোক্ষ হউক উহা দ্বারা নিরাপত্তা প্রদান সাব্যস্ত হইবে এবং উহা লংঘন করিবার অবকাশ থাকিবে না। পারস্য অভিযানরত সেনাবাহিনীর নিকট খলীফা হযরত উমার (রা) এই ফরমান পাঠাইলেন ঃ

وَاِذَا لَقِىَ الرُّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ لاَ تَخَفْ فَقَدْ اٰمَنَهُ وَاِذَا قَالَ مُتَرْسٍ لاَ تَخَفْ فَقَدْ اٰمَنَهُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ الْاَلْسِنَةَ كُلَّهَا.

"যখন কোন (মুসলমান) ব্যক্তি অপর কোন (কাফির) ব্যক্তিকে 'ভয় করিও না বলিল' তখন সে তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিল। অদ্রূপ সে ফারসী ভাষায় 'মুতারশি' (ভয় পাইও না) বলিলে নিরাপত্তা প্রদান করিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল ভাষাই জানেন" (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩১৬-৩১৭)।

তুসতার (تستر) দুর্গ অবরোধের ঘটনায় হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, দুর্গ অবরোধ করা হইলে দুর্গাধিপতি হুরমুযান খলীফা হযরত উমর (রা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আনাস (রা) বলেন, সেনাপতি আবূ মূসা (রা) হুরমুযানকে আমার সঙ্গে খলীফার দরবারে পাঠাইলেন। উমার (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে শুরু করিলে সে নীরবতা অবলম্বন করিল। উমার (রা) বলিলেন, কথা বল। সে বলিল, জীবিত ব্যক্তির কথা অথবা মৃত (মৃত পথযাত্রী) ব্যক্তির কথা? উমার (রা) বলিলেন, تَكَلَّمْ لاَ بَأسَ عَلَيْكَ "কথা বল, তোমার কোন অসুবিধা নাই"। ইহা ছিল উমার (রা)-এর পক্ষ হইতে নিরাপত্তা প্রদান। পরে উমার (রা) হুরমুযানের সহিত যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং তাহার মতামত জানিতে চাহিলেন। অতঃপর উমার (রা) তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিলে আমি বলিলাম, ইহার অবকাশ নাই, আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছেন। উমার (রা) বলিলেন, এই বিষয়ে তোমার সাক্ষী কে? যুবায়র (রা) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে উমার (রা) হুরমুযানকে মুক্ত করিয়া দিলেন (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ২১১; বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৫০, কিতাবুল জিহাদ-এর জিয্য়া ও সন্ধি সংক্রান্ত অধ্যায়)।

এই ঘটনা নিরাপত্তা বিধির ব্যাপকতা ও অলংঘনীয়তার পাশাপাশি সাহাবীগণের সকলের নিকট উহার মর্মবাণী সুস্পষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং শত্রুপক্ষের দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদেরও জীবন রক্ষায় ইসলামের উদার নীতি প্রমাণিত করে। ইহার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে খুন করিবার ও জোর করিয়া মুসলমান বানাইবার অপবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

যুদ্ধ নয় সন্ধি ও অনাক্রমণ চুক্তি এবং আপোষ-রফা

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মূলনীতি, আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলাম কোন আপোষ করে না। এমনকি মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার অবস্থায়ও প্রতিপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব করিলে শুধু অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত খুনাখুনি বন্ধের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণে কোন বিধিনিষেধ ইসলামে নাই এবং প্রতিপক্ষের সন্ধির সুযোগ গ্রহণ ও প্রতারণার আশংকার ক্ষেত্রেও ইসলাম সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি করে না। এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللهُ.

"তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করিবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" (৮ ঃ ৬১-৬২)।

এমনকি কোন কাফির গোত্র সরাসরি চুক্তি ও সন্ধিবদ্ধ না হইয়া, পক্ষে-বিপক্ষে যুদ্ধ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিলে রক্তপাত এড়াইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও ইসলামে নিষিদ্ধ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ اَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ.

"কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকুচিত হয়" (৪ ঃ ৯০)।

ইসলামে সন্ধির বিষয়টি এত ব্যাপক ও উদারতাপূর্ণ যে, সন্ধির শর্তাবলী আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল এবং মুসলমানদের জন্য হেয় প্রতিপন্নকারী হইলেও খুনখারাবী পরিহারের লক্ষ্যে সন্ধিকেই যুদ্ধাপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস ইহার প্রমাণ বহন করে। বিশেষত মক্কার মুশরিকদের সহিত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। সেই মুহূর্তে প্রায় দেড় সহস্র নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ সাহাবী বায়'আতে আবদ্ধ হইয়া (বায়'আতে রিদওয়ান) জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ সংগীন ও নাযুক মুহূর্তে (১) এই বৎসর উমরা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে অর্থাৎ সকলকে ইহরাম ভঙ্গ করিতে হইবে, (২) আগামী বৎসর তীর-তরবারি খাপবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিতে হইবে এবং মাত্র তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে, (৩) মক্কার

কেহ মুসলমান হইয়া মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে, (৪) মদীনার কেহ মক্কায় চলিয়া আসিলে বা সেখানে থাকিতে চাহিলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহাতে বাধা দেওয়া যাইবে না এবং বিসমিল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ শব্দ লিখা যাইবে না,বরং মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এই ধরনের বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ও অপমানজনক শর্তেও সন্ধিতে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছিল। মুসলমানদের মানসিক অবস্থা যে কী হইয়াছিল তাহা এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইহরাম খুলিয়া ফেলিবার ও কুরবানীর পশু যবেহ করিবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে সদাপ্রস্তুত সাহাবীদের একজনও উহাতে সাড়া দিলেন না। অবশেষে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (স)-কেই অগ্রগামী হইয়া প্রথমে মাথা মুণ্ডন করিতে হইল এবং হযরত উমার (রা)-এর মত অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিও বাঁকিয়া বসিলেন এবং সন্ধির শর্তের ব্যাপারে প্রিয়তম রাসূলের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিলেন এই বলিয়া যে ঃ (১) আপনি কি সত্য নবী নহেন? (২) আমরা কি সত্য দীনের উপরে কায়েম নহি এবং আমাদের শত্রুপক্ষ কি বাতিলের উপর নহে? (৩) আমাদের শহীদগণ কি জান্নাতে গমনকারী এবং তাহাদের নিহতগণ কি জাহান্নামবাসী নহে? এই সকল প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (স) হাঁ-সূচক জবাব প্রদান করিলে হযরত উমার (রা) বলিলেন ঃ

فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اِذَنْ.

"তাহা হইলে আমরা কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে এই অবমাননাকর সন্ধি মানিয়া নিব"? এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়াইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৭৩, ৩৭৭-৩৮১, ৪৫১-৪৫২, যথাক্রমে কিতাবুস সুলহ, কিতাবুশ শুরূত ও কিতাবুল জিহাদ)। মূলত রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই বলিয়াছিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِه لاَ يَسْاَلُوْنِى خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتَ اللهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا.

"যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম! তাহারা এমন যে কোন শর্ত দাবি করিবে যাহাতে তাহারা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বিষয়সমূহের মর্যাদা রক্ষা করিবে, আমি তাহাই তাহাদিগকে প্রদান করিব" (বুখারী, ১খ., ঐ)।

উক্ত ঘটনা কি এই প্রমাণ বহন করে না যে, ইসলাম ও মুসলমানদের নিকট যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি এবং রক্তপাত অপেক্ষা আপাত অবমাননাকর সন্ধিই অধিক পসন্দনীয়?

বস্তুত সন্ধি স্থাপনের প্রতি মুসলমানদের এইরূপ নির্দেশের রহস্য এই যে, সন্ধি বাহ্যত ও কাঠামোগত বিচারে জিহাদ না হইলেও প্রকৃতিগতভাবে উহাও জিহাদই বটে। কেননা জিহাদের প্রধান লক্ষ্য— কুফরীর ফিতনা নির্মূল হওয়া এবং সর্বত্র আল্লাহ্‌র দীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া (حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ২ ঃ ১৯৩)।

সন্ধি দ্বারা বিনা রক্তপাতে এই উদ্দেশ্য সহজে ও উত্তমরূপে অর্জিত হইতে পারে। কেননা সন্ধিকালীন সময়ে কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের অপকর্ম ও অপতৎপরতা

বন্ধ রাখিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ খুন করাই জিহাদের লক্ষ্য নয়, বরং দীনের স্বীকৃতি ও বিস্তারই লক্ষ্য।

আল্লাহ তা'আলা কাফির শত্রুর বিপক্ষে প্রতারণা করাও পসন্দ করেন না এবং কাফিরদের বিপক্ষে হইলেও উহা বৈধ হইবে না। তবে অপর পক্ষ হইতে চুক্তি ভঙ্গের অশংকা দেখা দিলে তাহাদের নিকট এই স্পষ্ট ঘোষণা পৌছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ঃ "আমরা ভবিষ্যতে চুক্তি প্রতিপালন করিব না"। কিন্তু এই ঘোষণার ব্যাপারে উভয় পক্ষকে সমান অবস্থানে থাকিতে হইবে। ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করা যাইবে না এবং তাহাদের অপ্রস্তুতির সুযোগ গ্রহণ করাও যাইবে না। ইহাই ইসলামের ইনসাফ ও নীতিপরায়ণতা। বিশ্বাসঘাতকতার আশংকাময় শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া বৈধ নহে। এইভাবেই শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে মুসলমানগণকে বাধ্য করা হইয়াছে (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩২০; মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ২৬৯, বরাত তাফসীরে মাজহারী)।

এই ধরনের চুক্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় ঘটনা সুলায়ম ইব্ন 'আমের (র) সূত্রে বিভিন্ন হাদীছের ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত মু'আবিয়া (রা) রোমকদের সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। চুক্তির মেয়াদকালে তিনি তাহাদের সীমান্তের দিকে সেনাবাহিনী ও রসদপত্র অগ্রসর করিতে চাহিলেন যাহাতে মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ামাত্র শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। সেনাবাহিনী অগ্রসর হইতে শুরু করিবে ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক বৃদ্ধ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন এবং জোরে জোরে এই আওয়ায দিতে লাগিলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءً لاَ غَدْرًا "আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! চুক্তি রক্ষা করিতে হইবে, বিশ্বাসভঙ্গ করা যাইবে না"। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحَلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدُّهَا حَتّٰى يَنْقَضِىَ اَمَدُهَا اَوْ يُنْبَذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ.

"কোন সম্প্রদায়ের সহিত কেহ চুক্তিবদ্ধ থাকিলে(সন্ধি বা অনাক্রমণ চুক্তি) উহা লংঘন করা যাইবে না যতক্ষণ না মেয়াদ সমাপ্ত হয়। অন্যথায় সমভাবে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিবে"। মু'আবিয়া (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, ঘোষণা প্রদানকারী বৃদ্ধ সাহাবী আমর ইব্ন আবাসা (রা)। মু'আবিয়া (রা) তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন যাহাতে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদকালে সেনা প্রেরণের উদ্যোগ প্রতারণারূপে বিবেচিত না হয় (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৩২১; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ২৭০; বরাত আহমাদ (মুসনাদ), আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন হিব্বান; আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৭৯)।

ইসলাম ও সমর বিজ্ঞান

উল্লিখিত নাতিদীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে এই দাবি করা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধ ও সমরাস্ত্রের প্রভাবে বিস্তার লাভ করে নাই, বরং ইসলাম উহার নৈতিকতা, উদারতা ও আদর্শের মাধ্যমেই

বিস্তার লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ ইসলামের মুখ্য বিষয় নহে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ একটি ব্যবস্থা মাত্র। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (স) মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আদর্শ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত করিবার ন্যায় ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রচলিত বর্বরতা ও অমানবকিতায় পরিপূর্ণ যুদ্ধ ও কিতালকেও একটি শান্তিপূর্ণ এবং পরিশীলিত আদর্শের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন যাহাকে সংক্ষেপে ইসলামের সমরনীতি বলা যায়। ইসলাম যুদ্ধের জন্য যেসব মূলনীতি ও বিধিবিধান স্থির করিয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত এবং পক্ষপাতমুক্ত যে কোন বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধানেও আজ পর্যন্ত কেহই ইসলামের সমর নীতির অপেক্ষা অধিক উন্নত ও গ্রহণযোগ্য কোন নীতির ধারণা পেশ করিতে পারে নাই।

জাহিলী যুগের যুদ্ধে কোন নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন ছিল না। উহা ছিল শক্তির লড়াই। দুই শক্তিধরের কে কাহাকে পরাস্ত করিবে ইহার প্রতিযোগিতা। রাজ্যসীমা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্য বিস্তার, দিগ্বিজয়ী বীরের স্বীকৃতি অর্জন অথবা শুধু শক্তি ও ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন ও সম্পদ হরণ ছিল যুদ্ধের লক্ষ্য। আবার সবল কর্তৃক দুর্বলকে বিনাশ করা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া অথবা নিছক খুনের নেশাও যুদ্ধ বাধাইয়া দিত। তাহাদের যুদ্ধ চলিত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া। কোন গোত্রের যে কেহ নিহত হইলে হত্যাকারীর পরিবর্তে সেই গোত্রের যাহাকেই যেখানে পাওয়া যাউক হত্যা করা এবং ইহার পাল্টাপাল্টি হত্যার পর হত্যা চলিতে থাকা এবং ক্রমান্বয়ে উহা গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিয়া উভয় পক্ষের শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কাল চলিতে থাকা ছিল জাহিলী যুগের যুদ্ধের অলিখিত কিন্তু অলঙ্ঘনীয় বিধান। শস্য-ফসলবিহীন মরুদেশে খাদ্যের প্রয়োজন মিটানো ও আর্থিক সংগতি অর্জনের জন্যও যে কোন জনগোষ্ঠীর উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া লুটের মাল সংগ্রহ করা ছিল যুদ্ধের আর একটি উৎস।

মোটকথা, যুদ্ধ শুরু হইবার জন্য প্রয়োজন ছিল না কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণের এবং একবার শুরু হইয়া গেলে পক্ষসমূহের শক্তিশূন্য হওয়া ব্যতীত উহা বন্ধ হইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কখন যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি হইলেও সুযোগ পাওয়া মাত্র উহা ভঙ্গ করাই ছিল রীতি। ইহার সহিত ছিল নিহতদের সহিত বর্বর পৈশাচিক আচরণের প্রতিযোগিতা। সেসব বর্বরতার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি নিম্নরূপঃ (১) যুদ্ধবন্দী যোদ্ধা পুরুষদের সহিত নারী ও শিশুদেরও হত্যা করা হইত, এমনকি আগুনে পোড়ানো হইত; (২) প্রতিপক্ষের ঘুমন্ত বা অসতর্ক অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ, খুন ও লুটতরাজ করা ছিল বাহাদুরী; (৩) শিশুদের তীরন্দাযীর লক্ষ্যবস্তু বানানো; (৪) অংগ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করিয়া ধুকিয়া ধুকিয়া মরিতে দেওয়া; (৫) নিহতের মাথার খুলিতে মদ্যপান করিয়া উল্লাস; (৬) গর্ভবতী নারীর পেট ফাড়িয়া গর্ব করা—এইসব ছিল তখনকার যুদ্ধের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার (সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৫৭৫-৫৮৫; বরাত মাজমাউল আমছাল, পৃ. ৩৪২, ৪৭৭; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৯)।

ইহাতো ছিল সেই সেকেলে ও পশ্চাদপদ যুগের কথা যখনকার লোকেরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জিত বর্বর অসভ্য ছিল বলিয়া বর্তমান যুগের তথাকথিত সুসভ্য লোকেরা দাবি করিয়া থাকেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই আধুনিক সভ্যদের আচরণ আমরা কী দেখিতে পাই— বিগত দুই শতাব্দীতে ইংরেজ বেনিয়াদের উপমহাদেশ দখল ও শাসনের নামে নির্যাতনের করুণ কাহিনী, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব-পরবর্তী বিচারের নামে প্রহসনে গ্রান্ড ট্রাংক রোডের গাছে গাছে এবং ঢাকার বাহাদুরশাহ পার্কের প্রতিটি গাছে বিপ্লবী মুজাহিদবর্গের (যাহাদের অধিকাংশ ছিলেন তৎকালীন বরেণ্য আলিম. মণীষী) ফাঁসীতে ঝুলন্ত, লাল-শ্বাপদ সংকুল মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী আন্দামান- কালা পানিতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর আজীবন নির্বাসন ও বর্বর বন্দী নিপীড়ন, ইংরেজসহ প্রায় সকল ইউরোপীয়দের সারা বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন এবং আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আদম সন্তানদের গরু-ছাগলের ন্যায় বাঁধিয়া জাহাজ ভর্তি করিয়া ক্রীতদাস বানানো কিংবা পশুর ন্যায় বিক্রয় করা; সভ্য জাতির কর্ণধার হিটলার-মুসোলিনীর গ্যাস চেম্বার ইত্যাদি, বুর্জোয়া নিধন ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার শ্রেণী সংগ্রামের নামে লেনিন-স্টালিনের লক্ষ লক্ষ জনতা, বিশেষত মুসলিম হত্যা—এই সবই ইসলামের বিরুদ্ধে 'তরবারির জোরে মুসলমান বানাইবার অপবাদদাতা, সভ্যতার ধ্বজাধারীদের কর্মকাণ্ড। স্পেনে মুসলিম গণহত্যা, জাহাজডুবি ঘটাইয়া এবং নিরাপত্তার অংগীকার করিয়া মসজিদে আবদ্ধ করিয়া জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করিবার নায়ক রাজা ফার্ডিনান্দ ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদে সোচ্চার পশ্চিমা সভ্যদের আর এক নায়ক। ক্রুসেড নামক ধর্মযুদ্ধে মুসলিম গণহত্যার ইতিহাসও বেশী পুরাতন নহে। দুঃখজনকভাবে এই ফিরিস্তি অতি সুদীর্ঘ। ইদানীং কালের বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃতকারী বিশ্বমুক্তির স্বঘোষিত নায়ক, ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যাদানকারী অতি সভ্য (?) আমেরিকার রাজাধিরাজ ও তাহার দোসরদের শুদ্ধি অভিযানের কথা পৃথিবীর সকলের নিকট সুস্পষ্ট। অথচ ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসে এই ধরনের বর্বরতা ও পৈশাচিকতার ক্ষুদ্র পরিমাপের একটি নজিরও দেখানো যাইবে না।

ইসলাম-পূর্ব যুগে দূতদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল না। হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বক্ষণে মক্কায় প্রেরিত মুসলিম দূতের উটটি কুরায়শরা হত্যা করিয়াছিল এবং দূতকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের মত অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) 'দূত হত্যার বিধান নাই, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হইত' বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ইতিহাসবিদগণ মন্তব্য কারিয়াছেন, এই ঘটনার দিন হইতে দূতকে হত্যা না করার আন্তর্জাতিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হইল।

যুদ্ধবন্দীদের সহিত আরবদের বর্বরতার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে অভিন্ন পন্থার অনুসারী ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম বন্দীদের সহিত পশুর ন্যায় আচরণ করিত। আল্লামা ইব্ন জুবায়র ক্রুসেড যুদ্ধকালে তাহার ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় লিখিয়াছেন ঃ

وَمِنَ الْفَجَائِعِ الَّتِيْ يُعَا يِنُهَا مَنْ حَلَّ بِلاَدَهُمْ اَسْرى الْمُسْلِمِيْنَ يَرْسُفُوْنَ فِى الْقُيُوْدِ وَيُصْرَفُوْنَ فِى الْخِدْمَةِ الشَّاقَّةِ وَالاَسِيْرَاتُ الْمُسْلِمَاتُ كَذٰلِكَ فِى سُوْقِهِنَّ خَلاَخِيْلُ الْحَدِيْدِ تَتَفَطَّرُ لَهُمُ الاَفْئِدَةُ.

"ঐ সকল অঞ্চলে দেখা মর্মান্তিক বিষয়সমূহের অন্যতম ছিল ডাণ্ডাবেড়ি পরিহিত মুসলিম বন্দীগণ, যাহাদের কঠোর শ্রমে বাধ্য করা হইত। এমনকি মুসলিম নারী বন্দীদের পায়েও ছিল ডাণ্ডাবেড়ি। সেই দৃশ্য দেখিয়া কলিজা বিদীর্ণ হয়" (ইব্ন জুবায়রের ভ্রমণ কাহিনী, লাইডেন ১৫০৭ খৃ. মুদ্রিত, পৃ. ৩০৭)।

প্রতিপক্ষের বন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণ

বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কড়া নির্দেশ ছিল যেন তাহাদের খাদ্য-পানীয়ের সামান্য কষ্টও না হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, মুসলমানগণ তাহাদের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও নিজেরা খেজুর খাইতেন এবং বন্দীদের খাদ্য (রুটি) খাওয়াইতেন। বদরের যুদ্ধবন্দীদের সকলের জন্য নূতন পোশাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হুনায়নের ছয় সহাস্রাধিক বন্দীকে একযোগে মুক্তি দেওয়া হইল এবং ইব্ন সা'দের বর্ণনামতে তাহাদিগকে ছয় হাজার সেট (মিসরীয়) পোশাকও দেওয়া হইল।

দানবীর হাতিম তাঈ-এর কন্যা বন্দী হইলে সম্মানের সহিত মসজিদের এক কোণে তাহার অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইল এবং (হাতিম তাঈর ন্যায় ব্যক্তির কন্যাকে বন্দী করিয়া রাখা যায় না এই যুক্তিতে) অবিলম্বে তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, যাহা পরবর্তীতে তাহার ভাই আদী ইব্ন হাতিমের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল। বন্দীদের সহিত মুসলমানদের সন্তোষজনক আচরণের কারণে পবিত্র কুরআনে সাহাবীগণের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ·

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে" (৭৬ ঃ ৮)।

প্রচলিত যুদ্ধে আর একটি গর্হিত বিষয় ছিল— কোন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনাকালে সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনও দুর্বিসহ করিয়া দেওয়া, তাহাদের স্বাধীন চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং জনতা ও পথচারীদের সম্পদ লুটপাট করা। কোন এক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রচলিত পন্থায় সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে এবং লুটতরাজ করিতে শুরু করিলে মহানবী (স) এক ব্যক্তিকে জনতার মধ্যে এই ঘোষণা প্রদানের জন্য পাঠাইলেন ঃ

اِنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً وَقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

"যে মানুষের ঘরবাড়ীকে সংকুচিত করিবে এবং লুটতরাজ করিবে তাহার জিহাদ কবুল হইবে না" (আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ৩৫৫)।

এই কারণেই মুসলিম বাহিনী কোথাও ছাউনী স্থাপন করিলে সকলে একত্রে কাছাকাছি অবস্থান করিত যেন সম্পূর্ণ বাহিনী একটি ছাউনীর নিচে অবস্থান করিতেছে (আবূ দাউদ, ঐ)।

গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য হারাম ছিল, কিন্তু এই উম্মতের জন্য হালাল করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাহাবীগণের গনীমতের মালের প্রতি আকর্ষণ থাকাও স্বভাবিক ছিল। এই কারণে ইসলাম ধীরে ধীরে তাহাদের অন্তর হইতে গনীমতের আকর্ষণ বিদূরীত করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে গনীমতকে مَتَاعُ الدُّنْيَا (পার্থিব সম্পদ, ভোগ্য পণ্য) বলিয়া উহার প্রতি অনীহা স্পষ্ট করা হইয়াছে। বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ প্রাপ্তির (অথবা গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ার) নিন্দা করিয়া অবতীর্ণ হইল ঃ

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ.

"তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর,আল্লাহ চাহেন আখিরাতের কল্যাণ" (৮ ঃ ৬৭)। উহুদ যুদ্ধে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হওয়ার পরিণতিতে অর্জিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হইল ঃ

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ.

"তোমাদের মধ্যে কতক লোক দুনিয়া চাহিতেছিল এবং কতক আখিরাত চাহিতেছিল" (৩ ঃ ১৫২)।

হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আল্লাহর পথে জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির দুনিয়ার কিছু সম্পদ প্রাপ্তির বাসনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, لاَ اَجْرَ لَهُ সে ছওয়াব পাইবে না। অন্যরা তাহার নিকট এই বিষয়টি শুনিলে তাহাদের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হইল এবং তাহারা বলিল, তুমি তাঁহার কথার মর্ম বুঝিতে পার নাই। তাহারা তাহাকে বিষয়টি বুঝিবার জন্য বারবার পাঠাইলে তৃতীয়বারেও 'সে ছওয়াব পাইবে না' বলা হইলে তাহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল (আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ৩৪২)। অপর এক হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কেহ গনীমতের জন্য যুদ্ধ করে, কেহ যুদ্ধ করে সুনাম-সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে, কেহ বাহাদুরি প্রদশর্নের উদ্দেশ্যে, কেহ গোত্রপ্রীতি ও ক্ষোভ নিরসনের উদ্দেশ্যে। কাহার যুদ্ধ আল্লাহ্‌র পথে বলিয়া বিবেচিত হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমা সমুন্নত হওয়ার জন্য যুদ্ধ করিবে শুধু উহাই আল্লাহর পথে হইবে (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব আল্লাহ্র কলেমা সমুন্নত হওয়ার জন্য জিহাদ; মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ২খ., পৃ. ১৪০ বাব -ঐ)। একটি হাদীছে বিষয়টি আরও স্পষ্ট রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيْبُوْنَ الْغَنِيْمَةَ الاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اَجْرِهِمْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ يَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَاِنْ لَّمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ.

"যে কোন মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং গনীমত লাভ করে, তবে তাহারা (যেন) তাহাদের ছওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ গ্রহণ করিল এবং এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য (আখিরাতে) অবশিষ্ট রহিল। আর গনীমত লাভ না করিয়া থাকিলে তাহাদের ছওয়াব পূর্ণ হইল" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪০, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ঃ যুদ্ধে গনীমাত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ছাওয়াব; আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ঃ সারিয়্যা সংক্রান্ত)।

অর্থাৎ গনীমত মুখ্য নহে এবং গনীমতের অনীহা সৃষ্টিই ছিল লক্ষ্য। সাহাবায়ে কিরাম ক্রমান্বয়ে এই উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথার্থরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাবূক যুদ্ধকালে সাহাবী ওয়াছিলা ইব্নুল আসকা' (রা)-এর নিকট উট ও সমরোপকরণ ছিল না। তিনি মদীনায় এইরূপ ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি বাহন দিবে সে প্রাপ্ত গনীমতে সমান অংশীদার হইবে ঘোষণা শুনিয়া জনৈক আনসারী সাহাবী তাহার বাহন ও রশদপত্র প্রদানে সম্মত হইলেন। যুদ্ধশেষে ওয়াছিলা (রা) গনীমত বাবদ প্রাপ্ত উট আনসারী সাহাবীর নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, শর্ত অনুযায়ী আপনি এই উটের অংশীদার। তিনি বলিলেন, উটগুলি আপনিই নিন, আমার উদ্দেশ্য ছিল জিহাদের ছওয়াবে অংশগ্রহণ করা (আবূ দাউদ, ২খ., কিতাবুল জিহাদ, বাব ঃ অংশীদারিত্বের শর্তে জিহাদে উট ভাড়া দেওয়া)।

মোটকথা, আমূল সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত খুন-খারাবী, রাজ্য ও সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বর্বরতা ও পৈশাচিকতার অবসান ঘটাইয়া যুদ্ধকে ইসলাম একটি পবিত্র ইবাদতে পরিণত করিয়াছে। আল্লাহ্র কলেমা বুলন্দ করিবার মাধ্যমে তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সম্পদ ও জীবন কুরবান করা এবং প্রয়োজনে ইসলামের বিধান মুতাবিক আল্লাহর দুশমনদিগকে হত্যা করাই মূল লক্ষ্য। ইহাতে গনীমত প্রাপ্তি ঘটিলে উহা অতিরিক্ত হিসাবে আল্লাহর ফযল ও মেহেরবানী। তদুপরি উহা লুটের মাল নহে যে, যাহার যেমন ইচ্ছা ভোগ করিবে, বরং উহার জন্যও রহিয়াছে সুস্পষ্ট বন্টন বিধি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

"আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের" (৮ ৪১)।

অবশিষ্টাংশ পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে বিধি মুতাবিক বণ্টিত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম (বিশেষভাবে সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা, আনফাল, তাওবা, হজ্জ, আহযাব, মুহাম্মাদ ইত্যাদি) (২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, তাফসীরে কাবীর, দারুত্-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (৩) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তাফসীরে তাবারী, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন ১৩৯৮/১৯৭৮; (৪) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), দার ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৩৭২/১৯৫২; (৫) ঐ লেখক, মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, আল-হাইআতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ, মিসর, ১৯৭৭; (৬) আল্লামা আলূসী আল-বাগদাদী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন, তা.বি./দারু ইহ্য়াইত-তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি.; (৭) আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, দারুল কুরআনিল কারীম, বৈরূত, লেবানন ১৪০২/১৯৮১; (৮) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, আত্-তাফসীরুল মাজহারী, নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লী ১৩৯৭/১৯৭৭; (৯) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, বায়ানুল কুরআন, মাক্তাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, তা.বি.; (১০) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, কুমিল্লা, তা.বি.; (১১) আবূ বাক্র আমহাদ ইব্ন আলী আর-রাযী আল-জাস্সাস, আহ্কামুল কুরআন, দারুল ফিক্র, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (১২) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, আহকামুল কুরআন, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান, তা.বি.; (১৩) আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত লিগারীবিল কুরআন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (১৪) ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, দারুল মা'আরিফ; (১৫) সহীহুল বুখারী, বিশেষত ১খ., কিতাবুল জিহাদ, ২খ., কিতাবুল মাগাযী, আসাহ্হুল মাতাবি', ২য় মুদ্রণ, করাচী, পাকিস্তান ১৩৮১/১৯৬১; (১৬) সহীহ মুসলিম, বিশেষত ১খ., কিতাবুল ঈমান, ২খ., কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল ইমারা, আসাহহুল মাতাবি'/কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, দিল্লী ১৩৭৬ হিজরী; (১৭) সুনানু আবী দাউদ, ১-২খ., কিতাবুল জিহাদ, মাতবাআতুর রশীদিয়া, দিল্লী, তা.বি.; (১৮) সুনানুন নাসাঈ, আল-মাতবাআতুর রশীদিয়া, দিল্লী, তা.বি.; (১৯) জামে তিরমিযী, ১খ., আবওয়াবুল জিহাদ, কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, দিল্লী, তা.বি.; (২০) সুনানু ইব্ন মাজা, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউপি, ভারত ১৩৮১ হি.; (২১) মুসনাদ ইমাম আহমাদ, বায়তুল আফকার, রিয়াদ ১৪১৯/১৯৯৮; (২২) মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, আশরফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, তা.বি.; (২৩) সুনানুল বায়হাকী, দারুল মারিফা, বৈরূত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ,

দাক্ষিণাত্য, ভারত ১৩৫২ হি.; (২৪) আলাউদ্দীন আলী বুরহানপুরী, কানযুল উম্মাল, মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী, হালাব (আলেপ্পো), ১ম মুদ্রণ, ১৩৮৯/১৯৬৯; (২৫) মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, দারুল মা'আরিফ, দক্ষিণাত্য, ভারত ১৩৫৪ হি.; (২৬) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (৬খ., ১খ.), দারুর রায়্যান লিত-তুরাছ, ২য় মুদ্রণ, কায়রো, মিসর ১৪০৭/১৯৮৭; (২৭) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখ তাবারী, মাতবা'-ই-হুসাইনিয়া, মিসর তা.বি.; (২৮) আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল, দারুস সালাম, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৩; (২৯) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪১২/১৯৯১; (৩০) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন ১৩৯৩/১৯৭৩; (৩১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, লেবানন ১৩৮৮/১৯৬৮; (৩২) আল্লামা ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩খ), মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১২/১৯৯২; (৩৩) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (সীরাতে ইব্ন হিশাম), শিরকাতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় মুদ্রণ, মিসর ১৩৭৫/১৯৫৫; (৩৪) ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪০৭/১৯৮৭; (৩৫) আল্লামা ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৩; (৩৬) আল্লামা শিবলী নুমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্নাবী (১খ., ৪খ., ৫খ), সা'ঈদ এন্ড সন্স, করাচী, পাকিস্তান, তা.বি.; (৩৭) কিরমানী, মাজমা'উল আমছাল। ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহ ঃ (৩৮) যায়নুদ্দীন ইব্ন নুজায়ম, আল-বাহরুর রাইক, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত, লেবানন ১৪১৯/১৯৯৮; (৩৯) আলাউদ্দীন আবূ বাক্র ইব্ন মাসউদ আল-কাসানী, আল-বাদাই' ওয়াস-সানাই', মাকতাবা-ই যাকারিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত ১৪১৯/১৯৯৮; (৪০) আল্লামা যায়নুল আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররিল মুখতার (ফাতাওয়া শামী), দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী/ মুআস্সাসাতুত তারীখিল আরাবী, বৈরূত, লেবানন ১৪১৯/১৯৯৮; (৪১) ফাতাওয়া আলামগীরী, দারুল কুতুব, বৈরূত, লেবানন; মাকতাবা-ই যাকারিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি.; (৪২) ই. ফা. বা., ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬ খ. (জিহাদ শিরোনাম)।

মুহাম্মদ ইসমাইল

জিহাদের ফযীলাত, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

যে কোন বিষয়ের মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং উহার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে। জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেহেতু অতি মহান তাই উহার ফযীলাত ও গুরুত্বও অতি অধিক। জিহাদ ইসলামের একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হাদীছের ভাষায়, "জিহাদ ইসলামের শীর্ষচূড়া"। সাধারণ পরিস্থিতিতে উহা ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ফরযে 'আয়ন। আল-কুরআন ও আল-হাদীছের বর্ণনামতে জিহাদের সমতুল্য কোন ইবাদত নাই (বুখারী, হাদীছ নং ২৭৮৫)। জিহাদ হইতে পলায়ন কবীরা গুনাহ (৮ ঃ ১৫-১৬; মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৪)। জিহাদে অংশগ্রহণ বিহীন বা উহার নিয়াতবিহীন মৃত্যু মুনাফিকী মৃত্যুতুল্য (মুসলিম, ইমারা, হাদীছ নং ১৫১৭, ১৯১০; আবূ দাঊদ, জিহাদ)। জিহাদে কাফিরদিগকে হত্যা ও তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন (৮ ঃ ১৭)। জিহাদে মুসলমানদের পক্ষে ফেরেশতাগণের আগমন (৩ ঃ ১২৪-১২৫; ৮ ঃ ৯-১০), প্রতিটি জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্তরিক বাসনা এবং নবী-রাসূলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ করিয়া শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদনের প্রতি তাঁহার প্রবল বাসনা ইত্যাকার বহুবিধ বিষয়সহ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত জিহাদের বিশাল ও অপরিসীম সওয়াব, বিশেষত শহীদগণের অকল্পনীয় মর্যাদা ও সুখ-শান্তির বিবরণ জিহাদের সুমহান ফযীলাত, মাহাত্ম্য ও উহার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এবং তাহার দেহ-মন তথা যাবতীয় শক্তি ও বুদ্ধি এবং সকল সম্পদ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া নি'আমত ও পবিত্র আমানত। এই আমানতের সর্বোত্তম ব্যবহার হইল আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করিবার প্রয়াসে উহার নির্ভেজাল, সামগ্রিক ও সর্বাত্মক ব্যবহার এবং এই ব্যবহারই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। বিশাল ও অপরিসীম ফযীলাতের কারণেই প্রত্যক্ষ জিহাদে জীবন কুরবান করিবার সর্বোচ্চ ফযীলাতের পাশাপাশি উহার পূর্বাপর বিষয়সমূহ, পূর্বপ্রস্তুতি, যাবতীয় উপকরণ, রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ, নিয়াত ও সদিচ্ছা সহকারে প্রস্তুতিমূলক যে কোন কার্যক্রম ফযীলাতের আওতাভুক্ত হইয়াছে। জীবন দানের ধারায় জিহাদে যে কোন প্রকার আঘাতও ফযীলাতসম্পন্ন। তদ্রূপ মুজাহিদদের সহায়তা প্রদান, তাহাদিগকে যুদ্ধোপকরণ প্রদান এবং মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়িঘর ও পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর রাখা, দেখাশুনা করা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানও জিহাদের ফযীলাতে অংশীদার হিসাবে পরিগণিত।

জিহাদের গুরুত্ব ঃ মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করিয়া তাহাদেরকে সার্বিক কষ্ট সহ্য করিতে অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে এবং মু'মিনদিগকে উহাতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহা জিহাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত করে। যেমন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .....

"তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট উহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যাহা অপসন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর...." (২ ঃ ২১৬)।

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ الاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"সুতরাং তুমি (হে নবী) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর" (৪ ঃ ৮৪)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ.

"হে নবী! মুমিনদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর" (৮ ঃ ৬৫)।

জিহাদের জন্য সদা ও সার্বিক প্রস্তুতি রাখিবার, বিশেষ পরিস্থিতিতে সদলবলে জিহাদে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং জিহাদ অভিযানের ব্যাপারে কোন প্রকার অনীহা বা শিথিলতা প্রদর্শন তিরস্কার করা হইয়াছে এবং কখনও হুমকি দেওয়া হইয়াছে। যেমন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا.

"হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও" (৪ ঃ ৭১)।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

"তোমরা তাহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে, এতদ্দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাহাদিগকে জানেন। আল্লাহ্র পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না" (৮ ঃ ৬০)।

বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, যুদ্ধাস্ত্র ও সমরোপকরণ যুগোপযোগীরূপে প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং পবিত্র কুরআনের 'যথাসাধ্য শক্তি' সর্ববিধ সাজসরঞ্জাম,

অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রিক সামরিক প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে (মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ২৭২)। মৃত্যুভীতি সম্পর্কে ভর্ৎসনা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ.

"বল, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল তাহারা অবশ্যই নিজেদের মৃত্যুস্থানে বাহির হইত" (৩ ঃ ১৫৪)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَّقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لاَ اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً. اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক এবং বলিতে লাগিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না? বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তাহার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমন কি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করিলেও" (৪ ঃ ৭৭-৭৮)।

قُلْ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لاَّ تُمَتَّعُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"বল, পলায়নে তোমাদের কোন লাভ হইবে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর। তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই পার্থিব সুখ ভোগ করিতে দেয়া হইবে" (৩৩ ঃ ১৬)।

এই সকল ভর্ৎসনা, কঠোর নির্দেশ ও উদ্বুদ্ধকরণ জিহাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। যেমন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ. اِلاَّ تَنْفِرُوْا

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ..... اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর। যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। ... তোমরা অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে" (৯ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪১)।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"বল তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না" (৯ ঃ ২৪)।

জিহাদ ও অন্যান্য দীনী কর্মে অর্থব্যয়ে অনীহার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে ঃ

هٰاَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ.

"দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করিতেছে। যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন। অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না" (৪৭ ঃ ৩৮)।

জিহাদ না করাকে ধ্বংস ও আত্মহননের শামিল সাব্যস্ত করা হইয়াছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

"তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না" (২ ঃ ১৯৫)।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, জিহাদ বর্জন করিয়া নিজেদের ধ্বংস করিবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে। আবূ ইমরান আসলাম (র) বলেন, কুস্তুনতুনিয়া (কন্স্টান্টিনোপল/ ইস্তাম্বুল) অবরোধকালে জনৈক মুহাজির শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া একাকী তাহাদের সারি ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিল। আমাদের সঙ্গে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-ও ছিলেন। লোকেরা বলিতে লাগিল, লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। তখন আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলিলেন, তোমরা এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাক (অর্থাৎ যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়া ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া নয়)। আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। আমরা মদীনার আনসাররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গ ও সান্নিধ্য দিয়াছিলাম এবং সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছিলাম। এক সময় ইসলাম বিস্তার লাভ করিল এবং উহার সাহায্যকারীদের সংখ্যা অধিক হইল। তখন আমরা আনসাররা একটি প্রীতি বৈঠকে আলোচনা করিলাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে সঙ্গদান ও তাঁহার সাহায্য করিবার সুযোগ প্রদানে আমাদিগকে ভাগ্যবান করিয়াছেন। আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতে তাঁহাকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলাম। এখন তো যুদ্ধ উহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আমরা আমাদের বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার ও ধন-সম্পদের সংস্কারে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্বন্ধে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল করিলেন। সুতরাং ধ্বংসের অর্থ ছিল জিহাদ বর্জন করিয়া বাড়ি-ঘর ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নিমগ্ন হওয়া (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ২২৮-২২৯; তাফসীরে মাজহারী, ১খ., পৃ. ২০০; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৪৭২-৪৭৪)।

যুদ্ধ হইতে পলায়ন গুরুতর অপরাধ যাহা জাহান্নাম অবধারিত করে (দ্র. ৮ ঃ ১৫-৬)। এই বিধান জিহাদের অপরিসীম গুরুত্ব নির্দেশ করে। হাদীছে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকে ধ্বংসাত্মক বিষয় ও নিকৃষ্টতম কবীরা গুনাহের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তোমরা ধ্বংসাত্মক সাত বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সাহাবীগণ বলিলেন, সেই সাত বিষয় কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা..... যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা" (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৪)। অর্থাৎ ইহাকে শিরকের ন্যায় নিকৃষ্টতম পাপের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে জিহাদের বায়'আতকে আল্লাহ্র হাতে বায়'আত সাব্যস্ত করা, মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনাকে সরাসরি আল্লাহর পরিচালনা সাব্যস্ত করা

এবং জিহাদে ফেরেশতাগণের অংশগ্রহণ উহার সবিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলাত নির্দেশ করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দেন" (৪৮ ঃ ১০)।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

"তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মু'মিনদিগকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৮ ঃ ১৭)।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে; তখন তিনি তোমাদিগকে জবাব দিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যাহারা একের পর এক আসিবে। আল্লাহ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৮ ঃ ৯-১০; আরও দ্র. ৮ ঃ ৫০; ৩ ঃ ১২৪-৬)।

মু'মিনের জিহাদ আল্লাহ্‌র পথে এবং নির্যাতিত অসহায় নারী-পুরুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে। আর কাফিরদের যুদ্ধ তাগূত ও শয়তানের পথে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

"তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ— যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও। তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর। যাহারা মু'মিন তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহার তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল" (৪ ঃ ৭৫-৭৬)।

জিহাদের ফযীলাত ও সুফল

আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত লাভ, আল্লাহর সন্তুষ্টি মানব জীবনের চূড়ান্ত সফলতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সূত্র ও উপায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। জিহাদে অংশগ্রহণ করিবার পর জীবন ও গনীমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদ এবং শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদ উভয়ের জন্য রহিয়াছে অপরিসীম সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি। তবে শহীদের জন্য রহিয়াছে অতি সমুন্নত মর্যাদা, অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয় সুখ শান্তির অংগীকার।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে, তাহারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু" (২ ঃ ২১৮)।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে, যাহা তাহারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া অবশ্যই উহা অপেক্ষা শ্রেয়" (৩ ঃ ১৫৭)।

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করুক এবং কেহ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবই" (৪ ঃ ৭৪)।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

"অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে আমি তাহাদের পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট" (৩ ঃ ১৯৫)।

জিহাদ মু'মিনের সফলতার চাবিকাঠি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে জিহাদ কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার" (৫ ঃ ৩৫)।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, "এই আয়াতে প্রথমত আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বন এবং ঈমান ও নেক আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের হিদায়াত দানের পরে "তাঁহার পথে জিহাদ কর" ইরশাদ করিয়াছেন। ইহার মর্ম এই যে, জিহাদ নেক আমলের তালিকাভুক্ত অন্যতম সৎকর্ম। জিহাদের স্থান অতি উর্ধ্বে তাহা বুঝাইবার জন্য স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাকাতি, লুটতরাজ ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের মাধ্যমে যে খুনখারাবী ও সম্পদ লুণ্ঠন সংঘটিত হয় উহা শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। জিহাদে নরহত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হইলে উহাতে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্‌র কলেমা সমুন্নত করা এবং পৃথিবীর বুক হইতে জুলুম-নির্যাতন নির্মূল করা (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৩খ., পৃ. ১২৮: তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৫৩-৫৪)।

জিহাদ প্রকৃত ঈমানের মাপকাঠি

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (হিজরতকারী মুজাহিদগণকে) আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত মুমিন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা" (৮ ঃ ৭৪)।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই জিহাদের উদ্দেশ্য। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তাহারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম। উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাহাদের জন্য আছে স্থায়ী সুখ-শান্তি" (৯ ঃ ২০-২২)।

জিহাদের মাধ্যমে মাগফিরাত লাভ হয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হইতেছে ঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাহাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" ১৬ ঃ ১১০)।

জিহাদের জানমাল উৎসর্গ করিবার ফযীলাত এবং যথাসময়ে ব্যয়ের সবিশেষ গুরুত্ব ও মাহাত্ম বর্ণিত হইয়াছে। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করে তাহারা পরস্পর সমান নহে। যাহারা স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৪ ঃ ৯৫-৯৬; আরও দ্র. ৫৭ ঃ ১০)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পদসমূহ দৃঢ় করিবেন" (৪৭ ঃ ৭)।

মু'মিনের জীবন ও সম্পদ বিক্রীত বটে; আল্লাহ ইহার ক্রেতা এবং ইহার নিনিময় তাঁহার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। বিক্রীত পণ্য সমর্পণের পদ্ধতি জিহাদে ধন ও প্রাণ উৎসর্গীত করা। কাজেই মু'মিনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন ব্যয় এবং নগণ্য ও বড় যে কোন দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত। যেমন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে" (৬১ ঃ ১০-১৪)!

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন তাহাদের জীবন ও সম্পদ, ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য জান্নাত রহিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে এবং নিহত হয়। তাওরাত ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং উহাই তো মহাসাফল্য" (৯ ঃ ১১১)।

পবিত্র কুরআনের আরও বহু আয়াতে জিহাদের বিভিন্ন ফযীলাতের বিবরণ রহিয়াছে। বিশেষত জিহাদে জীবন উৎসর্গকারী শহীদের ফযীলাত বর্ণিত হইয়াছে উচ্চাংগ অনুপম ধারায়।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

"আল্লাহ্র পথে যাহারা নিহত হয় তোমরা তাহাদিগকে, মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না" (২ ঃ ১৫৪; আরও দ্র. ৩ ঃ ১৬৯-৭১)।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্র পথে, অতঃপর নিহত হইয়াছে অথবা মারা গিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা" (২২ ঃ ৫৮)।

বস্তুত শহীদগণ অমর ও আনন্দময় জীবনের অধিকারী হন। তাঁহাদের জীবন মান ও আনন্দের পরিধি ও ধরন অন্যদের ঈর্ষার বিষয়। হাদীছে ইহার বিশদ বিস্তৃত বিবরণ আছে।

হাদীছে জিহাদের ফযীলাত ও মাহাত্ম্য

সর্বোত্তম আমল ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলিলেন, "যথাসময়ে সালাত আদায় করা"। আমি বলিলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলিলেন, "পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাহাদের প্রতি সদাচরণ। আমি বলিলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ১, হাদীছ নং ২৭৮২)।

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, "সেই মু'মিন ব্যক্তি যে তাহার সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ১, হাদীছ নং ২৭৮৬; মুসলিম ২খ., পৃ. ১৩৬)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন,

من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار عليه يبتغى القتل او الموت مظانه.

"জীবন যাপনে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম অবস্থার অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রাখে (সদা প্রস্তুত থাকে), উহার পিঠে উড়িয়া চলে, যখনই শত্রুদলের আগমনের আওয়াজ কিংবা ভীতিকর ধ্বনি শুনিতে পায় তখন সে উহার পিঠে উড়িয়া যায় এবং জীবননাশ ও মৃত্যুর ক্ষেত্রসমূহ খুঁজিতে থাকে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩৬; নববীর ব্যাখ্যাসহ)।

জিহাদের সমতুল্য আমল ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে জিহাদের সমতুল্য কোন আমল বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ আমি তাহা দেখিতেছি না। পরে তিনি বলিলেন, তুমি কি এইরূপ করিতে পারিবে যে, যখন মুজাহিদ বাহির হইয়া যায় তখন তুমি তোমার মসজিদে (সালাতের স্থানে) প্রবেশ করিবে, অতঃপর

বিরতিহীনভাবে সালাতে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং সিয়াম পালন করিবে, ইফতার করিবে না" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ১, হাদীছ নং ২৭৮৫)?

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহরা (প্রশ্নকারীরা) উহা করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলে প্রতিবারে তিনি (স) বলিলেন, لا يستطيعوه তৃতীয়বারে বলিলেন ঃ

مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلوة حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله تعالى.

"আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের অবস্থা সেই সিয়াম পালনকারী, ইবাদাতে দণ্ডায়মান, আল্লাহ্র আয়াতসমূহ (তিলাওয়াত ও) প্রতিপালনকারীর ন্যায় যে আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদ প্রত্যাগমন পর্যন্ত সালাত, সিয়াম ও ইবাদাতে বিরতি দেয় না" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩৪; বুখারী, হাদীছ নং ২৭৮৭)।

জিহাদের ফযীলাত ধাপে ধাপে

আল্লাহ্র পথে জিহাদের এক সকাল বা বিকাল ঃ হযরত আবূ আয়্যুব, সাহ্ল ইব্ন সা'দ, আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

لغدوة فى سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها.

"আল্লাহ্র পথে জিহাদের একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল দুনিয়া ও ইহার অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম"। অপর বর্ণনায় আছে ঃ "আল্লাহ্র পথে এক সকাল অথবা এক বিকাল যাহার উপর সূর্য উদিয় হয় ও অস্তমিত হয় তাহার চাইতে উত্তম" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৫, ৬, হাদীছ নং ২৭৯২, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৬; মুসলিম, ২খ., ১৩৪, পৃ. ১৩৫)।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্ন হাজার একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন যাহাতে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাহিনী রওয়ানা হইয়া গেলে ইব্ন রাওয়াহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এক ওয়াক্ত সালাতে উপস্থিত থাকিবার উদ্দেশ্যে কিছু সময় বিলম্ব করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ

والذى نفسى بيده لو انفقت ما فى الارض ما ادركت فضل غدوتهم.

"যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম! সমগ্র পৃথিবীতে যাহা আছে উহা ব্যয় করিলেও তুমি তাহাদের এক সকালের ফযীলাত আহরণ করিতে পারিবে না"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র পথের এক সকাল বা এক বিকাল দুনিয়া হইতে উত্তম হওয়ার অর্থ দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা হইতেও উত্তম (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৮)।

জিহাদে প্রহরীর দায়িত্ব পালন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان فى الحراسة كان فى الحراسة وان كان فى الساقة كان فى الساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع.

"অতিশয় সৌভাগ্যবান সেই বান্দা যে আল্লাহ্র পথে তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিতে থাকে। তাহার মাথা উস্কো-খুস্কো, দুই পা ধুলি মাখা। তাহাকে প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হইলে সে প্রহরায় নিয়োজিত থাকে, বাহিনীর পশ্চাদভাগে দায়িত্ব দেওয়া হইলে পশ্চাদভাগেই দায়িত্ব পালনে নিবেদিত থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কাহারও জন্য সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৭০, হাদীছ নং ২৮৮৭)।

সাহ্ল ইব্নুল হানজালিয়া (রা) হইতে বর্ণিত ঃ হুনায়ন (হাওয়াযিন) যুদ্ধকালে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) নৈশ প্রহরার দায়িত্ব পালনের আহবান জানাইলে আনাস ইব্ন আবূ মারছাদ গানাবী (রা) এই দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে গিরিপথে অবস্থান করিয়া সতর্কতার সহিত প্রহরার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন। সারা রাত্রি প্রহরার দায়িত্ব পালনের পর সকালে তিনি ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ আজ রাত্রে কি তুমি নিচে নামিয়াছিলে? আনাস বলিলেন, সালাত ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত নহে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি (জান্নাত) অবধারিত করিয়া লইয়াছ। সুতরাং ইহার পর তুমি আর কোন (নফল) আমল না করিলেও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না (আবূ দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ৩৩৮, ৩৩৯)।

رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.

"আল্লাহ্র পথে এক দিনের জন্য (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত প্রহরা দেওয়া দুনিয়া ও তাহাতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৭৩, হাদীছ নং ২৮৯২)।

সালমান (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله واجرى عليه رزقه وامن الفتان.

"এক দিন ও এক রাত্রের সীমান্ত প্রহরা এক মাসের সিয়াম পালন ও ইবাদতে রাত্রি জাগরণ হইতে উত্তম। তাহার মৃত্যু হইলে সে যে কাজ করিতেছিল তাহার নামে উহা অব্যাহত থাকিবে ও তাহার জন্য রিযিক বরাদ্দ থাকিবে এবং তাহাকে বিপদে নিক্ষেপকারীদের হইতে নিরাপত্তা দেওয়া হইবে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪২)।

ফাদালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

كل الميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمو له عمله الى يوم القيامة وامن فتان القبر.

"সকল মৃত ব্যক্তির (আমলের) পরিসমাপ্তি ঘটিবে কিন্তু সীমান্ত প্রহরী; তাহার আমল কিয়ামত পর্যন্ত পাইতে থাকিবে এবং কবরে বিপদগ্রস্তকারী (মুনকার-নাকীর) হইতে নিরাপদ থাকিবে" (আবূ দাঊদ, ১খ., কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৩৩৮)।

জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনও জিহাদে গমনের সমতুল্য ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, قفلة كغزوة "(যুদ্ধ হইতে) প্রত্যাবর্তন (অথবা পুনঃ অভিযানে গমন) জিহাদ অভিযানের ন্যায়" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ৩৩৬)।

মুজাহিদের মর্যাদার স্তরসমূহ ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

من امن بالله وبرسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد فى سبيل الله او جلس فى ارضه التى ولد فيها.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করিবে, সালাত কায়েম করিবে, রমযানের সিয়াম পালন করিবে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য হইয়া যাইবে। সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক অথবা যে ভূমিতে তাহার জন্ম হইয়াছে সেইখানে বসিয়া থাকুক"। তাহারা বলিল, আমরা লোকদিগকে (এই) সুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিব কি? তিনি বলিলেন ঃ

ان فى الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض .....

"নিশ্চয় জান্নাতে এক শতটি মর্যাদার স্তর রহিয়াছে যাহা মহান আল্লাহ তাঁহার পথের মুজাহিদগণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার প্রতি দুই স্তরের মধ্যকার ব্যবধান আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৪, হাদীছ নং ২৭৯০, ৭৪২৩)।

মুজাহিদের পায়ের ধুলি ঃ অবদুর রহমান ইব্‌ন জাব্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله (ساعة من النهار) فتمسه النار.

"কোন বান্দার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে গমন করার ফলে ধুলিমাখা হইলে আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না" (বুখারী, হাদীছ নং ২৮১; জিহাদ বাব ১৬; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩৬)।

আল্লাহ মুজাহিদের যামিন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد فى سبيله وتصديق كلمته بان يدخله الجنة او يرجعه الى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمة.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁহার পথে জিহাদ করা ও তাঁহার কলেমার প্রতি বিশ্বাসই তাহাকে তাহার বাড়ী হইতে বাহির করে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ এই যামানত গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা তাহাকে তাহার প্রাপ্ত সওয়ার ও গনীমতসহ তাঁহার সেই নিবাসে পৌঁছাইয়া দিবেন যেখান হইতে সে বাহির হইয়াছিল" (মুসলিম, ২খ., জিহাদ, পৃ. ১৩৩)।

আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ثلثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيا فى سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفهاه فيدخله الجنة او يرده مما نال من اجر او عنيمة.

"তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে গাযী (মুজাহিদ)-রূপে বাহির হইল সে আল্লাহর দায়িত্বে— তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা তাহার প্রাপ্ত সওয়াব ও 'গনীমতসহ (তাহার বাড়িতে) ফিরাইয়া আনিবেন" (আবূ দাঊদ, ১খ., জিহাদ, পৃ. ৩৩৭)।

মুজাহিদের নিদ্রাও জাগরণ সমতূল্য ঃ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "যুদ্ধাভিযান দুই প্রকার। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করিল, নেতার আনুগত্য করিল, প্রিয় সম্পদ ব্যয় করিল, সংগীর সহিত সহজ আচরণ করিল এবং মন্দ কর্ম হইতে আত্মরক্ষা করিল তাহার নিদ্রা ও জাগরণ সবই সওয়াব" (আবূ দাঊদ, জিহাদ, ১খ., ৩৪১)।

মুজাহিদের দু'আ কবুলের নিশ্চয়তা ঃ সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "দুইটি দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা অতি অল্পই প্রত্যাখ্যাত হয়। (এক) আযানের সময় দু'আ এবং (দুই) যুদ্ধ চলাকালে যখন একে অপরকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে থাকে" (আবূ দাঊদ, জিহাদ, ১খ., পৃ. ৩৪৪)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বনূ লিহ্‌য়ান অভিমুখে বাহিনী প্রেরণের সময় বলিলেন ঃ "প্রতি দুইজনের মধ্য হইতে একজন যুদ্ধে যাইবে এবং সওয়াব তাহাদের মধ্যে সম্মিলিত হইবে" (মুসলিম, ইমরা, ২খ., পৃ. ১৩৮)।

মুজাহিদের পরিবারস্থ নারীদের মর্যাদা ঃ বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامة.... وقال فخذ من حسناته ما شئت فالتفت الينا رسول الله ﷺ فقال فما ظنكم.

"বাড়ীতে অবস্থানকারীদের দায়িত্বে জিহাদে গমনকারী নারীদের মর্যাদা তাহাদের মায়েদের মর্যাদার ন্যায়। বাড়িতে অবস্থানকারী যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারের দেখাশুনা করিল এবং তাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া (মুজাহিদকে) বলা হইবে, তুমি তাহার আমল হইতে তোমার যাহা মন চায় নিয়া নাও। এই কথা বলিবার সময় রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের দিকে দৃষ্টি প্রদান করিয়া বলিলেনঃ তোমাদের কী ধারণা যে, এইরূপ সুযোগ দেওয়া হইলে সে কি করিবে (এবং মুজাহিদ পরিবারের নারীর মর্যাদা কত উচ্চ)" (মুসলিম, ২খ., ১৩৮; আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ৩৩৮)।

জিহাদের অভিযানকালে সাধারণ মৃত্যুও শাহাদাততুল্য

আনাস (রা)-এর খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন আমাদের এখানে দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরে তিনি হাসিমুখে জাগ্রত হইলে আমি বলিলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন। আপনার হাসিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোকের দৃশ্য আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হইয়াছে যাহারা এই মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ তরংগের উপর আরোহণ করিবে, তাহারা যেন সিংহাসনে সমাসীন রাজা-বাদশাহ। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং পূর্বানুরূপ করিলেন। উম্মু হারাম (রা)-ও পূর্বানুরূপ বলিলে তিনি পূর্বানুরূপ জবাব দিলেন। উম্মু হারাম বলিলেন, আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি প্রথম দলে। পরবর্তী কালে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে প্রথম (মুসলিম) নৌবাহিনীর অভিযানকালে উম্মু হারাম (রা) তাঁহার স্বামী 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সহিত অভিযানে বাহির হইলেন। অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা শামে অবস্থান করিলেন। এই সময় তাঁহার আরোহণের জন্য একটি জন্তুযান তাঁহার নিকট লইয়া আসা হইল। তিনি জন্তুযানে উঠিবার সময় উহা তাঁহাকে ফেলিয়া দিলে উহাতে তিনি ইনতিকাল করিলেন (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ২৭৯৯-২৮০০, ২৮৭৭-২৮৭৮; মুসলিম, ২খ., ১৪১, ১৪২)।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

من لقى الله بغير اثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة.

"যে ব্যক্তি জিহাদের কোন প্রকার আলামত ব্যতীত আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থি হইবে সে নিজের মধ্যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা সহকারে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থি হইবে" (তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ২০০)।

জিহাদের ধুলি, জিহাদের চিহ্ন ও রক্তবিন্দু ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন,

لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم.

"আল্লাহ্‌র ভয়ে যে ব্যক্তি ক্রন্দন করিয়াছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরিয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র পথের ধুলিকণা ও জাহান্নামের ধুয়া একত্র হইবে না" (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯৬-১৯৭)।

আবূ উমামা (রা) সূত্রে নবী (স) বলিয়াছেন ঃ

ليس شيئ احب الى الله من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق فى سبيل الله واما الاثران فاثر فى سبيل الله واثر فى فريضة من فرائض الله.

"দুইটি ফোঁটা ও দুইটি চিহ্নের ন্যায় অন্য কিছু আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় নহে। (১) আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রুর ফোঁটা এবং (২) আল্লাহ্‌র পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। চিহ্ন দুইটি (১) আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের) চিহ্ন (দাগ) (২) এবং আল্লাহর (অন্যান্য) ফরযসমূহের কোন ফরয পালনের চিহ্ন" (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২০০)।

জিহাদের উপকরণ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসলূল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف.

"জানিয়া রাখ! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে" (বুখারী, জিহাদ, বাব ২২, হাদীছ নং ২৮১৮, ২৮৬৬)।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

بعثت بين يدى الساعة مع السيف وجعل رزقى تحت ظل رمحى.

"আমি কিয়ামতের পূর্বক্ষণে প্রেরিত হইয়াছি তরবারি সহকারে এবং আমার রিযিক রাখা হইয়াছে আমার বর্শার ছায়াতলে" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৮৮; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১১৬)।

উকবা ইব্‌ন আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারের উপরে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمى الا أن القوة الرمى الا ان القوة الرمى.

"তোমরা তাহাদের (শত্রুদের) মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখিবে যথাসাধ্য শক্তি" (৮ ঃ ৬০)। শুনিয়া রাখ! শক্তি হইল তীরন্দাযী (দূর নিক্ষেপক অস্ত্র), শক্তি হইল তীরন্দাযী , শক্তি হইল তীরন্দাযী" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪৩; কিতাবুল ইমারা)। উকবা ইব্ন 'আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه.

"অচিরেই বহু এলাকা তোমাদের জন্য বিজিত হইবে এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবেন। তবে তোমাদের কেহ যেন তাহার তীর ছুড়িতে অপারগ না হয়" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪৩)।

উকবা ইব্ন 'আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

ان الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامى به ومنبله (والممد به) ارموا واركبوا ولان ترموا احب الى من ان تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الاّ رميه بقوس وتاديبه فرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق .

"মহান আল্লাহ একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন ঃ (১) তীর নির্মাতা, যে উহা নির্মাণে কল্যাণ ও সওয়াবের উদ্দেশ্য রাখে, (২) তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) তীরের ফলা সরবরাহকারী। মুসলমানের সকল ক্রীড়া বাতিল তিনটি ব্যতীত, (১) তীর-ধনুক দ্বারা ক্রীড়া (প্রশিক্ষণ), (২) ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও ঘোড়দৌড় এবং (৩) স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক। এইগুলি সঠিক ও যথার্থ" (তিরমিযী, ১খ., ফাদাইলুল জিহাদ, পৃ. ১৯৭; আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ৩৪০, জিহাদ)। আবূ দাউদের বর্ণনায় আরও আছে,

من ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة تركها او كفرها (فليس منا او عصى - مسلم).

"যে ব্যক্তি তীরন্দাযী শিখিবার পরে উহাতে অনীহা দেখাইয়া উহা বর্জন করিল সে অবশ্য একটি নিআমত বর্জন করিল অথবা উহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল"। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "সে আমাদের দলভুক্ত নহে অথবা অবাধ্যতা দেখাইল" (আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ৩৪০; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১০৭)।

আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার, উরওয়া ইব্নুল জা'দ, আনাস ইব্ন মালিক (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন,

الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم.

"ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ সম্পৃক্ত রহিয়াছে ঃ সওয়াব ও গনীমত" (বুখারী, ১খ., কিতাবুল জিহাদ, বাব ৪৩-৪৪, মানাকিব, বাব ২৮, হাদীছ নং ২৮৪৯, ২৮৫০, ২৮৫১, ৩১১৯, ২৮৫২, ৩৬৪৩, ৩৬৪৪, ৩৪৫; মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, ২খ., পৃ. ১৩২; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ২০২)।

জিহাদে গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরের গুরুত্বঃ জাবির (রা) বলেন, "আহযাব (খন্দক) যুদ্ধকালে (এক রাত্রে) রাসূলুল্লাহ (স) আহবান করিলেন, শত্রুদের সংবাদ কে লইয়া আসিতে পারে? যুবায়র (রা) বলিলেন, আমি। নবী (স) পুনরায় একই কথা জিজ্ঞাসা করিলে এবারও যুবায়র (রা) বলিলেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী) থাকে, আমার হাওয়ারী হইল যুবায়র" (বুখারী, জিহাদ, হাদীছ নং ২৮৪৬, ২৮৪৭, ২৯৯৭, ৩৭১৯, ৪১১৩, ৭২৬১)।

জিহাদে হতাহত হওয়া ও শাহাদাতের ফযীলাত ঃ জুনদুব ইব্ন সুফয়ান (রা) হইতে বর্ণিত। কোন অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আংগুল আহত হইয়া রক্ত বাহির হইলে তিনি বলিলেন ঃ

هل انت الا اصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت.

"তুমি তো একটি অংগুলি মাত্র, তুমি রক্তরঞ্জিত হইয়াছ; তুমি যাহা কিছু ভুগিয়াছ তাহা আল্লাহ্র পথেই" (বুখারী, জিহাদ, বাব ৯, হাদীছ নং ২৮০২)।

যখমের রক্তে মিশকের সুঘ্রাণ ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম! আল্লাহ্র পথে যে কোন ক্ষত ও যখম হইবে, আল্লাহ্ই সমধিক অবগত যে, কে তাঁহার পথে যখম হইল, কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হইবে যখম হওয়ার সময়ের (তাজা ক্ষত) অবস্থায়। উহার বর্ণ হইবে রক্তের, কিন্তু ঘ্রাণ হইবে মিশকের" (বুখারী, জিহাদ, বাব ১০, হাদীছ নং ২৮০৩; মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩৩)।

শহীদ হওয়ার বাসনা ঃ আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

طلب الشهادة صادقا اعطيها لولم يصبه.

"যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করিবে সে উহা অর্জন না করিলেও তাহাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা হইবে" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, ২খ., পৃ. ১৪১)।

সাল ইব্ন হুনায়ফ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه.

"যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্র নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করিবে সে তাহার বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করিলেও আল্লাহ তাহাকে শহীদগণের মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দিবেন" (মুসলিম, ঐ, ২খ., পৃ. ১৪১)।

জান্নাতে শহীদগণের বাসস্থানঃ সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন (মি'রাজের ভ্রমণ প্রসঙ্গে) ঃ

رأيت الليلة رجلان اتيانى فصعدا بى الشجرة وادخلانى دارا هى احسن وافضل لم ار قط احسن منها قال اما هذه فدار الشهداء.

"আজ রাত্রে আমি দেখিলাম, দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিল এবং আমাকে গাছটিতে (সিদরাতুল মুনতাহা) আরোহণ করাইল এবং আমাকে এমন একটি নিবাসে প্রবেশ করাইল যাহা সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম। উহার চাইতে সুন্দর আমি কখনও দেখি নাই। সে বলিল, এই নিবাস হইল শহীদগণের" (বুখারী, জিহাদ, বাব ৪, হাদীছ নং ২৭৯১)।

শাহাদাত গুনাহ মিটাইয়া দেয় ঃ আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান শ্রেষ্ঠ আমল হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্র পথে নিহত হইলে আমার সমস্ত গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হইবে কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

نعم ان قتلت فى سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فان جبرئيل عليه السلام قال لى ذلك.

"হাঁ, যদি তুমি আল্লাহ্র পথে নিহত হও এবং তুমি সবরকারী, একনিষ্ঠ ও অগ্রগামী হও, পশ্চাদগামী না হও, ঋণ ব্যতীত। জিবরীল (আ) আমাকে ইহা বলিয়াছেন" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩৫)।

শহীদগণের ছয়টি বৈশিষ্ট্য ঃ মিকদাম ইব্ন মা'দীকারিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

للشّهيد عند الله ست خصال يغفرله فى اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفّع فى سبعين من اقاربه.

"শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট রহিয়াছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য ঃ (১) প্রথম মুহূর্তেই (প্রথম রক্তবিন্দু পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার জান্নাতের নিবাস দেখাইয়া দেওয়া হয়, (২) কবরের আযাব হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, (৩) মহাসংকট (হাশরের বিভীষিকা) হইতে সে নিরাপদ থাকে, (৪) তাহার মাথায় এমন একটি মুকুট পরানো হয় যাহার এক একটি মুক্তা দুনিয়া ও উহাতে বিদ্যমান সব কিছু হইতে উত্তম, (৫) আয়তলোচনা সুন্দরী রূপবতী হূর-এর সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয় এবং

(৬) তাহার সত্তরজন আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাহার সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়" (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯৯-২০০)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

والذى نفس محمد بيده لولا ان يشقّ على المسلمين ما قعدت خلف سريّة تغزو فى سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعة فاحملهم ولا يجدون سعة فيتبعونى ويشق عليه (ولا تطيب انفسهم) ان يّتخلفوا عنى ولو خرجت ما بقى احد فيه خير الاّ انطلق معى وذلك يشقّ علىّ وعليهم والذى نفس محمد بيده لوددت انى (اغزو فى سبيل الله) اقتل فى سبيل الله ثم احيا (ثم اغزو) ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل.

"যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁহার কসম! বিষয়টি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর না হইলে আমি অবশ্যই কখনও আল্লাহ্র পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতাম না। কিন্তু আমার নিকট সেই সামর্থ্য নাই যে, তাহাদের (সকলকে) বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিব এবং তাহাদেরও এই সামর্থ্য নাই যে, তাহারা (নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া) আমার অনুগামী হইবে। আর আমার সহিত শরীক হইতে না পারিলে তাহারা মনক্ষুণ হইবে। এই অবস্থায় আমি বাহির হইয়া পড়িলে যাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভাল আছে তেমন কেহই আমার সহিত রওয়ানা না হইয়া থাকিবে না, অথচ উহা আমার জন্য এবং তাহাদের জন্য কঠিন। যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁহার কসম! আমার তো পরম বাসনা হয় যে, আল্লাহ্র পথে (যুদ্ধ করিব এবং উহাতে) শহীদ হই, পুনরায় আমাকে জীবিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং আমি পুনরায় (যুদ্ধ করিয়া) শহীদ হইব; পুনরায় জীবিত হইব, পুনরায় শহীদ হইব" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৭, হাদীছ নং ২৭৯৭; মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩৩-১৩৪; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ২১)।

শহীদগণের আত্মা, তাহাদের নব জীবন ও জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণঃ মাসরূক (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-কে আয়াত

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমরা এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ "তাহাদের আত্মাগুলি সবুজ বর্ণের পাখীর দেহাভ্যন্তরে থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের দেহ ও কায়াকে সবুজ পাখীর আকৃতি দেওয়া হইবে)। তাহাদের জন্য রহিয়াছে আরশের সহিত ঝুলন্ত ঝাড়। তাহারা জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়ায়, অতঃপর সেই সকল ঝাড়ে অবস্থান করে। একবার আল্লাহ তাহাদিগকে বিশেষ দর্শন দান করিয়া বলিলেন, তোমরা কোন কিছুর বাসনা প্রকাশ কর। তাহারা বলিল, আমরা তো জান্নাতের যেই স্থানে আমাদের ইচ্ছা হয় ঘুরিয়া বেড়াই, তাই আমরা আর কিসের বাসনা করিব? তিনি তাহাদের সহিত তিনবার এইরূপ করিলেন। যখন তাহারা দেখিল যে, কিছু একটা আবদার না করিরে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না তখন তাহারা বলিল, হে পালনকর্তা! আমরা চাই যে,

আপনি আমাদের রূহগুলি আমাদের দেহে ফিরাইয়া দিবেন এবং আমরা পুনরায় আপনার পথে শাহাদাত বরণ করিব। যখন আল্লাহ দেখিলেন যে, তাহাদের কোনও চাহিদা নাই তখন তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল" (মুসলিম, ২খ., কিতাবুল ইমারা, পৃ. ১৩৫-১৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) পরিচালিত জিহাদের সংখ্যা

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কাফির-মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অথবা পূর্বাহ্নেই তাহাদের সম্ভাব্য আক্রমণ পরিকল্পনা নস্যাত করিবার জন্য জিহাদ পরিচালনা করেন। বিষয়াভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও হাদীছ বিশারদগণ তাঁহার সমরাভিযানসমূহকে দুইটি মৌলিক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (এক) 'গাযওয়া' অর্থাৎ সেই সকল যুদ্ধাভিযান যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচালনা ও সেনাপতিত্বে জিহাদ পরিচালিত হইয়াছে। (দুই) 'সারিয়্যা' অর্থাৎ যেই সকল অভিযানে তিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন নাই, বরং কোন সাহাবীকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া অভিযানে প্রেরণ করিয়াছেন । কখনও মূল অভিযান গাযওয়ার পরিপুরক ও আনুষঙ্গিক অংশরূপে কোন ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করা হইত। ইহার উদ্দেশ্য হইত কোন অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, কোন ক্ষুদ্র গোত্রকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা অথবা কোন মন্দির, প্রতিমা, অপসংস্কৃতির ধারক কোন ভাস্কর্য, স্মারক স্তম্ভ প্রভৃতি ধ্বংস করা। এই ধরনের ক্ষুদ্র বাহিনীকেও সারিয়্যা অথবা বা'ছ (بعث) বলা হয়।

অভিযানবিদগণের মতে এক শত হইতে সর্বোচ্চ পাঁচ শত সদস্যবিশিষ্ট সেনাবাহিনীকে সারিয়্যা বলা হয়। ইবনুস সিককীত হইতে ইব্ন হাজার আসকালানীর একটি বর্ণনায় পাঁচ হইতে তিন শত পর্যন্ত সংখ্যাবিশিষ্ট বাহিনীকে সারিয়্যা বলে। খালীল (অভিধান ও ব্যাকরণবিদ) বলিয়াছেন, চারি শত এর মত। কামূস গ্রন্থে আছে, সারিয়্যার চূড়ান্ত সংখ্যা চার শত, সারিয়্যা (মূল বাহিনী) হইতে পৃথককৃত ক্ষুদ্র দলকে বা'ছ বলে। সুতরাং বা'ছ হইল এক শত হইতে উহার নিম্নের সংখ্যা। কাহারও মতে দশ-এর কম সংখ্যক হইলে উহা বা'ছ। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কোন বিশেষ ও গোপন অভিযানে প্রেরিত এক, দুই, তিনজনকেও বা'ছ নামে অভিহিত করা হইয়াছে (দ্র. ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৩-২২৫; ঐ, মুকাদ্দিমা; যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ৯খ., পৃ. ৩৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২০২, টীকা)।

গাযওয়ার সংখ্যা

বুখারী শরীফে ও তিরমিযী শরীফে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর বর্ণনায় এবং মুসলিম শরীফে যায়দ ইব্ন আরকাম, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, বুরায়দা (রা) প্রমুখের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাযওয়ার সংখ্যা উনিশ উল্লিখিত হইয়াছে। আবূ ইয়ালা জাবির (রা) হইতে গাযওয়ার সংখ্যা একুশ বলিয়াছেন। মুহিব্ব আত-তাবারী খুলাসাতুল ইসতী'আব কিতাবে ২২ সংখ্যা হওয়ার মতকে যথার্থ বলিয়াছেন। আবদুর রায্যাক (মুসান্নাফে) সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হইতে

'চব্বিশ' বর্ণনা করিয়াছে। হাফিজ আবদুল গনী আল-মাকদিসী পঁচিশ সংখ্যা প্রসিদ্ধ হওয়ার দাবি করিয়াছেন এবং বর্ণনাটি ইব্ন ইসহাক, মূসা ইব্ন উকবা ও আবূ মা'শার প্রমুখ সীরাতবিদগণের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াছেন। আল-মাওরিদে হাফিজ আবদুল গনী মাকদিসীর এই বর্ণনা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক হইতে তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য যিয়াদ আল-বাককাঈর বর্ণনায় গাযওয়ার সংখ্যা ছাব্বিশ। এই ক্ষেত্রে তিনি ইব্ন সা'দ (তাবাকাত)-এর বর্ণনাকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ তাঁহার শিক্ষক মুহাম্মাদ ইব্ন উমার ইব্ন ওয়াকিদ আসলামী (যিনি ওয়াকিদী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) হইতে এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, মূসা ইব্ন উকবা ও আবূ মা'শার প্রমুখের মতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিয়াছেন এমন গাযওয়ার সংখ্যা সাতাশটি। কেহ কেহ এই সংখ্যা উনত্রিশ বলিয়াছেন। পরবর্তী সীরাত গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিকগণ ইব্ন সা'দের বর্ণনাকেই গ্রহণ করিয়াছেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৬৩, ৬৪২; মুসলিম, কিতাবুস সিয়ার, ২খ., পৃ. ১১৮; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৫৭; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৩-২২৫; যুরকানী, ১খ., পৃ. ৩৮৮-৩৮৯; সুবুলুল হুদা, ৩খ., পৃ. ৮; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ২; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৬-২৯৮)।

ইবনুল জাওযী, দিময়াতী, ইরাকী, সুহায়লী, ইব্ন কাছীর, ইব্ন হাজার প্রমুখ মনীষি ইব্ন সা'দ-এর সাতাইশ সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন বর্ণনায় সংখ্যার তারতম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনকল্পে বলিয়াছেন, পূর্বসূরী বিশেষজ্ঞ সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাদের বর্ণনায় নিজ নিজ অবগতি ও নিজের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। চূড়ান্ত সংখ্যা উল্লেখ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং উহার অবগতি লাভের অবকাশও তাঁহাদের জন্য সীমিত ছিল। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ পূর্বসূরী সকলের বর্ণনা একত্র ও সমন্বিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং পূর্বাপর গাযওয়া তালিকা বিন্যস্ত করিয়া সংখ্যা নিরূপণে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, কোন কোন সাহাবী প্রথম দিকের গাযওয়ার সময় স্বল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে উহাতে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং উহার বিবরণ তাঁহাদের অবগতিতে সংরক্ষিত ছিল না। তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে একই সমরাভিযানে দুইটি গাযওয়া সংঘটিত হওয়ায় অথবা কোন বৃহৎ গাযওয়া হইতে ফিরতি পথে অপর একটি গাযওয়া সংঘটিত হওয়ায় অথবা অল্প দিনের ব্যবধানে কাছাকাছি সময়ে দুইটি গাযওয়া সংঘটিত হওয়ায় অনেকে সেই দুইটিকে একটি গণনা করিয়াছেন। এইসব কারণে গাযওয়ার সংখ্যা সাতাশ হইতে কমিয়া ছাব্বিশ, বাইশ বা একুশ হইয়াছে। যেমন সুহায়লী বলিয়াছেন, খায়বার যুদ্ধের সন্নিকট সময়ে (ফিরতি পথে) ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ইব্ন ইসহাক হইতে বাক্কাঈর বর্ণনায় গাযওয়ার সংখ্যা ছাব্বিশ বলা হইয়াছে। সুহায়লী আরও বলিয়াছেন, যাহারা গাযওযার সংখ্যা সাতাশ-এর কম গণনা করিয়াছেন তাঁহারা মূলত ঐগুলির কোন কোনটি অপরটির অতি সন্নিকটে হওয়ার কারণে এইরূপ করিয়াছেন। যেমন (১) বুওয়াত (বা ওয়াদ্দান) ও আবওয়া গাযওয়াদ্বয় কাছাকাছি সময়ে (১ম হিজরী বর্ষের সফর ও রাবীউল আওয়াল মাসে) সংঘটিত হওয়ার কারণে এই দুইটিকে অভিন্ন গণনা করা

হইয়াছে। (২) উহুদ যুদ্ধ সমাপ্তির সাথে সাথে সংঘটিত হওয়ার কারণে হামরাউল আসাদকে উহার সহিত একীভূত করা হইয়াছে। (৩) খন্দকের পরপরই এবং খন্দকে ইয়াহূদীদের বিশ্বাসভংগের পরিণতিতে বনূ কুরায়জার গাযওয়া সংঘটিত হওয়ার কারণে এই দুইটিকে অভিন্ন গণনা করা হইয়াছে। (৪) হুনায়ন হইতে ফিরিবার পথে তাইফ অবরোধ হওয়ার কারণে হুনায়ন ও তাইফকে একটি গণনা করা হইয়াছে (দ্র. যুরকানী, ১খ., পৃ. ৩৮৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ১০)।

গাযওয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকা

ইউসুফ সালিহীর বর্ণনা অনুসারে গাযওয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ ঃ (১) গাযওয়াতুল আবওয়া যাহা ওয়াদ্দান নামেও পরিচিত, (২) গায়ওয়া বুওয়াত, (৩) কুরয ইব্‌ন জাবিরের সন্ধানে গাযওয়া সাফ্‌ওয়ান, যাহা প্রথম বদর নামেও পরিচিত, (৪) গাযওয়া আল-'উশায়রা, (৫) গাযওয়া বদর আল-কুবরা বা প্রসিদ্ধতম বদর যুদ্ধ, (৬) কুদ্‌র অঞ্চলে গাযওয়া বানূ সুলায়ম, যাহা কারকারাতুল কুদর নামেও পরিচিত, (৭) গাযওয়া আস-সাবীক (ছাতুর যুদ্ধ), (৮) গাযওয়া গাতাফান, যাহা গাযওয়া যী আমর নামেও পরিচিত, (৯) হিজাযের বুহ্‌রান অঞ্চলে গাযওয়া আল-ফুর' (১০) গাযওয়া বনূ কায়নুকা, (১১) প্রসিদ্ধ গাযওয়া উহুদ, (১২) গাযওয়া হামরাউল আসাদ, (১৩) গাযওয়া বনূ নাযীর , (১৪) গাযওয়া বদর বা (উহুদ যুদ্ধশেষে ঘোষিত বদরের শেষ যুদ্ধ), (১৫) গাযওয়া দূমাতুল জানদাল, (১৬) গাযওয়া বানুল মুসতালিক যাহার অপর নাম আল-মুরায়সী, (১৭) গাযওয়া খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ বা আহ্‌যাব যুদ্ধ, (১৮) গাযওয়া বনূ কুরায়যা, (১৯) গাযওয়া বনূ লিহ্‌য়ান, (১০) গাযওয়া হুদায়বিয়া, (২১) গাযওয়া যীকারাদ, (২২) গাযওয়া খায়বার, (২৩) গাযওয়া যাতুর রিকা যাহা গাযওয়া মুহারিব বা বনূ ছা'লাবা নামেও অভিহিত, (২৪) গাযওয়া উমরাতুল কাদা, (২৫) গাযওয়া আল-ফাত্‌হ (মক্কা বিজয়) (২৬) গাযওয়া হুনায়ন (হাওয়াযিন/ আওতাস), (২৭) গাযওয়া তাইফ, (২৮) গাযওয়া তাবূক, এইগুলির সময়কাল ও ক্রমবিন্যাসে মুহাদ্দিছ ও সীরাত রচয়িতাগণ কিছু পূর্বাপর করিয়াছেন (সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ২/৪খ., পৃ. ৬০৮; সুবুলুল হুদা, ৩খ., পৃ. ৮; আল-বিদায়া, ৫খ., পৃ. ২৩৬; ৪খ., পৃ. ২৯৬, টীকা নং ২)। নয়টি গাযওয়ায় প্রত্যক্ষ লড়াই সংঘটিত হয়। ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন হায্‌ম, কাসতাল্লানী, ইবনুল আছীর প্রমুখ বলিয়াছেন, নয়টি গাযওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন ঃ (১) বদর (২) উহুদ, (৩) খন্দক, (৪) বনূ কুরায়যা, (৫) বনূ মুসতালিক (মুরায়সী), (৬) খায়বার, (৭) ফাতহ মক্কা (মক্কা বিজয়), (৮) হুনায়ন ও (৯) তাইফ। কোন কোন বর্ণনামতে বনূ নাযীর যুদ্ধেও লড়াই হইয়াছে। ইহা ছাড়া ওয়াদিল কুরা ও আলগাবাকেও প্রত্যক্ষ লড়াই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কেহ কেহ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংঘটিত গাযওয়ার সংখ্যা আট বলিয়াছেন। তাহাদের কেহ খন্দক ও বনূ কুরায়যাকে, কেহ খায়বার ও ওয়াদিল কুরাকে এবং কেহ হুনায়ন ও তাইফকে অভিন্ন গণনা করিয়াছেন। নববীর মতে, মক্কা বিনা যুদ্ধে বিজিত হওয়া সংক্রান্ত ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অভিমতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মক্কা বিজয় এই তালিকা হইতে বাদ পড়িবে। সুতরাং সংখ্যা

আটটি থাকিবে (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৮; আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১২; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৫৭; সুবুলুল হুদা, ৩খ., পৃ. ৮-৯)। তবে এইসব যুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি উহাতে সরাসরি তীর-তরবারি ও অস্ত্র পরিচালনা করিয়াছেন। বরং ইহার অর্থ এই যে, এইসব যুদ্ধে তাঁহার সাহাবীগণ (রা) ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের মধ্যে আঘাত-প্রত্যাঘাত সংঘটিত হইয়াছিল। আর অবশিষ্ট গাযওয়াসমূহে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (স) শুধু উহুদ যুদ্ধে পার্শ্বের এক মুজাহিদ সাহাবীর নিকট হইতে একটি বল্লম হাতে নিয়া উহা দ্বারা (তাঁহার পূর্ব ঘোষণা বাস্তবায়নে) উবাই ইব্‌ন খালাফকে মৃদু আঘাত করিয়াছেন, যাহা উবাই-এর জন্য অসহনীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। তবে হাদীছে একথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা কোন সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইলে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স) আক্রমণের সূচনা করিতেন। মনীষীদের মতে ইহার অর্থ প্রতীকি, সূচনা ও আক্রমণ শুরুর আদেশ প্রদান (শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৩৮৮; বরাত ফাতহুল বারী, সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৯)।

এই সকল গাযওয়ার মধ্যে প্রধান গাযওয়া ছিল সাতটি ঃ (১) বদর, (২) উহুদ, (৩) খন্দক, (৪) খায়বার, (৫) মক্কা বিজয়, (৬) হুনায়ন ও (৭) তাবূক। এই সকল গাযওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা ও আয়াত নাযিল হইয়াছে। যেমন বদর সম্পর্ক সূরা আল ইমরানের ৩ ঃ ১২১ আয়াত হইতে প্রায় সূরার সমাপ্তি পর্যন্ত। খন্দক ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে সূরা আহযাব-এর প্রারম্ভ অংশ; বনূ নাযীর সম্পর্কে সূরা হাশর, হুদায়বিয়া ও খায়বার সম্পর্কে সূরা ফাত্‌হ। এই সূরায়ই পরবর্তী মক্কা বিজয়ের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে এবং সূরা নাসর-এও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তাবূক প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা রহিয়াছে সূরা তাওবায় (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ., ৯-১০; অন্যান্য হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহ)।

সারিয়্যার সংখ্যা

ইহার সংখ্যা গণনায় কেহ কেহ শুধু শত্রুর মুকাবিলা করিবার জন্য প্রেরিত বাহিনীকে সারিয়্যা তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, কেহ বাণিজ্যিক কাফেলার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী দলকেও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন এবং কেহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রেরিত অতি ক্ষুদ্র দল, এমনকি এক ব্যক্তি অভিযানকেও সারিয়্যা তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। এই কারণেই সারিয়্যার সংখ্যা নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে। কাতাদা (র) হইতে হাকেমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা তেতাল্লিশটি বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া হাকেম বলিয়াছেন যে, সম্ভবত কাতাদা ইহা দ্বারা শুধু সারিয়্যার সংখ্যাই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আল-বিদায়ায় ইব্‌ন কাছীর এই মন্তব্য করিয়াছেন, কাতাদা হইতে ইমাম আহমাদের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা তেতাল্লিশ; চব্বিশটি বা'ছ (সারিয়্যা) এবং উনিশটি গাযওয়া (সম্ভবত কাতাদা শত্রুদলের প্রতিরোধ ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রেরিত অতি অল্প সংখ্যার দলগুলি হিসাব করেন নাই)। সুতরাং হাকেমের মন্তব্য যথাযথ নহে।

ইব্ন ইসহাক বলিয়াছেন, সারিয়্যা ও বা'ছ আটত্রিশটি। আবূ উমার ইব্ন 'আবদুল বারর আল-ইসাতী'আব-এর ভূমিকায় সাতচল্লিশটি বলিয়াছেন। ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাত গ্রন্থে পূর্বসূরীদের উদ্ধৃতিতে সাতচল্লিশ বলিয়াছেন। আবুল ফাত্হ 'উয়ূনুল আছার-এ ইব্ন ইসহাক , ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ প্রমুখের বরাতে সাতচল্লিশটি বলিয়াছেন। ইবনুল আছীর আল-কামিলে বিভিন্ন বর্ণনার উদ্ধৃতিতে পঁয়ত্রিশ অথবা আটচল্লিশ বলিয়াছেন। ইব্ন ইউসুফ সালিহী সুবুলুল হুদায় মুহাম্মাদ ইব্ন উমার (আল-ওয়াকিদী)-এর বরাতে আটচল্লিশ বলিয়াছেন এবং আবুল ফাদল হইতে ছাপ্পান্ন ও মাস'উদী হইতে ষাট বর্ণিত হইয়াছে। ইরাকী আলফিয়াতুস সীরাত গ্রন্থে উহা সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, হাকেম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন নাস্র এই সংখ্যা সত্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। ইরাকী হাকেমের বরাতে আল-ইকলীল কিতাবে এই সংখ্যা এক শত-এর উর্দ্ধে হওয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর ইরাকী মন্তব্য করিয়াছেন, ইকলীলের অনুরূপ বর্ণনা আমি অন্য কাহারও নিকট পাই নাই। হাফিয ইব্ন হাজার বলিয়াছেন, সম্ভবত হাকেম কতক গাযওয়া সংযুক্ত করিয়া এই সংখ্যা সাব্যস্ত করিয়াছেন। হাকেম বুখারাবাসী তাহার আস্থাভাজন ব্যক্তির বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর-এর কিতাবে সারিয়্যা ও বা'ছ-এর সংখ্যা সত্তরের অধিক পাঠ করিয়াছেন।

সর্বশেষ উল্লিখিত উদ্বৃতিসমূহ বর্ণনার পর সালিহী বলিয়াছেন, আমার অবগতি অনুসারে সারিয়্যা ও বা'ছ-এর সংখ্যা যাহা যাকাত উসূলের উদ্দেশ্য ব্যতীত (অন্যান্য সামরিক উদ্দেশ্যে প্রেরিতে হইয়াছিল) সত্তরের অধিক হইবে (আল-বিদায়া, ২খ., পৃ. ২৯৬; তাবাকাত, ২খ. পৃ. ৫; উয়ূনুল আছার , ১খ., পৃ. ২৫৭; ফাতহুল বারী, ৭খ., 'কিতাবুল জিহাদ, বাব প্রথম গাযওয়া এবং বাব গাযওয়া সারিয়্যার সংখ্যা; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৭২; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৫খ., পৃ. ২৩৬-২৪২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ২/৪খ., পৃ. ৬০৯)।

রক্তপাত হইতে দূরে অবস্থান করিয়া পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা প্রদান ও সার্বিক শান্তি কামনার লক্ষ্যে প্রণীত জিহাদের বিধানকে ইসলাম বিদ্বেষীরা এইরূপে উপস্থাপন করিয়াছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) মানুষকে তরবারির জোরে মুসলমান বানাইবার শিক্ষা দিয়াছেন। অথচ তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি সেনাবাহিনীকে প্রস্থান করাইবার সময় সেনাপতিকে এইরূপ হিদায়াত প্রদান করিতেন ঃ

"যখন তুমি কোন মুশরিক শত্রুদলের সামনা-সামনি হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করিবার আহবান জানাইবে। তাহারা এইগুলির যে কোন একটিতে সম্মতি প্রদান করিলে তুমিও তাহা গ্রহণ করিবে এবং আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকিবে। প্রথমে তুমি তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিবে। তাহারা উহাতে সাড়া দিলে তুমিও তাহা গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তুমি তাহাদিগকে তাহাদের নিবাস হইতে মুহাজিরদের নিবাসে স্থানান্তরিত হওয়ার আহবান জানাইবে এবং

তাহাদিগকে অবহিত করিবে যে, তাহারা উহা গ্রহণ করিলে তাহারা মুহাজির (মুসলমান)-দের ন্যায় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে এবং তাহাদের ন্যায় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করিবে। তাহারা স্থানান্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহাদিগকে অবহিত করিবে, হয় তাহারা বেদুঈন মুসলমানদের ন্যায় হইবে, যাহাদের উপর আল্লাহর সেই হুকুম জারী হইবে যাহা মুমিনদের উপর জারী হইবে। তাহারা ইহাতে (ইসলাম গ্রহণ ও স্থানান্তরে) অস্বীকৃতি প্রদান করিলে তাহাদিগকে জিয্‌য়া প্রদানের আহবান জানাইবে। তাহারা ইহাতে সম্মত হইলে তুমিও তাহা গ্রহণ করিবে ও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। তাহারা ইহাতে (জিয্‌য়া প্রদানে) অস্বীকৃত হইলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িবে (মুসলিম, ২খ., কিতাবুস সিয়ার, পৃ. ৮২)।

শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী আরও বলিয়াছেন, যুদ্ধের এই মূলনীতি যাহার লক্ষ্য ছিল রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা, কাহাকেও তরবারির জোরে বাধ্য করিয়া মুসলমান বানানো নয়। সাহাবায়ে কিরামের যুগেও ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে তরবারি খাপবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) তিন দিন পর্যন্ত এই বিষয়টি অনুধাবনের আহবান জানাইতে থাকিলেন যে, দেখো! আমি তোমাদের সম্প্রদায়েরই একজন ছিলাম। কিন্তু তোমরাই দেখিতেছ যে, আরবরা রহিয়াছে আমার পরিচালনাধীনে। তোমরা মুসলমান হইলে তোমরাও আমাদের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আর তোমরা তোমাদের ধর্মে স্থির থাকিলে চাহিতে জিয্‌য়া প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া থাকিতে পার। তবে তখন তোমরা মুসলমানদের শাসনাধীন হইবে (তিরমিযী, আবওয়াবুস সিয়ার, ১খ., ১৮৭)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধ দ্বারাও শত্রুকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয় নাই, বরং তাহাদের জন্য বিকল্প পথও উম্মুক্ত ছিল।

বিভ্রান্তি ছড়াইবার আর একটি সূত্র এই যে, দীন প্রচার ও দা'ওয়াতের জন্য প্রেরিত জামা'আতগুলিও সশস্ত্র হইত। কিন্তু এই বাস্তবতা মনে রাখা হয় না যে, ঘটনাটি তৎকালীন আরব দেশের যেখানে কোন নিয়মতান্ত্রিক সরকার ও প্রশাসন ছিল না যাহারা নাগরিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করিবে। এক একটি উপত্যকা-অধিত্যকায় এক এক গোত্র নিজ নিজ রাজত্ব স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রের সহিত যুদ্ধরত ছিল। রাস্তাঘাট ছিল ডাকাত ও লুটেরাদের দখলে। দুই-চারজন নিরস্ত্র লোকের সেখানে নিরাপদে চলাচল করা ছিল অসম্ভব। এই কারণেই তাবলীগ মিশনে প্রেরিত দলগুলিও অরাজকতাপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারীদের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সশস্ত্র অবস্থায় প্রেরিত হইত যাহাতে তাহারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই ধরনের সশস্ত্র দল যে শুধু তাবলীগ ও দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইত উহার প্রমাণ এই যে, তাহাদের সংখ্যা এত কম থাকিত যাহা সামরিক অভিযানের জন্য যথেষ্ট নহে। বদর যুদ্ধের পরে কুরায়শের শক্তি খর্ব হওয়ার সময়ে এবং ইসলাম একটি শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার পরেও হযরত নবী (স) কোন কোন গোত্রের

আবেদনে সাড়া প্রদান করিয়া তাবলীগ ও তা'লীমের জন্য বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মুসলিম জামা'আত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে পথিমধ্যে হত্যার শিকার হইয়াছেন। রাজী-এর ঘটনায় সাতজন দা'ঈর, বি'রে মা'উনার ঘটনায় ঊনসত্তর জন মুসলিম দা'ইর নিহত হওয়া (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ২২৮), সারিয়্যা ইব্‌ন আবিল আওজা-তে ঊনপঞ্চাশ জন মুসলমানের শাহাদাত বরণ (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩৪৪) এবং যাতু আতলাহ্-এ চৌদ্দজন দা'ঈ মুসলিমের তীরের আঘাতে প্রাণদান করেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৭-১২৮)।

প্রাচ্যবিদগণ সীরাতুন্নবী বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন যেন উহা যুদ্ধের একটি অবিরাম ধারা, যাহার উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো। অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা (যেমন যুদ্ধ সূনরা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,) সাধারণ ধারণা এই যে, মক্কায় মুসলমানগণ বহুবিধ সমস্যা ও নির্যাতন-নিপীড়নের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং মদীনায় আসিয়া উহা বিপরীত হইয়াছিল। এই ধারণা সঠিক নয়। মক্কার বিপদ ভয়ংকর ছিল বটে, কিন্তু সেখানে শত্রু ছিল একমুখী, মদীনায় নূতন শত্রু জুটিল ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা। মুনাফিকরা ঘরের শত্রু হওয়ার কারণে অধিক ভয়ংকর ছিল। মক্কায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে উহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িত। মদীনায় এই সুবিধা ছিল না।পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হিজরতের পরে মদীনায় রাসূলের হিফাজত ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কুরায়শরা মদীনার উচ্চাভিলাষী মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি-কে পত্র লিখিয়া যুদ্ধের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল। মদীনার অন্যতম সর্দার সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) মক্কায় উমরা করিতে গেলে আবূ জাহলের সহিত তাহার তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল। আবূ জাহল মক্কার ধর্মত্যাগী মুহাজির ও রাসূলকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সা'দকে হুমকি দিয়াছিল, যাহার জবাবে সা'দ (রা) মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় সিরিয়ার বাণিজ্য পথ রুদ্ধ করিবার হুমকি প্রদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুরায়শরা হারামের প্রতিরক্ষা ও কা'বার খাদিম হওয়ার কারণে সমগ্র আরব তাহাদের প্রভাবান্বিত ছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারা সকল গোত্র-উপগোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকিবে। মোটকথা, মুসলমানদের হিজরত ও দেশত্যাগ মক্কার মুশরিকদের ঝামেলা চুকিয়া যাওয়ার কারণে শান্ত করিল না, বরং তাহারা ইসলামের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম শুরু করিল। এই পরিস্থিতিতে জীবনের নিরাপত্তা ও অবাধে আল্লাহ্‌র দীন পালনের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে মুসলমানদেরকেও আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইল (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩০৪-৩০৮)।

লক্ষণীয় যে, মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানগণ যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তখন সবর করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ অনুমোদন সংক্রান্ত প্রাথমিক আয়াতসমূহ স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধের লক্ষ্যেই যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

"মোটকথা, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বপ্রথম কাজ ছিল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উহা শুধু তাহার নিজের ও মুহাজিরদের জন্য নহে, বরং মদীনার আনসারদের জন্যও। কেননা মুসলমানদিগকে আশ্রয় প্রদানের অপরাধে কুরায়শরা মদীনাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং সমস্ত গোত্রজোটের ভিতরে উহার আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) দুইটি মৌলিক কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন ঃ (এক) কুরায়শদের সিরীয় বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া যাহা তাহাদের গর্বের (এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির) বিষয় ছিল, যাহাতে তাহারা সন্ধি ও আলোচনা করিতে বাধ্য হয়। (দুই) মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের সহিত নিরাপত্তা ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা।

"গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যাধিক্যে দ্বিধা সৃষ্টির কারণ এই যে, "ইতিহাস রচয়িতাবৃন্দ 'গায়ওযা' শব্দটির ব্যবহারে এত অধিক ব্যাপকতা প্রদান করিয়াছেন যে, কোথাও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য দুই-চারজন লোক পাঠানো হইয়া থাকিলে তাহারা উহাকেও গাযওয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গাযওয়া ব্যতীত আরও একটি শব্দ রহিয়াছে 'সারিয়্যা'। মনীষীদের নিকট গাযওয়া ও সারিয়্যার পার্থক্য এই যে, গাযওয়ার জন্য একটি ন্যূনতম বিশেষ সংখ্যা প্রয়োজন। সারিয়্যায় এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এমনকি যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য কোথাও মাত্র এক ব্যক্তিকে পাঠানো হইয়া থাকিলে উহাকেও সারিয়্যা বলা হইয়াছে।

"প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকগণ যেগুলিকে সারিয়্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন সেগুলি কয়েক প্রকারে বিভক্ত ঃ (১) অনুসন্ধান তৎপরতা অর্থাৎ শত্রুদের গতিবিধির সংবাদ তথ্য আহরণ ও সরবরাহ করা, (২) শত্রুদের আক্রমণ সংবাদ (অথবা আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ) প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধমূলক অগ্রাভিযান, (৩) কুরায়শের বাণিজ্য ধারায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া মুসলমানদিগকে হজ্জ ও উমরা করিবার সুযোগ প্রদানে সম্মত হয়, (৪) নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাহিনী প্রেরণ, (৫) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত লোকদের সহিত আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র দল প্রেরণ যাহাদিগকে তরবারি ব্যবহার না করিবার সতর্ক নির্দেশ দেওয়া হইত।

"গাযওয়ার উপলক্ষ্য ছিল মাত্র দুইটি ঃ (১) শত্রুরা দারুল ইসলামের (মদীনার) উপর চড়াও হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। (২) শত্রুরা মদীনার উপর চড়াও হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালে সংঘটিত যুদ্ধ ও অনুরূপ ঘটনা উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নে সম্পাদিত হইয়াছিল" (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ., ৫৮৭-৫৮৮)।

বাস্তবিকই ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) সময়কালে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে কাফির-মুশরিকরাই মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষায় প্রতি আক্রমণে বাধ্য করিয়াছিল। বদর, উহুদ ও খন্দকে কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে চড়াও হইয়াছিল। ইয়াহূদীদের অবিরাম চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা বনূ নাযীর, বনূ কায়নুকা, বনূ কুরায়যা ও খায়বার অভিযানের

কারণ ছিল। কুরায়শদের গোপনে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভংগ করা মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। হুনায়ন, তাইফ ও তাবূক অভিযান ছিল শত্রুদের প্রস্তুতি সংবাদের ভিত্তিতে আগাম প্রতিরোধ। অবশিষ্ট গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার শিকার হইয়া জীবন দানের প্রতিবিধান অথবা কোন আঞ্চলিক নেতা ও গোত্রপতির আক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। অনেকগুলি ছিল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, অনাক্রমণ ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন, প্রতিমা ধ্বংস করিবার জন্য এবং অবশিষ্টগুলি ছিল নিছক দীন প্রচারের লক্ষ্যে।

গাযওয়া ও সারিয়্যার উদ্দেশ্যসমূহের বিশ্লেষণে শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী লিখিয়াছেন, "উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইসলাম ও দারুল ইসলামের হিফাজতকল্পে কর্মকৌশল ও ব্যবস্থাপনা অবলম্বন অপরিহার্য ছিল। ইহার প্রথম কার্যসূচী ছিল ব্যাপক পরিধিতে শত্রুদের গতিবিধি ও প্রস্তুতির তথ্য সংগ্রহ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা সমুন্নত করা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করিতে থাকিলেন। শুধু গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এই সকল দলকেও সশস্ত্র অবস্থায় প্রেরণ অপরিহার্য ছিল। ঐতিহাসিকগণ এই ধরনের দলগুলিকে সারিয়্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(ক) প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষাঃ এই ব্যবস্থাপনার সুফল এই ছিল যে, মদীনা আক্রমণের যে কোন পরিকল্পনার সংবাদ অবিলম্বে অবহিত হওয়ার ফলে আগাম প্রতিরোধ বাহিনী প্রেরণ করিয়া শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাত করিয়া দেওয়া হইত। সারিয়্যা তালিকাভুক্ত অধিকাংশ অভিযান ছিল এই প্রকৃতির। নমুনাস্বরূপ কতিপয় সারিয়্যার উল্লেখ করা হইল যেগুলিতে প্রতিরোধ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে সীরাতবিদগণের সুস্পষ্ট ভাষ্য রহিয়াছে। যেমন (১) গাযওয়া গায়লান (যী আমর)-এর কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

"এই গাযওয়ার কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌছিল যে, বনূ ছা'লাবা ও বনূ মুহারিবের এক দল যোদ্ধা যূ আমর নামক স্থানে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাষ্ট্রসীমায় আক্রমণ করা । দু'ছুর ইবনুল হারিছ নামের এক সর্দার ইহাতে নেতৃত্ব প্রদান করিতেছে" (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৩৪/২২)।

(২) সারিয়্যা আবূ সালামা (রা)-এর কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, খুওয়ায়লিদের দুই পুত্র তুলায়হা ও সালামা তাহাদের স্বগোত্র ও অনুগামীদের লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণের পায়তারা করিতেছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫০/৩৫)।

(৩) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা)-এর কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে নিম্নরূপে ঃ

"এই মর্মে সংবাদ পৌছিল যে, উরানা ও সংযুক্ত অঞ্চলে অবস্থানকারী লিহ্য়ান-হুযায়ল গোত্রের সুফ্য়ান ইব্ন খালিদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যোদ্ধাদল সমবেত করিতেছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫০/৩৫)।

(৪) গাযওয়া যাতুর রিকা'-এর নিম্নরূপ কারণ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ এই মর্মে অবহিত হইলেন যে, বনূ আরমান ও ছা'লাবা গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬১/৪৬)।

(৫) গাযওয়া দূমাতুল জানদাল-এর কারণ বর্ণিত হইয়াছে এইরূপে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, দূমাতুল জানদালে একটি বড় সংখ্যা সমবেত হইয়াছে যাহারা পথচারীদের উপর অত্যাচার করে এবং মদীনায় চড়াও হওয়ার পরিকল্পনা করিতেছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ., ৬১/৪৪)।

(৬) গাযওয়া মুরায়সী-এর কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা ঃ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গেল যে, খুযা'আর অন্তর্গত বনূ মুসতালিক গোত্র, যাহারা বনু মুদলিজ-এর মিত্র, তাহাদের নেতা ও সর্দার হারিছ ইব্ন আবূ দিরার স্বীয় গোত্র ও তাহাদের প্রভাবান্বিত আরবদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াইতেছে এবং তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান করিলে তাহারা উহাতে সাড়া প্রদান করিয়াছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬৩/৬৫)।

(৭) সারিয়্যা 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কারণ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"এই মর্মে সংবাদ পৌছিল যে, বনূ সা'দ খায়বারের ইয়াহূদীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ফাদাকে বাহিনী সমবেত করিতেছে" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯/৯০)।

(৮) সারিয়্যা বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর কারণ ছিল ঃ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, গাতাফানীদের একটি দল আল-জানাব নামক স্থানে সমবেত হইয়াছে এবং উয়ায়না ইব্ন হিস্ন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া রাসূলুল্লাহ(স)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছে" (তাবাকাত, ২খ. পৃ., ১২০)।

بلغ انّ جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون لحراف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(৯) সারিয়্যা 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কারণ ছিল এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কূদা'আ গোত্রের একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর এলাকা আক্রমণের লক্ষ্যে সমবেত হইয়াছে (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩১; সর্ব বরাত সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৫৯০-৫৯৩)।

(খ) কুরায়শের বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঃ বহু সারিয়্যার বিবরণে সীরাত গ্রন্থকারগণ এই বাক্যটি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলার পথে অন্তরায় সৃষ্টির লক্ষ্যে.....। কখনও রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলার অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বিখ্যাত বদর যুদ্ধ ছিল মূলত এই ধরনের বিপত্তি সৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায়। যেহেতু

কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা এক-দুই শত সদস্যবিশিষ্ট হইত এবং তাহারা সশস্ত্র থাকিত। তাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রেরিত দলও স্বাভাবিকভাবে সশস্ত্র হইত। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা বিভ্রাট করিয়া এইগুলিকে কাফেলা লুট করিবার অভিযানরূপে উপস্থাপন করিয়াছে (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৫৯১)। এই ধরনের গাযওয়া ও সারিয়্যা তালিকায় রহিয়াছে (১) সর্বপ্রথম সারিয়্যা হামযা (রা), রমাযান ১ম হি., সমুদ্র সৈকতে অভিযান, (২) সারিয়্যার উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা), শাওয়াল, ১ম হি., বাতনে রাবিগ অভিমুখে, (৩) সারিয়্যা সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা), যিলকাদ, ১ম হি., খায়বার অভিমুখে; (৪) গাযওয়া বুওয়াত, রিদওয়া অভিমুখে, রবীউল আওয়াল, ২য় হি; (৫) গাযওয়া আল-উশায়রা, শাম অভিমুখে, কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার পথরোধে, ইয়ামবু অঞ্চলে, জুমাদাছ ছানী, ২য় হি; (৬) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ (রা), নাখলা অভিমুখে, রজব ২য় হি. (ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল বদর যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ)। (৭) সারিয়্যা যায়দ ইব্‌ন হারিছা (র), জুমাদাছ ছানী ৩ হি; নাজদের বারাদা অভিমুখে; (৮) সারিয়্যা যায়দ ইব্‌ন হারিছা (র), 'ঈস অভিমুখে, জুমাদাছ ছানী ৬ষ্ঠ হি., পৃ. ১০-৩৬-৮৭)।

কুরায়শদের জন্য সিরীয় বাণিজ্য ছিল জীবন ধারণের ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রধান উপায়। সমরোপকরণ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের জন্যও ইহা ছিল প্রধান অবলম্বন। এই কারণেই বাণিজ্য কাফেলার গতিরোধ ও উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তাহাদের জন্য ছিল মরণঘাতি সংকট। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হযরত সা'দ (রা) আবূ জাহলকে বাণিজ্য পথ রুদ্ধ করিবার হুমকি দিয়াছিলেন এবং আবূ যার গিফারী (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার হারামে উহার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করিলে উপস্থিত কাফিররা তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া রক্তাক্ত ও মরণাপন্ন করিয়া ফেলে।

মূলত বাণিজ্য কাফেলার নির্বিঘ্ন চলাচলের সংকটই কুরায়শদিগকে হুদায়বিয়া সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করিয়াছিল। কারণ তাহাদের অর্থনৈতিক ভিত প্রায় ধ্বসিয়া গিয়াছিল। এমনকি হুদায়বিয়া সন্ধির অন্যতম শর্তানুসারে মক্কা হইতে মদীনা গমনকারী মুসলমানগণ (আবূ বাসীর প্রমুখ) মদীনায় আশ্রয় না পাইয়া সিরিয়াগামী পথে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ঘাটি স্থাপন করিয়া কাফেলাকে উত্যক্ত করিতে শুরু করিলে তাহারা মদীনায় আগমন করা শর্তটি ছাড় দিতে বাধ্য হইয়াছিল (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ২৬৮)। প্রকৃতপক্ষে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির এই কর্মসূচী ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আল্লাহপ্রদত্ত হিকমত, নিপুণতা ও সমর কুশলতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

(গ) নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকল্পে অভিযান ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পৃথিবীর বুক হইতে ফিতনা-ফাসাদ, কুফরী ও অশান্তির উৎস নির্মূল করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সুতরাং অশান্তির উৎস জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধশক্তি প্রয়োগ করিয়া জাতীয় ও জননিরাপত্তা বাস্তবায়ন ইসলামের নবী (স) ও মুসলমানদের অন্যতম কর্তব্য। অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ অনুমোদিত ও অবশ্য করণীয়। 'আদী

ইব্ন হাতিম ইসলাম গ্রহণ করিবার সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ ! অবশ্যই আল্লাহ এই বিষয়টিকে (দীন ইসলাম) এমনভাবে পরিপূর্ণতা দান করিবেন যে, একজন উষ্ট্রারোহী সানআ হইতে হাদরামাওত পর্যন্ত একাকী সফর করিবে। ইহাতে সে একমাত্র আল্লাহকে এবং তাহার ছাগল পালের ব্যাপারে নেকড়ে বাঘ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করিবে না (বুখারীর বর্ণনায় একক নারীর হিরা হইতে মক্কা শরীফ আগমন করিয়া নির্বিঘ্নে হজ্জ সম্পাদনের কথাও আছে (বুখারী ১খ., মুশরিকদের নিপীড়ন অধ্যায় নবূওয়াতের আলামত অধ্যায়)।

বস্তুত সারিয়্যা তালিকায় এমনও অনেক ঘটনা রহিয়াছে যাহাতে বাণিজ্য স্বাধীনতায় বিপত্তি সৃষ্টি কারীদের প্রতিরোধ এবং জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠানো হইয়াছে। যেমন (১) ৫ম হিজরী রাবীউল আওয়াল মাসে দূমাতুল জানদাল অভিমুখে গাযওয়া পরিচালিত হয়। ইহার কারণ ছিল সেখানে সমবেত একটি লুটেরা ও ডাকাত দলকে দমন করা। রাসূলুল্লাহ (স) এখানে কিছু দিন অবস্থান করেন এবং আশেপাশে ছোট ছোট সারিয়্যা প্রেরণ করিয়া এই অঞ্চলের ও বাণিজ্য সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬২; সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩৩৮)। (২) গাযওয়া গাবা; রাবীউল আওয়াল, ৬ষ্ঠ হি.। গাবা ছিল মদীনার উর্বর চারণভূমি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বদান্যতার কারণে দুর্ভিক্ষপীড়িত বনূ ফাযারার সর্দার উয়ায়না ইব্ন হিস্নকে ইসলামী সীমান্তে পশুচারণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। উয়ায়না বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ক আবূ যার (রা)-এর পুত্রকে হত্যা করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রপাল ডাকাতি করিয়া লইয়া যায়। এই ডাকাতদের শায়েস্তা করিবার জন্য গাবা অভিযান পরিচালিত হয় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮০)।

(৩) জুমাদাছ ছানী ৬ হিজরীতে হযরত দিহ্য়া কালবী (রা) সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবার হইতে উপঢৌকনসহ ফিরিবার পথে জুযামীরা হুনায়দ ইব্ন আবিয ও তাহার পুত্রের নেতৃত্বে ডাকাতি করিয়া তাহার মূল্যবান মালপত্র লইয়া যায়। তাহাদের শায়েস্তা করিবার জন্য যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে ৫০০ যোদ্ধার বাহিনী প্রেরণ করা হয় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৮)।

(৪) অনুরূপ রমাযান ৬ হিজরীতে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) সাহাবীগণের বাণিজ্য রসদ সহকারে সিরিয়া গমনকালে বনূ ফাযারার কিছু লোক ডাকাতি করিয়া তাঁহার মাল লুট করিয়া নেয়। যায়দ (রা) মদীনায় প্রত্যাগমন করিয়া ঘটনা অবহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) ডাকাতদের শায়েস্তা করিবার জন্য যায়দ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯০)।

(৫) যাযাবরদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ ঃ সীরাত গ্রন্থকারগণ অনেক সারিয়্যার বিবরণে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিতেন যাহারা রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিত এবং দিনে আত্মগোপন করিয়া থাকিত। এইভাবে তাহারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া আক্রমণ পরিচালনা করিত। তালিকায় এই ধরনের সারিয়্যা রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাচ্যবিদগণ

এই ধরনের ঘটনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইসলাম শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া ডাকাতি ও লুটপাট করাকে বৈধ মনে করে। মারগোলিয়থ এই কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানদের নিকট জীবিকা উপার্জনের কোন উপায় না থাকিবার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার অনুসারিগণকে বিভিন্ন গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া লুটতরাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৬০০)।

অথচ এই ক্ষেত্রেও বাস্তব ঘটনা ও প্রকৃত ইতিহাস হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাস্তব পরিস্থিতি এই যে, তৎকালীন আরবের জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী কোন নির্দিষ্ট স্থানে (মরূদ্যান ও শহরাঞ্চলে) স্থায়ীভাবে বসবাস করিত। অপর শ্রেণীটি ছিল তাঁবুতে বসবাসকারী বেদুঈন যাযাবর। ইহাদের কোন স্থায়ী নিবাস ছিল না, কোথাও পানির প্রস্রবণ ঝর্ণা ও সবুজ শ্যামল ভূমি পাওয়া গেলে সেখানে তাহারা তাঁবু খাটাইয়া বসবাস করিত এবং পানি ও চারনভূমির ঘাসপাতা নিঃশেষ হইয়া গেলে অন্যত্র প্রস্থান করিত। নূতন নিবাসের সন্ধান লাভের জন্য এই ধরনের গোত্রগুলিতে নির্দিষ্ট তথ্য সন্ধ্যানী দল থাকিত। সাধারণত এই ধরনের গোত্রের লোকেরা ডাকাতি ও লুটতরাজ করিত। তাহাদের শায়েস্তা করিবার জন্য কোন বাহিনী আসিলে তাহারা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে কাবু করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই কারণেই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানকারীরাও বাধ্য হইয়া রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিয়া অতর্কিত আক্রমণের পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিল (সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৫৯৯-৬০০)।

মোটকথা ইতিহাসের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, যাহারা লুটতরাজ করিত এবং আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে দ্রুত আত্মগোপন করিত শুধু তাহাদের বিরুদ্ধেই অতর্কিত আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ধরনের কতিপয় ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যেগুলির কোন কোনটিতে মহানবী (স) নিজে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোনটিতে সারিয়্যা বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন।

(১) গাযওয়া বনূ সুলায়ম (জুমাদাল উলা, ৩য় হি.) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "ফুর' অঞ্চলে বনূ সুলায়মের সমবেত হওয়ার সংবাদে অতি দ্রুততার সহিত মুসলিম বাহিনী তাহাদিগকে ধাওয়া করে। ইতোমধ্যে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের পরিত্যক্ত পশুপাল ও সম্পদ দখল করা হইল" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৫/২৪)।

(২) গাযওয়া যাতুর রিকা (মুহররাম ৫ম হি.) সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছ ঃ "এই মর্মে সংবাদ পৌঁছিল যে, আনমার ও ছা'লাবা গোত্রের লোকজন সমাবেশ ঘটাইয়াছে.... যাযাবররা পাহাড় চূড়ায় পালাইয়া গেল" (তাবাকাত, ২খ., ৬১/৫০)।

(৩) সারিয়্যা উককাশা ইব্ন মিহসান আসাদী (রা) (রবী'উল আওয়াল, ৬ষ্ঠ হি.)-এর বর্ণনায় আছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (স) (বনূ আসাদ-এর) গামর অভিমুখে উককাশা ইব্‌ন মিহসান আসাদী (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিলেন। শত্রুরা পালাইয়া গেল" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৪/৬১)।

(৪) গাযওয়া বনূ লিহ্‌য়ান অভিমুখে (রাবী'উল আওয়াল, ৬ষ্ঠ হি.) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"বনূ লিহয়ান মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া পাহার চূড়ায় পালাইয়া গেল।.... রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সারিয়্যা পেরণ করিলেন" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৭৮/৬৭)।

(৫) সারিয়্যা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) (শা'বান, ৬ম হি.)। বনূ সা'দ-এর বিরুদ্ধে। বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

"তাহাদের (বনূ সা'দের) বিরুদ্ধে এক শত যোদ্ধাসহ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (র)-কে প্রেরণ করা হয়। তাহারা রাতে সফর করিয়া ও দিনে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া আল-হামাজ পর্যন্ত পৌঁছিলেন এবং তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পাঁচ শত উট ও দুই হাজার ছাগল ছিনাইয়া লইলেন। বনূ সা'দ তাহাদের নারীদের সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯/৬৫)।

(৬) সারিয়্যা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), হাওয়াযিনীদের 'তুরবা' অভিমুখে (শা'বান, ৭ম হি.)। বর্ণনায় আছে ঃ

"হযরত উমার (রা) মুসলিম বাহিনী লইয়া রাত্রে সফর করিতেন, দিনে লুকাইয়া থাকিতেন। হাওয়াযিনরা এই সংবাদ পাইয়া পালাইয়া গেল। উমার (র) তাহাদের বসতি অঞ্চলে পৌঁছিলেন এবং তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৭/১১১)।

(৭) সারিয়্যা কা'ব ইব্‌ন উমায়র গিফারী (রা), যাতু আত্‌লাহ অভিমুখে (রাবীউল আওয়াল, ৮ম হি.)। ঘটনার বিবরণে আছে, সিরিয়াগামী ১৫ জন সাহাবী তাহাদের সম্মুখে একটি বড় দল দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। জবাবে তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিলে ইহারা প্রচণ্ড লড়াই করিয়া একজন ব্যতীত সকলে শহীদ হইলেন। কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকা একজন (জুরায়জ) মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। দুঃসংবাদ অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) অতিশয় মর্মাহত হইলেন এবং প্রতিবিধান লক্ষ্যে কা'ব বাহিনী পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সংবাদ পাওয়া গেল যে, উহারা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৫; সর্ববরাত, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৬০১-৬০৩)।

সুতরাং এই ধরনের সুযোগ সন্ধান ডাকাত-লুটেরাদিগকে দমন করিবার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। তবুও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পালাইয়া বাঁচিতে সক্ষম হইয়াছে। মদীনার নিরাপত্তা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথের নিরাপত্তার জন্য ইহাদিগকে শায়েস্তা করা অপরিহার্য ছিল।

মক্কা বিজয়ের পরে মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন গোত্রাভিমুখে প্রেরিত সারিয়্যাসমূহও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আরবের বিভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা ছিল। মক্কা

বিজয়ের পরে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলেও দীর্ঘকালের কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে অনেকের অন্তর হইতে প্রতীমার মাহাত্ম্য ও অজ্ঞতা মূর্খতাজনিত কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা তখন বিলুপ্ত হয় নাই। প্রতিমাকে পূজার উপযোগী মনে না করিলেও তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাহা পুরুষানুক্রমিক প্রভাবে নিজ হাতে প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করিবার হিম্মত তাহাদের ছিল না। কতক গণ্ড মূর্খের ধারণা ছিল এইরূপ যে, এই সকল পুতপবিত্র পাথরের একটি খণ্ডও স্থানচ্যুত করিলে আকাশ ভাংগিয়া পড়িবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং বালা-মুসীবতের ঝড়-তুফান প্রবাহিত হইবে। তাইফবাসীরা ইসলাম গ্রহণের সময় শর্ত আরোপ করিয়াছিল যে, এক বৎসর পর্যন্ত যেন তাহাদের মন্দির ধ্বংস না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এই শর্ত মঞ্জুর করেন নাই। তখন তাহারা নিজ হাতে উহা ধ্বংস না করিবার শর্ত আরোপ করিল। আরও কতিপয় গোত্র এই কর্তব্য পালনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অনেক মন্দিরের সেবায়েত সাধু-পণ্ডিতের মন্দির ধ্বংসের জন্য আঘাত মুসলিম মুজাহিদগণকে প্রতিমার কোপানলে পড়িয়া ধ্বংস হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিত। এই কারণে বিভিন্ন মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস করিবার জন্য সৎসাহসী পোক্ত ঈমান-আকীদার অধিকারী জওয়ানদের সমন্বয়ে গঠিত সারিয়্যা পাঠানো হইয়াছিল। এই সকল সারিয়্যার উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা ছিল না এবং তাহারা যুদ্ধ করেও নাই। এই তালিকায় রহিয়াছে (১) কুরায়শ ও বনূ কিনানা গোত্রের উয্যা মন্দির ধ্বংসের জন্য প্রেরিত সারিয়্যা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (২৪ রমাযান, ৮ম হি.), (২) হুযায়লদের সুওয়া মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সারিয়্যা 'আমর ইবনুল 'আস (রমযান, ৮ম হি.), (৩) মুশাল্লালে অবস্থিত আওস ও খাযরাজের মানাত মন্দির ধ্বংসের জন্য সারিয়্যা সা'দ ইব্ন যায়দ আল-আশহালী ২৪ রমাযান, ৮ম হি.), (৪) লাত মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সারিয়্যা আবূ সুফ্য়ান ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা), (৫) যুল-কাফফায়ন মন্দির ধ্বংসের জন্য সারিয়্যা জারীর (রা), (৬) যুল-কাফফায়ন মন্দির ধ্বংসের জন্য প্রেরিত সারিয়্যা তুফায়ল ইব্ন 'আমর দাঊসী (শাওয়াল, ৮ম হি.), (৭) বনূ তায়-এর মন্দির ফুল্স ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রেরিত সারিয়্যা 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১৪৫-১৬৪)।

এই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা আপাত দৃষ্টিতে অধিক হওয়ার বাস্তব কারণ। ইহাতে পরিষ্কার হইয়া গেল যে, এই সকল গাযওয়া ও সারিয়্যার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই প্রত্যক্ষ লড়াই হইয়াছিল। এইগুলিরও ছিল প্রতিরোধ ও মুজাহিদগণের প্রতারণার শিকার হইয়া শাহাদাত বরণ। সুতরাং বাস্তববাদী, ন্যাপপরায় ও পক্ষপাতমুক্ত পাঠক ও গবেষকবৃন্দ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ইসলাম ও তাহার নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধোম্মাদনার অভিযোগ, তাঁহার অনুসারীবর্গকে লুটতরাজের প্রশিক্ষণ দানের অভিযোগ এবং তরবারির জোরে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিবার অভিযোগ সম্পূর্ণ বাস্তবতা বর্জিত, অযৌক্তিক, প্রমাণবিহীন, অবান্তর ও ভিত্তিহীন। তাঁহার সকল গাযওয়া ও সারিয়্যা ছিল নির্যাতন প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা, ফিতনা, কুফরী ও অত্যাচার-অনাচার নির্মূল করিয়া আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত করা এবং উহার মাধ্যমে মানব জীবনের চূড়ান্ত ও পরম কাম্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ।

গাযওয়া ও সারিয়্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা নির্ণয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মনীষীদের মতপার্থক্য এবং উহার বিভিন্ন কারণ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এইখানে স্থান, কাল, পক্ষ, প্রতিপক্ষ এবং পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সেনানায়ক, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ফলাফল ও অন্যান আনুষঙ্গিক বিষয়ের নিরিখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমস্ত গাযওয়া, সারিয়্যা ও বা'ছ অভিযানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন করা হইল।

(ক) গাযওয়াসমূহ

গাযওয়া-১ ঃ হজ্জযাত্রীদের পথে ফুরু' অঞ্চলের আবওয়া/ওয়াদ্দান অভিমুখে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পরচালনায় প্রথম গাযওয়া। হিজরতের দ্বাদশ মাস সফর (হিজরী)। পতাকাবাহী হযরত হামযা (রা), প্রতিপক্ষ কুরায়শ ও বনূ দামরা, দামারীদের নেতা আশজা ইব্ন আমরের সহিত অনাক্রমণ ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২খ., পৃ. ৫৯১; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৫; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; তাবাকাত, ২খ., পৃ.৮ ; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৪)।

গাযওয়া-২ ঃ ইয়াম্বু'-এর নিকটবর্তী শাম অভিমুখী সড়কের পার্শ্ববর্তী রিযওয়া অঞ্চলে জুহায়না গোত্রের পর্বত বুওয়াত অভিমুখে। ২য় হিজরী ত্রয়োদশ মাস রাবী'উল আওয়ালে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিল দুই শত মুজাহিদ। শ্বেত পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), প্রতিপক্ষ ও লক্ষ্য ছিল এক শত মানুষ ও আড়াই হাজার উটসহ উমায়্যা ইব্ন খালাফের নেতৃত্বাধীন কুরায়শ কাফেলা। কোন যুদ্ধ হয় নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, খ.,১-২, পৃ. ৫৯৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮-৯; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৫)।

গাযওয়া-৩ ঃ প্রথম বদর যাহা গাযওয়া সাফ্ওয়ান নামেও অভিহিত। বদর অঞ্চলের সাফ্ওয়ান উপত্যকা অভিমুখে। হিজরতের এয়োদশ মাস রাবী'উল আওয়াল (২য় হি.), কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রী মদীনার পশুপালের উপর (যাহা চারণভূমিতে ছিল) চড়াও হইয়া উহা লুট করিয়া লইয়া যায়। তাহার শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে এই গাযওয়া পরিচালিত হয়। কুরয নিরাপদে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং কোন সংঘাত হয় নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২খ., পৃ.৬০১; তারীখে ইব্ন জারীর তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৬)।

গাযওয়া-৪ ঃ গাযওয়া আল-উশায়রা। হিজরতের ১৬শ মাসে জুমাদাল উখরা শাম অভিমুখী কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার পথরোধ করিবার লক্ষ্যে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এই গাযওয়ায় মুজাহিদ ছিলেন ১৫০-২০০ জন মুহাজির। উশায়রা ইয়াম্বু প্রদেশের বানূ মুদলিজ গোত্রের অঞ্চল। কুরায়শ কাফেলা কয়েক দিন আগে নিরাপদে চলিয়া যায়। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ মুদলিজ গোত্র ও তাহাদের মিত্র বানূ দামরার সহিত অনাক্রমণ সন্ধি স্থাপন করেন। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন কাছীর প্রমুখের বর্ণনায় উশায়রা অভিযান প্রথম বদর অভিযানের পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনায় সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা)-এর সারিয়্যা উশায়রার সংযুক্তরূপে ও ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনায় প্রথম বদরের সংযুক্তরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১-২খ., পৃ. ৫৯৮-৫৯৯; সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ১; তাবাকাত, ২খ., সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৭)।

গাযওয়া-৫ ঃ বদর আল-কুবরা বা প্রসিদ্ধ বদর যুদ্ধ হিজরতের (২য়) ১৯তম মাস রমাযান সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনকারী কুরায়শের বিশাল বাণিজ্য বহর আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় তাহাদের হিফাজতের লক্ষ্যে আবূ জাহলের নেতৃত্বে আগত মুশরিক বাহিনী এবং (৩১৩, ৩০৫ মতান্তরে) মুসলিম মুজাহিদের বাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম প্রত্যক্ষ ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ যাহা কাফিরদের শক্তি খর্ব করিবার ও ইসলামের বিজয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। পবিত্র কুরআনে ইহার আলোচনা রহিয়াছে (দ্র. আল-কুরআন আল-ইমরান, আনফাল, ও অন্যান্য; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৬৪-৫৭৪; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১-২খ., পৃ. ৬০৬-৭১৫; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৩১৩-৪১১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১-২৭; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৮-১৭২)।

গাযওয়া-৬ ঃ বানূ কায়নুকা, হিজরতের (২হি.) ২০তম মাস শাওয়াল; মদীনার অন্যতম প্রধান ইয়াহূদী গোত্র বনূ কায়নুকা মহানবী (স)-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিল। বদরের পরে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহাদিগকে মদীনা হইতে উচ্ছেদ করা হয় (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৪৭; তারীখু তাবারী,৩খ.; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৩৫২; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৮-২৯; সুবুলুল হুদা ৪খ., পৃ. ১৭৯)।

গাযওয়া-৭ ঃ সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ; হিজরতের (২হি.) ২২তম মাস ৫/২৫ যিলহজ্জ। বদরের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ আবূ সুফ্‌য়ান ২০০ (১০০/৪০) আরোহী লইয়া গোপনে মদীনার সন্নিকটে উরায়দ নামক স্থানে আগমন করিয়া জনৈক আনাসারী ও তাহার সহকর্মীকে হত্যা করে এবং কিছু বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিয়া পলায়ন করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কারাকাতুল কুদর পর্যন্ত তাহাকে তাড়া করেন। আবূ সুফ্‌য়ান ও তাহার বাহিনী ছাতুর বোঝা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন করে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৪৪; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৪১৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩০ । ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনায় সাবীক যুদ্ধ বনূ কায়নুকা অভিযানের পূর্বে ছিল।

গাযওয়া-৮ ঃ বনূ সুলায়মর বিরুদ্ধে কারারাতুল কুদর যুদ্ধ। হিজরতের ২৩তম মাস মুহররাম মাসের মাঝামাঝি সময়ে বানূ সুলায়ম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয় (মতান্তরে বদরের পূরে রমাযান বা শাওয়াল ০২ হি.)। বানূ সুলায়ম ও গাতাফানীদের বাহিনী সমাবেশ ঘটাইবার সংবাদের প্রেক্ষিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৪৩; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৪১৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩১; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৭২)।

গাযওয়া-৯ ঃ গাযওয়া গাতাফান যাহা যূ-আমর নামেও অভিহিত। নাজ্দ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নুখায়ল অঞ্চলে রাবী'উল আওয়াল-মতান্তরে যিলহজ্জে গাতফানের শাখা বনূ হারিছ ইব্ন মুহারিব (অথবা বনূ ছা'লাবা ইব্ন মুহারিব) মদীনা আক্রমণের লক্ষ্যে বাহিনী সমাবেশ ঘটাইবার গোয়েন্দা সংবাদের প্রেক্ষিতে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এই অভিযানে পরিচালিত হয়। মুসলিম মুজাহিদ সংখ্যা ছিল চার শত পঞ্চাশজন। মুশরিক দলের প্রধান ছিল দু'ছুর ইবনুল হারিছ। শত্রুরা পাহাড়-পর্বতে পালাইয়া আত্মরক্ষা করে। ফলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম ও ইব্ন কাছীর প্রমুখের বর্ণনায় এই গাযওয়া ছিল বনূ কায়নুকা'-এর পূর্বে (তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ২; আন-নুওয়ায়রী, ১৭ খ., পৃ.৭৭; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৪৯; 'উয়ূনুল আছার, ১ খ., পৃ.৩৬২; তাবাকাত, ২ খ., পৃ.৩৪; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ১৭৬)।

গাযওয়া-১০ ঃ গাযওয়া বনূ সুলায়ম বা গাযওয়া আল-ফুর; ৬ জুমাদাল উলা, ৩হি., মতান্তরে রাবী'উছ-ছানী বনূ সুলায়ম গোত্র বহু যোদ্ধা সমাবেশ ঘটাইয়াছে—এই সংবাদের প্রেক্ষিতে তিন শত মুজাহিদসহ রাসূলুল্লাহ (স) অভিযানে বাহির হন। প্রতিপক্ষ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ৪৬-৫০; মাগাযিল-ওয়াকিদী, ১ খ., পৃ. ১৯৬; তারীখ তাবারী, ৩ খ., পৃ. ২; 'উয়ূনুল আছার, ১ খ., পৃ. ৩৬২; আন-নুওয়ায়রী, ১৭ খ., পৃ. ৭৯; আল-কামিল, ২ খ., পৃ. ১৪২; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৩৫; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ১৭৮)।

গাযওয়া-১১ ঃ গাযওয়া উহুদ। হিজরতের ৩২তম মাস, ৭ শাওয়াল, ৩ হি. শনিবার (মতান্তরে ১১/১৫ শাওয়াল) অন্যতম প্রধান যুদ্ধ, যাহাতে সত্তরজন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদত লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও আহত হন (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য, কিতাবুল মাগাযী/কিতাবুল জিহাদ; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ৬০; আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ১১; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৩৬; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ১৮২)।

গাযওয়া-১২ ঃ হামরাউল আসাদ উহুদের অব্যবহিত পরে (৮ শাওয়াল, ৩ হি.) আবূ সুফ্য়ান (কুরায়শী) বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ১০১; আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ৩৬; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৪৮; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ৩০৮)।

গাযওয়া-১৩ ঃ বানূ নযীর-এর প্রতিরোধে। ৪ হিজরীর রাবী'উল আওয়ালে (মতান্তরে বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সময়ে বদরের ছয় মাস পরে। বি'রে মাঊনা হইতে ফিরিবার পথে আমর ইব্ন উমায়্যার হাতে নিহত দুই আমেরী ব্যক্তির দিয়াত প্রদানে রাসূলুল্লাহ (স) বনূ নাযীরকে আহবান জানাইলে বাহ্যত তাহারা উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিল। কেননা তাহারা বনূ আমেরের সহিত মিত্রতা চুক্তির শর্তানুসারে ইহাতে বাধ্য ছিল। কিন্তু গোপনে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করিলে তাহাদিগকে মদীনা হইতে নির্বাসিত করা হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ১৯০; মাগাযিল ওয়াকিদী, ১ খ., পৃ. ৩৭৪; দালাইলুন নুবূওয়্যাহ, ৩খ., পৃ. ৩৬৪;

বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বনূ নাযীরের উৎখাত; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৮৬; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৫৭; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ৩২; বুখারী ২খ., পৃ. ৫৭৪)।

গাযওয়া-১৪ ঃ আখিরী (শেষ-দ্বিতীয়, তৃতীয়) বদর। উহুদ যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় তখনকার মুশরিক নেতা আবূ সুফয়ান ঘোষণা করিয়া গিয়াছিল, আগামী বৎসর তোমাদের সঙ্গে বদরে সাক্ষাত হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং ৪ হি. যিলকদের সূচনায় (মতান্তরে রিকা' যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর শা'বান মাসে) বদরে উপস্থিত হইলেন। আবূ সুফ্য়ান বাহিনী মক্কায় দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির অজুহাতে স্বঘোষিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া অনুপস্থিত থাকিল। ফলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইল না। মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বিপুল পরিমাণে লাভবান হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২০৯; মাগাযিল ওয়াকিদী, ১ খ., পৃ. ৩৮৭; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১০০; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫৯; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ৩৩৭)।

গাযওয়া-১৫ ঃ যাতুর রিকা' অভিযান। ৫ম হিজরীর মুহাররাম (মতান্তরে বনূ নাযীর অভিযানের পরে)। গাতাফানীদের শাখা গোত্র আনমার ছা'লাবা (ও মুহারিব) মদীনা আক্রমণের জন্য সেনা সমাবেশ করিতেছে, এই সংবাদের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে সালাতুল খাওফ-এর বিধান নাযিল হয়। শত্রুদল বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধ হয় নাই। মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ৪০০/৭০০/৮০০ (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ২০২-২১৩; আনসাবুল আশরাফ, ১ খ., পৃ. ৬৩; মাগাযিল ওয়াকিদী, ১ খ., পৃ. ১৬৩; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ., ৩৯; ইব্ন হায্ম, পৃ. ১৮২; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৭২; আন-নুওয়ায়রী, ১৭ খ. পৃ. ১৭৬; দালাইলুল বায়হাকী, ৩খ., পৃ. ৩৬৯; সীরাতে হালাবিয়্যা, ২ খ., পৃ. ৩৫৫; বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯২; মুসলিম, ২ খ.; জিহাদ অধ্যায়; আল-বিদায়া ৪ খ., পৃ. ৯৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬১; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ১৭৫)।

গাযওয়া-১৬ ঃ দূমাতুল জানদাল (শামের প্রবেশ মুখ) অভিমুখে। সংবাদ পৌঁছিল যে, দূমায় একদল সন্ত্রাস মানুষের উপর নিপীড়ন করে এবং পথচারীদের সর্বস্ব ছিনতাই করে ও বাণিজ্য কাফেলা লুটতরাজ করে। ৫ম হিজরীর রাবী'উল আওয়ালে এই অভিযান পরিচালিত হয়। শত্রু দলের এক হাজারের বাহিনী পালাইয়া যায় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩ খ., পৃ.২১৩/২২৪; শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ৯৫; আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ১০৫; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৬২; সুবুলুল হুদা, ৪ খ., পৃ. ৩৪২)।

গাযওয়া-১৭ ঃ আল-মুরায়সী' বা বানুল মুসতালিক অভিযান ২ শা'বান, ৫ম হিজরী (মতান্তরে ৪র্থ হিজরী অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর পিতা বনূ মুসতালিক গোত্রের শীর্ষ নেতা হারিছ ইব্ন আবূ দিরার-এর নেতৃত্বে বনূ মুসতালিক-এর যোদ্ধা সমাবেশ ঘটাইবার সংবাদের

প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) এই অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল সাত শত। শত্রুদল হযরত উমার (রা)-এর মাধ্যমে ঘোষিত কলেমার দা'ওয়াত অস্বীকার করিলে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাহাদের দশজন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকল নারী-পুরুষ বন্দী হয়। একজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধবন্দী সর্দার কন্যা জুওয়ায়রিয়া (রা) কে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলে সাহাবায় কিরাম (রা) এই দাম্পত্য সম্বন্ধের সম্মানে সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ.২৮৯/৩০২; মাগাযী, আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৪০৭ ; বুখারী, ২খ., পৃ.৫৯৩ মুসলিম, ২খ., জিহাদ, বাব-১; বিদায়া, ৪খ., পৃ.১৭৮ ; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬৩; সুবুলুল হুদা., ৪খ., পৃ. ৩৪৪)।

গাযওয়া-১৮ ঃ খন্দক (পরিখা) বা আহযাব যুদ্ধ। ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসের ৮ তারিখে (মতান্তরে ৪৯তম মাস রাবী'উল আওয়ালে অথবা ৪র্থ হিজরীর শাওয়ালে) মক্কার মুশরিকদের নেতৃত্বে প্রায় সমগ্র আরবের সম্মিলিত যৌথ বাহিনী মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে মদীনার উন্মুক্ত প্রান্তরগুলিতে পরিখা খনন করিয়া শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শত্রুদল দীর্ঘদিন মদীনা অবরোধ করিবার পরে আল্লাহর সৈনিক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু ও শৈত্যপ্রবাহে পর্যুদস্ত হইয়া অবরোধ তুলিয়া ফিরিয়া যায়। ইহাই ছিল মদীনা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কা বা সীদের শেষ ও চূড়ান্ত আক্রমণ। ইহার পর হইতে তাহারা বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্নরূপে পর্যুদস্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২১৪/২২৪; আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ১৬৫; বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৮(৫/১০৭); ইব্ন হাযম, পৃ. ১৭৪ ; সীরাত হালাবিয়া, ২খ., পৃ. ৪০১; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৭৬; সীরাত শামিয়াহ, ৪খ., পৃ. ৫১২; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৪৪০; দালাইলুল বায়হাকী, ৩খ., পৃ. ৩৯২; নাওয়াবী, শরহু মুসলিম, ১২খ., পৃ. ১৪৫; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১০৬ ; তাবাকাত., ২খ., পৃ. ৬৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৬৩)।

গাযওয়া-১৯ ঃ বনূ কুরায়যা অভিযান ঃ ৫ম হিজরী যিলকাদ মাস। খন্দক হইতে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে জিবরীল (আ) পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় আসিয়া নিজে বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে গমনের ঘোষণা দেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে বনূ কুরায়যা অভিমুখে গমন করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ অবহিত করেন। খন্দক যুদ্ধকালে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এই আদেশ দেওয়া হয়। হযরত আলী (রা) পতাকা বহন করেন। অবরুদ্ধ বনূ কুরায়যা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) কে বিচারক মানিয়া আত্মসমর্পণ করে। সা'দ (রা) সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উহা বাস্তবায়ন করা হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২৩৩; বুখারী, ২খ., কিতাবুল মাগাযী, বাব-খন্দক হইতে প্রত্যাবর্তন; মুসলিম, ২খ., কিতাবুল জিহাদ; সীরাত শামিয়া, ৫খ., পৃ. ৯; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১৩৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৭৪; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৩)।

গাযওয়া-২০ ঃ বানূ লিহ্য়ান অভিমুখে। ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উল আওয়াল, রাজী'-এর ঘটনায় হযরত খুবায়ব (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের নিহত হওয়ার প্রতিবিধান লক্ষ্যে লিহয়ানের হুযায়ল ইব্ন মুদরিকা গোত্রের বিরুদ্ধে এই গাযওয়া পরিচালিত হয়। শত্রুরা পাহাড়-পর্বতে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে। মক্কাবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) উসফান পর্যন্ত যাত্রাভিযান প্রলম্বিত করেন এবং ছোট ছোট দল (সারিয়্যা) বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম ও ইব্ন কাছীর প্রমুখের বর্ণনায় গাযওয়া বনূ লিহ্য়ান ৪র্থ হিজরীর তালিকাভুক্ত রহিয়াছে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৭১; মাগাযিল ওয়াকিদী ১খ., পৃ.৩৯৬; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ.৯৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৭৮; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৩০)।

গাযওয়া-২১ ঃ গাযওয়া যূ কারাদ বা গাযওয়া আল-গাবা। একদল গাত্‌ফানী ঘোড়সওয়ার ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উল আওয়ালে উয়ায়না ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী গাবা অঞ্চলের চারণভূমিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটপালের উপর আক্রমণ করে এবং আবূ যার (রা)-এর পুত্রকে হত্যা করে ও তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) ৫০০ মুজাহিদ সহকারে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া যূ কারাদ পর্যন্ত তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং উটপাল ফিরাইয়া আনেন। এই অভিযানে সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) সাহসিকতা ও যুদ্ধ কুশলতার সাক্ষর রাখেন। পতাকাবাহী ছিলেন মিকদাদ ইব্ন আমর (রা)। বুখারী ও অন্য অনেকের বর্ণনায় যী কারাদ/গাবা গাযওয়া খায়বারের পরে সংঘটিত হইয়াছে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২৮১; বুখারী, ২খ., মাগাযী, বাব ৩৮, হাদীছ নং ৪১৯৪; কিবাতুল জিহাদ, বাব ১৬৬; মুসলিম, কিবাতুল জিহাদ, বাব ৪৫; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৬৪; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১৭০; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮০; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৯৫)।

গাযওয়া-২২ ঃ হুদায়বিয়া সন্ধি ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে যাহা বায়'আতে রিদওয়ান নামেও পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (স) প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে মক্কাবাসী কাফিররা উহাতে বাধা প্রদান করে এবং দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাহা পরবর্তীতে ইসলামের বিজয় ও বিস্তৃতির দুয়ার খুলিয়া দেয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৫; বুখারী, ২খ., মাগাযী,পৃ. ৫৯৭; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১৮৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯৫; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৩৩)।

গাযওয়া-২৩ ঃ খায়বার অভিযান। ৭ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে এবং ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন কাছীর প্রমুখের মতে, ৭ম হিজরীর বর্ষ সূচনায় (যুহরী হইতে বর্ণিত একটি মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে)। মদীনা হইতে বিতাড়িত ইয়াহূদীরা খায়বারে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ইয়াহূদীদের স্বভাবজাত বিদ্বেষ ও চক্রান্ত নির্মূল করা নূতন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য ছিল। এই কারণে ইয়াহূদীদিগকে পদানত করিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খায়বার অভিযান পরিচালিত হয় এবং ইয়াহূদীরা পরাজিত ইয়া অধীনতা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৩২৮; আদ-দুরার, পৃ. ১৯৬; বুখারী, ২খ.,পৃ. ৬০৩; মাগাযীল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৬৩২; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ.

১৯৫; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৭৫; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৬; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১০৬; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ১১৫)।

গাযওয়া-২৪ ঃ (ওয়াদিল কুরা), খায়বার হইতে ফিরিবার পথে। ইয়াহূদীরা পরাজয় স্বীকার করিয়া অধীনতা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। খায়বার অভিযানের সহিত সংযুক্ত হওয়ার কারণে অনেক ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার ওয়াদিল কুরা অভিযানকে স্বতন্ত্ররূপে তালিকাভুক্ত করেন নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৩৩৮; মাগাযীল ওয়াকিদি, ২খ., পৃ. ৭১০; বিদায়া, ৪খ.,পৃ. ২৪৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ১৪৮)।

গাযওয়া-২৫ ঃ মক্কা বিজয়, রমযান ৮ম হিজরী। মক্কার কুরায়শ ও মুশরিক পক্ষ হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিলে মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত লওয়া হয় এবং নির্বিঘ্নে মক্কা বিজিত হয় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৩৮৯; দালাইলুল বায়হাকী, ৫খ., ৯.; বিদায়া, ৪খ., ৩১৭; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩৪; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২০০)।

গাযওয়া-২৬ ঃ গাযওয়া হুনায়ন, হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে (হাওয়াযিন ও তাইফের ছাকীফ গোত্রদ্বয় সম্মিলিত প্রতিরোধে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল ৮ম হিজরীতে এই অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত অর্জিত হয় (বুখারী, ২খ., ৬১৭; মুসলিম ২খ., কিতাবুল-জিহাদ; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৪২; শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ৫; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৮৮৫; সীরাত ইব্ন হিশাম,৩-৪খ., পৃ. ৪৩৭; ৪খ., পৃ. ৮০; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩৬৮; সীরাত শামিয়াহ ৫খ., পৃ. ৪৫৯; তারীখে তাবারী, ৩খ., ১২৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৯; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৩১০)।

গাযওয়া-২৭ ঃ তাইফ অভিযান । মক্কা বিজয় ও হুনায়নের পরে, শাওয়াল ৮ম হিজরী। প্রায় এক মাস অবরোধের পর (ইব্ন হিশামের বর্ণনায় সত্তর দিন) রসূলুল্লাহ (স) মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ আদেশ দেন। পরে ৯ম হিজরীতে তাইফবাসীদের প্রতিনিধিদল আসিয়া আত্মসমর্পণ করে ও ইসলাম গ্রহণ করে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৯; দালাইলুল বায়হাকী, ৫খ., পৃ. ১৫৯; ফাতহুল বারী, ৭খ., ৪৪; সীরাত হিশাম, ৫খ., পৃ. ৩৯৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫৮; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ৩৮২)।

গাযওয়া-২৮ ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ তাবূক অভিযান, রজব ৯ম হিজরী। প্রতিপক্ষ ময়দান ত্যাগ করায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্র ও সামন্ত রাজাদের সহিত সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হয় (তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৪২, বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৩৩, সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৫১৫; মাগাযিল ওয়াকিদী, ৩খ., পৃ. ৯৮৯; উয়ূনুল আছার ২খ., পৃ. ২৭৪; শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ৬২; সীরাত শামিয়া, ৫খ. পৃ. ৬২৫; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৯০; বিদায়া, ৫খ., পৃ. ৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬৫-১৬৮; সুবুলুল হুদা, ৫খ. পৃ. ৪৩৩)।

(খ) সারিয়্যাসমূহ

সারিয়্যা-১ ঃ হামযা ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব (র)-এর সারিয়্যা। হিজরতের পরবর্তী সপ্তম মাস রমাযানে (১ম হিজরী) রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের প্রথম যুদ্ধ পতাকা হযরত হামযা (রা)-কে প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঈস অঞ্চলের সমুদ্র তীরে প্রেরণ করেন। পতাকাটি ছিল শ্বেত বর্ণের এবং উহার বাহক ছিলেন হামযা (রা)-এর মিত্র আবূ মারছাদ কান্নায ইবনুল হুসায়ন আল-গানাবী (রা)। মুসলিম মুজাহিদ সংখ্যা ছিল ত্রিশজন মুহাজির। লক্ষ্য ছিল আবূ জাহলের নেতৃত্বে শাম হইতে মক্কাভিমুখে আগত তিন শত সদস্যের বাণিজ্য কাফেলার পথরোধ করা। ইহাতে উভয় পক্ষের মিত্র মাজদী ইব্ন আমর আল-জুহানী উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা করিয়া দিলে কোন যুদ্ধ ও হানাহানি ব্যতীত পক্ষদ্বয় নিজ নিজ অবস্থানে ফিরিয়া যায় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬; বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৬-৩০০; সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২খ. পৃ. ৫৯; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১১১)।

সারিয়্যা-২ ঃ উবায়দা ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব-এর সারিয়্যা। হিজরতের অষ্টম মাস শাওয়ালে (১ম হিজরী) বাতনে রাবিগ অভিমুখে। মুসলিম মুজাহিদ সংখ্যা ছিল ষাট (মতান্তরে আশি) জন মুহাজির। শ্বেত পতাকাবাহী ছিলেন মিসতাহ ইব্ন উছাছা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। মুসলিম বাহিনী ছানাইয়াতুল মুররা-র সন্নিকটে (মতান্তরে আহ্যা নামক জলাধারের নিকটে) কাফিরদের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হয় । দুই শত সদস্যের দলটির নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফ্য়ান (মতান্তরে 'ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহল অথবা মিকরায ইব্ন হাফ্স। কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই (তাবাকাত, ২খ. পৃ. ৯; ইব্ন হিশাম, ১-২ খ., পৃ. ৫৯১; বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৭, ২৯৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩)।

ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম প্রমুখের মতে উবাদা (রা)-এর সারিয়্যা প্রথম এবং হামযা (র)-এর সারিয়্যা দ্বিতীয়। যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা, ওয়াকিদী প্রমুখের মতে সারিয়্যা হামযাই সর্বপ্রথম। মূলত উভয় সারিয়্যার সময় অতি সংলগ্ন হওয়ার কারণে এই বিরোধ দেখা দিয়াছে (বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৬, ২৮৭, ২৯৮, ৩০৩-৩০৪)।

সারিয়্যা-৩ ঃ সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা)-এর সারিয়্যা, হিজরতের নবম মাস যিলকাদ (১ম হিজরী), হিজাযের অন্তর্গত খায়বার অভিমুখে। শ্বেত পতাকাবাহী ছিলেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ('আমর) আল-বাহরানী, মুজাহিদ সংখ্যা বিশ (একুশ) জন। প্রতিপক্ষ কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলাকে প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে অভিযান চালানো হয়। কাফেলা একদিন পূর্বে নিরাপদে চলিয়া যায়, ফলে কোন সংঘাত ঘটে নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২খ., পৃ. ৬০০; সুবুলুল হুদা ৫খ., পৃ. ১৫)।

সারিয়্যা-৪ ঃ সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর সারিয়্যা। মিত্র গোত্র মুযায়নার পার্শ্ববর্তী কুরায়শের শাখা গোত্র বনূ কিনানার বিরুদ্ধে। হিজরী ২য় বর্ষের জুমাদাল উখরা অথবা রজব মাসে। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (র)-এর পরিচালনায় আট (অথবা এক শত) সদস্যের অভিযান। এই সারিয়্যার বিবরণ অস্পষ্ট ও মতভেদপূর্ণ। ইহা ও পূর্ববর্তী ৩নং সারিয়্যা অভিন্ন হইতে পারে (দ্র. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২ খ., পৃ. ৬০০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৬)।

সারিয়্যা-৫ ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (রা)-এর সারিয়্যা, হিজরতের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ মাস বদর প্রথম বদর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশের নেতৃত্বে মুহাজির সদস্যের সংক্ষিপ্ত বাহিনী। উদ্দেশ্য ছিল শাম হইতে প্রত্যাগমনকারী কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার (যাহাদের উদ্দেশ্যে উশায়রা অভিযান পরিচালিত্ হইয়াছিল এবং তাহারা নিরাপদে শাম চলিয়া গিয়াছিল। পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নায়লায় অবস্থানের নির্দেশপ্রাপ্ত এই দলটির হাতে বিশিষ্ট কুরায়শ নেতা আমর ইবনুল হাদরামী নিহত হয় রজব মাসের শেষ অথবা শা'বানের প্রথম দিন। বাহ্যত এই ঘটনা পরবর্তী প্রধান যুদ্ধ বদরের কারণে হইয়াছিল। পবিত্র কুরআনে ২ ঃ ২১৭ ও পরবর্তী আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইংগিত আছে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১-২খ., পৃ. ৬০১-৬০৬; আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৪-৩০৮; মাগাযীআল- ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩২; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৬)।

সারিয়্যা-৬ ঃ উমায়র ইব্ন আদী ইব্ন খারাশ আল-খিতমী (রা)-এর সারিয়্যা (বা'ছ); হিজরতের (২য়) মাসে ২৫ রমাযানে বদরের অব্যবহিত পরে বনূ উমায়্যা ইব্ন যায়দ গোত্রের মহিলা কবি আসমা বিন্ত মারওয়ানকে শায়েস্তা করিবার লক্ষ্যে। 'আসমা নবী করীম (স) বিরুদ্ধে উসকানীমূলক কবিতা রচনা করিত। উমায়র (রা) তাহাকে হত্যা করেন (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৬৩৬-৫৭৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১)।

সারিয়্যা-৭ ঃ সালিম ইব্ন উমায়র (রা)-এর সারিয়্যা (বা'ছ); বনূ আমর ইব্ন আওফের সদস্য আবূ (ইব্ন) 'আফ্ক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে, হিজরতের (২হি.) ২০তম মাস শাওয়াল । সে উসকানীমূলক কবি রচনা করিত। সালিম (রা) তাহাকে হত্যা করেন। ইব্ন হিশামের বর্ণনায় অসমা বিন্ত মারওয়ানকে হত্যার ঘটনা আবূ আফ্ককে হত্যার পরে এবং উহার অনুবর্তী ঘটনারূপে হইয়াছিল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৩)।

সারিয়্যা-৮ ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-র ইয়াহূদী কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যার অভিযান। কা'ব ছিল অত্যন্ত কুচক্রী ও নবী বিদ্বেষী। কবিতা দ্বারা সে নবী করীম (স)-কে কষ্ট দিত। হিজরতের ২৫তম মাসে, ৪ঠা রাবী'উল আওয়াল (৩হি.) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) কৌশলে তাহাকে হত্যা করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৫১; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ২খ., বাব ৪২; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৫৬; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৬-১০; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩১-৩৪; সুবুলুল হুদা, খ. ৬,পৃ. ২৫-২৯)।

সারিয়্যা-৯ ঃ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা কারাদা অভিমুখে। হিজরতের ২৮তম মাস জুমাদাল উখরা ৩হি.। হযরত যায়দ (রা)-এর প্রথম সারিয়্যা। নাজ্দ অঞ্চলের কারাদা অভিমুখে। কুরায়শরা সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরের জন্য মদীনার সন্নিকটে সাগর পাড়ের পথ পরিহার করিয়া ইরাকগামী নাজ্দ অঞ্চলের পথ গ্রহণ করিলে তাহাদের গতিরোধের লক্ষ্যে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর পরিচালনায় ১০০ মুজাহিদের বাহিনী প্রেরিত হয়। আবূ সুফ্য়ান অথবা

সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা (হুওয়ায়তিব) প্রমুখের নেতৃত্বে বাণিজ্য কাফেলা শীর্ষস্থানীয়রা পালাইয়া যায় এবং মুসলিম বাহিনী বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩ খ., পৃ.৫০; বিদায়া, ৪খ., পৃ.৭-৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩৬)।

সারিয়্যা-১০ ঃ আবূ সালামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা)-এর সারিয়্যা, বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের (যায়দ অঞ্চলের সন্নিকটে) কাতান (জলাধার) অভিমুখে ১৫০ জন মুজাহিদের বাহিনী। হিজরতের ৩৫তম মাস মুহররাম ৪ হিজরীর সূচনায়। তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ও তাহার ভাই সালামা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান করিতেছে-এই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। শত্রুরা বিক্ষিপ্ত হইয়া পালাইয়া যায়। মুসলিম বাহিনী গণীমত লাভ করে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ৬১২; দালাইলুল বায়হাকী, ৩ খ., পৃ. ৩১; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৫০; সুবুলুল হুদা, ৬ খ., পৃ. ৩৪)।

সারিয়্যা-১১ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা)-এর সারিয়্যা; ৫ মুহাররাম, ৪ হিজরী। রসূলুল্লাহ (স) অবহিত হইলেন যে, খালিদ ইব্‌ন সুফ্‌য়ান (বর্ণনান্তরে সুফ্‌য়ান ইব্‌ন খালিদ) ইব্‌ন নুবায়হ হুযালী উরানা নিম্নভূমিতে ও নাখলায় মদীনা আক্রমণের লক্ষ্যে হুযায়ল লিহ্‌য়ান গোত্রের যোদ্ধা সমাবেশ করিতেছে। তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা)-কে প্রেরণ করা হয়। শত্রদল বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল এবং আবদুল্লাহ (রা) সুফ্‌য়ান (খালিদ)-কে হত্যা করিলেন (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৬১৯; আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ১৬০; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৫০; সুবুলুল হুদা, ৬ খ., পৃ. ৩৬)।

সারিয়্যা-১২ ঃ মুনযির ইব্‌ন আমর আস-সাইদী (রা)-এর সারিয়্যা যাহা বি'রে মা'উনা যুদ্ধ নামে সমধিক পরিচিত। হিজরতের ছত্রিশতম মাস সফর ৪ হি.। আমের ইবনুত তুফায়ল এবং বনূ সুলায়ম-এর শাখাগোত্র রি'ল ও যাকওয়ান এবং লিহ্‌য়ান ও উসায়্যা প্রভৃতি গোত্র প্রতারণা করিয়া ৭০ জন মুসলিম মুবাল্লিগকে শহীদ করে, যাহারা সুফফা নিবাসী এবং কু'ররা' (কুরআনে পারদর্শী বা হাফিজ) ছিলেন (সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ১৮৩; আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ৮১; মাগাযিল ওয়াকিদী, ১ খ., পৃ. ৩৩৭; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৩৩; ইব্‌ন হায্‌ম, পৃ. ১৭৮; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৬১; আন-নুওয়ায়রী, ১৭ খ., পৃ. ১৩০; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২৮ বাব, হাদীছ নং ৪০৯০; দালাইলুল বায়হাকী, ৩খ., পৃ. ৩৩৮; তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৫১; সুবুলুল হুদা, ৬ খ., পৃ. ৫৭; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৫)।

সারিয়্যা-১৩ ঃ মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ আল-গানাবী অথবা আসিম ছাবিত (রা)-এর সারিয়্যা, যাহা রাজী'-এর ঘটনা নামে সমধিক পরিচিত। সফর ৪হি. হুযায়ল লিহয়ানের শাখা 'আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা তাহাদের গোত্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী থাকিবার কথা বলিয়া মুবাল্লিগ জামা'আত প্রেরণের আবেদন করে। ১০ জন সাহাবী (রা)-এর একটি দল প্রেরিত হয়। আহবানকারীরা প্রতারণা করিয়া মুসলিম মুবাল্লিগগণকে গ্রেফতার ও হত্যা করে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩ খ., পৃ. ১৬৯; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ১০ বাব, হাদীছ নং ৩৯৮৯;

আল-বিদায়া, ৪ খ., পৃ. ৭১; তাবাকাত, ৬ খ., পৃ. ১৬৯; সুবুলুল হুদা, ৬ খ., পৃ. ৩৯; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৫)।

সারিয়্যা-১৪ ঃ কুরাতা অভিমুখে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলমা (রা)-এর সারিয়্যা। হিজরতের ৫৩তম মাস ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররমের ১০ তারিখে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) দারিয়্যা অঞ্চলের বনূ কিলাবের একটি শাখাগোত্রকে শায়েস্তা করিবার জন্য ৩০জন আরোহীসহ অভিযানে প্রেরিত হন। শত্রুরা পালাইয়া আত্মরক্ষা করে। মুজাহিদগণ উট ও ছাগল গনীমত হিসাবে লাভ করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১২; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৭১, ৫খ., পৃ. ২৩৬; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৭৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৭১)।

সারিয়্যা-১৫ ঃ উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রা)-এর সারিয়্যা। বনূ আসাদের জলাধার গামর অভিমুখে ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উল আওয়ালে। মুজাহিদ সংখ্যা ছিল চল্লিশজন। শত্রুরা পালাইয়া যায়। মুজাহিদগণ দুই শত উট গনীমতরূপে লাভ করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১২; আল-ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৫০; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৮৩; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৪; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৭৭-৭৮)।

সারিয়্যা-১৬ ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর সারিয়্যা। যুলকাসসা অভিমুখে 'বনূ ছা'লাবা, বনূ উওয়াল ও বনূ মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে, ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উছ ছানী মাসে। শত্রুরা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া অতর্কিত আক্রমণে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামার নয়জন সঙ্গীকে শহীদ করে। মুহাম্মাদ নিজে মারাত্মকভাবে আহত হইলে জনৈক মুসলমান তাঁহাকে মদীনায় লইয়া আসেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১২; আল-ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৫১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৫; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৭৯)।

সারিয়্যা-১৭ ঃ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর সারিয়্যা। ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উছ ছানী মাসে। বনূ মুহারিব, ছা'লাবা ও আনমারের বিরুদ্ধে চল্লিশজন মুজাহিদসহ। শত্রুরা হায়ফা-তে বিচরণরত মদীনার পশুপাল লুট করিবার পরিকল্পনা করিলে উহা নস্যাত করিবার জন্য এই সারিয়্যা প্রেরিত হয়। শত্রুরা পালাইয়া যায়। এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুজাহিদগণ উটপাল ও অন্যান্য আসবাবপত্র গনীমতরূপে লাভ করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬০৯-৬১২; আল-ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৫১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৮১)।

সারিয়্যা-১৮ ঃ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা, বাত্ন-ই নাখল অঞ্চলের আল-জামূম / হামূম অভিমুখে, বনূ সুলায়াম-এর বিরুদ্ধে, ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবী'উছ ছানী মাসে। ছাগল ও উট পালের গনীমত অর্জিত হয় (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১২; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৮২)।

সারিয়্যা-১৯ ঃ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা, ঈস অভিমুখে। ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে। শাম হইতে প্রত্যাগমনকারী একটি বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে ১৭০ জন মুজাহিদের বাহিনী প্রেরিত হয়। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্যেষ্ঠ জামাতা আবুল 'আস

ইবনুর রাবী'-এর সম্পদও মুসলমানদের দখলে আসে। পরে তাহা ফেরত দেওয়া হয়। আবুল আস মক্কাবাসীদের মালপত্র বুঝাইয়া দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন (বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৮৩)।

সারিয়্যা-২০ ঃ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা নুখায়ল-এর নিকটবর্তী তারাফ অভিমুখে, বনূ ছা'লাবার বিরুদ্ধের ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে। মুজাহিদ সংখ্যা ছিল পনের জন। যাযাবররা পালাইয়া যায়। মুজাহিদগণ পর্যাপ্ত সংখ্যক উটের গনীমত লাভ করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১৬; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৫৩; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৮৭)।

সারিয়্যা-২১ ঃ যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা, ওয়াদিল-কুরার বিপরীতে হিস্মা অভিমুখে, জুযাম-এর শাখাগোত্র উযায়ল-এর নেতা হুনায়দ ইবনুল আরিখ ও তাহার পুত্র উগারিখ ইবনুল হুনায়দ এর শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে। দিহ্য়া আল-কালবী (রা) সম্রাট কায়সারের নিকট হইতে উপঢৌকনসহ প্রত্যাবর্তনকালে হুনায়দ ও তাহার একদল জুযামকে সঙ্গে লইয়া উহা লুট করিয়া রাখিয়া দেয়। পাঁচ শত মুজাহিদের বাহিনী সহ যায়দ (রা) অভিযানে বাহির হন এবং হুনায়দ ও তাহার পুত্রসহ অনেকে নিহত হয় ও অনেকে বন্দী হয়। পাঁচ হাজার ছাগল ও এক হাজার উটের বিশাল গনীমত হস্তগত হয়। পরে জীবিত বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ওয়াকিদী ও ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে এই সারিয়্যা ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১৬; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৫৬; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩-২০৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৮৮)।

সারিয়্যা-২২ ঃ হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সারিয়্যা বনূ ফাযারা অভিমুখে। অতর্কিত আক্রমণে শত্রুরা পর্যুদস্ত নিহত ও বন্দী হয় (বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৫০; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ২৯০; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাব ১৪ হাদীছ নং ৪৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯২)।

সারিয়্যা-২৩ ঃ ওয়াদিল কুরা অভিমুখে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা। ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে বনূ ফাযারার বিরুদ্ধে, এই অভিযানে কতক সহযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন এবং যায়দ (রা), ও মারাত্মকভাবে আহত হন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১৪-৬১৭; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯৩)।

সারিয়্যা-২৪ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর সারিয়্যা, দুমাতুল জানদাল অভিমুখে। ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে তাহাকে পাগড়ী বাধিয়া দেন। প্রতিপক্ষের আসবাগ ইব্ন আমর ও তাহার লোকজন খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুসারে সর্দার কন্যা তুমাযির বিনতুল আসবাগকে বিবাহ করেন। এই তুমাযিরই ছিলেন আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর মাতা (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩১; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ.; বিদায়া ৪খ., পৃ. ২০৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯৩)।

সারিয়্যা-২৫ ঃ যায়দ ইব্‌ন হারিছা (র)-এর সারিয়্যা, মাদয়ান অভিমুখে, বহু যুদ্ধবন্দী সংগৃহীত হয়। (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩৫; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯৬)।

সারিয়্যা-২৬ ঃ হযরত আলী (রা)-এর সারিয়্যা, ফাদাক অঞ্চলের বনূ সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র অথবা বনূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ অভিমুখে, ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে (ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনায় বনূ আসাদ ইব্‌ন বাকর অভিমুখে)। গোয়েন্দা সংবাদ তথ্য ছিল এইরূপ যে, খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা একটি যোদ্ধাদল গঠন করিয়াছে। আলী (রা)-এর বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিল এবং দুই হাজার ছাগল ও পাঁচ শত উটের গনীমত অর্জন করিল (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৪ তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৯-৯০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯৭)।

সারিয়্যা-২৭ ঃ যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা, ওয়াদিল কুরা অভিমুখে, ফাযারা গোত্রের শাখা বনূ বাদরের বিরুদ্ধে। ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে বনূ ফাযারার বিরুদ্ধে একটি অভিযানে যায়দ (রা) মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কতিপয় সঙ্গী শাহাদাত লাভ করিয়াছিলেন। উহার প্রতিবিধানে রমযান ৬ষ্ঠ হিজরীতে পুনরায় অভিযান প্রেরিত হয়। অন্য বর্ণনামতে যায়দ (রা) শাম হইতে সাহাবীগণের বাণিজ্য-সম্ভারসহ ফিরিবার পথে বনূ ফাযারার অন্তর্গত বনূ বাদরের লোকেরা মারধর করিয়া উক্ত সম্ভার লুট করিয়া লইয়া যায়। যায়দ (রা) মদীনায় ফিরিয়া আসিলে সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ (রা)-এর বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বাদরীরা নিহত ও বন্দী হয় এবং তাহাদের দুর্ধর্ষ নারী উম্মু কিরফা ফাতিমা বিন্‌ত রাবী'আ ইব্‌ন বাদরকে হত্যা করা হয় (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১৪-৬১৭; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৯৯)।

সারিয়্যা-২৮ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আতীক (রা)-এর সারিয়্যা, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফে' সাল্লাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক-কে হত্যার লক্ষ্যে, খায়বার অভিমুখে ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে। আবূ রাফে' গাতাফান গোত্র ও পার্শ্ববর্তী মুশরিকদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। আনসার আওস গোত্রের মুজাহিদগণ ইতোপূর্বে রাসূল বিদ্বেষী কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যা করিয়াছিল। পূণ্যকর্ম প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আনসার খাযরাজীগণ বনূ নাযীরের তখনকার নেতা আবূ রাফেকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে উহা মঞ্জুর করা হয় এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আতীক (রা)-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সারিয়্যা এই অভিযান সম্পন্ন করে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ২৭৪, ৬১৯; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬৭৭, বাব ঃ আবূ রাফেকে হত্যা প্রসঙ্গে, হাদীছ নং ৪০৩৮; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭৪; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৬; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯১; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১০)।

সারিয়্যা-২৯ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর সারিয়্যা। খায়বারের ইয়াহূদী নেতা ইয়ুসায়র ('উসায়র) ইব্‌ন রিযাম (রাযিম)-কে শায়েস্তা করিবার লক্ষ্যে। খায়বারের নেতা আবূ

রাফে নিহত হওয়ার পর ইয়াহূদীরা 'উসায়রকে তাহাদের নেতা মনোনীত করে। উসায়রও তাহার পূর্বসূরীর পদাংক অনুসরণ করিয়া গাতাফানীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে ত্রিশ সদস্যের বাহিনীসহ আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (ও আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স) (রা)-কে প্রেরণ করা হইল। আবদুল্লাহ (রা) আবূ 'উসায়রকে খায়বারের আমির নিযুক্তির প্রলোভন দেখাইলে সে মদীনার উদ্দেশে সফর শুরু করিল। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হইলে সতর্ক মুসলিম মুজাহিদদের হাতে 'উসায়র ও তাহার সঙ্গীরা নিহত হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১৮; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫১; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ২৯৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১১১)।

সারিয়্যা-৩০ ঃ কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহরী (রা) অথবা সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-এর সারিয়্যা। উরানা ('উকল/বাজীলা)-দের শায়েস্তা করা ও শাস্তি বিধানের জন্য। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে। উরায়না ও উক্ল গোত্রের একদল লোক মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে মদীনার আবহওয়া তাহাদের অনুকূল না হওয়ার কথা অবহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সরকারী সাদাকার উটপাল চরাইবার প্রান্তরে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন। তাহারা মুরতাদ্দ হইয়া উটপালের তত্ত্বাবধায়ক রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোলাম ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করিয়া উটপাল লইয়া পালাইয়া যায়। তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য বিশজন ঘোড়সওয়ারসহ হযরত কুরয ইব্ন জাবির (রা) অথবা সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-কে প্রেরণ করা হয়। বাহিনী সন্ত্রাসী মুরতাদ্দদিগকে ধরিয়া আনে এবং তাহাদিগকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিয়া হত্যা করা হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৬৪০; বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ১৭; মুসলিম, কিতাবুল কাসামা, হাদীছ নং ৯; আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, হাদীছ নং ৪৩৪৬; তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত, হাদীছ নং ৯২; নাসাঈ, কিতাবুত তাহরীম, ইব্ন মাজা, কিতাবুল হুদূদ, হাদীছ নং ২০; মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., পৃ. ১৬৩, ১৭৭ ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ১১১; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৫৭০ দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৮৫, আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২০৪, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯৩; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১১৫)।

সারিয়্যা-৩১ ঃ আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী ও সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হারিছ (রা)-এর সারিয়্যা। আবূ সুফয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-কে গোপনে বা অতর্কিতে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক বেদুঈনকে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করে। এই অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে লোকটি মদীনায় রিসালাত দরবারে পৌঁছিয়া ধরা পড়ে এবং সত্য কথা স্বীকার করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। ইহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) ও সালামা ইব্ন আসলাম (রা)-কে, ইব্ন হিশামের বর্ণনায় জাব্বার ইব্ন সাখর আনসারী (রা)-কে আবূ সুফয়ানকে অতর্কিতে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কায় পাঠানো হয়। মক্কাবাসীরা তাহাদিগকে সন্দেহ করিলে তাহারা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন (সীরাত ইব্ন

হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩৩; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৩২; শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৭৮; দালাইলুল বায়হাকী, ৩খ., পৃ. ৩৬৩; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৭৯; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯৩; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১২৩)।

সারিয়্যা-৩২ ঃ নাজদ অভিমুখে আবান ইব্ন সা'দ ইবনুল আস ইব্ন উমায়্যা (রা)-এর সারিয়্যা। এই সারিয়্যাতে মুসলমানগণ বিজয়ী হয় (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১২৮)।

সারিয়্যা-৩৩ ঃ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সারিয়্যা, হাওয়াযিন গোত্রের অনুবর্তী অঞ্চল তুরাবা অভিমুখে, ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে। শত্রুরা পালাইয়া জীবন রক্ষা করে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬০৯; মাগাযিল ওয়াকিদি, ২খ., পৃ. ৭২২; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৬০৯; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩০)।

সারিয়্যা-৩৪ ঃ বনূ ফাযারা (বনূ কিলাব)-এর বিরুদ্ধে হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সারিয়্যা; যারিয়্যা অঞ্চলে। ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫০; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ২৯০; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩১)।

সারিয়্যা-৩৫ ঃ বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর সারিয়্যা, বনূ মুররার নিবাস ফাদাক অভিমুখে। ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে। প্রথমে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের পরাস্ত করে। পরে পাল্টা আক্রমণে ৩০ সদস্যের মুসলিম দলের অনেকে শাহাদাত লাভ করেন এবং আমির ইব্ন সা'দ মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে ইহার প্রতিবিধানে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহকে প্রেরণ করা হয়। ইব্ন হিশাম ইহাকে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সারিয়্যারূপে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৫২; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৮-১১৯; সুবুলুল হুদা, ৫খ., পৃ. ১৩২)।

সারিয়্যা-৩৬ ঃ গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর সারিয়্যা, আল-মায়ফাআহ নামক স্থানে অবস্থানকারী বনূ 'উয়াল ও বনূ আব্দ ইব্ন ছা'লাবার বিরুদ্ধে ৭ম হিজরীর রমযানে। গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ছিলেন ১৩০ সদস্যের মুজাহিদ বাহিনীর আমীর (মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭২৪; বুখারী, ২খ., পৃ.৬১২; মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৪; দালাইলুল বায়হাকী, ২খ., পৃ. ১৫২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬০৯ ; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ১৩৩)।

সারিয়্যা-৩৭ ঃ ইয়ামান ও জাবার-এর বিরুদ্ধে বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর সারিয়্যা, ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মুজাহিদ সংখ্যা ছিল ৩০০ । উয়ায়না ইব্ন হিসন গাতাফানীদের একটি দলকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া হুবাবে সমবেত করে। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদে উহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করে এবং উট ও ছাগলের গনীমত অর্জিত হয় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২০ ; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩৪)।

সারিয়্যা-৩৮ ঃ বনূ সুলায়ম অভিমুখে ইব্‌ন আবিল আওজা আখরাম আস-সুলামী (রা)-এর সারিয়্যা । মুজাহিদ সংখ্যা ছিল ৫০ জন। ৭ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে। ইব্‌ন আবিল আওজা তাঁহার স্বগোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাহারা উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া মুসলিম দলকে বেষ্টন করিয়া ফেলে এবং প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় সকলে শাহাদাত বরণ করেন। কতিপয় সঙ্গীসহ দলনেতা মারাত্মক আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরিয়া আসেন (মাগাযিল ওয়াকিদী, ৩খ., পৃ. ১০১; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৬৮; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১২; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৩; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩৬)।

সারিয়্যা-৩৯ ঃ কাদীদ অঞ্চলে বনূ মুলাওহ-এর বিরুদ্ধে গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-লায়ছী আল-কালবী (র)-এর সারিয়্যা, ৮ম হিজরীর সফর মাসে। মুসলিম মুজাহিদগণ গনীমতসহ প্রত্যাবর্তনকালে শত্রুরা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে মেঘ-বৃষ্টি ছাড়াই অর্তকিতে আগত ঢল শত্রুদের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমানরা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে (মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭২৪; দালাইলুল বায়হাকী, ২খ., পৃ. ২৯৬; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৭১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৪; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৩৭)।

সারিয়্যা-৪০ ঃ ফাদাক অঞ্চলে বনূ মুররার বিরুদ্ধে, গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর সারিয়্যা। ইহা ছিল বনূ মুররার বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর বাহিনীকে খুন-যখম করিবার প্রতিশোধমূলক পাল্টা অভিযান (পূর্ববর্তী নং সারিয়্যা ৩৫ দ্রষ্টব্য)। প্রথমে যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা)-এর নেতৃত্বে বাহিনী গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে গালিব (রা) আগমন করিলে তাঁহার পরিচালনায় ২০০ অথবা ৩০০ সদস্যের এই বাহিনী প্রেরিত হয় (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬১০; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭২৬, ৭২৭; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৪০)।

সারিয়্যা-৪১ ঃ সিয়্য অভিমুখে হাওয়াযিন-এর শাখাগোত্র বনূ আমের-এর বিরুদ্ধে শুজা' ইবৃন ওয়াহ্‌ব আল-আসাদী (রা)-এর সারিয়্যা, ৮ম হিজরী, শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মা'দিনের বিপরীত দিকে রুকবা নামক স্থানে হাওয়াযিন গোত্রের একটি দল সমবেত হইয়াছিল। মুজাহিদ বাহিনী বিপুল সংখ্যায় উট ও ছাগল গনীমতরূপে লাভ করে (বুখারী, ১খ., খুমুস প্রসঙ্গ, বাব ১৫; মুসলিম, জিহাদ, বাব ১২, হাদীছ নং ৩৫; মুওয়াত্তা মালিক, জিহাদ, নফল অধ্যায়; দালাইলুল বায়হাকী, ৪থ., ৩৫৬; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৭৩; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭৫৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৭প; সুবুলুল হুদা ৬খ., পৃ. ১৪২)।

সারিয়্যা-৪২ ঃ কা'ব ইব্‌ন উমায়র গিফারী (রা)-এর সারিয়্যা, শাম-এর প্রবেশমুখ, ওয়াদিল কুরা-র বিপরীতে যাতু আত্‌লাহ্ অঞ্চলে বনূ কুদা'আর বিরুদ্ধে। ৮ম হিজরীর রাবী'উল আওয়াল মাসে। ১৫ সদস্যের মুজাহিদ দলটি দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সফর করিতেছিল। শত্রুদের বিরাট দল ইসলামের আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া তীর বর্ষণ শুরু করে এবং প্রায় সকলকে শহীদ করে। মাত্র একজন মারাত্মক আহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসেন।

শত্রুদের পলাইয়া যাওয়ার সংবাদ অবগত হওয়ার পর পাল্টা অভিযানের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয় (মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭৫২; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৩৫৭, সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৬২১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৭৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৭-১২৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৪৩)।

সারিয়্যা-৪৩ ঃ শামের সন্নিকটে বালকা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ মূতা অভিযান, ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে। তিন হাজার মুজাহিদের এই বাহিনীর তিন সিপাহসালার যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফার ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) পরপর শাহাদত লাভ করিবার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর পরিচালনায় মুজাহিদরা নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়া আসে (বুখারী, ২খ., পৃ. ২০০, সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৩৭৩; ৪খ., পৃ. ১৫; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০৭; আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ১৬৯; ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ১৯৮; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭৫৬; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৩৬১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৪৪)।

সারিয়্যা-৪৪ ঃ আমর ইবনুল আস (রা)-এর সারিয়্যা, যাতুস সালাসিল অভিমুখে, সিরীয় সীমান্ত সংলগ্ন ওয়াদিল কুরার বিপরীতে, ৮ম হিজরী, জুমাদাল আখিরা মাসে। মুজাহিদ সংখ্যা ৩০০ জন। বনূ কুদাআ-র শাখা বনূ বুলায়্য ছিল আস ইব্ন ওয়াইল-এর মাতুল গোত্র, বনূ কুদাআ-র শাখা বনূ উযরা ও বালকায়ন মদীনার বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে এই বাহিনী প্রেরিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল 'আমর ইবনুল 'আস (র)-এর মাতুল গোত্রের সমর্থন লাভ করা। পরে ইবনুল 'আস (রা)-এর আবেদনের ভিত্তিতে আবূ 'উবায়দা (রা)-এর পরিচালনায় প্রবীণ ও শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদের (৩০০ সদস্যের) সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানো হয় এবং সম্মিলিত বাহিনী 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে (তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০৪; বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২৫; মাগাযিল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭৬৯; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩২; (৪খ. পৃ. ২৭২); 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২০৪; আর-রাওদুল উনুফ, ২খ., ৩৫৯; সীরাত হালাবিয়া , ৩খ., পৃ. ১৯০; শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ২৭৮; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩১; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩১১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩১১)।

সারিয়্যা-৪৫ ঃ আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর সারিয়্যা, ৮ম হিজরীর রজব মাসে। ইহা সারিয়্যাতুল খাবাত নামেও পরিচিত। ৩০০ সদস্যের মুজাহিদ বাহিনী জুহায়না গোত্রের নিবাস অঞ্চলে সাগর সৈকতে নিরাপত্তা প্রহরার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। পাথেয় ফুরাইয়া যাওয়ার কারণে দৈনিক একটি খেজুর খাইয়া এবং পরে খেজুরের আঁটি চুষিয়া এবং গাছের পাতা খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই বাহিনী পরে সাগরের এক বিরাটকায় মাছ দ্বারা আঠার দিন আহার করিয়াছিল (বুখারী, মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২৫; হাদীছ নং ৪৩৬১; মুসলিম, যাবাইহ, বাব-৪ হাদীছ ১৭, ১৮; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৪০৭, ৪০৮; সীরাত ইব্ন

হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩২; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩১৪; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৭৭; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৭৬)।

সারিয়্যা-৪৬ ঃ আবূ কাতাদা-রিবঈ আনসারী (রা)-এর সারিয়্যা, নাজদ অঞ্চলে বনূ মুহারিবের নিবাস জাযীরা অভিমুখে, ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে। ইব্ন হিশাম ও ইব্ন কাছীরের বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ (রা)-এর সারিয়্যা গাবা অভিমুখে। মুজাহিদগণ বিশাল উটবহরের গনীমত লাভ করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., ৬২৯; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., ৩০৩; মাগাযীল ওয়াকিদী, ২খ., ৭৭৯ বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৪; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৮৫)।

সারিয়্যা-৪৭ ঃ আবূ কাতাদা (রা)-এর সারিয়্যা, ইদাম অভিমুখে, ৮ম হিজরীর রমযান মাসে। ইব্ন হিশাম ও ইব্ন কাছীর প্রমুখের বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ (রা)-এর সারিয়্যা। এই সারিয়্যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল পরিকল্পিত মক্কা অভিযান হইতে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি অন্যদিকে নবিদ্ধ করা (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৬২৬; ৪খ., ২৭৬; দালাইলুল বায়হাকী, ৪খ., পৃ. ৩০৮; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩৩; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৯০)।

সারিয়্যা-৪৮ ঃ জুহায়না গোত্রের হুরাকাত অঞ্চল অভিমুখে। উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর সারিয়্যা। বুখারীর বর্ণনামতে মূতা অভিযানের পরে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৬২৩; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩১৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৯২)।

সারিয়্যা-৪৯ ঃ মক্কা বিজয়ের অনুবর্তী অভিযানরূপে নাখলায় অবস্থিত কুরায়শ ও সমগ্র বনূ কিনায়া-র বৃহত্তম প্রতিমা 'উয্যা (প্রতিমা ও মন্দির) ধ্বংসের লক্ষ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সারিয়্যা, ২৫ রমযান, ৮ম হিজরী (তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৩৩; দালাইলুল বায়হাকী, ৫খ., পৃ. ৭৭, ৪০৮; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ২১; হাদীছ নং ৪২৯৯; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৪৩৬; মাগাযী, ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৮৭৩; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৫; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৯৬)।

সারিয়্যা-৫০ ঃ মক্কা বিজয়ের অনুবর্তী অন্যতম অভিযান হুযায়লীদের মন্দির ও প্রতিমা সুওয়া ধ্বংসের লক্ষ্যে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সারিয়্যা, রমযান, ৮ম হিজরী (বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৪৩১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৯৮)।

সারিয়্যা-৫১ ঃ মক্কা বিজয়ের অনুবর্তী অন্যতম অভিযান আওস, খাযরাজ ও গাসসানীদের প্রতিমা মানাত ধ্বংসের জন্য সাগর সৈকতের মুশাল্লাল অভিমুখে সা'দ ইব্ন যায়দ আল-আশহালী (রা)-এর অভিযান। রমাযান, ৮ম হিজরী, ২০ জন অশ্বারোহীর বাহিনী। (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৪৩১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৬-১৪৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ১৯৯)।

সারিয়্যা-৫২ ঃ ইয়ালামলাম-এর সন্নিকটে অবস্থানকারী বনূ কিনানা-র শাখা বনূ জাযীমা-র প্রতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের দাওয়াতী অভিযান। ৩৫০ জন মুহাজির আনসারের সম্মিলিত দল খালিদ ভুল করিয়া কিছু নও মুসলিমকে হত্যা করিলে পর রসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে দিয়াত ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২; হাদীছ নং ৪৩৩৯; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৪২৮; ৪খ., পৃ. ৭৪; মাগাযিল ওয়াকিদী ২খ., পৃ. ৮৮০; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৭-১৪৮.; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩৩৮; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২০০)।

সারিয়্যা-৫৩ ঃ হুনায়ন যুদ্ধের অনুবর্তীরূপে বিজিত দলের সেনা সমাবেশের বিরুদ্ধে আবূ 'আমের আশ'আরী (রা)-এর সারিয়্যা, আওতাস অভিমুখে, শত্রুরা পরাজিত হয় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৯; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৪৫৪; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩৮৬; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫১-১৫৩; সুবুলুল হুদা, ৬ খ., পৃ. ২০৬)।

সারিয়্যা-৫৪ ঃ যুল-কাফফায়ন অভিমুখে আমর ইব্‌ন হামামা দাওসীর প্রতিমা ধ্বংসের লক্ষ্যে তুফায়ল ইব্‌ন আমর দাওসী (র)-এর সারিয়্যা, শাওয়াল ৮ম হিজরী। এই অভিযান হইতে ফিরিবার সময় তুফায়ল (রা) দাব্বাবা (দুর্গের দেয়াল বিধ্বংসী ট্যাংক) ও মিনজানীক (পাথর ছুড়িবার কামান) লইয়া আসেন (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪ খ., পৃ. ৪৭৮; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৩৯৫; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫৭; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১০;)।

সারিয়্যা-৫৫ ঃ ইয়ামান অঞ্চলের সাদা অভিমুখে কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর সারিয়্যা (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১১)।

সারিয়্যা-৫৬ ঃ উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন আল-ফাযারী (রা)-এর সারিয়্যা বনূ তামীমের বিরুদ্ধে। বনূ তামীমের নিবাসও সুক্‌য়ার মধ্যবর্তী স্থানে। মুহাররাম ৯ম হিজরী। মুহাজির- আনসার সম্মিলিত ৫০ জন মুজাহিদের বাহিনী (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬২১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬০; সুবুলুল হুদা ৬খ., পৃ. ২১২)।

সারিয়্যা-৫৭ ঃ বনূ হারিছার বিরুদ্ধে প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওসাজা (রা)-এর সারিয়্যা (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১৩)।

সারিয়্যা- ৫৮ ঃ তুরবার সন্নিকটে খাছ'আম গোত্রের বিরুদ্ধে কুতবা ইব্‌ন 'আমের (আমের ইব্‌ন কুতবা) ইব্‌ন হাদীদা (রা)-এর ২০ সদস্যের সারিয়্যা, সফর ৯ম হিজরী (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬২; সুবুলুল হুদা ৬খ., পৃ. ২১৪)।

সারিয়্যা-৫৯ ঃ কুরাতা অঞ্চলে বনূ কিলাবের বিরুদ্ধে দাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফ্‌য়ান কিলাবী (রা)-এর সারিয়্যা, রাবী'উল আওয়াল ৯ম হিজরী (তাবাকাত, ২খ., ১৬৩; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১৫)।

সারিয়্যা-৬০ ঃ আলকামা ইব্‌ন মুজায্‌যিয আল-মুদলিজী (রা)-এর সারিয়্যা, হাবাশার বিরুদ্ধে রাবী'উছ-ছানী ৯ম হিজরী। একদল হাবাশাবাসীর সেনা সমাবেশের সংবাদের প্রেক্ষিতে

৩০০ মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরিত হয় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২;; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৩৯; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬৩; সুবুলূল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১৬)।

সারিয়্যা-৬১ ঃ পূর্ববর্তী সারিয়্যার সংযুক্ত ও অনুবর্তী আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা আস-সাহ্মী (রা)-এর সারিয়্যা (বুখারী, ২খ., ৬২২; মুসলিম, ২খ., কিতাবুল ইমারা, বাব ৮, হাদীছ ৪০; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., ৬৪০; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৭; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৫৮)।

সারিয়্যা-৬২ ঃ আয্দ-এর দুই গোত্রপতি জায়ফার ইবনুল জুলানদী ও আমর ইবনুল জুলানদীকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য আমর ইবনুল আস (রা)-এর সারিয়্যা ইব্ন কাছীরের বর্ণনায় ৮ম হিজরীর শেষদিকে এই অভিযানে উল্লিখিত অঞ্চলের অগ্নিপুজক ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের সহিত জিয্য়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয় (আল-বিদায়া ৩/৪খ., ৩৭৪)।

সারিয়্যা-৬৩ ঃ তাঈ (তাই) গোত্রের প্রতিমা (মন্দির) ফুল্স্ ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রেরিত হযরত আলী (রা)-এর সারিয়্যা; ১৫০ মুজাহিদের বাহিনী, আদী ইব্ন হাতিম পলায়ন করে এবং তাহার ভগ্নী সাফফানা বিন্ত হাতিম বন্দীরূপে মদীনায় নীত হয় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬৪; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২১৭; আল-কামিল, ২খ., ১৫৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৫৭৯; বিদায়া, ৫খ., পৃ. ৭৫)।

সারিয়্যা-৬৪ ঃ উয্রা ও বালিয়্যি গোত্রদ্বয়ের নিবাস জুবাব (জিনাব) অভিমুখে উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রা)-এর সারিয়্যা, ৯ম হিজরীর রাবী'উছ-ছানী মাসে (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬৪; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২২০)।

সারিয়্যা-৬৫ ঃ তাবূক অভিযানের অনুবর্তীরূপে দূমাতুল জানদালের শাসনকর্তা উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা)-এর সারিয়্যা। উকায়দির বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৫২৬; বিদায়া, ৫খ., পৃ. ২১; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২২০; দালাইলুল বায়হাকী, ৫খ., পৃ. ২৪৫)।

সারিয়্যা-৬৬ ঃ ছাকীফ গোত্রের (তাইফে অবস্থিত) প্রতিমা লাত (মন্দির) ধ্বংস করিবার জন্য আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব (অথবা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ) ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সারিয়্যা (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬৪১; আদ-দুরার, ৪খ., ১৮২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২২৬; মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, ৩খ., পৃ. ৯৬০; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১২, ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল আগমন প্রসঙ্গে)।

সারিয়্যা-৬৭ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর দাওয়াতী অভিযান, ইয়ামান অভিমুখে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২; বিদায়া, ৫খ., পৃ. ১১৫; সুবুলুল হুদা, ৬খ. পৃ. ২২৯; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৬৫)।

সারিয়্যা-৬৮ ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর সারিয়্যা, নাজরানের বনূ আবদিল মা'দান (বনুল হারিছ ইব্ন) কা'ব অভিমুখেও দা'ওয়াতী অভিযান। রাবী'উল আওয়াল ১০ম হিজরী

(বিদায়া-ইবন ইসহাক হইতে, রাবী'উছ-ছানী অথবা জুমাদাল উলা ১০ম হিজরী)। প্রতিপক্ষ ইসলাম গ্রহণ করায় যুদ্ধ হয় নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৫৯২)।

সারিয়্যা-৬৯ ঃ মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-এর সারিয়্যা একদল পল্লীবাসীর বিরুদ্ধে। (সুবুলুল হুদা, ৬খ., ২৩৩ পৃ.)

সারিয়্যা-৭০ ঃ ইয়ামান অভিমুখে আলী (রা)-এর দাওয়াতী অভিযান (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ, পৃ. ৬৪১; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৩৮)।

সারিয়্যা-৭১ ঃ বনূ আব্স অভিমুখ সারিয়্যা (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪১)।

সারিয়্যা-৭২ ঃ রিইয়া আস-সুহায়মীর বিরুদ্ধে প্রেরিত বা'ছ (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪১)।

সারিয়্যা-৭৩ ঃ বনূ বাহিলার বিরুদ্ধে আবূ উমামা সুদায়্যি ইব্ন আজলান (রা)-এর অভিযান (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪৩)।

সারিয়্যা-৭৪ ঃ নকল কা'বা (ইয়ামানের) খালাসা (বা যুল-খালাসা) ধ্বংসের লক্ষ্যে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর সারিয়্যা; ১৫০ আহমাসী সদস্যের বাহিনী নকল কা'বাটি ভস্মীভূত ও ধুলিস্যাত করিয়া দেয় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২৪; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৪৩১-৪৩২; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪৪)।

সারিয়্যা-৭৫ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে ইয়ামান অভিমুখে হযরত আলী (রা) ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (সুবুলুল হুদায় খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইবনুল আস)-এর দাওয়াতী অভিযান। যাকাত উসূল করা এবং দীনী দা'ওয়াত ছিল ইহার লক্ষ্য (বুখারী, ২খ., মাগাযী ৬২৩; মুসনদ আহমাদ, ৫খ., ৩৫১, ৩৫৯ দালাইলুল বায়হাকী, ৫খ., পৃ. ৩৯৫; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৬৫; বিদায়া, ৫খ., পৃ. ১২০; তাবাকাত, ২খ., ১৭০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., ২৪৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ. পৃ. ৬৪১)।

সারিয়্যা-৭৬ ঃ নাজ্দ অভিমুখে প্রেরিত যাহাদের হাতে ইয়ামানের ইয়ামামা গোত্রের সর্দার বন্দী হইয়া মদীনায় নীত হয় এবং তিন দিন বন্দী জীবন যাপনের পর মুক্তি লাভ করিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., ৬৩৮; বিদায়া, ৫খ., ৪৮-৪৯; এবং ছুমামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে)।

সারিয়্যা-৭৭ ঃ খাছ'আমীদের নিকট প্রেরিত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর বা'ছ (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪৭)।

সারিয়্যা-৭৮ ঃ আবূ সুফয়ান ইবনুল হারিছ-এর নিকট আমর ইব্ন মুররা আল-জুহানী (রা)-এর বা'ছ (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪৭)।

সারিয়্যা-৭৯ ঃ সর্বশেষে সারিয়্যা বালকা অঞ্চলের উব্না অভিমুখে উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সারিয়্যা; ২৬ সফর, ১১তম হিজরী। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ওফাতের পূর্বে এই সারিয়্যার পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং ঐ অঞ্চলে মূতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী

সেনাপতিগণের অন্যতম যায়দ (র)-এর পুত্র উসামা (রা)-কে উহার সিপাহসালার নিয়োগ করেন। আবূ বকর ও উমার (র)-এর ন্যায় প্রবীণ ও সম্মানিতগণও এই বাহিনীর তালিকাভুক্ত ছিলেন। বাহিনী রওয়ানা করিয়া মদীনার বহিঃসীমা অতিক্রম করিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিযান আপাতত স্থগিত রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর খলীফাতুল মুসলিমীন আবূ বাক্র (রা) দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার স্বার্থে উক্ত বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং উহা বাস্তবায়িত করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ৬০৬, ৬৪১; আল-বিদায়া, ৫খ., পৃ. ২৪১, ২৪২; বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৪১; তাবাকাত, ২খ., ১৮৯-১৯২.; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৯৯; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৪৮)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উল্লিখিত তালিকায় সময়ের পূর্বাপর এবং সেনাধিনায়কের নাম ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে। তালিকার সহিত উদ্ধৃত গ্রন্থাদি ব্যতীত আল-বিদায়া, ৫খ., ২৩৩-২৪১ পৃষ্ঠায় সারিয়্যাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। ইবনুল আছীরের আল-কামিলেও বিন্যস্ত বিবরণ রহিয়াছে।

গাযওয়া, সারিয়্যা ও বা'ছ-এর তালিকা দীর্ঘ হইলেও ইহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষ ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য ছিল না। অনেকগুলি ছিল দা'ওয়াতী কাফেলার ভ্রমণ ও অভিযান। অধিকাংশ ছিল প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রস্তুতি প্রতিরোধ ও আগেই নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার লক্ষ্যে, যুদ্ধ অনিবার্য হইলেই, যাহার সংখ্যা অতি নগণ্য, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধ বিজয়ের পর কখনও কোন অমানবিক আচরণ করা হয় নাই এবং কখনও কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গেলে উহার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। সর্বোপরি হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, নববী যুগে সংঘটিত প্রত্যক্ষ যুদ্ধসমূহে উভয় পক্ষের নিহতদের সংখ্যা হাজারের চাইতে কম হইবে। এই বাস্তবতার আলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপিত যুদ্ধোন্মত্ততা, শক্তি প্রয়োগে ও জোর যবরদস্তী করিয়া দীন প্রচার বা মুসলমান করিবার অভিযোগ এবং ইসলামের নবীকে যুদ্ধবাজ সাব্যস্ত করিবার অপপ্রয়াস সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। ইসলাম বিদ্বেষীরাই শুধু বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। অবশ্য অমুসলিম বিদ্বানবর্গ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিরপেক্ষ মনোবৃত্তির অধিকারিগণ ন্যায়নীতি রক্ষা করিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, ইসলাম তাহার সৌন্দর্য ও অনুপমতার কারণেই এবং ইসলামের নবী ও তাঁহার অনুসারিগণের উচ্চ মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে প্রচার-প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ইসলামই যে বিধ্বস্ত ও বিক্ষুব্ধ মানবতাকে লালন ও সার্বিক সাফল্যে উন্নীত করিতে পারে। সুতরাং ইসলামের গাযওয়া, সারিয়্যা ও জিহাদ মানব হত্যার জন্য নহে, ইসলামের জিহাদ বিশ্বশান্তির জন্য, মাজলুমের সুরক্ষার জন্য, ইনসাফ ও মানবতার বিকাশের জন্য এবং আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়িত করিয়া সৃষ্টিকে স্রষ্টার সঙ্গে, বান্দাকে আল্লাহ্র সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার জন্যই নিবেদিত। এই জিহাদই ইসলামের অন্যতম চলমান ফরয এবং ইহা সর্বোর্ধ্ব ও সর্বোত্তম সফলতা লাভের উপায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী; (৩) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম; (৪) ইমাম বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, কিতাবত্রয় ও অন্যান্য হাদীছের কিতাবের কিতাবুল মাগাযী, কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল ইমারাহ; ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুত তাবারী, (৫) ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা;(৬) ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ (৭) ইব্ন আবদুল বারর, আদ-দুরার ;(৮) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী; (৯) আবূ দাঊদ, সুনান; (১০) আবূ ঈসা তিরমিযী, জামি' তিরমিযী;(১১) শরফুদ্দীন নববী, শারহু মুসলিম; (১২) আবুল ফিদা ইব্ন কাছীর, তাফসীরে ইব্ন কাছীর; (১৩) ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী; (১৪) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী,আত-তাফসীরুল মাজহারী; (১৫) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন; (১৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন, নাবাবিয়্যা, সীরাতে ইব্ন হিশাম; (১৭) সুহায়লী, আর-রওদুল উনুফ; (১৮) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওহিবুল্লাদুন্নিয়্যা; (১৯) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল্লাদুন্নিয়্যা; (২০) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার; (২১) আস-সালিহী আশ-শামী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যা; (২২) উমার আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী; (২৩) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত-তারীখ; (২৪) আবুল ফিদা ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; (২৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা; (২৬) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; (২৭) ইব্ন সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ (আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ); (২৮) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী (বিশেষত ১ম ও ৪র্থ খ.)।

মুহাম্মাদ ইসমাইল

জিহাদের বিধান

বিধি ঃ আল্লাহ্র দীন আল্লাহ্র জমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ফরয (বাধ্যতামূলক)। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ.

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইয়ছে" (২ ঃ ২১৬)।

فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ.

"তাহারা (কাফিররা) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তোমরাও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও" (২ ঃ ১৯১)।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

الجهاد ماض منذ بعثنيَ الله الى ان يقاتل اخر امّتى الدّجّال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.

"আমার উম্মতের শেষাংশ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকিবে। স্বৈরাচারীর স্বৈরাচার এবং ন্যায়পরায়ণের ন্যায়পরায়ণতা উহা বাতিল করিতে পারিবে না" (আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৩৩, নং ২৫৩২; হিদায়া, ২খ., পৃ. ৬৫৮, টীকা নং ৯-১০; আল-বাহরুর রাইক, ৬খ., পৃ. ১১৯, ১২০)।

বিধি ঃ কেবল রাষ্ট্রপ্রধানই কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন। মহানবী (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে অনুষ্ঠিত সবগুলি যুদ্ধই প্রধান নির্বাহীর নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছিল এবং তিনিই সরাসরি প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপ্রধান ন্যায়পরায়ণ বা স্বৈরাচারী যাহাই হউন, তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিলে তাহাতে যোগদান করা মুসলমানদের কর্তব্য। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا.

"আমীর (শাসক) সৎলোক বা পাপাচারী যাহাই হউক তাহার সহিত যুদ্ধে যোগদান করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য" (আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল গাযবি মাআ আইম্মাতিল জাওরি, নং ২৫৩৩)।

বিধি ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহ কাফিরদের আক্রমণ ও হুমকির সম্মুখীন না হইলে এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের পক্ষ হইতে জাতীয় দুর্যোগ ও 'জরুরী

অবস্থা' ঘোষিত না হইলে জিহাদ 'ফরযে কিফায়া' অর্থাৎ মুসলমাদের একটি অংশ জিহাদে নিয়োজিত থাকিলে সকলের পক্ষ হইতে এই ফরয আদায় হইয়া যাইবে। আর কেহই জিহাদে নিয়োজিত না হইলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ফরয পালন না করার কারণে গুনাহগার হইবে (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৫৮-৫৫৯)।

মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ যুদ্ধে যোগদান করে না এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তাহারা পরস্পর মর্যাদায় সমান নহে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَّكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"যাহারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন" (৪ ঃ ৯৫)।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদে গমনকারী ও জিহাদ হইতে পশ্চাতে থাকিয়া যাওয়া উভয় শ্রেণীর জন্য উত্তম বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। জিহাদ সর্বাবস্থায় 'ফরযে আইন' হইলে পশ্চাতে থাকিয়া যাওয়াদের জন্য তিনি উত্তম বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন না। কেননা, তখন জিহাদ না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা হারাম হইত।

ইহা ছাড়া জিহাদ ফরয হওয়ার মূল লক্ষ্য হইল ইসলামের দাওয়াত দান করা, আল্লাহ্র সত্য দীনকে সমুন্নত করা, কাফিরদের পরাভূত করিয়া কুফরীর অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্র বান্দাদের সৎপথ প্রদর্শন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাবস্থায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জরুরী নহে, বরং কিছু লোকের প্রচেষ্টা দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে। মুসলমানদের একাংশ দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হইলে অন্য সকলে ফরযের দায় হইতে মুক্ত হইবে (বাদাইউস্ সানাই, ৬খ., পৃ. ৫৭-৫৮; হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৫৮-৫৫৯; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২০; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪৫)।

জিহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মধারাও উহা 'ফরযে কিফায়া' হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি প্রায়শ কোন সাহাবীর (রা) সেনা পরিচালনায় ছোট ছোট যোদ্ধাদল (সারিয়্যা) প্রেরণ করিতেন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করিতেন। জিহাদ সর্বাবস্থায় 'ফরযে আইন' হইলে তিনি নিজেও কোন জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকিতেন না এবং অন্য কাহাকেও কোন অবস্থায় জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিতেন না (বাদাই', ৬খ., পৃ. ৬৮; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২০; এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর দ্র.)।

জিহাদ ফরযে কিফায়া হওয়ার কারণে ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান)-এর অন্যতম কর্তব্য হইবে রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রক্ষ বাহিনী নিয়োগ করা। সীমান্তরক্ষীরা আক্রান্ত হইলে এবং শত্রু কাফির বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্বল বা আপরগ হইলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলিম জনতার জন্য নৈকট্যের ক্রম অনুসারে সীমান্তরক্ষীদের সাহায্যে আগাইয়া আসা এবং অস্ত্র, সমরোপকরণ ও সম্পদ দ্বারা তাহাদের সহায়তা প্রদান করা ফরয (বাদাই', ৬খ., পৃ. ৫৮; আল-বাহ্‌রুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২০; আলমগীরী , ২খ., পৃ. ১৮৮)।

বিধি ঃ যুদ্ধ সংক্রান্ত জনঘোষণা অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের কারণে জাতীয় দুর্যোগ ও রাষ্ট্রীয় 'জরুরী অবস্থা' ঘোষিত হইলে প্রত্যেক সক্ষম-সামর্থ্যবান মুসলমানের প্রতি জিহাদ 'ফরযে আইন' হইয়া যায়। 'জনঘোষণা' (নাফীর)-এর অর্থ কোন জনপদবাসীদের এই সংবাদ অবগত হওয়া যে, ইসলাম ও ইসলামের বাণী ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে শত্রু তোমাদের জীবন, সন্তান-সন্তুতি পরিবার ও সম্পদ হরণে আসিয়া পড়িয়াছে (আলমগীরী, ২খ., পৃ. ১৮৮)। সুতরাং সাধারণ জনঘোষণার ক্ষেত্রে এবং কোন মুসলিম জনপদ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের পত্যেক ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরযে আইন হইয়া যায় এবং এই কারণে এইরূপ পরিস্থিতিতে সন্তান পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত, গোলাম মনিবের অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এবং দেনাদার পাওনাদারের অনুমিত ব্যতীত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে।

তবে এই ক্ষেত্রেও একই মুহূর্তে বিশ্ব মুসলিমের জন্য জিহাদে যোগদান ফরযে আইন হইবে না, বরং প্রথমে আক্রান্ত অঞ্চলের সন্নিকটবর্তীদের জন্য ফরযে আইন হইবে এবং তাহারা শত্রু প্রতিরোধে সক্ষম হইলে অন্যান্য দূরবর্তীদের জন্য ফরযে কিফায়া থাকিয়া যাইবে। আক্রান্ত জনপদের সন্নিহিত অঞ্চলের লোকেরা শত্রু প্রতিরোধে অসমর্থ ও দুর্বল হইলে কিংবা কর্তব্য পালনে গড়িমসি করিলে (কিংবা আক্রমণ প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইলে) ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তীদের জন্য ফরযে আইন হওয়ার হুকুম প্রযোজ্য হইবে; অবশেষ পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য ফরযে আইন হইয়া যাইবে।

প্রমাণ ঃ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا "তোমরা অভিযানে বাহির হইয়া পড় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অথবা বাহির হও সম্মিলিতরূপে" (৪ ঃ ৭১)।

যেহেতু জনঘোষণার পূর্বেও জিহাদ ফরয হওয়ার বিধান প্রত্যেকের জন্য সাব্যস্ত ছিল এবং 'কিফায়া'রূপে একাংশের কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা অন্যদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা ছিল, আর ব্যাপক জনঘোষণা ও জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে সকলের অংশগ্রহণ ব্যতীত এই কর্তব্য সম্পাদিত হইতে পারে না, সুতরাং এই অবস্থায় সালাত ও সিয়ামের ন্যায় প্রত্যেকের জন্য 'ফরযে আইন' (ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে আবশ্যিক) সাব্যস্ত হইবে এবং স্বাধীন ও দাস এবং নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৫৯; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪৪; বাদাই, ৬খ., পৃ. ৫৮; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২২-১২৩; রাদ্দুল মুহতার, ৬খ., পৃ. ২০৫; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২খ., পৃ. ১৮৮-১৮৯)।

বিধি ঃ প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের জন্য নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা শরী'আতের সাধারণ বিধান। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রহণযোগ্য ও বৈধ। সুতরাং কেহ নিজে যুদ্ধে না গেলে অথবা দৈহিক দুর্বলতা ও স্বাস্থ্যগত কারণে তাহাতে অপারগ হইলে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুজাহিদ ও যোদ্ধাকে অর্থ সম্পদ ও সমরোপকরণ দ্বারা সহায়তা করা বৈধ। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তির জন্য অথবা আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও অন্যকে জিহাদের সাওয়াবে অংশপ্রাপ্তির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইরূপ সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা বৈধ।

বিধি ঃ (১) জিহাদ দৈহিক বিচারে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরয। কেননা, জিহাদ করার জন্য দৈহিক শক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা অপরিহার্য। সুতরাং অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হাত-পা কর্তিত, অতি বৃদ্ধ, উন্মাদ, কঠিন দূরারোগ্য ও অতি দুর্বলের উপর জিহাদ ফরয নয়। (২) সমরোপকরণ ও যুদ্ধব্যয় নির্বাহে অপারগ সুস্থ-সবল ব্যক্তির উপরও জিহাদ ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ.

"অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নাই, খঞ্জ-বিকলাঙ্গের জন্য নাই কোন অপরাধ এবং অসুস্থের জন্য নাই কোন অপরাধ" (৪৮ ঃ ১৭)।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ.

"যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াল"। (৯ ঃ ৯১)।

(৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালেগের উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা নাবালেগের দেহ যুদ্ধের ধকল সহ্য করিবার উপযোগী নয়। মূলত অপ্রাপ্ত বয়স্করা শরী'আতের বিধানের অধীন (মুকাল্লাফ) নয়। বুখারী-মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে যোদ্ধা তালিকাভুক্তির জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে পেশ করা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নাই (ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৪)।

(৪) নারীর উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা তাহার দৈহিক গঠন যুদ্ধের উপযোগী নয়। তবে তাহারা স্বেচ্ছায় সহাযোগী শক্তি হিসাবে জিহাদের যোগদান করিতে পারে।

বিধি ঃ জরুরী পরিস্থিতিতে (জিহাদ ফরযে 'আইনে হওয়ার অবস্থায়) উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ (সন্তান পিতার অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, গোলাম মনিবের অনুমতি ব্যতীত, দেনাদার পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত এবং অন্যান্যরা) সকলে জিহাদে অংশগ্রহণ করিবে এবং সাধ্যমত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যোগদান করিবে, প্রয়োজনে নারীরা অস্ত্র হাতে তুলিয়া নিবে। বিভিন্ন হাদীছে উহুদ, খন্দক, খায়বার ও অন্যান্য জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণের তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিম বাহিনী রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ বা অনুমোদনক্রমে (জবাবী আক্রমণের ক্ষেত্র ব্যতীত অগ্রগণ্য হইয়া) কোন অমুসলিম দেশ (দারুল হারব) বা কোন কাফির গোষ্ঠীকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বা তাহাদের কোন দুর্গ অবরোধ করিলে পর্যায়ক্রমে তিনটি কাজ করণীয় হইবে। (১) যদি ইতিপূর্বে তাহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছিয়া থাকে তবে প্রথমে আবশ্যিকরূপে তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইতে হইবে। তাহাদের এই মর্মে অবহিত করিতে হইবে যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারা মুসলমানদের সমপর্যায়ের এবং সার্বিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণে সম্মত হইলে আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

তাহারা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগকে জিয্‌যা (সার্বিক নিরাপত্তামূলক কর) প্রদানে স্বীকৃত হইয়া ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লওয়ার আহ্বান জানাইতে হইবে। তাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়া জিয্‌যা প্রদানে সম্মত হইলে তাহাদেরকে আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় তাহারা মুসলিম নাগরিকদের সমতুল্য রাষ্ট্রীয় নাগরিক অধিকার লাভ করিবে এবং তাহাদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পালনে স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

জিয্‌যা প্রদান ও আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলে তৃতীয় পর্যায়ে 'আল্লাহ্‌র' সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের উপর পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ পরিচালনা করিতে হইবে।

বিধি ঃ শত্রুপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া পরাজিত করিবার লক্ষ্যে সব ধরনের মারণাস্ত্র ব্যবহার করা যাইবে। একান্ত অপরিহার্য এবং ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাহাদের বাড়িঘরে ও ক্ষেত-খামারে আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে। পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাইফ অবরোধকালে শত্রুদের বিরুদ্ধে (সমকালীন সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র) কামান দ্বারা পাথরের গোলা নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। বনূ নযীর যুদ্ধে তাহাদের মনোবল ভাংগিয়া দিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদের অতি প্রিয় বুওয়ায়রা নামক বাগানটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য হইবে জান-মাল ও সম্পদ নষ্ট করা নয়, বরং তাহাদিগকে হীনবল করা, তাহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস বিনাশ করা এবং তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ও তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাদের পরজয় অথবা আত্মসমর্পণে বাধ্য করা (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬০-৫৬১; ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ১৯৭; বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৩০২০; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৭৯; আল-বাহ্‌রুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২৮; ফাতওয়া আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৩; বাদাই'উস সানাই', ৬খ., পৃ. ৬২; রাদ্দুল মুহ্‌তার, ৬খ., ২০৯-২১০)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ.

"তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহাদের কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই এবং পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে" (৫৯ ঃ ৫)।

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"উহা (শাস্তি) তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিল। তাহারা তাহাদের বাড়িঘর নিজ হাতে ও মুমিনদের হাতে ধ্বংস করিল" (৫৯ ঃ ২)।

বিধি ঃ কাফির বাহিনীর সহিত কিংবা তাহাদের দুর্গে (ও সেনানিবাসে) কোন মুসলমান ব্যবসায়ী, পর্যটক বা মুজাহিদ কারাবন্দী থাকিলে এবং আক্রমণে তাহাদের নিহত হওয়ার আশংকা থাকিলেও যুদ্ধের প্রয়োজনে আক্রমণ করা যাইবে। তদ্রূপ কাফির পক্ষ মুসলিম শিশু, বালিকা অথবা মুসলিম ব্যবসায়ী বন্দীদিগকে তাহাদের সেনাসজ্জায় মানবঢালরূপে ব্যবহার করিলেও তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম নিহত হইলে উহার বিপরীতে দিয়াত, কাফ্ফারা (রক্তপণ ইত্যাদি) প্রদান করিতে হইবে না। কেননা জিহাদ একটি ফরয কর্তব্য এবং উহা পালন করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত জান-মালের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য থাকে না। কেননা শরী'আতের বিধান সাধ্য অনুসারে প্রযোজ্য হয়। শারী'আর অন্যতম মূলনীতি "বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি স্বীকার করা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা" উক্তরূপ বৈধতার প্রমাণ বহন করে (দ্র. হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬১; বাদাই'উস সানাই', ৬খ., পৃ. ৬৩; ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ১৯৯; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১২৮-১২৯; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬খ., পৃ. ২১০; ফাতাওয়া 'আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৪)।

বিধি ঃ যুদ্ধ চলাকালে কাফির শত্রুপক্ষের নারী, শিশু, অতিবৃদ্ধ, চলৎশক্তি রহিত, বিকলাংগ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অন্ধ, ডান হাত কর্তিত, ডান হাত ও বাম পা বা বাম হাত ও ডান পা কর্তিত, উন্মাদ, ধর্মযাজক, সংসারত্যাগী ও গীর্জা-মন্দিরে আত্ম-অবরুদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাইবে না।

উপবিধি ঃ উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কেহ শত্রুপক্ষের রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী রাজা বা রাণী হইলে অথবা সেনাবাহিনীর পদাধিকারী হইলে অথবা ইহাদের কেহ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিলে অথবা পরোক্ষ বুদ্ধি-পরামর্শ, পরিকল্পনা ও কলা-কৌশল দ্বারা অথবা সম্পদ দ্বারা, গোয়েন্দাগিরি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে যুদ্ধে মদদদাতা হইলে যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে ইহাদিগকে হত্যা করা বৈধ। কেননা এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হইবে দুষ্ট ব্যক্তিকে দমন করা এবং কাফিরদের মনোবল খর্ব করা।

উপবিধি ঃ সন্ধিসূত্রে আত্মসমর্পণকারী ও পরাজিত শত্রুর সহিত কোন প্রকার অংগীকার ভংগ, বিশ্বাসভংগ বা প্রতারণা করা যাইবে না।

উপবিধি ঃ নিহত শত্রুর লাশের অবমাননা বা বিকৃতি সাধন, নাক-কান বা অংগ-প্রত্যংগ কর্তন করা যাইবে না (দ্র. বাদাই'উস সানাই', ৬খ., পৃ. ৬৩-৬৪; হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬২;

ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ২০২-২০৩; আল-বাহরুর রাইক ৫খ., পৃ. ১৩০-১৩২; রাদ্দুল মুহ্‌তার, ৬খ., পৃ. ২১১-২১৫; 'আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৪)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة.

"তোমরা বিশ্বাসভংগ করিবে না, অঙ্গ বিকৃতি করিবে না, শিশু ও নারীকে হত্যা করিবে না" (বায়হাকী, সুনান, ৯খ., পৃ. ৯০; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ১৬৮; বাদাই', ৬খ., পৃ. ৬৩)।

ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আছে, "কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) এক নিহত নারীকে দেখিতে পাইয়া উহাতে তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং যুদ্ধে নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করিলেন" (বুখারী, জিহাদ, বাব ৪৬, হাদীছ নং ৩০১২ ও ৩০১৩)।

উপবিধি ঃ কাফিরদের দুর্বল ও সন্ত্রস্ত করিবার প্রয়োজনে ভয়ংকর ও দুষ্ট প্রকৃতির কাফির শত্রুকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা, কথার কূটজালে আক্রান্ত করিয়া এবং প্রয়োজনে দ্ব্যর্থবোধক মিথ্যার আশ্রয় নিয়া এবং অতর্কিতে ও গুপ্ত হত্যা করা বৈধ। তদ্রূপ যুদ্ধের জন্য বাহ্যত প্রতারণা ও প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন বৈধ ও পসন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ الحرب خدعة। "যুদ্ধ হইল কূটকৌশল" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৩০২৮, ৩০২৯, ৩০৩০)।

উপবিধি ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মুসলিম মুজাহিদ অগ্রে আক্রমণ করিয়া তাহার পিতা-মাতা বা তদুর্দ্ধ আত্মীয়কে হত্যা করিবে না। তাহাদের কেহ আক্রমণের আওতায় আসিয়া পড়িলে নিজে সরিয়া গিয়া অন্য মুজাহিদকে আক্রমণ ও হত্যা করিবার সুযোগ করিয়া দিবে। তবে তাহাদের দ্বারা নিজে আক্রান্ত হইলে এবং পিতা ও অন্যান্যরা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ করিতে পারিবে এবং হত্যা না করিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব না হইলে হত্যাও করিতে পারিবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশ ঃ

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

"এবং তাহাদের (পিতা-মাতার) সহিত পার্থিব জীবনে সদাচরণ করিবে" (২১ ঃ ১৫)।

হানজালা (রা) তাঁহার কাফির পিতাকে হত্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এই ব্যাপারে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখকে পার্থিব জীবনে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা শারী'আতের বিধানমতে সন্তানের কর্তব্য। সুতরাং সে তাহাদের হত্যা করিতে পারে না। তবে আক্রান্ত হইয়া নিজ জীবননাশের সমূহ আশংকার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা ফরয হওয়ার বিধান কার্যকর হইবে (বাদাই, ৫খ., পৃ. ১৩১-১৩২; ফাতাওয়া আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৪)।

উপবিধি ঃ পবিত্র হারাম শরীফে যুদ্ধের সূচনা করা বৈধ নহে। কাফির প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করিতে হারামে প্রবেশ করিলে এবং মুসলমানগণ হারাম এলাকায় প্রতি-আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলে হারাম শরীফেও যুদ্ধ করা বৈধ হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...

"মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যতক্ষণ না তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা (সেখানে) তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তোমরাও (সেখানে) তাহাদিগকে হত্যা করিবে" (২ঃ ১৯১; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬খ., পৃ. ১৯৯-২০০)।

সন্ধি ও নিরাপত্তা প্রদান বিধি

বিধি ঃ কাফির প্রতিপক্ষ মুসলমানদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব দিলে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের (ইমাম) হারবী প্রতিপক্ষের সহিত বা তাহাদের কোন দল-উপদল বা রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি এবং অনাক্রমণ বা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ হইবে। কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ ইসলামের জিহাদ বিধানের মূল লক্ষ্য নয়, বরং কাফিরদের প্রতিপত্তি খর্ব করা, তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করা এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান করা জিহাদের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.

"তাহারা সন্ধির প্রতি আকৃষ্ট হইলে তুমিও সেদিকে আকৃষ্ট হও এবং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ" (৮ঃ ৬১)।

فَاِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا.

"যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোন (যুদ্ধ করিবার) কোন পথ রাখেন না" (৪ঃ ৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাবাসীদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের জন্য যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৩১৭৩; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩১৭)।

বিধি ঃ কাফিরদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধির বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ হইবে— যদি মুসলমানদের জন্য উক্ত সম্পদ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয় এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বাহরায়ন ও হিজরের খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারীদের সহিত বার্ষিক প্রদেয় নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ বদর যুদ্ধে কাফিরদের নিকট হইতেও তিনি মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপবিধি ঃ অমুসলিম রাষ্ট্র আক্রমণ করিবার পূর্বে তাহাদের প্রেরিত দূতের মাধ্যমে সম্পাদিত হইলে সন্ধির বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পদ জিয্য়া ও খারাজ ব্যয়ের খাতসমূহে ব্যয় করিতে হইবে।

উপবিধি ঃ আক্রান্ত বা অবরুদ্ধ হওয়ার পর কাফিররা সম্পদ প্রদানের শর্তে সন্ধিবদ্ধ হইলে সেই সম্পদ গনীমতরূপে বিবেচিত হইবে এবং উহা গনীমত বণ্টন বিধি অনুসারে বণ্টিত হইবে (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬৩, ৫৬৪; বাহ্রুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১৩৩; ফাতহুল কাদীর, ৬খ., পৃ. ২০৭; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬খ., পৃ. ২১৬; বুখারী, কিতাবুল জিয্য়া, বাব ১, হাদীছ নং ৩১৫৭, ৩১৫৮, ৩১৫৯; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ২৯৮-৩০০; ফাতাওয়া আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৬)।

উপবিধি ঃ কাফিররা মুসলমানদের আক্রমণ করিয়া কোণঠাসা করিয়া ফেলিলে বা অবরোধ করিয় সন্ধি সম্পাদনের চাপ সৃষ্টি করিলে অথবা মুসলিম ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান/সেনাপ্রধান) মুসলমানদের জান-মাল রক্ষায় কাফিরদের সহিত সন্ধি সম্পাদনে বাধ্য হইলে সন্ধি করা বৈধ। তদ্রূপ পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হইলে এবং মুসলমানদের ব্যাপক জীবননাশের আশংকা দেখা দিলে অগত্যা সম্পদ প্রদান করিবার ও শর্তে সন্ধি করা বৈধ। কেননা সম্ভাব্য যে কোন উপায় জীবন রক্ষা ও ধ্বংস প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। খন্দক যুদ্ধে অতি সংকটকালে রাসূলুল্লাহ (স) সম্মিলিত কাফির বাহিনীর একাংশ গাতাফান গোত্রের নেতা উয়ায়না ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী ও হারিছ ইব্ন 'আওফ ইব্ন হারিছা আল-মুররীর নিকট মদীনার এক-তৃতীয়াংশ ফল (খেজুর) প্রদানের শর্তে তাহাদের যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার প্রস্তাব প্রদান সম্পর্কে আনসারগণের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে এই প্রস্তাব কার্যকর না হইলেও উহার দ্বারা সংকটকালে সম্পদ প্রদান করিয়া সন্ধি করিবার বৈধতা প্রমাণিত হয়। ব্যাপক জীবননাশের আশংকা না থাকিলে সম্পদ প্রদানের শর্তে সন্ধি করিবে না। কেননা উহা ইসলাম ও মুসলমানদের হীনতা ও অবমাননা স্বীকার করিবার নামান্তর (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৬৫৪; আল-বাহ্রুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১৩৩; ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ২০৭-২০৮; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬খ., পৃ. ২১৬-২১৭; আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৭)।

বিধি ঃ সন্ধি চুক্তি যেমন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হইতে পারে তদ্রূপ অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও হইতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার মুশরিকদের সহিত দশ বৎসরের জন্য হুদায়বিয়া সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সন্ধিচুক্তিতে পরের বৎসর (উমরাতুল কাযা-র জন্য) মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের তিন দিন অবস্থানের শর্তও সংযুক্ত ছিল। অপরদিকে খায়বারের ইয়াহূদীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স) অনির্ধারিত মেয়াদের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আমরা তোমাদিগকে অবস্থান করিবার সুযোগ দিব যত দিন আল্লাহ তোমাদিগকে অবস্থান করাইবেন" (বুখারী, কিতাবুল মুওয়াদা, বাব ২০)।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, মুসলমানদের সুবিধা ও কল্যাণ। সুতরাং মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান বা সেনাপ্রধান) নির্দিষ্ট, কম বা বেশী কিংবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের যেইটিকে মুসলিম স্বার্থের অনুকূল মনে করিবেন তদনুসারে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে অনির্ধারিত মেয়াদকে নির্ধারিত করিতে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদকে কম-বেশী করিতে কিংবা উত্তম মনে করিলে যথা নিয়মে সন্ধি ভংগ করিবার ঘোষণা দিতে পারিবেন (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬৬; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৩২৫, ৩২৬; ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ২০৫; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৭)।

উপবিধি ঃ উল্লিখিত সন্ধি ভংগ বা বাতিল করার বৈধতা অমুসলিম রাষ্ট্র বা যুদ্ধরত প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কোন অমুসলিম রাষ্ট্র বা জনপদ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সন্ধিবদ্ধ ও জিয্‌য়া প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হইলে তাহা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী (সংখ্যালঘু)-রূপে বিবেচিত হইবে এবং মৌলিক নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে। তাহারা সম্মিলিতরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে বা বিদ্রোহ না করিলে তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাইবে না (বাদাইউস্ সানাই, ৬খ., পৃ. ৭৭)।

উপবিধি ঃ প্রতিপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে বা সন্ধির শর্ত লংঘন করিলে অথবা তাহাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও নির্দেশে তাহাদের কোন দল-উপদল মুসলিম অঞ্চল বা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত আক্রমণ করিলে, অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধির ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্ণ হইলে এবং চুক্তি নবায়ন না করা হইলে— এই সকল অবস্থায় সন্ধিচুক্তি সরাসরি বাতিল হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন প্রকার ঘোষণা বা আগাম সতর্কীকরণ ব্যতীত এবং প্রস্তুতি গ্রহণের সময় ও সুযোগ প্রদান ব্যতীত আক্রমণ পরিচালনা করা বৈধ হইবে।

উপবিধি ঃ সন্ধিবদ্ধ প্রতিপক্ষের কোন দল-উপদল তাহাদের রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, নির্দেশ বা অবগতি ব্যতিরেকে ইসলামী রাষ্ট্র বা উহার সীমান্ত আক্রমণ করিলে উহা রাষ্ট্রীয় ও সার্বিকরূপে সন্ধিভংগ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, বরং উহা ডাকাতি, রাহাজানী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমরূপে ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হইবে। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধিবদ্ধ মক্কার মুশরিক পক্ষ গোপনে সন্ধির শর্ত ভংগ করিবার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধি ভংগের ঘোষণা প্রদান ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যতীত তাহাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহার ফলেই মক্কা বিজয় হইয়াছিল (বুখারীর কিতাবুল মাগাযী ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থাবলীতে মক্কা বিজয় প্রসংগ; আরও দ্র . হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬৩; বাদাই', ৬খ., পৃ. ৭৭; রাদ্দুল মুহতার, ৬খ., পৃ. ২১৭; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., পৃ. ১৩৩; ফাতহুল কাদীর, ৫খ., পৃ. ২০৬; আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৭৯)।

বিধি ঃ সন্ধি বা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কোন কাফির ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা রাজ্য ইসলামী রাষ্ট্রের (দারুল ইসলাম) আনুগত্য স্বীকার করিলে অর্থাৎ যিম্মী হওয়ার প্রার্থনা বা স্বীকারোক্তি করিলে ও চুক্তিবদ্ধ হইলে তাহার বা তাহাদের জন্য স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা সাধারণ মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার এবং তাহাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন পালনে স্বাধিকার লাভ করিবে।

উপবিধি ঃ কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে জিয্‌য়া রহিত হইবে।

উপবিধি ঃ যিম্মীরা বিদ্রোহ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলে বা মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অঞ্চলে তাহাদের দখল প্রতিষ্ঠা করিলে অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রে (দারুল হারব) চলিয়া গেলে যিম্মী চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে।

সাময়িক নিরাপত্তা বিধি ঃ যুদ্ধবিহীন স্বাভাবিক শান্তি পরিস্থিতিকালে অথবা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলাকালে অথবা যুদ্ধ সমাপ্তিকালে কোন কাফিরকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন কাফির দল বা গোত্র বা কোন দুর্গবাসী, নগরবাসী বা দেশবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইলে উহা কার্যকর

হইবে এবং নিরাপত্তা প্রদত্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আঘাত করা যাইবে না বা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাইবে না।

বিধি ঃ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলিবার সংগীন মুহূর্তেও মারণাস্ত্রের মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া বা অন্য কোন কারণে যদি কোন কাফির (সে যতই দুর্ধর্ষ ও দুর্দমনীয় হউক) স্বীয় অস্ত্র সংবরণ করিয়া কলেমা উচ্চারণ করে অথবা যে কোন ভাষায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় তবে তখনই সে নিরাপত্তা লাভ করিবে এবং মৃত্যুভয়ে অথবা প্রতারণা করিতেছে এই অজুহাতে তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। হুরুকাত ও জাযীমা অভিযানে প্রেরিত উসামা (রা) এইরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষকে হত্যা করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন (বুখারী, ১খ., কিতাবুল জিহাদ, বাব ১১; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬১২ ৬২২; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৩১৬)।

গনীমত (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের বিধান

কতিপয় পরিভাষা

গনীমত (الغنيمة বা المغنم) ঃ যুদ্ধে ও প্রত্যক্ষ আক্রমণে পরাজিত বা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত (ক) অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ, (খ) ভূমি, (গ) পরাজিত কাফির-বাহিনী ও তাহাদের পরিবার-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি গনীমত হিসাবে গণ্য।

ফায় (الفئ) ঃ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ব্যতীত মুসলিম বাহিনীর প্রভাবে ভীত হইয়া আত্মসমর্পণকারী ও বশ্যতা স্বীকারকারী কাফিরদের অস্থাবর সম্পদ ও ভূমি এবং তাহাদের নিকট হইতে আহরিত জিয্য়া ও খারাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধভীতি ও আক্রমণোদ্যম ব্যতীত পারস্পরিক সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইলে সেই সম্পদ কতক ফকীহ্র মতে ফায়ভুক্ত হইবে এবং কতকের মতে উহা গনীমতও নয়—ফায়ও নয়। তবে উহার বিধান ফায়-এর অনুরূপ হইবে। উপহার-উপঢৌকন, ছিনতাই, চুরি ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত কাফির (হারবী)-এর সম্পদ ফায়ভুক্ত হইবে না।

নাফ্ল বা তানফীল (نفل/تنفيل) ঃ যুদ্ধ প্রকালে বা যুদ্ধ চলাকালে ইমাম বা সেনাপ্রধানের পক্ষ হইতে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি, ছোট দল বা ব্যাপকরূপে সেনাবাহিনীর জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য বা কোন সম্পদ অথবা গনীমতের অংশবিশেষ অথবা 'সালাবা' পুরস্কার হিসাবে প্রদানের ঘোষণাকে তানফীল এবং এইরূপ প্রদেয় বস্তু-সম্পদকে নাফ্ল বলে।

সালাব (سلب) ঃ প্রতিপক্ষ যোদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, বাহন ও আসবাবপত্র।

জিয্য়া (جزية) ঃ সন্ধিবদ্ধ বা আত্মসমর্পণকারী অথবা মুক্তি প্রদত্ত কাফির বন্দীদের উপর আরোপিত ব্যক্তিগত কর যাহা চুক্তির শর্তানুসারে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রমজীবী এই তিন স্তরে নির্ধারিত হারে ধার্য হয়।

খারাজ (خراج) ঃ বিজিত শত্রুভূমিতে আরোপিত 'ভূমিরাজস্ব' বা খাজনা। পরাজিত কিংবা চুক্তিবদ্ধ কাফির অধিবাসীদেরকে তাহাদের ভূমি অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া অথবা তাহাদিগকে

উৎখাত করিবার পরে অপর কোন কাফির সম্প্রদায়কে আবাসনের সুযোগ প্রদান করিয়া ইহা ধার্য করা হয় (এইরূপ ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় মুসলিম মালিকানাভুক্ত হইলেও উহাতে 'খারাজ' অব্যাহত থাকে)।

বিধি ঃ গনীমতের অন্যতম অংশ যুদ্ধলব্ধ যাবতীয় অস্থাবর সম্পদ প্রথমে পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক-পঞ্চমাংশ (যাহা খুমুস নামে অভিহিত) সরকারী সংরক্ষণে থাকিবে। অবশিষ্ট চার অংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

উপবিধি ঃ পদাতিক যোদ্ধা এক অংশ এবং অশ্বারোহী দুই অংশ, মতান্তরে অশ্বারোহী তিন অংশ, যোদ্ধা-এক ও ঘোড়া দুই অংশ হারে বণ্টিত হইবে। হানাফী মাযহাবমতে ইসলামী রাষ্ট্রে (দারুল ইসলাম) প্রত্যাবর্তনের পর গনীমত বণ্টন করিতে হইবে। তবে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে (দারুল হারবে) বণ্টন করিলেও তাহা কার্যকর হইবে।

উপবিধি ঃ শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যোদ্ধাগণ উক্ত হারে গনীমতের অংশ লাভের অধিকারী হইবে। দারুল ইসলামের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দারুল হারবে প্রবেশকারী অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণকারী সকল যোদ্ধা এই ক্ষেত্রে সমান সাব্যস্ত হইবে।

বিধি ঃ যুদ্ধে পরাজয় বরণকারী যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ (ক) নারী ও শিশু ব্যতীত সকল যোদ্ধা পুরুষকে হত্যা করিতে পারিবেন এবং নারী ও শিশুদিগকে দাস-দাসী বানাইয়া রাখিতে পারিবেন; (খ) নারী-শিশুসহ সকল পুরুষকে দাস বানাইয়া রাখিতে পারিবেন; (গ) যিম্মীরূপে সকলকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন জিযিয়া ধার্য করিতে পারিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ না করিলেও এমন ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন যে, অচিরেই দাসপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধবন্দীদিগকে গোলাম-বাঁদী বানানো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নীতি নহে, বরং মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া, যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা কিংবা সম্পূর্ণ যুদ্ধবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান তাঁহার নীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) দাস-দাসী বানানোকে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করিয়াছেন।

বিধি ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ যুদ্ধের কৌশলের অংশরূপে এবং নিজেদের বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ আক্রমণের উদ্দেশ্য না থাকিলে) পলায়ন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাকে সাতটি ধ্বংসাত্মক মহাপাপ (اَكْبَرُ الْكَبَائِر) -এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (মুসলিম, ১খ., কিতাবুল ঈমান, পৃ. ৬৪)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ. وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ

তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল" (৮ ঃ ১৫-১৬)।

বিধি ঃ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধরত প্রতিপক্ষের নিকট যুদ্ধাস্ত্র ও যে কোন প্রকার সমরোপকরণ বিক্রয় করা যাইবে না। যুদ্ধ চলাকালীন ও সন্ধিকালীন উভয় সময়ের জন্য এই বিধান অভিন্ন (হিদায়া, ২খ., পৃ. ৫৬; রদ্দুল মুহতার, ৬খ., পৃ. ২১৮; আল-বাহরুর রাইক, ৫খ., ১৩৮; ফাতাওয়া আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৯৭-১৯৮)।

বিধি ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি মৃত্যুবরণ করিলে বা নিহত হইলে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাহাকেও নূতন সেনাপতি নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা বা অবকাশ না রাখিলে কোন সাহসী আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধার জন্য সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং নিজকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করা বৈধ। মূতা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়োজিত তিনজন সেনাপতি পরপর শাহাদাত বরণ করিলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল (বুখারী, ১খ., কিতাবুল জিহাদ, বাব ১৮৩, হাদীছ নং ৩০৬৩; ২খ., কিতাবুল মাগাযী, মূতা অভিযান অধ্যায়; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ২০৮-২০৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি.; (৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ তা. বি.; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৭ হি.; (৫) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, বিশেষত ১খ., কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল জিয্‌য়া, কিতাবুল খুমুস, ২খ., কিতাবুল মাগাযী, দেওবন্দ, ইউপি ১৪০৭ হি.; (৬) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ২খ., কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল ইমারাহ, দারুল ইশা'আত আল-ইসলামিয়্যা, কলিকাতা তা. বি.; (৭) আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন আলী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ২খ., কিতাবুস সিয়ার, দেওবন্দ, তা. বি.; (৮) ইমাম আবূ দাঊদ, সুনান আবী দাঊদ, দারুল ইশা'আত, কলিকাতা ১৪০০ হি.; (৯) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী, ৬খ., ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৪০৭/১৯৮৭; (১০) আল-কাসানী, বাদাই'উস-সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই' ৬খ., ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪১৯/১৯৯৮; (১১) ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ৬খ., পাকিস্তান তা. বি.; (১২) মুহাম্মাদ ইব্ন নুজায়ম মিসরী, আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযিদ দাকাইক, মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা, ১ম সং.,দেওবন্দ,সাহারাপুর ১৪১৯/১৯৯৮; (১৩) মুহাম্মাদ আমীন ইব্ন আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, ৬খ., দারুল কুতুব, ১ম মু., বৈরূত ১৪১৫/১৯৯৪; (১৪); ফাতাওয়া আলামগীরী, ২খ., দেওবন্দ তা. বি.; (১৫) মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও ডঃ মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ সংকলিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় ভাগ, ১ম সং., ই. ফা. বা., ঢাকা ১৪২১/২০০১, পৃ. ৩০৩।

মুহাম্মদ ইসমাইল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল

মক্কী জীবন

নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা বা সঙ্গী-সাথীগণের পরামর্শ তাঁহার মুখ্য চালিকাশক্তি ছিল না। তাই তাঁহার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বা গোটা রণকৌশলই ছিল আল-কুরআন ভিত্তিক। আল-কুরআনের জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহে এবং হাদীছ গ্রন্থসমূহের কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছসমূহে ইহার রূপরেখা পাওয়া যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষাকৌশল মূলত মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের তথা আল-কুরআন ও আল- হাদীছেরই প্রতিরক্ষা কৌশল। যেহেতু ইহার বাস্তবায়ন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বারাই এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ঘটিয়াছে, তাই ইহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল বলা যাইতে পারে।

মক্কার দীর্ঘ তেরটি বৎসরে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া প্রিয়নবী (স) ও তদীয় সহাবীগণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে কিন্তু তিনি প্রত্যাঘাত করেন নাই।

মহানবী (স) মক্কার মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যক লোককে দুইবারে সুদূর হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) প্রেরণ করেন। সকলেই মক্কা ত্যাগ করিয়া বিদেশের পথে পাড়ি জমাইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে ধাওয়া করিয়াছিল মক্কার কাফিরগণ। তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিতে ব্যর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে মক্কায় ফেরত আনার জন্য ইথিওপীয়-রাজ ও তাঁহার সভাষদগণকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল সেইদেশে পাঠায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রিয়নবীর এক বিরাট সংখ্যক সাথী ইথিওপীয় সম্রাটের বদান্যতায় সেই দেশে আশ্রয় লাভ করিলেন। কুরায়শ প্রতিনিধিগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া সেই দেশ হইতে ফিরিয়া আসে।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সাহাবী আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম আল-মাখযূমী (রা)-র বাড়ী দারুল আরকাম ছিল একটি নিরাপদ স্থান। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে এইরূপ একটি নিরাপদ স্থানের প্রয়োজন ছিল। কেননা মক্কার কুরায়শরা তখন মুসলমানদের উপর এমনভাবে নির্যাতন চালাইয়া যাইতেছিল যে, কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এই কথা প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে একদা একটি সুরক্ষিত স্থানে সাহাবীগণের একত্র নামায আদায় করার বিষয়টি একদল পৌত্তলিকের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে তাহারা এতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠে যে, মুসলমানদিগকে গালিগালাজ করিতে শুরু করে। জবাবে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) একজন শত্রুকে এমন প্রত্যাঘাত

করিলেন যে, তাহার দেহ হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িল। ইসলামে উহাই ছিল সর্বপ্রথম রক্তপাতের ঘটনা। এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা বারবার ঘটিলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কাবশত নবী করীম (স) দারুল আরকা'ম নামক বাড়ীটিকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করেন।

হজ্জ উপলক্ষে আবহমান কাল হইতে গোটা আরবের লোকজন মক্কায় প্রতি বৎসর আগমন করিত। নবুওয়াতের ১১শ, ১২শ ও ১৩শ বৎসরে মহানবী (স) মদীনা হইতে আগত হজ্জযাত্রীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছান এবং তাহাদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহাদিগকে যথাক্রমে আকাবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বায়'আত নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম বৎসর ছয়জন, দ্বিতীয় বৎসর বারজন এবং তৃতীয় বৎসর ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন (দ্র. আওজাযুস সিয়ার, আরবী, মুফতী আমীমুল ইহসান প্রণীত, বঙ্গানুবাদ মুখতাসার নবী চরিত, মহানবী স্মরণিকা, ১৪১৮ হি., পৃ. ২২)।

আকাবার প্রথম বায়'আতের শর্তাবলীতে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন দফা ছিল না বটে, তবে পরবর্তী আকাবার বায়'আত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের দিক হইতে গুরুত্বের অধিকারী। উক্ত বায়'আতের বিবরণ দিতে গিয়া কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

"সেই রাত্রে আমরা অন্যান্য সহযাত্রীর সঙ্গে তাঁবুতে ঘুমাইলাম। রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হইলে আমরা আকাবার উদ্দেশে বাহির হইলাম। আমরা অতি সন্তর্পণে নিশাচর পাখীর মত বাহির হইলাম। এইভাবে আমরা আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হইলাম। আমরা ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা"। রাবী বলেন, আমরা আকাবার গিরিপথে সমবেত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার চাচা আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব। তখনও তিনি মুসলমান হন নাই। তবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আলোচনায় উপস্থিত থাকা ও তাঁহার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার আদায়কে জরুরী মনে করিয়াছিলেন। উপস্থিত আওস ও খাযরাজ বংশীয় লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব বলিলেন।

ان محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قو منا ممن هو على مثل رائينا فيه فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده وانه قد ابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه عن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذ لوه بعد الخروج به اليكم فمن الان فدعوه فانه فى عز ومنعة من قو مه وبلده.

"আমাদের কাছে মুহাম্মাদের কী মর্যাদা তাহা তোমাদের অজানা নাই। আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁহার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। কিন্তু তবুও তিনি আপনাদের কাছে চলিয়া যাইতে ও আপনাদের মাঝে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনারা যদি তাঁহাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সক্ষম হন তবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। পক্ষান্তরে যদি আপনারা মনে করেন, আপনারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, শত্রুর হাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন তাহা হইলে বরং এখনই ছাড়িয়া দিন। কারণ তিনি স্বগোত্রে ও স্বদেশে নিরাপদেই আছেন"।

কা'ব (রা) বলেন ঃ

فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما احببت.

"আমরা তাঁহাকে বলিলাম, (হে আব্বাস!) আমরা আপনার বক্তব্য শুনিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের এবং আপনার রবের জন্য আমাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার নেওয়া ভাল মনে করেন তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন।"

রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বক্তব্য শুরু করিলেন। প্রথমে তিনি আল-কুরআন হইতে তিলাওয়াত করিলেন এবং তাহাদিগকে মহান আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন ঃ

ابايعكم على ان تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم.

"আমি এই মর্মে তোমাদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিতেছি যে, তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদিগকে যেইভাবে রক্ষা কর, ঠিক সেইভাবে আমাকেও রক্ষা করিবে।"

তখন গোত্রপতি বারাআ ইব্ন মা'রূর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ

نعم والذى بعثك بالحق (نبيا) لنمنعك مما نمنع ازوازنا منه فبايعنا يا رسول الله فنحن والله ابناء الحروب واهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر.

"হাঁ, যিনি আপনাকে সত্যসহ নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে রক্ষা করিব যেইভাবে আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়া থাকি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি আমাদের বায়'আত গ্রহণ করুন! আল্লাহ্র কসম! আমরা যুদ্ধে পারদর্শী। বহু সমরাস্ত্র আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি।"

রাবী কা'ব (রা) বলেন, বারা'আ ইব্ন মা'রূরের কথার মাঝখানে আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়্যিহান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! ইয়াহূদীদের সহিত আমাদের সন্ধিচুক্তি রহিয়াছে। এখন আমরা তাহা ছিন্ন করিতে চাই। এমন তো হইবে না যে, আমরা এইরূপ করার পর আল্লাহ

তা'আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করিবেন, তখন আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিবেন? এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মৃদু হাসিয়া বলিলেন ঃ

بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم منى احارب من حاربتم واسالم من سالمتم.

"তোমাদের রক্ত আমার রক্ত! তোমাদের জীবন-মরণের একই সূত্রে গ্রথিত থাকিবে আমার জীবন-মরণ। আমি তোমাদের আর তোমরা ও আমার। তোমরা যাহাদের সহিত লড়াই করিবে আমিও তাহাদের সহিত লড়াই করিব এবং তোমরা যাহাদের সহিত শান্তি স্থাপন করিবে আমিও তাহাদের সহিত শান্তি স্থাপন করিব" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩৯, ই. ফা. অনু., সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৯৫-৯৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৬৫-১৬৭)।

আকাবার উক্ত বায়'আতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি যে কত গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইয়াছে তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট, বরং উহাই ছিল বায়'আতের আসল শর্ত। ইহা ছাড়া অন্য শর্তগুলিও প্রতিরক্ষার জন্য সহায়ক ছিল। তাই ঐ শর্তগুলিসহ হযরত জাবির (রা)-এর বরাতে ইমাম আহ্মাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি উদ্ধৃত করা হইল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি কি শর্তে আমরা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ

(١) على السمع والطاعة فى النشاط والكسل

(٢) وعلى النفقة فى العسر واليسر

(٣) وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

(٤) وعلى ان تقوموا فى الله لا تأخذكم فى الله لومة لائم

(٥) وعلى ان تنصرو نى اذا قدمت اليكم وتمنعونى مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنة.

(১) "এই শর্তে যে, সুখে-সম্পদে ও বিপদে-দুর্বিপাকে তোমরা আনুগত্য করিবে; (২) সুসময়েও অসময়ে তোমরা ব্যয় করিবে; (৩) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে; (৪) আল্লাহ্‌র রাহে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার তোয়াক্কা করিবে না; (৫) আমি যখন তোমাদের নিকট চলিয়া যাইব তখন তোমরা আমার সাহায্য-সহযোগিতা করিবে এবং তোমাদের নিজদিগকে, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে যেইভাবে রক্ষা কর তেমনি আমাকেও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে"।

উবাদা ইব্নুস সামিতের বর্ণনায় ইব্ন ইসহাকের অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত রহিয়াছে ঃ

(٦) ان لا ننازع الامر اهله.

"শাসন ক্ষমতা লইয়া শাসকদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইব না" (আর- রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৬৬)।

যখন বায়'আতের শর্তাবলী সম্পর্কে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল তখন প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় আকাবায় শপথ গ্রহণকারী দুইজন এই ব্যাপারে তাহাদের স্বগোত্রীয়দিগকে তাগিদ প্রদান এবং তাহাদের আনুগত্যকে মযবুত ও নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখেন এবং তাঁহাদের এই শপথ গ্রহণের দ্বারা তাঁহারা যে গুরুদায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইতেছেন সেই ব্যাপারে তাহাদিগকে সচেতন করার জন্য আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাদলা (রা) বলেন ঃ

هل تدرون على ماتبايعون هذا الرجل.

"তোমরা কি জান, ঐ ব্যক্তির সহিত তোমরা কী গুরুতর বায়আতে আবদ্ধ হইতে যাইতেছ"?

তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ, আমরা জানি। তখন তিনি বলিলেন ঃ

انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا والاخرة وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والاخرة.

"তোমরা তাঁহার হাতে বায়'আতের মাধ্যমে মানবজাতির গৌর-কৃষ্ণ সকলের তথা আরব ও আজমের সহিত বিরোধিতার মুখামুখী। যদি তোমরা মনে কর যে, তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত এবং তোমাদের নেতাদের নিহত হইতে দেখিয়া তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে তাহা হইলে বরং এখনই তাহা কর। কারণ আল্লাহ্র কসম! তখন যদি তোমরা তেমন কিছু কর তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হইবে। পক্ষান্তরে নিজেদের প্রতি যদি তোমাদের এই আস্থা থাকে যে, তোমরা তাঁহাকে দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতে ধন-সম্পদের যতই ক্ষতি হউক, যত নেতাই নিহত হউক না কেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! ইহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর" (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২)।

আকাবার বায়'আতের আলোচনায় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মদীনার মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ণ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে মদীনায় হিজরতের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রতি মনোযোগের পাশাপাশি নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের প্রতিও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন গোত্রের সহিত সহঅবস্থানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করেন।

ভ্রাতৃবন্ধন ঃ প্রতিরক্ষার মযবুত বুনিয়াদ

সৈনিকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ হইতেছে প্রতিরক্ষার অন্যতম মযবুত বুনিয়াদ। আল-কুরআনে গোটা মুসলিম জাতিকে এক ভ্রাতৃসমাজ বলিয়া অভিহিত করিয়া বিশ্বের মুসলমানগণকে ভাই ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ.

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর " (৪৯ ঃ ১০)।

লক্ষণীয় যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কুরআনুল কারীমে ইহা তো আছেই, তদুপরি এই কথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কোন কারণে ঝগড়াঝাটি বা বিরোধ হয় তাহা হইলে উহা মিটাইয়া দাও ঃ হে মু'মিন সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের ভাইদের এই বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ অবিলম্বে মিটাইয়া দিতে তৎপর হও, যাহাতে মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হইয়া না পড়ে। তাই একদিকে যেমন ভ্রাতৃত্ব বিনাশী হিংসা-বিদ্বেষ, পারস্পরিক বিদ্রূপ-উপহাস, নিন্দা, গীবত, গালিগালাজ করা, এমন কি একে অপরকে খোঁটা দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অপরদিকে তেমনি পারস্পরিক কোন্দল সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে,

وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

"এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবেনা, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে" (আনফাল ঃ ৪৬)।

অনুরূপ অনেক হাদীছেও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যেমন ঃ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا.

"এক মু'মিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ। ইমারতের এক অংশ যেমন অপর অংশকে মযবূত করে তেমনি এক মু'মিন অপর মু'মিনের শক্তি বৃদ্ধি করে" (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবঃ মু'মিনদের পারস্পরিক সহযোগিতা; মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস-সিলা, মু'মিনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি অধ্যায়, হাদীছ নং ২৫৮৫; রিয়াদুস্ সালিহীন, ২২৪)।

হযরত নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى.

"মু'মিনগণ পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সহযোগিতায় একটি দেহের মত। দেহের যে কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হইলে গোটা দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে ভোগে" (বুখারী, কিতাবুল আদাব,

মানবজাতি ও পোষ্যাদির প্রতি দয়ার্দ্রতা প্রসঙ্গে; মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস-সিলা, মু'মিনদের প্রতি সদয় ও সহযোগী হওয়া, হাদীছ নং ২৫৮৬)।

অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই; সে তাহার প্রতি যুলুম করিবে না এবং তাহাকে তাহার শত্রুর নিকট সোপর্দও করিবে না। যে ব্যক্তি তাহার কোন মুসলিম ভাইয়ের কোন অভাব পূরণ করিবে আল্লাহ তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিবেন। যে কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমের কষ্ট মোচন করিবে উহার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহার পারলৌকিক কষ্ট মোচন করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করিবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির দোষ গোপন রাখিবেন" (বুখারী, ৫/৭০-৭১; মুসলিম, হাদীছ ২৫৭০; রিয়াদুস্ সালিহীন, ২৩৫/১২)।

আল-কুরআন ও হাদীছে এইরূপ তাগিদ আসার ফলে একটি সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মুসলমানদের মধ্যে গড়িয়া উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই বন্ধন এতই দৃঢ় যে, আজও ফিলিস্তীন, ইরাক, আফগানিস্তানে অথবা চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিপাইন, কাশ্মীর ও সিংকিয়াং-এর যে কোন জায়গায় একটি মুসলমানের আর্তনাদ শুনিতে পাইলে গোটা বিশ্বের মুসলমানের গা শিহরিয়া উঠে এবং মযলুমদের প্রতি তাহাদের সহমর্মিতা জাগিয়া উঠে।

আল-কুরআন-হাদীছের উক্তরূপ শিক্ষাবলী গোড়া হইতেই মুসলমানদিগকে এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। হিজরতের পর উহাতে নূতন মাত্রা যোগ হইল। মুহাজিরগণ যেমন একমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে রওয়ানা হইয়া আল্লাহ-প্রেম ও নবী প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, মদীনাবাসী মুসলমানগণও তেমনি তাঁহাদের যথাসর্বস্ব নবী করীম (স) ও তাঁহাদের মুহাজির ভাইদের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

মদীনা তখনও নগর হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই; উহা তখন ইয়াছরিব নামে একটি কৃষি নির্ভর অঞ্চল। নগদ অর্থ-সম্পদ যাহাদের হাতে ছিল তাহারা ছিল ধর্মত ইয়াহূদী। মক্কা হইতে পর্যায়ক্রমে কয়েক শত মুহাজির আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের সংবাদ পাইয়া ইতোপূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ন্যূনাধিক এক শত সাহাবীও মদীনায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের না ছিল মাথা গুজিবার ঠাঁই, না ছিল জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়। এমতাবস্থায় এই মুহাজিরদের পুনর্বাসন সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মদীনাবাসী মুসলমানগণ শুধু অম্লান বদনেই নহে, হাসিমুখে প্রশান্ত হৃদয়েই তাঁহাদের মুহাজির ভাইগণকে গ্রহণ করিলেন। শায়খুল হাদীছ তফাজ্জল হোছাইন মদীনাবাসীদের ঐ আন্তরিকতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এইভাবে ঃ

"সুহৃদ আনসারগণ নবাগত অতিথিগণের সুখ-সুবিধার জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন। নিজেদের এবং পরিবারবর্গের কথা ভুলিয়া তাহারা সর্বাগ্রে মুহাজির ভাইদের থাকা, খাওয়া ও পরার চিন্তা করিতেন। মেহমানদের সুখ-শান্তিকেই তাঁহারা নিজেদের সুখ-শান্তি বলিয়া মনে করিতেন। দীনী ভাইদের খিদমতের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। কিন্তু পাছে কোন ত্রুতি ঘটে কিংবা তাহাদের সেবা-যত্ন কোন মেহমানের মনঃপূত না হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের মন সর্বদাই সঙ্কুচিত থাকিত। পক্ষান্তরে আত্মনির্ভরশীল মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, হাতে একটি কানাকড়ি পর্যন্ত ছিল না। একাধারে আনসার ভাইদের কৃপা গ্রহণ করা হইতেছে অথচ প্রতিদানের কোন উপায় নাই। এইজন্য সতত্তই তাঁহাদের অন্তরে সঙ্কোচ, চোখে মুখে একটা জড়সড় ভাব বিদ্যমান থাকিত। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই, বাসস্থানের কোন অসুবিধা নাই; কিন্তু পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা এবং অন্যের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা তাঁহাদের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। আত্মমর্যাদা জ্ঞান দিন দিন তাঁহাদের সঙ্কোচ বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। তাই রাসূলুল্লাহ (স) ভাবিলেন,ইহাদিগকে একটা আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলে এই সঙ্কোচ ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইবে" (হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স)ঃসমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৪৩৩)।

সেই মোতাবেক একটু স্বস্তি মিলিতেই রাসূলুল্লাহ (স) এদিকে মনঃসংযোগ করিলেন। একদিন হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর গৃহে নব্বইজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। ইহার অর্ধেক মক্কা হইতে আগত মুহাজির এবং অর্ধেক মদীনাবাসী আনসার ছিলেন। নবী করীম (স) অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের মধ্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুহাজিরে মুহাজিরে, আনসারে আনসারে আনুষ্ঠানিক ভ্রাতৃবন্ধন জুড়িয়া দিলেন। ইহা হিজরতের আট মাস পরের ঘটনা (আসাহ্হুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ৬৬-৭৭)।

এ ভ্রাতৃ সম্পর্ক অনুমোদন করিয়া আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে, হিজরতও করিয়াছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়া আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পরের বন্ধু" (৮ ঃ ৭২)।

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত ও পেশায় ব্যবসায়ী মক্কার মুহাজিরগণ এবং প্রধানত কৃষিজীবি ও ইয়াছরিবের বসবাসকারী আনসারগণকে নবী করীম (স) ভাই ভাই সম্পর্কে জুড়িয়া দিলেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের আয়াত নাযিল করিয়া সেই ভ্রাতৃ সম্পর্ককে শুধু অনুমোদনই করিলেন না, রীতিমত রক্তসম্পর্কের আত্মীয়ের মত একে অপরের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কার্যক্ষেত্রে উহা কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা না জানা পর্যন্ত উহাকে

কেবল একটা চমৎকার নীতিবাক্যই মনে হইবে। তাই ইসলামের ইতিহাসের সেই সোনালী অধ্যায়ের কিছু বাস্তব নমুনা তুলিয়া ধরা আবশ্যক।

ইমাম বুখারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, আনসারদিগের নিকট সম্পদ বলিতে ছিল তাঁহাদের কৃষিজমি ও খেজুর বাগানগুলি, নগদ অর্থকড়ি তাহাদের কিছুই ছিল না। তাই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের খেজুর বাগানগুলি ভাগ করিয়া আমাদের মুহাজির ভাইগণকে উহার অর্ধেক অংশ দিন। তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তির ভাগ এইভাবে মুহাজিরদিগের দখলে চলিয়া যাওয়ার কথা নবী করীম (স)-এর মনঃপূত হইল না। অগত্যা আনসারগণ বলিলেন, ভাইগণ! আমাদের সহিত কৃষিকাজে যোগ দিন, উৎপাদিত ফসলের আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া ভোগ করিব। রাসূলুল্লাহ (স) এইবার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৩১২-৩১৩)।

উক্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যে অপূর্ব সম্প্রীতির সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে মুসলমানদিগের মধ্যে জাতীয় সংহতির সৃষ্টি হয় মূলত উহাই পরবর্তী কালের রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ী সাহাবীগণ এবং তাঁহাদের উত্তরসুরিদের অর্ধবিশ্ব বিজয়ের মত সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তির বুনিয়াদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

আনসার ও মুহাজিরগণের এই ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন একেবারে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি বড় সুফল ইহা হইয়াছে যে, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুহাজিরগণ মদীনার মুসলমানগণকে ইসলামের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাঁহাদিগকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে ডঃ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী বলিয়াছেন ঃ

"বস্তুত ভ্রাতৃত্ববন্ধন মুসলিম সমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এবং উহাকে সুসংহত করে। এইভাবে আওসের একটি ক্ষুদ্র শাখা ও ইয়াহূদীরা ছাড়া মদীনার সমগ্র জনগোষ্ঠীই ধর্মীয় বন্ধনের ভিত্তিতে এক অখণ্ড সমাজে পরিণত হয়। মুসলমানদের নূতন সামাজিক সচেতনতাবোধের সর্বোত্তম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হযরত সালমান ফারসীর বক্তব্যে। তাঁহাকে তাঁর বংশপরম্পরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিয়াছিলেন, 'আনা সালমান ইব্ন ইসলাম— আমি সালমান, ইসলামের সন্তান' (Organisation of Goverment Under the Prophet (Sm)-এর বাংলা অনু. রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৪; বরাত উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ২খ., পৃ. ৩২২; আল-ইসাবা ফী তাম্‌ঈযিস সাহাবা, ২খ., পৃ. ৬০; আল-ইস্তী'আব, ২খ., পৃ. ৫৪)।

মদীনা সনদ ও অন্যান্য সন্ধিচুক্তি

ডক্টর ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকীরই ভাষায় ঃ "মুআখাত বা ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের পর মহানবী (স)-এর সনদসমূহ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মদীনার জনসাধারণকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আওতায় আবদ্ধ করে" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪)।

মদীনার ঐ সময়ের অধিবাসীদের একটি হিসাব লইলে দেখা যায়, সেখানে তখন প্রধানত চারি শ্রেণীর লোকের বাস ছিল ঃ

১. মুসলিমগণ-আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়

(২) আওস ও খাযরাজের সেই অংশ যাহারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করিলেও গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আল-কুরআনের ভাষায় ইহারা হইল মুনাফিক যাহারা জাহান্নামের অধিবাসী (দ্র. ৪ ঃ ১৪৫)।

(৩) আওস ও খাযরাজের ঐ অংশ যাহারা পৌত্তলিক ছিল, তবে দ্রুত গতিতে ইসলামের দিকে ঝুঁকিতেছিল।

(৪) ইয়াহূদী সম্প্রদায়ঃ শিক্ষা-দীক্ষায় অর্থবিত্তে উহারা অগ্রসর ছিল। বনূ কায়নুকা, বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা নামক তাহাদের তিনটি প্রধান গোত্র ছিল। জাহিলিয়্যা যুগে উহারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে আর কোনদিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে সেজন্য সদা সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। মূলত ইহারাই ছিল মুসলমানদের সমান্তরাল প্রতিপক্ষ শক্তি। মক্কার কুরায়শদের সহিতও উহাদের যোগাযোগ ও গোপন মিত্রতা ছিল।

এই দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা ছিল ইসলামের ঘরের গোপন ও বাহিরের শত্রু। এমতাবস্থায় মদীনায় একটি নূতন ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তোলা ছিল এক কঠিন কাজ। শত্রুর আক্রমণ হইতে উহাকে প্রতিরক্ষা করা কঠিন ছিল। বিশেষত এক বিরাট সংখ্যক শত্রু জনতা যখন ঘরের লোক সাজিয়া পরের ইঙ্গিতে ঘরের ক্ষতি সাধনে অহরহ নিয়োজিত থাকে, তখন উহা যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক হইতে পারে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে মক্কার কুরায়শরাও মুসলিম রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিয়া মদীনার ও নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাতির নিরাপত্তা বিধান ছিল অত্যন্ত জরুরী। তাই মদীনার মসজিদ নির্মাণ ও আনসার-মুহাজিরগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েমের পর নবী রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম সেই দিকেই মনোনিবেশ করিলেন। ইহারই ফলে আনসার, মুহাজির, আওস ও খাযরাজ এবং ইয়াহূদী গোত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ইতিহাসে বিখ্যাত মদীনা সনদ নামের চুক্তিপত্রটি প্রণীত হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৭৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২২৪; ড. হামীদুল্লাহ, মাজমু'আত আল-ওছাইক আল-সিয়াসিয়্যা, পৃ. ৪১-৪৭ ও তদীয় উর্দু গ্রন্থ "আহদে নববী কে নেযামে হুক্‌মরানী" পৃ. ১০০-১০৯)। চুক্তিটি আগাগোড়াই ছিল প্রতিরক্ষার স্বার্থে।

ফলে মুসলিমও অমুসলিম নাগরিকগণের সমন্বয়ে একটি সাধারণতন্ত্র গঠনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রথম নজীরটি স্থাপন করেন। সকলকে তিনি একটি সাধারণ বিধিমালার আওতায় নিয়া আসার ফলে

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও নাগরিকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপদ হইতে মদীনা সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইল। এমন চমৎকার প্রতিরক্ষা কৌশলের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

মদীনা চুক্তির প্রতিরক্ষা তাৎপর্য

মদীনা চুক্তির প্রয়োজন ও ইহার গুরুত্ব তদানীন্তন মক্কা ও মদীনার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা না করিলে বুঝা যাইবে না।

মক্কার কুরায়শরা তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাসস্থান ঘেরাও করিয়া, মদীনার পথে তাঁহার (স) ও তদীয় ঘনিষ্ঠতম সাহাবী আবূ বাক্র (রা) বাহির হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এবং তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও হিজরত ঠেকাইতে ব্যর্থ হয়। এইদিকে তাহাদের জীবন ধারণের একমাত্র পন্থা সিরিয়ার সহিত বাণিজ্যের পথটি মদীনার পাশ দিয়া অতিক্রম করায় তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎও ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহারা যে কোন মূল্যে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা মদীনার মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর সহিত রীতিমত পত্র যোগাযোগ শুরু করিয়া দিয়াছিল (আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৬৭; সীরাতুন্নবী, উর্দূ, ১খ., পৃ. ৩০৫)।

ঐদিকে মদীনার পরিস্থিতিও কম জটিল ছিল না। বু'আছ যুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত আওস ও খায্রাজ গোত্রদ্বয় তাহাদের আত্মকলহের মারাত্মক পরিণতির কথা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়া যে কোনভাবে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য যত্নবান ছিল। তাহারা শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যিকেই শীর্ষনেতারূপে রীতিমত অভিষেক অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্ণমুকুট দিয়া বরণ করিয়া লওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল (দ্র. বুখারী, মুসলিম ও মুশরিকদের একত্রে অবস্থানকালে সালাম প্রদান অধ্যায়)। ঠিক এমনি সময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভাগমন, মসজিদ নির্মাণ ও দৈনন্দিন সালাতের জামা'আত প্রতিষ্ঠা এবং আনসার-মুহাজিরের রীতিমত আনুষ্ঠানিক ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে সুসংহত করার দরুন তাহার নেতা হওয়ার স্বপ্ন আর পূর্ণ হইল না। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার প্রচারিত ইসলাম ধর্মের প্রতি সে চরম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, কিন্তু বাহ্যত উহা প্রকাশ করা যে সম্ভব নহে তাহাও সে সম্যক উপলব্ধি করিতেছিল। এমতাবস্থায় গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া তাহার আর করার কিছু ছিল না। সুতরাং কখনও সে মুসলমানদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে বহিষ্কারের উসকানী ও প্ররোচনা দিত (দ্র. ৬৩ ঃ ৮ ও উক্ত আয়াতের তাফসীর), আবার কখনও মক্কার কুরায়শ সর্দারদিগকে সদলবলে মদীনা আক্রমণের জন্যও আমন্ত্রণ জানাইত। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত প্রকাশ্যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) বুখারী ও মুসলিমের বরাতে লিখিয়াছেন যে, একদা খাযরাজ গোত্রের বানুল হারিছ শাখার মহল্লায় মুশরিকীন, মুনাফিকীন ও কিছু মুসলমানের উপস্থিতিতে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে এবং তিনি আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করিলে সে পরম বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠে, "ওহে! তোমার বক্তব্য যদি সঠিকও হইয়া থাকে, তবুও আমাদের মজলিসে আসিয়া তুমি আমাদিগকে বিরক্ত করিবে, উহা আমি পছন্দ করি না। তোমার

কাছে যদি কেহ যায় তবে তাহার কাছে ঐসব বলিও।" তাহার এইসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ হইতেই ষড়যন্ত্রের সম্যক আভাস পাওয়া যাইতেছিল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপর এক প্রকাশ্য শত্রু ছিল আওস নেতা আবূ আমের রাহিব। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে 'বাস্তুহারা' স্বজন-তাড়িত প্রভৃতি শব্দে নিন্দা ও উপহাস করিয়া বেড়াইত। মদীনায় তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া সে মক্কায় চলিয়া গিয়া কুরায়শদের সহিত মিলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। উহুদ যুদ্ধে সে কুরায়শদের পক্ষে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয় যাহাতে তাহারই পুত্র নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত হানযালা (রা) শহীদ হইয়াছিলেন। মক্কা মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইলে সে তা'ইফ গিয়া আশ্রয় নেয়, তারপর তা'ইফও বিজিত হইলে সে সিরিয়ায় পালাইয়া গিয়া বায়যানটাইনীদের সহিত মিলিত হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সেখানেই তাহার পলাতক, বাস্তুহারা-বিড়ম্বিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মক্কার পরিবেশ যে মুসলমানদের হিজরতের পরও কী বিপজ্জনক ছিল উহার প্রমাণ মিলে মদীনার আওস নেতা হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ঘটনা হইতে। মক্কায় উমরা করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার পূর্বের বন্ধু উমায়্যা ইব্‌ন খালফের বাড়ীতে উপস্থিত হন। একদিন যখন তিনি ঐ উমায়্যাকে সঙ্গে লইয়াই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহারা আবূ জাহলের মুখামুখী হইতেই সে উমায়্যার নিকট তাহার পরিচয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত মারমুখী হইয়া উঠে, উমাইয়াকে ভর্ৎসনা করে এবং সা'দকে লক্ষ্য করিয়া রাগত কণ্ঠে বলে, "উমায়্যার সঙ্গে না থাকিলে তুমি প্রাণ নিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিতে না। অবশ্য সা'দ (রা)ও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন, আমাদের সহিত বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করিয়া সিরিয়ার সহিত কীভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক টিকাইয়া রাখ, আমরাও উহা দেখিয়া লইব।

মদীনার কুসীদজীবি ইয়াহূদীরা লক্ষ্য করিল, মদীনার আওস ও খাযরাজরা পূর্বে যেমন হীনমন্যতায় ভুগিত, এমনকি সন্তান লাভের আশায় অনেকে নবজাতককে ইয়াহূদী বানাইয়া দিবে বলিয়া মানত করিত, এখন আর তেমনটি হইতেছে না। ইসলাম তাহাদের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে এক প্রাণচাঞ্চল্যে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের সূদী লেনদেনের বাজার সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া যে ঈসা (আ) ও খৃস্টীয় ধর্মকে তাহারা এতকাল নিন্দা করিয়া আসিয়াছে, ইসলাম আসিয়া তাঁহাকেই আল্লাহ্‌র একজন মহান নবী এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে একটি আসমানী ধর্মের মর্যাদায় স্বীকৃতি দিতেছে, তখন তাহারাও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আল-কুরআনে তাই যথার্থভাবেই তাহাদিগকে ইসলাম ও মুসলমান জাতির প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন মানবগোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ ·

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে" (দ্র. ৫ ঃ ৮২)।

উহার বিবরণ দিতে গিয়া আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) লিখেন ঃ "কুরায়শরা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যিকে পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল না, বরং তাহারা তাহাকে যেইরূপ লিখিয়াছিল তদ্রূপ মদীনা আক্রমণ করিয়া ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করে। দীর্ঘ দিন যাবৎ রাসূলুল্লাহ (স) রাত জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। সুনান আন-নাসাঈতে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম প্রথম মদীনায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেন" (দ্র. সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩০৮)।

আবদুর রহমান ইব্ন আলী আল-জাওযী তো তাঁহার পুস্তকের একটি অধ্যায়ের শিরোনামই দিয়াছেন ঃ

الباب الحادى والعشرون فى ان رسول الله ﷺ كان يحرس بالمدينة .

"একবিংশতম অধ্যায় ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদীনায় পাহারায় রাখা হইত"। তাহাতে আছে ঃ

عن عائشة قالت ارق رسول الله ﷺ ذات ليلة ثم قال اللهم آتنى رجلا صالحا من اصحابى يحرسنى الليلة اذ سمعت صوت السلاح فقال رسول الله ﷺ من هذا قال سعد بن ابى وقاص انا يا رسول الله اتيت احرسك قالت عائشة فنام رسول الله ﷺ حتى سمعت غطيطه .

"হযরত আইশা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের মধ্য হইতে এমন একজন পুণ্যবানকে আমার জন্য পাঠাইয়া দাও যে আমাকে পাহারা দিবে। এমন সময় আমি অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ শুনিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়া উঠিলেন ঃ তুমি কে? সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সা'দ। আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আসিয়াছি। হযরত আইশা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রামগ্ন হইলেন, এমন কি আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাইলাম" (দ্র. আল-ওয়াফা বি- আহওয়ালিল মুসতাফা, পৃ. ২৬৩; সহীহ মুসলিম, সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাসের ফযীলাত অধ্যায়, ২/২৮০; সহীহ বুখারী, আল-গাযও ফী সাবীলিল্লাহ হইতে, প্রহরা অধ্যায়, ১/৪০৪)।

শিবলী নু'মানী অভিমত ব্যক্ত করেন, "মদীনায় পৌঁছিয়া তাই রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বপ্রথম আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার চিন্তা করিতে হয়, শুধু নিজের এবং মুহাজিরগণের জন্যই নহে—আনসারগণের জন্যও। কেননা তাহারা মুসলমানগণকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কুরায়শরা মদীনা ধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ করে এবং তাহাদের সকল গোত্রের মধ্যে সেই আগুন ছড়াইয়া দেয়। এইজন্য তিনি দুইটি পন্থা অবলম্বন করেন। এক, কুরায়শদের শক্তি ও গর্বের উৎস সিরিয়ার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন যাহাতে তাহারা সন্ধি চুক্তিতে বাধ্য হয়। দুই, মদীনার আশেপাশের গোত্রসমূহের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন (দ্র. শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩০৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম মদীনা হইতে তিন মনযিল দূরত্বে অবস্থিত দীর্ঘ পার্বত্য এলাকায় বসতরত জুহায়না গোত্রের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তাহারা মক্কায় কুরায়শ ও মদীনার মুসলমানদের সহিত পক্ষপাতহীন আচরণ করিবে। তারপর ২য় হিজরীর সফর মাসে আবওয়ার দিকে সদলবলে নির্গত হইয়া মদীনার দূরবর্তী সীমান্তে অবস্থিত প্রায় আশি মাইল দূরের এলাকায় বনূ দামরা গোত্রের সহিতও চুক্তিবদ্ধ হন। সুয়েজ খাল খননের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপ-আফ্রিকাগামী কাফেলাসমূহ প্রধানত এই পথ দিয়াই চলাফেরা করিত বিধায় আবহমান কাল হইতে এই এলাকাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এইজন্য এই মহাসড়কের দুই পার্শ্বে বসবাসকারী প্রায় সকল গোত্রের সহিতই রাসূলুল্লাহ (স) মৈত্রী চুক্তি করিয়া মদীনার প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মদীনা গমনের কয়েক মাসের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (স) পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের এলাকাগুলি সফর করিয়া সকলের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ফলে মদীনা হইতে ইয়াম্বু পর্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহ (বনী দামরা, মুদলিজ প্রভৃতি) ইসলাম গ্রহণ না করিলেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কেহ মদীনা আক্রমণ করিলে তাহারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবে। তবে দুই পক্ষের কেহ চুক্তি অনুযায়ী না চলিলে কেহ কাহাকেও সাহায্য করিবে না। মূলত উহা ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যাহার উপর দিয়া বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহ যাতায়াত করিত। মক্কাবাসীরা এই পথেই সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত। এই রাস্তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কুরায়শদের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা বদর যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠে। মুসলমানরা মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত নজদ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করিয়া মক্কাবাসীদের জন্য ইরাক যাওয়ার কষ্টদায়ক পথটিও বন্ধ করিয়া দেয় (বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১০৫)।

এই সমস্ত চুক্তির ধরন সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কেবল বনূ দামরার সঙ্গে কৃত সন্ধির পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة فانهم امنون على امو الهم وانفسهم وان لهم النصرة على من رامهم ان لا يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة وان النبى ﷺ اذا دعاهم لنصره اجابوه الخ.

"এই লিপিটি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বনূ দামরার জন্য।

(১) তাহারা তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে।

(২) যে কোন বহিরাক্রমণের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে এই শর্তে যে, তাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না—যাবত সমুদ্র অন্তত একটি পশমকেও ভিজাইতে থাকে।

(৩) নবী করীম (স) যখন তাহাদিগকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিবেন তখন তাহারা তাঁহাকে সাহায্যদানে বাধ্য থাকিবে"(শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩১১)।

এই চুক্তির অতিরিক্ত ধারারূপে আরও দুইটি বাক্য রহিয়াছে ঃ

(১) তাহারা যতদিন চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হইবে।

(২) এই চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের যিম্মাদারি রহিল (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪; সুহায়লী, রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ৫৮; যুরকানী, ১খ., পৃ. ৪৫৯; মাকতূবাতে নববী, পৃ. ৮২-৮৩)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষাকে মজবুত করার এবং বৃহত্তর বিজয়ের পথ সুগম করার সর্বোত্তম নমুনা হইতেছে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি। ১৪০০ জন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীকে সঙ্গে করিয়া সেইদিন রাসূলুল্লাহ (স) উমরার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন (যিলকদ ৬ হি.)। যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া তাঁহারা কুরবানীর পশুসমূহের গলায় কুরবানীর পশুর প্রতীক চিহ্ন লৌহ পাদুকা ঝুলাইয়া দেন, কিন্তু উসফান নামক স্থানে পৌছিতেই উমরা করার বিষয়ে কুরায়শদের পরম অনীহার কথা জানিতে পারেন। এই সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল উহার প্রতিরক্ষার গুরুত্বই আমাদের প্রতিপাদ্য, তাই সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে উহা মুসলমানদের জন্য নতি স্বীকারমূলক চুক্তি বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিদ্বারাই সর্বপ্রথম ইসলাম একটি অপরাজেয় শক্তি হিসাবে আরবদের কাছে অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং এই চুক্তি দ্বারাই নিরাপদে ইসলামের বাণী বিশ্বদরবারে পৌছাইয়া দেওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্তত পরবর্তী দশ বৎসর কুরায়শদের পক্ষ হইতে আক্রমণের কোন সুযোগ ছিল না, তাই এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ (স) তদানীন্তন বৃহত্তম শক্তিদ্বয় রোমক সম্রাট ও পারস্য সম্রাটসহ সভ্যজগত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশসমূহের রাজন্যবর্গের দরবারে দূত ও পত্র প্রেরণ করিয়া ইসলামের দাওয়াতকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই চুক্তিই পরবর্তী কালে মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধানে বিনা বাধায় মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। আর মক্কা বিজয় হওয়া মাত্র আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ দলে দলে মদীনায় হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের তিনদিন পর মদীনার পথে রওয়ানা হইলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.

"আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি" (৪৮ ঃ ১)।

আল্লামা ইব্ন কাছীরের ভাষায় ঃ "এই সন্ধিকে উহার অন্তর্নিহিত মঙ্গলসমূহ ও পরিণতির দিক হইতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, বিজয় বলিতে তোমরা মক্কা বিজয়কে গণ্য করিয়া থাক, আর আমরা বিজয় বলিতে গণ্য করি হুদায়বিয়ার সন্ধিকে। ইমাম বুখারী হযরত বারা'আ

ইব্‌ন 'আযিব (রা)-এর বিবরণে উল্লেখ করেন, তোমরা বিজয় বলিতে মক্কা বিজয়কে গণ্য করিয়া থাক। মক্কা বিজয় একটি বিজয় ছিল উহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে গণ্য করি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়কার বায়'আতে রিদওয়ানকে" (মুখতাসার তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯)।

এই সময় কুরায়শদের পক্ষ হইতে আক্রমণের আর কোন আশঙ্কা না থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) নির্বিঘ্নে খায়বার অভিযান করিয়া সেই বিরাট বিজয় ও বিপুল গনীমত সামগ্রীর অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন যাহা মদীনার মুসলমানদিগের মধ্যে সচ্ছলতা আনিয়া দিয়াছিল। আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা যে প্রতিরক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান উহাও অর্জিত হইয়াছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধি যে সুস্পষ্ট বিজয় ছিল উহার সমর্থনে সায়্যিদ কুতব শহীদ লিখেন, "বিজয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্য হইতে একটি হইল দাওয়াত তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিজয়। ইমাম যুহরী বলেন, ইসলামের আগমনের পর হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে ইহার ন্যায় এত বিরাট বিজয় সংঘটিত হয় নাই। যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। এক পক্ষের লোকজনের কাছে অপর পক্ষের লোকজনের প্রাণের নিরাপত্তা ছিল। পরিশেষে বাদানুবাদে উভয় পক্ষ মীমাংসায় উপনীত হইয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করিল। এ সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অসংখ্য অমুসলিম নর-নারী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল যাহাদের সংখ্যা ইতিপূর্বে দীক্ষিত মুসলমানদের সমান বা উহার চাইতে বেশী" (ফী যিলালিল কুরআন, বাংলা অনু., ১৯ খ., পৃ. ১৫৬-১৫৭)।

যুহরীর বক্তব্যই আরও বিশদভাবে উদ্ধৃত করিয়া ইব্‌ন হিশাম নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করেন,

"পূর্বে যেখানেই লোকজন সমবেত হইত বা পারস্পরিক সাক্ষাৎ হইত সেখানেই যুদ্ধের সূচনা হইত। এই সন্ধি স্থাপিত হইলে সেই যুদ্ধের অবসান হইল এবং লোকজন একে অপর হইতে নিরাপত্তাবোধ করিতে লাগিল। তখন পারস্পরিক সাক্ষাতে তাহারা আলাপ-আলোচনা, ভাব বিনিময়, বিতর্ক ও বাদানুবাদের সুযোগ পাইল। যখন কেহ ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা বলিত এবং উহা কাহারো বোধগম্য হইয়া যাইত তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করিত। ফলে দুই বৎসর এত অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করিল যাহা ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারীদের সমান, বরং সেই সংখ্যাকেও অতিক্রম করিয়াছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন, যুহরীর এই বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ হইল রাসূলুল্লাহ (স) যখন হুদায়বিয়ার দিকে যাত্রা করেন তখন জাবীর ইব্‌ন আবদুল্লাহর ভাষ্য অনুসারে তাঁহার সঙ্গীসাথীর সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। পক্ষান্তরে দুই বৎসর পর মক্কা বিজয়ের সময় যখন তিনি পুনরায় যাত্রা করেন তখন তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার (ইফা প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য সীরাতুন্নবী, ৩ খ., পৃ. ৩৩৮-৩৩৯)।

"প্রকৃত তথ্য হইতেছে, সাহাবীগণের জিহাদের বায়'আত এবং মামুলী বাদানুবাদের পর বিদ্বেষপরায়ণ কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়া এবং নবী করীম (স)-এর যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণশক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি ব্যাপারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং কেবল বায়তুল্লাহর সম্মানার্থে তাহাদের আবদারসমূহ অর্থহীন হওয়া সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হওয়া প্রভৃতি একদিকে আল্লাহর রহমত আকর্ষণের মাধ্যম হইয়াছিল, অপরদিকে শত্রুদের অন্তরে ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নবী করীম (স)-এর পয়গাম্বরী প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছিল। সত্য কথা এই যে, কেবল মক্কা বিজয় বা খায়বার বিজয়েরই নহে, বরং অনাগত কালের তাবৎ ইসলামী বিজয়সমূহের ভিত্তি এবং সোনালী পূর্বাভাস ছিল এই হুদায়বিয়ার সন্ধি" (তাফসীরে উছমানী, সূরা ফাতহ-এর তফসীর প্রসঙ্গে, পৃ. ৮৭৪-৭৫)।

অনুরূপ নাজরান চুক্তি এবং বিভিন্ন আরব গোত্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিগুলিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য। ঐ সমস্ত চুক্তির বরখেলাফ করায়ই মক্কা বিজয়, খায়বার বিজয় ও বনূ নাযীর, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি ইয়াহূদী গোষ্ঠীসমূহের দেশান্তরিতকরণের হেতু হইয়াছিল (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী; আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)।

সমুদ্রোপকূলে ইসলামের নূতন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি

সাহাবীগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুরায়শ পক্ষের দাবির কাছে বাহ্যত নতি স্বীকার করিয়া সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই সন্ধির শর্ত পালনে কড়াকড়ি ও নিষ্ঠার সুফল শীঘ্রই ফলিতে শুরু করে। ছাকীফ গোত্রীয় জনৈক নওমুসলিম যুবক আবূ বাসীর ইসলাম গ্রহণ করিয়া মক্কার কুরায়শদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা ও প্রিয়নবীর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের অনুমতি না লইয়াই মদীনায় চলিয়া আসেন। ছাকীফরা ছিল কুরায়শদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র, তাই হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আযহার ইব্ন আওফ ও আখনাস ইব্ন শুরায়ক তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইবার দাবি জানাইয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করে। পত্রের মর্মানুসারে তাহারা বনী আমের গোত্রের একজন লোককে এবং তাহাদের একটি ক্রীতদাসকে তাহার সাথীরূপে প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাসীরকে বলিলেন ঃ

يا ابا بصير انا قد اعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصح لنا فى ديننا الغدر

وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق الى قومك.

"হে আবূ বাসীর! আমরা ঐ সম্প্রদায়কে যে কথা দিয়াছি (অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমরা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছি) তাহা তুমি জান। আর ইসলামে বিশ্বাস ভঙ্গের অবকাশ নাই। আল্লাহ তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যাও" (দ্র. হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ (আরবী), মিসর ১৫তম সংস্করণ ১৯৬৮, পৃ. ৩৮৪)।

আবূ বাসীর অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আবার পৌত্তলিকদের নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন? উহারা যে আমাকে ধর্মচ্যুত করিয়া ফেলিবে! কিন্তু আল্লাহর রাসূল একাধিকবার তাঁহার ঐ কথারই পুনরুক্তি করিয়া তাহাকে আশ্রয় দানে তাঁহার নীতিগত অসামর্থ্যের কথা জানাইলেন। অগত্যা আবূ বাসীর ঐ দুই ব্যক্তির সহিত প্রস্থান করিলেন। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছিয়া তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সহিত সঙ্গীটিকে তাঁহার চমৎকার তরবারিটি একবার দেখিতে দিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গীটি তরবারি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেই তিনি উহার দ্বারা তাহাকে হত্যা করেন। সঙ্গী ক্রীতদাসটি ভয়ে পালাইয়া মদীনায় গিয়া উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে উপস্থিত হইয়া সে আরয করিল, আপনার লোকটি আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এমনি সময় উন্মুক্ত তরবারি হাতে আবূ বাসীরও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) কোন মন্তব্য করার পূর্বেই তিনি বলিলেন ঃ

يا رسول الله وفت ذمتك وادى الله عنك اسلمتنى بيد القوم وقد امتنعت بدينى ان افتن فيه او يعبث بى.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার সন্ধির শর্ত পূরণ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করিয়াছেন। আপনি যথারীতি আমাকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। আমি ধর্মচ্যুতির ফিৎনা ও তাহাদের নির্যাতনের পাশবিক ব্যবহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছি" (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ৩য় খ., পৃ. ২২০-২১)।

আবূ বাসীর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী ঈস নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। উহা ছিল কুরায়শদের সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রার পথ। সন্ধিমতে কোন পক্ষই এই পথ রোধ করিতে পারিতেন না। মক্কায় এই খবর পৌঁছিতেই সেখানকার অত্যাচারিত মুসলমানগণ আসিয়া তাঁহার নেতৃত্বে ঈসে একত্র হইতে থাকিলেন। দেখিতে দেখিতে সত্তরজনের একটি দল জুটিয়া গেল। প্রতিটি কুরায়শ কাফেলার উপর তাহারা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভার লুণ্ঠন এবং তাহাদের লোকজনকে হত্যা করিতে শুরু করিলেন।

এতদিন পর্যন্ত কুরায়শরা তাহাদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালাইয়াছে, যেইভাবে নিজেরাই জেদ ধরিয়া মক্কা হইতে পলাতক মুসলমানগণের মদীনার আশ্রয় চাওয়ার পথ চুক্তিদ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, এখন আর তাহাদের বলার মতও কিছুই ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) এই ব্যাপারে তাঁহার দায়িত্ব যথারীতি পালন করিয়াছেন। মক্কার যে নির্যাতিত মুসলমানগণ চুক্তির বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাদিগকে এইভাবে অত্যাচারিত হইয়া মরিতে বা ধর্মত্যাগ করিতে সুযোগ দেওয়ারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এইদিকে সিরিয়ার বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হইলে তাহাদেরও বাঁচিয়া থাকার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই পথটিকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্যই তো তাহারা মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করিয়াছে। চুক্তির দ্বারা উহা মুক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু এখন তো আবূ বাসীর ও তাঁহার সঙ্গী-সাথীরা

অপ্রতিরোধ্য এক নূতন শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। ইসলামের এক নূতন রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি হইয়াছে যাহা পূর্বেকার ঝুঁকি হইতে কোনমতেই কম বিপজ্জনক নহে। অগত্যা তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মদীনায় দূত পাঠাইল। আত্মীয়তার দোহাই দিয়া তাহারা তাহাদের বাঁচিবার তাগিদে আবূ বাসীর তথা তাবৎ মক্কাবাসী নির্যাতিত মুসলমানগণকে মদীনায় ডাকাইয়া লইবার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ফরিয়াদ জানাইল। মানবতার নবী মানবিক কারণে তাহাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়া আবূ বাসীর ও মক্কার তাবৎ মুসলমানগণকে মদীনায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। এইভাবে স্বয়ং কুরায়শদের আবেদনে হুদায়বিয়া চুক্তির একটি শর্ত বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ নিরাপদ করিয়া দেওয়া হইল (হায়াতে মুহাম্মাদ, আরবী, পৃ. ৩৮৪-৮৫)।

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

মদীনায় হিজরত, আনসার-মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি, মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সহিত সমঝোতা সৃষ্টি, সর্বোপরি মদীনার প্রভাবশালী ইয়াহূদী গোত্রসমূহ ও পৌত্তলিকদের সহিত মদীনা সনদ সম্পাদনের পর জিহাদ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ.

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। তাহাদিগকে তাহাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনা স্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী" (২২ ঃ ৩৯-৪০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হইতেছে আল-কুরআনের নির্দেশনা ভিত্তিক জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

মক্কার কুরায়শরা যখন লক্ষ্য করিল যে, তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ মদীনার মত এমন একটি স্থানে গিয়া একত্র হইয়াছেন যাহা

তাহাদের সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথের নিকটবর্তী। ইহা ছাড়া মদীনায়ও তাহারা একান্তই বাস্তহারা ও আশ্রিত নহেন, মদীনা সনদ ও সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথের নিকটবর্তী গোত্রসমূহের সহিত সন্ধিচুক্তি করিয়া তাহারা সেখানকার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তখন তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। অঙ্কুরেই এই উদীয়মান শক্তিকে নির্মূল না করিলে তাহাদের ভবিষ্যত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবিয়া তাহারা সেইভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা জানিত, মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রীয়রা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যিকে তাহাদের একচ্ছত্র সর্বাধিনায়করূপে গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। তাই তাহারা ঐ নেতাকেই সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিল ঃ

انكم اويتم صاحبنا وانا نقسم بالله اتقاتلنه او تخرجنه او اسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبح نسائكم.

"তোমরা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়াছ। আল্লাহুর কসম! হয় তোমরা নিজেরা তাহাকে হত্যা করিবে কিংবা তাহাকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিবে। অন্যথায় আমরা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইব, তোমাদেরকে হত্যা করিয়া তোমাদের নারীদিগকে আমাদের ভোগদখলে লইয়া আসিব" (সুনান আবূ দাঊদ, খ. ২, পৃ. ৬৭)।

যদিও রাসূলুল্লাহ (স) বা তদীয় অনুসারী মুসলমানগণকে হত্যা করা বা মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা তখন আর মুনাফিক নেতা আবদুল্লহ ইব্ন উবায়্যির ছিল না, তবুও মক্কাবাসীদের নিকট হইতে এইরূপ পত্র পাইয়া তাহার উন্নাসিকতা ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল যাহার উল্লেখ ইতোপূর্বেই করা হইয়াছে। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তুমি কি তোমার আত্মীয়-পরিজনের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে তখন সে ব্যাপারটি সম্পর্কে বুঝিতে পারিয়া এইরূপ কোন উদ্যোগ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় (দ্র. শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩০৫-৩০৬)।

কিন্তু কুরায়শরা তাহাদের পরিকল্পনা মত প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং যে কোন প্রকারেই মুসলমানদের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। তাহাদের একজন সর্দার কুরয ইব্ন ফিহর মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পশুপাল লুট করিয়া লইয়া যায়। অবশ্য যথারীতি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছিল। কা'বা ঘরের খাদেম হওয়ার দরুন তাহাদের যে গুরুত্ব গোটা আরবে স্বীকৃত ছিল ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে সমগ্র আরবদেশ জুড়িয়া তাহারা অপপ্রচারে সেই প্রভাবকে ব্যবহার করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল গোত্রকে ক্ষেপাইয়া তোলে। চরম উৎকণ্ঠায় মুসলমানদিগকে দিনের বেলায় তো বটেই রাত্রি বেলায়ও সশস্ত্র অবস্থায় কাটাইতে হইত। কুরআনুল করীমে সেই উৎকণ্ঠার সময়টির বর্ণনা রহিয়াছে এইভাবে ঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে। তোমরা আশঙ্কা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও" (৮ ঃ ২৬)।

মোটকথা, নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সর্বদিক হইতেই তখন মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তা'আলা জিহাদের আয়াত নাযিল করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দান করিলেন।

আল্লাহ্র পক্ষ হইতে জিহাদের নির্দেশ বা অনুমোদন পাওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ (স) একে একে বেশ কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন।

১ম হিজরী সনের সফর মাসে হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজির সাহাবী সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ কুরায়শের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈস নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হইলেও জুহানী সর্দার মাজদী আল-জুহানীর হস্তক্ষেপে উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে বিরত থাকে।

ঐ সনেই ৮ম মাসে 'উবায়দা ইব্ন হারিছের নেতৃত্বে ৬০ জন, মতান্তরে ৮০ জন মুহাজির বাতনে রাবিগের দিকে প্রেরিত হন। আবূ সুফ্য়ান ও ইকরিমার নেতৃত্বে ছানিয়া মাররা নামক স্থানে ২০০ কুরায়শকে তাহারা সমবেত দেখিতে পান। এইবারও যুদ্ধ হইল না। তবে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) সর্বপ্রথম কাফের পক্ষের উপর একটি তীর নিক্ষেপ করেন।

তৃতীয় অভিযান খাররার অভিমুখে প্রেরিত হয় ঐ সালের নবম মাসে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে। কুড়িজন অশ্বারোহীসহ সফরের পঞ্চম দিনে খাররায় পৌঁছিয়া তাহারা জানিতে পারেন যে, কুরায়শরা চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ অভিযানটি ওয়াদ্দান অভিযান বা আবওয়া অভিযান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সর্বপ্রথম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ঐ অভিযান পরিচালনা করেন। মদীনায় সা'দ ইব্ন উবাদাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তিনি মদীনা হইতে ৮০ মাইল দূরবর্তী আবওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইবারও লক্ষ্য ছিল কুরায়শ কাফেলা ও বনূ দমরা গোত্র। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন ষাটজন মুহাজির সাহাবী। পক্ষকাল পর তাঁহারা বিনা যুদ্ধেই প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ কুরায়শরা ততক্ষণে পলায়ন করিয়াছে। বনূ দামরার নেতা মাখশী ইব্ন 'আমর যুদ্ধ না করিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং প্রয়োজনে মুসলমানদের সাহায্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

পঞ্চম অভিযানে হিজরী দ্বিতীয় সনের রবি'উল আওয়াল মাসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে ২০০ মুহাজির সাহাবী বুওয়াত পর্যন্ত যান। কুরায়শ পক্ষের নেতৃত্বে ছিল উমায়্যা ইব্ন খালাফ, লোকসংখ্যা ১০০। কাফেলায় আড়াই হাজার উট ছিল। তাহাদের সন্ধান না পাইয়া বিনা যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স) সদলবলে মদীনায় ফিরিয়া আসেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত অভিযানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঃ (ক) যুদ্ধযাত্রাকারিগণ মুহাজির সাহাবী, আনসারের একজনও নহেন, (খ) কোন অভিযানেই যুদ্ধ হয় নাই, (গ) যুদ্ধে কোন পক্ষের কেহই হতাহত হয় নাই, (ঘ) প্রতিবারই কুরায়শ পক্ষ সিরিয়াযাত্রী বা প্রত্যাগমনকারী কুরায়শ বণিক, (ঙ) প্রতিটি অভিযানের নেতৃত্বেই নবী পরিবারের লোকজন ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, পাঁচটি অভিযানের শেষ দুইটিতে নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁহারই প্রথম অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁহার আপন পিতৃব্য হামযা (রা), দ্বিতীয়টির নেতৃত্বে পিতৃব্যপুত্র 'উবাদা ইব্ন হারিছ (রা), তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)। নবী করীম (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উহা হইতে পাওয়া গেল ঃ

(১) ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধযাত্রায় তিনি সর্বাধিক ত্যাগী ও সর্বাধিক পরীক্ষিত মুহাজিরগণকেই ব্যবহার করিয়াছেন। আশ্রয়দাতা আনসারগণকে সেই ঝুঁকির মুখে ফেলেন নাই।

(২) যুদ্ধের ঝুঁকি যেহেতু সেনাপতিকে সর্বাধিক নিতে হয় সেই দায়িত্ব হয় তিনি নিজে নিয়াছেন নতুবা নিজ পরিবারের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠজনকেই সেই ঝুঁকির মুখে ফেলিয়াছেন, এমনকি অন্য মুহাজিরগণকেও সেই সর্বাধিক ঝুঁকির মুখে ফেলেন নাই।

(৩) বিজাতীয় বিদেশী অনাত্মীয় বিধর্মীদের পরিবর্তে সর্বপ্রথম তিনি বিধর্মী আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাহারা সকলেই ছিল কুরায়শ বংশীয়।

(৪) কোন অভিযানেই প্রতিপক্ষের কোন ক্ষতি করেন নাই, কেবল শক্তির মহড়া প্রদর্শন করিয়াই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কুরায়শরা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে পরবর্তী কালের যুদ্ধসমূহের আর প্রয়োজন হইত না, উভয় পক্ষে অহেতুক লোক ক্ষয়ও হইত না। উহা ছিল আল্লাহ তাআলার ঐ নির্দেশেরই বাস্তবায়ন যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً.

"হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদিগের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়" (৯ ঃ ১২৩)।

এই বিষয়ে মাওলানা ইদরীস কান্দহলবী (র) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক নবীই সর্বপ্রথম তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, অন্য সম্প্রদায়ের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছেন পরবর্তী কালে। মহানবী (স)-এর সমস্ত জিহাদ তাঁহার আপন সম্প্রদায় এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই ছিল, কোন বিদেশী বা বিজাতির সহিত ছিল না। বদর যুদ্ধে

মুহাজিরগণের অস্ত্রের সম্মুখে কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও ভাই, কাহারও মামা পড়িয়াছে। সাধারণভাবে প্রতিপক্ষের সকলেই আত্মীয় ছিল। কেবল আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের এবং তাঁহার দীনের সাহায্যের জন্য সাহাবায়ে কিরামের তরবারি উন্মুক্ত ছিল" (সীরাতুর রাসূল, ২খ., পৃ. ১৭-১৮)।

জিহাদের উক্ত বিধান পালন করিতে গিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) বারবার রণাঙ্গনে রওয়ানা হইয়াছেন, সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। একে একে বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, হুনায়ন প্রভৃতি যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে।

জিহাদ সংক্রান্ত প্রথম দিকের আয়াতগুলির প্রতি দৃকপাত করিলে মনে হয় যে, জিহাদ নিতান্তই একটা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। নিকটবর্তীদের (اَلَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ) সহিত যুদ্ধের আদেশ দেখিয়াও কেহ মনে করিতে পারেন যে, নিকবর্তী কাফিরদের বাহিরে দূরবর্তী অন্য কাফিরদের সহিত সম্ভবত জিহাদের নির্দেশ নাই। কিন্তু ইসলাম কেবল আত্মরক্ষার জন্যই জিহাদের অনুমতি দিয়াছে কিংবা যুদ্ধ কেবল নিকটবর্তীদের সহিতই অনুমোদিত, অন্যদের সহিত নহে এইরূপ ধারণা যথার্থ নহে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিবে যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে" (৯ ঃ ৩৬)।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ.

"যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্য়া দেয়" (৯ ঃ ২৯)।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

"আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে যালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না" (২ ঃ ১৯৩)।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ.

"তোমরা যেখানেই তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বহিষ্কার করিবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত না তাহারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে, ইহাই কাফিরদিগের পরিণাম" (২ ঃ ১৯১)।

লক্ষণীয় যে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহে মুশরিক আহলে কিতাব নির্বিশেষে নিকটের ও দূরের সকল কাফির ও ফিতনাবাজ লোকদের বিরুদ্ধে তাহাদের ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই সর্বাবস্থায় শান্তি ও সন্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কুরআনুল কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

اَلصُّلْحُ خَيْرٌ.

"আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়" (৪ ঃ ১২৮)।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ.

"তাহারা (শত্রুরা) যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন" (৮ ঃ ৬১-৬২)।

লক্ষণীয় যে, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিপক্ষ সন্ধির প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া সন্ধির জন্য উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সাথে সাথে প্রতিপক্ষের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার আশঙ্কার কথাটিও স্মরণ করাইয়া দিয়া ঐরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য ও মুমিনগণের আনুগত্যের আশ্বাস পাওয়ারও আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূলকে শুনাইয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করিতে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার ইয়াহূদী ও পৌত্তলিক এবং মক্কার কুরায়শদের সহিত যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন তাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাফির-মুশরিকদের চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) যেই সমব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা হইতেছে। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার এই ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল তাঁহার প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্যতম দিক।

বনূ কায়নুকা'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমাকে 'আসিম ইব্ন 'আমর ইব্ন কাতাদা এই তথ্য অবহিত করেন যে, বনূ কায়নুকা' ইয়াহূদীদের প্রথম সম্প্রদায় যাহারা তাহাদের ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যকার

চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইব্ন হিশামের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জনৈকা আরব মহিলা কিছু জিনিস লইয়া বনূ কায়নুকা'র বাজারে যান এবং সেখানে তাহা বিক্রয় করিয়া জনৈক ইয়াহূদী স্বর্ণকারের দোকানে বসেন। মওলানা আকরম খাঁ উল্লেখ করেন যে,ইয়াহূদীগণ কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া তিনি ঐ দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইয়াহূদীরা তাহার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিতে বলিলে মহিলাটি তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্বর্ণকার মহিলাটির চাদরের এক কোণা দোকানের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া দেয়। নরাধমরা মজা দেখিবার জন্য একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর দুর্বৃত্তরা সরিয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া মহিলাটি উঠিতে চাহিলে তাহার গায়ের চাদরখানি খসিয়া পড়িল। এই ভদ্র মহিলাকে বিবস্ত্র হইতে দেখিয়া তাহারা হাসিয়া উঠে এবং করতালি দিতে থাকে। মহিলাটি লজ্জা ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়া নিজেকে রক্ষার জন্য আর্তনাদ করিয়া উঠিলে জনৈক মুসলিম তরবারি হস্তে ছুটিয়া আসেন। ইয়াহূদীরা তাহাকে হত্যা করে এবং তাহার হাতেও তাহাদের একজন নিহত হয়। মুসলিম সমাজে স্বভাবতই ইহার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়।

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের বাজারে গিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হওয়ার আহবান জানাইলেন। নতুবা তাহাদের অবস্থাও যে বদরে বিপর্যস্ত কুরায়শদের অনুরূপ হইতে পারে তাহাও জানাইয়া দিলেন। ইয়াহূদীরা তাঁহাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলে, মুসলমানগণ যুদ্ধে কতিপয় অনভিজ্ঞ কুরায়শ হত্যা করিয়াছে বলিয়া গর্বিত হওয়ার কারণ নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের আচরণে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইয়াহূদীরা উত্তমরূপে দুর্গের দরজা বন্ধ করিয়া এই ভাবিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, মক্কার কুরায়শদের আক্রমণে অচিরেই মুসলমানগণ দিশাহারা হইয়া পালাইয়া যাইবে। দীর্ঘ ১৫ দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধের পরও যখন তাহাদের সেই প্রত্যাশিত মক্কার কুরায়শদের সাহায্য আসিল না তখন তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র মদীনায় রাখিয়াই বসতবাড়ি ত্যাগের অনুমতি ভিক্ষা করিল। তখনকার প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি উহাদের সকলকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। কেবল সম্মতিই নহে,সাহাবী উবাদা ইব্নুস সামিতকে তাহাদের যাত্রার সুব্যবস্থার জন্য নিয়োগ করিলেন। পূর্বে এই বনূ কায়নুকার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ছিল। ইহা ছাড়া মদীনা ত্যাগের জন্য তাহাদিগকে তিন দিনের অবকাশও দেওয়া হইল। এইভাবে ইয়াহূদীদের মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুতকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভার মুসলমানদের হস্তগত হয়। বনূ কায়নুকার সাত শত যুদ্ধবাজ সৈনিক, যাহাদের অধিকাংশই ছিল স্বর্ণকার ও দোকানদার, তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ সিরিয়ার দিকে পাড়ি জমাইল। এইভাবে বিদ্রোহ ও চুক্তিভঙ্গের জন্য যাহারা মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষা করিতেছিল তাহারা নিরাপদে ইয়াছরিব ত্যাগে সক্ষম হয় (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুননবী, ৩খ., পৃ. ৫-৮; মোস্তফা চরিত, পৃ. ৬৩৮-৬৪০; যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৪৮, আবুল হাসান আলী নদভী, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আরবী, পৃ. ১৯৫)।

প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারী ওয়াট মনে করেন, ইয়াহূদীদের ঐ বহিষ্কারের মূলে ছিল ইয়াহূদীদের মদীনার সমাজ জীবনে মিশিয়া না যাওয়া। ইহা ছাড়া মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার কুরায়শদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও হয়তো মুহাম্মাদ (স) অবগত ছিলেন যাহা ছিল মুসলমান ও ইয়াহূদীদের চুক্তির পরিপন্থী (দ্র. নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৪০, পাদটীকা)।

বনূ নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান

হিজরী ৪র্থ সালের রবী'উল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় সাহাবীসহ বনূ নাযীরের ইয়াহূদী পল্লীতে গমন করেন এবং সাহাবী 'আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা)-এর একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য নিহত বনূ 'আমের গোত্রের দুই ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে তাহাদের সাহায্য কামনা করেন। ঐ সময় তিনি প্রাচীরের ছায়ায় উপবেশন করেন। বনূ নাযীরের ইয়াহূদীরা বাহ্যত প্রসন্ন বদনে তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং রক্তপণ পরিশোধে সহযোগিতার আশ্বাসও দেয়; কিন্তু তাহারা গোপন শলাপরামর্শের মাধ্যমে স্থির করে যে, এক ব্যক্তি ঐ প্রাচীরের উপর হইতে একটি ভারী পাথর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার উপর ফেলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। সাল্লাম ইব্ন মিশকাম নামক তাহাদেরই জনৈক সাথী বলে ঃ

لا تفعلوه والله يخبره ربه وانه لنقض العهد الذى بيننا وبينه.

"তোমরা এইরূপ কাজ করিতে যাইও না। আল্লাহর কসম! তাঁহার প্রভু তাঁহাকে উহা অবহিত করিয়া দিবেন আর ইহা তাঁহার ও আমাদের মধ্যকার চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন হইবে"।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ) মারফত তদীয় প্রিয় নবীকে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাত সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন। ইব্ন 'উকবা বলেন, ইহারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল তখন আল্লাহ তাহাদের হাত তোমাদিগের হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন" (৫ ঃ ১১; দ্র. 'উয়ূনুল আছার,২ খ., পৃ. ৪৮)।

আরেকবার বনু নাযীর তাহাদের তিনজন ধর্মযাজককে এই উদ্দেশ্যে নবী করীম (স)-এর নিকট প্রেরণ করিবে বলিয়া জানায় যে,তাঁহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে উহারা সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিবে, অথচ ঐ যাজকরূপী লোকগুলিকে গোপনে বস্ত্রের নীচে করিয়া খেজুর লইয়া যাইতে বলিয়া দেয় এবং প্রথম সুযোগেই যেন তাহারা তাঁহাকে এবং তাহাদের প্রস্তাবিত তাঁহার তিনজন সাথীকে হত্যা করে। তাহারা সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর মাধ্যমে তাহা অবগত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। ইব্ন মারদাওয়ায়হ প্রমুখাৎ সহীহ সনদে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথাটি বর্ণিত আছে।

বনূ নাযীর গোত্রের এইরূপ চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা)-এর মারফতে তাহাদিগকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দেন, অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত থাকার ঘোষণা দেন। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যি তাহাদিগকে তাহার দুই হাজার অনুচরসহ সাহায্য করিবে, এই আশ্বাস দিয়া নিজেদের দুর্গে অবস্থান করিতে উৎসাহ দেয়। সে বলে, বনূ কুরায়যা ও গাতাফানীরা তোমাদের বন্ধু, তাহারাও তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। ফলে তাহারা মদীনা ত্যাগে তাহাদের অসম্মতির কথা জানাইয়া দিল। বনূ নাযীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাব যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন। দীর্ঘ পনের দিন অতিবাহিত হইল। মুনাফিক সর্দার বা কোন ইয়াহূদী মিত্র গোষ্ঠী তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আগাইয়া আসিল না। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের খেজুর বাগান ধ্বংস করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। অগত্যা ইয়াহূদীরা আত্মসমর্পণ করিল এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দশ দিনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সম্পদ লইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহানুভবতার দরুন তাহারা নিজেদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ঘরের দরজা, চৌকাঠ পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার সুযোগ পাইল। ছয় শত উট বোঝাই করিয়া তাহারা খায়বারে গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং কতক সিরিয়ার আযরু'আত নামক স্থানে চলিয়া যায়। এই অভিযানে পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি শিরস্ত্রাণ এবং তিন শত চল্লিশখানা তরবারি মুসলমানদের হস্তগত হয়। বিনাযুদ্ধে প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে আসে। আনসার সাহাবীগণের সম্মতিক্রমে এই সম্পদ রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিয়া আনসারগণের উপর তাঁহাদের নির্ভরতার অবসান ঘটান। কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য রাখেন এবং অবশিষ্টাংশ রণসম্ভার ক্রয়ে ব্যয় করেন (দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, ২ খ., পৃ. ৫৯১-৫৯৯; সীরাতুর রাসূল, ২ খ., পৃ. ২৭০-২৭৩)।

বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান

দীর্ঘ একমাস ব্যাপী কুরায়শ ও ইয়াহূদীদের সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ মুকাবিলা করিয়া ৫ম হিজরীর যুলকা'দা মাসের এক সপ্তাহ বাকী থাকিতে রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম বাহিনীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালমার গৃহে গোসল করিতেছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কি যুদ্ধবিরতি করিয়া ফেলিয়াছেন? আমরা ফেরেশতাগণ কিন্তু এখনও অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া রাখি নাই। আপনি তাড়াতাড়ি সঙ্গী-সাথিগণকে লইয়া বনূ কুরায়যার দিকে রওয়ানা হন। আমি অগ্রে গিয়া তাহাদের দুর্গসমূহে ভূকম্পন সৃষ্টি করিব এবং তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব। এই বলিয়া ফেরেশতা জিবরাঈল প্রস্থান করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ও আনুগত্যের অঙ্গীকারে অটল সাহাবীগণকে আসরের নামায বনূ কুরায়যার পল্লীতে গিয়া পড়ার নির্দেশ দিয়া নিজে সেইদিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। সেইখানে পৌঁছিয়া

তিনি আনা নামক কূপের পাদদেশে অবতরণ করিলেন। মুসলিম বাহিনী সেইখানে পৌছিয়া সঙ্গে সঙ্গে বনূ কুরায়যার দুর্গসমূহ অবরোধ করিলেন।

উল্লেখ্য যে, মদীনা সনদ অনুসারে এই ইয়াহূদীদের মদীনা আক্রান্ত হইলে মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মদীনার প্রতিরক্ষাকল্পে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু তাহারা উহা তো করেই নাই, উপরন্তু মদীনা আক্রমণ করিয়া মুসলিম জাতি ও তাহার নবীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য বহিশক্তির সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং এইজন্য গোপনে বিশাল প্রস্তুতিও নিয়া রাখিয়াছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন মক্কার কুরায়শ ও তাহাদের মিত্র গোত্রগুলি এবং বনূ নাযীর প্রভৃতি ইয়াহূদী গোত্রসমূহের সম্মিলিত শক্তি ১০,০০০ সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল তখন বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরাও স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং আক্রমণকারী বাহিনীর সহিত যোগ দেয়। মুসলমানদের সহিত চুক্তির নেতৃত্বদানকারী তাহাদের নেতা কা'ব ইব্‌ন আসাদ সত্য নবীর হাতে ইসলাম কবূল করিয়া এই বিপর্যয় এড়াইবার পরামর্শ দিলেও অপর নেতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের গোঁড়ামির দরুন তাহা আর হইয়া উঠে নাই।

বনূ কুরায়যার দুর্গে অস্ত্রশস্ত্র বা রসদের কোন অভাব ছিল না। ঐদিকে বাহিরে অবরোধরত মুসলমানগণ ক্ষুৎপিপাসায় ও শীতে ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ইয়াহূদীরা মানসিক দুর্বলতায় ভুগিতেছিল, আর মুসলমানগণের ঈমানী চেতনা ছিল তুঙ্গে। তাই খন্দক যুদ্ধের অক্লান্ত পরিশ্রম বা পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তাহাদিগকে দমাইতে পারে নাই। দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকার পর এক পর্যায়ে হযরত 'আলী (রা) ও হযরত যুবায়র ইব্‌নুল 'আওয়াম (রা) বীরদর্পে দুর্গের উপর চরম আঘাত হানিতে অগ্রসর হইতেই ইয়াহূদীরা আত্মসমর্পণ করে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে তাহাদের পুরুষদিগকে বাঁধিয়া ফেলা হইল, নারী ও শিশুদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। আওস বংশীয় আনসারগণ একসময় এই বনূ কুরায়যা বংশের ইয়াহূদীদের মিত্র ছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন জানাইলেন, ইতোপূর্বে খাযরাজ বংশীয় আনসারদের মিত্রতার জন্য বনূ কায়নুকার ইয়াহূদীদের প্রতি যেইরূপ সদয় আচরণ করা হইয়াছে, এইবার তাঁহাদের পুরাতন মিত্রতার খাতিরে যেন বনূ কুরায়যার প্রতিও সেইরূপ সদয় আচরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরই এক ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিলে তাঁহার খুশী হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা মদীনায় আহত অবস্থায় অবস্থানরত তাহাদের নেতা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে ডাকিল। খাযরাজ বংশীয়গণ তাঁহার প্রতিও তাহাদের পুরাতন বন্ধুদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সহজতর সিদ্ধান্ত প্রদানের আবদার জানাইলেন। কিন্তু সা'দ (রা) তাহাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের সকলকে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করিলেন এবং তদনুযায়ী প্রায় সাত শত বিশ্বাসঘাতক বনূ কুরায়যা বংশীয় ইয়াহূদীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাহাদের নারী ও শিশুরা দাস-দাসীতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার

এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, সপ্ত আকাশের উপরে আল্লাহ তা'আলার যে ফয়সালা সা'দের সিদ্ধান্তে উহাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা যে বিপুল অস্ত্রসম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার সবগুলিই মুসলমানদের অধিকার আসে। সেই অস্ত্রভাণ্ডারে ছিল দেড় হাজার তরবারি, দুই হাজার বল্লম, তিন শত বর্ম ও পাঁচ শত ঢাল।

আল্লাহ্র শত্রু বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা এইভাবে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল লাভ করে। খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ নামক একজন সাহাবী উক্ত অবরোধকালে দুর্গ হইতে যাতা নিক্ষেপের ফলে শহীদ হন এবং উক্কাশা (রা)-এর সহোদর আবূ সিনান ইব্ন মিহ্সান (রা) স্বাভাবিকভাবে ইনতিকাল করেন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৫২-৩৫৭)।

বনূ নাযীর অভিযানে ঐ ইয়াহূদী গোত্রের নির্বাসনের ফলে একদিকে যেমন মুসলমান জাতি অতি নিকটে অবস্থানকারী বৈরী ও ষড়যন্ত্রকারী একটি গোষ্ঠীর নিত্য-নূতন ষড়যন্ত্রের কবল হইতে নিরাপদ হইল তেমনি তাঁহাদের হাতে আসিল শত্রুদের বিশাল ভূ-সম্পদ ও বাগবাগিচা। তাহাদের যে অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহার মধ্যে ছিল ৫০টি বর্ম, ৫০টি লৌহ শিরস্ত্রাণ ও ৩৪০টি তরবারি।

বনূ নাযীরের ইয়াহূদীরা দেশান্তরিত হইলেও অচিন্ত্যনীয়ভাবে তাহারা ঢাকঢোল পিটাইয়া নৃত্য-গীত করিয়া শানশওকতপূর্ণ মিছিল সহকারে মদীনা ত্যাগ করে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হইতে হযরতের মহানুভবতায় রক্ষা পাইয়া তাহারা যে তাহাদের বিপুল সম্পদ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেছে উহাই সম্ভবত তাহাদের এই মহাধুমধামপূর্ণ মিছিলের কারণ ছিল। মদীনাবাসীরা ইতিপূর্বে কোনদিন এতবড় মিছিলের সমারোহ প্রত্যক্ষ করেন নাই (দ্র. তাবারী, পৃ. ১৪৫২; সীরতুন্নবী,উর্দু, ১ খ., পৃ. ৪১২)। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই পতন সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرًا.

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে (কুরায়শদিগকে) সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিলেন। এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী। আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি-ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩৩ আহযাব ঃ ২৬-২৭)।

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ.

"তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ হইতে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৫৯ : ২)।

উহাদের এই শাস্তির কারণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর" (৫৯ : ৪)।

এই অভিযান হইতে শিক্ষণীয়

যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃক্ষ কর্তন : বাহ্যত মানবিক দৃষ্টিতে ফলবতী বৃক্ষ কর্তন একটি গর্হিত কাজ মনে হইতে পারে এবং এইজন্য ইসলামের শত্রুরা সমালোচনামুখরও হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে যে এই কাজটি বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত তাহার শিক্ষা এই অভিযান হইতে পাওয়া যায়। আল্লামা শিবলী নু'মানী ঐ বৃক্ষকাটা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে লিখেন :

"সম্ভবত ঘন বৃক্ষসমারোহ আত্মরক্ষার সহায়ক ছিল। এইজন্য তাহা পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে অবরোধ বিঘ্নিত না হয়" (দ্র. সীরাতুন্নবী, ১ খ., পৃ. ৪১১)।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র) উহার সমর্থনে পাদটীকায় লিখেন, "গ্রন্থকারের এই অভিমতের সমর্থন ইহা হইতেই পাওয়া যায় যে, ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে যুদ্ধের প্রয়োজনে আবশ্যক বিবেচিত হইলে এবং উহার কোন বিকল্প না থাকিলে রণক্ষেত্রে বৃক্ষ কর্তন করিতে হয়। হাদীছবেত্তাগণ ইমাম আহমাদের এই অভিমত এই ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন ইসহাকের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুরা যদি বৃক্ষের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করে তাহা হইলে উহাতে অগ্নিসংযোগ করা সুন্নত। উহা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত ইমামগণের মতে ঐ

বৃক্ষ কর্তন যুদ্ধের প্রয়োজনে জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল (দ্র. 'উমদাতুল কারী, ৮ খ., পৃ. ১৯১; সীরাতুন্নবী, ১ খ., ৪১১, পাদটীকা)।

তাই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমে মুসলমানদের ঐ কাজকে তাঁহারই আদেশে কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ.

"তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে এবং এইজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন" (৫৯ ঃ ৫)।

(খ) ইসলামের ইতিহাসে উহাই ছিল বিনা যুদ্ধে শত্রুসম্পদ লাভের প্রথম ঘটনা। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (স)-এর আমলে বেতনভোগী নিয়মিত কোন পেশাদার সেনাবাহিনী ছিল না। যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ আল্লাহ্র ও তদীয় রাসূলের এবং অবশিষ্ট চার অংশ মুজাহিদদের মালিকানায় চলিয়া যাইত।

বনূ নাযীরের নির্বাসনের ফলে যে বিশাল সম্পদ আসিল উহার জন্য মুসলমান যোদ্ধাগণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই যেন ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক" (৫৯ ঃ৭)।

লক্ষণীয় যে, আয়াতে এরূপ বিনা যুদ্ধেলব্ধ সম্পদে মুজাহিদদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত হয় নাই। গোটা সম্পদই রাসূলুল্লাহ (স)-এর এখতিয়ারভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) প্রধানত উহা মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যেই বণ্টন করিয়াছেন। সম্ভবত ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি এই ব্যাপারে আনসার সাহাবীগণের মতামত জানিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা চাহিলে আপনাদের এবং মুহাজিরদের মধ্যে এবং রাজী থাকিলে মুহাজিরদের মধ্যেই কেবল উহা বিতরণ করিয়া তাহাদের অধিকারে থাকা

আপনাদের বাড়ীঘর ও সম্পদসমূহ যাহা ইতোপূর্বে আপনারা তাহাদিগকে দিয়া রাখিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

জবাবে আনসার নেতা সা'দ ইব্ন 'উবাদা ও সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) জানাইয়া দিলেন, আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট যে, আপনি এই সম্পদ কেবল মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। মুহাজিরগণ পূর্বের মত আমাদের বাড়ীসমূহেই বসবাস করিবেন এবং আমাদের সহিতই তাহাদের থাকা-খাওয়া চলিবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, জবাবে আনসারগণ ততোধিক বদান্যতা প্রদর্শনপূর্বক বলিয়াছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেবল মুহাজিরগণের মধ্যেই এই সম্পদ বিতরণ করিয়া দিন। উপরন্তু আমাদের সম্পদ হইতেও যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করুন, ইহাতে আমাদের পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে।" তাহাদের এই জবাব শ্রবণে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار.

"হে আল্লাহ! আপনি আনসারগণ এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি সদয় হউন।"

হযরত আবূ বাক্র (রা)-ও এই সময় তাহাদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক উক্তি করিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত সম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যেই বিতরণ করেন এবং আনসারগণের মধ্য হইতে কেবল আবূ দুজানা ও সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা)-কে তাঁহাদের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু অংশ দান করেন (দ্র. সীরাতুর রাসূল, ২ খ., পৃ. ২৭৩; বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. ফাতহুল বারী, ৭ খ., পৃ. ২৫৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪ খ., পৃ. ৭৪-৮০)।

সম্পদের অংশ না পাইয়াও আনসারগণের এই সন্তুষ্টি ও বদান্যতা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের জিহাদ গনীমত পাওয়া যায় এই লোভে নহে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহ্‌র দীনের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অধিকারভুক্ত ফায় সম্পদ যে জনকল্যাণমূলক কার্যাদিতে ব্যয়িত হইত পূর্বোক্ত আয়াতেই উহার সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। তাই 'আল্লামা শাব্বির আহমদ 'উছমানী ফায় সংক্রান্ত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন ঃ "নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ফায় সম্পদ তাঁহারই এখতিয়ারাধীন ছিল। ইহা তাঁহার মালিকানা এখতিয়ারও হইতে পারে আবার নিছক প্রশাসনিক এখতিয়ারও হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উহা কোন্ কোন্ খাতে খরচ করিবেন তাহাও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরে এই সম্পদ মুসলিম জাতির ইমামের এখতিয়ারে চলিয়া যাইবে এবং তাহার এই এখতিয়ার বা অধিকার নিছক প্রশাসনিক পর্যায়ের, মালিকানায় নহে (তাফসীরে 'উছমানী,সূরা হাশরের ৭ম আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)।

ফায় সংক্রান্ত উক্ত বিধানের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম জাতির জিহাদের এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য হইতেছে জনকল্যাণ।

আবূ লুবাবা (রা)-এর স্ব-আরোপিত শাস্তি

বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং সুরক্ষিত দুর্গের জন্য গর্বিত ছিল। ইহা ছাড়া তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কুরায়শ ও ইয়াহূদীদের সম্মিলিত বাহিনীর দশ সহস্র সৈন্যের মুকাবিলায় ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় মুসলমানগণ এত তাড়াতাড়ি বনূ কুরায়যা গোত্রকে অবরোধ করিতে ছুটিয়া আসিবে। দীর্ঘ অবরোধে বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহারা অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে দুর্গ হইতে চীৎকার করিয়া আবূ লুবাবাকে তাহাদের নিকট পাঠাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন জানায়।

আবূ লুবাবা ইব্ন মুনযির ছিলেন আওস গোত্রের মিত্র বনূ 'আমর ইব্ন 'আওফ গোত্রের লোক। এই হিসাবে তিনি তাহাদের মিত্র ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং বাগ-বাগিচা তাহাদেরই এলাকায় ছিল বিধায় তাঁহার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবরুদ্ধ বনূ কুরায়যা গোত্রের অনুরোধে সাড়া দিয়া নবী করীম (স) আবূ লুবাবাকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সেইখানে পৌঁছিতেই ইয়াহূদীদের পুত্র-কন্যা ও মহিলাগণ কান্নাকাটি করিয়া এই অসহায় অবস্থায় তাহাদের আত্মসমর্পণ সঙ্গত হইবে কিনা এই ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ কামনা করে। আবূ লুবাবা (রা)-এর হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় এবং মনের অজান্তেই গলার দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড। মুহূর্তেই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। তিনি কোন মুনাফিক নহেন, তিনি আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া শত্রুদের দুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সামান্য একটি ইশারা দিয়া তিনি কি আল্লাহ্র রাসূলের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া ফেলেন নাই? নিদারুণ মর্মবেদনা ও বিবেকের তাড়নায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফিরিয়া গেলেন না। তিনি সোজা মদীনায় পৌঁছিয়া মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সহিত নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তিনি কসম খাইলেন, স্বয়ং নবী করীম (স) তাঁহাকে বাঁধনমুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি আর মুক্ত হইবেন না এবং ভবিষ্যতে আর কোন দিন বনূ কুরায়যার পল্লীতে যাইবেন না। বিবেকের তাড়নায়, ঈমানী শক্তির তাগিদে সৃষ্ট অপরাধবোধ হইতে এইরূপ স্ব-আরোপিত শাস্তিভোগের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বিরল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও যখন আবূ লুবাবা মুসলিম শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন না, তখন স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ (স) চিন্তিত হইলেন। তারপর সবকিছু অবগত হইয়া তিনি মন্তব্য করিলেন ঃ আবূ লুবাবা চলিয়া আসিলে আমি হয়ত তাহার অপরাধ মার্জনার জন্য দু'আ করিতাম। এখন সে এমন একটি কাজ করিয়া বসিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি আর কিছু করিতে পারিব না।

দীর্ঘ ছয় রাত পর্যন্ত আবূ লুবাবা (রা) এইভাবে তাঁহার স্ব-আরোপিত শাস্তি ভোগ করেন। তাঁহার স্ত্রী প্রতি নামাযের সময় আসিয়া তাঁহাকে খুলিয়া দিতেন। নামাযের পর আবার তিনি

পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতেন। রাতের পর প্রত্যূষে তাঁহার তওবা কবুলের আসমানী সংবাদ আসিল। ঐ রাত্রিতে মহানবী (স) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে আবূ লুবাবা বলেন, তিনি তাঁহার হুজরার দরজা খুলিয়া আমাকে আমার তওবা কবূলের সুসংবাদ জানাইয়া অভিনন্দিত করিলেন। ইহা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত সাহাবীগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু আবূ লুবাবা নাছোড়বান্দা! আল্লাহ্র রাসূলের পবিত্র হাত ছাড়া আর কাহারও হাতে মুক্ত হইতে তিনি রাজী হইলেন না। অবশেষে ফজরের নামাযের সময় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পবিত্র হাতে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুজাহিদ সঙ্গীগণ যে কী উচ্চ মানের নৈতিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, এই ঘটনা উহার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর দৃঢ়তা

বনূ কুরায়যার পুরাতন মিত্রগোত্র আওস। সেই আওস গোত্রেরই নেতা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের ভার অর্পণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি মদীনা হইতে আসামাত্র গোটা আওস গোত্রের আনসারগণ দুই দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। তাঁহার মুখের একটি কথায় গোটা বনূ কুরায়যা রক্ষাও পাইতে পারে, আবার সমূলে ধ্বংসও হইয়া যাইতে পারে। আওসগণ বলিলেন, সা'দ! মিত্রগোত্রের প্রতি সদয় হউন। সদয় সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আপনাকে বিচারক মনোনীত করিয়াছেন। তিনি কাহারও কথার কোন জবাব দিলেন না। তাহারা যখন বারবার তাহাদের আবদারের পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم.

"এখন সেই সময় সমুপস্থিত যখন সাদের আর আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার তোয়াক্কা করা উচিত নয়।"

লোকজন যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইল। তাহাদের মধ্যকার কেহ কেহ ঐ সময়ে মদীনায় গিয়া বনূ কুরায়যার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়া দিল (দ্র. ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২০০, বাংলা ভাষ্য ই.ফা.)। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁহার কাব্যিক ভাষায় ঐ সময়ের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এইভাবে ঃ "সা'দ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আসিবার কালে সারা পথ আওস গোত্রের অন্যান্য মুসলমানও ইয়াহূদিদের সহিত আওস গোত্রের সৌহার্দের পূর্বস্মৃতিও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু হইলে কী হয়, সেই খাতিরে ত তিনি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন না! কারণ মরণ সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া তিনি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবেন? করিলে তাঁহাকে যে জবাবদিহি করিতে হইবে! অপক্ষপাত বিচার তাঁহাকে করিতেই হইবে—তাহাতে যে যাহা বলে বলুক। ইহাই ভাবিয়া সা'দ তাঁহার মনকে দৃঢ় করিলেন।

"তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই বড় করুণ। বন্দী ইয়াহূদীকে অপেক্ষা করিতে হইতেছে অন্য পার্শ্বে হযরত ও তাঁহার সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া আছেন। আশা-নিরাশার আলো-আঁধারে ইয়াহূদীদের ভাগ্য দোল খাইয়া ফিরিতেছে। স্তব্ধ প্রকৃতি এই অভিশপ্তদিগের শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য যেন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে" (বিশ্বনবী, পৃ. ২৫৭, ৭ম সংস্করণ, ১৯৬০, ১ম সং. ১৯৪২)।

মৃত্যুশয্যা হইতে প্রিয়নবীর নির্দেশে সা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং কাহারও সহায়তা ব্যতীত তাঁহার গাধার পিঠ হইতে অবতরণের শক্তি ছিল না। নবী করীম (স) সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন ঃ

"তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও এবং তাহাকে গাধার পিঠ হইতে নামাইয়া আন (দ্র. মুসনাদে আহমাদ)।

সা'দ নামিয়া আসিতেই রাসূলুল্লাহ (স) জানাইলেন, বনূ কুরায়যার দুর্গবাসীরা তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে এই শর্তে আত্মসমর্পণে রাযী হইয়াছে। সা'দ (রা) তখন দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ حكمى نافذ عليهم "আমার আদেশ তাহাদের ব্যাপারে কার্যকরী হইবে"? রাসূলুল্লাহ (স) ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ وعلى المسلمين মুসলমানদের উপরও? রাসূলুল্লাহ (স) এইবারও ইতিবাচক জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে বিনয় দৃষ্টিতে তাকাইয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ وعلى من ههنا "আর এই দিকে যে মহান সত্তা রহিয়াছেন তিনিও মানিয়া লইবেন তো"?

যখন রায় কার্যকরী হওয়ার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করিলেন তখন গলদ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

فانى احكم فيهم ان تقتل المقاتلة وان تسبى الذرية والنساء وتقسم اموالهم .

"আমি রায় ঘোষণা করিতেছি ঃ (১) তাহাদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষম তাহাদিগকে হত্যা করা হউক; (২) শিশু ও নারীদিগকে বন্দী করা হউক এবং (৩) তাহাদের সম্পদসমূহ বণ্টন করা হউক" (দ্র. মুসলিম, অনুচ্ছেদ ৮৮, হাদীছ নং ৪৪৪৬; সহীহ বুখারী, বাব ১৬, হাদীছ নং ১২৭৬, কিতাবুল মাগাযী; আবূ দাউদ, অধ্যায় ৫৭১, হাদীছ নং ১৭৭৪; সীরাত ইব্ন হিশাম, আরবী, ২খ., পৃ. ২৩০-৪০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে তাহার এই রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট উহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার মাত্র কয়েক দিন পরেই মসজিদে নববীর সন্নিকটস্থ ঐ তাঁবুতে চিকিৎসারত অবস্থায়ই হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) একেবারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বগোত্রের সমস্ত লোকের আকূতি আবদারকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভীকভাবে সে দিন যে ঐতিহাসিক রায়টি ঘোষণা করিলেন, ইতিহাসে চিরদিন উহা মহানবী (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল হিসাবে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। কারণ এই ধরনের রায় কার্যকর না হইলে এই ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদিগকে পুনরায় আক্রমণ করিত।

খন্দকের যুদ্ধে জনৈক বনূ কুরায়যা বংশীয় যোদ্ধা তীরবিদ্ধ করিয়া সা'দকে আহত করিয়াছিল এবং ইহাতেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার পক্ষে বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে এইরূপ একটি যথার্থ রায় দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল (দ্র. শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৪৩৫, পাদটীকায়)। কিন্তু তাঁহার উক্ত সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ ঐ তীর নিক্ষেপকারী কোন ইয়াহূদী ছিল না। তীর নিক্ষেপকারী লোকটি ছিল কুরায়শ বংশীয়। তাহার নাম ছিল ইবনুল আরিকা (দ্র. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪৪৬, ই.ফা. প্রকাশিত ৬ষ্ঠ খণ্ড, তাহার পূর্ণ নাম ছিল হাব্বান ইব্ন কায়স ইবনুল আরিকা (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৪৯, বুখারী মুসলিমের বরাতে)। আল্লামা শিবলী নু'মানী লিখেন ঃ

"কুরআন মজীদে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স) তাওরাতের বিধানেরই অনুসরণ করিতেন। তাই নামাযের কিবলা, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, হত্যার দণ্ডবিধি হিসাবে কিসাস, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, চক্ষু বদলে চক্ষু, দাঁতের বদলে দাঁত প্রভৃতি দণ্ডবিধি এই সংক্রান্ত নূতন কোন ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) পালন করিয়া গিয়াছেন (দ্র. সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৪৩৫)।

বনূ কুরায়যার পুরুষদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ সংক্রান্ত ঐ রায় তাওরাতের বিধান অনুযায়ী প্রদান করা হইয়াছিল—উহা অন্তত মারগোলিয়থ সাহেবের মত ইয়াহূদী পণ্ডিতের জ্ঞাত থাকা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তাওরাতের বিধান নিম্নরূপ ঃ

When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it. And it shall be, if it make thee answer of peace and open unto thee, then it shall be, that all the people that is found therein shall be tributaries into thee, and they shall serve thee. And if it will make no peace with thee, but will make war againt thee, then thou shalt besiege it. And when the Lord thy God hath delivered it unto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword. But the women and the little ones, and the cattle and all that is in the city, even all the spoil thereof shalt thou take unto thyself; and thou shalt it the spoil of thine enemies which the Lord thy God hath given thee (Deut, 20 : 10-14).

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রচারিত পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম হইতে তাহাদের নিজস্ব বিশ্বস্ত অনুবাদই আমরা নিম্নে পেশ করিতেছি যাহাতে কেহ আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুবাদে হেরফের করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ না পান। বাংলা অনূদিত তাওরাতের উক্ত বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"তোমরা কোন গ্রাম বা শহর আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে সেখানকার লোকদের কাছে বিনাযুদ্ধে অধীনতা মেনে নেবার প্রস্তাব করবে। যদি তাতে তারা রাযী হয় তাদের কপাট খুলে দেয় তবে সেখানকার সমস্ত লোকেরা তোমাদের অধীন হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু তারা যদি প্রস্তাবে রাযী না হয়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে সেই জায়গা তোমরা আক্রমণ করবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন সেই জায়গাটা তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানকার সব পুরুষ লোকদের তোমরা মেরে ফেলবে। তবে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, পশুপাল এবং সেই জায়গার অন্য সবকিছু তোমরা লুটের জিনিষ হিসাবে নিজেদের জন্য নিতে পারবে। শত্রুদের দেশ থেকে লুট করা যেসব জিনিষ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দেন তা তোমরা ভোগ করতে পারবে" (দ্র. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, গণনা পুস্তক, অধ্যায় ২০, যুদ্ধযাত্রা ১০-১৪)।

ইহা তো গেল বাইবেল ও তাওরাতের বিধানের কথা। তাওরাতে তাহাদের প্রয়োগ বা আচরণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আরও কঠোর, লোমহর্ষক এবং নিষ্ঠুরতম। তাহাতে মহিলাদের বা শিশুদেরও রক্ষা ছিল না। এই প্রসঙ্গে তাওরাতের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "মোশিকে দেওয়া সদাপ্রভুর আদেশ মতই তারা মিদিয়নীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত পুরুষ লোকদেরকে মেরে ফেলল। ইস্রায়েলীয়েরা বিয়োরের ছেলে বিলিয়ামকেও মেরে ফেলল। তারা মিদিয়নীয়দের স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের বন্দী করল আর তাদের সমস্ত গরু ছাগল ও ভেড়ার পাল এবং জিনিষপত্র লুট করে নিল। মিদিয়নীয়েরা যে সব শহরে বাস করত সেই সব শহরগুলো এবং শহরের বাইরে তাম্বু খাটিয়ে বাস করবার জায়গাগুলো তারা পুড়িয়ে দিল। তারপর তারা মোশি পুরোহিত ইলিয়াসর ও সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে যাবার জন্য তাদের লুট করা জিনিষপত্র মানুষ এবং পশুপাল নিয়ে ছাউনির দিকে এগিয়ে চললো। মোশি তাদের সেনাপতিদের উপর রাগ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাহলে সমস্ত স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছো? এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ" (দ্র. পবিত্র বাইবেল, গণনা পুস্তক ৩১, মিদিয়নীয়দের ধ্বংস ৭-১৮; বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি)।

যেখানে এই তাওরাতের থিয়োরী ও প্রাকটিস, সেখানে অন্তত ইয়াহূদী এবং এই বাণী সম্বলিত বাইবেল পুরাতন নিয়ম প্রচারক খৃস্টান জাতির পণ্ডিতগণের উক্ত ঘটনার বা হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশের অবকাশ কোথায়?

হিন্দু শাস্ত্রের বিধান

ইস্রায়েলীদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভারতীয় হিন্দুগণ মুশরিক, যাহারা মুসলমানদের বিরোধিতা ও তাহাদের প্রতি বৈরিতা পোষণে তাহাদের সমপর্যায়ের, তাহাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.....

"অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিতে পাইবে" (দ্র. ৫ ঃ ৮২)।

ঐ হিন্দুজাতির অনুসরণীয় বেদের বাণী উহা হইতে কোন অংশে কম নহে। ঋগবেদে বলা হইয়াছে ঃ

رگ وید چوتھے منڈل کے منتر-١٦ رچا-١٠ میں ہے اس نے پچاس ہزار سیاہ خام دشمنون کو لڑائی مین تباہ وغارت کیا (قدیم ھندوستان کی تھذیب)۔

ঋগ্‌বেদ ৪র্থ বৃত্ত, মন্ত্র ১৬, শ্লোক ১০-এ আছে ঃ

তিনি পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণকায় শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস করেন।

رگ وید منڈل ١٠ منتر ٤٩ رچا-٧

ہم نے داسوں (غلاموں) کو دو ٹکڑوں مین قطع کردیا قضا وقدر نے ان کو اسی واسطے پیداکیا تھا، ص ٣٨-

আমরা দাসদিগকে দুই টুকরা করিয়া কর্তন করিয়া দিলাম। নিয়তি তাহাদিগকে এইজন্যই সৃষ্টি করিয়াছিল।

رگ بید منڈل ٣ منتر رچا ٦-٧

وہ اندر جسنے ورتراکو قتل کیا اور قصبے کے قصبے اور گاوں کے گاوں برباد کردیئے وہ کالے داسوں کی فوجوں کو تباہ کر دیا (اردو ترجمہ قدیم ھندوستان کی تھذیب مصنفہ مسٹر ار سی دت)۔

সেই ইন্দ্র যিনি ভরত্রাকে নিধন করেন এবং যিনি সম্পদের পর সম্পদ, গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করেন, তিনি কৃষ্ণকায় বাহিনীকে সংহার করেন (মিঃ আর. সি. দত্তের প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি-র উর্দূ অনুবাদ, পৃ. ৩৭; রহমাতুল লিল-আলামীন, ১খ., পৃ. ১৫৬-১৫৭)।

ঋগ্বেদের শ্লোকে উল্লিখিত কৃষ্ণকায় দাস বা বৈশ্য বলিতে কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে? তাহারা যে মধ্য এশিয়ার গৌরবর্ণের মরুচারী আর্যদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণকায় আদিম ভারতীয় ডোম, কোল, তামিল, দ্রাবিড় ও আদিসমাজের সাধারণ লোকজন ছিল উহা বলাই বাহুল্য। মনুসংহিতার পাতায় পাতায় তাহাদের মনুষ্যত্বের ও অধিকার বঞ্চিত জীবনের চিত্র বিধৃত হইয়াছে যাহার দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এইখানে নাই। হযরত সা'দ (রা)-এর বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ের যে বিরোধিতা করার কোন সুযোগ কোন ইয়াহূদী, খৃস্টান বা হিন্দু আর্য পণ্ডিতের নাই, এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই কেবল এই আলোচনাটুকু করিতে হইল।

স্বয়ং বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা এবং তাহাদের খাযরাজ বংশীয় বন্ধুগণ হযরত মু'আয (রা)-কে বিচারকরূপে মনোনীত করার জন্য প্রস্তাব দিয়াছিল এবং এই শর্তেই তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল যে, তিনি যে রায় দিবেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহারা সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন। উহা না করিয়া তাহারা যদি রাসূলুল্লাহ্র(স) প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিত, তাহা হইলে তিনি কী সিদ্ধান্ত দিতেন উহা তাহারা বুঝিতে পারিত। বনূ কুরায়যা খন্দকের যুদ্ধেই যে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহা নহে, বদর যুদ্ধেও তাহারা মক্কার কুরায়শদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া মদীনা সনদের শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) দয়াপরবশ হইয়া সেই সময় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কাজী সুলায়মান মনসূরপুরী বলেন ঃ

"আমাদের কাছে এমনটি বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ ও নজীর রহিয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বলা চলে যে, বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা যদি তাহাদের ভাগ্যের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ছাড়িয়া দিত তবে তাহাদের বেশি হইতে বেশি যে শাস্তি দেওয়া হইত তাহা হইত, যাও, খায়বারে গিয়া বাস কর। বনূ নাযীর ও বনূ কায়নুকার ইয়াহূদীদের ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্তই ইহার বাস্তব নজীর। রাসূলুল্লাহ (স) তো স্বয়ং বনূ কুরায়যার কোন কোন ইয়াহূদীর প্রতিও বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া রাজকীয় বদান্যতাস্বরূপ উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রিফা'আ ইব্‌ন শামুয়েল নামক ইয়াহূদীকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন (দ্র. রহমাতুললিল আলামীন, উর্দূ, ১খ., পৃ. ১৫৬-১৫৭)।

বনূ কুরায়যার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের মধ্যে গনীমত বিতরণকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি অন্যতম সমরকৌশল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি পদাতিক সৈন্যগণকে এক-চতুর্থাংশ এবং অশ্বারোহিগণকে তিন-চতুর্থাংশ হিসাবে গনীমত দান করেন। অন্য কথায় তিনি একজন অশ্বারোহী সৈন্যকে একজন পদাতিক সৈন্যের তিন গুণ প্রদান করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সমরনায়ক জেনারেল আকবর খান ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে ঃ

"এটা এজন্য করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় ফৌজকে শক্তিশালী করে গড়বার স্বার্থে মুজাহিদদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যেন তারা সবাই ঘোড়া রাখে এবং অধিকতর মর্যাদাবান ও গর্বিত হয়। যতদিন ফৌজে অশ্বারোহী বাহিনী থেকেছে, আরোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য সর্বদা ও সর্বস্থানে ছিল। আজও ট্যাংক বাহিনীর সিপাহীদের প্রকৌশলগত নৈপুণ্যের কারণে অধিক বেতন দেওয়া হয়। আঁ-হযরতের এই দূরদর্শিতার ফলে মুসলিম বাহিনী সত্বর সর্বোত্তম ও শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়।

"বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কেবল দুটো ঘোড়া ছিল। উহুদ যুদ্ধে সেনানায়কদের নিজেদের ছাড়া সিপাহীদের নিকট ৩০টি ঘোড়া এবং খন্দক যুদ্ধে শুধু ৩৬ জন ঘোড়সওয়ারের একটি প্লাটুন ছিল। এটা বাড়াবার দরকার ছিল জরুরী ভিত্তিতে এবং সেই যুগে স্বেচ্ছাপ্রণোদনের ভিত্তিতে বাড়ানোর এটা ছিল সর্বোত্তম প্রয়াস" (দ্র. ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ২৮৩-২৮৪)।

গোটা বনূ কুরায়যা যুদ্ধের উপর পর্যালোচনা করিতে গিয়া উক্ত সমরনায়ক নিম্নোক্তভাবে তাহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

"এটাও স্মরণ রাখা উচিত, যে দেশ এবং যে সরকার নৈতিক দিক দিয়ে কমযোর হয় তাকে শুধুমাত্র শক্তির প্রদর্শনী দ্বারাই বশীভূত করা যায়। এর উদাহরণ ঠিক সেই গুণ্ডার মতই, যে প্রতিটি ভদ্র ও শরীফ লোককে হেনস্তা করতে মজা পায়; কিন্তু যেখানেই তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী লোকের সাক্ষাৎ ঘটে এবং পুলিশের ডাণ্ডা দেখতে পায়, অমনি সে ভেজা বিড়ালের মত হয়ে যায়। ঐ উদাহরণ কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরূপ অবস্থায় মানিয়ে-বুঝিয়ে, অনুরোধ-উপরোধ কিংবা উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক অভিযান আবশ্যক। যদি তাদেরকে একবারও লোভ দেখিয়ে কিংবা লালসা জাগিয়ে আনিয়ে দেয়া হয় তবে তাদের দন্তনখরও হিংস্র হয়ে ওঠে। অতএব এমতাবস্থায় ইটের বদলে পাটকেলটি খেতে হয়— নীতির উপর আমল হওয়া উচিত। এই নীতির উপর আমল করে বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (স) গ্রহণ করেছিলেন এবং উম্মতের জন্য এই সুন্নাহ রেখে গেছেন যে, যখনই এই ধরনের মওকা আসবে, যখনই শরাফতি ও যুক্তিগ্রাহ্যতার জবাব দেওয়া হয় গাদ্দারি, দাগাবাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, শঠতা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তখন চরম পদক্ষেপ গ্রহণে এতটুকু ইতস্তত করা উচিত নয়" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-২৯৯)।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের অধিকাংশই ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বিষ্ট মনোভাবসম্পন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যকার কেহ কেহ সময় সময় বাস্তব অবস্থার স্বীকারোক্তিও করিয়াছেন। বনূ কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদীর শঠতা ও প্রবঞ্চনা যে সত্য সত্যই চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের দমন ও নির্বাসন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহাও কেহ কেহ নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

ডারমিংহাম-এর স্বীকারোক্তি

"Quraish had allied themselves to the Bedouins and the Jews, and their formixable Clayton was preparing to deal a decision blow to Islam. The Banu Nadhir who had taken refuge at Khaibar incited their hosts against the new power that had risen threatening all anarchistic Arabia; they represented Muhammad as a tyrant waiting to put all the tribes into chains. The Bedouins of Tihama and Nejd Joined Quraish in a body and the confedaration had spies in the very heart at Medina amongst the Jews of Banu quraidhah who designed, almost openly, the ruin of their burdensome ally. The situation, if prolonged might have become serious, the more so

because Banu Quraidhah had allied themselues with the Ummah" (The Life of Mohamet, P. 326).

অর্থাৎ কুরায়শদের সহিত বেদুঈন ও ইয়াহূদীদের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল এবং তাহাদের ভয়ংকর ঐক্যজোট ইসলামের উপর একটি সিদ্ধান্তকারী ও চূড়ান্ত আঘাত হানিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। খায়বারে আশ্রয় গ্রহণকারী বনূ নাযীর গোত্রীয়রা তাহাদের মেযবানগণকে সেই উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া চলিয়াছিল যাহা গোটা নৈরাজ্যবাদী আরব শক্তিগুলির জন্য হুমকি হইয়া দাঁড়িয়াছিল। তাহারা মুহাম্মদ (স)-কে সমস্ত গোত্রকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত স্বৈরাচারীরূপে চিত্রিত করিতেছিল। তিহামা ও নজদের বেদুঈনরা ঐক্যবদ্ধভাবে সেই ঐক্যজোটে যোগ দিয়াছিল। মদীনার কেন্দ্রবিন্দুতে সেই বনূ কুরায়যা গোত্রীয় গুপ্তচররা সক্রিয় ছিল যাহারা তাহাদের বোঝাস্বরূপ মিত্রশক্তি ইসলামকে প্রায় খোলাখুলিভাবে ধ্বংসের আকাঙ্খা ব্যক্ত করিত। এই পরিস্থিতি আরও বেশিকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হইলে আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করিতে পারিতে। কেননা বনূ কুরায়যা ততক্ষণে আরও বেশি শত্রুদের সহিত জোটবদ্ধ হইত (দি লাইফ অফ মহামেৎ, পৃ. ৩২৬, English translation, London, Routledge & Sons, 1930)।

স্টেনলী লেনপুল বলেন ঃ

"Of the sentences on the three clans, that at exile, passed upon two of them, was clement enough. They were a turbulent set, always setting the people of Medina by the ears; and finally, a followed by an insurection resulted in the expulsion of one tribe; and insubordination, alliance with enemies and a suspicion of conspiracy against the Prophet's life, ended Similarly for the second. Both tribes way to bring Muhammad and his religion to ridicule and destruction. The only question is whether punishment was not too light. Of them an arbiter appointed by themselves, When Quraish and their allies are beseizing Medina and had well night stormed the defences, this Jews tribe entered into negotiations with the enemy, which were only circus dented by the diplomacy of the Prophet. When the beslized had retained, Muhammad naturally demanded an explanation at the Jews. They reinstated in their dogged way and were themsalves besieged and consented to surrender of discretion. Muhammad, however, consented to the appointing at a chief of a tribe allied to the Jews as the judge who should pronouns sentence upon them. This chief gave sentence that the men, in number some 600 should be killed, and the woman and children enslaved and the sentence was carried out. If was a

harsh, bloody sentence; but it must be remembered that the crime of these men was high treason against the state, during a time of seize and one need not be surprised of the summary executing of a traitorous clan. (Studies in a Mosque, page 69).

"পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে দুইটি গোত্রের প্রতি প্রদত্ত নির্বাসনের দণ্ডাদেশ ছিল যথেষ্ট মৃদু বা হালকা। তাহারা ছিল একটি উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী। অহরহ তাহারা মদীনার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে লাগিয়াই থাকিত। অবশেষে কলহ, তারপর বিদ্রোহ একটি গোত্রের নির্বাসন পর্যন্ত গড়ায়। অবাধ্যতা, শত্রুদের সহিত যোগসাজশ ও নবীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রজনিত অবিশ্বাস দ্বিতীয় গোত্রটিরও অনুরূপ পরিণতি ডাকিয়া আনে। উভয় গোত্রই মূল সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করে। তাহারা মুহাম্মদ (স) এবং তাঁহার ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ধ্বংস করার কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয় নাই। এই ব্যাপারে একটি মাত্র প্রশ্ন, তাহাদের এই শাস্তি কি একান্তই হালকা ছিল না? কেবল তৃতীয় গোত্রটি ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন হয়, তাহাও আবার মুহাম্মদের দ্বারা নহে, বরং তাহাদেরই স্ব-নিয়োজিত একজন সালিশের দ্বারা। কুরায়শ এবং তাহাদের মিত্র বাহিনীর দ্বারা যখন মদীনা অবরুদ্ধ হয় এবং মদীনার প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয় তখন উক্ত ইয়াহূদী গোত্রটি শত্রুদের সহিত যোগসাজশে লিপ্ত হয়। নবীর কূটনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই উহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। অবরোধ প্রত্যাহৃত হইলে মুহাম্মদ (স) স্বভাবতই ইয়াহূদীদের নিকট উহার কৈফিয়ত তলব করেন। তাহারা তাহার একগুয়েমীপূর্ণ জবাব দেয়, নিজেরাই নিজেদের জন্য অবরোধের পথ বাছিয়া লয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যেমন করিয়াই হউক মুহাম্মদ (স) ইয়াহূদীদের একজন মিত্র গোত্রপতিকে তাহাদের ব্যাপারে রায় দেওয়ার জন্য বিচারক নিয়োগে সম্মতিদান করেন। সেই গোত্রপতিই যে রায় দিলেন সেই রায় কার্যকরী করা হয়। ইহা একটি রূঢ় ও রক্তক্ষয়ী রায় ছিল সন্দেহ নাই, তবে বিশ্বাসঘাতক গোত্রের বিরুদ্ধে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারের রায় কার্যকরী হওয়ার জন্য কাহারও বিস্মিত হওয়ার মত কিছু নাই" (দ্র. স্টাডিজ ইন এ মস্ক, পৃ. ৬৮, London, Eden Remington, 1893)। অন্যত্র Lane Poole লিখেন :

"মনে রাখতে হবে যে, তাদের অপরাধ ছিল দেশের সঙ্গে গাদ্দারী এবং তাও আবার অবরোধকালীন। যেসব লোক ইতিহাসে এটা পড়েছে যে, (জেনারেল) ওয়েলিংটনের ফৌজ যে পথ দিয়ে যেত, সেসব পথ চিনতে পারা যেত পলাতক সৈনিক ও লুটপাটকারীদের লাশ দ্বারা যা গাছের ডালে লটকানো থাকতো, তাদের একটি গাদ্দার গোত্রের একটি কাতুকুতু ফয়সালার প্রেক্ষিতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই" (নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৭, Selection from the koran, page IXV-এর বরাতে)।

আর. ডি. সি. বড়লে বলেন : "মুহাম্মদ আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ডটি আকার-আয়তনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং এর লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখ। কেবল

তিন হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া তাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না যারা লোকদের আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্য করতে পারে। এই বাহিনীও আবার পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। আর মুহাম্মদ যদি এক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বনী কুরায়যাকে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কোনরূপ শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিতেন, তাহলে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হত। ইয়াহূদীদের হত্যার ব্যাপারটি কঠোর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের ধর্মের ইতিহাসে এটা কোন অভিনব ব্যাপারই ছিল না এবং মুসলমানদের দিক দিয়ে এ কাজের পেছনে পূর্ণ বৈধতা ও অনুমোদন বর্তমান ছিল। এর ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহ ও ইয়াহূদীরা কোনরূপ চুক্তিভঙ্গ ও গাদ্দারী করবার পূর্বে তার পরিণতি কত খারাপ হতে পারে তা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। কেননা মুহাম্মদ (স) যে তাঁর ফয়সালা কার্যকরী করতে কতটা পারঙ্গম তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল" (প্রাগুক্ত, সূত্র The Messenger The Life of Muhammad, London 1946, p. 202-3)। মোটকথা, সমর কৌশল হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই পদক্ষেপ যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল উহা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকমাত্রই স্বীকার করেন।

মক্কা বিজয়ে অনুসৃত প্রতিরক্ষা কৌশল

সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হইল মক্কা অভিযান। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, যে কেহ ইচ্ছা করিলে মুহাম্মাদ (স) বা তাঁহার প্রতিপক্ষ কুরায়শের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে। মিত্ররা তাহাদের মিত্র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং ঐ মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করা সন্ধিকারী মূল পক্ষের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির উক্ত শর্তানুযায়ী বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এবং তাহাদের প্রতিপক্ষ বনূ বাক্র কুরায়শদের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইভাবে তাহারা একে অপরের নিকট হইতে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার প্রয়াস পায়। কিন্তু বনূ বাক্র ঐ সুযোগে সুদীর্ঘ কাল হইতে চলিয়া আসা বনূ খুযা'আর সহিত তাহাদের বৈরিতা চরিতার্থ করার সুযোগ পাইল। নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ-দায়লীর নেতৃত্বে তাহাদের একটি বাহিনী ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে ওতীর নামক একটি ঝর্ণা পাড়ে তাঁবু গাড়িয়া থাকা খুযা'আ গোত্রের উপর নৈশ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের ২০জন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করে (দ্র. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭৮৪)।

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে হারাম সীমানায় ঠেলিয়া দেয় এবং যুদ্ধ নিষিদ্ধ সেই পবিত্র হারাম সীমায় তাহাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয় (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নাবাবিয়্যা (আরবী), ২খ., পৃ. ৩৮৯)।

মূসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করেন যে, বনূ খুযা'আকে আক্রমণে বনূ বাক্রকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিল কুরায়শ সর্দার সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা, শায়বা ইব্ন উছমান ও সুহায়ল

ইব্‌ন আমর প্রমুখ এবং তাহারা তাহাদের দাসদিগকে পাঠাইয়া ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বনূ বাক্‌রকে সাহায্য করিয়াছিল (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৬৫; যাদুল মা'আদ, ১খ., ৪১০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৮১)।

মাওলানা আকরম খাঁ এই যুদ্ধের পিছনে কুরায়শ তথা গোটা পৌত্তলিক গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এইভাবে ঃ "(হুদায়বিয়া) সন্ধি স্থাপনের অল্প দিনের মধ্যে এই মহা বিজয়ের মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং কুরায়শগণ দেখিতে পাইল যে, মক্কা ও উহার দক্ষিণ অঞ্চলের আরব গোত্রগুলিও অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। এই আশংকায় মক্কার কুরায়শ, তায়েফের ছাকীফ ও হুনায়নের হাওয়াযিন গোত্র যারপর নাই বিচলিত হইয়া পড়িল। এতদিনে তাহাদের কৃতকর্মগুলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কুরায়শগণ এখন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই হাওয়াযিন গোত্রের দলপতিগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিল এবং সমস্ত পৌত্তলিক আরব গোত্রকে লইয়া সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করার আয়োজন করিতে লাগিল। হাওয়াযিন দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশে গমন পূর্বক ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকে। অবশেষে পূর্ণ এক বৎসরের চেষ্টা-চরিত্র ও উদ্যোগ-আয়োজনের পর মদীনা আক্রমণ করার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হইয়া যায়" (মোস্তফা চরিত, পৃ.৭৮৩; সূত্র যুরকানী, মাওয়াহিব, ১খ., ৩৮৮)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিতে তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ আরবের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি একমাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন খুযা'আ গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইবার মধ্যে তাহারা বাক্‌র গোত্রকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। বনূ খুযা'আর প্রতি আক্রমণ চালাইয়া তাহারা সন্ধিপত্র লঙ্ঘনের প্রক্রিয়াটি শুরু করিয়াছিল এবং সম্মিলিত পৌত্তলিক শক্তির বিরুদ্ধে এখন আর তেমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের শক্তি মুসলমানদের নাই, এইরূপ একটা ধারণায় তাহারা উপনীত হইয়াছিল।

বনূ বাকরের আক্রমণের সেই দুঃসহ রজনীতে মক্কায় আত্মগোপনকারী আমর ইব্‌ন সালিম খুযা'ঈ সেখান হইতে সরাসরি মদীনায় পৌঁছিয়া একটি কবিতা তাঁহাদের দুর্দশার বিবরণ দিলেন এইভাবে ঃ

إن قريشا اخلفوك الموعدا + ونقضوا ميثاقك الموكدا

وجعلوا لى فى كداء رصدا + وزعموا ان لستُ ادعوا احدا

هم اذل واقل عددا + هم بيوتنا بالوتير هجدا

وقتلونا ركعا وسجدا .

"নিঃসন্দেহে কুরায়শরা আপনার চুক্তির বরখেলাপ করিয়াছে এবং তাহারা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে।

"তাহারা কাদা নামক স্থানে আমার জন্য ওঁৎ পাতিয়াছে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছে যে, আমি বুঝি সাহায্যের জন্য কাহারও নিকট ফরিয়াদ জানাইব না।

"তাহারা অতি হীন এবং সংখ্যায় নগণ্য। তাহারা ওতীরে আমাদের বাড়ীঘরে নৈশ আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এমন অবস্থায় আমাদের উপর হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে যখন আমরা রুকূ সিজদার অবস্থায় (প্রার্থনারত) ছিলাম"।

এই সময় আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা গেল। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ বনূ খুযা'আর সাহায্যের সুসংবাদে এই মেঘখণ্ড দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকার নেতৃত্বে বনু খুযা'আর একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌঁছিয়া তাহাদের নেতৃবৃন্দের নামধাম এবং কুরায়শদের ঐ হামলাকারী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ নবী করীম (স)-কে অবগত করিয়া তাহারা আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অপরাধ যে কত .নাযুক তাহা উপলব্ধি করিয়া আবূ সুফ্য়ান মদীনায় গমন করিয়া তাহাদের পূর্বের চুক্তির নবায়নের প্রয়াস চালান। কিন্তু নবী করীম (স), এমনকি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও আহলে বায়তগণের যাহাদিগের নিকটই আবূ সুফ্য়ান সুপারিশের জন্য গিয়াছিলেন তাঁহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শক্রমে কুরায়শ নেতা মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া একতরফাভাবে শান্তি প্রস্তাবের নবায়নের ঘোষণা দিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে উহার অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হন (দ্র. ইব্ন হাজার, আল-মাতালি আল-আলিয়্যা, ৪২৪৩, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাফর হইতে বর্ণিত মুরসাল বর্ণনার বরাতে; ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৮, ইব্ন উমারের হাদীছের বরাতে; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ.,পৃ. ২৮৩; আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ২খ., পৃ.৭৮৬; ইব্ন হিশাম, ৪খ.,পৃ. ৭-৮)।

তাবারানীর রিওয়ায়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদপ্রাপ্তির তিনদিন পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত আইশা (রা)-কে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এমনভাবে প্রস্তুত করার আদেশ দিয়াছিলেন যাহাতে অন্য কেহ তাঁহার এই প্রস্তুতির ব্যাপারটি আঁচ করিতে না পারে। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর জিজ্ঞাসার জবাবেও হযরত আইশা (রা) এই ব্যাপারে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে 'আমর ইব্ন সালিম খুযা'ঈ চল্লিশজন অশ্বারোহীসহ আসিয়া কবিতা পাঠের মাধ্যমে ফরিয়াদ করিলেন। তাহার পর বুদায়লের আগমন এবং সর্বশেষ আবূ সুফিয়ানের আগমনে লোকজনের কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনকে মক্কা যাত্রার প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং সংবাদটি যাহাতে মক্কাবাসীদের গোচরীভূত হইতে না পারে সেইজন্য দু'আ করেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, উর্দূ সংস্করণ, পৃ. ৫৪০)।

কুরায়শরা যাহাতে মুসলমানগণের মক্কা অভিযান সম্পর্কে আঁচ করিতে না পারে এইজন্য প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (স) উহা গোপন রাখিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪ খ., পৃ. ২৮৩; Akram Diya al-Umari, Madinan Society at the time of the Prophet, vol. 2, page 153)।

মক্কা অভিযানের এইরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ ও দু'আ হইতে জানা গেল যে, গন্তব্যস্থান সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অনবহিত রাখাও ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অন্যতম রণকৌশল। এমনকি শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসাবে ৮ম হিজরীর রমযান মাসের শুরুতেই আবূ কাতাদা ইব্ন রিব্ঈ (রা)-এর নেতৃত্বে ৮ জনের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে তিনি বাতনে আদাম (بطن اضم) অভিমুখে পাঠাইয়া দেন যাহাতে লোকজন ঐ ছোট দলটিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল বিবেচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ঐ দিকে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া ধারণায় উপনীত হয়। ঐ এলাকাটি মদীনা হইতে ৩৬ মাইল দূরে যী-খাশাব ও যী-মারওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। ঐ ক্ষুদ্র বাহিনী ঐ স্থানে পৌঁছিয়া জানিতে পারেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীসহ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছেন। সেইমতে তাঁহারা গিয়া মূল বাহিনীর সহিত মিলিত হন।

এই সময় সরলমতি সাহাবী হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা) নিছক সরলতার দরুন এমন একটি ত্রুটিপূর্ণ কাজ করিয়া বসেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি মক্কাবাসীদিগের নিকট একটি পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধযাত্রার সংবাদ অবগত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি যথারীতি পারিশ্রমিক দিয়া এক নারীকে পত্র বহনের দায়িত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে মক্কার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (স) ওহী মারফত এই সংবাদ পাইয়া হযরত 'আলী, মিকদাদ, যুবায়র ও আবূ মারছাদ (রা)-কে ঐ নারীর নিকট হইতে পত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করাইয়া প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা মদীনা হইতে বার মাইল দূরবর্তী রাওদা খাখ নামক স্থানে পৌঁছিয়া ঐ হাওদানশীন নারীর খোপা হইতে পত্রটি উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) হাতিবকে ডাকিয়া তাঁহার কৈফিয়ত তলব করিলে জবাবে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে তাড়াহুড়া করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস রহিয়াছে। আমি মুরতাদও হই নাই বা আমার বিশ্বাসে কোনরূপ পরিবর্তনও আসে নাই। ব্যাপার হইতেছে এই যে, আমি নিজে কুরায়শ বংশীয় নহি। অবশ্য আমি মক্কায় তাহাদেরই মধ্যে ছিলাম এবং এখনও আমার পরিবার-পরিজন সেইখানেই বসবাসরত। কিন্তু কুরায়শদের সহিত আমার এমন কোন সম্পর্ক নাই যে জন্য তাহারা আমার পরিবার-পরিজনের হেফাযত করিবে। তাই আমি চাহিলাম তাহাদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ থাকুক, তাহা হইলে ইহার বিনিময়ে তাহারা আমার ঘনিষ্ঠজনদের হেফাযত করিবে।

সব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হাতিব যথার্থ বলিয়াছে। 'উমার (রা) উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ঐ মুনাফিকটির গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'উমার! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, এই হাতিব বদর যুদ্ধের একজন যোদ্ধা এবং বদরের যোদ্ধাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি" (দ্র. ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৯৭)। এই কথা শুনিয়া উমার (রা)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলই সম্যক অবহিত (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪২২,

হযরত হাতিবের ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ ছিল বটে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার কৈফিয়ত তলব না করিয়া একতরফা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না। শোনার পর তাহা গ্রহণ করিয়া রণযাত্রার সময় স্থির ও ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মহান শিক্ষা দান করিলেন। পরীক্ষিত আপনজনকে তাহার সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য হত্যা করা চলে না, ইহাও তিনি শিক্ষা দিলেন।

অহেতুক যুদ্ধ বাঁধাইয়া রক্তক্ষয় বা প্রতিপত্তি লাভ যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাম্য ছিল না, তাই শত্রুপক্ষকে প্রতিকারের বা যুদ্ধকে এড়াইবার শেষ সুযোগটি তিনি দান করিতেন। তাই বনূ খুযা'আর উপর বনূ বাক্রের আক্রমণ ও রক্তক্ষয়ে কুরায়শদের প্রত্যক্ষ হাত রহিয়াছে টের পাইয়া যুদ্ধ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি কুরায়শদের কাছে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠাইলেন, "হে কুরায়শগণ! তোমরা খুযা'আ গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দান করিয়া কৃত অন্যায়ের প্রতিকার কর অথবা বনূ বাক্র গোত্রের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর। অন্যথায় হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা কর।"

কুরায়শগণ পূর্ব হইতেই পরামর্শ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই জন্যই তাহারা নিঃসঙ্কোচে বাক্র গোত্রকে সাহায্য করিতে সাহস করিয়াছিল। কাজেই কুরায়শদের মুখপাত্র কারাতা ইব্ন উমর পরিষ্কার ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দূতকে জানাইয়া দিল, আমরা শেষ শর্তটি গ্রহণ করিলাম অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলাম। দূত মদীনায় ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সব জানাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কুরায়শদের প্ররোচনায় বনূ বাক্র এইসব কাণ্ড করিতে সাহসী হইয়াছে। এখন যুদ্ধ যাত্রা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স): সমকালীন পারিবেশ ও জীবন, পৃ. ৭৫৬, সূত্র যুরকানী, পৃ. ৩৪৯)।

মক্কা যাত্রার পূর্বে উহার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় যে চরম গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য ছিল, মক্কাবাসীরা যেন প্রস্তুতি গ্রহণের সময় না পায় যাহাতে কা'বা প্রাঙ্গণে রক্তাক্ত যুদ্ধ না হয়। ইহার গোপনীয়তার অংশ হিসাবেই মদীনার আশপাশের আসলাম, গিফার, মুযায়না জুহায়না, আশজা', সালিম প্রভৃতি গোত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে ঘোষণাটি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল এই ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحضر رمضان بالمدينة .

"আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যাহাদের ঈমান আছে তাহারা যেন রমযান মাসে মদীনায় উপস্থিত থাকে।"

এই সংবাদে প্রচুর সংখ্যক লোক মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহারা তাৎক্ষণিক ভাবে পৌছিতে পারেন নাই, তাহারা পথে আসিয়া কাফেলার সহিত মিলিত হইলেন। এইভাবে দশ হাজার মুজাহিদের বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হইয়া গেল (দ্র. তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৯৭)।

আনসার ও মুহাজিরগণের একজনও এই অভিযান হইতে পিছনে রহিলেন না। কেবল মুযায়না গোত্রের ১০০০ জন এবং সালিম গোত্রের ১১০০/৭০০ জন এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ২খ., পৃ. ৩৯৯)। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী শান্তির সময় ইসলাম যে কী দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অষ্টম হিজরীর ১০ রমযান তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (স) সদলবলে মক্কার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন। তাহাদের মাররুয যাহ্রান পৌঁছা পর্যন্ত কুরায়শরা তাঁহাদের গতিবিধি আঁচ করিতে পারে নাই (শারহে মুসলিম, ৩খ., পৃ. ১৭৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) যখনই কোন যুদ্ধ উপলক্ষে মদীনার বাহিরে গমন করিতেন তখন তাঁহার বিশ্বস্ত সাহাবীগণের একজনকে প্রতিনিধিরূপে মদীনার শাসক নিযুক্ত করিয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুপস্থিতিতে মদীনা আমীরবিহীন অরক্ষিত অবস্থায় থাকিবে ইহা কখনও তাঁহার কাম্য ছিল না। মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রাককালে কুলছুম ইব্ন হুসায়ন গিফারীকে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান (ইব্ন হিশাম, সীরতুন্নবী, বাংলা অনু., ৪খ., পৃ.৩৯)।

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ২য় হিজরীর সফর মাসে আবওয়া যুদ্ধ অভিযানে গমনকালে তিনি সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)-কে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। বুওয়াত অভিযানকালে সা'দ ইবন মু'আযকে, যুল-'উশায়রা অভিযানকালে আবূ সালামা ইব্ন আব্দুল আসাদ মাখযূমীকে, বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে প্রথমে হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। আর-রাওহায় পৌঁছিবার পর হযরত আবূ লুবাবা ইব্ন আব্দুল মুনযির (রা)-কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। বনূ সুলায়ম অভিযানকালে সিবা ইব্ন উরফুতা (রা)-কে, অপর মতানুসারে ইব্ন উম্মে মাকতূমকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৯০)।

বনূ কায়নুকা অভিযান কালেও আবূ লুবাবা (রা) ইব্ন মুনযির মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ইব্ন হিশাম বশীর ইব্ন মুনযির সম্পর্কে লিখিয়াছেন, আসলে আবূ লুবাবারই নাম ছিল বশীর (দ্র. (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ৭১)।

বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা অভিযানকালে ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে গমনকালে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা, মতান্তরে আবূ যার গিফারী (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। আবার কেহ নুমায়লা ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ লায়ছী (রা) এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহুদ যুদ্ধকালেও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। খায়বার অভিযানকালে সিবা ইব্ন উরফুতা এবং গাযওয়া যী-আমর চলা কালে হযরত উছমান ইব্ন 'আফফান (রা) মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গাযওয়া সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধকালেও আবূ লুবাবা (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন (দ্র. যাদুল মা'আদ, ২ খ., পৃ. ৯০-৯১)।

মোটকথা, ইহাও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একটি প্রতিরক্ষা কৌশল ছিল যে, কোন সংক্ষিপ্ততম সময়ের জন্যও মদীনা ত্যাগ করিলে তিনি মদীনায় তাঁহার একজন স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া যাওয়া জরুরী বিবেচনা করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যূহ রচনা, দায়িত্ব বন্টন ও পতাকা ব্যবহার

মক্কা অভিযানের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ্ (স) এতই সফল হন যে, বিশাল মুসলিম বাহিনী মাররুজ জাহ্রান পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে কুরায়শরা তাঁহাদের এই অভিযান সম্পর্কে ঘূণাক্ষরেও কিছু টের পায় নাই। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সময় বাহিনীকে সামরিক নিয়মনীতি অনুসারে বিন্যাসও করা হয় নাই।

মাররুজ জাহ্রানে পৌঁছিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) গোটা বাহিনীর ব্যূহ রচনা করেন। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেনঃ (১) ডান দিকের বাহিনী, (২) বাম দিকের বাহিনী ও (৩) মধ্যবর্তী বাহিনী। ডান দিকের দায়িত্ব খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে, বাম বাহিনীর দায়িত্ব যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা)-কে এবং আবূ উবায়দা আমের ইব্নুল জাররাহ্ (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় (দ্র. সহীহ্ মুসলিম, হাদীছ ১৭৮০; সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৪০৭; নাদরাতুন না'ঈম, ১খ., পৃ.৫০২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) যুদ্ধযাত্রাকালে বড় ও ছোট উভয়বিধ পতাকাই ব্যবহার করিতেন। বৃহদাকার পতাকাগুলি কাল বর্ণের এবং ক্ষুদ্রাকার পতাকাগুলি সাদা বর্ণের হইত (দ্র. সুনান ইব্ন মাজা, ২/৯৪১, হাদীছ নং ২২২৭ ও ২৮১৮; সুনান নাসাঈ, ৫খ., পৃ. ৩০০)। বাহিনীতে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত উমার (রা) (দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮৬৯)।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি যুদ্ধযাত্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁহার প্রেরিত সেনাপতিগণ এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন এবং কোন কোন সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রেরিত কোন সেনাপতি শত্রুপক্ষের হাতে নিহত বা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়া পড়িলে তাঁহার পরবর্তী সেনাপতি কে হইবেন তাহাও তিনি যুদ্ধযাত্রার সময়ই বলিয়া দিতেন। যেমন মূতার যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ কালে তিনি যায়দ ইব্ন হারিছাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সাথে সাথে তিনি বলিয়া দেন যে, তিনি যদি নিহত হন তাহা হইলে জাফর ইব্ন আবূ তালিব নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। তিনিও যদি নিহত হন তাহা হইলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করিবেন (দ্র. সহীহ্ বুখারী, হাদীছ নং ৪২৬১, গাযওয়া মূতা মিন আরদে শাম অধ্যায়; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৫১৩; ইবন হিশাম, সীরাহ, ৩/৪২৭)।

এই বিকল্প আমীর নিয়োগের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমীর নিয়োগের সময় একজন আমীর নিয়োগ করা এবং তাহার অবর্তমানে বিকল্প আমীর মনোনয়নেরও অবকাশ রহিয়াছে (দ্র. অধ্যাপক আকরম যিয়া, Madinan Society at the Time of the Prophet, vol. 2, page 143)।

প্রতিশোধ স্পৃহামুক্ত ক্ষমাসুন্দর হৃদয়

প্রতিশোধ স্পৃহামুক্ত ক্ষমাশীল হৃদয় ও আচরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (স) সেই বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছেন যাহা অন্যান্য সেনাপতিগণ বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেও

ছিনাইয়া আনিতে পারেন না। মক্কা অভিযানে রওয়ানা হওয়ার প্রথম দিকেই মুসলিম বাহিনী আবওয়ায় পৌঁছিতেই তাঁহার দুই আজীবন শত্রু নিকটাত্মীয় তাঁহার পিতৃব্য পুত্র আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারিছ এবং ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন উমায়্যা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আজীবন ইহারা আল্লাহ্র রসূলের সহিত বৈরী আচরণের কিছুই বাদ দেয় নাই।

উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রাণের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূল (স) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের ইসলামে দীক্ষিত করার আবেদনে সাড়া দিলেন। অবশ্য হযরত আলী (রা) তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া এবং উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা) তাহাদের জন্য সুপারিশ করিয়া ঐ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখিয়াছিলেন (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, আরবী, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৫০-২৫১)।

কুরায়শ বাহিনীর পক্ষে গোপনে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া গভীর রাতে আবূ সুফ্য়ান রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচা সদ্য ঘোষিত মুসলমান আব্বাস (রা)-এর কাছে ধরা পড়িয়া যান। হাকীম ইব্ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্ন ওয়াক্‌শ সমভিব্যাহারে নৈশ পর্যবেক্ষণে আগত এই দলের পারস্পরিক শলা-পরামর্শের সময় আব্বাস (রা) আবূ সুফ্য়ানের কণ্ঠস্বর চিনিয়া ফেলেন। আবূ সুফ্য়ান এই দিকের সংবাদ জানিতে চাহিলে তাহার পুরাতন বন্ধু আব্বাস (রা) জানাইলেন, কুরায়শদের ধ্বংস অনিবার্য। সময় থাকিতে সুবুদ্ধির আশ্রয় নিতে হইবে। আবূ সুফ্য়ান এখন উপায় কী জানিতে চাহিলে আব্বাস তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

মক্কাবাসীরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাউক, ইহা কোনমতেই আব্বাসের কাম্য ছিল না। তাই কাহারও মাধ্যমে সংবাদ পাঠাইয়া মক্কাবাসীদিগকে আবার সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাত্রিকালে একাকী বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সুপরিচিত শুভ্র বর্ণের খচ্চরে আরোহণ করিয়াই তিনি বাহির হইয়াছিলেন।

আব্বাস (রা) যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এরই পিতৃব্য এবং তাঁহার বাহন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এরই সুপরিচিত বাহন শুভ্র খচ্চরটি, তাই মুসলিম বাহিনীর মধ্য দিয়া আবূ সুফ্য়ানকে লইয়া অতিক্রম করিতে আব্বাসকে কোন বেগ পাইতে হইল না। তাঁহার পিছনে উপবিষ্ট লোকটি কে, তাহাও কেহ জানার প্রয়োজন বোধ করিল না। কিন্তু উমার (রা)-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। আব্বাস (রা)-এর নিজের বর্ণনা ঃ

"শেষ পর্যন্ত যখন আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জ্বলন্ত চুল্লীর পার্শ্ব অতিক্রম করিতেছিলাম তখন তিনি গর্জিয়া উঠিলেন, কে হে ? তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং যখন আমার পিছনে আবূ সুফ্য়ানকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন তখন চিৎকার করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র দুশমন আবূ সুফ্য়ান? প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি কোনরূপ সন্ধিচুক্তি ও শর্ত ব্যতীতই তোমাকে আমাদের করায়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। এই কথা বলিয়াই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর

দিকে দ্রুত দৌড়াইলেন। আর আমিও প্রাণপণে খচ্চরকে ছুটাইলাম এবং তাঁহার পূর্বেই নবী করীম (স)-এর সম্মুখে পৌঁছিয়া গেলাম। তৎক্ষণে উমার আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আবূ সুফ্য়ানকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাত আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিন্তু তাঁহাকে অভয় আশ্রয় দিয়া আনিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! অদ্যকার রাত্রিতে আমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যেন আপনার সহিত একান্তে মিলিত না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আবূ সুফ্য়ানকে আপনি আপনার তাঁবুতে লইয়া যান, সকালে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন।

আব্বাস (রা)-এর এই দীর্ঘ বর্ণনায় হযরত উমার (রা)-এর সঙ্গে আবূ সুফ্য়ানের হত্যার ব্যাপারে তাঁহার বাদানুবাদের বর্ণনাও রহিয়াছে। পরদিন সকালে মহানবী (স) দরবারে হাযির হইলে আবূ সুফ্য়ানের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নরূপ কথোপকথন হয় ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (স) ঃ আবূ সুফ্য়ান! তোমার জন্য আক্ষেপ, এখনও কি তোমার এই কথা অনুসরণ করার সময় আসে নাই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই?

আবূ সুফ্য়ান ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন। আপনি কত ধৈর্যশীল! কত আত্মীয় বৎসল!! আমি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কোন ইলাহ আদৌ থাকিত তবে এই দুর্দিনে সে আমার কাজে আসিত।

রাসূলুল্লাহ্ ঃ আবূ সুফ্য়ান! তোমার জন্য আক্ষেপ, এখনও কি তোমার এই কথা উপলব্ধি করার সময় হয় নাই যে, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল?

আবূ সুফ্য়ান ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন! আপনি কতইনা ধৈর্যশীল ও স্বজন বৎসল। এই ব্যাপারে এখনও আমার কিছুটা সংশয় রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত আব্বাসের পরামর্শক্রমে আবূ সুফ্য়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন (দ্র. ইবন হাজার, মাতালিবুল আলিয়া, পৃ. ২৪৪)।

বুদায়ল ও হাকীম ইবন হিযাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করেন তখন তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করেন (দ্র. মাগাযী, পৃ. ৮১৫; তাবাকাত, পৃ. ১৩৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রদত্ত পতাকা হস্তে আনসার-নেতা হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বীরদর্পে যখন মাররুজ জাহ্রানের গিরিপথ অতিক্রম করিতেছিলেন তখন প্রবল উৎসাহে তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল ঃ

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة.

"আজকের দিন মনের সুখে নিধন হবে।
আজকে কা'বায় হারাম কাজ হালাল হবে।"

ভীত-সন্ত্রস্ত আবূ সুফ্য়ান সা'দ ইব্ন উবাদার এই ঘোষণার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। হযরত উছমান এবং আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-ও সা'দ

(রা)-এর বাহিনীর হাতে কুরায়শদের ব্যাপক নিধনের আশঙ্কা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ব্যক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ বলিলেনঃ না, না, তাহা হইবার নয়।

يا ابا سفيان اليوم يوم المرحمة يعز الله فيه قريشا.

"হে আবূ সুফ্য়ান! আজকের দিন দয়া ও সৌহার্দ্য প্রকাশের দিন। আজ আল্লাহ কুরায়শদিগকে মর্যাদায় ভূষিত করিবেন"।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة.

"সা'দ ভুল বলিয়াছে। আজ আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে সম্মানিত করিবেন এবং কা'বাকে গিলাফ পরানো হইবে"।

সাথে সাথে তিনি অতি উৎসাহী সাদের হাত হইতে পতাকা লইয়া তাঁহার পুত্র কায়সের হাতে অর্পণের নির্দেশ দিলেন (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪২৮০; নাদ্‌রাতুন নাঈম, ১খ., পৃ ৫০১, বাংলা অনু.)।

তারপর আবূ সুফ্য়ান মহানবী (স)-এর দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দ্রুত মক্কায় গিয়া মক্কাবাসীদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা কোনমতেই পারিয়া উঠিবে না। তাই কোনক্রমেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন হইবে না (কান্ধলবী, সীরাতুল মুসতাফা, পৃ. ২১-২২)। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষমাপরায়ণতার সেই দৃশ্য আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র)-র ভাষায় ছিল এইরূপ ঃ

"মক্কা বিজয় তখন সমাপ্ত হয়েছে। হারাম প্রাঙ্গণ। এই সেই হারাম প্রাঙ্গণ যেখানে নূরের নবীকে গালিগালাজ করা হয়েছে , তাঁর উপর আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাঁকে হত্যার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কুরাইশ দলপতিরা বিজিতের বেশে দণ্ডায়মান। ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার কুটিল ষড়যন্ত্রের নায়করা, নূরের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী, তাঁকে অপদস্ত করার প্রয়াসে প্রয়াসীদের মত স্পর্ধাকারী, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণকারী, তাঁর উপর তলোয়ার চালনাকারী, অকারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বক্ষ বিদারণকারী ও তাঁদের হৃৎপিণ্ড চর্বণকারী, নিঃস্ব-দরিদ্র মুসলমানদেরকে অকারণে উৎপীড়নকারী, নিরস্ত্র মুসলমানদের বুকে যারা অত্যাচারের আগ্নেয় মহর অঙ্কন করেছিল, দুপুরের অগ্নিক্ষরা রোদে মরুভূমির তপ্ত বালুতে শুইয়ে রেখেছিল, জলন্ত অঙ্গারে মুসলিমদের চেপে ধরে যারা পাশবিক আনন্দ লাভ করত, বল্লমের খোঁচায় একদা যারা মুসলিমদেরকে ক্ষতবিক্ষত ও ছিদ্র করেছিল, এদের সবাই আজ নত মস্তকে সম্মুখে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে ওদের দশ সহস্রাধিক তলোয়ার রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইঙ্গিতের শুধু অপেক্ষা করছিল। সহসা রাসূলে খোদার মুখে উচ্চারিত হলো— হে কুরাইশকুল! বল, আজ তোমরা আমার কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর? 'মুহাম্মদ! অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী

ভাই আমার, ভাতিজা আমার! জবাবে নানাজনের নানা সম্ভাষণ উচ্চারিত হয়। নূরের নবীর মুখে উচ্চারিত হলো ঃ আজ আমি ভাই বলবো ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর যালিম ভাইদেরকে যা বলেছিলেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.

"আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই"।

اذهبوا فانتم الطلقاء.

"যাও, আজ তোমরা স্বাধীন, যদৃচ্ছ অবাধে যেতে পার"।

প্রিয় ভায়েরা আমার! বন্ধুরা আমার! এই হলো শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শনে ইসলামের নবীর বাস্তব আদর্শ, বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা-যা দুনিয়ার বাস্তব ইতিহাসের পাতায় দেদীপ্যমান ঘটনারূপে ভাস্বর হয়ে রয়েছে" (আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র) কর্তৃক ১৯২৫ সালে মাদ্রাযের লালী হলে প্রদত্ত সীরাত-ভাষণ, দ্র. নবী চিরন্তন, খুৎবাতে মাদ্রাজ-এর আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী কৃত বঙ্গানুবাদ, পৃ. ১৩৬)।

প্রতিপক্ষকে বিব্রত ও ভীতিগ্রস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ

মাররুজ্জ জাহ্‌রানে রাত্রি যাপনকালে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার দশ হাজার সহযাত্রীকে অগ্নিচুল্লি প্রজ্বলনের নির্দেশ দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যেন প্রতিপক্ষ কুরায়শগণ এই বিপুল অগ্নি সমারোহ দর্শনে সৈন্য-সংখ্যার আধিক্য সম্পর্কে অবগত হইয়া প্রস্তুত হইয়া যায় এবং তাহাদের মনোবল নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার এই সমর কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এই বিপুল অগ্নিসমারোহ দর্শনে ভীত-সন্ত্রস্ত আবূ সুফ্য়ান ও তাহার সঙ্গীদের জল্পনা-কল্পনার সময়ই যে আব্বাস (রা)-এর সাথে আবূ সুফ্য়ানের যোগাযোগ ঘটে এবং আব্বাস (রা)-র পরামর্শে তিনি মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন সেই কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মাররুজ্জ জাহ্‌রানের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রমকালে বিশাল ইসলামী বাহিনীর সংক্ষেপে অগ্রযাত্রা যেন আবূ সুফ্য়ান প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, সেইজন্য তাহাকে লইয়া সেই সময় ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকার জন্যও রাসূলুল্লাহ্ (স) আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সত্য সত্যই সেই দৃশ্য দর্শনে অভিভূত হইয়া পরম ভীতিগ্রস্ত অন্তরে আবূ সুফ্য়ান মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গৃহীত এই ব্যবস্থাটিও অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। অল্প কিছু লোক ছাড়া মক্কা বিজয়ের দিন বিশাল মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় দাঁড়াইতে মক্কাবাসীরা সাহসী হয় নাই। ফলে অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কবল হইতে কুরায়শরা রক্ষা পায়।

প্রতিপক্ষের সর্দারদের সম্মাননা এবং রক্তপাত এড়াইবার ব্যবস্থা গ্রহণ

নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বলিপ্সা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষত রাজ-রাজড়া ও গোত্র প্রধানগণ উহার কবল হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের এই তৃষ্ণা নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে সত্যকে সম্যকরূপে জানিয়াও অনেকের পক্ষে তাহা গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূলের সত্যতা নিখুঁতভাবেই ধরা পড়িয়াছিল, কেবল রাজত্ব হারাইবার আশঙ্কাই তাহার ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় (দ্র. মৎপ্রণীত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রাবলীঃ সন্ধি চুক্তি ও ফয়সালাসমূহ, পৃ. ৩৮-৫৭; সূত্রঃ ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৪০; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৬২-২৬৮; আল-জাওয়াবুস সাহীহ্, ১খ., পৃ. ৯৪ ইত্যাদি)।

তাই রাসূলুল্লাহ (স) রাজন্যবর্গের নামে লিখিত তাঁহার পত্রাবলীতে প্রায়ই উল্লেখ করিতেন ঃ

فاسلم تسلم واسلم يجعل لك الله ما تحت يديك.

"অতএব ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন এবং ইসলাম কবুল করুন, আপনার অধীনে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্ আপনার অধীনেই রাখিয়া দিবেন" (দ্র. মুনযির ইব্ন সাওয়ার নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র, প্রাগুক্ত রসূলুল্লাহ্‌র পত্রাবলী...., পৃ. ৯৬; সূত্র ঃ যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬১; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ১৯ ও ২৭; ফুতূহুল বুলদান, ১খ., পৃ. ৭৯-৮১; ইব্ন তূলূন, ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ৮ ইত্যাদি)।

সত্য সত্যই ইসলাম গ্রহণের পর এই মুনযির ইব্ন সাওয়া এবং আরও অনেককে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের রাজত্বে বহাল রাখিয়াছেন। আবূ সুফ্য়ানের ইসলাম গ্রহণ কালেও সেই ব্যাপারটি সম্মুখে আসিল। আব্বাস (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফ্য়ান মক্কার অন্যতম প্রধান সর্দার, সে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাহার গৌরববর্ধক ও বৈশিষ্ট্যবোধক কোন ব্যবস্থা করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঠিক আছে। ঘোষণা করিয়া দাও, যেই ব্যক্তি আবূ সুফ্য়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘরে কয়জন লোকই বা আশ্রয় নিতে পারিবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঠিক আছে, যাহারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে (আশ্রয় গ্রহণ করিতে) তাহারাও নিরাপদ।

এইবার আবূ সুফয়ান বলিলেন, মসজিদেও তো সকলের স্থান সঙ্কুলান হইবে না ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঠিক আছে, যেই ব্যক্তি তাহার নিজ ঘরে অবস্থান করিবে সেও নিরাপদ। এইবার আবূ সুফ্য়ান আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন, হাঁ, এখন আর স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা হইবে না।

আবূ সুফ্য়ান যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নিরাপত্তা লাভের এই ব্যবস্থার কথা লোকজনকে বলিলেন, তখন তাহার স্ত্রী হিন্দ লোকজনকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল— দেখ, দেখ, এই অর্বাচীন বৃদ্ধটি কী প্রলাপ বকিতেছে! তোমরা ইহার কথায় কর্ণপাত করিও না। সে আবূ

সুফ্য়ানকে অত্যন্ত অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিল। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, মঙ্গল চাহিলে ইসলাম গ্রহণ কর! প্রাণ বাঁচাইতে চাহিলে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক। আমি যাহা বলিতেছি, সত্য বলিতেছি। ইহা ছাড়া প্রাণে বাঁচিবার আর কোন পথ নাই। তাহার এইরূপ বক্তব্য শ্রবণে লোকজন মসজিদুল হারামের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। কেহ বা তাহার নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল (দ্র. কান্ধলবী, সীরাতুল মুসতাফা, ৩খ., পৃ. ২০-২৩)।

ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলী যুগের সর্দার শ্রেণীর লোকদের পুনর্বাসনের অন্তত আরও তিনটি নযীর পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়কালে হাকীম ইব্ন হিযামের বাড়ীও নিরাপদ ঘোষিত হইয়াছিল। আমর ইব্নুল আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর পূর্বতন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী অনেক উল্লেখযোগ্য সাহাবীর বর্তমানে তাঁহাকেই সেনাপতির মর্যাদা দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের হোতা হওয়া সত্ত্বেও খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করিবার সাথে সাথে তাহাকে 'সায়ফুল্লাহ' (আল্লাহ্র তরবারি খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই সম্মাননাগুলি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী—

خياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام اذا فقهوا.

"তোমাদের মধ্যকার যাহারা ইসলাম— পূর্ব যুগে সম্মানিত ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তাহারা সম্মানিত বিবেচিত হইবে যদি তাহারা ইসলামের ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হয়"-এরই প্রতিফলন (দ্র. ডঃ হামীদুল্লাহ্, উর্দূ মাসিক সিয়াসাত, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, জানুয়ারী ১৯৪০ সংখ্যা এবং আহদে নববী কে নিযামে হুক্মরানী, পৃ. ২৭২)।

যুদ্ধাভিযানে সঙ্কেত ব্যবহার

যুদ্ধ যাত্রাকালে বিশাল বাহিনীর মধ্যে যাহাতে শত্রু পক্ষের গুপ্তচর ঢুকিয়া পড়িতে না পারে, সেই লক্ষ্যে আল্লাহ্র রাসূল (স) পরিচিতিমূলক বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দ নির্ধারণ করিয়া দিতেন, এমনকি নিজেদের বাহিনীর বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্কেতিক শব্দও নির্ধারণ করিয়া দিতেন। যেমন মক্কা অভিযানকালে মুহাজিরগণের সাঙ্কেতিক শব্দ ছিল 'ইয়া বনী আবদুর রহমান'। আনসারদের মধ্যকার খাযরাজীদের সঙ্কেত ছিল 'ইয়া বনী আবদুল্লাহ'। আর আওস গোত্রীয়দের সঙ্কেত ছিল 'ইয়া বানূ উবায়দুল্লাহ্' (সীরাতু ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৪৯, ইফা.)।

গাযওয়া বানূ মুস্তালিক অভিযানে মুসলমান যোদ্ধাদের সাঙ্কেতিক শব্দ ছিল "ইয়া মানসূর"! আমিত আমিত (হে সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী! মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দাও! মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দাও)! খায়বার যুদ্ধেও মুসলিম মুজাহিদগণের বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দ ছিল–আমিত! আমিত!!

কুরায়শদের নামমাত্র প্রতিরোধ

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আবূ সুফ্য়ানের পরমার্শ অনুসারে কুরায়শগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়া বা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়। কিন্তু মরণ কামড়ের

মত তাহাদের মধ্যকার কিছু গুণ্ডা-বদমাশ প্রকৃতির লোক গোয়ার্তুমীপূর্ণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ও সুহায়ল ইব্ন আমরের নেতৃত্বে জাবাল আবূ কুবায়সের পূর্বদিকে অবস্থিত খানদামায় সমবেত হইল। সংঘর্ষে হযরত খালিদের বাহিনীর হাতে তাহাদের বার-তেরজন নিহত হইল। অবশ্য মুসলিম পক্ষের দুইজন কুরয ইব্ন জাবির ফিহ্রী এবং খুনায়স ইব্ন খালিদ ইব্ন রাবী'আ (রা)-ও ভুলক্রমে ভিন্ন পথে চলিয়া যাওয়ায় মুশরিকদের কবলে পড়িয়া শহীদ হন। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খালিদ-বাহিনীর আরেকজন মুজাহিদ জুহায়না গোত্রের সালামা ইব্ন সায়লাও এই সময় শহীদ হন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৪খ., পৃ. ৪৮)।

চূড়ান্ত বিজয়

অষ্টম হিজরীর ১৭ রমযান, মঙ্গলবার। রাসূলুল্লাহ্ (স) মাররুজ জাহ্রান হইতে মক্কায় রওয়ানা হইলেন। যী-তুয়া প্রান্তরে উপনীত হইয়া তিনি থামিলেন। কুরায়শদের পক্ষ হইতে কোনরূপ আক্রমণের লক্ষণই নাই দেখিয়া তিনি সম্যক উপলব্ধি করিলেন যে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় আনিয়া দিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ের কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শির নত হইয়া আসিল। তাঁহার মস্তক আক্ষরিক অর্থেই এত অবনত হইল যে, উটের পিঠের হাওদা তাঁহার শ্মশ্রুরাজি স্পর্শ করিতেছিল। তাঁহার নির্দেশ অনুসরণে খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ তাহার দক্ষিণ বাহিনীসহ মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়া সাফা পাহাড়ে গিয়া থামিলেন। বাম বাহিনী প্রধান যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা) মক্কার উচুঁ এলাকা দিয়া 'কাদা'-এর পথে অগ্রসর হইয়া 'হাজূনে' তাহার ঝাণ্ডা উড্ডীন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি কুব্বা নির্মাণ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় থাকিলেন। আবূ উবায়দাও তাহার পদাতিক বাহিনী লইয়া বাতনে ওয়াদীর পথ ধরিয়া মক্কার কেন্দ্রভূমিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইভাবে আল্লাহ্র ফযল ও করমে প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতেই মক্কা বিজয় সমাপ্ত হইল। যে বিজয়ের জন্য উভয় পক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধার প্রাণনাশ হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রতিরক্ষা কৌশল ও সামরিক ব্যবস্থাপনার দরুন উহা ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতিতে এইভাবে সম্পন্ন হইল।

সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে মক্কা বিজয়ের মূল্যায়ন

দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমর নায়ক জেনারেল আকবর খান বিশ্বযুদ্ধগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে মক্কা বিজয়ের যে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়াছেন উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল যে সর্বোত্তম ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই তাঁহারই ভাষায় এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"মক্কা বিজয়ের বেলা মহানবী (স) যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা আজকালও অবলম্বন করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার indirect approach -এর প্রতিরক্ষা

নীতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। হিটলার প্রথমে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে শত্রুরাষ্ট্রে বিরোধিতার আবেগ-উদ্দীপনাকে খতম করে দিতেন এবং এভাবে নিজেদের হামলার সাফল্যকে নিশ্চিত করতেন, এরই সঙ্গে শত্রুর শক্তিশালী সহযোগীকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেন যেন সে তাদের থেকে সরাসরি ফায়দা উঠাতে না পারে এবং এভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর তার রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হতো যার ফলে তাদের অবশিষ্ট ছিটেফোটা মনোবলটুকুও ভেঙ্গে পড়ে। এসব নীতি অনুসরণ করেই ১৯৩৮ সালে তিনি জার্মানীকে বিশালতর জার্মানীতে পরিণত করেছিলেন।

মহানবী (স) আজ থেকে সাড়ে তের শ' বছর পূর্বে এই প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী এমনভাবে কার্যকর করেন যে, বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে। তিনি প্রথমে কুরায়শদেরকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করেন। তারপর তাদের সহযোগী শক্তিগুলোকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তাদের অবশিষ্ট মর্যাদা ও প্রভাবটুকু খতম করে দেন। এরপর মক্কা বিজয় পাকা ফলের ন্যায় হয়ে রইল যা সামান্য ঝাকুনীতেই বোটা থেকে খসে টস করে কোলের উপর এসে পড়লো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরাইশদেরকে তিনি ধ্বংস করেননি। তাদেরকে তিনি হেয় ও অপমানিত করেননি, বরং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিরেকে সবাইকে তিনি মুক্ত করে দেন। না কারো জীবন ও সম্মানের উপরই তিনি আচঁড় কেটেছেন, না তিনি কারো সম্পদহানি করিয়েছেন! আর এসবই ছিল সংস্কার ও গঠন, ধ্বংস ও প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। তিনি তাদেরকে মক্কার মুহাফিয রাখতে চেয়েছিলেন এবং তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে যদি এমত পরিমাণ অবনমিত করা হতো যে, ইসলামী সমাজ জীবনের উপর বোঝাস্বরূপ হত তাহলে তা রহমতস্বরূপ হবার পরিবর্তে মুসিবতরূপে দেখা দিত। কিন্তু তিনি এমনভাবে কাজ করলেন যে, সাপও মারলেন অথচ লাঠিও ভাঙলো না।

শত্রুকে দুর্বল করিবার তিনটি পদ্ধতি : (ক) বৈষয়িক তথা বস্তুগত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়া; (খ) নৈতিক দিক দিয়ে পরাজিত করা; (গ) সামাজিক দিক দিয়ে পর্যুদস্ত করা। উল্লেখিত তিনটির মধ্যে সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈষয়িক ক্ষতি। এই দুর্বলতাকে হয়তো দুশমন স্বয়ং মওকা পেতেই পূরণ করে নেয় অথবা তার মিত্ররা নিজেদের স্বার্থে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে মিত্র শক্তির সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্রের উপর বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু এর কিছুটা স্বয়ং বৃটিশ পূরণ করে দেয় আর কিছুটা আমেরিকার সাহায্যে পূরণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জার্মানীর আক্রমণে রাশিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়, কিন্তু ১৯৪১ সালে বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যে এই ক্ষতির একটা বিরাট পরিমাণই পূরণ হয়ে যায়। ফলে তারা জার্মানদেরকে রূশ ভূখণ্ডের বাইরে তাড়িয়ে দিতে কামিয়াব হয়।

আর্থিক তথা বৈষয়িক পরাজয়ের মুকাবিলায় নৈতিক পরাজয় কিন্তু অনেক বেশী ভয়াবহ ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। নেপোলিয়ন একে একের মুকাবিলায় তিন গুণ বেশী মারাত্মক বলেছেন।

বস্তুগত ক্ষতি সত্বর অথবা বিলম্বে পূরণ হতে পারে। কিন্তু নৈতিক পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ অসম্ভব ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের কথাই ধরুন না কেন? নৈতিক অবনতির কারণে ফ্রান্স এ বছর অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। কিন্তু কিছু কিছু লোক যাদের ভেতর মিত্র রাষ্ট্রগুলোর কাজ হাসিলের মাধ্যম, উদাহরণত রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি সংগঠন Resistance movement এবং জানবাজ ফৌজ কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্ব পালন করে ফ্রান্সের মরা গাঙে জোয়ার সৃষ্টি করে এবং এভাবে ফ্রান্স বিশ্বের বুক থেকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ ফ্রান্সের নৈতিক পরাজয়ের চিহ্ন পুরোপুরিভাবে ফুটে উঠেনি। অতএব তারা কোন না কোনভাবে বেঁচে ওঠে। কিন্তু মানসিক পরাজয় সবচাইতে ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। কোন জাতির মধ্যে মানসিক পরাজয় আসন গেড়ে বসলে জীবনের আর কোন স্পন্দনই অবশিষ্ট থাকে না।

মহানবী (স) দুশমনকে প্রথমে বদর প্রান্তরে আর্থিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে পরাজিত করেন। তারপর খন্দক যুদ্ধে তিনি তাদেরকে নৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করেন। তারপর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ঘটিয়ে তিনি তাদেরকে একেবারে অসহায় করে তোলেন। এ সন্ধি কাফিরদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার এবং ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাতা এবং মুসলমানদের জানা-বুঝার এবং তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ যাচাই করার মওকা এনে দেয়। ফলে মক্কা বিজয় সহজ হয়ে যায়।...

যোগ্য জেনারেলই আপন ফৌজের ন্যূনতম ক্ষতি করে শত্রুর উপর অধিকতর ও গভীরতর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মক্কা বিজয় বিশ্ব ইতিহাসে সৈনিকসুলভ যোগ্যতার মহত্তম নমুনা, আর মহানবী (স) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও যোগ্যতম সমরনায়ক" (মহানবী (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ৩৪৬-৩৫০)।

বিজয়ের আদর্শ

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে নবী করীম (স)-এর বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হইল বটে, কিন্তু তিনি কোন দেশ বিজয়ী সম্রাটের বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন নাই, বরং আল্লাহর একজন অতি অনুগত ও বিনয়ী বান্দার বেশে সেখানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সওয়ারীর পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় করুণ স্বরে তিনি তিলাওয়াত করিতেছিলেন সূরা আল-ফাত্হ, যাহাতে মহাবিজয়ের, নিরাপদে মক্কা প্রবেশের, (খায়বারে) প্রচুর গনীমত-সম্ভার লাভের, সর্বোপরি পরকালে ঈমানদারদের চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে এবং যাহা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিয়াছিলেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই আজ সেই স্বপ্ন আল্লাহ্ পাক পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করিয়া তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন। তাই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়া ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করিয়া কা'বার প্রতি কোণে প্রতিটি প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া, সেখানে শুকরানা সালাত আদায় করিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুশলী ও বিজয়ী নবী (স) কা'বার দরজা খুলিয়াই যে খুৎবা দিলেন তাহার প্রথম কথাটিই ছিল ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি তাঁহার ওয়াদাকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার বান্দাকে তিনি সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন"।

অন্য কথায়, তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন, এই বিজয়ের কৃতিত্ব তাঁহার নিজের নহে, এই কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি নিজে তাঁহার বান্দা মাত্র, মনিব তাঁহার বান্দার সহিত বিজয়দানের যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আজিকার বিজয় সেই অঙ্গীকার পূরণেরই বহিঃপ্রকাশ। বিজয়ের গৌরব একমাত্র মনিবেরই প্রাপ্য, বান্দার নহে। সুবহানাল্লাহ্! পৃথিবীর কোন বিজয়ী বীর কি বিজয়ের মহাআনন্দের মুহূর্তে এইভাবে আত্মবিলীন করিয়া তাঁহার মনিবের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন ? আত্মনিবেদনের এই মহা-কৃতিত্ব কেবল আল্লাহ্র রাসূল নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এরই প্রাপ্য।

মক্কা বিজয় মহাবিজয়ের দ্বার উন্মোচিত করিল

যুদ্ধের জয়কে যদি জয় বলা হয় তাহা হইলে বিনা যুদ্ধের জয়কে বলিতে হয় মহাবিজয়। সূরা 'আন-নাসর' নাযিল করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয়ের বিজয় স্মৃতিকে অমর করিয়া দিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় সূরাটি নাযিল হয় (দ্র. সহীহ্ বুখারী, ৫/১৮৯, হাদীছ নং ৪২৯৪)।

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ.

"যখন আসিল আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়"।

তাফসীরবিদগণের সকলেই এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, উক্ত সূরার বিজয় বলিতে মক্কা বিজয়ই বুঝান হইয়াছে (দ্র. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১৪৮১)। পরবর্তী আয়াতেই উহার সুফলের কথা বর্ণিত হইয়াছে এইভাবেঃ

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا.

"আর তুমি দেখিতে পাইলে মানুষ আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতেছে দলে দলে।"

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (র) উহার ব্যাখ্যায় লিখেন, "মক্কা মু'আজ্জমা (আল্লাহ্র যমীনে উহা যেন আল্লাহ্র রাজধানী)-এর বিজয় ছিল বড় একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। অধিকাংশ আরব গোত্রের দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ইহার পূর্বে একজন দুইজন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিত, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, এমনকি গোটা আরব উপদ্বীপ ইসলামের কলেমা পড়িয়া নিতে শুরু করিল। এইভাবে নবুওয়াতের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হইল (তাফসীরে উছমানী, উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে, পৃ. ৭৯০)।

উহুদ যুদ্ধ ঃ ঈমানদারগণের অগ্নিপরীক্ষা

দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কুরায়শ বাহিনী আবূ সুফ্য়ানের নেতৃত্বে পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়া তিন হাজার সৈন্য, তিন হাজার উট, দুই শত ঘোড়া ও সাত শত বর্ম সজ্জিত হইয়া মদীনার পথে অগ্রসর হয়। বদর যুদ্ধকালে আবূ সুফ্য়ানের নেতৃত্বাধীন যে বাণিজ্য কাফেলাটি সাগর পাড়ের পথ ধরিয়া নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিতে সমর্থ হইয়ছিল এই কাফেলার অর্জিত সমুদয় অর্থ এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সর্বসম্মতিক্রমে কুরায়শরা ব্যয় করে। ঐ সম্পদের মধ্যে ছিল এক হাজার উট ও নগদ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। যুদ্ধ উন্মাদনা বৃদ্ধির সহায়করূপে কয়েকজন কবি ও ১৫জন নারীকেও সাথে লওয়া হইল। দুই হাজার হাবশী সৈন্যও ভাড়া করিয়া লওয়া হইল। আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ.

"যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা তাহাদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে যাহাতে আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে; তারপর উহা তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে এবং তারপর তাহারা পরাস্ত হইবে" (৮ ঃ ৩৬)।

মাওলানা আকরম খাঁ কুরায়শদের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত উদ্ধৃত করার পর ইহার পর্যালোচনা করিয়া বলেন, "প্রথম পদে বলা হইতেছে যে, তাহারা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করার আয়োজন করিতেছে, আল্লাহর পথ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে প্রতিহত করাই তাহাদিগের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পদে বলা হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহারা ঐরূপ কার্যে কথিতরূপ ধণসম্পদ ব্যয় করিবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শেষোক্ত পদে বর্ণিত ভাবী ঘটনাটি সংঘটিত হইবার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই মক্কাবাসিগণ নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া মুসলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এইরূপে নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া কোরেশগণ যুদ্ধে মুসলমানদিগকে ধ্বংসের আয়োজন করিতেছিল বলিয়াই পূর্বোক্ত আয়াতে মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, আবূ সুফিয়ান-এর উদ্দেশ্যে অস্ত্র-রসদাদি ও রণসম্ভার খরিদ করার উদ্দেশেই মক্কার সমস্ত ধন-সম্পদ লইয়া সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল। তাহার এই যাত্রা প্রকৃতপক্ষে সমর অভিযান, বাণিজ্যের কথা একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র" (মোস্তফা চরিত, পৃ. ৫৯৪-৫৯৫)।

মক্কায় অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আব্বাস (রা), যিনি তখনও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন নাই, কুরায়শদের প্রতিশোধস্পৃহা ও রণপ্রস্তুতি এবং তাহাদের যুদ্ধযাত্রা

পর্যবেক্ষণ করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ইহার বিবরণ সম্বলিত একটি পত্রসহ একজন দ্রুতগতি-সম্পন্ন দূতকে মদীনায় পাঠাইয়া আল্লাহর রাসূল (স)-কে তাহা অবহিত করিলেন।

প্রতিশোধকামী দুর্ধর্ষ ও সুসজ্জিত কুরায়শ বাহিনীর আগমন সংবাদে মদীনায়ও জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইল। লোকজন দিবারাত্রি অস্ত্রসহ কালযাপন করিতে লাগিল। এমনকি সালাতের সময়ও সাহাবীগণ সশস্ত্র অবস্থায় থাকিতেন। সা'দ ইব্ন উবাদা, সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) প্রমুখ সাহাবী সশস্ত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজায় প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতেন।

মক্কার কুরায়শ বাহিনী আবওয়া ও ওয়াদী আকীক হইয়া মদীনার উত্তর প্রান্তে ওয়াদী কানাতের নিকটবর্তী আয়নায়ন নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করিল। ঐ দিনটি ছিল ৬ শাওয়াল, শুক্রবার।

মজলিসে শূরা

কেবল সামরিক বিষয়ই নহে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম স্বীকৃত নীতি হইতেছে মুশাওরা বা পরামর্শ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ—

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"এবং কাজেকর্মে তুমি তাহাদের সহিত পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে। যাহারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৫৯)।

যেইসব ব্যাপারে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই, সেইসব ব্যাপারেই উক্ত আয়াতে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তাই রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অনেক সময় সাহাবীগণের পরামর্শ আহবান করিতেন। উহুদ যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালেও তিনি পরামর্শ আহবান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিগতভাবে মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়াই আক্রমণ মুকাবিলার পক্ষে ছিলেন। ঘটনাচক্রে মুনাফিক সর্দার ইব্ন উবায়্যিও এই মতের পক্ষে স্বীয় মত প্রকাশ করে । কিন্তু বদর যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, বিশেষত সেইসব তরুণ বয়সী যোদ্ধা মদীনা হইতে বাহির হইয়া বীরত্ব প্রদর্শনের পক্ষে ছিলেন। তাহারা মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া মুকাবিলা করাকে অনেকটা কাপুরুষোচিত বলিয়া ধারণা করিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) শহর হইতে বাহির হইয়াই যুদ্ধ মুকাবিলার পক্ষে মত দিলেন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেনঃ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কোন নবীর জন্য তাহা ত্যাগ করা বৈধ নহে। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধের সময়ও নবী করীম (স) আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের সুস্পষ্ট মতামত নিয়াছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা, বাহিনী পর্যবেক্ষণ, অল্প বয়স্কগণকে ফেরত পাঠানো

তৃতীয় হিজরীর ১১ শাওয়াল জুমু'আর দিন আসরের নামাযান্তে এক হাজার যোদ্ধাসহ রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। দুইটি বর্ম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। সা'দ ইব্ন মু'আয ও সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা) বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁহার অগ্রে, অবশিষ্ট সহযোদ্ধাগণ তাঁহার ডাইনে ও বামে কাতারবন্দী অবস্থায় অগ্রসর হইতেছিলেন। মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শায়খায়ন টিলার নিকট উপনীত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বাহিনী পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং অল্পবয়স্ক যে সমস্ত বালক অতি উৎসাহে যুদ্ধের জন্য বাহিনীতে শামিল হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের সংখ্যা ছিল সতের (১৭)। রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) এবং তাঁহার সমবয়স্ক সামুরা ইব্ন জুনদুব ব্যতিক্রমী শক্তি-সাহস ও তীর বর্ষণে দক্ষতার জন্য স্বল্পবয়সী হইলেও বাহিনীতে থাকার অনুমতি লাভ করিলেন (দ্র. তাবারী, ৩খ., পৃ. ১২; সীরাতুর রাসূল, ২খ., পৃ. ১৯২)।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অল্পবয়স্ক বালকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া এবং শত্রুর সম্মুখে লইয়া গিয়া বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং ব্যতিক্রমধর্মী সাহস ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা হইত।

মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন

উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী হইতেই মুনাফিকসর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি তাহার তিন শত অনুগামীসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এই বলিয়া চলিয়া আসিল, তিনি তো আমার কথা শুনিলেন না, শুনিলেন উহাদের কথা (أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِيْ) (দ্র. সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৮-১২)। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমে তাহাদের ঐ মুনাফিকীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবেঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ.

"যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্‌র হুকুমে। ইহা মুমিনদিগকে জানিবার জন্য এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, আইস! তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা যদি যুদ্ধ জানিতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের

অনুসরণ করিতাম। সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে বলে। তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত" (৩ ঃ ১৬৬-৭)।

মুনাফিকদের চলিয়া যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত রহিলেন সাত শত জন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ১৫জন তরুণও বাদ পড়িল। মাত্র ১০০ জন বর্ম পরিহিত এবং গোটা বাহিনীতে কেবল দুই জন অশ্বারোহী ছিলেন, একজন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) এবং অপরজন হযরত আবূ বুরদা ইব্ন নায়ার হারিছী (রা) (দ্র. তাবারী, ৩খ., পৃ. ১২)।

মুনাফিকদের কাটিয়া পড়ায় খায্রাজ গোত্রের বানূ সালামা শাখার মুসলিম যোদ্ধাগণ এবং আওস গোত্রের বানূ হারিছা শাখার যোদ্ধাগণ প্রভাবান্বিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহই তাহাদিগকে রক্ষা করেন (দ্র. ৬ ঃ ১২২; সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭/৩৫৮, ৮/৩২৫; সহীহ মুসলিম, ২/৪০২; ইবন হিশাম, সীরাহ, ৩/৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সৈন্যবিন্যাস

উহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হওয়ার পূর্বে শায়খায়নে থাকিতেই সূর্য অস্ত গেল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে সালাত সম্পন্ন হইল। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) সারা রাত প্রহরায় নিযুক্ত রহিলেন। শেষ রাত্রিতে আবার সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হইল। উহুদের নিকটবর্তী হইলে ফজরের ওয়াক্ত হইল। সালাতশেষে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যাস করিলেন যে, উহুদ পাহাড় মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে এবং মদীনা শহর তাহাদের সম্মুখে রহিল। আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে তিনি উহুদ পাহাড়ের সম্মুখস্থ আয়নায়ন পাহাড়ের শীর্ষদেশে এই উদ্দেশ্যে মোতায়েন করিলেন, যাহাতে মুশরিক বাহিনীর সম্ভাব্য পশ্চাত দিকের আক্রমণ হইতে মুসলিম বাহিনী নিরাপদ থাকিতে পারে। তিনি তাহাদিগকে তাগিদ দিলেন যেন মুসলিম বাহিনীর চরম বিজয় বা চরম পরাজয়েও তাহারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই ব্যাপারে তিনি জোর তাগিদ দিয়া এই পর্যন্ত বলিয়াছিলেনঃ

ان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا مكانكم.

"যদি তোমরা দেখিতে পাও যে, পাখী আমাদিগকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা হইলেও তোমরা স্থান ত্যাগ করিবে না। যদি দেখিতে পাও যে, আমরা তাহাদিগকে পরাজিত ও দলিত-মথিত করিয়া ফেলিতেছে তবুও তোমরা স্থান ত্যাগ করিবে না" (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩০৩৯; ফাতহুল বারী, ৭/৩৫৭, ৮/৩২৫; ইব্ন হিশাম, সীরা, ৩/৬৭; ইব্ন সা'দ, ২/৩৯-৪০; হাকেম, ২/২৯৬)।

যুদ্ধের পতাকা মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে অর্পণ করা হয়। যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) দক্ষিণ বাহিনীর এবং মুনযির ইব্‌ন উমার (রা) বাম বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। নবী করীম (স)-এর তরবারি লাভ করিয়া আবূ দুজানা (রা) তাহার হক আদায় করেন (দ্র. আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১০৪)। যুদ্ধের শুরুতেই মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইব্‌ন উছমান এবং তাহাদের অপর বীরপুরুষ সাবা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার চ্যালেঞ্জের জবাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া হযরত আলী (রা) ও হযরত হামযা (রা) তাহাদের উভয়কে হত্যা করিয়া তাঁহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেন (দ্র. তাবারী, তাফসীর, ৭/২৮১)। মুসআব ইব্‌ন উমায়র, আবূ দুজানা, আবূ তাল্‌হা, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা) প্রমুখ সাহবীও অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন (দ্র. বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭/৩৬৭; মুসলিম, ২/২৮৪; আহমাদ, ২১/৬০৫৯)।

হযরত হামযা ও মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া শাহাদাত বরণ করিলেও যুদ্ধের ফলাফল ছিল মুসলমানদের অনুকূলে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ.

"আল্লাহ তোমাদের সহিত কৃত তাঁহার অঙ্গীকার পূরণ করিলেন যখন তোমরা তাঁহার নির্দেশে মুশরিকদিগকে হত্যা করিতেছিলে" (৩ ঃ ১৫২)।

অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, কাফির বাহিনী উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে এবং মুসলিম বাহিনীর এখন গনীমত লাভের পালা। তখন পাহাড় শীর্ষে প্রহরায় নিযুক্ত 'আবদুল্লাহ ইবুযন যুবায়রের নেতৃত্বাধীন সেই পঞ্চাশজনের বাহিনীটি তাহাদের নেতার বারবার বারণ করা সত্ত্বেও গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করিল (দ্র. বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬/১৬২)।

মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। কুরায়শদের ডান বাহিনীর সুচতুর ও সুযোগ সন্ধানী সেনাপতি খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন। তিনি 'আয়নায়ন পাহাড়ের পশ্চাৎদিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পিছন দিক হইতে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন। পরাজিতপ্রায় কাফির বাহিনী আবার রুখিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহারা মুসলিম বাহিনীকে তাহাদের পূর্ণ অবস্থানস্থল হইতে সরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে মুসলিম বিজয় পরাজয়ের রূপ পরিগ্রহ করিল। মুসলমানরা এলোমেলোভাবে লড়িতে লড়িতে শহীদ হইতে লাগিলেন, শত্রু-মিত্র কিছুই চিহ্নিত করিতে পারিতেছিলেন না। হুযায়ফা (রা)-এর পিতা বৃদ্ধ ইয়ামান হুযায়ফার মুখে তাঁহার পিতৃপরিচয় ব্যক্ত করা সত্ত্বেও মুসলমানদের হাতেই নিহত হইলেন (দ্র. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩/২০২; আহমাদ, মুসনাদ, ৪/২৬০৯)।

মুসলমান যোদ্ধারা নবী করীম (স) হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেই তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল (দ্র. ইব্‌ন হিশাম, সীরাহ, আরবী, ৩/৩৩; আত-তাবারী, তাফসীর, ৭/৩৬৫; ফাতহুল

বারী ৭/৩৬১, বুখারীর এক বর্ণনার ভিত্তিতে)। নবী করীম (স) নিহত হইয়াছেন বলিয়া গুযব ছড়াইয়া পড়িল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। অনেকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন। মহানবীর অনুপস্থিতিতে জীবন রক্ষাই অনেকে নিরর্থক মনে করিলেন। এই গুজবের কারণেই মুসলিম যোদ্ধাদের কিছু সংখ্যক রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন (দ্র. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, ১/৪৮৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে নিহত হন নাই, বাঁচিয়া আছেন, তাহা সর্বপ্রথম কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি এই সুসংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে থাকেন। মুশরিকরা তাহা শুনিলে ক্ষতির কারণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় নবী করীম (স) তাঁহাকে কণ্ঠস্বর নিচু করিতে বলেন (হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩/২০১)।

সাতজন আনসারসহ নয়জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। মুশরিকরা তখন মরিয়া হইয়া তাহার উপর আক্রমণ চালাইতেছিল। তাহাদের প্রবল আক্রমণে একে একে সাতজন আনসারই শহীদ হইলেন। আবূ তাল্‌হা যুদ্ধ করিতে করিতে একটি তীরের আঘাতে তাঁহার হাতও অবশ হইয়া গেল। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বীরত্বের সহিত শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ততক্ষণে নবী করীম (স) আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। তাঁহার পবিত্র দাঁত শহীদ হইল। তাঁহার দুই হাঁটু ও মুখমণ্ডলে আঘাত লাগিয়া রক্তাক্ত হইল। ইব্‌ন কামিয়া নামক দুর্বৃত্তের প্রস্তরাঘাতে তিনি কাৎ হইয়া আবূ আমের ফাসিক কর্তৃক খননকৃত গর্তে পড়িয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। হযরত আলী ও তাল্‌হা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে গর্ত হইতে উঠাইলেন। ইব্‌ন কামিয়ার তলোয়ারের আঘাতে শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া তাঁহার কপালের দুই পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া কপালের গভীরে ঢুকিয়া গিয়াছিল। আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) দাঁত দ্বারা উহা সজোরে টান দিয়া খুলিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিজের দুইটি দাঁত তাহাতে উপড়াইয়া গেল।

মুসলমানরা মহানবী (স)-এর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ শুরু করিতেই কাফির বাহিনী আর মাঠে থাকা সমীচীন মনে করিল না। ৭০ জন মুসলমান বীর ইতোমধ্যে শাহাদাত লাভ করিয়াছেন, ইহাতে উল্লসিত হইয়া তাহারা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। আবূ সুফ্‌য়ানের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বাক্‌র ও উমার সকলেই শহীদ হইয়াছেন। সে চীৎকার করিয়া প্রত্যেকের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া জবাব পাইতেছিল না। অবশেষে হযরত উমার (রা) জবাব দিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গাইলেন। সে যাইতে যাইতে বলিল, ইহা বদরের প্রতিশোধ, আগামী বৎসর বদরে আবার দেখা হইবে। এই যুদ্ধে তাহাদের বাইশজন নিহত হয়।

এই যুদ্ধে প্রকৃত মুসলমান ও মুনাফিকদের স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। নেতৃ-আদেশ লঙ্ঘন যে বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করিয়া সমূহ বিপদের কারণ হইতে পারে, সেই শিক্ষাটিই মুসলিম উম্মাহ এই যুদ্ধ হইতে লাভ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ ও নির্দেশ দানে যে মহানবী (স) কত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন , তাহাও এই যুদ্ধের ব্যূহ রচনা ও নির্দেশ দান

হইতে জানা যায় (দ্র. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস্-সাহীহা, নাদরাতুন নাঈম, ১খ.; আসাহ্হুস সিয়ার, সাইয়েদুল মুরসালীন, উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)।

খন্দকের যুদ্ধ ঃ প্রতিরক্ষা কৌশলে নূতন মাত্রা

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সংবাদে খায়বারে নির্বাসিত প্রতিশোধকামী ইয়াহূদীরা খুবই উল্লসিত হইল। আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে আবার মুসলমানদের সহিত মুকাবিলা হইবে বলিয়া কুরায়শ সর্দার আবূ সুফ্য়ান হুমকি দিয়া গিয়াছে শুনিতে পাইয়া উক্ত ইয়াহূদীদের স্বপ্নের ডানা মেলিতে শুরু করিল। তাহারা ভাবিল, মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। কুরায়শ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি সাথে থাকিলে উহাদিগকে চিরতরে উৎখাত করিতে আর সময় লাগিবে না। সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকায়ক, সাল্লাম ইব্ন মিশকাম, হুয়াই ইব্ন আখতাব, কিনানা ইব্নুর রবী' প্রমুখ ইয়াহূদী সর্দার বানূ ওয়াইলের হাওয়া ইব্ন কায়স ও আবূ উমায়্যাসহ কয়েকজন সর্দার সমভিব্যাহারে সদলবলে মক্কায় গিয়া মুসলমানদিগকে নির্মূল করিবার জন্য কুরায়শদের সাহায্য কামনা করিল। এই কথা শুনিয়া কুরায়শরা তাহাদিগকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিল। শুধু আশ্বাসই নহে, কা'বার গিলাফ ধরিয়া বিভিন্ন গোত্রের ৫০ জন কুরায়শ নেতা তাহাদিগকে সহযোগিতার পাকা প্রতিশ্রুতিও দিল। ইয়াহূদী সর্দাররা হাজার হউক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল না, কিন্তু তাহাদের নীচতা এতদূর পর্যন্ত গড়াইল যে, কুরায়শদের মনোরঞ্জনের জন্য 'তাহাদের ধর্ম উত্তম নাকি মুহাম্মাদের ধর্ম' এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা কুরায়শদের পৌত্তলিকতাই বরং উত্তম বলিয়া জবাব দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিল না। এমনকি কুরায়শদিগের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহারা আত্মসম্মানবোধ ও ধর্ম বিসর্জন দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নত হইয়া তাহাদের বিগ্রহকুলকে সিজদা করিল (সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৬৩৬)। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫১তম আয়াতে তাহাদের ঐ নীচতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

আসাদ গোত্রের সহিত নাজদের গাতাফানীদের মিত্রতা ছিল। তাই ঐ ইয়াহূদী সর্দারগণ মক্কা হইতে নাজদে গমন করিয়া প্রতি বৎসর খায়বারে উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক তাহাদিগকে প্রদানের শর্তে একটি মুসলিম বিরোধী সমরচুক্তি করে। কুরায়শরাও সুলায়ম, কিনানা ও তিহামাসহ অন্যান্য গোত্রগুলিকে সংগঠিত করিতে সক্ষম হয় (বায়হাকী, ৩/৪৪৩; ফাতহুল বারী, ৭/৩৯৩; ইব্ন হিশাম, ২/২১৯-২২০; নাদরাতুন নাঈম, ১খ., পৃ. ৪৫৫, বাংলা অনু.)।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধকে আহ্যাব যুদ্ধ নামকরণ

সমগ্র আরবের পৌত্তলিক ও ইয়াহূদী শক্তির সমবেত সমর প্রচেষ্টা যেহেতু মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এইজন্য ইহাকে আহ্যাব যুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। আহ্যাব হইতেছে আরবী হিয্ব শব্দের বহুবচন। হিয্ব অর্থ দল। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের অনেক দল-উপদল যুদ্ধযাত্রা ও মদীনা অবরোধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। খন্দক (পরিখা) খননের মাধ্যমে সম্মিলিত কাফির বাহিনীকে প্রতিরোধ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ।

কুরায়শ ও তাহাদের মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদ পাইয়া নবী করীম (স) তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যাপারে সাহাবীগণের পরামর্শ আহবান করিলেন। উহুদের মত এইবারও শহর হইতে বাহির হইয়া শত্রুর মুকাবিলা করা হইবে, নাকি শহরের অভ্যন্তর হইতেই প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা হইবে সেই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। পারস্য দেশীয় অভিজ্ঞ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শক্রমে অশ্বারোহী শত্রুদের কবল হইতে মদীনাবাসীকে রক্ষার জন্য খন্দক বা পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হইল। পারস্য দেশীয় এই প্রতিরক্ষা কৌশলকেই সমীচীন মনে করা হইল।

এইভাবে পরিখা খননের মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা আরবের জন্য সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। তিন দিক হইতেই পাহাড় ও ঘন খর্জুরবীথি দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত মদীনার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত বিধায় সেই দিকেই সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) পাথুরে জমি খনন করিয়া পরিখা নির্মাণের এই সুকঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজটি বিভিন্ন কবীলার মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। প্রতি দশজন যোদ্ধাকে দশ গজ পরিখা খননের দায়িত্ব দেওয়া হইল (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৫)।

নবী করীম (স) স্বয়ং সেই কঠিন দৈহিক শ্রমের কাজে অংশগ্রহণ করিলেন। পনের ফুট প্রস্থ ও পনের ফুট গভীর এই অর্ধ-বৃত্তাকার পরিখা সাল'আ পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তের সহিত সংযুক্ত ছিল। মাঝে কয়েকটি পাহাড় ও ক্ষুদ্র পাহাড়ী পথ পড়ে, যেই সকল গিরিপথ দিয়া কোনমতে একটি উট অতিক্রম করিতে পারিত। সেই সকল গিরিপথে কড়া প্রহরা নিযুক্ত করা হইল। তীব্র শীত ও প্রবল খাদ্যাভাবের মধ্যে নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ দীর্ঘ কুড়ি দিনে ঐ পরিখাটি খনন করিয়া শত্রুদের মদীনায় প্রবেশের স্বপ্নসাধ ধুলায় মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

আবূ সুফয়ানের নেতৃত্বাধীন কাফির বাহিনী মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া এই অভিনব প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া যায়। তাহারা এই আশায় মদীনা অবরোধ করিয়া বসে যে, অবরোধ অবস্থায় বাধ্য হইয়া মদীনাবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিবে। আসলেও মদীনায় ঐ বৎসর তীব্র আকাল চলিতেছিল। অবরোধের ফলে সেই আকাল আরও বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধার জ্বালায় সাহাবীগণ পেটে পাথর বাঁধিয়া নবী করীম (স)-কে দেখাইলে তিনি তাঁহার নিজের পেটে দুই দুইটি পাথর বাঁধা দেখাইলেন।

দীর্ঘ সাতাইশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। নবী করীম (স) মুসলমান নারী ও শিশুদিগকে সুরক্ষিত দুর্গসমূহে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাফির বাহিনীর এক একজন সেনাপতি এক একদিকে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। ৩০০০ মুসলমান যোদ্ধা পালাক্রমে বিভিন্ন ছোট ছোট প্লাটুনে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রহরা ও প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। কাফির বাহিনীর পরিখা অতিক্রম করিয়া মদীনায় প্রবেশের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কোনক্রমেই তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। একদিন তাহারা সমবেতভাবে পরিখা অতিক্রম করিয়া মদীনায় প্রবেশের চেষ্টা

চালায় এবং এক স্থানে পরিখার প্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় সেই দিক দিয়া আমর ইব্ন আবদুদ, দিরার, জুবায়রা ও নাওফাল নামক কয়েকজন দক্ষ সেনাপতি পরিখা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

সর্বপ্রথম আমর ইব্ন আবদুদ মুসলমানদিগকে মল্লযুদ্ধের আহবান জানাইলে হযরত আলী (রা) বীর দর্পে অগ্রসর হইলেন এবং তরবারির একটিমাত্র আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। তাঁহার যুলফাকার নামক তরবারি বিদ্যুতের মত ঝলসিত হইতেছে দেখিয়া দিরার ও জুবায়রা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু হতভাগা নাওফাল পলায়ন করিতে গিয়া পরিখার মধ্যে পড়িয়া গেল। সেইখানেই তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার যুদ্ধসাধ মিটাইয়া দেওয়া হইল। সারা দিন ব্যাপী তীব্র যুদ্ধ অব্যাহত রহিল। উভয় দিক হইতে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ অব্যাহত গতিতে চলিল। ঐদিন যুদ্ধের তীব্রতার দরুন রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক ওয়াক্ত (আসর) নামায কাযা হইয়া যায় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)। তবে মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনামতে চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৪৬)।

বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা বাহ্যত মুসলমানদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিল। কিন্তু মদীনা নগরী যখন অবরুদ্ধ এবং যুথবদ্ধ শত্রু বাহিনীর দাপটে গোটা মদীনা কম্পমান, ঠিক ঐ দুর্দিনেই তাহারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রথমে চুক্তিভঙ্গের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের নেতা কা'ব ইব্ন আসাদ হুয়াই ইব্ন আখতাবের প্ররোচনায় চুক্তি ভঙ্গ করিল এবং চুক্তিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

যুদ্ধের গোপনীয়তা রক্ষা

বানূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ সর্বপ্রথম হযরত উমার ফারূক (রা)-এর কর্ণগোচর হয়। কিন্তু এইরূপ দুঃসংবাদে সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ (স) উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন এবং উহার সত্যতা যাচাই করার জন্য সা'দ ইব্ন মু'আয ও সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় করার সময় তিনি বলিয়া দিলেন, খবর যদি সত্য হয় তবে অবোধ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবে, যাহাতে সাধারণ সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া না পড়ে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া উচ্চারণ করিলেন, 'আদাল ও কারা'। মানে ইতোমধ্যে ঐ নামের দুইটি গোত্র যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীরাও তাহাদের পথই ধরিয়াছে (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাহ, ২খ., পৃ. ১৪০; যুরকানী, ১২খ., পৃ. ১১১)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হইলেন বটে কিন্তু তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া শত্রুবাহিনীতে সদ্য যোগদানকারী বানূ কুরায়যাকে ভয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। বানূ হারিছার দুর্গে অবস্থানরত মুসলিম মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়স্থল এইবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ সালামার নেতৃত্বে ২০০ জন এবং যায়দ ইব্ন হারিছার নেতৃত্বে আরও ৩০০ জনকে মদীনার অভ্যন্তরভাগ প্রহরার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মোটকথা, মুসলমানদের সংকট ও উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছিল (সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৬৫০-৬৫১)।

যুদ্ধ কৌশলমাত্র

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, الحرب خدعة। "যুদ্ধ কৌশলমাত্র"। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্ত করা দূষণীয় নহে (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ২৮০৪-২৮০৫)। খন্দকের প্রায় এক মাসব্যাপী প্রাণান্তকর অবরোধ ও মুসলমানদের বিব্রতকর অবস্থার অবসানকল্পে একটি কূটনৈতিক কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়।

নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমের নামক গাতাফান গোত্রের এক ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁহাকে অবগত করিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইসলাম গ্রহণের কথা কিন্তু কাফিররা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। এখন আপনি আমাকে যেই নির্দেশ দিবেন আমি তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিব না। মহানবী (স) বলিলেন, তুমি তো একজন মাত্র ব্যক্তি (দলবল লইয়া সাহায্য করা তো আর তোমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব পরিস্থিতির চাহিদামত তুমি যাহা সমীচীন মনে কর তাহাই কর।

সেই মতে ন'আয়ম ইব্ন মাসউদ বাহির হইয়া পড়িলেন। সর্বপ্রথম তিনি বানূ কুরায়যা গোত্রের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীতে যোগদান করিয়াছ বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম কী হইতে পারে তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? কুরায়শ আর গাতাফানীদের কী! যুদ্ধে জয় হইলে তো ভাল কথা, নতুবা তাহারা তাহাদের পথে চলিয়া যাইবে। তারপর মুহাম্মাদ ও তাহার অনুসারীদের রোষানল পড়িবে তোমাদের উপর। কুরায়শ ও গাতাফানীরা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র তাঁহাদের দেশে রাখিয়া আসিয়াছে। তোমাদের অবস্থা কিন্তু তাহা নহে। মদীনা তোমাদের শহর; স্ত্রী পুত্র-পরিজন লইয়া তোমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? ইহা ছাড়া বানূ কায়নুকা ও বানূ নাযীরের পরিণাম তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। তবুও নির্বাসনে যাওয়াকালে তাহারা তো অস্থাবর ধন-সম্পদ সাথে লইয়া যাইতে পারিয়াছে যদি কুরায়শ ও গাতাফানীরা সত্য সত্য রণেভঙ্গ দিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তোমাদের উপায়টা কী হইবে? তাহারা বলিল, তওবাহ্! এখন উপায়?

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া নুআয়ম বলিলেন, উপায় একটা আছে বৈ কি! তবে ব্যাপারটা তোমাদিগকে গোপন রাখিতে হইবে। তাহারা গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিলে তিনি বলিলেন, তোমরা কুরায়শদের কয়েকজনকে যুচলেকাস্বরূপ না রাখিয়া যুদ্ধে যোগ দিবে না। বানূ কুরায়যার লোকজন উহার প্রতি সমর্থন জানাইয়া বলিল, কী একটা উপযুক্ত পরামর্শ না আপনি আমাদিগকে দিয়াছেন! নু'আয়ম (রা) উপলব্ধি করিলেন যে, তাহার প্রথম তীরটি লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এবার তিনি কুরায়শদের তাঁবুতে গিয়া বলিলেন, আপনাদের সহিত আমার দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন। তাহারা একবাক্যে বলিল, কেন নয়?

আপনি তো আমাদের অনেক পুরাতন বন্ধু। তিনি বলিলেন, সেইজন্য তো আপনাদের কাছে আসিয়াছি। ইয়াহূদীরা কিন্তু মুহাম্মাদের সহিত চুক্তিভঙ্গের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত । এখন আপনাদের কিছু লোককে মুচলেকাস্বরূপ নিজেদের কাছে রাখিয়া উহাদিগকে তাহারা মুহাম্মাদের হাতে তুলিয়া দিবার মতলব আঁটিতেছে। তাহারা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আপনারা কোনক্রমে তাহাদের হাতে আপনাদের কোন লোককে মুচলেকাস্বরূপ দিতে রাজী হইবেন না। তারপর তিনি গাতাফান গোত্রের কাছে গিয়া বলিলেন, তোমরা তো আমার স্বগোত্রীয় ও আত্মীয়-স্বজন। একটি গোপন কথা বলিতেছি, গোপন রাখিও। এই কথা বলিয়া তিনি কুরায়শদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। এইভাবে সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষের মধ্যে মহা অবিশ্বাস ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইল।

তারপর আবূ সুফ্য়ান যখন যুদ্ধ শেষ করার জন্য মুসলিম বাহিনীর উপর একযোগে চরম আঘাত হানিবার জন্য বানূ কুরায়যাকে প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন তখন তাহারা কুরায়যা কতিপয় লোককে মুচলেকাস্বরূপ তাহাদের কাছে না রাখিলে এত বড় ঝুঁকি গ্রহণে তাহাদের অপারগতার কথা জানাইয়া দিল। নুআয়মের সতর্কবাণীর সত্যতা কুরায়শ পক্ষ প্রত্যক্ষ করিল। কুরায়শ পক্ষ যখন তাহাদের একজনকেও মুচলেকাস্বরূপ রাখিতে রাজী হইল না, তখন বানূ কুরায়যা গোত্রেরও তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। এইভাবে নুআয়ম (রা)-এর কূটনৈতিক কৌশলের ফলে সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল এবং তাহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ., পৃ. ২২১-২২২, ইফাবা)।

এদিকে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পূর্বদিক হইতে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হইয়া অবরোধকারী বাহিনীর সবকিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। উনুনস্থ বৃহদাকার ডেগ ও কড়াই উল্টাইয়া অগ্নি নির্বাপিত হইয়া এবং তাঁবুসমূহের রজ্জু ছিড়িয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া রাত্রির ঘন অন্ধকারে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। তাহাদের মালামাল দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হইল। অশ্বগুলি বাঁধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। লোকজন বালুরাশির নীচে চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। তাহাদের চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইল। চতুর্দিকে বজ্র গর্জনের শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল। বায়ু প্রবাহের সহিত আসমানী ফেরেশতাকুল নামিয়া আসিয়া অস্ত্রের ঝনঝনানীতেও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে শত্রুদলের অন্তরে ভীতি ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিলেন। সেনাপতি আবূ সুফ্য়ান বলিল, অশ্বগুলি হালাক হইয়া গেল। বানূ কুরায়যা বিশ্বাসঘাতকতা করিল। প্রবল বাতাস আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া ফেলিল। কুরায়শ বাহিনী! আর এখানে নয়, এবার দেশে ফিরিয়া চল। মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহর এই মহা অনুগ্রহের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা" (৩৩ : ৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই প্রসঙ্গে বলেনঃ "আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি প্রাচ্য-বাত্যায় এবং কওমে আদ হালাক হইয়াছে প্রতীচ্য বাত্যায়"। সেদিন ফেরেশতা বাহিনীসমূহ প্রেরিত হইয়াছিল শত্রুদের মনে ভয়-ভীতি সৃষ্টির জন্য, যুদ্ধের জন্য নহে। ইহাতে নিশ্চয়ই আল্লাহর হিকমত রহিয়াছে। কেননা পরবর্তী কালে আবূ সুফ্য়ান ও ইকরামাসহ তাহাদের অনেকেই মহানবী (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া দীনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

গুপ্তচর বৃত্তি প্রতিরক্ষার অন্যতম উপাদান

যে কোন যুদ্ধে গুপ্তচরদের বিরাট ভূমিকা থাকে। গুপ্তচরদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্যতম। এই গুরুদায়িত্বে প্রেরণ কালে হুযায়ফা (রা)-কে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁহার নিজের সাহচর্যের ওয়াদা দিয়াছিলেন (মুসলিম, ৩/১৪১৪)।

ঝড়ের দাপটে, শীতের তীব্রতায়, ফেরেশতাগণের অস্ত্রের ঝনঝনানী ও তাকবীর ধ্বনিতে ভগ্নহৃদয় কুরায়শ বাহিনী যখন দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র, আবূ সুফ্য়ান যখন তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাহার বিপর্যস্ত বাহিনীকে ফেরত চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিতেছিলেন তখন তিনি বলিতেছিলেন, কুরায়শ সেনাগণ! নিজ নিজ পার্শ্বের লোকগুলিকে চিনিয়া লও এবং গুপ্তচর হইতে সাবধান থাক! রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যুৎপন্নমতি গুপ্তচর সাহাবী হুযায়ফা (রা) তখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সাথে সাথে তাহার ডান পার্শ্বস্থ লোকটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে হে! উত্তর আসিল, মু'আবিয়া। বাম পার্শ্বস্থ লোকটির হাত ধরিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই উত্তর আসিল, আমর ইবনুল 'আস। মধ্যবর্তী এই লোকটি যে তাহাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর উহা কেহ ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারিল না।

তারপর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল আসকে পরিখা মুখে ২০০ অশ্বারোহীসহ পাহারায় রাখিয়া কুরায়শদের বীরপুরুষগণ স্বদেশের পথে রওয়ানা হইল। তাহাদের আশঙ্কা ছিল পৃষ্ঠ প্রদর্শনরত পর্যুদস্ত কুরায়শ বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হইতে পারে। ফেরেশতা বাহিনী হামরাউল আসাদ পর্যন্ত কুরায়শ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আসেন। কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পাইয়া গাতাফানী বাহিনীও রওয়ানা হইয়া গেল এবং অবরোধ পরিহার করিয়া বানূ কুরায়যা দুর্গে গিয়া প্রবেশ করিল। সমগ্র আরবের যুদ্ধ বাহিনীর এইভাবে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি

আল-কুরআনে অনাগত কালের লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া রহিল! আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا.

"আল্লাহ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী" (৩৩ ঃ ২৫)।

যুদ্ধকৌশল হিসাবে সমর সঙ্গীত বা উদ্দীপনামূলক কবিতা পাঠ

যুদ্ধকালে সমর সঙ্গীত বা উদ্দীপনামূলক কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আপন বাহিনীকে চাঙ্গা করিয়া তোলার প্রয়াসও এই যুদ্ধে লক্ষণীয়। পরিখা খননের কঠিন কাজে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স) দৈহিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। কোদাল চালনা করিতে, মাটি বহন ইত্যাদি কাজে তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার নূরানী বদন ধুলি ধুসরিত হয় সমস্ত দেহ ধূলা-বালিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায় (দ্র. সহীহ বুখারী, ৫/৪৭; সহীহ মুসলিম, ৩/১৪৩০; ফাতহুল বারী, ৭/৩৯৫)। কঠিন শিলা ভাঙ্গিতে গিয়া তিনি সোৎসাহে গাহিয়া উঠিলেন ঃ

اللهم لو لا انت ما اهتدينا   ولا تصدقنا ولا صلينا
فانزلن سكينة علينا   وثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاولى قد بغوا علينا   وان ارادوا فتنة ابينا

"হে আল্লাহ ! তুমি না থাকিলে পথের দিশা পেতাম না, না করিতাম সাদ্কা-যাকাত, না পড়িতাম তোমার সালাত। নাযিল কর মোদের প্রতি তোমার সাকীনা (শান্তি), তওফীক দাও যুদ্ধে যেন আমরা ভাগি না। মুশরিকরা মোদের প্রতি করছে বাড়াবাড়ি, তারা যদিও অশান্তি চায় আমরা না চাহি" (দ্র. সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৯, হাদীছ নং ২৮০৮; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১২, হাদীছ নং ৪৫১৮)।

মুসলমানগণ গর্বের সহিত মাটির ঝুড়ি লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহাদের বায়'আতবদ্ধ হওয়ায় কথা ঘোষণা করিতেছিলেন গানের সুরে ঃ

نحن الذين بايعوا محمدا - على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরা সেই জাত মুহাম্মাদের হাতে নিলাম পণ। ইসলামে থাকবো অটল সারাটি জীবন" (দ্র. সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৩)।

জবাবে নবী করীম (স) বলিতেছিলেন—

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة - فاغفر الانصار والمهاجرة

"শান্তি-সুখ আখিরাতে দুনিয়ার জীবন জীবন না, আনসার ও মুহাজিরে আল্লাহ কর তুমি মার্জনা" (মুসলিম, হাদীছ নং ৪৫২১)।

আর-রাওদুল উনুফের বিবরণ হইতে জানা যায়, সর্বপ্রথম মহানবী (স) কোদাল হাতে লইয়া পরিখা খননের উদ্দেশ্যে কোপ দিতে দিতে গাহিয়া উঠিলেন ঃ

بسم الله وبه بدينا + ولوعبدنا غيره شقينا + حبذا ربا وحبذا دينا

"বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে শুরু করিলাম, অন্যেরে পুঁজিলে নিজে আভাগা হইতাম। কতই উত্তম মোদের পরোয়ারদিগার, কত না উত্তম ধর্ম ইসলাম তাঁহার" (দ্র. রাওদুল উনুফ, ৩খ., পৃ. ১৮৯; কান্দেহলবী, সীরতুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩১৫)।

শুধু খন্দকের যুদ্ধেই নহে, হুনায়ন যুদ্ধের চরম বিপর্যয়ের সময় বার সহস্র মুসলিম সৈন্য যখন দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন, তখন এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) একেবারে একাকী ছিলেন। যে এক শত সৈন্য ময়দানে টিকিয়া রহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রবর্তী, অন্যরা পিছনে পড়িয়া গেলেন (দ্র. ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৪৪)।

খচ্চর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ (স) নির্ভীক চিত্তে শত্রুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার চাচাত ভাই আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারিছ প্রাণপণে খচ্চরের লাগাম টানিয়া ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। নবী করীম (স)-এর মুখে তখন উচ্চারিত হইতেছিল ঃ

انا النبى لا كذب + انا ابن عبد المطلب

"আমি আল্লাহর নবী মিথ্যুক নই কোন, আবদুল মুত্তালিবের সন্তান আমি জেনো" (দ্র. সহীহ বুখারী, ১/৪০১; সহীহ মুসলিম, ২/১০১)।

এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (স) কবিতার সাহায্যে মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেন।

সহযোদ্ধাগণের দৃঢ়তায় চুক্তি সম্পাদন হইতে বিরত থাকা

আল্লাহর রাসূল (স) যেহেতু তাঁহার প্রিয় অনুসারিগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন (بالمؤمنين رءوف رحيم) তাই খন্দকের যুদ্ধের সম্মিলিত কাফির বাহিনীর দীর্ঘ অবরোধে মুসলমানদের প্রাণান্তকর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া এক পর্যায়ে তিনি বানূ গাতাফানের সহিত প্রতি বৎসর খায়বারের উৎপন্নজাত খেজুরের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে চুক্তি করিতে মনস্থ করিয়া এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইলেন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের পূর্বক্ষণে তিনি এই ব্যাপারে সাহাবীগণের পরামর্শ চাহিলেন। আওস ও খাযরাজ গোত্রপতিগণ সবিনয়ে জানিতে চাহেন যে, উহা কি ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশের ভিত্তিতে, নাকি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? ওহী ভিত্তিক নির্দেশ হইলে বলিবার কিছু নাই। আর যদি একান্তই আমাদের প্রতি অনুকম্পাবশত আপনার ব্যক্তিগত অভিমত হইয়া থাকে তাহা হইলে আরয করিব, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন দিন উহারা ক্রয় বা আপ্যায়ন সূত্রে ছাড়া মদীনার একটি খেজুর দানাও লাভ করিতে পারিত না। এখন

যেহেতু ইসলাম দ্বারা আল্লাহ আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং আপনার যোগ্য নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছি, কাজেই আমরা কেন এইরূপ হীনতা স্বীকার করিব? ফলে রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির এই আলোচনা স্থগিত করিয়া দেন (দ্র. মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৬/১৩২; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২/৭৩; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩/১১০-৩১১; নাদরাতুন নাঈম, ১/৪৭৫-৪৭৮)।

সাহাবীগণের পরামর্শকে যে রাসূলুল্লাহ (স) কীরূপ মূল্যায়ন করিতেন, তাঁহার নিজের অভিমতের উপর তাহাদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়া উহুদ যুদ্ধের সময়ের মত খন্দকের যুদ্ধেও সেই প্রমাণ রাখিলেন।

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ও বিজয় প্রার্থনা

রাসূলুল্লাহর (স) দু'আকে মুমিনের অস্ত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

الدعاء سلاح المؤمن

"দু'আ হইল মু'মিনের অস্ত্র"।

الدعاء مخ العبادة

"দু'আ হইতেছে ইবাদতের সারনির্যাস"।

জিহাদ একটি সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত এবং জিহাদে অস্ত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (স) জিহাদের ময়দানে বারবার এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। মুসনাদে আহমাদের হাদীছে আছে ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন , অবরোধের ফলে আমাদের কষ্টের কথা বলিয়া আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দু'আ করিবার জন্য আবেদন জানাইলে তিনি বলিলেন, তোমরা এইভাবে দু'আ করিবেঃ

اللهم استرعوراتنا + وامن روعاتنا.

"হে আল্লাহ! আমাদের ত্রুটিসমূহকে গোপন করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতি দূর করিয়া দিন"।

সহীহ বুখারীর হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তখন এইভাবে দু'আ করেন—

اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب واهزمهم وانصرنا عليهم.

"হে কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী ও যূথবদ্ধ বাহিনীকে পরাস্তকারী আল্লাহ! উহাদিগকে পরাস্ত করুন এবং উহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন"।

মুসনাদে আহমাদ ও তাবাকাতে ইব্ন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (স) মসজিদে আহযাবে হাত উঠাইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় এইরূপ দু'আ করিয়াছিলেন। আবূ নু'আয়মের রিওয়ায়াতে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ার পর দু'আটি করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. যুরকানী. ২খ., পৃ. ১২০,পাদটীকায়)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই দু'আ কবূল করেন। ফলে পূর্ব কথিত ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইয়া কাফির বাহিনীর সবকিছু তছনছ করিয়া দেয় এবং তাহারা পালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। হুযায়ফা (রা)-কে কাফির বাহিনীর মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণকালে আল্লাহ্র রাসূল দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته.

"হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে সম্মুখ দিক, পশ্চাৎ দিক, ডান দিক, বাম দিক, উর্ধ্ব ও অধঃ দিক হইতে হিফাযত করিও" (দ্র. যুরকানী, ২খ., পৃ. ১১৮)।

পরদিন ভোরের আকাশ ছিল নির্মল মেঘমুক্ত। দীর্ঘ অবরোধের পর মদীনাবাসীদের জীবনে আবার স্বচ্ছন্দের হাতছানি। সদলবলে ঘরে ফিরিতে ফিরিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে উচ্চারিত হইল ঃ

لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير. ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক-লা শরীক। রাজ্য তাঁহারই, প্রশংসাও একমাত্র তাঁহারই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর দিকে রুজুকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রভুর স্তুতিকারীরূপে (আমরা ঘরে ফিরিতেছি)। আল্লাহ তাঁহার ওয়াদাকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি একাই পরাস্ত করিয়াছেন" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)।

শরীকে উদ্ধৃত হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা)-এর মুসলিম রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, খন্দকের যুদ্ধের অবরোধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (স) সর্বক্ষণিকভাবে দু'আ করিয়া চলিয়াছিলেন ঃ

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب.

"হে কিতাব অবতরণকারী ও দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! সম্মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও প্রকম্পিত করিয়া দিন" (দ্র. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ৪১১; মুসলিম, ৬খ., পৃ. ১৯০, হাদীছ নং ৪৩৯৩; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৯০)।

মুসলমানদের চরম দুর্দিনে মদীনা অবরোধের বিপদজনক মুহূর্তে বানূ কুরায়যা ইয়াহূদী গোষ্ঠী চুক্তিভঙ্গ করিয়া শত্রুবাহিনীতে যোগ দেওয়ার দুঃসংবাদ শ্রবণে বিমূঢ় মুহূর্তে নবী করীম (স)-এর পবিত্র যবানে উচ্চারিত হইল ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের উত্তম কর্মনির্বাহক" (৩ ঃ ১৭৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ দু'আ করিয়াছেন বদর রণাঙ্গনে, তায়েফে, হুনায়নে, মক্কা বিজয়কালে, আরও কত যুদ্ধে ও বিপদাপদে। বদরের যুদ্ধের দিন যখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ

চলিতেছিল তখন তিনি ছাউনীতে কিবলামুখী হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানাইতেছিলেনঃ

اللهم انجز لى ما وعدتنى اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام لا تعبد فى الارض.

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পূরণ করুন! হে আল্লাহ! মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটি যদি আজ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীবক্ষে আর আপনার ইবাদত হইবে না" (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৪৪৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর এই ফরিয়াদ শুনিয়াছেন, তাঁহাকে বারবার জয়যুক্ত করিয়াছেন, শত্রুবাহিনীর কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার দুশমনদের চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের জবাব দিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে। আল্লাহ্ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৮ ঃ ৯-১০)।

খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি ফরিয়াদ করিয়াছিলেন ঃ

يا سريع اكمروبين يا مجيب المضطرين اكشف همى وغمى وكربى فانك ترى ما نزل بى وباصحابى.

"হে বিপদগ্রস্তের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অসহায়দের প্রার্থনা মঞ্জুরকারী! আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও বিপদ দূর কর! আমার উপর ও আমার সাহাবীদের উপর যে বিপদ আপতিত উহা নিশ্চয় তুমি দেখিতেছ" (সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৬৬৩)।

মোটকথা, যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ও বিজয় প্রার্থনাও যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিশেষত আহযাব যুদ্ধে ইহার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গুপ্তচর অস্ত্রধারণ করিবে না

সাধারণত একটি যুদ্ধে কেবল সশস্ত্র যোদ্ধাগণই থাকে না, উহাতে যোদ্ধা ছাড়াও গুপ্তচর, সেবক-সেবিকা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে এবং তাহাদের কাহারও ভূমিকাকে খাটো করিয়া দেখার উপায় নাই। আধুনিক যুগে প্রতিটি সেনাবাহিনীর সহিত ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এবং

মেডিকেল কোরও রীতিমত বাহিনীর সৈন্য ছাড়াও পদস্থ কর্মকর্তার মর্যাদায় যুদ্ধে শামিল থাকেন। উহুদ যুদ্ধে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে কেবল গিরিপথ প্রহরায় নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের জয় বা পরাজয় কোন অবস্থায় তাহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। খন্দকের যুদ্ধে আমরা লক্ষ্য করিলাম তীব্র শীতের রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে হযরত হুযায়ফা (রা)-কে শত্রুশিবিরে রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরণ করিলেন এবং সাথে সাথে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন ঃ

اذهب فأتنى بخبر القوم ولا تذعرهم على.

"যাও, সম্প্রদায়ের সংবাদ লইয়া আস। কিন্তু উহাদিগকে আমার উপর ক্ষেপাইবার মত কোন উস্কানীমূলক কাজ করিয়া বসিও না" (মুসলিম, ৩/২৭৪)।

মুসলিমের ঐ হাদীছেই হুযায়ফার নিজের বর্ণনা ঃ

فلما وليت من عنده جعلت كأنما امشى فى حمام حتى اتيتهم فرايت ابا سفيان يصلى ظهره بالنار توضعت سهما فى كبد القوس ناردت ان ارميه فذكرت قول رسول الله ﷺ ولا تذعرهم على ولو رميته لاصبته.

"যখন আমি নবী করীম (স)-এর নিকট হইতে প্রস্থান করিলাম তখন আমার নিকট মনে হইতেছিল যে, আমি যেন হাম্মামের উষ্ণ পানিতে বিচরণ করিতেছি (অর্থাৎ তীব্র শীতের রাত্রিতেও শীত বোধ করিতেছিলাম না)। চলিতে চলিতে আমি তাহাদের একেবারে নিকটে চলিয়া গেলাম। লক্ষ্য করিলাম আবূ সুফ্য়ান আগুনে তাহার পিঠ সেঁকিতেছে। আমি তীর নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়া ধনুকে তাহা সংযোজনও করিলাম, এমন সময় আমার মনে পড়িয়া গেল রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'উস্কানীমূলক এমন কিছু করিও না যাহাতে উহারা আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে' (তাই আমি তীর নিক্ষেপে বিরত রহিলাম)। 'যদি আমি তীর নিক্ষেপ করিতাম তাহা হইলে উহা অবশ্যই লক্ষ্যভেদ করিত" (মুসলিম, ৩/১৪১৪-১৪১৫; যুরকানী, ২খ., পৃ. ১১৮; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস্-সাহীহা, ২খ., পৃ. ৪৩১)।

খন্দকের অবরোধ সমাপ্ত হইলে নবী করীম (স) প্রত্যাবর্তনকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দান করিলেন ঃ

الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم.

"এখন হইতে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা আর করিতে পারিবে না। আমরাই বরং তাহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)।

খায়বার বিজয় ঃ ইসলামের প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিদার সন্ধির ফলে মক্কার কুরায়শদের বৈরিতাপূর্ণ তৎপরতা হইতে আপাতত মুক্ত হইতে পারিলেও খায়বারে নির্বাসিত বনূ নাযীর ও বানূ কুরায়যার আশ্রয়স্থল

খায়বারের ইয়াহূদীরা সংগঠিত হইয়া মদীনা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছিল। গোটা আরবের মধ্যে মক্কার পরেই মুসলিম বিদ্বেষের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই খায়বার। এখানে ইয়াহূদীদের অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ এবং প্রায় কুড়ি হাজার সশস্ত্র সৈন্য ছিল। বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীদিগকে ইহারাই বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়াছিল।

খায়বারের ইয়াহূদীরা কেবল আরবের বিভিন্ন ইয়াহূদী গোত্রগুলিকে যে উত্তেজিত ও সংগঠিত করিল তাহাই নহে, তাহাদের নেতা উসায়র তাহার মিত্র গাতাফান গোত্রকে খায়বারের উৎপন্নজাত অর্ধেক ফসল প্রদানের আশ্বাস দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিল। খন্দক যুদ্ধে যূথবদ্ধ 'আহ্যাব' বাহিনীতে কুরায়শ ছাড়া আরও দুইটি ইয়াহূদী ও গাতাফান গোত্র শরীক ছিল। বানূ নাযীর গোত্র রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের পর মদীনা ত্যাগের জন্য আদিষ্ট হইলে মদীনার মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যির প্ররোচনায় এবং বানূ কুরায়যার স্বধর্মীয় ইয়াহূদী গোষ্ঠী ও বানূ গাতাফানের সাহায্যের ভরসায় তাহারা সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া অস্থাবর সম্পত্তিসহ মদীনা ত্যাগের সদয় অনুমতি লাভ করিয়া গর্বের সহিত মিছিল করিয়া ঢোল-বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে মদীনা ত্যাগ করিয়াছিল। কুরায়শরা চুক্তিবদ্ধ হইয়া যাওয়ায় এখন কার্যত তাহাদিগকে বাদ দিয়াই আহযাব বাহিনীর তিন পক্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের সম্মিলিত শক্তিই আবার মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। উহাদের চক্রান্তমূলক তৎপরতা বন্ধ করার জন্য বহু পূর্বেই উহাদিগকে দমন করা উচিত ছিল।

কিন্তু ইসলামের প্রধান শত্রু মক্কার কুরায়শদের তৎপরতা দমন না করিয়া শতাধিক মাইল দূরবর্তী এলাকার শত্রুদের শায়েস্তা করার দিকে মনোযোগী হওয়ার উপায় ছিল না। তাই খায়বারবাসীদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার পাইয়াই চলিয়াছিল। ডব্লিউ মন্টগোমারী ওয়াটের ভাষায় ঃ

"খায়বারের ইয়াহূদী এবং বানূ নযীরের প্রধান সর্দারগণ মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সাথীদিগকে সমূলে ধ্বংস করার সংকল্প করে। তাহারা খায়বার সংলগ্ন এলাকার গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য উস্কানি দিতে থাকে। এইজন্য তাহারা অনেক অর্থও ব্যয় করে। ইহাই ছিল হযরত মুহাম্মাদের সদলবলে খায়বার অভিযানের মৌল কারণ (Mahammad, Prophet and Statesman; পৃ. ১৮৯;,লিডেন ১৯৬১; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৭০২, পাদটীকায়)।

প্রখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিত মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল বলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষিতে দক্ষিণ দিক হইতে কুরায়শদের আক্রমণের আশংকা না থাকিলেও উত্তরের দিকে খায়বারের ইয়াহূদীদের পক্ষ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা ষোল আনাই ছিল। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বা পারস্য সম্রাট কিসরার পক্ষ হইতেও আশঙ্কা ছিল যে, তাহারা খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতে পারে। কুরায়শদের তুলনায় ইয়াহূদী গোষ্ঠীই মহানবী (স)-এর প্রতি অধিকতর বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। তাহারা ধর্মীয় দিক হইতেও অধিকতর গোঁড়া

এবং জ্ঞান-গরিমায় কুরায়শদের তুলনায় উন্নততর ছিল বিধায় তাহাদের সহিত হুদায়বিয়ার সন্ধির মত সন্ধি করাও ছিল অসাধ্য ব্যাপার। তাহারা একাধিকবার মুসলমানদের হস্তে পরাস্ত হওয়ায় হিরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সাহায্য পাইলেই যে কোন সময় তাহারা মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার আশঙ্কা ছিল। এইজন্য তাহাদিগকে নির্মূল করা এবং তাহারা গাতাফানীদের পক্ষ হইতে যাহাতে সাহায্য না পাইতে পারে তাহাও নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল (হায়াতে মুহাম্মাদ, আরবী, পৃ. ৩৯৩, ১৫তম সংস্করণ, ১৯৯৩, মাক্তাবাতুন নাহ্দাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো)। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাকে ছদ্মবেশে খায়বার প্রেরণ করিলে তিনি স্বয়ং খায়বারের নেতা উসায়রের মুখেই শুনিয়া আসিলেন যে, সে অচিরেই মদীনা আক্রমণের জন্য সংকল্পবদ্ধ।

খায়বার যাত্রাঃ কেবল পরীক্ষিত যোদ্ধাগণই অনুমতিপ্রাপ্ত

অবশেষে হিজরী ৭ম সনের মুহাররাম মাসের শেষদিকে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সেই পূর্ব কথিত 'শত্রুর দেশে গিয়া যুদ্ধ' করার উদ্দেশ্যে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে প্রচুর গনীমত-সম্ভারের প্রতিশ্রুতি দিয়া ঐ সময়ই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, অচিরেই ঐ সমস্ত পশ্চাতে অবস্থানকারী ঐ সমস্ত লোক যাহারা মুসলমানদের কঠিন মুহূর্তে নানা অজুহাতে অভিযানে যাওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে, গনীমত প্রাপ্তির আশায় তোমাদের সহিত অভিযানে যাইতে পরম আগ্রহী হইয়া উঠিবে (দ্র. ৪৮ঃ ১১, ১৫)।

খায়বার অভিযানের সময় সেই সত্যটিই প্রকাশিত হইল। যাহারা পূর্বে নানা অজুহাতে পশ্চাতে থাকিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট ছিল গনীমতের লোভে এখন তাহারাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেবল ঐ সমস্ত লোকই যুদ্ধযাত্রার যোগ্য বিবেচিত হইবে, যাহারা প্রকৃতই জিহাদের জন্য আগ্রহী। সেই মতে, কেবল ঐ সকল জানবায সাহাবাগণই যুদ্ধ যাত্রার যোগ্য বিবেচিত হইলেন, যাহারা হুদায়বিয়ার বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে মরণপণ বায়'আত (বায়'আত রিদওয়ান) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪০০ (চৌদ্দ শত) (দ্র. ফাতহুল বারী, ৭/৪৬৫; যাদুল মা'আদ, ২/১০৩; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪০৯)।

অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই আদেশ ছিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কেননা বিভিন্ন যুদ্ধে, বিশেষত উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্কটজনক মুহূর্তে মুনাফিকদের কাটিয়া পড়ায় যে মহাসঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছিল, উহার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সুযোগ দান কোনমতেই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

শত্রুদের মিত্র বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন রাখা

ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম প্রতিরক্ষা কৌশল। আহযাব বাহিনীত্রয়কে পরস্পর হইতে কীভাবে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ইতোপূর্বে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইবার খায়বারের নেতাদের মিত্র গাতাফানী বাহিনীর তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসার সম্ভাবনা ছিল। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সদলবলে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে খায়বারবাসীদিগকে পত্রযোগে তাহা জানাইয়া দিয়াছিল। সাথে সাথে সে খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে প্রবোধ দিয়াছিল যে, মুহাম্মাদ ও তাঁহার বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তোমরা অনেক বেশী এবং তোমাদের সৈন্য ও অস্ত্র অনেক বেশী। মুহাম্মাদ স্বল্প সংখ্যক সঙ্গী এবং যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। সেমতে ইয়াহূদী নেতা কিনানা ইব্ন আবুল হুকায়ক এবং হাওযা ইব্ন কায়স গাতাফানীদের সাহায্য কামনায় তাহাদের এলাকায় ছুটিয়া গিয়াছিল। মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারিলে খায়বারের অর্ধেক ফসল গাতাফানীদিগকে দেওয়ার টোপও তাহারা দিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া সদলবলে আর-রাজী' নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। গাতাফানীদের আবাসস্থল ঐ স্থান হইতে মাত্র একদিন এক রাত্রির পথের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। গাতাফানীরা ততক্ষণে খায়বারের দিকে যাত্রা শুরু করিয়া দিয়াছে। পথিমধ্যে পিছন দিক হইতে শোরগোল শুনিতে পাইয়া তাহারা ভাবিল, নিশ্চয় মুসলিম বাহিনী তাহাদের জনপদে হামলা চালাইয়াছে। তাই আর অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের জনপদ রক্ষার তাগিদে তাহারা প্রত্যাবর্তনকেই সমীচীন মনে করিল। খায়বারের ইয়াহূদীদের শক্তি বর্ধনের জন্য যাওয়া তাহাদের আর হইয়া উঠিল না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সামরিক প্রজ্ঞা দ্বারা শত্রুবাহিনীকে তাহাদের বন্ধুদের হইতে সার্থকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন (তাবারী, তারীখ, পৃ. ৫৭৫)।

বাহিনী পরিচালনায় ইয়াহূদীগণ

হযরত সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সহিত খায়বারের পথে রওয়ানা হইলাম। সফরটি ছিল রাত্রিকালীন । জনৈক ব্যক্তি 'আমেরকে কিছু একটা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি ছিলেন কবি (তাই এরূপ আবদার লোকে তাহার নিকট করিতই)। তিনি সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া হুদীর ছন্দে দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঃ

اللهم لو لا انت ما اهتدينا   ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اتقينا   وثبت الاقدام ان لاقينا
والقين سكينة علينا   انا اذا صيح بنا ابينا
وبالصياح عولوا علينا

"হে আল্লাহ! তুমি না থাকিলে পথের দিশা পেতাম না।
না করিতাম সাদকা যাকাত
না পড়িতাম তোমার সালাত

যাবৎ থাকি তাকওয়া পথে কল্লো মোদের মার্জনা
নাযিল কর মোদের পরে তোমার শান্তি সাকীনা!
বিপদে কেউ ডাকলে মোদের আমরা বসে থাকি না
স্থির রাখিও যুদ্ধকালে যেন মোরা ভাগি না

তারাও জানে যারা ডাকে আমরা বসে থাকি না" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬০৩; ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৩৪৪-৩৪৫; মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৫)।

তাহার এইরূপ হুদী (উট চালনার গান)। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কে এই হুদী গাহিতেছে? জনতা বলিল, আমের। আল্লাহর রাসূল (স) বলিলেনঃ আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করুন! রাসূলুল্লাহ (স)-এর এইরূপ দু'আর অর্থ সকলের জানা ছিল। তাই সকলেই বুঝিয়া লইলেন, আমেরের শাহাদাত আসন্ন। উপস্থিত জনতার একজন বলিল, এখন তাহার জন্য (শাহাদাত) তো অবধারিত হইয়া গেল। হায়! তাঁহাকে দিয়া যদি আমাদিগকে আরও অধিক উপকৃত করা হইত (সহীহ বুখারী , খায়বার যুদ্ধ প্রসঙ্গ, ২/৬০৩)। সহীহ মুসলিমের হাদীছ হইতে জানা যায়, এইরূপ উক্তিকারী ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (দ্র. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, যী-কারাদ ও অন্যান্য যুদ্ধ প্রসঙ্গ, হাদীছ ৪৫২৬)। উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সৈন্যবাহিনীর চলার পথে বাহনকে উদ্দীপ্ত ও বাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্য হুদী গানও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমর কৌশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পঞ্চ বাহিনী আল-খামীস ঃ

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যদি কোন জনপদে আযানের শব্দ শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে নবী করীম (স) আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতেন। ঐ রাত্রি সেখানে যাপন করিয়া প্রত্যূষে যখন কোন আযানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না তখন তিনি অতি প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করিয়া সদলবলে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া খায়বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। খায়বারের কৃষককূল তখন কোদাল-ঝুড়ি হাতে লইয়া মাঠের দিকে বাহির হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল ঃ

محمد والله محمد والخميس

"মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ, আর তাঁহার গঠিত বাহিনী"।

তারপর তাহারা পলায়ন করিয়া তাহাদের নগরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন ঃ

الله اكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر
انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! খায়বার ধ্বংস (বিজিত) হইল! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! খায়বার ধ্বংস হইল। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের জন্য উপনীত হই, তখন সতর্কীকৃত সম্প্রদায়ের

প্রাতকাল কতই না মন্দ" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬০৩-৬০৪, খায়বার যুদ্ধ প্রসঙ্গ; অনন্তর কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল আযানেও হাদীছখানা রহিয়াছে)।

উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (স)-এর সমর কৌশলের 'আল-খামীস' বা পঞ্চ বাহিনীর খ্যাতি তখন সুদূর খায়বারবাসীদের কানেও পৌঁছিয়াছিল এবং তাহাদের আগমনের আশঙ্কা তাহারা পূর্ব হইতেই করিত। বানূ নদীরের উৎখাতে সেই ভীতি খায়বারেও ছড়াইয়া পড়িবে উহাই ছিল স্বাভাবিক।

ইব্ন খাল্দূন বলেন, পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে যে যুদ্ধরীতি প্রচলিত ছিল তাহা ছিল 'আল-কার্র ওয়াল ফার্র' ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারার মত আক্রমণ আবার ত্বড়িৎ গতিতে সরিয়া পড়া। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাহারা অনারবদিগকে লইয়া সেনাবাহিনী (তাবি'আ) গড়িয়া তুলিতে শুরু করে। ইহা তাহারা করিয়াছিল দুইটি কারণে। প্রথমত, শত্রু পক্ষের যুদ্ধের মুকাবিলা এবং দ্বিতীয়ত, স্বীয় বাহিনীকে অধিকতর অর্থবহ করিয়া গড়িয়া তোলা। তাহাদের বেপরোয়া লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইহাই ছিল অধিকতর সঠিক পদ্ধতি। পূর্ববর্তী লেখকগণ কর্তৃক 'আল-খামীস' নামে আখ্যায়িত এই পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইত। প্রচলিতভাবে এই ভাগগুলি ছিল ঃ (১) কাল্ব (কেন্দ্র), (২) মায়মানা (দক্ষিণ বাহু), (৩) মায়সারা (বাম বাহু), (৪) মুকাদ্দামা (অগ্রবর্তী বাহিনী) ও (৫) সাকা (পশ্চাদরক্ষী বাহিনী)। ইব্ন খাল্দূন এই নয়া বিন্যাসকে যাহ্ফ (বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া) নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা এমন এক রণপদ্ধতি যাহাতে সেনাবাহিনী সালাতের সারির মত বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই পদ্ধতিটি শত্রু বাহিনীর জন্য ছিল রীতিমত ভীতিকর। সাধারণত গাযওয়াসমূহে এবং বড় বড় সারিয়্যা অভিযানেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত। উহুদ যুদ্ধকালে উহা পূর্ণরূপে চালু হয়। আল-ওয়াকিদীর খায়বার অভিযানের বিবরণে খামীস পদ্ধতির বিবরণটির স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। হুনায়ন, তায়েফ ও খায়বার অভিযানেও খামীস পদ্ধতির কথা জানা যায়। মহানবী (স)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র যে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব হইতে তাবিয়া যুদ্ধকৌশল ও সেনাবিন্যাসে খামীস পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। সময়ের সাথে সাথে উভয় পদ্ধতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও পূর্ণতা সাধন করিয়া ইসলামী বাহিনী এক সুদক্ষ যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত হইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বাহিনীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করে (দ্র. রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ১৫৫-১৫৮)।

যুদ্ধের মূল লক্ষ্য গনীমত নহে ঃ যুদ্ধে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নসীহত

খায়বর যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রা) পতাকা লাভের পর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি ততক্ষণ পর্যন্ত লড়িয়া যাইব যাবৎ না তাহারা আমাদের পর্যায়ে আসে? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم.

"ধীরে সুস্থে যাও, তাহাদের অঙ্গনে গিয়া অবতরণ করিবে, তারপর তাহাদিগকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে এবং ইহাতে তাহাদের উপর আল্লাহ্র কী হক বর্তায় সেই সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবে। আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা একটি লোকেরও হিদায়াত লাভ তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উষ্ট্র লাভের চাইতেও উত্তম" (দ্র. সহীহ বুখারী, ২/৬০৩-৬০৪)।

মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে জিহাদে প্রেরণকালে যে উপদেশ দিতেন তাহার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোন ব্যক্তিকে সেনাদল অথবা সারিয়্যা বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিতেন তখন তাহাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলমানগণকে আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনের নসীহত করিতেন। তারপর বলিতেনঃ যুদ্ধ করিবে আল্লাহর নামে, আল্লাহ্র পথে। লড়াই কর তাহাদের সহিত যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে। যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে তবে গনীমতের মাল আত্মসাত করিবে না। প্রতিশ্রুতি (চুক্তি) ভঙ্গ করিবে না। শত্রুপক্ষের নিহতদের অঙ্গহানি করিবে না। শিশুদিগকে হত্যা করিবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হইবে তখন তাহাকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিবে। সে যদি তাহার কোন একটিও গ্রহণ করিয়া লয় তবে তুমি তাহা মানিয়া লইবে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(১) তাহাদিগকে তুমি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা তাহা মানিয়া লয় তবে তাহা তুমিও মানিয়া লইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। তারপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া মুহাজিরগণের এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার আহবান জানাইবে। তখন অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাহারা মুহাজিরদের সমপর্যায়ে থাকিবে। আর যদি তাহারা স্বগৃহ ত্যাগে সম্মত না হয় তাহা হইলে তাহারা বেদুঈন মুসলমানদের সমপর্যায়ে থাকিবে। সাধারণ মুসলমানদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত হুকুম বর্তায় তাহাদের উপরও তাহাই বর্তাইবে, আর তাহারা গনীমত বা ফায় সম্পদে অংশীদার হইবে না— যাবৎ না মুসলমানদের সহিত জিহাদে গমন করিবে।

(২) যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাহাদিগকে জিয্য়া প্রদানের আহবান জানাইবে। যদি তাহারা তাহাতে সম্মত হইয়া যায়, তবে তুমি তাহাতে সম্মত হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া লইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৩) যদি তাহাতেও তাহারা অস্বীকৃতি জানায়, তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আর যদি তোমরা কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের যিম্মাদারি প্রার্থনা কর, তাহা হইলে

তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের যিম্মাদারিতে না দিয়া তোমার নিজের ও নিজের সাথীগণের যিম্মাদারিতে রাখিবে। কেননা তোমাদের ও তোমাদের সাথীগণের যিম্মাদারি ভঙ্গ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের যিম্মাদারি ভঙ্গের তুলনায় লঘুতর হইবে। আর তোমাদের কোন দুর্গ অবরোধকালে দুর্গবাসীরা যদি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের হুকুমের বরাতে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে তাহা হইলে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করাইবে। কেননা তোমার জানা নাই যে, তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম কার্যকরী করিতে পারিবে কি না (দ্র. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীছ নং ৪৩৭২)।

উক্ত হাদীছ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ কুফরীর অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া মনগড়া উপাস্যদের দাসত্বের নিগড় হইতে এবং কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের দাসত্বের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া এক আল্লাহর উপাসনা করুক, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জিহাদ ছিল সেই উদ্দেশ্যে। মুসলমানরা প্রভূত গনীমত ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হইয়া যাউক, এই উদ্দেশ্যে জিহাদ পরিচালিত হইত না।

শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টিকারী কবিতা পাঠ

রণক্ষেত্রে শত্রুর মনে ভয় উদ্রেককারী কবিতা পাঠ নবী করীম (স)-এর যুগে প্রচলিত ছিল। আরবে পূর্ব হইতেই এইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাই খায়বার বিজয়কালে নাইম দুর্গের দিকে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করিলে ইয়াহূদী নেতা মারহাব তরবারি নাচাইতে নাচাইতে এই বীরত্ব ব্যঞ্জক পংক্তি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল ঃ

قد علمت خيبر انی مرحب + شاك السلاح بطل محرب

اذا الحروب اقبلت تلمت

"জানে খায়বার আমি মারহাব বীরপুরুষ
সশস্ত্র বীর নখদর্পণে রচা আহব
লড়াকু ব্যাঘ্র যবে হয় আগুনের
সেও কাবু হয় বল্লম আর অসিতে ঘোর!
ঘেঁষে না নিকট পালায় ভয়েতে অনন্তর"।

তাহার জবাবে মুসলিম পক্ষ হইতে আমের (রা), কা'ব ইব্‌ন মালিক ও শেরে খোদা আলী (রা) বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবি আমের (রা) বলিয়াছিলেনঃ

قد علمت خيبر انی عامر + شاكی السلاح بطل مغامر

"জানে খায়বার আমি মহাবীর আমের হই
অস্ত্রসজ্জা রণকুশলে যে পেছনে নই" (দ্র. সহীহ মুসলিম, খায়বার যুদ্ধ প্রসঙ্গ, ২খ., পৃ. ১২২; যী কারাদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ, ২খ., পৃ. ১১৫; সহীহ বুখারী, খায়বার যুদ্ধ প্রসঙ্গ, ২খ., পৃ. ৬০৩; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৮০)।

সীরাত ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মারহাবের জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) নিম্নরূপ পংক্তি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ঃ

জানে খায়বার আমি যে কবি শংকানাশী
বীর বাহাদুর যবে হয় রণে সর্বত্রাসী
যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিলে যুদ্ধ হয়
চমকে অসি কর্তনকারী বিদ্যুৎময়
এমনি দলন তোদের আমরা দলিব যে,
কষ্টই তোদের পরিণত হবে সহজে।
মারের বদলে হয়তো বা দেবো উচিত মার
নয়তো লভিব গনীমত (রুখে সাধ্য কার ?)
এমন হস্তে নাই যাতে লেখা বক্রতার।

ইব্‌ন হিশাম আবূ যায়দ আনসারীর বরাতে কা'ব (রা)-এর নিম্নরূপ উক্তি শুনাইয়াছেন ঃ

জানে খায়বার আমি কবি (যাই যে বলি)
স্বরূপে প্রকাশি সমর অগ্নি উঠিলে জ্বলি।
যুদ্ধের মহাবিভীষিকা রাখি নিয়ন্ত্রণে
দৃঢ়চেতা বীর লড়ি উদ্যমে অপরিসীম।
সাথে তরবারি কর্তনকারী বিদ্যুৎপ্রায়
উঠে যে চমকি কাপে না হস্ত বক্রতায়।

খণ্ড খণ্ড করিব জানিস তোদের কেটে, (ফলে) কষ্টও আর কষ্ট রবে না মোটে (দ্র. সীরাতুন্নবী, ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৩৫৩)। অন্য বর্ণনায় আছে, মারহাব বলিয়াছিল ঃ

انا الذى سمتنى امى مرحب + شاك السلاح بطل مجرب

"আমি সেই বীর যার মা নাম রাখিয়াছে মারহাব, অস্ত্রের সাজে অভিজ্ঞতায় আমি বীর পুঙ্গব"। তাহার মুকাবিলায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ

انا الذى سمتنى امى حيدره + كليث غابات كريمة المنظره

"আমি সেই বীর যার মা নাম রাখিয়াছে হায়দার। গভীর বনের সিংহ যে আমি মূর্তি ভয়ঙ্কর" (বর্ণনা মুসলিমের, দ্র. ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৬৭)।

কথিত আছে যে, মারহাব পূর্বরাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, একটি সিংহ তাহাকে রক্তাক্ত করিয়াছে। আলী (রা) স্বপ্নযোগে তাহা অবগত হইয়া তাহার জবাবে বলিলেন, হে মারহাব! আমি তোমার রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা সেই সিংহ। এই বাক্যটি শোনামাত্র তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সকল বীরত্ব কর্পূরের মত উবিয়া গেল এবং সে নিহত হইল (দ্র. যুরকানী, ২খ., পৃ. ২২৪)।

ইব্‌ন কায়্যিম (র) বলেন, সহীহ মুসলিমের বর্ণনামতে, হযরত আলী (রা)-এর হাতেই মারহাব নিহত হয়। কিন্তু মূসা ইব্‌ন উকবা ও যুহরী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর বরাতে বলেন, মারহাবের হত্যাকারী আসলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)। মারহাব দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বীরগণকে আহবান জানাইলে তিনি তাঁহার ভাই মাহমূদ ইব্‌ন মাস্‌লামা-এর ঘাতক মারহাবকে হত্যা করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে হত্যা করিতে সমর্থ হন।

আল-ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামার তরবারির আঘাতে মারহাবের পদযুগল বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন, আমার নিহত ভাইয়ের মৃত্যুর যাতনাটি তুই এখন ভোগ কর। এই অবস্থায় হযরত আলী (রা) তাহার উপর চরম আঘাত হানিয়া তাহার দফা রফা করিয়া দেন এবং তাহার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন।

যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমত বণ্টনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুবিচার

উপরিউক্ত ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত করা হইলে হযরত আলী (রা) স্বীকার করিলেন যে, তিনি মারহাবকে পদযুগল বিচ্ছিন্ন ও মরণাপন্ন অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সেইমতে রাসূলুল্লাহ (স) নিহত মারহাবের তরবারি, শিরস্ত্রাণ, বল্লম প্রভৃতি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাকে প্রদান করেন। ঐ তরবারিখানা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামার বংশধরদের মধ্যে ছিল এবং উহাতে মারহাবের নাম খোদাইকৃত ছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯১-১৯২)।

সেনাপতি ও সৈনিকের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্যতম নীতি। খায়বার যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (স) যখন একেবারেই দুর্গের নীচে শিবির স্থাপন করিলেন তখন হযরত হুবাব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই শিবিরের স্থান নির্বাচন কি ওহীর ভিত্তিতে? খায়বারের দুর্গবাসীরা তীরন্দাযীতে অত্যন্ত দক্ষ, আর আমাদের শিবির একেবারে তাহাদের লক্ষ্য সীমার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ঘন খেজুর বীথির মধ্য দিয়া আসিয়াও তাহারা বিপদের কারণ হইতে পারে। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় ৪০০ খেজুর গাছ কর্তন করাইলেন। তিনি শিষ্যদের উৎসাহবোধক একটি খুৎবাও দিলেন (দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮০৮-৮০৯)।

ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাবু করা

জেনারেল আকবর খান বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর লড়াই করার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের পর শান্তি ফিরে আসবে এবং বিজেতা ও বিজিত উভয় পক্ষই আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই যুদ্ধে তিনি ঠিক ততটুকু মাত্র জীবন ও সম্পদহানি ঘটানোকে জায়েয রেখেছেন যতটুকু যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ও শান্তি লাভের জন্য ছিল অপরিহার্য। অন্যথায় তিনি এমন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করতেন না বা এমন সামরিক চাল

চালতেন না যার ফলে দুশমন বিনা যুদ্ধেই ভীতিগ্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে হিম্মত হারিয়ে যেতো আর অধিক রক্তক্ষয় ব্যতিরেকেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যেত। এই সামরিক কলাকৌশলকেই বৃটিশ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ লীডল হার্ট-এর উক্তি মুতাবিক জার্মানীর প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক নিম্নোক্ত ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছেন ঃ 'প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্যে এমনভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে যে, লড়াই ব্যতিরেকে অন্য পন্থায়ও শত্রুর উপর বিজয় সাধিত হয়" (দ্র. ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ২১৯-২২০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্ত নীতি সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলিম যোদ্ধা সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তাই আহ্যাব যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতক বনূ কুরায়যা যখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাদের একটি লোক মদীনার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী নারী ও শিশুদের খবর লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণের পাঁয়তারা করিতেছিল তখন স্বয়ং নবী করীম (স)-এর ফুফু সাফিয়্যা (র) তাঁবুর একটি খুঁটি খুলিয়া লইয়া পশ্চাৎদিক হইতে লোকটির মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, তাহার মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর ত্বরিৎ গতিতে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার খণ্ডিত মুণ্ডসহ তিনি দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তারপর দুর্গের পশ্চার্ধদিকে খণ্ডিত অংশটি এমনভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, শত্রুরা ভাবিল নিশ্চয়ই দুর্গের মধ্যে পুরুষ সৈন্যরা রহিয়াছে। অথচ সেখানে কোন পুরুষ যোদ্ধা ছিল না। কেবল ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমেই দুর্গটি বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল (দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৬৫৯-৬৬০)।

খায়বার আক্রমণের তৃতীয় দিনে সা'ব দুর্গ দখলের উদ্দেশ্যে হযরত হুবাব (রা)-এর হস্তে পতাকা অর্পণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহাকে প্রেরণ করিলেন তখন একে একে ইউশা ও দাইয়ান নামক দুইজন ইয়াহূদী অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার মুকাবিলায় অগ্রসর হইল। তিনি প্রথমজনকে অসির আঘাতে হত্যা করিয়া দ্বিতীয় ইয়াহূদীকেও আঘাত করিলেন। যখন সেও নিহত হইল তখন তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া কর্তিত মুণ্ডটি সজোরে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকা, তাহার স্বগোত্রীয়দের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "লও, ইহা তোমাদের উপহার"। ভীত-সন্ত্রস্ত ইয়াহূদীরা তখন রণে ভঙ্গ দিয়া তাড়াতাড়ি দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মুসিলম যোদ্ধাগণকে উৎসাহ দিতেছিলেন। মুসলিম বাহিনী পলায়নরত ইয়াহূদীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলপূর্বক দুর্গ মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। এইভাবে তৃতীয় দিবসে দুর্ভেদ্য সা'ব দুর্গও অধিকৃত হইল। সঞ্চিত বিপুল রসদ এবং বহু মিনজানিক (লোষ্ট্র বর্ষণ চক্র), দাব্বাবা, বর্ম ও তলোয়ার মুসলমানদের হস্তগত হইল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৫)।

নায়েম দুর্গ প্রথমেই অধিকৃত হইয়াছিল। ওয়াতীহ ও সুলালিম দুর্গ চৌদ্দ দিন পর্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখার পরও যখন একটি লোকও দুর্গের বাহিরে আসিল না তখন ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) মিনজানিক সন্নিবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া ইয়াহূদীরা প্রমাদ গণিতে

লাগিল। তাহারা জীবনভিক্ষা চাহিয়া শর্তাধীনে সন্ধির প্রার্থনা জানাইল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৬-৮১৭)। এইরূপ শত্রুপক্ষকে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারটি স্বয়ং আল-কুরআনের নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ.

"তাহাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যমত শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে; এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে" (৮ ঃ ৬০)।

যাহা হউক, খায়বারের ইয়াহূদীগণ যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আর নাই তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট মিনতি জানায় যেন তিনি তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া দেশান্তরিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এই মিনতি মানিয়া লইলেন। ইহারই মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে গোটা খায়বারের পতন ঘটিল।

বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদের হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স) শেষ পর্যন্ত ইয়াহূদীদিগকে খায়বার হইতে দেশান্তরিত করেন নাই। তিনি এই শর্তে তাহাদিগকে সেখানে বসবাসের অনুমতি দিলেন যে, তাহারা নিজ খরচে সেখানকার জমিজমা চাষাবাদ করিবে এবং উৎপন্নজাত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদেরকে প্রদান করিবে। কিন্তু ইহা শর্ত রহিল যে, মুসলমানগণ যত দিন ইচ্ছা তাহাদিগকে রাখিবে, যখন ইচ্ছা খায়বার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার অধিকারী থাকিবে। ইয়াহূদীদের আবেদন ও উদ্যোগেই এইরূপ চুক্তি হইয়াছিল [(দ্র. সহীহ বুখারী, খায়বারবাসীদের প্রতি নবী করীম (স) এর আচরণ প্রসঙ্গ, ৭/ ৪৯৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, ৩/১১৮৬-৮৭; ফাতহুল বারী, ৫খ., পৃ. ১৬ ,ঐ ৫খ., পৃ. ২৩৯, কিতাবুশ শুরূত; সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, ৩/৬৯৭; নাদ্‌রাতুন নাঈম, ১/ ৪৮৬, পাদটীকায়) ।

ফাদাকবাসিগণের নিকট খায়বার বিজয়ের সংবাদ পৌঁছিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরেও ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন। তখন তাহারাও তাহাদের জীবন রক্ষার বিনিময়ে তাহাদের তাবৎ সম্পদ নবী করীম (স)-কে নযরানাস্বরূপ দিয়া দেশান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব দিল। এইভাবে ফাদাকের সমস্ত সম্পত্তি নবী করীম (স)-এর অধিকারে চলিয়া আসিল। অতঃপর ওয়াদিল কুরা ও তায়মার ইয়াহূদীগণও অনুরূপ শর্তে তাহাদের তাবৎ সম্পদ ত্যাগ করে। খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে তথাকার জমিজমা বর্গা দেওয়া হয় (দ্র. যাদুল মা'আদ, ১/৪০৫; নাদরাতুন নাঈম, ১/৪৮৭)।

গনীমত ও ফায়

ইসলামের প্রথম যুগে বেতনভোগী নিয়মিত সেনাবাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানই ছিলেন এক একজন যোদ্ধা-মুজাহিদ। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সবকিছুই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইত। ঈমানদারগণ নামায-রোযার মত ইবাদত হিসাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জিহাদে গমন করিতেন, সম্পদ লাভের লোভে বা মোহে নহে। গনীমত ছিল তাহাদের বাড়তি পুরস্কারস্বরূপ। তাই সূরা আল-আনফালের শুরুতেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মু'মিন হও" (৮ ঃ ১)।

লক্ষণীয় যে, প্রশ্নটি আসলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উহাকে গনীমত না বলিয়া 'আনফাল' বলিয়াছেন। আনফাল শব্দটি 'নফল'-এর বহুবচন। নফল অর্থ বাড়তি বা ফাও। এই শব্দ ব্যবহারই ইঙ্গিত করিতেছে যে, গনীমত কোন অবশ্য প্রাপ্য সম্পদ নহে। উহা একান্তই মহান আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মালিকানা ও এখতিয়ারধীন। মুসলিম যোদ্ধাগণ উহা লাভ করেন বাড়তি বা অতিরিক্ত প্রাপ্য সম্পদস্বরূপ। উহা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ মাত্র, দাবি করিয়া আদায় করিয়া লওয়ার বস্তু নহে।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত প্রাচীন যুগের নিয়ম সম্পর্কে বাইবেল বিশারদগণের বক্তব্য অনেকটা এইরূপঃ By ancient custom a special share of booty taken in warfalk to the commander, he has the first choice, and in old Arabia was entitled to a forth of the whole. In ancient Israel the practice was similar (Cheyene and Black's Encyclopedia Biblica (Black, London, c. 4905)।

"প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি বিশেষ অংশ পাইতেন সেনাপতি, প্রথম তাঁহার চাহিদাই বিবেচ্য ছিল। প্রাচীন আরবেও সেনাপতি মোট যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশের অধিকারী হইত। প্রাচীন ইসরাঈলেও অনুরূপ রীতি ছিল"।

বাইবেল অভিধানেও আছে যে, ইস্রাইলে, Booty was to be divided in equal shares between those who went into the battle and those who guarded the camp. A chosen part was sometimes dedicated to the Lord, or reserved for a leader (Hasting's Dictionary of the Bible, Clark, London, vol. vi, page 895)।

"যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যাহারা যুদ্ধে গমন করিত এবং যাহারা তাঁবু রক্ষায় নিয়োজিত থাকিত তাহাদের মধ্যে সমভাবে বিভাজ্য ছিল। কখনও কখনও ইহার একটি বিশেষ অংশ 'প্রভু'-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইত বা নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিত"।

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত আয়াতে মুসলমান যোদ্ধাগণকে নীতিগতভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)।

গনীমত সংক্রান্ত প্রশ্নটি প্রথমে দেখা দেয় যখন বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রভূত সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মাদ উছমানী (র) এই সম্পর্কে লিখেন, বদর যুদ্ধে গনীমতস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যুবকগণ যাহারা যুদ্ধের অগ্রভাগে থাকিয়া লড়াই করিয়াছিল তাহারা নিজদিগকেই গোটা গনীমত সম্ভারের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেছিল। প্রবীণগণ যাহারা তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া শক্তি ও সাহস যোগাইতেছিলেন তাহাদের বক্তব্য ছিল, আমাদের সহযোগিতায়ই তো এই বিজয় অর্জিত হইয়াছে, তাই গনীমত আমাদেরই প্রাপ্য। আবার যাহারা নবী করীম (স)-এর হিফাযতে নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের ধারণা ছিল যে, গনীমতের আসল হকদার তাহারাই।

আয়াতে স্পষ্ট জানাইয়া দেওয়া হইল যে, কাহারও বীরত্ব বা কাহারও বুদ্ধি-পরামর্শ-পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় নাই। উহা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার মদদেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাই গনীমত সম্ভারের মালিক আল্লাহ্ই এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নায়েব। তাই যেভাবে আল্লাহ তদীয় রাসূল (স) মারফত হুকুম দিবেন, ঠিক সেইভাবেই উহার বিলি-বণ্টন হইবে। মুসলমানদের কাজ হইল, আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া নিজেদের পরস্পরিক সম্পর্ক— সৌহার্দ বজায় রাখিয়া নিজেদের মন-মর্জি ও অভিমত বিসর্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই নির্দেশিত পথে চলা, সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত লাভে সচেষ্ট থাকা (দ্র. তাফসীরে উছমানী, সূরা আনফালের প্রথম পাদটীকা)। তারপর ঐ সূরা আনফালেরই ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যাহা লাভ কর উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের। যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ এবং তাহাতে যাহা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান" (৮ ঃ ৪১)।

বিনা যুদ্ধে যে সমস্ত সম্পদ শত্রুপক্ষের দখল হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মালিকানাধীনে আসে, আল-কুরআনের ভাষায় উহাই হইতেছে 'ফায়'। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَارِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। আল্লাহ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৫৯ ঃ ৬)।

এই ফায় ব্যয়ের খাতসমূহও আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন পরবর্তী আয়াতেঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنَ السَّبِيْلِ.

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র, তদীয় রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের" (৫৯ ঃ ৭)।

উহার উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন ঐ আয়াতের শেষাংশে ঃ

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান, কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে" (৫৯ ঃ ৭)।

খায়বারের গনীমত বন্টন

খায়বার বিজয়ের পর যে দুর্গগুলি ও জমিজমা ভাগবন্টন করা হয় নাই, সহীহ রিওয়ায়াতসমূহে ঐগুলিকে 'ফায়' বলা হইয়াছে। ফাদাকের অর্ধেক জমি এবং ওয়াদিল কুরার এক-তৃতীয়াংশ বিনাযুদ্ধে চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয় বিধায় ঐগুলিকেও ফায় বলা হইয়াছে (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭)। বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত জমিজমাও ফায় ছিল (ঐ, পৃ. ২১৪)।

খায়বারের সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল ভূমি ও বাগ-বাগিচা। ভূ-সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পদ রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের নির্দেশানুযায়ী যোদ্ধাগণের মধ্যে ভাগবন্টন করিয়া দেন এবং ভূ-সম্পদ কেবল হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করেন (দ্র. ইমাম তাহাবী (শারহু মা'আনিল আছার, ১খ., পৃ. ৩১৬)।

উল্লেখ্য, হুদায়বিয়া অভিযানের সময় কেবল নিষ্ঠাবান ঈমানদার সাহাবীগণই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহযাত্রী হইয়াছিলেন, দুর্বল চিত্তের লোকজন নানা ছল-ছুতায় উহাতে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে। ঐ অভিযানকালেই খায়বার বিজয়ে প্রচুর গনীমত লাভের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ সময় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, খায়বারের গনীমত-সম্ভার কেবল

হুদায়বিয়ার সহযাত্রীদের মধ্যেই ভাগবণ্টন করা হইবে, অন্য কেহ ইহার অংশ পাইবে না (দ্র. ইযালাতুল খিফা, ১খ., পৃ. ৩৮)।

সুনান আবূ দাউদে ও মুসতাদরাক হাকেমে খায়বারের ভূ-সম্পদ বণ্টনের বিবরণ রহিয়াছে। মহানবী (স) খুমুস বাহির করার পর খায়বারের সমস্ত ভূ-সম্পদকে ৩৬ ভাগ করিয়া উহার অর্ধেক ১৮ ভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ১৮ ভাগ মুজাহিদগণের মধ্যে প্রতি ভাগ ১০০ অংশ করিয়া বিভক্ত করিয়া দেন (দ্র. সুনান আবূ দাউদ, ৩/৪১৩; হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২/১৩১)।

মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ১৫০০। তন্মধ্যে ৩০০ জন ছিলেন আরোহী। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক পদাতিককে এক ভাগ হিসাবে এবং প্রতি আরোহী সৈন্যকে দুই ভাগ করিয়া প্রদান করেন। এইভাবে ৩০০×২=৬০০ এবং বার শত পদাতিকের বার শত, মোট ১৮ শত ভাগ হইল (দ্র. বাযলুল মাজহূদ, ৪খ., পৃ. ১৪৬; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানু., ৩/ ৩৭২, ইফাবা)।

কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে শত্রু কবলিত এলাকা হইতে সম্পদ উদ্ধার

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধকে কূটনৈতিক কৌশল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। খায়বার যুদ্ধ জয়ের অব্যাহিত পরে এবং মক্কায় সেই সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বেই হাজ্জাজ ইব্ন ঈলাত নামক একজন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয করিলেন যে, মক্কার কাফিরদের কাছে তাহার প্রচুর সম্পদ রহিয়া গিয়াছে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিলে অন্যরা তো বটেই, তাহার নিজ স্ত্রীও সম্পদ ফেরত দিবে না। এমতাবস্থায় পূর্বাহ্নেই মক্কায় গিয়া কূটনৈতিক চাল না চালিলে তাহার সম্পদ উদ্ধারের কোনই পথ নাই। তিনি বলিলেন, আমাকে অনুমতি দেওয়া হউক, প্রয়োজনে কিছু উল্টাপাল্টা কথাও যেন আমি বলিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সেই অনুমতি দিলে তিনি সত্বর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

হাজ্জাজ বলেন, তারপর আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ছানিয়াতুল বিদায় পৌঁছিতেই কুরায়শের কয়েক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাত হইল। তাহারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিত না। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল, এই যে হাজ্জাজ ইব্ন ঈলাত! নিশ্চয় তাহার কাছে সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাহারা বলিল, হে আবূ মুহাম্মাদ! আমরা তো সংবাদ পাইয়াছি যে, ঐ ডাকাতটা খায়বার যাত্রা করিয়াছে, আর খায়বার হইতেছে ইয়াহূদী জনপদ ও হিজাযের সমৃদ্ধতম এলাকা। আমাদিগকে তাহার সংবাদ জানাও। হাজ্জাজ বলেন, আমিও এইরূপ শুনিয়াছি। আমার কাছে এমন আরও সংবাদ আছে যে, তোমরা তাহা শুনিলে আনন্দিত হইবে। তারপর সেই শুভ সংবাদটি কী জানিবার জন্য কুরায়শরা আমার উটের চারিপাশে ভিড় জমাইল। হাজ্জাজ বলেন, আমি বলিলাম, সে এমন শোচনীয় পরাজয়ই বরণ করিয়াছে যেরূপ পরাজয়ের কথা তোমরা

কোন দিন শুন নাই। তাহার সঙ্গী-সাথীরা শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে। মুহাম্মাদ তাহাদের হাতে বন্দী। মক্কাবাসীরা যাহাতে প্রকাশ্যে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যার প্রতিশোধ তিল তিল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে এইজন্য তাহারা নিজেরা তাহাকে হত্যা না করিয়া শীঘ্রই মক্কাবাসীদের হাতে হস্তান্তর করিবে। মক্কার কাফিররা এই সংবাদে উল্লাসে ফাটিয়া পড়িল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, শীঘ্রই তাহারা বন্দী মুহাম্মাদকে নিজেদের হাতের মুষ্টিতে পাইতে যাইতেছে।

আমি বলিলাম, মক্কায় ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকা আমার অর্থসম্পদ উদ্ধারে তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর এবং আমার খাতকদিগকে চাপ দিয়া আমার পাওনাগুলি উশুল করিয়া দাও! আমি খায়বারে সর্বাগ্রে পৌঁছিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পূর্বেই পরাজিত মুহাম্মাদ ও তাহার দলবলের মালপত্র কিনিয়া লইতে আগ্রহী। আমার কথায় তাহারা এতই উৎসাহিত হইল যে, অভাবনীয় স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহারা আমার পাওনাগুলি আদায় করিয়া দিল। তারপর আমি আমার সঙ্গিনীটির কাছে গিয়াও অনুরূপ বলিয়া তাহার কাছে রক্ষিত আমার অর্থ-সম্পদ তাড়াতাড়ি দিয়া দেওয়ার জন্য বলিলাম।

আমি তখন ব্যবসায়ীদের একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলাম। আমার মুখ হইতে প্রচারিত সংবাদ মক্কার আনাচে-কানাচে স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছিয়া গেল। নবী করীম (স)-এর চাচা আব্বাসের কানেও খবরটি পৌঁছিল। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং সাথে সাথে তাঁহার গোলামকে হাজ্জাজের নিকট পাঠাইয়া সঠিক সংবাদ আসলে কী তাহা জানিবার প্রয়াস পাইলেন। হাজ্জাজ বলিলেন, আবুল ফাদলকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে যে, আমি আসিলে যেন একান্তে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখেন। আমি যেই সংবাদ দিব তাহাতে তিনি খুশীই হইবেন। গোলাম ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ দিতেই আনন্দ-উৎফুল্ল আব্বাস তাঁহার বার্ধক্য ও রোগের কথা ভুলিয়া গিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তারপর একান্তে মিলিত হইয়া হাজ্জাজ তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদটি জানাইতে গিয়া বলিলেন, খায়বারপতির কন্যার সাথে আমি আপনার ভাতিজাকে বাসররত রাখিয়া আসিয়াছি। কৌশলে নিজের সম্পদ উদ্ধারের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতিক্রমে আমি এখানে এইরূপ প্রচার করিয়াছি। আমি চলিয়া যাওয়ার আগে কিন্তু এই কথা প্রচার করা যাইবে না। আপনি তিন দিনের আগে কোনক্রমেই ইহা কাহাকেও বলিবেন না।

তিন দিন পর বৃদ্ধ আব্বাস সুগন্ধি আতর মাখিয়া নক্শী শাল গায়ে দিয়া লাঠিতে ভর করিয়া রাজকীয় চালে ঐ মহিলা ও কুরায়শদের সম্মুখে কা'বা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কা'বাঘর তাওয়াফ করিলেন। আপন ভাতিজার এই দুর্দিনে আব্বাসের নিরুদ্বেগ আচরণ দর্শনে কুরায়শগণ বিস্মিত হইয়া এই ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা শুনিয়াছ তাহা যথার্থ নহে। প্রকৃত সংবাদ হইল, খায়বার বিজিত। বিজয়ী মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণের করতলগত সেখানকার তাবৎ সম্পদ। খায়বারের রাজকন্যার সহিত বাসররত অবস্থায় মুহাম্মাদকে রাখিয়া আসা হইয়াছে। হাজ্জাজ ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ-সম্পদ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল এবং আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে খায়বারের

পথে পাড়ি জমাইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কাফিরগণ বিমর্ষ হইয়া পড়িল এবং মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানগণের আনন্দের সীমা রহিল না (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ৩৬৭-৩৬৯; আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ২০২-২০৪)।

ইয়াহূদী নেতার কন্যার উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ

খায়বার বিজিত হইল। খায়বারের ইয়াহূদী নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাব, যে মক্কার কুরায়শ কুলকে, আরবের বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্র ও ইয়াহূদী গোত্রসমূহকে ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার এবং ইসলামকে চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মিটাইয়া দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, সে নিহত হইয়াছে। তাহারই কন্যা সাফিয়্যা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইলেন।

পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজনের নিহত হওয়ার ফলে হিংসা ও ঘৃণায় সাফিয়্যার মন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অতিশয় বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মনের গতি পরিবর্তনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে আনাসের মাতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। বিশেষ আদর-যত্নে থাকায় তাহার মনের পরিবর্তন ঘটিলে তিনি এক শুভ মুহূর্তে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রত্যাবর্তন পথে আস-সাহ্বা নামক স্থানে শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হইল। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। দাসত্বমুক্তিই ছিল তাঁহার মোহরানা। এইরূপ মোহরানা আদায় করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য জায়েয ছিল। হযরত সাফিয়্যা স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, বন্দিনী অবস্থায় আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। পিতা, ভ্রাতা ও কওমকে কতল করার দরুন তিনি আমার নিকট ঘৃণ্যতম মনে হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি বিমোহিত হইয়া পড়িলাম। আমার অন্তর হইতে হিংসা চিরতরে মুছিয়া গেল। এক্ষণে তিনি আমার নিকট সারা জাহানের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় (দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮২৭)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী এই প্রসঙ্গে লিখেন, "বলা বাহুল্য, হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে খান্দানের ধ্বংসের পর খান্দানের বাহিরে কাহারও স্ত্রী বা বাঁদী হইয়া থাকিতে হইত। তিনি ছিলেন খায়বারের রঈস-দুহিতা, তাহার স্বামীও বনূ নযীর গোত্রের রঈস ছিল। পিতা ও স্বামী দুইজনই নিহত। এমতাবস্থায় তাহার মন রক্ষা, মর্যাদা রক্ষা এবং বিষাদ দূরীকরণের ইহা ছাড়া আর কোন উত্তম উপায় ছিল না যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সহধর্মিনী ও জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করিলেন। তিনি তাহাকে বাঁদীরূপেও রাখিতে পারিতেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহার বংশকৌলিন্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে আযাদ করিয়া দেন, তারপর যথারীতি বিবাহ করিলেন। মুসনাদে আহমাদ ইব্ন হাম্বল-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তাহাকে স্বাধীন হইয়া নিজের পরিবারে চলিয়া যাওয়ার অথবা তাহাকে পতিরূপে বরণের মধ্যে কোন একটি প্রস্তাব বাছিয়া লওয়ার এখতিয়ার দান করেন। সদাচরণ, করুণা, বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়াও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক হইতেও তাঁহার এইরূপ আচরণ অত্যন্ত সঙ্গত ও যথার্থ ছিল। এই জাতীয় কর্মপদ্ধতির ফলে আরবগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও মোহিত

হইত। তাহারা বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিত যে, ইসলাম তাহার শত্রুদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি কিরূপ সদয় ও সহানুভূতিশীল! বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর সহিতও অনুরূপ আচরণ করা হইয়াছিল (দ্র. শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৪৯২, ৫ম সংস্করণ, আলীগড়)।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সহনশীলতা ও পরধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ইয়াহূদীদের ইসলাম বৈরিতা ছিল সর্বজনবিদিত। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে" (৫ ঃ ৮২)।

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন যেহেতু মুসলমানদের পথপ্রদর্শক, অমুসলিমদের অনেকেই এই কিতাবখানির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ نهى ان تسافر بالقرآن الى ارض العدو.

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিধর্মী শত্রুদের ভূমিতে কুরআনসহ গমন করিতে বারণ করিয়াছেন" (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২৭৬৯, কিতাবুল জিহাদ)।

শত্রুদের হাতে আল-কুরআনের অবমাননার আশঙ্কা থাকার কারণেই যে এই নিষেধাজ্ঞা তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইসলামে অন্য ধর্মের বা তাহাদের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করার অনুমতি নাই। তাই খায়বার যুদ্ধে তাওরাতের কয়েকটি কপি মুসলমানদের হস্তগত হইলে ইয়াহূদীরা সেইগুলি তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার আবেদন জানাইলে রাসূলুল্লাহ (স) সসম্মানে সেইগুলি ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন (দ্র. তারীখুল খামীস, ২খ., পৃ. ৬০)।

তারীখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল 'আরাব গ্রন্থের (পৃ. ১৭০) বরাতে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী ইয়াহূদী পণ্ডিত ডঃ ইসরাঈল ওয়েল্‌ফিন্সন-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

"এই ঘটনা থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারি যে, এইসব ধর্মীয় সহীফার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরে কোন পর্যায়ের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁর এই উদারতা ও সহনশীলতার বিরাট প্রভাব পড়ে ইয়াহূদীদের ওপর। তারা তাঁর এই বদান্যতা ভুলতে পারে না যে, তিনি তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে এমন কোন আচরণ করেননি যা দ্বারা তার অসম্মান হয়। এর বিপরীতে তাদের সেই ঘটনা বেশ ভালই মনে আছে যখন রোমানরা খৃ. পূর্ব ৭০ সনে জেরুসালেম জয় করে ঐসব পবিত্র সহীফায় অগ্নিসংযোগ করে এবং সেসব পদদলিত করে। ঠিক তেমনি ঈর্ষাকাতর ও উগ্র সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানরা স্পেনে ইয়াহূদীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালানোকালীন তাওরাতের সহীফাগুলোকে অগ্নিদগ্ধ করে। এই সেই বিরাট পার্থক্য যা ঐসব বিজয়ী (যাদের কথা একটু ওপরে বলা হল) এবং ইসলামের নবীর মধ্যে দেখতে পাই" (দ্র. নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু., পৃ. ৩২৭)।

হুনায়ন ঃ এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদেরই সমপর্যায়ের তায়েফের বনূ ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রীয় যোদ্ধা গোষ্ঠীর উপরই পৌত্তলিকতার শেষ রক্ষার দায়িত্ব বর্তাইল। মক্কার পতনে আশেপাশের গোত্রগুলি ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে দ্বিধামুক্ত হইল। তাহারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তায়েফের যোদ্ধাগোষ্ঠীর উপর উহার দারুণ প্রতিক্রিয়া হইল। মক্কার কুরায়শরা যাহা পারে নাই তাহাই তাহাদের বীর যোদ্ধারা পারে, এই কথা প্রমাণের জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মালিক ইব্ন আওফের নেতৃত্বে তাহারা মক্কার সমবেত মুসলিম শক্তির উপর আঘাত হানিবার শেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। সেনাপতির নির্দেশে যোদ্ধাগণ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র, পশুপাল সবকিছু লইয়া রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া আওতাস প্রান্তরে উপনীত হইল। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য শতায়ু রণবিশেষজ্ঞ দুরায়দ ইবনুস সিম্মাকেও একটি খাটিয়ায় শায়িত অবস্থায় সাথে লওয়া হইল।

গুপ্তচরের মাধ্যমে তায়েফবাসীদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও যাত্রার সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে মক্কা জয়ে আগত দশ হাজার যোদ্ধা ও মক্কার নবদীক্ষিত ও এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই এমন দুই হাজার সঙ্গীসহ ৮ হিজরীর ৬ শাওয়াল তারিখে হুনায়ন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণ

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার অমুসলিমদিগকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়াও আবূ জাহলের বৈমাত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন রাবী'আর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন (দ্র. মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৩৬)। মুসনাদের উক্ত বর্ণনায় ঐ ঋণের পরিমাণ ত্রিশ হাজার দিরহাম ছিল বলা হইলেও ইসাবায় ইমাম বুখারী প্রমুখাত বর্ণিত রিওয়ায়াতে ঐ ঋণের পরিমাণ দশ হাজার দিরহাম বলা হইয়াছে (সীরাতুন্নবী, শিবলী, ২খ., ৫৩৩, পাদটীকায়)। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার কাছে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র মওজুদ রহিয়াছে জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট যুদ্ধাস্ত্র চাহিলে সে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কি তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে চাহিতেছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) জানাইলেন, না, ধারস্বরূপ, ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তাসহ। তাহাতে সে সম্মত হইল এবং এক শত বর্ম ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অস্ত্র দিল (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ, পৃ. ৯৬-৯৭)।

বিজয় গর্বিত মুসলিম বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করিলেও তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও বিপুল অস্ত্রসম্ভার তাহাদিগকে বিজয় আনিয়া দিতে পারিল না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু উহা তোমাদের কোনই কাজে আসিল না এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদিগের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পলায়ন করিয়াছিলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফিরদের কর্মফল" (৯ ঃ ২৫-২৬)।

বস্তুত মুসলিম বাহিনী যখন ১০ শাওয়াল হুনায়নে উপস্থিত হইল তখন গিরিপথসমূহে পূর্ব হইতে ওঁৎ পাতিয়া থাকা দক্ষ তীরন্দাজগণ বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু করিল। মুসলিম বাহিনী এই অতর্কিত ও অভাবিত আক্রমণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দৌড়াইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। বার হাজার সৈন্যের মধ্যে বড়জোর দশ-বারজন রণাঙ্গনে রহিল। এক পর্যায়ে একা আল্লাহ্র রাসূলকে পর্বত প্রমাণ ধৈর্য ও হিম্মত সহকারে ময়দানে অবস্থান করিতে দেখা গেল। কেবল চাচা আব্বাস ও চাচাতো ভাই আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারিছ সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণে তাঁহাকে পিছনের দিকে টানিয়া রাখিতেছিলেন (জামি'উল উসূল, খ. ৮, পৃ. ৩৭০, কিতাবুল জিহাদ; সহীহ মুসলিম, ৬খ., হাদীছ ৪৬৬১; মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১/১৬৩; ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ৩/৮৯৫-৮৯৬; নাদরাতুন না'ঈম, ১/৫১৩)।

সীরাতবিদগণ হুনায়ন যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর এইরূপ বিপর্যয়ের বর্ণনা দিলেও সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) প্রমুখাত বর্ণিত রিওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكبينا على الغنائم ناستقبلنا بالسهام.

"আমরা যখন কাফিরদের উপর আক্রমণ চালাইলাম তখন তাহারা পরাস্ত হইয়া পিছনে হটিয়া যায়। আমরা যখন গনীমত-সম্ভারের উপর ঝাপাইয়া পড়িলাম তখন তীরের দ্বারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানানো হইল" (সহীহ বুখারী, হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গ; সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ২৪২, হাদীছ নং ৪৪৬৬)।

হুনায়ন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠপ্রদর্শনের রহস্য

জিহাদ হইতে পলায়ন করা মহাপাপ— শিরক ও নরহত্যার সমপর্যায়ের কবীরা গুনাহ। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূলকে রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া সহযোদ্ধাগণ হুনায়নের যুদ্ধ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। ইহার রহস্য কি? সহীহ মুসলিমে ইহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে। আবূ ইসহাক হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত বারা'আ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হুনায়নের যুদ্ধের দিন কি

আপনারা পলায়ন করিয়াছিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, না, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (স) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, বরং তাঁহার সঙ্গে তরুণরা ও অস্থিরচিত্ত ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন লোক যাহাদের হয় অস্ত্র একেবারে ছিল না অথবা নামমাত্র অস্ত্র ছিল তাহারাই হাওয়াযিন ও বনূ নযীরের অব্যর্থ তীরন্দাজদের তীরের সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া এইদিক সেইদিক হইয়া যায় এবং কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে চলিয়া আসে (দ্র. মুসলিম, হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গ, হাদীছ নং ৪৪৬৪-৪৪৬৫, ৬খ., পৃ.২৪০-২৪১)।

কিছু লোক শুধু এই উদ্দেশ্যে মুসলমান পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল যাহাতে ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া মুসলমানদের সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে অবস্থানকারী উম্মু সুলায়ম (রা) এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াই তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন ঃ

اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك.

"আমাদের ব্যতীত ঐ যে মুক্তি ও ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসীরা (আমাদের সহিত যুদ্ধে আসিয়াছে) উহাদের সকলকে হত্যা করুন। কারণ উহারাই আপনার পরাজয়ের হেতু" (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৫২৯, পুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকের যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গ)।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) লিখেন, ঐ সময়ে সকলেই পলায়ন করেন নাই, বরং মক্কার ঐ সকল লোক যাহাদের হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দান করা হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যকার পৌত্তলিকরা যাহারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, তাহারাই পলায়ন করিতে শুরু করে। এই অভাবনীয় পরাজয় এজন্য হইয়াছিল যে, শত্রুপক্ষ অতর্কিতে তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং মুসলিম বাহিনীতে মক্কার এমন লোকেরাও ছিল যাহাদের অন্তরে ইসলামের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নাই এবং তাহারা এই অপেক্ষায় ছিল যে, কখন মুসলমানদের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে এবং তাহাদের মধ্যে এমন নারী এবং শিশুও ছিল যাহারা কেবল গনীমত সম্ভারের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল (মুসলিম, গাযওয়া হুনায়ন প্রসঙ্গ, তথ্যসূত্র সীরাতুন্নবী, পৃ. ৫২৫, পাদটীকা)।

ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এমন লোকও হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ সাজিয়া যোগদান করিয়াছিল যাহার সঙ্কল্প ছিল নবী করীম (স)-কে সুযোগ বুঝিয়া আঘাত করা। তাহারা উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, শায়বা ইব্ন উছমান ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, আমি সংকল্প করিলাম যে, কুরায়শদের সহিত আমিও হুনায়নে যাইব এবং সুযোগ পাইলেই মুহাম্মাদকে হত্যা করিয়া কুরায়শগণের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আরব-আজম সকলেও যদি মুহাম্মাদের অনুসারী হইয়া যায় আমি কস্মিনকালেও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিব না। তারপর রণক্ষেত্রে গিয়া আমি মওকা খুঁজিতে লাগিলাম।

লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেলে মওকা বুঝিয়া আমি তরবারি বাহির করিয়া তাহা উত্তোলিতও করিলাম। এমন সময় একটি বিদ্যুৎঝলক আমার এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে চমকাইয়া উঠিল দেখিতে পাইলাম। ভয়ে আমি জড়সড় হইয়া নিজের দুই হাত দুই চক্ষুর উপর রাখিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম ধরিয়া ডাক দিলেন। তাঁহার নিকট ঘেঁষিতেই তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, যাও, দুশমনদের মুকাবিলা কর। মুহূর্তেই আমার মধ্যে এমন পরিবর্তন ও ভাবান্তর ঘটিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমার নিজের জীবন হইতেও প্রিয়তর মনে হইল। আমি অগ্রসর হইয়া তরবারি চালনা করিতে লাগিলাম। নিজের প্রাণের বিনিময়ে হইলেও রাসূলুল্লাহ (স)-কে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করাই যেন আমার প্রধান দায়িত্ব হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ও আনুগত্য ঐ পর্যায়ে উন্নীত হইল যে, তখন আমার পিতাকেও সম্মুখে পাইলে নির্দ্বিধায় তরবারি দ্বারা আমি তাহার মুকাবিলা করিতাম। যুদ্ধের পর যখন আমি তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন তাহাকে দেখিবার জন্য পাগলপারা হইয়া তাঁহার তাঁবুতে ছুটিলাম। তিনি তখন একাকী ছিলেন। তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, তুমি যাহা কামনা করিয়াছিলে তাহার তুলনায় আল্লাহ তোমার জন্য যাহা কামনা করিয়াছেন তাহাই উত্তম। আমি বলিলাম, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কান ইলাহ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল"। তারপর আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। জবাবে তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষতা করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে আমার দরাজ কণ্ঠে আমি 'হে আনসার সমাজ! হে সামুরা বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট লোকজন!! বলিয়া আহ্বান জানাইতেই চতুর্দিক হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়া লোকজন আসিয়া ত্বরিত গতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্বে সমবেত হইতে লাগিল। সামুরা বৃক্ষ বলিতে ঐ বৃক্ষকেই বুঝানো হইয়াছে যাহার তলায় হুদায়বিয়াব সন্ধির প্রাক্কালে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মরণপণ যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন এক শতজন আসিয়া সমবেত হইলেন তখন পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। খাযরাজীগণ অ্যন্ত দৃঢ়তার সহিত লড়িতেছিল। এতদ্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নবী করীম (স) বলিলেন ঃ الان حمى الوطيس। "তন্দুর এখন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে"।

شاهت الوجوه (কাফিরদের চেহারা ধূলি ধুসরিত হউক) বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্টি ধূলি ছুড়িয়া মারিলেন। সেই এক মুষ্টি ধূলি কাফিরদের প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে জয়যুক্ত করিলেন। জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) বলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম আকাশ হইতে কাল বর্ণের চাদরের মত কী একটা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যবর্তী স্থানে নিক্ষিপ্ত হইল। কালো বর্ণের পিপীলিকার

রূপে অসংখ্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হন এবং এইভাবে দুশমনদের পরাজয় ঘটে। ছাকীফ গোত্রের ৭০ ব্যক্তি এই যুদ্ধে নিহত হয়। তারপর আওতাসের দিকে আবূ 'আমর (রা)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে তাহাদের পতাকাধারী যুলফিকার এবং পরবর্তী পতাকাধারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাবী'আ ও দুরায়দ ইব্‌নুস সিম্মাও নিহত হয়।

তায়েফের পথে দুইটি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ

সামরিক দিক হইতে কৌশলপূর্ণ দুইটি কাজ তায়েফে সম্পন্ন করা হয়। একটি হইল সেখানে অবস্থিত আওফ ইব্‌ন মালিকের দুর্গ ধ্বংস করা, আর অপর কাজটি হইল ছাকীফ গোত্রের এবং তাহাদের সম্ভাব্য সাহায্যকারী হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ, যাহাতে ছাকীফদের সাহায্যার্থে তাহারা আগাইয়া আসিতে না পারে (দ্র. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস্-সাহীহা, ২খ., পৃ. ৫০৮)। তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী যুল-কাফফায়ন বিগ্রহটি ভস্মীভূত করিয়া আসার সময় সেখান হইতে মিনজানীক নামক কামান সদৃশী লোষ্ট্র নিক্ষেপক যন্ত্র ও ট্যাংক সদৃশ দাব্বাবা যন্ত্র লইয়া আসেন (দ্র. আসাহহুস্ সিয়ার, পৃ. ২৮৮)।

আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মিনজানীক ও দাব্বাবা দুইটি জারাশ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন হযরত খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)। অন্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) নিজ হাতে মিনজানীক নির্মাণ করেন (দ্র. কিতাবুল মাগাযী, ৩/৯২৭; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস-সাহীহা, পৃ. ৫০৯, পাদটীকায়)।

রাসূলুল্লাহ (স) তায়েফ অবরোধ করিলেন। হুনায়ন যুদ্ধে পরাজিত পৌত্তলিকগণ তাহাদের সর্দার আওফ ইব্‌ন মালিকের নেতৃত্বে দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িল। ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রাসূলুল্লাহ (স) মিনজানীক ও দাব্বাবা ব্যবহারের দ্বারা দুর্গ ধ্বংসের প্রয়াস পাইলেন। মিনজানীক দ্বারা দূর হইতে বিশালাকার শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করা যাইত। আর অনেকটা সিন্দুকের মত কাষ্ঠ নির্মিত দাব্বাবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু দুর্গমূলে পৌঁছিয়া শাবল ইত্যাদির সাহায্যে দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের কাজ করা যাইত। কিন্তু রণকুশলী তায়েফবাসীরা দুর্গাভ্যন্তর হইতে উত্তপ্ত লৌহশলাকা নিক্ষেপ করিয়া দাব্বাবায় অগ্নিসংযোগ করিতে থাকিলে উহাতে অবস্থান করা আর সম্ভব হইয়া উঠিল না । দাব্বাবা হইতে বাহির হইলেই তাহারা অব্যর্থ শর নিক্ষেপে যোদ্ধা সাহাবীগণকে হত্যা করিত। শেষ পর্যন্ত কুড়ি দিনের অবরোধের পর তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে হয়।

শত্রুদিগকে কাবু করার উদ্দেশ্যে তাহাদের দীর্ঘকালের পরিশ্রমে লালিত দ্রাক্ষাকুঞ্জসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হইলে দুর্গাভ্যন্তর হইতে অসহায়ের মত তাহারা তাহা প্রত্যক্ষ করে এবং তীব্র মর্মপীড়ায় ভুগিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাহাদের অনুনয়-বিনয়ে দয়াপরবশ হইয়া রহমতের নবী ঐ যুদ্ধাবস্থায়ও শত্রুদের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং উহা হইতে বিরত থাকেন (দ্র.

বায়হাকীর সুনানুল কুবরা, ৯/৮৪; কিতাবুল উম্ম, ৭/৩২৩; আস-সীরাতুন নাবাবিয়া আস্-সাহীহা, ২খ., পৃ. ৫০৯)।

দুর্গের বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, যে সমস্ত দাস দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিবে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার চমৎকার ফল ফলিল। পরবর্তী কালের বিখ্যাত সাহাবী আবূ বাকরাসহ কুড়িজন, মতান্তরে ২২জন দাস বাহির হইয়া আসিলেন এবং চিরতরে দাসত্ব মুক্ত হইয়া গেলেন (দ্র. মুসনাদ আবদুর রায্যাক, ৫/৩০১; ফাতহুল বারী, ৮/৪৬; বুখারী, ৫/১২৯)।

বাহ্যত তায়েফ অবরোধ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (স) প্রত্যাবর্তনকালে সহযোদ্ধা সাহাবীগণকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন কর ঃ

ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون.

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার এবং নিজেদের প্রভুর প্রশংসাকারী"।

এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! বানূ ছাকীফকে বদদু'আ করুন। তিনি দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَأْتِ بِهِمْ.

"হে আল্লাহ! ছাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং অনুগত করিয়া তাহাদিগকে আমার নিকট হাযির করুন" (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৭১-৪৭২)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, 'আল্লাহর দরবারে এই দু'আ কবুল হইয়াছিল। অথচ আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কতিপয় সাহাবীকে হত্যা করিয়াছে, এমনকি তাঁহার দূতকে পর্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের ঐ অপকর্মসমূহের পরও তিনি তাহাদিগকে বদদু'আ না করিয়া তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই তাঁহার আশীর্বাদ, ক্ষমা ও ঔদার্যের পরিচায়ক। তাঁহার প্রতি আল্লাহর অজস্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক' (দ্র. যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৩৫৭, বাংলা অনু.)।

হুনায়নের গনীমত-সম্ভারের অভূতপূর্ব বিলিবণ্টন

তায়েফ অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সদলবলে জি'রানায় ফিরিয়া আসিলেন। এখন পূর্বোল্লেখিত বিপুল সংখ্যক বন্দী ও গনীমত-সম্ভার বণ্টনের পালা। দশ-বার দিন পর্যন্ত তিনি হাওয়াযিনদের জন্য অপেক্ষা করিলেন এই ভাবিয়া যে, তাহাদের কেহ তাহার স্ত্রী-পুত্রকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতেও আসিতে পারে। কিন্তু না, কেহই আসিল না। অগত্যা রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে যোদ্ধাগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন (দ্র. ফাতহুল বারী, ৮/৩৮; 'উয়ূনুল আছার, ২/১৯৩)।

এতকাল দেখা গিয়াছে যে, গনীমত বণ্টনের সময় যুদ্ধে যোদ্ধাদের বীরত্ব ও অবদানের কথা বিবেচনায় রাখিয়া তাহা করা হইত। অনেককে তাহার অতিরিক্ত ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য অধিক গনীমত দান করিয়া উৎসাহিত করা হইত। এইবার হইল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আজীবন ইসলামের সহিত, ইসলামের নবীর সহিত, মুসলিম জাতির সহিত যাহারা বৈরী আচরণ করিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের জয়যুক্ত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াই তাহারা গনীমত সম্ভার হইতে অঢেল পরিমাণ লাভ করিল। সাধারণভাবে সৈনিকদের প্রত্যেকে যেখানে চারটি উট ও চল্লিশটি করিয়া ছাগল-ভেড়া পাইলেন, আর প্রতিজন অশ্বারোহী সৈন্য পাইলেন বারটি করিয়া উট ও ১টি করিয়া ছাগল-ভেড়া, সেখানে আবূ সুফ্য়ান ও তাহার দুই পুত্র ইয়াযীদ ও মু'আবিয়ার প্রত্যেকে পাইলেন এক শত করিয়া উট এবং চল্লিশ উকিয়া করিয়া রৌপ্য। হাকীম ইব্‌ন হিযাম দুই শত উট, হারিছ ইব্‌ন হিশাম, সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর, সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার মত আরও অনেকে ১০০টি করিয়া উট লাভ করিলেন। কুরায়শের বাহিরের আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসকেও ৫০টি উট দেওয়া হইল। সে তাহার কবিতায় এইজন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলে মহানবী (স) বলিলেন, যেভাবেই হউক আমার পক্ষ হইতে তাহার রসনা কাটিয়া দাও। সাহাবাগণ তাহার সন্তুষ্টিমত তাহাকে দান করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিলেন (বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল বারী ও যুরকানী, সীরাতুন-নবী, ইব্‌ন হিশাম, ৮খ., পৃ. ১৫৪)।

অপরদিকে দীর্ঘকাল অবধি যাহারা সুখে-দুঃখে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গ দিয়াছেন, প্রাণ বাজি রাখিয়া ইসলামের জন্য ইসলামের নবীর জন্য লড়িয়াছেন সেই পরীক্ষিত আনসার সাহাবীগণের ভাগে পরিমাণে কম পড়িল। ইহা তাহাদের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি করিল। তাহারা ভাবিলেন, মক্কাবাসী ও বিশেষত কুরায়শগণ মহানবীর স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-স্বজন হওয়ায় বুঝি তাহাদের অগ্রাধিকার লাভের কারণ। মদীনার আনসার সাহাবীগণের বিপুল আত্মত্যাগ এবং মহানবী (সা)-এর চরম দুর্দিনে তাঁহাকে সঙ্গদান বুঝি এখন অতীতের বিষয় হইয়া গেল। তাহাদের কথাবার্তায় সেই হতাশা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বুখারী বর্ণিত হাদীছে উহার সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার নবীকে হাওয়াযিনের বিপুল গনীমত-সম্ভারের অধিকারী করিলেন, আর তিনি তাহা হইতে কুরায়শদের কিছু লোককে এক শত করিয়া উট প্রদান করিলেন, তখন আনসার সম্প্রদায়ের কিছু লোক বলিতে লাগিলেন ঃ

يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطى قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم.

"আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে ক্ষমা করুন! তিনি কুরায়শদিগকে দান করিয়া চলিয়াছেন আর আমাদিগকে পরিহার করিতেছেন। অথচ আমাদের তরবারিসমূহ হইতে এখনও তাহাদের রক্ত ঝরিতেছে"।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আনসারদের অসন্তোষের কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরে আনা হইল। সংশয় নিরসনকল্পে তিনি লোক পাঠাইয়া চর্ম নির্মিত তাঁবুর নিচে তাহাদের

সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও সেখানে ডাকিলেন না। সকলে সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) আসিলেন এবং বলিলেনঃ তোমাদের পক্ষ হইতে আমি এইসব কি শুনিতেছি? তখন তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণ বলিলেন, আমাদের মধ্যকার প্রাজ্ঞগণ কিছু বলিতেছেন না, উঠতি বয়সের যুবকরাই এইরূপ বলাবলি করিতেছে (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২৯১২)।

সেই বলাবলি যে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল তাহার প্রমাণ বুখারীর ১৯১৫ নং হাদীছ যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ হুনায়ন যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক লোককে প্রাধান্য দিলেন, আকরা' ইব্ন হাবিস ও 'উয়ায়নাকে এক শত করিয়া উট দিলেন এবং আরবের সর্দার গোত্রের লোকদিগকে বেশী বেশী দান করিলেন। তখন এক ব্যক্তি এই পর্যন্ত বলিয়া ফেলিল যে, ইহা এমন একটি বণ্টন যাহাতে সুবিচার করা হয় নাই বা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখা হয় নাই। কেহ কেহ তো এই কথা পর্যন্ত বলিল যে, যখন বিপদ আসে তখন আনসারদিগকে আহবান করা হয়, আর যখন গনীমত বণ্টনের পালা আসে তখন স্বজাতির লোকজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আনসারদের এইরূপ অসন্তুষ্টি যে কেবল তাহাদের নব্য যুবকদের মধ্যে ছিল তাহা ঠিক নহে। কেননা সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা)-র মত পরীক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান নেতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আনসারদের এই অসন্তুষ্টির কথা তাঁহাকে অবগত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা! অন্যরা যাহা ইচ্ছা বলুক, তোমার কী অভিমত হে সা'দ? তিনি জবাব দিলেন, আমিও তো আমার সম্প্রদায়েরই একজন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নওমুসলিমরা যদি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিতে না পারিয়া উল্টাপাল্টা মন্তব্য করে তবে তাহা মানিয়া নেওয়া যায় এইজন্য যে, জাহিলিয়াতের সমাজ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবোধ এখনও তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কাছে মাল-দৌলত, উট, ছাগল ইত্যাদি হইতেছে প্রাধান্যের মাপকাঠি। কিন্তু পরীক্ষিত আনসারগণও যদি অনুরূপ ভুলে নিমগ্ন থাকেন, এইরূপ কথাবার্তা তাহাদের মুখ হইতেও বাহির হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহা ঔদ্ধত্য নয়, ভুল বুঝাবুঝি। তাই তাহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য আনসার নেতা উবাদা ইব্নুস সামিতের মাধ্যমে তিনি কেবল আনসারগণকে এক স্থানে সমবেত করিলেন। তারপর তিনি তাহাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা এইরূপ জবাব দিলে মহানবী (স) বলিলেন, হে আনসারগণ! দুনিয়ার এই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের জন্য তোমরা আমার প্রতি মনোক্ষুণ্ন? ইহা তো আমি কেবল সেই সকল লোককেই দিয়াছি যাহারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের অন্তরে এখনও ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় নাই। ইসলামের স্বপক্ষে তাহাদের অন্তর জয় করা কেবল ইহার উদ্দেশ্য, যাহাতে ইসলামের প্রতি বৈরিতা ত্যাগ করিয়া তাহারা আল্লাহর দীনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

হে আনসারগণ! তোমরা কি ইহা মানিয়া নিতে পারিলে না যে, লোকজনকে উট-ছাগল দিয়া আমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়াস পাইয়াছি, আর তোমাদের ইসলাম-নিষ্ঠার উপর আমি দৃঢ় আস্থা পোষণ করিয়াছি? তোমাদের কাছে ইহা কি গ্রহণযোগ্য নহে যে, লোকজন উট

ছাগল লইয়া তাহাদের ঘরে ফিরিবে, আর তোমরা ফিরিবে আল্লাহ্র রাসূলকে সঙ্গে লইয়া? আল্লাহ্র কসম! যে যে পথে যাউক না কেন, আমার পথ তো ঐটাই যে পথে আনসারগণ গমন করিবে। জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের সাথী।

আনসারগণ! আজ তোমরা তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছ। আচ্ছা বল দেখি, আমি কি তোমাদিগকে পথহারা বিভ্রান্ত অবস্থায় পাই নাই? আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে পথের সন্ধান দিয়াছেন। তোমরা কি শতধা বিচ্ছিন্ন ছিলে না? আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন। তোমরা কি অভাবগ্রস্ত ছিলে না? আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদিগকে অভাবমুক্ত ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথার মাঝে মাঝে সায় দিয়া তাহারা 'অবশ্যই, অবশ্যই' বলিতেছিলেন এবং তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবদানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়া যাইতেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলিলেনঃ তোমরা যথার্থভাবে বলিতে পার, যখন তোমাকে অপর সকলেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তখন আমরা তোমাকে সত্য নবী বলিয়া বরণ করিয়াছি। যখন সকলেই তোমাকে অপমান করিয়াছে, আমরা তোমাকে মর্যাদা দিয়াছি। যখন সকলেই তোমাকে দেশছাড়া করিয়াছে আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি। ফলে তুমি অভাবগ্রস্ত ছিলে, আমরা তোমার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিয়াছি!

হে আনসারগণ! তোমরা আমার অন্তর্বাস, আর অন্য সকলে আমার বহির্বাস। হে আল্লাহ! আনসারদিগকে রহম করুন! আনসারদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন! আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও রহম করুন!!!

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য শ্রবণে আনসারগণ অঝোর ধারায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্মশ্রু তাহাদের অশ্রুতে ভিজিয়া গেল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) প্রস্থান করিলেন এবং আনসারগণও প্রস্থান করিলেন (দ্র. আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৫-৩০১; সীরাতুন নবী, ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৫৯-৬০ ই.ফা.)।

বর্ধিত দান সাফল্য আনিয়াছিল

ড. আকরম যিয়া উমারী বলেন, সর্দারদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তরূপ দান ঐ সমস্ত সর্দার ও তাহাদের অনুসারিগণকে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে তাহারা উত্তম ও নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে ইসলামের জন্য লড়িয়াছেন, জানমাল দিয়া ইসলামের সেবা করিয়াছেন, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী তারপরও বৈরী-ভাবাপন্ন ছিল, যেমন ইব্ন হাযম বলিয়াছেন (দ্র. জাওয়ামিউস সীরা , পৃ. ২৪৮)। আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) পরবর্তী কালে তাঁহার দশটি সন্তানসহ ইয়ারমুকের যুদ্ধে লড়িয়াছিলেন (দ্র. তাবাকাত, ৭/৩৭; ইসতী'আব, ১/১০৩; ইসাবা, ১/৫৮; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস-সাহীহা, পৃ. ৫১২)।

হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের আগমন ও বন্দীমুক্তি

গনীমতের বিলি-বন্টন সম্পন্ন হইলে বিলম্বে হাওয়াযিন গোত্রের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের হৃত সম্পদ ও বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল ও বন্দীদের মধ্যে কোনটি তোমাদের নিকট অগ্রগণ্য? তাহারা বন্দীদের কথা বলিলে তিনি বলিলেন, আমার ও বনী মুত্তালিবদের ভাগে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদিগকে আমি মুক্তি দিতে পারি। অন্যদের দায়িত্ব আমি নিতে পারি না, তবে সুপারিশ করিতে পারি মাত্র। সেইমতে তিনি সুপারিশ করিলে ছয় হাজার বন্দী একত্রে মুক্তি লাভ করিল। আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস তাঁহার নিজের ও তামীম গোত্রের এবং উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন তাঁহার নিজের এবং নিজ গোত্রের বহু ফাযারীর ভাগে পড়া বন্দীদিগকে তারপরও মুক্তি দিতে অনীহা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে পরবর্তীতে একটির বদলে ছয়টি করিয়া বন্দী দানের ওয়াদা দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (দ্র. সীরাতুন নবী, ইব্‌ন হিশাম, ৮/১৫০-১৫১, বঙ্গানু.)।

মূতার যুদ্ধঃ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই

ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সমস্ত যুদ্ধ ছিল পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল খৃস্টানদের বিরুদ্ধে। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই ছিল খৃস্ট জগতের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। এইজন্য ইহার একটি ভিন্ন তাৎপর্য রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র দিয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযসহ অনেক রাজন্যবর্গের নিকট দূত প্রেরণ করেন। একটি পত্র তিনি রোম সম্রাটের অধীনস্ত বুসরার শাসক শুরাহবীল-এর নিকটও প্রেরণ করেন তদীয় দূত হারিছ ইব্‌ন উমায়র আল-আযদী (রা)-র মাধ্যমে। শুরাহবীল কূটনৈতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করিয়া ঐ দূতকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। ইসলামের ইতিহাসে উহাই ছিল কোন দূত নিহত হওয়ায় প্রথম ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ইহার সমুচিত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধটির গুরুত্ব পরিমাপের জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজে ছানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া এই বাহিনীকে বিদায় দিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে সেনাপতির হাতে পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও সীরাতবিদগণ এই যুদ্ধটিকে গাযওয়ার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

সেনাপতির আসনে গোলামঃ ইসলামী সাম্যের নমুনা

রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে পতাকা বাঁধিয়া যাঁহার হস্তে এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিলেন তিনি যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্তদাস। এত বড় বড় বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ এই যুদ্ধে সাধারণ সৈনিকরূপে যোগদান করিলেন, কিন্তু

রাসূলুল্লাহ (স) সেনাপতি নির্বাচিত করিলেন এই যায়দকে। কুরায়শ বংশীয় আরব নেতাগণের কেহ এইজন্য অসন্তুষ্ট হইলেন না। রাসূলুল্লাহ (স) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন ঃ "যায়দ শহীদ হইলে তারপর জা'ফার ইব্ন আবী তালিব এবং সেও শহীদ হইলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে" (দ্র. ফাত্হুল বারী, ৭/৫১০; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩/৪২৮)।

মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঃ বাহিনীর সফর দীর্ঘ, মুকাবিলা করিতে হইবে রোমক শক্তির সহিত। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে জীবন বাজি রাখিয়া মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হইল। বাহিনী রওয়ানা করার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন ঃ তোমরা হারিছ ইব্ন উমায়রের বধ্যভূমিতে পৌঁছিয়া প্রথমে তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা সাড়া দেয় তবে তো উত্তম, নতুবা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্র নামে আল্লাহর রাহে ঐ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে যাহারা আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়াছে। বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। খিয়ানত করিও না। কোন শিশু, নারী বা অতি বৃদ্ধকে হত্যা করিও না। সংসার বিরাগী কোন সাধুকে হত্যা করিও না। খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ কাটিও না। কোন ইমারত ধ্বংস করিও না (দ্র. সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১১)।

লক্ষণীয় যে, একটি অমানুষিক বর্বরতার জবাব দেওয়ার জন্য প্রেরিত বাহিনীকেও রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত মানবতা বিরোধী ও সভ্যতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত মা'আনে পৌঁছিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, স্বয়ং রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীসহ নিকটেই বালকা অঞ্চলের মাআবে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। লাখম, জুযাম, বালকীন প্রভৃতি আরব বংশোদ্ভূত খৃস্টান গোত্রের আরও এক লক্ষ সৈন্য তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। বিদেশ বিভূঁইয়ে মাতৃভূমি হইতে প্রায় হাজার মাইলের দূরত্বে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন হইবে কিনা তাহা রীতিমত চিন্তার ব্যাপার ছিল। তাই মুসলিম বাহিনী দুই দিন পর্যন্ত নিবৃত্ত রহিল। অনেকের ধারণা ছিল, পরিস্থিতির সঠিক চিত্র রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবগত করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর এক বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হইল। তিনি বলিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! যে বস্তুটির জন্য আপনারা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নিঃসন্দেহে উহাই আপনাদের পরম কাম্য। তাহা হইতেছে শাহাদাত। আমরা সংখ্যাশক্তি বা সংখ্যাধিক্যের জোরে যুদ্ধ করি না। আমরা কেবল এই দীনের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই যুদ্ধ করি যাহা দ্বারা আল্লাহ আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। সুতরাং অগ্রসর হউন! আমাদের জন্য দুইটি মঙ্গলের একটি অবশ্যম্ভাবী ঃ বিজয় অথবা শাহাদাত।

তারপর অগণিত শত্রুসৈন্যের ভীতি সকলের মন হইতে কর্পূরের মত হাওয়ায় মিশিয়া গেল। একে একে যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফার ইব্ন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা

(রা) বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হইলেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা পড়িয়া গেল দেখিয়া বানূ 'আজলান গোত্রীয় সাহাবী ছাবিত ইব্‌ন আরকাম (রা) পতাকা তুলিয়া ধরিয়া বুলন্দ আওয়াজে আহবান জানাইলেন, আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদগণ! একজন সেনাপতি নির্বাচিত করুন। লোকজন বলিয়া উঠিল, আপনিই আমাদের সেনাপতি। তিনি বলিলেন, এই গুরুদায়িত্ব আমি পালন করিতে পারিব না। তখন যোদ্ধাগণ খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া লইলেন।

সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করিয়াই খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা) যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে নূতনভাবে সৈন্য বিন্যাস করিলেন। তিনি মুকাদ্দামা বা অগ্রবাহিনীকে সাকা (পশ্চাৎবর্তী) বাহিনীরূপে এবং মায়মানা (ডানবাহিনী)-কে মায়সারা (বাম বাহিনী)-রূপে বিন্যস্ত করিলেন। শত্রুসৈন্যরা যখন তাহাদের সম্মুখে নূতন নূতন মুখ দেখিতে পাইল, তখন তাহারা সাহায্যকারী নূতন বাহিনী আসিয়া মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়াছে ভাবিয়া প্রমাদ গণিল। হযরত খালিদ সৈন্যবিন্যাস বজায় রাখিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার বাহিনীকে সরাইয়া আনিতে লাগিলেন। শত্রুরা মনে করিল মুসলমান সৈন্যগণ কৌশলে পিছনের দিকে গিয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নূতন কোন ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই তাহারাও পশ্চাদাপসরণ করিল, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহস পাইল না। কেবল ঈমানের বলে দুই লক্ষ শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়া এইভাবে মুসলিম বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিল (দ্র. ফাতহুল বারী, ৭/৫১৩; যাদুল মা'আদ, ২/১৫৬; আর-রাহীকুল মাখতূম, ১ম আরবী সং, ১৪০০ হি., পৃ. ৪৩৫-৪৪০)।

উক্ত যুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত তিনজন সেনাপতি ছাড়াও আরও নয়জন শহীদের নাম আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তদীয় যাদুল মা'আদে এবং মোট চৌদ্দজনের নাম ইব্‌ন হিশাম উল্লেখ করিয়াছেন। রোমক পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা না গেলেও এবং সৈন্যসংখ্যার তুলনায় তাহা খুব বেশী মনে না হইলেও তাহাদের পক্ষেও যে বেশ কিছু লোক হতাহত হইয়া থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা সেই দিন কেবল হযরত খালিদেরই হাতে একে একে নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া যাওয়ার কথা বুখারী শরীফেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সেই দিনের বীরত্বের জন্য তাঁহাকে 'সায়ফুল্লাহ্' (আল্লাহর তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেন (দ্র. 'ফাতহুল বারী, ৭/৫১২, হাদীছ নং ৬২৬-২৬৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে মাত্র আট বৎসরের সামরিক প্রশিক্ষণে মদীনাবাসিগণের বীরত্বের মান যে কী পরিমাণ সমুন্নত হইয়াছিল তাহা যতটুকু না এই অসম যুদ্ধে প্রমাণিত হয়, ততোধিক প্রমাণিত হয় যখন মূতা হইতে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিল তখনকার মদীনাবাসীদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া হইতে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) অগ্রসর হইয়া মদীনার উপকণ্ঠে মূতার মুজাহিদগণকে অভ্যর্থনা জানানো সত্ত্বেও একদল লোক তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাহাদের প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) অগ্রসর হইয়া তাহাদের এই অপরাধের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেনঃ "ইহারা

পলাতক নহে, ইহারা হইতেছে পুনরায় যুদ্ধে যোগদানে প্রস্তুত একটি দল। ইনশাআল্লাহ সুযোগমত পুনরায় উহারা শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে"।

তাঁহাদের এই পশ্চাদাপসরণ যুদ্ধের কৌশল মাত্র, আপত্তিকর কিছু নহে। ইব্ন হিশাম, ইব্ন ইসহাক প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা) একদা সালামা ইব্ন হিশাম ইব্ন আসের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সালামাকে যে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের সহিত সালাতের জামাআতে দেখা যাইতেছে না, ব্যাপার কী? জবাবে মূতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সালামার স্ত্রী জানাইলেন, আল্লাহ্র কসম! ঘর হইতে বাহির হইলেই লোকে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকারী বলিয়া খোঁটা দেয়, এইজন্য তিনি এখন ঘর হইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন-নবী, ৪খ., পৃ. ১৭-১৮)।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত প্রায় হাজার মাইলের পথ পাড়ি দিয়া যে মুসলিম বাহিনী সেই প্রবল শত্রুর দেশেই স্বল্প সংখ্যক লোক লইয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে তাহারা যে আর সেই উপেক্ষিত মরু আরব নহে, বরং প্রবল শক্তিধর এক বিরাট মানবগোষ্ঠী, তাহা এই যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হয়। মুসলিম বাহিনী এই প্রথমবারের মত একেবারে শত্রুর দেশে ঢুকিয়া তাহাদের সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের রণকৌশল ও শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করে। তাই মদীনার এক শ্রেণীর লোকের নিকট উহা তাৎপর্যবহ না হইলেও আল্লাহর রাসূল তাঁহার কৈশোরে সিরিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং রাসূল সুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে উহার তাৎপর্য ঠিকই অনুধাবন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রোমকদের সহিত অনুষ্ঠিত অসংখ্য যুদ্ধ এবং রোমক তথা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা মুসলমানদের হাতে বিজিত হওয়ার ঘটনা এই মূতার যুদ্ধের পরই সম্ভব হইয়াছিল। তাই দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জেনারেল আকবার খান এবং সাবেক ইরাকী জেনারেল মাহমূদ শীছ খাত্তাব মূতার যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। জেনারেল আকবর খান লিখেন ঃ

"মহানবী (স)-এর জিহাদ ঘোষণার খবর রোমানদের সম্মিলিত বাহিনীতে যখন পৌঁছে তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া বনূ হাদস্-এর শাখা বনূ গাযাম-এর উপর হয়। তারা তখনি যুদ্ধে যোগদান থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাতে অন্যান্য কবীলাও প্রভাবিত হয় এবং তারাও নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। ফৌজের এই সংখ্যাল্পতার কারণে রোমকরা যারা প্রথমেই পেছনে হটে এসেছিল, নিজেদের মোর্চায় চুপ মেরে যায়, এরপর যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে যায়। খালিদ (রা)-ও ময়দান শূন্য দেখে মদীনায় ফিরে আসেন।

"বাস্তব সত্য এই যে, সার্বিক অবস্থার পরিমাপ করা শুধু মহানবী (স)-এর মত যোগ্য ও দূরদর্শী অধিনায়কেরই কাজ ছিল। অনন্তর তাবূকের যুদ্ধ থেকে যা মূতার যুদ্ধের পরবর্তীতে সংঘটিত হয়-এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সেখানকার লোকেরা ইসলামের মুজাহিদবৃন্দের বীরত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাদের পরাজয় সেই পাকা ফলটির মত যা ছিল মুজাহিদবৃন্দের

কোলে পতনোন্মুখ। অনন্তর সেসব কবীলা কোনরূপ মুকাবিলা ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই তাবূক যুদ্ধের পর অনুগত হয়ে যায়" (দ্র. ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ৩৩২-৩৩৩)।

জেনারেল মাহমূদ শীছ খাত্তাব বলেন, এটি এক বাস্তব সত্য যে, পশ্চাদপসরণ পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাবার আশংকায় খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। আর পরাজয় এমন এক বিপদ হয়ে দেখা দেয় যা পরাজিতদের জন্য সাধারণত খুবই ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য মূতায় মুসলমানদের মামুলি ক্ষতি সেই সামরিক উপকারিতার তুলনায় নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর যে, এর দ্বারা রোমকদের সামরিক শক্তি তাদের শৃঙ্খলা ও সংগঠন এবং তাদের যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্যাদি পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের কাজে লেগেছে" (দ্র. আর-রাসূলুল কাইদ, আরবী, পৃ. ২০৬-২০৭; নবীয়ে রহমত, পৃ. ৩৩৫, বাংলা অনু.)।

তাবূক অভিযান

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত আরবের অনেক দোদুল্যমান গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনার নূতন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারিতেছিল না। তাহাদের সকলেই তীব্র কৌতুহল লইয়া মদীনার ইসলামী শক্তি ও মক্কার পৌত্তলিক শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিতেছিল। মক্কার পতনের পর তাহাদের সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং তাহাদের অনেকেই মদীনায় যথারীতি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ ও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। মদীনায় ইয়াহূদী শক্তি ও তাহাদের বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য বারবার মার খাওয়া ও দুই দুইবার নির্বাসিত হওয়ার ফলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। মূতার অভিযানে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও বর্ধিষ্ণু শক্তির পরিচয় লইয়া মদীনার উত্তর ও পূর্বদিকে অবস্থিত বিভিন্ন আরব বংশোদ্ভূত খৃস্টান গোত্রও সম্যক উপলব্ধি করিল যে, মদীনার ইসলামী শক্তি এখন একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি এবং উহা স্বয়ং আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত। তাই দেখিতে দেখিতে বনী সুলায়ম, আশজা, গাতাফান, বানূ যুবয়ান ও ফাজারা গোত্রের লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিল। এই সময় বায়যান্টাইনী ফৌজের একজন আরব বংশোদ্ভূত সেনাপতি মা'আন ও সিরীয় অঞ্চলের শাসক ফারওয়া ইব্ন আমর আল-জুযামীর ইসলাম গ্রহণ রোমক সম্রাটকে রীতিমত ভাবাইয়া তুলিল। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না যখন সম্রাট সমীপে দাঁড়াইয়া তিনি ইসলাম ত্যাগ নতুবা ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুর মধ্যে দ্বিতীয়টিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইলেন। রোমক সম্রাটের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইসলাম আর উপেক্ষণীয় শক্তি নহে, রীতিমত ইহা তাহার ও তাহার সাম্রাজ্যের জন্য একটি হুমকিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আবূ আমের রাহিব, যাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) রাহিব নহে ফাসিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, প্রথমে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করিলেও শীঘ্রই খোলস পরিবর্তন করিয়া খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া উত্তর সীমান্তের গাস্সানী গভর্নর, এমনকি শেষ পর্যন্ত রোমের সম্রাটের দরবার পর্যন্ত পৌছিয়া তাহাকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। প্রথম প্রথম রোমক সম্রাট এই ব্যাপারটিকে তত গুরুত্ব না দিলেও মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়ার পর

এখন আর তাহাকে গুরুত্ব না দিয়া উপায় ছিল না। সিরিয়া-আরব সীমান্তের আরব খৃস্টান গোত্রগুলি আনুগত্য পরিবর্তন করিয়া ঐ এলাকায় তাহার আধিপত্যকে অস্বীকার করিয়া বসায় মদীনার এই মুসলিম শক্তিকে আর উপেক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

নবম হিজরী সালে মদীনায় যেমন প্রাণান্তকর গরম পড়িল, তেমনি ভীষণ আকাল দেখা দিল। সেই আকাল যে কত তীব্র ছিল হাদীছ আশ্রিত তাফসীর বর্ণনায় ইমাম কাতাদা ও মুজাহিদের বর্ণনা হইতে তাহার চিত্রটি অধিত হইয়াছে এইভাবে ঃ একটি খেজুর দানা দুই ব্যক্তি ভাগ করিয়া খাইত। কয়েকজন লোকে মিলিয়া একটি খেজুর চুষিত, তারপর পানি পান করিয়া অন্যজনকে তাহা চুষিতে দিত। তারপর সেও চুষিয়া পানি পান করিত (দ্র. তাফসীর তাবারী, ১১/৫৫)।

মু'জাম আত-তাবারানীতে ইমরান ইব্নুল হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, আরবের খৃস্টানগণ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পত্রযোগে জানায় যে, মুহাম্মাদ (স)-এর মৃত্যু হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে লোকের মৃত্যু হইতেছে। আরব আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সময়। সংবাদ পাওয়ামাত্র সম্রাটের নির্দেশে চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল (দ্র. মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৬খ., পৃ. ১৯১)।

মদীনায় আগত নাবাতী সম্প্রদায়ের তৈল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে জানা গেল যে, হিরাক্লিয়াস একটি বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার অগ্রভাগ বাল্‌কা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সম্রাট সৈন্যদের এক বৎসরের বেতন-ভাতা অগ্রিম শোধ করিয়া দিয়াছেন (দ্র. তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৬৫; সীরাতুল মুসতাফা, ৩খ., পৃ. ৮৬)। ইব্‌ন সা'দ উহাকেই তাবূক অভিযানের কারণ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ইয়াকূবী বলিয়াছেন, জা'ফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এই অভিযান পরিচালিত হয় (দ্র. তারীখুল ইয়াকূবী, ২খ., পৃ. ৬৭)। কিন্তু ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) রোমকদের সহিত যুদ্ধের সঙ্কল্প করিলেন। কেননা উহারাই গোটা মানবজাতির মধ্যে তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং হকের দিকে দাওয়াতের সর্বাধিক হকদার ছিল। কেননা তাহারাই ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিল"।

নবম হিজরীতে নবুওয়াতের ২১ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নবী করীম (স)-এর আয়ু সমাপ্তির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। তাই বিশাল খৃস্টীয় সমাজের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার কাজটিও আল্লাহ সম্পন্ন করিবেন দীর্ঘ একুশ বৎসরের নৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়া। তিনি তদীয় উম্মতকে উন্নততর যে চরম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন সেই বাস্তব প্রমাণটিও বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরার কাজটি তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সর্বাধিক শক্তিধর খৃস্ট ধর্মাবলম্বী রোমক সম্রাট তথা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চরম অভাব-অনটনের মুহূর্তে ত্রিশ বৎসর মরণপণ মুজাহিদের ঈমানী মহড়া প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার দীনকে জয়যুক্ত করা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁহারই নেতৃত্বে তাহা ঘটাইয়া দেওয়াই যেন তাঁহার

অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল। নতুবা কিয়ামত পর্যন্ত লোকে বলিতে পারিত, দীন ইসলাম বিজয় মণ্ডিত হওয়ার ঘোষণা তো নবীর জীবনে কার্যকরী হইতে দেখা গেল না।

তাবূক অভিযানের দ্বারা দীনের বিজয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাই ঐ চরম সঙ্কটজনক মুহূর্তে আল্লাহ্র নবীর আনুগত্য অবলম্বনের মাধ্যমে যাহারা দীন বিজয়ী হওয়ার দৃশ্যটি বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা উহার অব্যবহিত পরেই নাযিল করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপ্রবণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল সঙ্কটকালে, এমনকি যখন তাহাদের একদলের চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তিনি তো উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১১৭)।

এই চরম দুর্দিন ও পরম আকালের অভিযান হিসাবেই উহা গাযওয়াতুল 'উসায়রা বা সঙ্কটকালীন যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (দ্র. সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৯/১২৯; ফাতহুল বারী, ৮/৮৪; সহীহ মুসলিম, ১/২৬-২৭, ৪১-৪২; নববী, শারহে মুসলিম, ১/২২১-২২৩; তাফসীরুল কুরতুবী, ৮/২৭৯)।

বস্তুত তাবূক অভিযানের আহবান ছিল একটা মহা অগ্নিপরীক্ষা। স্বর্ণ যেমন পোড়াইয়া উহার খাদ বাহির করিয়া ফেলা হয়, আসল স্বর্ণ টিকিয় থাকে, ঠিক সেইভাবে মহাসঙ্কটকালে প্রচণ্ড অগ্নিক্ষরা রৌদ্রের মধ্যে মরুভূমি পাড়ি দিয়া এত দূরের গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হওয়া এবং বিশ্বের সেরা শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ, বিশেষত এত আকালের সময় যখন বৎসরের একমাত্র ফসল খেজুর পাকিয়া আসিতেছিল, ঈমানের বলে বলীয়ানদের ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অন্য যে কোন যুদ্ধযাত্রার সময় যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) যাত্রাপথ ও গন্তব্যের কথা গোপন রাখিতেন, সেখানে এই যুদ্ধে যাত্রার সময় তিনি স্পষ্টভাবে গন্তব্যস্থলের কথা প্রচার করিয়া দিলেন। আল-ওয়াকিদীর ভাষায়, রাসূলুল্লাহ (স) গোত্রে গোত্রে তাঁহার দূতগণকে পাঠাইয়া লোকজনকে তাবূক যাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য ঘোষণা দিলেন (দ্র. কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৯০)। সাচ্চা ঈমানদারগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎসাহিত করিতে নাযিল হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হইল যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর" (৯ ঃ ৩৮)।

মুমিনদের প্রতি আহবান জানানো হইল ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"অভিযানে বাহির হইয়া পড় হাল্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে" (৯ ঃ ৪১)।

আল্লাহ ও রাসূলের এইরূপ উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়া প্রকৃত ঈমানদারগণ আল্লাহ্র কাছে জান-মাল বিলাইয়া দিতে অকুণ্ঠ চিত্তে আগাইয়া আসেন। বলা বাহুল্য, ঐ সময় রীতিমত কোন পেশাদার বাহিনী বা যুদ্ধযাত্রার কোন তহবিল ছিল না। দূরবর্তী সকলের জন্য বাহন ও অস্ত্রের জন্য বিরাট তহবিলের প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়া দিলেন ঃ "সঙ্কটকালীন সৈন্যবাহিনীকে যে সুসজ্জিত করিয়া দিবে তাহার জন্য রহিয়াছে জান্নাত" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, ৪/১১; ফাতহুল বারী, ৫/৩০৬)।

হযরত উছমান (রা)-এর দানের পরিমাণ সুনান আত-তিরমিযী (কিতাবুল ওয়াসায়া, ১২/১৫৩-১৫৪)-এর বর্ণনানুসারে, প্রস্তুতির সূচনাতে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা, অনুরূপভাবে বাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনীয় উট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ (দ্র. নাদরাতুন নাঈম, ১/৫২৩-৫২৪)।

স্বর্ণ ব্যতীত তাঁহার প্রদত্ত উট ও অন্যান্য সম্পদের তালিকায় ছিল ৩০০ উট ও আনুষঙ্গিক ব্যয়। শেষ পর্যন্ত তাঁহার দেওয়া বাহনের সংখ্যা দাঁড়ায় নয় শত উট ও ১০০ ঘোড়া (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, উর্দূ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩)।

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ২০০ উকিয়া (সাড়ে উনত্রিশ কিলোগ্রাম) রৌপ্য এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে তুলিয়া দেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহার ঘরে যাহা কিছু ছিল সবই লইয়া আসিলেন, এমনকি জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থও ঘরে রাখিয়া আসিলেন না। উমার (রা) তাঁহার সম্পদের অর্ধেক লইয়া আসিলেন। হযরত আসিম ইব্ন আদী (রা) ৯০ ওয়াস্ক (সাড়ে তের হাজার কিলো = সাড়ে তের টন) খেজুর আনিয়া জমা দিলেন। এইভাবে সাধ্যমত প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জিহাদ তহবিলে দান করিলেন।

অপরদিকে মুনাফিকরা অধিক পরিমাণে দানকারিগণকে লোক দেখানো দাতা এবং স্বল্প পরিমাণে দানকারিগণকে এক-দুইটি খেজুর দিয়া রোমক সম্রাটের সাম্রাজ্য জয়ের নেশায় মত্ত বলিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিল। সূরা তওবার ৭৯তম আয়াতে ঐ মুনাফিকদের জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হইয়াছে।

প্রকৃত মু'মিনদের সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যুদ্ধযাত্রার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে বাহন দানের দরখাস্ত করিলেন কিন্তু এত অধিক সংখ্যক লোককে দেওয়ার মত উট বা ঘোড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছিল না। অগত্যা তাঁহাদিগকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরত যাইতে হয়। অর্থনৈতিক দিক হইতে ও শারীরিকভাবে দুর্বলগণ যুদ্ধযাত্রায় আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত শামিল হইতে না পারায় অত্যন্ত মর্মবেদনা ও অপরাধবোধে ভুগিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَايُنْفِقُوْنَ.

"যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। উহাদেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না; উহারা অর্থব্যয়ে অসমর্থ জনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল" (৯ ঃ ৯১-৯২)।

মুনাফিকরা ছিল উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা নানা মিথ্যা অজুহাতে ছল-চাতুরী করিয়া যুদ্ধযাত্রা হইতে বিরত থাকিবার প্রয়াস চালাইল। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিলেন এইভাবে ঃ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ.

"আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তোমার অনুসরণ করিত। কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা অচিরেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বাহির হইতাম। উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ জানেন উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী" (৯ ঃ ৪২)।

মুনাফিকরা কেবল ওজরখাহি করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, অন্যরা যাহাতে তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যোগ না দেয় সেইজন্যও তাহারা পরিকল্পিতভাবে প্রচারণা শুরু করিয়া দেয়। এই সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বর্ণনা এইরূপঃ

قَالُوْا لاَ تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"তাহারা বলিল, গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তাহারা বুঝিত! অতএব তাহারা কিঞ্চিত হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ" (৯ ঃ ৮১-৮২)।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ধ্বংস

কোন জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর মুনাফিকরা হইতেছে অন্তর্ঘাতী শত্রু। ইহাদিগকে উপেক্ষা করা সমীচীন নহে। যতদূর সম্ভব শীঘ্র উহাদের কেন্দ্র ধ্বংস করিয়া ফেলাই উচিত। তাই নবী করীম (স) দ্রুত সেই দিকে মনোযোগ দিলেন। কিছু সংখ্যক মুনাফিক সুওয়ায়লিম নামক ইয়াহূদীর বাড়ীতে বসিয়া অতি সংগোপনে দল পাকাইতেছে এবং মুসলমানগণকে অভিযানে বাহির হইতে বাধা দিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি ঐ ইয়াহূদীর গৃহটি পোড়াইয়া দিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন (দ্র. সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪/২১৭-২১৮; বাংলা ভাষ্য, ৪খ., পৃ. ১৭১-১৭২)।

অবশেষে নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার (দ্র. সীরাতুল মুসতাফা, ৩খ., পৃ. ৮৬)। সাহাবী যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর বর্ণনামতে তখন তাঁহার সাথে ছিল ৩০,০০০ সহযোদ্ধা। ওয়াকিদী বলেন, তাঁহাদের মধ্যে দশ হাজার ছিলেন অশ্বারোহী। ফাতহুল বারীর বর্ণনা অনুসারে আবূ যার (রা) প্রমুখ বর্ণিত আছে যে, তাবূক অভিযানে ৪০,০০০ মুজাহিদ ছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ঐ দারুণ সঙ্কট ও তীব্র দাবদাহের সময় তাঁহাদের সংখ্যা ৩০,০০০ হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় উহাই ছিল সর্বাধিক সংখ্যক মুজাহিদের অভিযান। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, সমস্ত বাহিনী সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে তাহাদিগকে লইয়া মদীনা হইতে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী যু-খাশাব নামক স্থানে যান, তারপর সেখান হইতে তাবূকে যাত্রা করেন। আলকামা ইব্‌নুল ফাগওয়া আল-খুযাঈ ছিলেন তাঁহাদের পথ প্রদর্শক (দ্র. মাগাযী, ২/ ৯৯৯; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস-সাহীহা, ২/৫৩১)।

মদীনার প্রশাসন

রাসূলুল্লাহ (স) যে কোন অভিযানে নির্গত হওয়ার পূর্বেই মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে কোন একজন সাহাবীকে রাখিয়া যাইতেন। তাবূক অভিযানের দীর্ঘ অনুপস্থিতি কালে মদীনায়

তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা আনসারীকে রাখিয়া গেলেন। আহলে বায়তের দেখাশোনার জন্য হযরত আলী (রা)-কেও তিনি মদীনায় রাখিয়া গেলেন। মদীনায় হযরত আলী (রা)-এর উপস্থিতি মুনাফিকদের জন্য তাহাদের তৎপরতা চালাইবার পক্ষে বড় অন্তরায় হইল। তাই এই ব্যাপারে তাহারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া কোনমতে আলীও যাহাতে মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যান সেইজন্য বলাবলি করিতে থাকে যে, তাবূক সফরে আলী অপাংক্তেয় বিবেচিত হইয়াছেন; তাই তাহাকে নেওয়া হয় নাই। এইরূপ অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত হইয়া আলী (রা) মদীনার বাহিরে আল-জুরুফে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া এই বিষয়ে অবগত করিয়া তাঁহাকে তাবূকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্য জিদ ধরিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ না, বরং মূসা (আ) তূর পাহাড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমনকালে হারূন (আ) যখন স্বীয় গোত্রে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন তোমার মর্যাদাও সেইরূপ (দ্র. বুখারী, আস-সহীহ, ৫/১৭; মুসলিম, -আস-সহীহ, ৭/১২০-১২১)।

বিভিন্ন জিহাদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিনজন পরীক্ষিত সাহাবী এবং ৮২জন বেদুঈন যাহারা বনী গিফার গোত্রের এবং ওজরগ্রস্ত অসহায় শ্রেণীর ছিলেন, মদীনায় রহিয়া যান (দ্র. ফাতহুল বারী, ৮/১১৪; তাবারী, তাফসীর, ১১/৫৮)। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার দলভুক্তদের কথা আলাদা। তাহারা সংখ্যায় ছিল প্রচুর (দ্র. ফাতহুল বারী, ৮/১১৯)। তাহাদের মুনাফিক কুখ্যাতির জন্য উহারা ধর্তব্যের বা আলোচনার মধ্যে ছিল না। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামার মত তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন লোককে স্থলবর্তী করিয়া এবং আল্লাহ্র সিংহ হযরত আলী (রা)-কে মদীনায় রাখিয়া না গেলে মুনাফিকদিগকে লইয়া ইব্ন উবাই মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দীর্ঘ ৫০ দিনের অনুপস্থিতির সুযোগে কী তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটাইয়া বসিত কে জানে! যুদ্ধ বা অভিযানকালে মদীনা প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে বহাল রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সেই সম্ভাব্য অঘটন হইতে মদীনাকে রক্ষা করিলেন।

যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহারা যদি শক্তি বর্ধক না হইয়া ক্ষতিকারক হয়, তবে তাহাদিগের সঙ্গে রাখা অত্যন্ত বিপদজনক। যুদ্ধে মুসলমানদের সেই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যখন প্রথম শত্রুর আক্রমণের মুখে থাকা অবস্থায় ৩০০ লোক লইয়া মুনাফিক সর্দার ইব্ন উবাই চলিয়া গিয়াছিল। বনী মুসতালিকের যুদ্ধে সাথে থাকিয়া তাহারা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধাইবার পাঁয়তারা করিয়াছিল এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের প্রয়াস পাইয়াছে।

তাই যখন এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল যে, এত তাগিদ সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তাবূক অভিযানে যোগ না দিয়া পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তখন তিনি বলিলেন ঃ ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। যদি তাহাদের যোগদান মঙ্গলজনক হইয়া থাকে তবে আল্লাহ তাহাদিগকে অচিরেই তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। আর যদি তাহার অন্যরূপ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ তাহাদের অনিষ্ট হইতে তোমাদিগকে বাঁচাইলেন। সত্য সত্যই সাহাবী আবূ খায়ছামা (রা) পরবর্তীতে গিয়া বাহিনীতে যোগ দেন (দ্র. আল-মুসতাদরাক, ৩/৫০-৫১; মীযান, ১/৩০৬)।

অনুরূপভাবে হযরত আবূ যার (রা) তাঁহার উট অচল হইয়া পড়ায় যখন পিছনে পড়িয়া গেলেন তখন স্বীয় সরঞ্জামাদি আপন পিঠে বাঁধিয়া বহন করিয়া শেষে পদব্রজে একাকী গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইলেন (দ্র. কিতাবুল মাগাযী, ৩/১০০৮-১০১৫; খাসাইসুল কুবরা, ২/১০৯)।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর রাসূলুল্লাহ (স) তদীয় ত্রিশ হাজার আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীসহ যখন তাবূকে উপনীত হইলেন তখন রোমক সম্রাট বা তাহার অধীনস্থ কোন রাজ্যের গভর্নর বা সেনাপতি কেহই তাহাদের মুকাবিলায় অগ্রসর হয় নাই। দীর্ঘ কুড়ি দিন সেখানে সদলবলে অবস্থান করিয়া তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যাওয়া-আসায় পূর্ণ ৩০ দিন অতিবাহিত হয় (দ্র. মাওয়ারিদুয যামআন ইলা ফাওয়াইদি ইব্ন হিব্বান, পৃ. ১৪৫)।

তাবূকে যুদ্ধ না হইলেও উহার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে আরব খৃস্টান গোত্রগুলি এতদিন রোমক সম্রাটের ছায়াতলে স্বস্তিবোধ করিতেছিল তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল যে, রোমক সম্রাট নূতন ইসলামী শক্তির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে আগ্রহী নহে। তাই তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধা রহিল না, বরং নূতন শক্তির সহিত সম্পৃক্ত হওয়াকেই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল। আয়লা, আযরূহ, মাকান্না প্রভৃতি অঞ্চলের সর্দারগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিরাপত্তা লাভ করিল। দূমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দিরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রেরিত সেনাপতি খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ মাত্র ৪২০ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ গিয়া আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। জিয্য়ার বিনিময়ে উকায়দির নবী করীম (স)-এর সহিত সন্ধি করেন (দ্র. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিয্য়া, ৬/৭৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ৭/৬১)।

মোটকথা, তাবূক অভিযানে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পথ সুগম হয় এবং সেই ভাবী বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। একের পর এক প্রতিনিধি দল আসিয়া ইসলাম গ্রহণ ও আনুগত্যের শপথ করিতে থাকে বলিয়া ঐ বৎসরটি প্রতিনিধিদল আগমন বৎসররূপে অভিহিত হয়। এই প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ষাট, মতান্তরে ১০০ (দ্র. ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩/৫৯৯)।

মসজিদে দিরার ধ্বংস

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক অভিযানে নির্গত হওয়ার পূর্বেই মদীনার মুনাফিকগণ মসজিদে নববী হইতে কিছু দূরে ঐ মসজিদেরই বিকল্প একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া কৌশলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমোদন আদায় করার লক্ষ্যে তাঁহার নিকট ঐ মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য আবেদন জানায়। অভিযান জনিত ব্যস্ততার জন্য এবং সম্ভবত এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন নির্দেশ না পাওয়ায় নবী করীম (স) পরে দেখা যাইবে বলিয়া সেখানে যাওয়া স্থগিত রাখেন। তাবূক অভিযানকালে মুনাফিকদের স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া গেল। তারপর আর তাহাদের মনোরঞ্জনেরও কোন অবকাশ রহিল না। এইদিকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঐ তথাকথিত মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহার রাসূলকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন (দ্র. ৯ : ১০৭)।

তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাবূক অভিযান হইতে ফিরিয়াই উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের সাদাকা গ্রহণ করিতে, তাহাদের জানাযা পড়িতে, তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে এবং কোন যুদ্ধে তাহাদের আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও তাহাদিগকে সাথে লইতে তাঁহার নবীকে নিষেধ করিয়া দিলেন (দ্র. ৯ ঃ ৮০, ৮৩, ৮৪)। এইভাবে মুসলিম সমাজ মুনাফিকদের অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পাইল।

কঠোর সাধনা

হিজরী ২ সালের ১৭ রমযানে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া নবম হিজরীর রজব মাসের তাবূক অভিযান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধ অভিযানগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহা হইল তাঁহার সংগ্রাম সাধনার কঠোরতা। বদর ও তাবূকের মত গুরুত্বপূর্ণ বরং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দুইটি অভিযানই রমযান মাসে এবং কঠিন খরতাপের মধ্যে পরিচালিত হয়। খন্দক ও তাবূকে যাত্রার সময় অনটন ছিল সীমাহীন। খন্দক যুদ্ধের সময় পাথর কাটিয়া পরিখা খননের সুকঠিন কর্মটি করার সময় সাহাবীগণ যখন তাহাদের পেটে উপবাস জনিত কারণে পাথর বাঁধার দৃশ্য দেখাইলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিজ পেটে বাঁধা দুইটি পাথর তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। ঐ সময় বিশাল একটি শিলাখণ্ড যখন কোনক্রমেই ভাঙ্গা যাইতেছিল না তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘটনাটি জানাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, তিন দিন ধরিয়া আমরা কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায়ই আল্লাহর রাসূল (স) কোদাল হাতে লইয়া তিনটি আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া দিলেন (দ্র. মিশকাত, পৃ. ৪৪৮; তিরমিযীর বরাতে সীরাতুর রাসূল, ২খ, পৃ. ৩১৭)।

তীব্র দাবদাহের মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ শত মাইলের মরুপথ অতিক্রম করিয়া যুদ্ধযাত্রার মাধ্যমে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁহারই সঙ্গে সফর করিয়া যে কঠোর সহনশীলতার অনুশীলন করিলেন তারপর আর কঠোর ও কঠিন বলিয়া তাঁহাদের কাছে কোন কাজ ছিল না। এই কঠোর অনুশীলনই যে স্বল্পকালের মধ্যে পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা জয়ের জন্য মুসলিম বাহিনীকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই ব্রিগেডিয়ার গুলযার আহ্‌মদ বলেন, মহানবী (স) যে তীব্র খরতাপ ও শীতের মধ্যে অভিযানসমূহে সাহাবীগণকে রওয়ানা করাইয়াছেন এবং যেভাবে নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যগণকে অনুশীলন করাইয়াছেন উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সময় মানসিক ও দৈহিক শ্রম সর্বাধিক পরিমাণে করিতে হয়। বদর যুদ্ধের পর মুসলমান সৈন্যদিগকে দেখিলে কাফিরদের মধ্যে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার হইত (দ্র. সায়্যারা ডাইজেস্ট, লাহোর, রাসূল নম্বর, ২খ., পৃ. ২৪১)।

শত্রুদের গুপ্তহত্যা

আবূ আফক-এর হত্যাকাণ্ডও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিন্দাসূচক কবিতার মাধ্যমে সে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করিয়া লোকজনকে ক্ষেপাইয়া তুলিত। বদর যুদ্ধের পর দ্বিতীয় হিজরীর

শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স) সালিম ইব্ন উমায়র (রা)-কে তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ব হইতেই ঐ হতভাগাকে নিজের জীবনের মূল্যে হইলেও হত্যার সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবী করীম (স)-এর আদেশ পাওয়ামাত্র তিনি রওয়ানা হইলেন। গরমের রাত্রিতে সে অসতর্কভাবে নিদ্রামগ্ন ছিল। সালিম তাহার হৃৎপিণ্ড বরাবর তরবারি রাখিয়া সজোরে চাপ দিতেই তরবারি তাহার দেহ ভেদ করিয়া তাহার বিছানা স্পর্শ করিল। আল্লাহর শত্রু এক চীৎকার দিয়াই চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লোকজন দৌড়াইয়া আসিল বটে কিন্তু তখন আর করার কিছু ছিল না (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৯)।

কা'ব ইব্নুল আশরাফকে হত্যা

এই অভিযানের পরবর্তী শিকার হয় ইয়াহূদী নেতা কা'ব ইব্নুল আশরাফ। সেও কবি ছিল। ইসলামের নবীর বিরুদ্ধেই কেবল নহে, মুসলিম মহিলাদের মানহানিকর অশ্লীল কবিতাও সে রচনা করিত। বদরের যুদ্ধে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়া ও পরাজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছিলে সে মন্তব্য করিয়াছিল, তারপর পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে মাটির নীচই ভাল। তারপর নিহত কুরায়শ নেতাদের শোকগাথা রচনা করিয়া সে নিজেও কাঁদিত এবং অন্যদিগকেও কাঁদাইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াইবার প্রয়াস পাইত। সে মক্কার হারামে কুরায়শ নেতাগণকে লইয়া কা'বার গিলাফ ধরিয়া মুসলমানদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ গ্রহণ করে। একবার সে গোপনে কয়েকজন ঘাতককে নবী করীম (স)-কে হত্যার জন্য নিয়োগ করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করে। জিবরাঈল (আ) যথাসময়ে তাঁহাকে এই ব্যাপারে অবগত করিলে তাঁহারই সাহায্যে তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাহাকে হত্যার নির্দেশ দেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৫৯)।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছ যে কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করিবে? ঐ লোকটি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। ইকলীলে উদ্ধৃত হাকেমের রিওয়ায়াতে ইহার সহিত আরও বর্ণিত আছে, "এবং সে আমাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করিয়াছে মক্কার মুশরিকগণকে" (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৫৯; যুরকানী, ২খ., পৃ. ১০)।

মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আমি প্রস্তুত, তবে আমাকে প্রয়োজনে কিছু এইদিক সেইদিক কথা বলার অনুমতি দিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সেই অনুমতি দিলেন। অতএব তিনি একদিন কা'ব-এর সাথে সাক্ষাত করিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন, এই লোকটি সাদাকা-যাকাতের বায়না ধরিয়া ধরিয়া আমাদের অবস্থা কাহিল করিয়া দিতেছে। আর পারা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া কা'ব উৎসাহিত হইয়া বলিল, এই তো মাত্র শুরু, ভবিষ্যতে আরও কত কি দেখিবে। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা বলিলেন, লোকটির দলে ভিড়িয়া তো বিপদে পড়িয়াছি, এখন কিছু বলিতেও পারি না। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এখন আমার কিছু খাদ্য-শস্য প্রয়োজন। কিছু খাদ্য-শস্য আমাকে ধার দিন না!

এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে এক পর্যায়ে তাঁহার অস্ত্র বন্ধক রাখিয়া সে কিছু ধার দিতে রাজী হইল। নির্ধারিত দিন রাত্রে কয়েকজন সঙ্গীসহ তিনি তাহার বাড়ীতে গিয়া ডাক দিলেন। তাহাদিগকে তিনি পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন ছলে আমি তাহার চুল গুচ্ছ টানিয়া ধরিব, সেই সুযোগে তোমরা তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে।

সেইমতে কা'ব ইব্ন আশরাফ যখন বাহির হইয়া আসিল তখন তিনি তাহার মাথার সুগন্ধিযুক্ত কেশের প্রশংসা করিয়া উহা শুঁকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সে রাজী হইলে তিনি উহার ঘ্রাণ লওয়ার ছলে কেশগুচ্ছ সজোরে টানিয়া তাহার মাথা নত করিয়া দিতেই সঙ্গীরা তাহার গর্দান উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর তাহার ছিন্ন মস্তক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ.,পৃ. ২৬০)।

পরদিন ইয়াহূদীরা আসিয়া তাহাদের সর্দারের নিহত হওয়ায় অনুযোগ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ সে তো আজীবন আমাদের বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করিয়াছে। ইয়াহূদীরা হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যতে তাহারা এইরূপ আচরণ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লন।

আসমা ইয়াহূদীকে হত্যা

ইসলামের শত্রুদের গুপ্ত হত্যার তালিকায় প্রথম নামটি ছিল এক ইয়াহূদী নারীর। সেও কবি ছিল এবং তাহার নাম আসমা ইয়াহূদীয়া। তাহার কবিতার মাধ্যমে সে নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও উত্তেজনা ছড়াইত। বদর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যাবর্তন না করিতেই সে আবারও ঐরূপ কবিতা রচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিন্দা করিতে লাগিল। অন্ধ সাহাবী উমায়র ইব্ন আদী (রা)-এর তাহা আর বরদাশত হইল না। তিনি তাহাকে হত্যার সঙ্কল্প করিলেন। রাতের অন্ধকারে তিনি হাতড়াইতে হাতড়াইতে আসমার গৃহে উপনীত হইলেন এবং নিদ্রামগ্ন আসমার পার্শ্বে শায়িত শিশুদিগকে সরাইয়া তরবারির এক কোপে তাহার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে অবগত করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইজন্য কি আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ এইজন্য দুইটি ভেড়াও শিং গুতাগুতি করিবে না।

মুসান্নাফ হাম্মাদ ইব্ন সালামায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ নারী রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের প্রতি এতই বৈরী ভাবাপন্ন ছিল যে, মাসিক ঋতুস্রাবের রক্তমাখা নেকড়া মসজিদে নিক্ষেপ করিত। রাসূলুল্লাহ (স) উমায়র (রা)-এর এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়া বলেনঃ "আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অদৃশ্যে অজ্ঞাতে থাকিয়া সাহায্য করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে চাহিলে তোমরা উমায়রকে দেখ"। অন্ধ হইয়াও তিনি হাতড়াইতে হাতড়াইতে শত্রুর নিকট পৌঁছিয়া তাহার ঈমানী দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহাকে অন্ধ বলিও না, বরং বাহ্য দৃষ্টিতে সে অন্ধ হইলেও অন্তরের দিক হইতে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। ২য় হিজরীর রমযানের পঁচিশ

তারিখে তিনি এই কর্মটি সম্পাদন করেন (দ্র. যুরকানী, ১খ., পৃ. ৪৫৩; আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল, পৃ. ৯৪-১০৩; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২/১৮; উয়ূনুল আছার, ২/২৯৩; সীরাতুর রাসূল, ২/১৬৫-৬)।

আবূ রাফে' ইব্ন আবুল হুকায়ককে হত্যা

তাহার আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, তাহাকে সাল্লামও বলা হইত, কিন্তু আবূ রাফে' উপনামেই সর্বাধিক পরিচিতি ছিল। তাহার পিতার নাম ছিল আবুল হুকায়ক; তাই সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকায়ক ও আবূ রাফে' ইব্ন আবুল হুকায়ক উভয় নামেই তাহার পরিচিতি পাওয়া যায়। খায়বারের নিকট একটি দুর্গে সে বাস করিত। খন্দক যুদ্ধের জন্য কুরায়শ বা অন্যান্য গোত্রকে সংগঠিত এবং তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া এই ইয়াহূদী বণিকটি ইসলামের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বৈরিতার ব্যাপারে অর্থব্যয়ে সর্বদা অত্যন্ত তৎপর ও মুক্তহস্ত ছিল। কা'ব ইব্ন আশরাফের সে অন্যতম বন্ধু ও সহযোগী ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১০৭)।

মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে আবহমান কাল হইতেই সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল। কা'বের হত্যাকারীরা সকলেই ছিলেন আওস গোত্রীয়। তাই খাযরাজ গোত্রীয়গণ তাহারই সমপর্যায়ের অন্য ইয়াহূদী শত্রু আবূ রাফে'-কে হত্যা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের তাগিদ অনুভব করিলেন এবং সত্য সত্যই তাঁহার কাছে ইহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সেই অনুমতি দান করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৬২)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আতীকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল আবূ রাফে'-কে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তাহাদিগকে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (স) সতর্ক করিয়া দিলেন, সাবধান! কোন শিশু বা নারীকে যেন হত্যা না করা হয়।

বুখারীর হাদীছে আছে, সাহাবী বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বর্ণনা করেন, ৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের এক গোধূলি লগ্নে তাহারা খায়বারে গিয়া উপনীত হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সে একটি দুর্গে বসবাস করিত। দুর্গদ্বারে গিয়া তাহারা উহার ভিতরে প্রবেশের ফন্দি-ফিকির করিতেছিলেন। দলনেতা সাথীদিগকে একটু তফাতে ও আড়ালে রাখিয়া নিজেই আগে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেছেন এইরূপ ভান করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। এমন সময় দুর্গরক্ষী হাঁক দিল, ভিতরে কেহ ঢুকিতে চাহিলে ঢুকিয়া পড়, আমি কিন্তু ফটকদ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছি। অমনি তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষী তাহাদের নিজেদের লোক মনে করিয়া তাঁহাকে ঢুকিতে দিল। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেন, দ্বাররক্ষী একটি খুঁটির সাথে চাবিগুচ্ছ ঝুলাইয়া রাখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আবূ রাফে' দুর্গের অভ্যন্তরস্থ গৃহের দোতলায় বাস করিত। রাত্রে তাহার ঘরে রীতিমত জমজমাট মজলিস বসিত। মজলিসশেষে সকলে যখন নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেল এবং প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইল তখন দলনেতা আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক নির্দিষ্ট স্থান হইতে চাবিগুচ্ছ লইয়া একটি একটি করিয়া দরজা খুলিতে খুলিতে অন্ধকারে আচ্ছন্ন আবূ রাফের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া আবূ রাফে বলিয়া ডাক দিলেন।। আবূ রাফে 'কে' বলিয়া উঠিতেই তিনি তাহার উপর তরবারি চালাইলেন। কিন্তু তাহা অন্ধকারে তাহার গায়ে লাগিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। এইবার অন্যরূপ কণ্ঠে আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ রাফে! কি হইল? এ কিসের আওয়াজ? সে বলিল, এইমাত্র কে যেন আমার প্রতি তরবারি চালাইল! আবূ রাফের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হইতেই আবদুল্লাহ এইবার সুনির্দিষ্টভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালাইলেন। এইবার তরবারি তাহার দেহে লাগিল। আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক নিজে বর্ণনা করেন, তারপর তাহার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তরবারি তাহার পেটে ঠেকাইয়া আমি জোরে চাপ দিলাম। তরবারি তাহার পেট ভেদ করিয়া পিঠে গিয়া ঠেকিল। তারপর তাহার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া আমি একে একে দরজা খুলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া অন্ধকারের মধ্যে নামিতে গিয়া উপর হইতে পড়িয়া আমার পায়ের গোছার একটি হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি পাগড়ী খুলিয়া পা বাঁধিয়া আমি সঙ্গিগণকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়া সেই সুসংবাদ শুনাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে আমি আমার পা মেলিতেই তিনি উহাতে পবিত্র হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং আমি পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলাম (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৩৮; বুখারী, ২/৫৭৭)।

শত্রুদের সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করার মত এই সমস্ত শত্রু সর্দার ও বড় বড় কবি ও দলনেতাকে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করায় শত্রুপক্ষ দুর্বল ও নেতৃশূন্য হইয়া পড়ে। সেই যুগে এই কবিরা বর্তমান যুগের প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা পালন করিত। এই কবিদের কবিতা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া বিদ্বেষ ও উত্তেজনা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িত। তাই তাহাদিগকে নির্মূল করা ইসলামের স্বার্থে ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীগণ প্রাণের ঝুঁকি লইয়া তাই এই গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। গুপ্তহত্যার মাধ্যমে এই অপশক্তিকে নির্মূল না করিলে ইহারা আরও অনেক যুদ্ধ ও রক্তপাতের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। ইহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার পর মুসলমানগণ ও আল্লাহর রাসূল (স) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

The execution of the half dogen mwrked gews is generwler colled assaisination, became a muslim was sent secrethy to kill each of the criminals. The reason is almost tooobvious tobeed explanation. There were no police or law corerts al medina; some one of the followers of Mohammad must therefore be the executor of the sentance of death, and it was balter it should be done guetely, as the excenting of a man openlybefore his clan would have caused a braw and more bloodshed and

relliation, till the whole city had become mexcd up in the quared. If secret assasination isthe woed for such decds, secrcl assasinationwas necessway part of the internal government of medina. The man must be killed and best inthe war, in saying this I assume that muhammad was cognisant of the deed , and that it was nat merely a case at private vengeans;but in several instancer the cvidence that trece these execntions to Muhammads or der is either entirly wanting or is too doubt fue toclaine owr credence"

উহার সারকথা হইল, মদীনায় তখন কোন পুলিশ বা আদালত ছিল না যে, ঐ দুষ্কৃতকারীদের হত্যার আদেশ কার্যকর করিবে। তাই মুহাম্মাদ (স)-এর কোন না কোন সহচরকেই সেই দায়িত্ব পালন করিতে হইত। উহা প্রকাশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোত্রের সম্মুখে করিতে গেলে উহা হইত রক্তক্ষয়ী এবং গোটা শহর সেই দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়িত। চুপিসারে সেই কর্ম সমাপ্ত করা ছিল শ্রেয় ও যুক্তিসঙ্গত। নতুবা হিংসা-প্রতিহিংসার অনেক বিস্তার ঘটিত। উহা কোন ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ছিল না, উহা ছিল সময়ের এবং রাষ্ট্র ও জাতির প্রয়োজনে। সুতরাং গুপ্তহত্যার অপবাদ দিয়া উহার নিন্দা অযৌক্তিক (স্টাডিজ ইন এ মস্ক, পৃ. ৬৮)।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী ও সফলতম সমরবিদ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামরিক ও প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে হাদীছে দেফা'নামক প্রুস্তকের রচয়িতা জেনারেল আকবর খান প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্জিত তদীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁহার যুদ্ধসমূহের আলোচনাশেষে ইহার পর্যালোচনায় লিখেন ঃ

"হিজরতের পর তিনি সাতাশটি যুদ্ধ করেছেন এবং জিহাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ৩৫টি অভিযান বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছেন, আর এসবই করেছেন মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ততম সময়ে। এর ফল হয়েছে এই যে, বিরোধিতা ও বৈরিতার বিষবৎ ঝঞ্ঝা খতম হয়ে যায়। বিদ্রোহী ও উদ্ধত স্বভাবের লোকগুলো বিনীত ও ভদ্র হল, খুন পিয়াসী ও জানের দুশমন জীবন উৎসর্গকারীতে পরিণত হল। যেখানে কুফর ও শিরকের রাজত্ব ছিল সেখানে ইসলামের কূজন উত্থিত হতে লাগল। পশুত্ব ও বর্বরতার জায়গা দখল করল মহানবী (স)-এর মর্যাদা ও ভদ্রতা। তাহযীব ও তমদ্দুন তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বভাবজাত সম্পদে পরিণত হল। যেখানে বিশৃংখলা, বিভেদ আর অব্যবস্থাপনার জয়জয়কার চলছিল সেখানে কায়েম হল শৃংখলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। গোটা জীবনই রহমতে পরিণত হল, আর আরববাসী পরিণত হল দুনিয়াবাসীর হাদী ও শিক্ষকে।

"দৈনিক ২৭৪ বর্গমাইল হিসাবে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তার বিজয় অভিযান অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকে। মুসলমানদের জীবনহানি ছিল প্রতি মাসে একটি করে আর দুশমন পক্ষে অন্তত ১৫০ জন করে। দশ বছর পূর্ণ হল এবং মহানবী (স)-এর মিশন পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত

হল। তখন দশ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক এলাকা তাঁর অধীনে আর লাখো মানুষ দৃঢ়চিত্তে তাঁর অনুগত ভৃত্যে পরিণত! এত বড় বিজয়, এত বিরাট ও শানদার কৃতিত্ব, এত বড় সাম্রাজ্য দখল, অথচ মানুষের খুন ঝরল এত অল্প! কোন যুদ্ধে পরাজয় নেই, কোথাও নেই পশ্চাদপদতা, কোথাও অলসতা নেই, সব জায়গায় সামনে চলা আর অগ্রাভিযান, সর্বত্র সাফল্য আর সাফল্য। অধিকন্তু দুশমনের মুকাবিলায় সংখ্যাশক্তি হামেশাই কম, আসবাব-উপকরণ সর্বদাই স্বল্প! অতঃপর বিজয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত এখানেই থেমে যাচ্ছে না কিংবা তাঁর পবিত্র জীবনের পরিধিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না, বরং সামনে অগ্রসর হয় এবং দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নিয়ে যাবার পরও তা অব্যাহত থাকে। তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও তাঁর শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত এবং তাঁর পদাংক অনুসরণকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলে, এমনকি ইসলামী রাজত্ব এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করে। কোন সিপাহসালার, কোন বিজয়ী রাষ্ট্রবিদ, কোন কুশলী ব্যবস্থাপক, কোন সংস্কারক সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনার ফল তার দশ ভাগের এক ভাগও পেশ করতে পেরেছেন কি? পেরেছেন রেখে যেতে এমন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে চিরদিনের তরে স্থায়ী অনিত্য এমন কোন সুকীর্তি" (ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ৩৬২-৩)!

আধুনিক কালের একজন অভিজ্ঞ সমরবিদ যখন আলেকজান্ডার, মুসলিনী, হিটলার প্রমুখ বিশ্বজয়ী সমরবিদদের সহিত তুলনা করে তার এরূপ সিদ্ধান্ত পেশ করেন, তখন ইহার চাইতে অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রিগেডিয়ার গুলযার আহমাদ এই সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একা কিছু সংখ্যক লোককে এমন চমৎকার প্রশিক্ষণ দিলেন যে, এই ক্ষুদ্র দলটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শক্তি দ্বারা সুদৃঢ় রাষ্ট্র দৈনিক দুই শত চুয়াত্তর বর্গমাইল হারে বিস্তৃতি লাভ করিতে করিতে দশ বৎসরে রুশ এলাকা বাদে গোটা ইউরোপের সমান আয়তন লাভ করে। এই সময়ে মাত্র এক শত কুড়িজন ঈমানদার শহীদ হন। যুদ্ধ ইতিহাস পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং নবী করীম (স)-এর সীরাত হইতেও উহা প্রতীয়মান হয় যে, সৈন্যবাহিনীর লোকজনের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও যথার্থ প্রশিক্ষণ থাকিলে দুনিয়ার কোন শক্তি সেই বাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারে না (দ্র. সায়্যারা ডাইজেষ্ট, লাহোর, রাসূল নম্বর, ২খ., পৃ. ২৩১)।

জিয্য়া ঃ অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বিশ্বনবীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আশীর্বাদ

আল-কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ.

"যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্য যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না— তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্য়া দেয়" (৯ ঃ ২৯)।

তাফসীরকারগণের মতে, আরবী জাযা (جزى) শব্দ হইতে জিয্য়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জাযা অর্থ বিনিময়। ইহা যিম্মীদের প্রাণ রক্ষার বিনিময় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে (দ্র. যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ১খ., পৃ. ২৫২; আল-বায়দাবী, ১খ., পৃ. ৩৩১; রূহুল মাআনী, ১০খ., পৃ. ৭৮)।

আল-খাওয়ারিযমী-এর মতে, ফারসী کزيت-এর আরবী রূপ হইল জিয্য়া। উহার মানে কর (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১খ., পৃ. ৫৭৮)।

অমুসলিমদের নিকট হইতে সর্বপ্রথম এই জিয্য়া আদায়ের ঘটনা ঘটে হিজরী ৭ম সালে (৬২৮ খৃ.) যখন তায়মার অধিবাসিগণ ঐ কর দিতে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তায়মার ইয়াহূদী গোত্র বনূ আদিয়াকে জিয্য়ার বিনিময়ে জান-মালের নিরাপত্তা দান করিয়াছিলেন (রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি, ফরমানসমূহ, পৃ. ১৯৮; তথ্যসূত্রঃ তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৯; ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ৪৯; মাজমু'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা, পৃ. ৪১, নং ১৯)।

জিয্য়া আদায়ের দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ৮-৯ হি./৬৩০ খৃ. সালে। বাহরায়নের শাসক মুনযির ইব্ন সাওয়ার প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) সেখানকার ইয়াহূদী ও অগ্নি উপাসকদের নিকট হইতে এক মুআফিরী মূল্যমানের এক দীনার হিসাবে জিয্য়া আদায়ের নির্দেশ দিয়াছিলেন (দ্র. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ, পৃ. ৯৫; তথ্যসূত্র কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২১)।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবূক যাত্রার মনস্থ করেন, তখন হযরত কুদামা ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিয্য়া বাবৎ সংগৃহীত অর্থ লইয়া আসার জন্য মুনযিরের কাছে পাঠানো হয়। ঐ সময় অপর একজন মুসলিম শাসককেও তাহার এলাকা হইতে জিয্য়াস্বরূপ সংগৃহীত অর্থ আবূ হুরায়রার মাধ্যমে পাঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুনযির সেইমতে অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাবূক অভিযানের ব্যয় নির্বাহে এই অর্থ ব্যয়িত হয় (দ্র. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ , পৃ. ৯৬; বালাগে মুবীন, পৃ. ১৭৮)।

নাজরানের খৃস্টানদের উদ্দেশ্যে লিখিত ফরমানে জিয্য়ার পরিমাণ ও জিয্য়াদাতাদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হইয়াছে। উহা ইসলামের ইতিহাসে জিয্য়ার তৃতীয় ঘটনা (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রাবলী, পৃ. ১৮৮-৯; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১১১-৩)।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান জিয্য়া আদায়ের অন্যতম শর্ত। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বা অপারগ হইলে জিয্য়া আদায়ের উহার কোনই

অধিকার থাকে না। ইসলামী রাষ্ট্র কঠোরভাবে সেই দায়িত্ব পালন করিত। কখনও এই ব্যাপারে ব্যর্থ হইলে তাহারা কি করিতেন ইহার জবাব আরনল্ড নামক খৃস্টান লেখকের কলম হইতেই আমরা জানিতে ঃ

How rwgidlythe Mulsims observed the condificn of this ability to afford protection os well enidenced by an on cidenb in the Reign at theseeond cabiph. The Emperor Heraclius had raiced on enonmous army with which to concenteate all their energien on the impending en couhten the Arab general Abn Ubaida accordinghy,Wrole tothe gonernors as sthe congusred citees at Syria, or derring them to pay badk all Sigywh, that had been colleeted from the citis and wrote to the people saming "the agrcement betwen us was that we should prot protcet ypu, and as this is not now onour power, we refurn ypu all that we took" in accodanec with this order enormous sums were paid back out of the stali treasiry, and this chriltian called down blessing on the heads of the Muslims, saying May god give you rule over us again and make ypu gieforious ouer the Roman had it been the, they would not have guven es anything but would have taken all that remained with us, Arnold, Preacling of Islam PP, Go-61

সারকথা, মুসলমানগণ এই দায়িত্ব যে কি কঠোরভাবে পালন করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের আমলে সিরিয়ার একটি বিজিত এলাকায় রোমক সম্রাট বিরাট বাহিনী লইয়া আক্রমণ চালাইলে মুসলমানগণ যখন উহার প্রতিরোধকল্পে ব্যস্ত তখন সেনাপতি আবূ উবায়দা সিরিয়ার বিজিত এলাকার ঐ শহরগুলির শাসকগণকে আদায়কৃত জিয্য়া এই বলিয়া ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন, আমরা যেহেতু তোমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছি, তাই তোমাদের প্রদত্ত কর তোমরা ফিরাইয়া লও। ইহাতে বিমোহিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেখানকার খৃস্টান প্রজাগণ মুসলমান শাসকদিগকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া বলে, আল্লাহ তোমাদিগকে আবার আমাদের উপর বিজয়ী করুন। রোমক সম্রাট তো সর্বদাই আমাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছেন, কোন দিন উহা আমাদের কাছে ফিরাইয়া দেন নাই, বরং আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছন (দ্র. প্রীচিং অব ইসলাম, পৃ. ৬০-৬১)।

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য এই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্য ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি সমরনীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশলেও তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন তথা গোটা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

সারিয়্যা হামযা (রা)

হিজরী প্রথম বর্ষের রামাদান (মুতাবিক ৬২৩ খৃ. মার্চ) মাসে রাসূলুল্লাহ (স) তদীয় চাচা হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে ত্রিশজন মুহাজির সাহাবীকে এই অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নবী করীম (স) ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি শ্বেতবর্ণের পতাকা উক্ত বাহিনীর সেনাপতি হযরত হামযার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। হামযা (রা) উহা তাঁহার বাহিনীর পতাকাবাহক হযরত আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা)-এর হাতে তুলিয়া দেন। সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনকারী তিনশত কুরায়শের একটি কাফেলার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে এই বাহিনীটি প্রেরিত হইয়াছিল। কুরায়শ সর্দার আবূ জাহ্‌লও উক্ত কাফেলায় ছিল।

মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হইয়া লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈস নামক স্থানে উপনীত হইলে উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য মুখামুখী অবস্থান গ্রহণ করে। এমন সময় জুহায়না গোত্রের সর্দার মাজদী ইব্‌ন 'আমর আসিয়া উপস্থিত হন এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্য উভয় পক্ষকে অনুরোধ করেন। এই সর্দার যেহেতু উভয় পক্ষেরই চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন, তাই তাহার এই উদ্যোগ সফল হয় এবং যুদ্ধ আর সংঘটিত হয় নাই। সমুদ্র উপকূলের দিকে এই অভিযানটি পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া উহা সারিয়্যা সীফুল বাহ্‌র বা সমুদ্রোপকূলের সারিয়্যা নামেও খ্যাত (দ্র. আল-মাগাযী, ওয়াকিদী ১খ., পৃ, ৯; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৫৯৫; তাবাকাত ২খ., পৃ. ৬)।

জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত অভিযানকালে হযরত হামযা (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার নিজের এবং প্রতিপক্ষের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। কবিতাটির প্রথম দুইটি চরণ হইল ঃ

اَلاَ يَا لَقَوْمِىْ لِلتَّحَلُّمِ وَالْحَمْلِ + وَلِلنَّفْسِ نَقْصِ مِنْ رَأىَ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ.

"হে আমার জাতি! তোমরা অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা এবং আপন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ মতামত ও বাচালতা হইতে সাবধান হও"।

প্রত্যুত্তরে আবূ জাহ্‌লও একটি কবিতা আবৃত্তি করে। তাহার প্রথম দুইটি চরণ হইল ঃ

عَجِبْتُ لاَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ + وَبِالشَّاغِبِيْنَ بِالْخِلاَتِ وَبِالْبُطْلِ

"আমি এই বিদ্বেষ ও গোয়াতুর্মী প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়া যাই। অবাক হইয়া যাই বিরোধ ও গোলযোগ সৃষ্টির হোতাদিগকে দেখিয়া"।

ইব্ন হিশাম উক্ত দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন যে, কবিতা দুইটি হযরত হামযা ও আবূ জাহ্লের কবিতারূপে আরোপিত হইলেও মূলত ঐগুলি তাহাদের রচিত নহে ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৭০-৭২; রওদুল উনুফ, ৫খ., পৃ.)।

সম্ভবত কোন দক্ষ কবি হযরত হামযা (রা) এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ আবূ জাহ্লের মনোভাব, বক্তব্য ও অবস্থানকে মূর্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

সমুদ্রোপকূলের দিকে অভিযান প্রেরণের কারণ

দীন ইসলাম যেখানে শান্তির ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেখানে হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে প্রথম অভিযানটিই সমুদ্রোপকূলের দিকে কেন প্রেরিত হইয়াছিল, কেহ এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করিতে পারেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ইহার জবাব দিয়াছেন এইভাবে ঃ

বাস্তব ঘটনা এই যে, মদীনায় পদার্পণ করার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বপ্রথম কাজ ছিল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন। কেবল তাঁহার নিজের বা মুহাজিরগণের নহে, মদীনাবাসী আনসার সাহাবীগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও উহা জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও মুহাজিরগণকে আশ্রয় দিয়াছেন এই অজুহাতে কুরায়শগণ মদীনা ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাহাদের সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমটি হইতেছে সিরিয়ার সহিত কুরায়শদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া—যাহাতে তাহারা চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, এই সিরীয় বাণিজ্য ছিল তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার বড় অবলম্বন ও গর্বের বিষয়। দ্বিতীয় যে ব্যবস্থাটি রাসূলুল্লাহ (স) গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইল মদীনার আশপাশের গোত্রসমূহের সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে বদর যুদ্ধের পূর্বে তিনি পঞ্চাশ হইতে এক শতজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী মক্কার দিকে প্রেরণ করিতে থাকেন। দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে আবওয়ার দিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সশরীরে যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই তিনি তিনটি বাহিনী এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া সীরাতবেত্তাগণ লিখিয়াছেন। ঐগুলিকে সীরাত শাস্ত্রের পরিভাষায় সারিয়্যা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ঐ সারিয়্যাগুলি হইতেছে ঃ (১) সারিয়্যা হামযা (রা), (২) সারিয়্যা উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা) এবং (৩) সারিয়্যা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)। কিন্তু ঐ অভিযানসমূহে কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটে নাই। সীরাতবেত্তাগণ ঐ সমস্ত সারিয়্যার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহকে প্রতিহত করাই ছিল ঐগুলির উদ্দেশ্য। অন্য কথায় তাহাদের সিরীয় বাণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই ছিল কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। ইসলামের শত্রুরা বলিয়া থাকে যে, ছিনতাই ও রাহাজানির উদ্দেশ্যেই সাহাবীগণের এই অভিযানগুলি প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অভিযোগ নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত এই জন্য যে,

প্রথমত, ইসলামী শরীয়তে ছিনতাই, রাহাজনি বা দস্যুতা একটি মহাপাপ। দ্বিতীয়ত, বাস্তবে এইরূপ কিছুই ঘটে নাই। ঐ সমস্ত অভিযানের কোন একটিতেও সাহাবাগণ কোন কাফেলাকে লুণ্ঠন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। দস্যুতা বা তস্করবৃত্তির জন্য তো তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলিই ছিল সর্বোত্তম। কিন্তু বাস্তবে এমনটি ঘটে নাই।

জুহায়না গোত্রের সাথে পূর্বাহ্নেই রাসূলুল্লাহ (স) মৈত্রীচুক্তি করিয়াছিলেন। তাই কুরায়শদের মিত্ররূপে তাহাদের আর মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অবকাশ ছিল না (দ্র. শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩০৯-৩১০)।

প্রথম পতাকা প্রসঙ্গ

হযরত হামযা (রা)-এর প্রতি আরোপিত উপরোল্লিখিত কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক সর্বপ্রথম তাহারই হস্তে পতাকা তুলিয়া দেওয়ার কথা ব্যক্ত হইলেও ইব্ন হিশাম বলেন, আমাদের নিকট যে তথ্য বিদ্যমান তাহা হইল উবায়দা ইব্ন হারিছই প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করিয়াছিলেন। তবে সাথে সাথে ইব্ন হিশাম এই কথাও বলিয়াছেন, আসলে কে প্রথম পতাকা পাইয়াছেন তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২৮৫, ইফা প্রকাশিত বাংলা অনু.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

সারিয়্যা উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা)

মক্কার কুরায়শগণ মদীনার সীমান্ত অঞ্চলে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আপন পিতৃব্য পুত্র হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছের নেতৃত্বে ষাটজন অশ্বারোহী মুহাজির সাহাবীর একটি দলকে রাবিগ অভিমুখে প্রেরণ করেন। মতান্তরে ঐ সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল আশিজন। ইহাতে কোন আনসার সাহাবী শামিল ছিলেন না। রাবিগ উপত্যকার ছানিয়াতুল মাররা নামক স্থানে একটি জলাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তাহারা সেখানে বিপুল সংখ্যক কুরায়শের সমাবেশ লক্ষ্য করেন। সংখ্যায় তাহারা ছিল দুই শতজন। ঐ সমাবেশে আবূ সুফিয়ানও ছিল। ইবন ইসহাক-এর ভাষ্যমতে, ঐ কুরায়শ দলের নেতৃত্বে ছিল আবী জাহ্ল পুত্র ইকরিমা। তবে ইব্ন হিশামের মতে ঐ কুরায়শ দলের নেতৃত্বে ছিল মিকরায ইব্ন হাফ্স। উভয় পক্ষ মুখামুখি হইলেও সেখানে কোন যুদ্ধ হয় নাই। তবে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) কাফির বাহিনীর দিকে একটি তীর ছুড়িয়াছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই ছিল কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সর্বপ্রথম তীর।

ইব্ন হিশাম ঐ সারিয়্যাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াদ্দান অভিযানের পরবর্তী সময়ে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিলেও আল্লামা শিবলী নু'মানী উহা তাঁহার উক্ত অভিযানের পূর্ববর্তী কালের ঘটনা বলিয়া সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. সীরাতুন্নবী, ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৮২; সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী (উর্দু), ১খ., পৃ. ৩১০)।

সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী ঐ সারিয়্যা, শাওয়াল ১ম হিজরী। এপ্রিল ৬২৩ খৃ. অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সুনির্দিষ্টভাবে করিয়াছেন (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী), পৃ. ২১৯ ১ম স. ১৯৮০ খৃ.)।

মাওলানা দানাপুরীও এই অভিযানের সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এইভাবে ঃ সারিয়্যা হামযার পর ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হিজরতের অষ্টম মাসে নবী করীম (স) ৬০, মতান্তরে ৮০ জন অশ্বরোহী মুহাজির সাহাবীকে হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছের নেতৃত্বে রাবিগ প্রেরণ করেন। এইজন্য যে পতাকা তৈয়ার করা হয় উহাও শ্বেতবর্ণের ছিল এবং পতাকা বহনকারী ছিলেন মিসতাহ ইব্ন উছাছা (রা.) (দ্র. আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৮০)।

মিকদাদ ইব্ন আমর বাহরানী এবং উতবা ইব্ন গাযওয়ান আল-মাযিনী নামক দুই ব্যক্তি মুশরিক শিবির হইতে পলায়ন করিয়া এই সময় মুসলমান শিবিরে চলিয়া আসেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহারা দুইজন মুসলমানই ছিলেন। তাঁহারা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন (দ্র. সীরাতুন্নবী, ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৮২; ইফা; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ.৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও তদীয় তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন বলিয়া কথিত আছে। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

الا هل اتى رسول الله انى + حميت صحابتى لصدور نبلى

اذود بها اوائلهم ذيادا + بكل حزونة وبكل سهل

فما يعتد رام فى عدوّ + بسهم يا رسول الله قبلى

وذلك ان دينك دين صدق + وذو حق اتيت به وعدل

ينجي المؤمنون به ويجزى + به الكفار عند مقام مهد

فمهلا قد غونت فلا تعبنى + غوى الحى ويحك يا ابن جهل.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, আমি আমার সঙ্গীগণকে আমার তীর দ্বারা রক্ষা করিয়াছি। আমি তাহাদের প্রত্যেক পার্বত্যভূমি ও সমভূমিতে তাহাদের শত্রুদের অগ্রবর্তীদিগকে প্রতিহত করিতেছি।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পূর্বে আর কেহই শত্রুবাহিনীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে নাই। বস্তুত আপনার আনীত দীন সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের দীন। ইহা দ্বারা মুমিনদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে এবং কাফিরদিগকে ইহার (অগ্রাহ্য করার) কারণে স্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করা হইবে।

"হে জাহ্‌ল (মূর্খ) নন্দন! তোমার জন্য পরিতাপ, তুমি তো বিপথগামী হইয়াছ। এইজন্য আমার প্রতি দোষারোপ করিবে না। তুমি কিছু দিন অপেক্ষা কর (এবং দেখ, তোমার জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে)" (দ্র. ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩৪; ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৩৪; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ১৪০; উসুদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৯১)।

ইব্‌ন হিশাম (র) হযরত সা'দ (রা) ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের বলিয়া কথিত উপরোল্লিখিত কবিতা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে বলিয়া মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, আমার নিকট এই মর্মে তথ্য পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁহার হস্তে পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন তিনি ছিলেন এই উবায়দা ইব্‌ন হারিছ (রা)।

হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা) পরিচালিত অভিযানটি সারিয়্যা রাবিগ নামেও পরিচিত। তবে এই অভিযানে উভয় সৈন্যদল কোনও প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই নিজ নিজ অবস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিল।

সারিয়্যা সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (স) কুড়িজন সাথীসহ হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-কে কুরায়শদের একটি কাফেলার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য হিজরী ১ম বর্ষের যী-কা'দা (মে ৬২৩ খৃ.) মাসে রওয়ানা করেন। তাহাদের প্রতি তাগিদ ছিল তাহারা যেন কোনক্রমেই খাররার নামক স্থানটি অতিক্রম না করেন। তাহারা পদব্রজে রওয়ানা হন। সারা রাত ধরিয়া পথ চলিয়া দিনের বেলা তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। পঞ্চম দিনের প্রত্যুষে খাররার পৌঁছিয়া তাহারা জানিতে পারেন যে, কুরায়শদের কাফেলা একদিন পূর্বেই এই স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই অভিযানের পতাকাও সাদা ছিল এবং পতাকা বহন করেন হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) (দ্র. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬; উয়ূনুল আছার, ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, ১খ., পৃ. ২২৫)। স্থানের নামানুসারে ঐ সারিয়্যাকে সারিয়্যায়ে খাররার নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। ঐ স্থানটি জুহ্‌ফার অনতিদূরে অবস্থিত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খাররার অভিযান হযরত হামযা (রা)-এর অভিযানের পরে প্রেরিত হইয়াছিল (দ্র. সীরাতুন নবী, ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৮৯)।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম অভিযান ছিল উক্ত তিনটি অভিযান। তাই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মহানবী (স)-এর সকল জীবনীকারই ঐ সারিয়্যাগুলির গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষত পাশ্চাত্যের লেখকগণ এই প্রসঙ্গে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামের যুদ্ধপ্রসঙ্গ এবং ঐ সময়কার প্রেক্ষাপটও আলোচনা করিয়াছেন। এই অভিযানগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের একজন লেখিকা মন্তব্য করেনঃ

The early raids of 623 were not very successful. It was difficult to get accurate information about the movement of the caravan. no goods were siezed and there was no fighting. But the Macen world have been rafited and irritated. They have to take Precautions is that had never been necessary before and the Beduin tribes along the Red sea coast (the preferred trade route) would have been im.pressed by the muslims pluck Even though the early raiders failed to attack the Caravans. They made Treaties with Tribes a various Strategic points along the Red.

"৬২৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিককার অভিযানসমূহ খুব সফল ছিল না। কাফেলাসমূহের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্যলাভ ছিল খুবই দুরূহ। ফলে কোন যুদ্ধও হয় নাই এবং তাহাদের মালামাল কাড়িয়া লওয়াও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাহাতে অত্যন্ত বিব্রত এবং দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে এমন সব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইতেছিল যাহার প্রয়োজন ইতোপূর্বে কোন দিনই পড়ে নাই। তাহা ছাড়া লোহিত সাগর উপকূলবর্তী পছন্দনীয় এই বাণিজ্য পথটির বেদুঈন গোত্রগুলি মুসলমানদের এই ধরনের অভিযানে বেশ অভিভূত হইয়াছিল। ঐ প্রাথমিক অভিযাত্রী দলগুলির কাফেলা আক্রমণ যদিও ব্যর্থ হইয়াছিল তথাপি ইহার ফলে এই পথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসবাসকারী গোত্রগুলির সহিত সন্ধি স্থাপনে বা সমঝোতা গড়িয়া তুলিতে তাহারা সক্ষম হইয়াছিল" (Karen Armstrong, Muhammad, holy war অধ্যায়, পৃ. ১৬৯-১৭০)।

বস্তুত ঐ শেষোক্ত সাফল্যগুলিই ছিল উক্ত সারিয়্যা অভিযানগুলির দ্বারা মুসলমানদের চরম প্রাপ্তি, যাহা পরবর্তী কালে তাহাদের সকলের চাবিকাঠিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহানবী (স)-এর এই প্রতিরক্ষা কৌশল ছিল একজন দূরদর্শী ও কুশলী সমরবিদসুলভ। ঐ সাফল্যের জন্যই ইসলামের ইতিহাসে ঐ প্রাথমিক সারিয়্যাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

গাযওয়া আল-আবওয়া

গাযওয়া আবওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সর্বপ্রথম গাযওয়া। ইহাই সর্বাধিক গৃহীত মত। আবওয়া (ابوء) নামক স্থানের নামানুসারে এই গাযওয়ার নামকরণ করা হইয়াছে। তবে ইব্ন জারীরসহ কতিপয় ঐতিহাসিক ইহাকে গাযওয়া ওয়াদ্দান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ওয়াদ্দান (ودان) নামক স্থানের নামানুসারে এই নামকরণ করা হইয়াছে (ইব্ন জারীর আত-তাবারী, আত-তারীখ, ১খ., পৃ. ২৬১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে সংঘটিত গাযওয়াসমূহের সংখ্যার হিসাবে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন ষোলটির বর্ণনা পাওয়া যায় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৫)। সর্বোচ্চ ২৮টির বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারীর পাদটীকায় ২৭টির উল্লেখ রহিয়াছে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৬৯; ড. ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদ-এর সরকার কাঠামো, অনুবাদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইয়া, ই.ফা.বা, পৃ. ১৫৩)। তন্মধ্যে গাযওয়া আবওয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনের সর্বপ্রথম গাযওয়া। মক্কা মু'আজ্জমার ১৩ বৎসরের নবূওয়াতী জীবনে নির্মম অত্যাচারের মুকাবিলা করিয়াছেন তিনি পরম ধৈর্যের মাধ্যমে। অতঃপর তাঁহার মাদানী জীবনের প্রথম বৎসরেই أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا "যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল। কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে" (২২ ঃ ৩৯)।

কাফিরদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণে আদিষ্ট হইয়া তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে শুরু করেন। তন্মধ্যে হামযা (রা), উবায়দা ইব্ন হারিছ (রা) ও সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে নেতৃত্ব দিয়া তিনটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান সম্পন্ন করিবার পর স্বীয় নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (স) আবওয়া নামক অভিযানই সর্বপ্রথম পরিচালনা করেন। ইমাম বুখারীও ইব্ন কাছীরসহ প্রায় সকলেই এই ব্যাপারে একমত। ইমাম বুখারী (র) ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম সরাসরি যে অভিযান পরিচালনা করেন তাহা হইল আবওয়া, অতঃপর বুওয়াত, অতঃপর উশায়রা। তবে যায়দ্ ইব্ন আরকাম (রা) বর্ণিত হাদীছে উশায়রা (العشيرة) বা উসায়রা (العسيرة)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম গাযওয়া হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৫৬৩; ইব্ন কাছীর, আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৯৫)। ইহা ছাড়া বদরের ব্যাপারে কাহারও কাহারও অনুরূপ মন্তব্য থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কেবল সংঘর্ষপূর্ণ যুদ্ধগুলির মধ্যে বদরই প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৯৭)।

গাযওয়া আবওয়া সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে। একটি হইল ইব্‌নুল আছীরের বর্ণনা। উক্ত বর্ণনামতে আবওয়া অভিযান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত গাযওয়া নয়, বরং উহা রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রেরিত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সারিয়্যা (ইবনুল আছীর, আল্-কামিল ফিত তারীখ, ২খ., পৃ. ১০)। অপর বর্ণনাটি আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার। এই বর্ণনামতে, আবওয়া নামক অভিযান কেবল একটা নয়, বরং দুইটি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বপ্রথম এবং পঞ্চম উভয় গাযওয়ার নামই ছিল গাযওয়া আবওয়া (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)। তবে এই ব্যাপারে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না এবং উল্লিখিত কিতাবগুলিতেও এই সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা নাই।

স্থান পরিচিতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'আবওয়া' নামক স্থানের নামানুসারে এই গাযওয়াকে 'গাযওয়া আবওয়া' এবং 'ওয়াদ্দান' নামক স্থানের নামানুসারে গাযওয়াটিকে 'গাযওয়া ওয়াদ্দান' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

আবওয়া (الأبواء) মক্কা ও মদীনার মাঝখানে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, আবওয়া মূলত মদীনার ফুরু' (الفرع) অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা লইয়া গঠিত একটি গ্রাম, যাহা জুহ্‌ফা হইতে মদীনার পথে। অর্থাৎ জুহ্‌ফা হইতে মদীনার দিকে উহার দূরত্ব তেইশ মাইল। ইহাকে দক্ষিণ আরাত (يمين أراة)-এর সংলগ্ন একটি অঞ্চল হিসাবেও উল্লেখ করা হইয়াছে। দক্ষিণ আরাত হইল অনেকগুলি প্রস্রবণ সমৃদ্ধ একটি পাহাড় যাহার প্রতিটি প্রস্রবণকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক একটি গ্রাম। এই পাহাড়ের উপত্যকা আবওয়া এবং ওয়াদ্দান নামক স্থানদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, উহা মদীনার হজ্জযাত্রীদের গমন পথে অবস্থিত একটি স্থান (আল-বাগদাদী, মু'জামুল বুলদান, ১খ., পৃ. ৭৯-৮০)।

ইহা ছাড়াও স্থানটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, উহা লোহিত সাগর উপকূলের নিকটবর্তী ছিল এবং এই পথ দিয়াই সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলা ও অভিযাত্রীরা যাতায়াত করিত। এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব ছিল বানূ দাম্‌রার হাতে (ইসলামী বিশ্বকোষ, হযরত রাসূল কারীম (স) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪২)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, স্থানটির মূল অঞ্চল হইল ফুরু' (فرع) যেখানে মুযায়না গোত্র বসবাস করিত। মদীনা হইতে উহার দূরত্ব আশি মাইল। মক্কার দিক হইতে ইহা মদীনার সীমান্তে অবস্থিত একটি অঞ্চল (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ১৮৪)। স্থানটির কর্তৃত্ব ছিল বানূ দামরার, তবে বানূ খুযাআরও বসবাস ছিল এইখানে (মু'জামুল বুলদান, পৃ. ৭৯)।

স্থানটির নাম আবওয়া (الابواء) হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ বলেন, স্থানটির নাম আবওয়া রাখা হইয়াছে وباء শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। কারণ وباء অর্থ মহামারী। সম্ভবত সেখানকার কোন মহামারীর (وباء) কারণে স্থানটির নাম ابواء হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে ভিন্ন মত এই যে, নামটি (اوباء) হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ وباء হইতে বহুবচন হিসাবে اوباء ব্যবহৃত হয়, ابواء নহে। এই মত অনুযায়ী ابواء শব্দটি بوء শব্দ হইতে উদ্‌গত। بوء শব্দের অর্থ কোন স্থানে স্থায়ী হওয়া। সম্ভবত স্থানের অধিবাসীরা স্থায়ীভাবে স্থানটিকে বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছে বিধায় এই নামকরণ করা হইয়াছে (মু'জামুল বুলদান, পৃ. ৭৯; আরও দ্র. যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৯২)।

উল্লেখ্য যে, আবওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মায়ের কবর অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া মদীনায় তাঁহার পিতার কবর যিয়ারত করিতে যান। সেইখান হইতে মক্কায় ফিরিবার পথে আবওয়ায় তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (মু'জামুল বুলদান, পৃ.৭৯-৮০)।

'গায্ওয়া ওয়াদ্দান' নামকরণের কারণ হিসাবে মু'জামুল বুলদান গ্রন্থকার বলেন, ওয়াদ্দান মোট তিনটি স্থানের নাম। তন্মধ্যে এইটি হইল মক্কা ও মদীনার মাঝে ফুরু' (فرع) অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা লইয়া গঠিত একটি গ্রাম। ইহার এবং হারশা (هرشى) -এর মাঝে ছয় মাইলের দূরত্ব। আর ইহার এবং আবওয়ার মাঝে দূরত্ব হইল প্রায় আট মাইল (মু'জামুল বুলদান, ৫খ., পৃ. ৩৬৫)। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক ছয় মাইল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., ৮)। মদীনার দিক হইতে উহার এবং রাবিগের মাঝে ২৯ মাইলের দূরত্ব (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৮)। স্থানটির অধিবাসী মোট তিনটি সম্প্রদায় অর্থাৎ বানূ দামরা, বানূ গিফার ও বানূ কিনানা (মু'জামুল বুলদান, ৫খ, পৃ. ৩৬৫)।

এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ রিদা বলেন যে, কেহ ইহাকে ওয়াদ্দান নামক স্থানের এবং কেহ আবওয়া নামক স্থানের নামানুসারে নামকরণ করিয়াছেন। কারণ জায়গা দুইটি পাশাপাশি। ইহাদের মাঝে মাত্র ছয় মাইলের ব্যবধান (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ১৫৮)। তবে অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় সাহাবীদের সঙ্গে লইয়া উপরিউক্ত স্থান দুইটিতেই অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন (হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪৩)। সুতরাং গাযওয়াটির নামকরণে উহার যে কোন একটির নাম গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক।

গাযওয়ার প্রেক্ষাপট

মক্কাবাসীদের অত্যাচার-নিপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিজরতের পর মদীনায় তাঁহারা শান্তিতে

বসবাস করিতে পারিলেন না। কারণ মক্কার জীবনে কাফিরদের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পরও মুসলমানদের সেখানকার স্বাভাবিক জীবন যাপন দেখিয়া মক্কার কাফিরগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে এবং দীন ইসলামের ক্রমোন্নতিতে তাহারা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিতে থাকে। ফলে তাহারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মদীনায় সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য সিরিয়ামুখী বাণিজ্যিক তৎপরতা জোরদার করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যখন এই সকল সংবাদ আসিতে থাকে, তখন তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেফাজত করার বিষয়টি তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তোলে।

অপরদিকে মক্কার কুরায়শগণ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে থাকে যে, তাহাদের আক্রমণের আশংকায় কয়েক বৎসর পর্যন্ত মদীনায় রাত্রিতে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করিতে হয়। সাহাবীগণ অস্ত্রসহ নিদ্রা যাইতেন এবং সর্বদা যে কোন অতর্কিত হামলার জন্য সতর্ক থাকিতেন (হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪১; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৩)। ইমাম বুখারী (র) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) শত্রুদের অতর্কিত হামলার আশংকায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগ্রত ছিলেন। অতঃপর তিনি বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং বলিলেন, যদি কোন নেক্কার ব্যক্তি অবশিষ্ট রাত্রির প্রহরায় নিযুক্ত হইত তাহা হইলে আমি বিশ্রাম করিতে পারিতাম। এমন সময় বাহিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা গেল। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর আসিল, আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, পাহারা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্রাম করিতে গেলেন (ইমাম বুখারী, আস -সাহীহ, ২খ., ৫৬৩)।

ইহা ছাড়াও তৃতীয় যে সমস্যাটি রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদেরকে উদ্বেগের মাঝে ফেলিয়াছিল, তাহা হইল ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের প্রথমদিকে ইয়াহূদীরা মুসলমানদের পক্ষে থাকিলেও পরবর্তীতে যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা ও অবস্থানের ক্রমোন্নতি দেখিতে লাগিল তখন তাহারা আর তাহা মনে প্রাণে মানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু মদীনাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই চুক্তিতে ইয়াহূদীরা আবদ্ধ থাকার কারণে চুক্তি ভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে তেমন কিছু করিতে পারিতেছিল না। ফলে তাহারা পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিল। তাহারা আনসার ও মুহাজিরদের ঐক্যে ফাটল ধরাইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিল। আবার কখনো আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুসলমানদের মধ্যে বু'আছ যুদ্ধের বিস্মৃত স্মৃতি পুনরায় জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বু'আছ যুদ্ধের সময় যেইসব জ্বালাময়ী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছিল, আওস ও খাযরাজদের উত্তেজিত করিবার জন্য ইয়াহূদীরা সেইগুলি

প্রায়ই আবৃত্তি করিত। এইভাবে তাহারা মুহাজির ও আনসার এবং আওস ও খাযরাজদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইতে সচেষ্ট ছিল (দ্র. মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কাল, অনুবাদ মাওলানা আবদুল আউয়াল,মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, ৩২৩)।

এই সকল পরিস্থিতিতে কুরায়শদের তৎপরতা রোধ করা, মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলিকে পক্ষে রাখা এবং মদীনার ইয়াহূদীদেরকে তাহাদের তৎপরতা বন্ধে চাপ সৃষ্টি করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (স) ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্য প্রাথমিক কৌশল হিসাবে নিম্নের তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

(১) বিভিন্ন দিকে মুসলিম সশস্ত্র টহলদার বাহিনী প্রেরণ করা, যাহাতে মুসলমানদের শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

(২) মক্কা হইতে মদীনার পার্শ্ববর্তী সিরিয়া অভিমুখে ঘন ঘন অভিযান পরিচালনা করা যাহাতে কুরায়শদের বাণিজ্য তৎপরতা সফল হইতে না পারে। কারণ সামরিক শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই বাণিজ্য পরিচালিত হইত।

(৩) উক্ত পথের পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের সহিত মৈত্রীচুক্তি করা (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৭; আরও দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূল করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪২)।

আবওয়া অভিযানের লক্ষ্য

উপরে উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) আবওয়া অভিযানে বাহির হন। তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দুইটি লক্ষ্যের কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা —

(ক) সিরিয়া হইতে আগত কুরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথরোধ করা। বাণিজ্য কাফেলার এই পথরোধ করার উদ্দেশ্য হিসাবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন যে, উহা ছিল কুরায়শদের বাণিজ্যিক তৎপরতা বন্ধ করা এবং কুরায়শদের কাছে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, মুসলমানগণ তাহাদের বাণিজ্য পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ার শক্তি রাখে (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৩২০)। তবে কাফেলার সম্পদ লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয় নাই।

(খ) বানূ দামরা গোত্রের সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৮)। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আবওয়া নামক স্থানটির কর্তৃত্ব ছিল বনূ দামরার হাতে এবং উহা মক্কাবাসীদের সিরিয়ামুখী বাণিজ্য পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। বনূ দামরার সহিত এই ধরনের চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল একাধিক। যেমন শতধা বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া তোলা, মক্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্যে বাধা দেওয়া ও কুরায়শদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা।

গাযওয়ার বিবরণ

ইব্ন কাছীরের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মদীনায় আগমনের বার মাস পর আবওয়া অভিযানে বাহির হন। এই হিসাবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইহাকে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, গাযওয়া আবওয়া সংঘটিত হইয়াছিল দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস মুতাবিক ৬২৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৯)। যুরকানী অবশ্য সফর মাসের ১২ তারিখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৯৩)। ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া (উর্দূ)-তে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানগণ সফর মাসের প্রথম দিকে এই অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং ২০সফর ফিরিয়া আসিয়াছিলেন (শাহকার বেক ফাউন্ডেশন, ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, করাচী, পৃ. ১১৮)।

অবশ্য তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আরও মতপার্থক্য রহিয়াছে। ওয়াকিদী বলেন, উহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় আগমনের ১১ মাস পরের ঘটনা (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১১)। ইবনুল আছীর বলেন, অভিযানটি ছিল প্রথম হিজরীর যুলকা'দা মাসে (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, ২খ., ১০)। ইমাম তাবারী বলেন, ইহা দ্বিতীয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল (ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ১খ., ২৬১)। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

সৈন্যসংখ্যার হিসাব অধিকাংশ ঐতিহাসিক ৬০ জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সফিউর রহমান মুবারকপুরী ৭০ জন (আর-রাহীকুল মাখতূম, প্রাগুপ্ত) এবং ইব্ন খালদূন তাঁহার তারীখে ২০০ জন উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন খালদূন, আত-তারীখ, ২খ., পৃ. ১৭)। এই ক্ষেত্রে একটা বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, এই অভিযানে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না (শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রাগুক্ত)। নবী করীম (স) এই সময় মদীনায় হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) -কে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে পতাকা দেওয়া হইয়াছিল। পতাকার রং ছিল সাদা, রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শদের কাফেলার মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আবওয়া বা ওয়াদ্দান পর্যন্ত পৌছেন কিন্তু কাফিরদের নাগাল না পাওয়ায় কোন সম্মুখ সংঘর্ষ হয় নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (স) সফরের অবশিষ্ট দিনগুলিতে সেইখানেই অবস্থান করেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে ইব্ন কাছীর বলেন যে, সফরের অবশিষ্ট দিনগুলিসহ রবীউল আওয়াল মাসেরও প্রথম কয়েক দিন অবস্থান করেন (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৪৩)। দা. মা. ই.-তে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ২০ সফর প্রত্যাবর্তন করেন। তবে ওয়াকিদীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী তিনি পনের দিন মদীনা হইতে অনুপস্থিত থাকেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৯)।

উক্ত অভিযানে বনূ দামরার দলপতি মাখশী ইব্‌ন আমর-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা নিম্নরূপ ঃ বনূ দামরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপদ থাকিবে। তাহাদের উপর কেহ হামলা করিলে তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। তবে তাহারা যদি আল্লাহ্‌র দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে এই সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না এবং মুসলমানদের শত্রুদিগকেও সাহায্য করিবে না। তাহারা মুসলমানদের সহিত প্রতারণা করিবে না। সমুদ্র যত দিন তাহার সৈকতকে সিক্ত করিবে, ততদিন এই চুক্তির কার্যকারিতা অটুট থাকিবে। নবী করীম (স) যখন তাহাদেরকে তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাকিবেন, তখন তাহাদিগকে আগাইয়া আসিতে হইবে (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ১৫৮)। উপরিউক্ত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আবওয়া অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি., ২খ.; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরুত, তা. বি., ১খ. ও ২খ.; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো তা. বি., ৩খ.; (৪) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, লন্ডন, তা. বি., ১খ.; (৫) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, আত-তারীখ, দারুল কালাম, বৈরুত, তা বি., ১খ.; (৬) ইব্‌ন খালদূন, আত-তারীখ, মুয়াস্‌সাসাতু জাম্মাল লিত-তাবা', বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ.. (অবশিষ্টাংশ); (৭) শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, করাচি তা. বি.; (৮) ইমাম শিহাবুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্ আল-হামাবী আল-বাগদাদী, মু'জামুল বুলদান, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি., ১-৫ খ.; (৯) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১খ.; (১০) আল্লামা শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী, দারুল ইশাআত , করাচী, ১ খ.; (১১) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২খ.; (১২) সফিউর রমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, আল-মাকতাবুল আফরিয়া, বৈরুত ১৪২২ হি. / ২০০১ খৃ.; (১৩) ডঃ মুহাম্মাদ হোসায়ন হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, বাংলা অনু., ই. ফা. বা. ঢাকা; (১৪) ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূল কারীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, ই. ফা. বা., ঢাকা; (১৫) মাওলানা মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

খান মুহম্মদ ইলিয়াস

গাযওয়া বুওয়াত

পরিচিতি

গাযওয়া বুওয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত দ্বিতীয় গাযওয়া। মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) যেই সকল কাফিরের নানামুখী ষড়যন্ত্র ও প্রতিহিংসামূলক তৎপরতার শিকার হন তন্মধ্যে মদীনায় আক্রমণের পরিকল্পনা এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যিক তৎপরতা জোরদার করা ছিল অন্যতম। সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তাহাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাণিজ্যিক তৎপরতা রোধ করা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে যখনই রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাবাসীদের কোন বাণিজ্যিক কাফেলার খবর পাইতেন তখনই তাহাদের গতিরোধ করার জন্য অভিযান চালাইতেন (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া, ১খ.,পৃ. ৩৯৩)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, গাযওয়া আবওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সর্বপ্রথম সামরিক অভিযান হইলেও গাযওয়া বুওয়াত মদীনার আনসার মুসলমানদের প্রথম সামরিক অভিযান (ড. মুহাম্মাদ হোসায়ন হায়কাল, বাংলা অনুবাদ ঃ মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, ৩১৭)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর গাযওয়া বুওয়াত পর্যন্ত কাফিরদের পক্ষ হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক বিভিন্ন প্রকার অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের কয়েকটি অভিযানে আনসার মুসলমানগণ শরীক হন নাই। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত তাঁহার জীবনের প্রথম অভিযান আবওয়াতেও তাহারা শরীক হন নাই। ইহার তাৎপর্য হিসাবে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, 'আকাবার দ্বিতীয় বায়আত কালে মদীনার আওস ও খাযরাজদের এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তার ব্যাপারে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার ধরন ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং ঐ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের আক্রমণ হইতে রাসূলুল্লাহ (স) তথা মুসলমানদিগকে রক্ষা করা। ইসলামের পক্ষ হইয়া অন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা উক্ত চুক্তির মোটেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না (প্রাগুক্ত)। আওস ও খাযরাজ ছাড়া বায়'আতকারী অন্যান্য মুসলমানদেরও এই সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল যে, তাহারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে মহানবী (স)-এর সহিত ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নাই (প্রাগুক্ত)। এই কারণে ইসলামের প্রাথমিক কয়েকটি অভিযানে

মদীনার আনসার মুসলমানগণ অংশগ্রহণ করেন নাই। অবশেষে নিছক ইসলামের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহারা সর্বপ্রথম বুওয়াত অভিযানে বাহির হন। এই দিক বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, মুসলমানদের প্রাথমিক অভিযানগুলির তুলনায় এই অভিযান ছিল পূর্ণাঙ্গ ও অধিক সংঘবদ্ধ। আরও বলা যায় যে, এই অভিযানের মাধ্যমে আনসার, মুহাজির নির্বিশেষে সকল মুসলমান একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হন। তাহা হইল ইসলামের স্বার্থ রক্ষা করা ও ইসলামকে দুশমনদের দুশমনী হইতে হেফাজত করা।

বুওয়াত নামক স্থানের নামানুসারে এই নামকরণ করা হইয়াছে। এইখানে উল্লেখ্য যে, অনেক ঐতিহাসিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই অভিযানের ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তম্মধ্যে ওয়াকিদীর কিতাবুল মাগাযী উল্লেখযোগ্য। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল যে, আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী গাযওয়া আবওয়া এবং গাযওয়া বুওয়াতকে একই গাযওয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নবীয়ে রহ্মত নামক কিতাবে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, গাযওয়া আবওয়া, অনেকে ইহাকে গাযওয়া বুওয়াতও বলে (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ২২৫)।

গাযওয়া বুওয়াতের তারিখ লইয়াও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্নুল আছীরের বর্ণনায় ইহাকে ১ম হিজরীর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ)। অন্য ঐতিহাসিকদের মতে ইহা দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় হিজরীর সময় লইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। যেমন ইব্ন ইসহাক-এর উদ্ধৃতি দিয়া যুরকানী বলেন, উহা রবীউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছে (শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৯৩)। ভিন্নমতে আবূ উমার ইব্ন হায্মের উদ্ধৃতি দিয়া যুরকানী বলেন, উহা রবীউল আখিরে সংঘটিত হইয়াছে (প্রাগুক্ত)। তবে প্রসিদ্ধ কতিপয় বর্ণনানুযায়ী গাযওয়া বুওয়াতের তারিখ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের তের মাসের মাথায় সংঘটিত হইয়াছিল (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১২)। সেই হিসাবে বলা যায় যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরত ১ম হিজরীর সফর মাসে হইয়াছিল সেই হেতু হিজরতের তের মাসের মাথায় সংঘটিত অভিযান দ্বিতীয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসেই পড়ে। সফিউর রহমান মুবারকপুরী গাযওয়া বুওয়াতের তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন ২য় হিজরী রবীউল আওয়াল মোতাবিক ৬২৩ খৃ., সেপ্টেম্বর মাস (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৪৮, ১৭৯)।

স্থান পরিচিতি

ইসলামের ইতিহাসে বুওয়াত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নেতৃত্বে আনসার-মুহাজিরদের সমন্বিত বাহিনীর একটি জিহাদ পরিচালিত হইয়াছিল। স্থানটির শাব্দিক উচ্চারণের একক কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। ভাষাবিদগণের এক পক্ষ ইহাকে

(بواط) অর্থাৎ প্রথম অক্ষর باء -এর উপর পেশ, واو -এর উপর যবর প্রদান করত স্থানটিকে বুওয়াত হিসাবে উচ্চারণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে আসীল আল-মুসতামিলী (যিনি বুখারীর হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের একজন) এবং আল-আযরী (যিনি মুসলিম শরীফের রাবীদের একজন) প্রমুখের বর্ণনানুযায়ী স্থানটিকে باء -এর উপর যবর প্রদান করত বাওয়াত উচ্চারণ করা হইয়াছে। তবে যুরকানী অবশ্য (المطالع) মাতালি' গ্রন্থের এবং কামূস গ্রন্থকারের বরাতে বলেন যে, প্রথমোক্ত মতটি যেমন সহজ তেমনি বেশী পরিচিত (শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, পৃ. ৩৯৩)। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক بواط শব্দটির উচ্চারণের বর্ণনায় পূর্বোক্ত দুইটি মতের কথা উল্লেখ করিলেও باء -এর উপর পেশযুক্ত উচ্চারণটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের আলোচনায় বুওয়াতের স্থান পরিচিতি হিসাবে বিভিন্ন কথা আসিয়াছে। এক দিকে বলা হইয়াছে যে, বুওয়াত জুহায়না পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত একটি পাহাড়। ইহা ইয়ানবু' (ينبوع)-এর নিকটবর্তী এবং মদীনা হইতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত। সুহায়লী বলেন, বুওয়াত একটি পাহাড়ের দুইটি শাখা পাহাড়। ভিন্নভাবে ইহাদেরকে জালসী (جلسى) এবং গাওরী (غورى) বলা হয়। তন্মধ্যে জালসী অঞ্চলে বনূ দীনার গোত্র বসবাস করিত এবং ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের দ্বিতীয় বারের সামরিক মূল অভিযানস্থল (যুরকানী, প্রাগুক্ত)। তবে ইহা ছাড়াও স্থানটির অন্যান্য বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন স্থানটি লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল হিসাবে বলা হইয়াছে (হযরত রাসূল করীম (স), জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪৬)। আর-রাহীকুল মাখতূম-এ বলা হইয়াছে যে, বুওয়াত একটি পাহাড়ের নাম। বুওয়াত ও রাদওয়া জুহায়না পাহাড়ী এলাকার দুইটি পাহাড়। মূলত ইহা একটি পাহাড়ের দুইটি শাখা, মক্কা হইতে সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে এবং এই কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, মদীনা হইতে উহা ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত (সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৯)।

বুওয়াতের ভৌগোলিক গুরুত্ব

তৎকালীন আরবের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা হইত সিরিয়াকে। মক্কাবাসীরা তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এইখানে লইয়া আসিত এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এইখান হইতে আমদানী করিত। আর এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য স্থলপথই ছিল একমাত্র উপায়। যেহেতু পথের দূরত্ব ছিল যেমন অধিক, তেমনি ঐ সময় দস্যুবৃত্তির প্রকোপও ছিল অত্যধিক। তাই যোগাযোগ ছিল কাফেলাভিত্তিক। অনেকের অনেকগুলো প্রয়োজন একত্র হওয়ার পর একটি বাণিজ্যিক কাফেলায় রূপ নিত। উট, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর প্রভৃতি বাহনের মাধ্যমে মক্কার লোকেরা কাফেলাবদ্ধ হইয়া সিরিয়ায় যাইত এবং তাহাদের বাণিজ্যিক তৎপরতা পরিচালিত করিত।

বুওয়াত স্থানটি মক্কা-সিরিয়া বাণিজ্যিক কাফেলাগুলির পথে পড়িত। স্থানটি মদীনার নিকটে হওয়ায় মদীনাবাসীদের দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত ছিল। মক্কার সহিত মদীনাবাসীদের

সম্পর্কের কোন প্রকার অবনতি ঘটিলে যেমনটি উক্ত স্থানের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হইত তেমনিভাবে সিরিয়ামুখী বাণিজ্যের অবস্থাও নাযুক হইয়া পড়িত। বুওয়াত কেবল মক্কা-সিরিয়া বাণিজ্যিক পথের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নহে, বরং আরবের গোটা দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যিক পথের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল হইতে যেই সকল বাণিজ্যিক কাফেলা চলাচল করিত বা মক্কায় আসিত তাহার কোন কোনটিতে আড়াই হাজার পর্যন্ত উট বোঝাই পণ্য থাকিত। এইসব পণ্যের মূল্য পঞ্চাশ হাজার দীনারেরও বেশী হইত। ড. স্প্রেংগার বলেন, এই সময় মক্কা হইতে যেইসব পণ্য বাহিরে যাইত সেই সবের মূল্য অনেক সময় এক লাখ ষাট হাজার লিরা বা দুই লাখ ডলার ছাড়াইয়া যাইত (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৩১৯-৩২০)।

গাযওয়ার প্রেক্ষাপট

হিজরতের পর হইতেই রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীরা যে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল উহা প্রতিহত করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (স) পরপর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করিলেন। ফলে মক্কাবাসীদের সিরিয়ামুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়িল। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের মদীনায় যাওয়ার পথ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

এই পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীরা তাৎক্ষণিকভাবে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবওয়া অভিযানের পর মাত্র এক মাসের মধ্যে মদীনায় পরপর দুইটি অভিযান পরিচালনা করিল, যদিও ইহাতে তাহারা কোন সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। এমনকি মুসলমানদের সহিত তাহাদের কোন ধরনের সম্মুখ সংঘর্ষও হয় নাই। কিন্তু মদীনার জন্য ইহা একদিকে বড় ধরনের ভবিষ্যত হামলার আশংকা বাড়াইয়া তুলিল, অন্যদিকে মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রের সহিত মুসলমানদের মৈত্রী চুক্তির ভিতও দুর্বল হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি ও রণ প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক তৎপরতাকে আরও সূদৃঢ়ভাবে প্রতিরোধকরণ, সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকরণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করিলেন।

১. মুসলিম টহলদার বাহিনী আরও জোরদার করা;

২. কাফিরদের কোন বাণিজ্যিক কাফেলার সংবাদ পাইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা;

৩. মুসলিম সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং

৪. আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে সকল সামরিক পদক্ষেপে সকল মুসলমানকে একই পতাকাতলে সমবেত করা।

গাযওয়ার বিবরণ

মাহ্মূদ শাকের বলেন যে, আবওয়া অভিযান সমাপ্ত হওয়ার কয়েক দিন পরই এই গাযওয়া সংঘটিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হইয়াছিল যে, কুরায়শদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হইতে মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে। মহানবী (স) তখন দুই শত সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া ঐ কাফেলার পথরোধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহির হইলেন। ইব্ন কাছীরের বর্ণনানুযায়ী, এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাজ'উন (রা)-কে মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০১)। তবে ওয়াকিদীর বর্ণনায় এই ক্ষেত্রে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৩; ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৮)।

এই অভিযানে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা)-কে পতাকা বহন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পতাকার রং ছিল সাদা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, পৃ. ৩০১)।

কুরায়শদের উক্ত কাফেলা ছিল বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কাফেলার নেতৃত্বে ছিল উমায়্যা ইব্ন খালাফ, লোকসংখ্যা ছিল এক শত। কাফেলাটি আড়াই হাজার উট লইয়া ফিরিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সৈন্য লইয়া বুওয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতে পারিয়া কুরায়শ সর্দার কাফেলা লইয়া অন্য পথে গমন করিল। ফলে এই অভিযানেও কুরায়শদের সহিত মুসলমানদের কোন সম্মুখ সংঘর্ষ হয় নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৯; শারহুল মাওয়াহিবিল্লাদুন্নিয়্যা, ১খ, ৩৯৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ৩০১; হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪৬)। রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রায় একমাস সেখানে অবস্থান করিয়া কাফেলাসহ মদীনাতে ফিরিয়া আসিলেন।

গাযওয়ার ফলাফল

গাযওয়া বুওয়াত ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। ইহা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডল, মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও মক্কার কাফিরদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই গাযওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হইল ইসলামের বিরুদ্ধে সকল অপতৎপরতা রোধে আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধভাবে একই পতাকাতলে সমবেত হওয়া। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল মিত্র গোত্রের সহিত সম্পর্কের উন্নতি। এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পর পরবর্তী গাযওয়া 'উশায়রা সংঘটিত হইয়াছিল (হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩৪৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি., ২খ.; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি., ১খ.; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, তা. বি., ৩খ.; (৪) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী,

আলামুল কুতুব, লন্ডন, তা. বি., ১খ.; (৫) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, আত- তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কালাম, বৈরূত, তা.বি., ১খ.; (৬) ইব্‌ন খালদূন, আত-তারীখ, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ. (অবশিষ্টাংশ); (৭) ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, শাহকার বেক ফাউন্ডেশন, করাচী তা. বি.; (৮) যুরকানী, শরহুল-মাওয়াহিবিল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ.; (৯) আল্লামা শিবলী নো'মানী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী, ১খ.; (১০) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, দারুল কুতুবিল-ইলমিয়া, বৈরূত, ২খ.; (১১) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, আল-মাকতাবুল আসরিয়া, বৈরূত ১৪ ২২/২০০১; (১২) ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, ই. ফা. বা. ঢাকা; (১৩) ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূল কারীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ই. ফা. বা. ঢাকা; (১৪) মাওলানা মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

খান মুহম্মদ ইলিয়াস

গাযওয়া আল-'উশায়রা

হিজরী দ্বিতীয় সনের জুমাদাল উলার মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) দুই শত মুহাজিরকে সঙ্গে লইয়া কুরায়শদের সিরিয়াগামী এক কাফেলার উপর হামলা করার জন্য 'উশায়রা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হন। এই সময় আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমীকে মদীনার শাসক নিয়োগ করা হয়। কুরায়শদের এই কাফেলা পণ্যসামগ্রী লইয়া মক্কা হইতে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিল। "ইয়াম্বু" নামক স্থানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে পারিলেন যে, কাফেলা ইতোপূর্বেই সিরিয়া চলিয়া গিয়াছে বিধায় কাফেলার অপেক্ষায় জুমাদাল উলার অবশিষ্ট দিন ও জুমাদাছ ছানিয়ার কয়েক দিন সেই স্থানে অবস্থান করেন। অবশেষে মুদলিজ গোত্র ও তাহাদের মিত্র বনূ দামরার সাথে সন্ধি চুক্তি করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে পতাকা ছিল। উল্লেখ থাকে যে, কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলাটি যখন সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করে তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করার জন্য পুনরায় অভিযানে বাহির হন তখনই মূল বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৩; উমদাতুল-কারী, ১খ., পৃ. ৭৪; ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ২খ., পৃ. ২৪৮)।

এই অভিযানে মুদলিজ গোত্র ও তাহাদের মিত্র গোত্র বনূ দামরার সাথে যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল—তাহা নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى ضمرة بأنهم آمنون على اموالهم وانفسهم وان لهم النصرة على من رامهم ان لا يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة وان النبى اذ دعاهم لنصره اجابوه عليهم بذالك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصرة على من بر واتقى.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। এই চুক্তিপত্র আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হইতে বানূ দামরার প্রতি; তাহাদের জীবন ও ধনসম্পদ নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি বানূ দামরার সহিত অনর্থক যুদ্ধের ইচ্ছা করিবে তাহার বিরুদ্ধে বানূ দামরাকে সাহায্য করা হইবে এই শর্তে যে, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ্‌র দীনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবে না (অর্থাৎ এই হুকুম সদাসর্বদা বলবৎ থাকিবে)। আর নবী (স) যখন তাহাদিগকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিবেন তখন তাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দিবে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিবে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করিবে তাহাদের সহিত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্যের অঙ্গীকারনামা ও তাহাদের যাবতীয় দায়- দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের যিম্মায় থাকিবে (আর-রাওদুল উনুফ, ৫খ., পৃ. ৭৮, ১ম সং., বৈরূত ১৪১২/১৯৯২)।

এই অভিযান সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قال كنت إلى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشر قلت كم غزوات أنت معه قال سبع عشر غزوة قلت فايهن كان اوّل قال العشيرة او العسيرة.

"আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (র)-এর পার্শ্বে অবস্থিত ছিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ (স) কতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, উনিশটিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তাহার সহিত কয়টি যুদ্ধে শরীক ছিলেন? তিনি বলিলেন, সতেরটিতে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথম যুদ্ধ কোনটি? তিনি বলিলেন, উশায়রা কিংবা উসায়রা" (বুখারী শরীফ, ২খ., পৃ. ৫৬৩)।

এই হাদীছ হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রথম গায্‌ওয়া হইল উশায়রা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০২)। এই অভিযানে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আবূ তুরাব (ابو تراب) উপনামে ভূষিত হইয়াছেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩১০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম

গায্ওয়া বদর আল-উলা

ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর মতে গায্ওয়া বদর আল-উলা যুল- উশায়রার পরে সংঘটিত হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৩০৩)। অপরদিকে "আসাহহুস সিয়ার", পৃ. ৮১ গ্রন্থের বক্তব্যানুসারে এই অভিযান যুল-উশায়রার পূর্বে তথা হিজরতের ত্রয়োদশ মাস রবীউল আওয়ালে সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধাভিযানের ঘটনার বর্ণনায় প্রকাশ থাকে যে, উশায়রার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর রাসূলুল্লাহ (স) প্রায় দশ দিন মদীনায় অবস্থান করেন। কুরয্ ইব্‌ন জাবির আল-ফিহ্‌রী নামীয় এক কুরায়শ সর্দার বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া মদীনার চারণভূমিতে মুসলমানদের পশু পালের উপর হামলা চালায় এবং অনেক মেষ পাল লইয়া তাহারা পলায়ন করে। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করিয়া কয়েকজন সাহাবীকে লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। এই অভিযানে পতাকা ছিল হযরত আলী (রা)-এর হাতে। বদরের নিকটবর্তী স্থান "সাফ্‌ওয়ান" (سفوان) নামক উপত্যকা পর্যন্ত গমন করার পর যখন শত্রুর সহিত সাক্ষাত হইল না তখন রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ২খ., পৃ. ২৫১)।

"সাফ্‌ওয়ান" বদরের নিকটবর্তী একটি স্থান। রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু শত্রুর সন্ধানে বদর পর্যন্ত গিয়াছিলেন সেই হেতু এই অভিযানকেই غزوة بدر الأولى (প্রথম বদরের যুদ্ধ) বলা হয়। আবার ইহাকে غزوة سفوان -ও বলা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৩)।

কুরয্ ইব্‌ন জাবির পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শাহাদাত লাভ করেন (আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ২৯০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)

রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের সপ্তদশ মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)-এর নেতৃত্বে আটজন অথবা বারজন সদস্যের এক বাহিনীকে কুরায়শদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩১০)। এই বার জন হইলেন ঃ ১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা), আমীর; ২. আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা (রা), সদস্য; ৩. উত্‌বা ইব্‌ন গায্ওয়ান (রা), সদস্য; ৪. উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা), সদস্য; ৫. সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা), সদস্য; ৬. ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা), সদস্য; ৭. আমের ইব্‌ন রবী'আ (রা), সদস্য; ৮. খালিদ ইব্‌ন বুকায়র (রা), সদস্য; ৯. সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা (রা), সদস্য; ১০. আমের ইব্‌ন আয়্যাস (রা), সদস্য; ১১. সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন বায়দা (রা), সদস্য এবং ১২. মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা), সদস্য।

ইবন হিশাম (র) বলেন, এই কাফেলাতে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা) ব্যতীত আটজন মুহাজির ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৫২)। ইব্ন কাছীর বলেন, এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে আমীর মনোনীত করেন, কিন্তু যাত্রার শুরুতেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিচ্ছেদে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলে তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পরিবর্তে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা)-কে নিযুক্ত করেন (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ., পৃ. ১৯০)।

মু'জাম তাবারানীতে জুনদুব আল-বাজালী (রা) হইতে হাসান সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা) যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাতে একটি মুখবন্ধ পত্র দিয়া নির্দেশ দিলেন তিনি যেন দুই দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর পত্রখানা খুলিয়া ইহার মর্মানুসারে কাজ করেন এবং নিজ সাথীদেরকে এই কাজে জোরপূর্বক বাধ্য না করেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৫১)।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)- এর নির্দেশানুসারে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা) দুই দিন পর পত্র খুলিলেন। ইহাতে লিখা ছিলঃ

اذا نظرت فى كتابى فامض حتي تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم.

"আমার এই পত্র যখন দেখিবে তখন তুমি সামনে অগ্রসর হইবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় গমন করিয়া কুরায়শদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সমস্ত তথ্য আমাকে অবহিত করিবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৫)।

এই কাজটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা) সঙ্গীগণকে এই ব্যাপারে পূর্ণ এখতিয়ার দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই নির্দেশকে অম্লান বদনে মানিয়া নিলেন এবং সকলেই " নাখলা" গমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও উতবা ইব্ন গায্ওয়ান (রা) যে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া যায়। তাঁহারা উভয়ে উটের সন্ধানে বহু দূর চলিয়া যান। যখন তাঁহারা উটের সন্ধান পাইলেন তখন পথ হারাইয়া ফেলিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা তাহাদের কাফেলার সহিত নাখলায় পৌছিতে পারিলেন না, পশ্চাতেই থাকিয়া গেলেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৫২)।

যখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা)-এর কাফেলা নাখলায় পৌছিল তখন রজব মাসের শেষ ভাগ, যাহা নিষিদ্ধ (اشهر حرم) মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্ধ্যার দিকে কুরায়শদের একটি কাফেলা আগমন করে যাহাতে আমর ইবন হাদরামী, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগীরার দুই পুত্র উছমান ও নাওফাল এবং মুগীরার ক্রীতদাস হাকাম ইব্ন কায়সান ছিল। কাফেলার উষ্ট্রের উপর খেজুর ও বাণিজ্য সম্ভার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করিলেন উভয় সংকটের কথাঃ যদি এই

কাফেলাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মক্কায় গমন করিয়া তাহারা আমাদের উপস্থিতির কথা প্রচার করিয়া দিবে। অপরদিকে এখন রজব মাস যাহাতে সর্বপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। অবশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত নিলেন,ইহাদেরকে ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। লড়াই-এর মাধ্যমেই ইহার সমাধান করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ওয়াকিদ তামীমী সর্বপ্রথম শত্রুদলের উপর তীর নিক্ষেপ করিলেন। ফলে আমর ইব্ন হাদরামী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর উছমান ও হাকামকে তাঁহারা বন্দী করিলেন এবং নাওফিল প্রাণ নিয়া কোনমতে পলায়ন করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৫)।

আরবজাতির সকল ধর্মমতেই রজব, যুল-কা'দা, যুলহিজ্জা ও মুহাররম এই মাস চতুষ্টয়কে "আশহুরুল হুরুম" (اشهر الحرم) তথা সম্মানিত মাস বলিয়া গণ্য করা হইত। এই মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামেও তখন ইহা সমর্থিত ছিল, অবশ্য পরবর্তীতে তাহা মান্সূখ হইয়া গিয়াছে কিনা এই ব্যাপারে মতপার্থক্য রহিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। এমনকি তাহাদের আনীত গনীমতের মাল ও বন্দীদ্বয়কে গ্রহণ করিতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অপরদিকে কাফির মুশরিকরা বলাবলি শুরু করিল যে, মুসলমানরা হারাম মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করিয়াছে। চতুর্দিক হইতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল, এই মাসগুলি সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের নীতি কি? তাহাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ.

"লোকেরা আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, এই মাসসমূহে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথ হইতে লোকদেরকে বাধা প্রদান করা, আল্লাহ্‌র সাথে এবং মসজিদে হারামের সাথে কুফরী করা এবং মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তাহার চাইতেও বড় অপরাধ। আর বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও ভয়াবহ" (২ ঃ ২১৭)।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ বাহিনী কর্তৃক লব্ধ গনীমতের মালামাল ও বন্দীদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন এবং উহা তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এই গনীমতের মাল বদরের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন। ইহাই ইসলামের প্রথম খুমুস (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৬; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩১১)।

ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ তামীমীর তীরের আঘাতে আমর ইব্ন হাদরামী নিহত হইয়াছিল বিধায় আমরই সর্বপ্রথম নিহত কাফির এবং ওয়াকিদ (রা) হইলেন সর্বপ্রথম হত্যাকারী মুজাহিদ। আর উছমান ও হাকামই ছিল মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দী।

এ ঘটনার পর মক্কাবাসিগণ দূত প্রেরণ করিয়া বন্দীদ্বয়ের মুক্তি কামনা করে। মুসলমানদের এই বাহিনীর যেই দুইজন উটের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স) বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দিলেন। "কায়সান" মুক্তি পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতেই থাকিয়া যান। অপরদিকে উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ মক্কায় চলিয়া যায় এবং কাফির অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., ২৫৫)।

হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (রা) ও তাঁহার সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এই অভিযানের জন্য মুজাহিদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইব? তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে, তাহারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু" (২ঃ২১৮)।

ইব্ন হিশাম- এর বর্ণনামতে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আবদুল্লাহ ইবন জাহ্শ (রা) নিম্নের পংক্তিগুলি আবৃত্তি করেনঃ

تعدون قتالا فى الحرام عظيمة + واعظم منه نويرى الرشد راشد
صدودكم عما يقول محمد + وكفربه والله راء وشاهد
واخراجكم من مسجد الله اهله + لئلا يرى الله فى البيت ساجد

"তোমরা হারাম মাসে যুদ্ধ করা গর্হিত গণ্য কর, তবে সত্যদ্রষ্টার জন্য ইহা হইতে অধিক গর্হিত হইলঃ মুহাম্মাদের বাণী প্রচারে তোমাদের বাঁধা দান এবং তা প্রত্যাখ্যান। আল্লাহ্ই ইহার প্রত্যক্ষকারী ও সাক্ষী যে, তোমরা আল্লাহ্র ঘর হইতে ইহার অধিবাসিগণকে বহিষ্কার কর যাহাতে আল্লাহ্র ঘরে কেহ ইবাদতকারী না থাকে, ইহাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ" (ইব্ন কাছীর, তাফসীর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম ২ ঃ ২১৭; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৬৩, এম বশীর হাসান এণ্ড সন্স, কলিকাতা; (৩) ইবন হাজার আসকালানী (র), ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৩, ৪র্থ সং, বৈরূত ১৯৮৮; (৪) বদরুদ্দীন আয়নী (র), উমদাতুল কারী, ৯খ., পৃ. ৭৪, দারুল ফিক্র; (৫) মুস্তাফা আস-সাক্কা, ইবরাহীম আল-আবয়ারী, আবদুল হাকীম শিল্পি, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা লি-ইব্ন হিশাম, সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৩৫,২৫১, ২৫২, ২৫৫; (৬) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৮, ৫১; (৭) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১০,৩১১; (৮) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৩, ৩০৬ ।

মুহাম্মাদ আনওয়ারুস সালাম

গাযওয়া বদর আল-কুবরা

বদর যুদ্ধ হযরত রাসূলে কারীম (স) কর্তৃক পরিচালিত প্রথম সফল যুদ্ধ। এই প্রথম কাফির কুরায়শদের সহিত মুসলমানদের সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে মুসলমানগণ গৌরবময় বিজয় অর্জন করেন এবং কাফিররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হওয়ার কারণেই দীন ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কাফির কুরায়শদের দম্ভ চূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে সরাসরি ফেরেশতা পাঠাইয়া মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন এবং মুসলমানদের মনোবল চাঙ্গা করিবার জন্য কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা তাহাদের দৃষ্টিতে কম করিয়া দেখান। আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আল-আনফাল-এ ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য সূরায় সংক্ষিপ্তভাবে এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

বদর-এর ভৌগোলিক বর্ণনাঃ বদর মূলত একটি কূপের নাম। সেই সূত্রে উহার নিকটবর্তী প্রান্তরকে বদর প্রান্তর বলা হয়। কূপটি খনন করান বদর ইব্ন কুরায়শ ইব্ন ইয়াখলুদ, মতান্তরে বদর ইবনুল হারিছ নামে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি। তাহার নামানুসারে উহার নাম রাখা হয় বদর (আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৪৮; আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৫ খ., পৃ. ১১৬)। ইহা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী হিজাযের একটি প্রসিদ্ধ ঝর্ণা ও স্থান। ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আল-জার সমুদ্র বন্দর হইতে এক রাত্রির সফর পরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত। ইহা উঁচু উঁচু পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দুর্গম স্থান। ইহা ডিম্বাকৃতির সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ ও সাড়ে চার মাইল প্রস্থ সুবিস্তীর্ণ ময়দান (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫খ., পৃ. ৪৮৪-৮৫)। শিবলী নু'মানীর বর্ণনামতে, ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৮০ (আশি) মাইল দূরে অবস্থিত (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ১৮৭)। এক বর্ণনামতে মদীনা হইতে বদর-এর দূরত্ব প্রায় ৪(চার) মন্যিল অথবা ২৮ ফারসাখ (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৬৮৬)।

জাহিলী যুগে এইখানে প্রতি বৎসর ১লা যুলকা'দা হইতে ৮ (আট) দিন পর্যন্ত একটি বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানেও এইখানে প্রতি শুক্রবার একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঘৃত, চামড়া, বালসান, তেল, উট, বকরী, পশমী কোর্তা ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য মেলায় আনা হয় (প্রাগুক্ত, ১৫খ., পৃ. ৪৮৪-৮৫)

যুদ্ধের কারণঃ এই যুদ্ধে সংঘটনের কারণ সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। উভয় বর্ণনার পিছনেই নির্ভরযোগ্য যুক্তি রহিয়াছে। বর্ণনা দুইটি নিম্নরূপ ঃ

(১) অধিকাংশ সীরাতবিদগণের মতে কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব-এর নেতৃত্বে ৩০ বা ৪০ জনের (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৪৯), মতান্তরে ৭০ জনের (ইয়ূসুফ সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ, ১৮) একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বাণিজ্য ব্যাপদেশে শাম (সিরিয়া) গিয়াছিল। তাহাদের সহিত প্রচুর পণ্যসম্ভার ছিল। এক বর্ণনামতে ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও এক হাজার উট ছিল (প্রাগুক্ত)। উক্ত কাফেলায় মাখরামা ইব্ন নাওফাল ও আমর ইবনুল আসও ছিলেন, যাহারা পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) শাম হইতে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া মদীনার মুসলমানগণকে ডাকিয়া উহার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিলেন, এই যে কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলা আসিতেছে তাহাদের সহিত তাহাদের প্রচুর সম্পদ রহিয়াছে। তোমরা তাহাদের প্রতিরোধে বাহির হও, হয়তোবা আল্লাহ তোমাদিগকে উক্ত সম্পদ গনীমত হিসাবে প্রদান করিবেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৫৬; ইব্ন সায়্যিদিন-নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮১)।

অতঃপর মুসলমানগণকে উক্ত কাফেলার অনুসন্ধানে বাহির হইবার জন্য ঘোষণা দেওয়া হইল। কতক মুসলমান ইহা ভাল মনে করিল এবং বাহির হওয়ার বিষয়টি সহজে মানিয়া লইল। আর কতকে বাহির হওয়া অপছন্দ করিল। ইহা এই কারণে যে, তাহারা ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের সম্মুখীন হইবেন (প্রাগুক্ত)। রাসূলুল্লাহ (স)-ও ইহার জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই বলিয়া ঘোষণা দেন, যে প্রস্তুত আছে সে আমাদের সহিত রওয়ানা হউক। কেহ কেহ একটু দূরে মদীনার উচুঁ অঞ্চলে তাহাদের বাড়িতে গিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন, না, এখনই যে প্রস্তুত আছে সে ব্যতীত আর কেহ নহে (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৯)। এইভাবে তিনি মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী লইয়া উক্ত বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। অপরদিকে আবূ সুফ্য়ান এই সংবাদ পাইয়া দামদাম ইবন 'আমর আল-গিফারীকে মজুরী দিয়া এই সংবাদ কুরায়শদের নিকট পৌঁছাইতে এবং তাহাদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতি লইয়া বাহির হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মক্কায় প্রেরণ করিলেন। আর নিজে সোজা পথে বদরের দিকে না গিয়া সমুদ্রোপকূলের দিক দিয়া বদরকে বাম দিকে রাখিয়া মক্কার পথ ধরিলেন। কুরায়শগণ যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়া বদর প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল। আর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণসহ আবূ সুফ্য়ানের চলিয়া যাওয়ার সঠিক পথ অবহিত হইতে না পারিয়া বদর প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে পৌঁছিয়া তিনি কুরায়শ বাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতিসহ আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়া সাহাবীদের সহিত পরামর্শক্রমে যুদ্ধের পূর্ব-প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও কুরায়শ বাহিনীর সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। সেইমত বদর প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল (প্রাগুক্ত)। পূর্বে হইতে যুদ্ধ করার সংকল্প থাকিলে তিনি আরও সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

(২) এই সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি পোষণ করিয়াছেন পরবর্তী কালের কতিপয় সীরাতবিদ। তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করিয়া সেখানে সুখ-শান্তিতে দিনাতিপাত করিতেছেন এবং নির্বিঘ্নে আপন দীন ইসলাম শুধু পালনই করিতেছেন না, বরং মদীনার প্রায় সকল লোককে তাহাদের অনুসারী বানাইয়া ফেলিতেছেন। ইহা দেখিয়া মক্কার কুরায়শগণ হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। অপরদিকে নিজদের কৃত অত্যাচার ও গভীর ষড়যন্ত্রের কথাও তাহাদের স্মরণে উদিত হইত। তাহারা নিজেদের মানসিকতার হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেছিল যে, সুযোগ পাইলেই মুহাম্মাদ এই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানগণ মদীনায় প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের পক্ষে সিরিয়ার বাণিজ্যপথ যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে তাহাদেরকে যে ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইবে, এই কথাও তাহারা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সকল কারণে মুসলমানদের সহিত যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য কুরায়শ দলপতিগণ আগ্রহী হইয়া উঠে (মোহাম্মদ আকরম খা, মোস্তফা চরিত, পৃ. ৩৯০-৩৯১)।

তাই কিভাবে মুসলমানদের এই দলটিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলীন করিয়া দেওয়া যায়, কিভাবে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা যায়, তাহারা সর্বদা তাহারই ফন্দি-ফিকির করিতে লাগিল এবং সেইজন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এমনকি তাহারা সরাসরি মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছিল। তাহারা মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিল যে, হে মদীনাবাসী! তোমরা আমাদের চরম শত্রু মুহাম্মাদকে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস কর, না হয় নিজেদের দেশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দাও। আমরা কসম করিয়া বলিতেছি যে, এই দুইটি শর্তের কোনও একটি তোমরা অবলম্বন না করিলে আমরা নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাঁদী বানাইয়া লইব (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল খারাজ,২খ., পৃ. ৭৫, বাব ফী খাবরিন-নাদীর)।

মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই কুরায়শদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তচর দল মদীনার দিকে আনাগোনা করিত এবং সুযোগ পাইলেই মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া পালাইয়া যাইত। কুরয ইবন জাবির আল-ফিহরীর কথা পূর্বেই (গাযওয়া বদর আল-উলা অধ্যায়) উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র বাহিনীর লুটতরাজ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং কুরায়শদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করিতে থাকেন। কারণ তিনি কুরায়শদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইয়াছিলেন। এই প্রেক্ষিতেই বুওয়াত ও উশায়রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাযওয়া সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কুরায়শদের হিংসার আগুন নির্বাপিত হইতেছিল না। তাহারা চাহিতেছিল মুসলমানদের সহিত একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। তাই কুরায়শ দল মদীনায় বড় ধরনের একটি আক্রমণের সংকল্প করে। আর ইহার জন্য
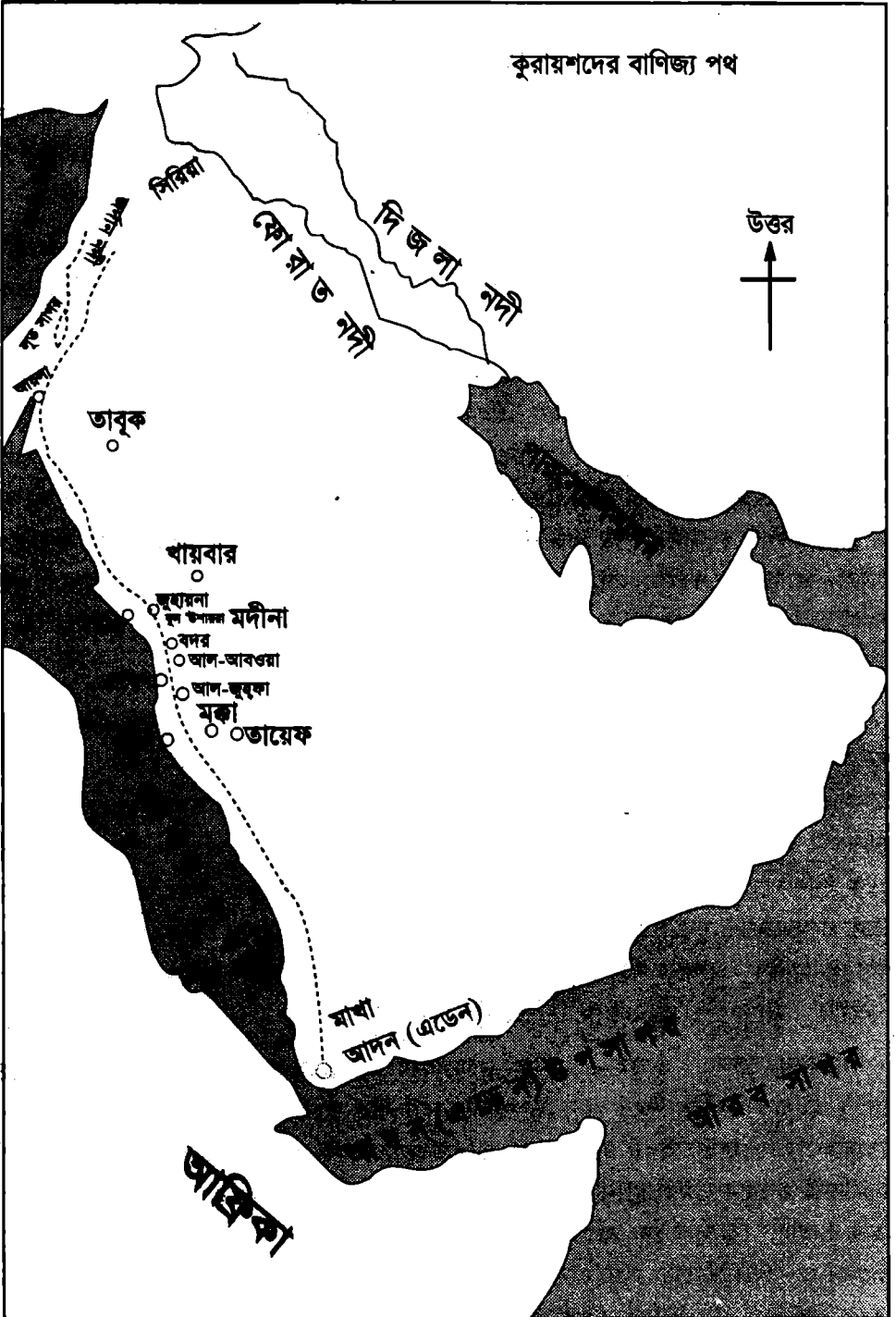
কুরায়শদের বাণিজ্যিক পথ। তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে (আধুনিক প্রকাশনী)।

প্রয়োজন বিপুল অস্ত্রসম্ভার ও অর্থ-সম্পদের, যাহা দ্বারা রসদপত্র সংগ্রহ করা যায়। তাই এই উদ্দেশ্যে তাহারা অগাধ ধন-সম্পদ দিয়া হিজরী দ্বিতীয় সনের জুমাদাল উখরা মাসে আবূ সুফ্য়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ায় প্রেরণ করে। তাহারা এতই গুরুত্বের সহিত সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিল যে, মক্কার নর-নারীদের মধ্যে এক রত্তি বা মাসা পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যও যাহার নিকট ছিল সেও উহা এই কাফেলার সহিত প্রেরণ করিয়াছিল।

মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আবূ সুফ্য়ানের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। তাহার বাণিজ্যসম্ভার বহন করিবার জন্য এক হাজার উট তাহার সঙ্গে চলিল। এই বণিক দল তিন মাস সিরিয়ায় অবস্থান করিয়া সরঞ্জামাদির ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত করিয়া মক্কায় রওয়ানা হয়। তাহারা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই 'নাখলা' নামক স্থানে কুরায়শ গোত্রের 'আমর আল-হাদরামী মুসলমান গুপ্তচরদের হাতে নিহত হয়। ইহাতে কুরায়শদের প্রতিশোধ স্পৃহা বহু গুণে বাড়িয়া যায়। ইতোমধ্যে গুজব রটিল যে, মদীনার মুসলমানগণ কুরায়শদের উক্ত বাণিজ্যিক কাফেলা লুণ্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে মক্কার কুরায়শদের অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িল। কাফেলার সরদার আবূ সুফয়ান সাবধানতাবশত শাম (সিরিয়া) হইতেই মক্কায় দূত পাঠাইয়া দিয়াছিল। এইসব কারণে মক্কার কুরায়শগণ বিরাট বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫খ., পৃ. ৪৮৫-৮৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইলেন। তিনি সকল সাহাবীকে একত্র করিয়া সব ঘটনা তাহাদিগকে খুলিয়া বলিলেন এবং ঘটনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিলেন। অতঃপর আনসার ও মুহাজির সাহাবী উভয় দলই যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ৩১৩ (তিন শত তের) জন সাহাবীসহ ১২ই (এক বর্ণনামতে ৮ই) রমযান মদীনা হইতে বাহির হইলেন। অতঃপর বদর প্রান্তরে পৌঁছিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল (মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ. ৩৯২-৩৯৪; শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৪৬৮-৪৭০)।

ঘটনার সূচনা ঃ ইতিহাস ও সীরাতবিদগণের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে বাহির হইবার দশদিন পূর্বে আবূ সুফয়ানের বাহিনীর সংবাদ লইবার জন্য তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ ও সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-কে সিরিয়ার পথে প্রেরণ করেন। তাহারা সিরিয়ার নিকটবর্তী খুওয়ার নামক স্থানে পৌঁছিয়া কুছায়্যির ইব্ন মালিক আল-জুমাহীর আশ্রয়ে উঠেন। তিনি তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখেন। ইত্যবসরে কুরায়শদের বাণিজ্যিক দল রওয়ানা হইয়া আসে। অতঃপর তাঁহারা কুছায়্যিরসহ 'যুল-মারওয়া' নামক স্থানে আগমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সংবাদ দেওয়ার জন্য মদীনায় আগমন করিয়া দেখিতে পান যে, ইতোমধ্যে তিনি মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। এদিকে আবূ সুফয়ান

দামিশক হইতে পাঁচ দিনের পথ মু'আন নামক বড় দুর্গের নিকটস্থ 'যারকা' নামক স্থানে পৌছিয়া জুযাম গোত্রের এক লোকের নিকট জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের কাফেলার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন আবূ সুফয়ান ও তাহার সঙ্গীবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণ কোথায়ও ওঁৎ পাতিয়া থাকার ভয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হইলেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ১৯)। অতঃপর আবূ সুফয়ান যখন হিজাযের নিকটবর্তী হইলেন তখন একাধিক সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং পথচারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন লোকজনের সম্পদ যেহেতু তাহাদের যিম্মায় রহিয়াছে সেই ভয়ে। ইহারই এক পর্যায়ে তাহাকে কোন এক পথচারী খবর দিল যে, মুহাম্মাদ (স) তোমার ও তোমার কাফেলাকে পাকড়াও করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। এই সংবাদে আবূ সুফয়ান ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দামদাম ইব্ন আমর আল-গিফারী (রা)-কে বিশ মিছকালের বিনিময়ে ভাড়া করিয়া মক্কায় পাঠাইলেন। তাহাকে সংবাদের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন মক্কায় প্রবেশের সময় স্বীয় উটের নাক কাটিয়া দেয়, নিজের পরিহিত জামার অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ ছিড়িয়া ফেলে, অতঃপর কুরায়শদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ রক্ষার্থে দ্রুত বাহির হইবার জন্য প্ররোচিত করে এবং তাহাদিগকে সংবাদ দেয় যে, মুহাম্মাদ তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া উক্ত সম্পদ আটক করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতঃপর দামদাম দ্রুত মক্কার পথে রওয়ানা হইল এবং আবূ সুফয়ান যাহা যাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা পালন করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫৭; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৫০)।

'আতিকা বিন্ত 'আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্নঃ এইদিকে আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিল যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের আভাস ছিল। এই স্বপ্ন মক্কায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে, দামদাম আল-গিফারী মক্কায় আগমনের তিনদিন পূর্বে আতিকা বিন্ত 'আবদিল মুত্তালিব এক স্বপ্ন দেখেন যাহা তাহাকে খুবই বিচলিত করিয়া তোলে। তিনি স্বীয় ভ্রাতা 'আব্বাস-এর নিকট লোক প্রেরণ করেন। তিনি আগমন করিলে আতিকা বলিলেন, ভ্রাত! আমি গত রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি যাহা আমকে খুবই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, আপনার কওমের উপর শীঘ্রই কোন বালা-মুসীবত আসিবে। আপনার নিকট যাহা বিবৃত করিব, আপনি তাহা গোপন রাখিবেন। এক বর্ণনামতে তিনি গোপন রাখিবার কারণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, কুরায়শগণ উহা শুনিলে আমাদিগকে নির্যাতন করিবে এবং এমন কথা শুনাইবে যাহা আমরা পছন্দ করি না (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ১৯)। 'আব্বাস বলিলেন, আপনি কি দেখিয়াছেন? আতিকা বলিলেন, আমি দেখিয়াছি, এক আরোহী তাহার উটের পিঠে করিয়া 'আবতাহ' নামক স্থানে আসিয়া থামিয়াছে। অতঃপর উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, ওহে খিয়ানতকারীদের বংশধর! তোমরা দ্রুত বাহির হও। তিনদিন পরই তোমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। অতঃপর আমি দেখিলাম, লোকজন তাহার নিকট জড়ো হইল,

আর ঐ আগন্তুক তাহার উট লইয়া মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকজনও তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিল, এমন সময় সে তাহার উটকে কা'বার উপর দাঁড় করাইল এবং অনুরূপভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, ওহে খিয়ানাতকারীদের বংশধর! তোমরা দ্রুত বাহির হও। তিনদিন পরই তোমাদের ভীষণ যুদ্ধ। অতঃপর সে তাহার উটকে আবূ কুবায়স পর্বতশীর্ষে দাঁড় করাইয়া আবার চীৎকার করিয়া অনুরূপ কথা বলিল। ইহার পর সে একখানি পাথর লইল এবং পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে ছাড়িয়া দিল। পাথরটি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পর্বতের নিচে আসিয়া উহা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। অতঃপর মক্কার কোনও ঘরবাড়ী এমন রহিল না যেখানে উক্ত পাথরের টুকরা পৌছিল না। ইহা শুনিয়া 'আব্বাস বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! এই স্বপ্ন আপনি গোপন রাখুন, কাহারও নিকট বিবৃত করিবেন না (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫১)।

এক বর্ণনামতে আব্বাস এই কথা বলার পর 'আতিকা আব্বাসকে বলিলেন, আপনিও ইহা গোপন রাখিবেন। ইহা কুরায়শদের নিকট পৌছিলে তাহারা আমাদিগকে নির্যাতন করিবে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২০)।

অতঃপর আব্বাস তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে আল-ওয়ালীদ ইবন উতবা ইবন রাবী'আর সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। আল-ওয়ালীদ ছিলেন আব্বাসের বন্ধু। তিনি তাহাকে উক্ত স্বপ্নের কথা বিবৃত করিলেন এবং তাহাকে গোপন রাখিতে বলিলেন। আল-ওয়ালীদ উহা স্বীয় পিতা ও কুরায়শ নেতা উতবা ইব্ন রাবীআর নিকট বলিলেন। অতঃপর এই স্বপ্নের কথা মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল। এমনকি কুরায়শগণ তাহাদের মজলিসে ইহা আলোচনা করিতে লাগিল (প্রাগুক্ত)।

আব্বাস বলেন, পরদিন সকালবেলা আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতে গেলাম। আবূ জাহল ইব্ন হিশাম তখন কুরায়শদের একটি দলের সহিত বসিয়া আতিকার স্বপ্ন লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া আবূ জাহল বলিল, হে আবুল ফাদ্ল! তাওয়াফ শেষ করিয়া আমাদের নিকট আসিও। আমি তাওয়াফ শেষ করিয়া তাহাদের নিকট গিয়া বসিলাম। তখন আবূ জাহল আমাকে বলিল, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র! এই মহিলা নবী তোমাদিগকে কখন বলিয়াছে? আমি বলিলাম, উহা কি? সে বলিল, আতিকা যে স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা। আমি বলিলাম, সে কি দেখিয়াছে? সে বলিল, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র! তোমরা কি তোমাদের পুরুষদের নবুওয়াতের দাবিতে সন্তুষ্ট নও! এখন তোমাদের মহিলারাও নবুওয়াতের দাবি করিতেছে? মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনামতে আবূ জাহল বলিল, ওহে হাশিমের বংশধর! তোমরা কি পুরুষদের মিথ্যাচারে সন্তুষ্ট নও, এখন মহিলাদের মিথ্যাচার লইয়া আসিয়াছ? তোমরা ও আমরা যেন বহু যুগ ধরিয়া সম্মানের প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছি। এই প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষ যখন সমপর্যায়ে ছিলাম তখন তোমরা বলিলে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন। কিছুদিন পর আবার বলিতেছ, আমাদের মধ্যে একজন মহিলা নবী

আছেন। কুরায়শদের কোনও ঘরে তোমাদের চেয়ে বেশী মিথ্যাবাদী নারী ও মিথ্যাবাদী পুরুষ আছে বলিয়া আমার জানা নাই (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২০)।

এইভাবে আবূ জাহল আব্বাসকে মানসিকভাবে খুবই নির্যাতন করিল। সে আরও বলিল, 'আতিকা মনে করে, তাহার স্বপ্নে সেই আগন্তুক বলিয়াছে তোমরা তিন দিনের মধ্যে বাহির হও। আমরা এই তিনদিন অপেক্ষা করিব। সে যাহা বলিতেছে তাহা যদি উক্ত তিন দিনের মধ্যে সত্যই সংঘটিত হয় তো হইল। আর যদি তিন দিন অতিবাহিত হইয়া যায় অথচ ইহার কিছুই সংঘটিত না হয় তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক অঙ্গীকারনামা লিখিব যে, তোমরা আরবের মধ্যে সর্বাধিক মিথ্যাবাদী পরিবার। আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমার পক্ষ হইতে তাহার প্রতি বড় কোনও প্রতিবাদ ছিল না। আমি কেবল উহা অস্বীকার করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা পৃথক হইয়া গেলাম (ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫৭)। মূসা ইবন উকবার বর্ণনামতে আব্বাস আবূ জাহলকে বলিয়াছিলেন, তুমি কি থামিবে? মিথ্যাচার তোমার ও তোমার পরিবারের মধ্যে। সেখানে উপস্থিত লোকজন বলিল, হে আবুল ফাদ্ল! তুমি তো মূর্খ বা বোকা ছিলে না! ইব্ন আইযও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, আব্বাস বলিলেন, থাম হে হলুদ নিতম্বধারী (নির্লজ্জ)! এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আতিকার পক্ষ হইতে আব্বাস খুব নির্যাতন ও ক্লেশ ভোগ করেন (ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৩-৮৪, সুবুলুল হুদা,৪খ., পৃ. ২০)।

'আব্বাস বলেন, সন্ধ্যাবেলা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর মহিলা কেহই আর বাকী রহিল না, সকলেই আমার নিকট একত্র হইয়া বলিল, আপনি কি ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে, এই পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্ত আপনাদের পুরুষদের ব্যাপারে জঘন্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে, অতঃপর আপনাদের মহিলাদেরকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে আর আপনি নীরবে তাহা শ্রবণ করিয়া যাইবেন? উহা শ্রবণের পরও কি আপনার কোনও আত্মসম্মানবোধ নাই? আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাহা করিব। আমার পক্ষ হইতে তাহার প্রতি যত বড় মারাত্মক আচরণই করিতে হয় আমি তাহা করিব। আল্লাহর কসম! আমি তাহার মুখামুখী হইব। সে যদি পুনরায় উহা বলে তবে আমিই তাহার সহিত বোঝাপড়ায় তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইব (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ, ৫১-৫২)।

আব্বাস বলেন, আতিকার স্বপ্ন দেখার তৃতীয় দিবসের সকালে আমি তেজোদ্দীপ্ত ও রাগান্বিত অবস্থায় অনুভব করিলাম যে, এমন একটি বিষয় আমা হইতে ছুটিয়া গিয়াছে যাহা আমি তাহার নিকট হইতে পাইতে চাহি। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার মুকাবিলা করিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, যাহাতে সে তাহার কথিত মন্তব্য প্রত্যাহার করিয়া লয়। সে ছিল দ্রুতগামী, কঠোর চেহারা, ধারালো বক্তব্য ও প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। হঠাৎ করিয়া সে মসজিদের দরজা দিয়া

বাহির হইয়া গেল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হউক, তাহার কী হইল! সে কি আমার গালির ভয়ে এইরূপ করিল? পরক্ষণেই বুঝিলাম, সে এমন কিছু শুনিয়াছে যাহা আমি শুনি নাই। তাহা হইল দামদাম ইব্ন আমর আল-গিফারীর আওয়ায। সে বাত্ন ওয়াদীতে (উপত্যকায়) চীৎকার করিতেছিল তাহার উটের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায়। সে তাহার উটের নাক কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সওয়ারী ঘুরাইয়া দিয়াছিল এবং নিজের জামা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় সে বলিতেছিল, ওহে কুরায়শ দল! তোমরা সুবাস বহনকারী উট রক্ষা কর। আবূ সুফ্য়ানের সহিত তোমাদের যে সম্পদ রহিয়াছে, মুহাম্মাদ তাহার দলবলসহ উহা আটক করিয়াছে। আমার মনে হয় তোমরা তাহা পাইবে না। হায় সাহায্য! হায় সাহায্য! ইহা শুনিয়া কুরায়শগণ ঘাবড়াইয়া গেল এবং তাহারা আতিকার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িল। আব্বাস বলেন, উদ্ভূত এই ঘটনাই আমাকে তাহা হইতে এবং তাহাকে আমা হইতে ফিরাইয়া রাখিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫২)। তখন আতিকা নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

الم تكن الرويا بحق وجاءكم - بتصديقها فل من القوم هارب

فقلتم ولم اكذب كذبت وإنما - يكذبنا بالصدق من هو كاذب.

" আমার স্বপ্ন কি সত্য ছিল না? কওমের এক লোক উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দ্রুত আগমন করিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ যে, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। অথচ আমি মিথ্যা বলি নাই; প্রকৃতপক্ষে যে নিজে মিথ্যাবাদী সে-ই সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে" (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২১)।

কুরায়শদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ঃ দামদামের এই সংবাদ শুনিয়া কুরায়শগণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। তাহারা দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, মুহাম্মাদ ও তাহার সঙ্গীবৃন্দ কি ধারণা করিয়াছে যে, ইবনুল হাদরামী দলের যে পরিণতি হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে? কখনও না। আল্লাহ্র কসম! তাহারা অন্য কিছু জানিতে পারিবে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫২)। অতঃপর কুরায়শদের সকলেই হয়ত বা নিজে যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল অথবা নিজের স্থলে অন্য এক লোক প্রেরণ করিল। আবূ লাহাব ব্যতীত কুরায়শদের কোনও নেতাই যুদ্ধে গমন করিতে বাকী রহিল না। এক বর্ণনামতে তাহার নিকট গমন করিলে সে যুদ্ধে যাইতে বা তদস্থলে কোনও লোক প্রেরণ করিতে অস্বীকার করে (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২১)। তবে সঠিক বর্ণনামতে সে নিজের পরিবর্তে আল-আস ইব্ন হিশাম ইবনুল মুগীরাকে প্রেরণ করে, যিনি পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ লাহাব আল-আস-এর নিকট চার হাজার দিরহাম পাইত। উহার বিনিময়ে তাহাকে প্রেরণ করিয়া নিজে ঘরে বসিয়া থাকে (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৪)। এক বর্ণনামতে আতিকার স্বপ্নের কারণে আবূ লাহাব ভয় পাইয়া উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২১)।

উমায়্যা 'হুবাল' নামক মূর্তির নিকট তীর নিক্ষেপের দ্বারা লটারী করে। লটারীতে নেতিবাচক দিক নির্ণীত হইলে তাহারা যুদ্ধে গমন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু আবূ জাহল ইবন হিশাম তাহাদিগকে প্ররোচিত করে। ফলে তাহারা নিজেদের সংকল্প ত্যাগ করে। তবে উমায়্যা ইব্ন খালাফ ছিল কুরায়শদের মধ্যে সম্মানিত, বয়োবৃদ্ধ, মোটাসোটা ও ভারী লোক। সে এই সংকল্প করিলে উকবা ইবন আবী মুআয়ত জ্বলন্ত একটি অগ্নির পাত্র লইয়া আগমন করিল। উমায়্যা তখন মসজিদে স্বীয় কওমের সম্মুখে বসিয়াছিল। উকবা পাত্রটি উমায়্যার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, ওহে আবূ আলী! লও, বসিয়া বসিয়া অগ্নি পোহাও। কারণ তুমি তো মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। উমায়্যা বলিল, আল্লাহ তোমাকে এবং তুমি যাহা লইয়া আসিয়াছ তাহাকে কুৎসিত আকার করিয়া দিন। অতঃপর উমায়্যা প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া অন্যান্যের সহিত যুদ্ধে গমন করে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫৮)।

উমায়্যা ইবন খালাফের যুদ্ধ হইতে পিছাইয়া থাকিবার কারণ ইমাম বুখারী (র) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা'দ (রা) উমায়্যা ইব্ন খালাফের বন্ধু ছিলেন। উমায়্যা যখন মদীনায় গমন করিত তখন সা'দ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করিত। অনুরূপভাবে সা'দ (রা)-ও যখন মক্কায় আগমন করিতেন তখন উমায়্যার গৃহে উঠিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরত করিবার পর সা'দ (রা) উমরা করার জন্য মক্কায় গমন করিলে উমায়্যার গৃহে উঠিলেন। সা'দ (রা) উমায়্যাকে বলিলেন, একটু নির্জন সময় দেখ, যাহাতে আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতে পারি। অতঃপর উমায়্যা তাহাকে লইয়া দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে বাহির হইল। ইতোমধ্যে আবূ জাহলের সহিত তাহাদের সাক্ষাত হইল। আবূ জাহল উমায়্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওহে আবূ সাফওয়ান! তোমার সঙ্গে এই লোক কে? সে বলিল, ইনি সা'দ। আবূ জাহল তাহাকে বলিল, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি নিরাপদে মক্কায় তাওয়াফ করিতেছ। অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদিগকে জায়গা দিয়াছ। তোমাদের ধারণামতে তোমরা তাহাদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আবূ সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকিতে তবে নিরাপদে তোমার পরিবারের নিকট কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে পারিতে না। সা'দ (রা) উচ্চস্বরে তাহাকে বলিলেন, তুমি জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি এই কাজে আমাকে বাধা দাও তবে অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার নিকট ইহা হইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ, তাহা হইতে বাধা দিব। আর তাহা হইল তোমার মদীনার নিকট দিয়া যাওয়ার রাস্তা। উমায়্যা তাহাকে বলিল, হে সা'দ! আবুল হাকাম-এর নিকট উচ্চস্বরে কথা বলিও না। কারণ তিনি এই উপত্যকাবাসীদের নেতা। সা'দ (রা) বলিলেন, রাখো হে উমায়্যা! আল্লাহ্র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনিই তোমার হত্যাকারী হইবেন। উমায়্যা বলিল, মক্কায়? সা'দ (রা) বলিলেন, আমি জানি না। ইহা শুনিয়া উমায়্যা ভীষণভাবে ঘাবড়াইয়া গেল। সে তাহার পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হে উম্মু সাফওয়ান! তুমি কি জান, সা'দ আমাকে কি বলিয়াছে? উমায়্যা বলিল, সে বলিয়াছে যে,

মুহাম্মাদ তাহাকে জানাইয়াছে যে, সে আমার হত্যাকারী। আমি তাহাকে বলিলাম, মক্কাতেই? সে বলিল, জানি না। উমায়্যা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মক্কা হইতে বাহির হইব না। অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহল যখন লোকজনকে বাহির হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছিল, তোমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের জন্য বাহির হও তখন উমায়্যা বাহির হইতে পছন্দ করিল না। আবূ জাহল তাহার নিকট আসিয়া বলিল, হে আবূ সাফওয়ান! লোকে যখন দেখিবে যে, তুমি পিছনে থাকিয়া গিয়াছ, আর তুমি উপত্যকাবাসীদের নেতা, তখন তাহারাও তোমার সহিত পিছনে থাকিয়া যাইবে। আবূ জাহল অনবরত তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল, জানিয়া রাখ, তুমি যদি আমার উপর বিজয়ী হইয়া যাও তবে অবশ্যই আমি মক্কার উত্তম উট ক্রয় করিব। অতঃপর উমায়্যা তাহার স্ত্রীকে বলিল, হে উম্মু সাফওয়ান! আমার সফরের প্রস্তুতি কর। স্ত্রী বলিল, হে আবূ সাফওয়ান! তুমি কি তোমার ইয়াছরিবী বন্ধু যাহা বলিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? উমায়্যা বলিল, না, আমি তাহাদের সহিত বেশীদূর যাইব না। অতঃপর উমায়্যা যখন বাহির হইল তখন যে মনযিলেই সে পৌঁছিতেছিল সেখানেই সে তাহার উট বাঁধিয়া দেখিতেছিল। এমনি করিয়া আল্লাহ তা'আলা বদর প্রান্তরে আনিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, বাব যিকরিন নাবিয়্যি মান য়্যুকতালু বিবাদ্‌র, হাদীছ নং ৩৯৫০)।

এক বর্ণনামতে উমায়্যার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় মুহাম্মদ মিথ্যা বলে না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫৯)। ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস বলেন, সীরাতবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা উমায়্যার ভ্রাতা উবাই ইব্‌ন খালাফকে হিজরতের পূর্বে মক্কায় বলিয়াছিলেন এবং তাহাকেই তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন বর্শা দ্বারা স্পর্শ করিয়া হত্যা করেন (উয়ূনুল, আছার, ১খ., পৃ. ২৮৫)।

এমনিভাবে কুরায়শগণ তিন দিনের মধ্যে মতান্তরে দুই দিনের মধ্যে তাহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল। তাহাদের শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বাহির হইতে সাহায্য করিল। সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, তু'আয়মা ইবন আদী, হানজালা ইবন আবী সুফয়ান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ জনগণকে বাহির হইতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। সুহায়ল বলিল, ওহে গালিবের বংশধর! তোমরা কি মুহাম্মাদকে ও তাঁহার সহিত তোমাদের যুবক ধর্মত্যাগীদিগকে ছাড়িয়া দিবে, আর ইয়াছরিববাসী তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা ও সহায়-সম্পদ লইয়া যাইবে? যে সম্পদ চাহিতেছে তাহার জন্য এই আমার সম্পদ রহিল। আর যে শক্তি চাহিতেছে এই আমার শক্তি। অতঃপর উমায়্যা ইবন আবিস সাল্‌ত তাহার প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করে। নাওফাল ইব্‌ন মু'আবিয়া কুরায়শদের সচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট গিয়া তাহাদের সম্পদ ও বাহন যুদ্ধে গমনেচ্ছুদের জন্য খরচ করিবার অনুরোধ জানাইল। আবদুল্লাহ ইবন আবূ রাবী'আ বলিল, এই পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা তুমি যেখানে ইচ্ছা খরচ কর। সে হুওয়ায়তিব ইবন আবদিল 'উযযা হইতে দুই শত, মতান্তরে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা লইল এবং উহা দ্বারা অস্ত্র ও

বাহনের শক্তি বৃদ্ধি করিল। তু'আয়মা ইবন আদী ২০টি উটের ব্যবস্থা করিল এবং উহার আরোহীদের পরিবার-পরিজনের খরচাদির ব্যবস্থাও করিয়া দিল। যুদ্ধের জন্য বাহির হইতে অপছন্দকারী কোনও ব্যক্তিকে তাহারা ছাড়িল না এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, তাহারা মুহাম্মাদ ও তাহার সঙ্গীদের দলভুক্ত। আর এমন কোন মুসলমানকেও ছাড়িল না যাহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তাহারা জানিত। বানূ হাশিমের মধ্য হইতেও আবূ লাহাব ব্যতীত কাহাকেও ছাড়িল না। 'আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব, নাওফাল ইবনুল হারিছ, তালিব ইবন আবী তালিব, 'আকীল ইব্‌ন আবী তালিব প্রমুখকে তাহাদের সঙ্গে লইল (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২১)। এমনিভাবে তাহারা যুদ্ধে গমনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল।

কুরায়শদের বানূ কিনানা ভীতি এবং শয়তানের সান্ত্বনা দান ঃ কুরায়শগণ যখন তাহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল এবং রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইল তখন তাহাদের মধ্যে ও বানূ বাক্‌র ইবন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কিনানার মধ্যে দীর্ঘ দিন হইতে যে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল উহার কথা তাহাদের স্মরণ হইল। তখন তাহারা বলিল, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহারা আমাদের পিছন দিক হইতে আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে। কুরায়শ ও বানূ বাক্‌র গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল 'আমের ইব্‌ন লুআয়্যি গোত্রের হাফ্‌স ইবনুল আখয়াফ তনয়কে কেন্দ্র করিয়া। তাহাকে বানূ বাক্‌র নেতা 'আমের ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আমের ইবনুল মাল্লূহ-এর ইঙ্গিতে উক্ত গোত্রের এক লোক হত্যা করিয়াছিল। নিহতের ভ্রাতা মিকরায ইব্‌ন আখয়াফ ইহার বদলাস্বরূপ 'আমের ইব্‌ন ইয়াযীদকে হত্যা করিয়া তাহার তরবারি কা'বা শরীফের গিলাফের সহিত লটকাইয়া রাখে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

অতঃপর কুরায়শগণ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়ে। ভয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন ইবলীস কিনানা গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম আল-মুদলিজী আল-কিনানী-এর আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল, কিনানা গোত্র তোমাদের পশ্চাত হইতে আক্রমণ করার ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে নিরাপত্তা দান করিতেছি যাহা তোমরা অপছন্দ করিতেছ। ইহাতে তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৩-৫৫)। এই সময় কুরায়শ যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৯৫০, মতান্তরে ১০০০। তাহাদের সঙ্গে ছিল ২০০ ঘোড়া, ৬০০ লৌহবর্ম। সমরাস্ত্রের বিপুল সমাহার ছাড়াও ছিল গায়িকাদল, যাহারা দফ বাজাইয়া এবং মুসলমানদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত গাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬০)। তাহাদের সঙ্গে আরও ছিল ইবলীস সুরাকার আকৃতি ধরিয়া। সে তাহাদিগকে আশ্বাস দিতেছিল যে, তাহাদের সাহায্যার্থে কিনানা গোত্র তাহাদের পিছনে আসিতেছে, কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে না ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৫)। কুরায়শদের এহেন দর্পভরে বাহির হওয়া এবং ইবলীসের আশ্বাসবাণী সম্পর্কে কুরআন কারীমে উক্ত হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَّرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ (٨ : ٤٧-٤٨).

"তোমরা তাহাদের ন্যায় হইবে না যাহারা দম্ভভরে ও লোক দেখাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে এবং লোককে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। স্মরণ কর, যখন শয়তান তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে না। আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকিব" (৮ ঃ ৪৭-৪৮)।

পথিমধ্যে কুরায়শ বাহিনীর আহারের ব্যবস্থা ঃ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সকল সৈন্যের আহারেরও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। মক্কা হইতে বাহির হইবার পর প্রথম দিন আবূ জাহল তাহাদের জন্য দশটি উট যবেহ করিল। অতঃপর 'উসফান নামক স্থানে পৌঁছিয়া উমায়্যা ইব্ন খালাফ ৯টি উট যবেহ করে। সুহায়ল ইব্ন 'আমর, যিনি পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন, কুদায়দ-এ পৌঁছিয়া যবেহ করেন দশটি উট। কুদায়দ হইতে তাহারা সমুদ্র অভিমুখে পানির নিকট গমন করে। সেখানে তাহারা একদিন অবস্থান করে। এই সময় শায়বা ইব্ন রাবী'আ তাহাদের জন্য নয়টি উট যবেহ করেন। পরদিন তাহারা জুহ্ফা নামক স্থানে পৌঁছে। সেখানে উতবা ইবন রাবী'আ তাহাদের জন্য দশটি উট যবেহ করে। অতঃপর তাহারা 'আল-আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে। সেখানে নুবায়হ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ নামক ভ্রাতৃদ্বয় দশটি উট যবেহ করে। এক বর্ণনামতে মুকায়্যিস ইব্ন 'আমর আল-জুমাহী এখানে নয়টি উট যবেহ করে (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯১)। অতঃপর আব্বাস ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব দশটি, অতঃপর আল- হারিছ ইবন 'আমের ইব্ন নাওফাল নয়টি উট যবেহ করে (প্রাগুক্ত)। বদর প্রান্তরে পানির নিকট পৌঁছিয়া আবুল বাখতারী দশটি উট যবেহ করে। এখানে মুকায়্যিস আল-জুমাহী নয়টি উট যবেহ করে। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গে বহনকৃত পাথেয় হইতে আহার করিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, আল-জুহফা পর্যন্ত পৌঁছিতে তাহাদের দশ দিন অতিবাহিত হয় (প্রাগুক্ত; আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬০)।

জুহায়ম ইবনুস সাল্ত-এর স্বপ্ন ঃ আসন্ন যুদ্ধে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যে নিহত হইবে উহা জুহায়ম নামক এক লোক স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উপহাস করিয়া উহা উড়াইয়া দেয়। 'উরওয়া ইবনুয যুবায়র সূত্রে বর্ণিত যে, কুরায়শদের মধ্যে বানূ মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দ মানাফ গোত্রে জুহায়ম ইব্ন আবিস সাল্ত ইব্ন মাখরামা নামে এক লোক ছিল, যিনি পরবর্তী কালে হুনায়ন যুদ্ধকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরায়শ দল যখন জুহফা নামক স্থানে পৌঁছিল তখন জুহায়ম-এর একটু ঘুমের আবেশ হইল। তিনি ভীত অবস্থায় উঠিয়া তাহার সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমরা কি সেই অশ্বারোহীকে দেখিয়াছ, যে এইমাত্র আমার নিকট আগমন

করিয়াছিল? তাহারা বলিল, না, তুমি পাগল হইয়া গিয়াছ। জুহায়ম বলিলেন, এইমাত্র এক অশ্বারোহী আমার নিকট আসিয়া বলিয়া গেল, আবূ জাহল, উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, আবুল বাখতারী, উমায়্যা ইব্ন খালাফ নিহত হইবে। অতঃপর জুহায়ম বদর যুদ্ধে আরও যেসব কুরায়শ নেতা নিহত হইবে তাহাদের নাম বলিলেন। তিনি আরও বলেন, অতঃপর আমি সেই আরোহীকে দেখিলাম, সে তাহার উটের গলদেশে আঘাত করিল। অতঃপর উহাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে ছাড়িয়া দিল। ফলে সেনাবাহিনীর এমন কোনও তাঁবু অবশিষ্ট রহিল না যেখানে উহার রক্ত গিয়া পতিত হয় নাই। ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীগণ বলিল, শয়তানই তোমার সহিত খেলা করিয়াছে। আবূ জাহলের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করা হইলে সে বলিল, তোমরা বানূ হাশিমের মিথ্যাচারের সহিত বানূ মুত্তালিবের মিথ্যাচার লইয়া আসিয়াছ। সেও মুত্তালিব বংশের আর একজন নবী। আগামী কালই জানিতে পারিবে, কে নিহত হয় (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৩; ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯২)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের যাত্রা ঃ রাসূলে কারীম (স) স্বীয় সাহাবীগণকে লইয়া ২য় হিজরী অর্থাৎ হিজরতের ১৯ মাসের মাথায় রামাদান মাসে মদীনা হইতে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে ১২ রামাদান শনিবার (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২), আর ইব্ন হিশাম-এর বর্ণনামতে ৮ রামাদান সোমবার (আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৫) তিনি যাত্রা শুরু করেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিল ৩০৫ জন সাহাবী। তন্মধ্যে ৬৪ জন মুহাজির এবং ২৪১ জন আনসার। এতদ্ব্যতীত ৮ জন সাহাবীর এই সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হওয়ার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গত কারণে তাহারা মদীনায় থাকিয়া গিয়াছিলেন যাহাদিগকে এই যুদ্ধে শামিল বলিয়া গণ্য করা হয়। তন্মধ্যে ৩ জন মুহাজির এবং ৫ জন আনসার। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে গনীমাতের অংশ প্রদান করেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২)।

মুহাজিরগণ হইলেন ঃ (১) উছমান ইব্ন আফফান (রা), তাঁহার স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা রুকায়্যা (রা) অসুস্থ থাকায় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া যান, এই রোগেই তিনি ইনতিকাল করেন; (২) তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ও (৩) সা'ঈদ ইবন যায়দ; এই দুইজনকে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ সুফয়ানের কাফেলার খবর সংগ্রহ করার জন্য গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন। আনসারগণ হইলেনঃ (১) আবূ লুবাবা ইব্ন 'আবদিল মুনযির। তিনি যথারীতি সাহাবীগণের সহিত বাহির হইয়াছিলেন কিন্তু আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনার গভর্নর বানাইয়া প্রেরণ করেন; (২) 'আসিম ইব্ন 'আদী আল-আজলানী; রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আপার মদীনার শাসকরূপে নিয়োগ দিয়া পাঠান; (৩) আল-হারিছ ইব্ন হাতিব আল-'উমরী; তাঁহাকেও রাসূলুল্লাহ (স) আর-রাওহা হইতে বানূ 'আমর ইব্ন 'আওফ গোত্রের নিকট ফেরত পাঠান। কারণ তাহাদের সম্পর্কে বিশেষ কোনও সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স) অবহিত হন; (৪) আল-হারিছ ইবনুস সিম্মা ও (৫) খাওওয়াত ইবন জুবায়র; উভয়কেই পায়ে অসুবিধার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) আর-রাওহা হইতে ফেরত পাঠান (প্রাগুক্ত; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৬)।

মদীনার মসজিদে সালাতের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে দায়িত্ব প্রদান করিয়া আসেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৫)। মদীনা হইতে এক মাইল দূরে 'আবূ 'ইনাবা' নামক কূপের নিকট পৌঁছিয়া তিনি সৈন্যদিগকে বাঁছাই করিলেন। এই সময় তিনি যাহাদিগকে অল্পবয়স্ক মনে করিলেন তাহাদিগকে মদীনায় ফেরত পাঠাইলেন। যাহাদিগকে তিনি ফেরত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন ঃ (১) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার; (২) উসামা ইব্ন যায়দ; (৩) রাফে ইব্ন খাদীজ; (৪) আল-বারাআ ইব্ন 'আযিব; (৫) উসায়দ ইব্ন হুদায়র; (৬) যায়দ ইব্ন আরকাম ও (৭) যায়দ ইব্ন ছাবিত। এতদ্ব্যতীত 'উমায়র ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কেও তিনি ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্দেশ শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অনুমতি দেন। বদর প্রান্তরে এই যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৩)।

মদীনা হইতে চার মারহালা দূরে 'আস-সুক্য়া' নামক স্থানে পৌঁছিয়া সেখানকার কূপ হইতে পানি পান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজেও উহা হইতে পানি পান করিলেন, সেখানকার গৃহের নিকট সালাত আদায় করিলেন এবং সেই দিন মদীনার জন্য এই দু'আ করিলেন ঃ

اللهم ان إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لاهل مكة وانى محمد عبدك ونبيك ادعوك لاهل المدينة أن تبارك لهم فى صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب الينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم اللهم انى حرمت ما بين لابتيها كما حرم ابراهيم خليلك مكة.

"হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) তোমার বান্দা, তোমরা বন্ধু, তোমার নবী। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য দু'আ করিয়াছেন। আর আমি মুহাম্মাদ তোমার দাস ও তোমার নবী। আমি মদীনাবাসীর জন্য তোমার নিকট এই দু'আ করিতেছি যে, তুমি তাহাদের সা' ও মুদ্দ ওজন পরিমাণে ও ফল-ফলাদিতে বরকত দাও। উহাতে যত মহামারী আছে সব খুম্ম (জুহফা হইতে তিন মাইল দূরে একটি স্থান)- এ আনিয়া দাও। হে আল্লাহ! আমি উহার দুই প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী অংশকে হারাম করিলাম, যেমনিভাবে তোমার খলীল ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম করিয়াছিলেন" (প্রাগুক্ত)।

'আস-সুক্য়া' হইতে রবিবার সন্ধ্যায় তিনি রওয়ানা হন এবং দু'আ করেন ঃ

أللهم انهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فاشبعهم وعالة فاغنهم من فضلك.

"হে আল্লাহ! ইহারা নগ্নপদবিশিষ্ট (পদাতিক), ইহাদেরকে বাহন দাও। ইহারা উলংগ বদন, খালী শরীর বিশিষ্ট; ইহাদিগকে কাপড় পরিধান করাও। ইহারা ক্ষুধার্ত; ইহাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার দান কর এবং ইহারা দরিদ্র; ইহাদিগকে তোমার অনুগ্রহে স্বনির্ভর কর" (প্রাগুক্ত)।

পতাকা ঃ মুসলিম বাহিনীর প্রধান পতাকা ছিল শ্বেত বর্ণের। রাসূলুল্লাহ (স) উহা মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর হাতে দিলেন। আরও দুইটি কৃষ্ণবর্ণের পতাকা ছিল। ইহার একটি ছিল 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর হাতে। ইহার নাম ছিল উকাব। আলী (রা)-এর বয়স ছিল এই সময় ২০ বৎসর। আর অপরটি ছিল একজন আনসার সাহাবীর হাতে (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৬)। ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে মুহাজিরদের পতাকা ছিল মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-র নিকট। খাযরাজদের পতাকা ছিল আল-হুবাব ইবনুল মুনযির-এর নিকট। আর আওসদের পতাকা ছিল সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর নিকট (আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪)। ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস বলেন, তবে প্রসিদ্ধ হইল, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) সেদিন আরীশ-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। আর মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত আলী (রা)-এর হাতে ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৬)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী এই উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বলেন, ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনা রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৪)। অর্থাৎ পথ অতিক্রমকালে উল্লিখিত তিনজনের হাতে ছিল তিন গোত্রের পতাকা। আর যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছার পর যুদ্ধকালীন সময়ে সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) আরীশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন এবং মুহাজিরদের পতাকা ছিল আলী (রা)-র হাতে। কুরায়শদের নিকটও তিনটি পতাকা ছিল ঃ একটি আবূ আযীযের হাতে, একটি আন-নাদর ইবনুল হারিছের হাতে এবং একটি তাল্‌হা ইব্‌ন আবী তালহার হাতে (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৫৮)।

মুসলমানদের ঘোড়া ও উটের সংখ্যা ঃ মুসলমানদের যুদ্ধের উপকরণ ছিল খুবই কম। তাহাদের সহিত মাত্র দুইটি ঘোড়া (মতান্তরে তিনটি) এবং ৭০টি উট ছিল। আল-উমাবীর বর্ণনামতে একটি ঘোড়ার আরোহী ছিলেন মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা) এবং অপরটির আরোহী ছিলেন আয-যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রা)। সেনাবাহিনীর ডাইন দিকের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা (রা) এবং বামদিকের নেতৃত্বে ছিলেন আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)। আল-উমাবীর অপর এক বর্ণনামতে দুইজন অশ্বারোহীর মধ্যে আয-যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রা) ডানদিকের এবং অপর অশ্বারোহী আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বাম দিকের নেতৃত্বে ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬০)। হযরত আলী (রা) হইতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমাদের সঙ্গে দুইটি ঘোড়াই ছিল। একটি যুবায়র-এর, অপরটি আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ-এর (প্রাগুক্ত)। ইউসুফ সালিহী আশ-শামীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঘোড়া দুইটির নামও উল্লেখ করিয়াছেন ঃ মিকদাদের ঘোড়ার নাম ছিল 'সাবহা', মতান্তরে বা'রাজা এবং আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা)-এর ঘোড়ার নাম ছিল 'আস-সায়ল', মতান্তরে আল-ইয়া'সূব (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৪-২৫)। ইব্‌ন সা'দ-এর এক বর্ণনামতে বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিনটি ঘোড়া ছিল। তৃতীয়টি ছিল মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ আল-গানাবী (রা)-এর; উহার নাম ছিল

'আস-সায়ল' (আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৪, ৩খ., পৃ. ৪৮)। রাসূলুল্লাহ (স) কায়স ইব্ন আবী সা'সা'আকে সাকা- এ নিযুক্ত করেন এবং আস-সুক্‌য়া অঞ্চল হইতে পৃথক হইবার পর মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আবূ 'ইনাবা কূপের নিকট তাহাদিগকে থামাইয়া গণনা করেন এবং গণনাশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করেন যে, তাহারা সংখ্যায় ৩১৩ জন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) খুশী হইয়া বলিলেন, ইহা তালূত বাহিনীর সংখ্যা (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২৫)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে ৭০টি উট ছিল। উহাতে তাহারা পালাক্রমে আরোহণ করিতেছিলেন। তিন তিনজন করিয়া তাহারা একটি উটে আরোহণ করিতেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ২৪)। ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স), আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ও মারছাদ ইব্ন আবী মারছাদ আল-গানাবী (রা) একটি উটে, হামযা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, যায়দ ইবন হারিছা (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্ত দাস আবূ কাবশা ও আনাস (রা) পালাক্রমে একটি উটে এবং আবূ বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও 'আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) একটি উটে আরোহণ করিতেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৫-৫৬)। তবে ইমাম আহমাদ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

عن ابن مسعود قال كانوا يوم بدر بين كل ثلاثة نفر بعير وكان على وابو لبابة زميل رسول الله ﷺ قال اذا كانت عقبة النبى ﷺ قالا له اركب حتى نمشى عنك فيقول ما انتما باقوى منى وما انا باغنى عن الاجر منكما.

"তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় আমরা তিনজন করিয়া একটি উটে আরোহণ করিয়াছিলাম। একটি উটে আবূ লুবাবা ইব্ন আবদিল মুনযির ও আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহগামী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদব্রজে চলিবার পালা আসিলে তাঁহার সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, আপনার পক্ষ হইতে আমরাই হাঁটিয়া চলি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা দুইজন আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী নহ। আর আমি সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে তোমাদের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ৪১১, নং ৩৯০১; পৃ. ৪১৮, নং ৩৯৬৫; পৃ. ৪২২, নং ৪০০৯; পৃ. ৪২৫, নং ৪০২৯)।

হাফিজ ইব্ন কাছীর ইহা বর্ণনা করিয়া উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন যে, সম্ভবত ইমাম আহমাদ ও নাসাঈর বর্ণনাটি আবূ লুবাবা (রা)-কে আর-রাওহা হইতে মদীনায় ফেরত পাঠাইবার পূর্বের। তাহাকে ফেরত পাঠাইবার পর তদস্থলে তাঁহার সহগামী হন মারছাদ ইবন আবী মারছাদ আল-গানাবী (প্রাগুক্ত)। হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত যে, এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) উটের গলা হইতে ঘণ্টাধ্বনি কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দেন (প্রাগুক্ত)।

'উবায়দা ইবনুল হারিছ, আত-তুফায়ল ও আল-হুসায়ন ইবনুল হারিছ ভ্রাতৃবর্গ ও মিসতাহ ইবন উছাছা উবায়দা ইবনুল হারিছের ক্রয়কৃত উটের পিঠে, মুআয, আওফ ও মুআওবিয ইব্ন আফরা' ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁহাদের দাস আবুল হামরা একটি উটে এবং উবাই ইব্ন কা'ব, উমারা ইব্ন হায্‌ম ও হারিছা ইবনুন নু'মান একটি উটে আরোহণ করিতেছিলেন। আল-ওয়াকিদী ইহার আরও দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রদান করিয়াছেন (দ্র. কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ২৪-২৫)।

বদরের রাস্তা ঃ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণসহ মদীনা হইতে মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা মদীনার গিরিপথ ধরিয়া, 'আকীক, যুল-হুলায়ফা, 'উলাতুল-জায়শ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, অতঃপর তুরবান (মদীনা হইতে একদিনের পথ), মালাল (মদীনা হইতে ২৮ মাইল দূরে), মারায়ায়ন-এর গামীসুল হামাম, সুখায়রাতুল ইয়ামাম, আস-সায়ালা, ফাজজুর রাওহা ও শানূকা হইয়া চলেন। ১৪ই রামাদান ইরকুজ-জারয়া নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা এক বেদুঈনের সাক্ষাত পাইলেন। তাহারা তাহাকে আবূ সুফ্য়ান ও তাহার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহার নিকট কোন সংবাদ পাইলেন না। সাহাবীগণ তাহাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম কর। সে বলিল, তোমাদের মধ্যে কি রাসূলুল্লাহ (স) আছেন? তাহারা বলিলেন, হাঁ। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম করিয়া বলিল, আপনি যদি আল্লাহ্র রাসূল হন তবে বলুন, আমার এই উটের পেটে কি আছে? সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক্শ (রা) তাহাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করিও না, বরং আমার নিকট আস। আমিই তোমাকে এই ব্যাপারে সংবাদ দিব। তুমি উহার সহিত অপকর্ম করিয়াছ। তাই উহার পেটে তোমার বাচ্চা রহিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, থাম! লোকটি সম্পর্কে তুমি অশ্লীল কথা বলিয়াছ। অতঃপর তিনি সালামা (রা) হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৬-৫৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬১; কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ১৫ই রামাদান বুধবার রাত্রে সাজসাজ তথা রাওহা কূপের নিকট অবতরণ করিলেন এবং সেখানে সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি যখন মুনসারিফ নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন মক্কার পথ বামে রাখিয়া ডানদিকে আন-নাযিয়া হইয়া বদরের দিকে চলিলেন, তাহার পর উহার এক প্রান্তের দিকে চলিলেন। এমনিভাবে তিনি আন-নাযিয়া ও মাদীকিস-সাফরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রুহ্কান নামক উপত্যকা অতিক্রম করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে রওয়ানা হইলেন। আস-সাফরা নামক স্থানের নিকটবর্তী হইলে তিনি বানূ সা'ইদা গোত্রের মিত্র বাসবাস ইব্ন 'আমর আল-জুহানী ও বানুন-নাজ্জার-এর মিত্র আদী ইব্ন আবিল যাগবা আল-জুহানী (রা)-কে গোপনে আবূ সুফ্য়ানের কাফেলার সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য বদর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৭; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৫)।

মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে মদীনা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই প্রেরণ করেন। অতঃপর তাহারা ফেরত আসিয়া আবূ সুফ্য়ানের বাণিজ্যিক কাফিলার খবর দিলে তিনি লোকজনসহ উহার উদ্দেশ্যে বাহির হন। হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) বলেন, ইব্ন ইসহাক ও মূসা ইব্ন উকবা উভয়ের বর্ণনাই যদি সঠিক হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে দুইবার প্রেরণ করেন। প্রথমবার মদীনায় থাকাকালে, আর দ্বিতীয়বার এই স্থানে আগমন করিয়া (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬২)।
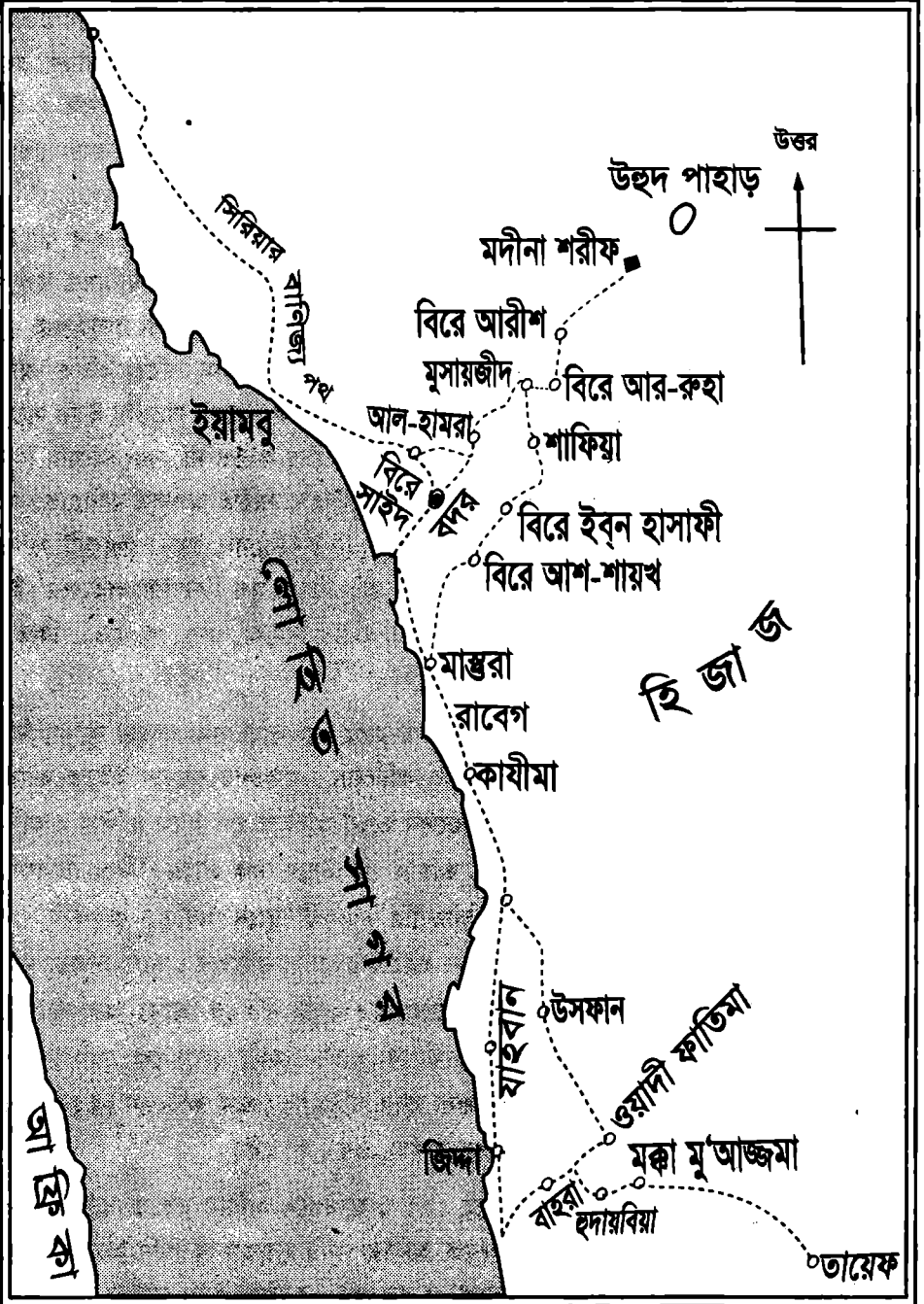
উপরিউক্ত মানচিত্রে কাফেলাসমূহের মক্কা ও মদীনা হইতে বদর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা প্রদর্শিত হইল (তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে, আধুনিক প্রকাশনী)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আস-সাফরা নামক গ্রামে পৌঁছিলেন । ইহা ছিল দুইটি পর্বতের মধ্যখানে অবস্থিত। তিনি উক্ত পর্বতদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকজন বলিল, উহার একটিকে বলা হয় 'মুসলিহ' এবং অপরটিকে 'মুখ্‌রি'। তিনি উহার অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, ইহারা গিফার গোত্রের দুইটি শাখা বানুন-নাজজার ও বানূ হুরাক। রাসূলুল্লাহ (স) উহার মধ্য দিয়া যাইতে অপছন্দ করিলেন। তিনি পর্বতদ্বয় ও সেখানকার অধিবাসী গোত্রের শাখাদ্বয়ের নাম শুনিয়াই তাহা অপছন্দ করিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত পথ ত্যাগ করিলেন এবং আস-সাফরাকে বামে রাখিয়া ডান দিকে একটি উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিলেন যাহাকে যাফেরান বলে। আড়াআড়ি ভাবে তিনি উক্ত উপত্যকা পাড়ি দিয়া সেখানে অবতরণ করিলেন।

সাহাবীদের সহিত পরামর্শ ঃ এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ আসিল যে, কুরায়শগণ বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করিতে পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি লইয়া আগমন করিতেছে। তিনি সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন এবং তাহাদিগকে কুরায়শদের সংবাদ অবহিত করাইলেন। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি উত্তম পরামর্শ দিলেন। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনিও উত্তম পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহারা কুরায়শ, সম্মানিত লোক। আল্লাহ্‌র কসম, যেদিন হইতে তাহারা সম্মান লাভ করিয়াছে তাহার পর আর কখনও অপদস্থ হয় নাই। আল্লাহ্‌র কসম! যেদিন হইতে তাহারা কুফরী করিয়াছে আর কখনও ঈমান আনয়ন করে নাই। আল্লাহ্‌র কসম! উহারা কখনও উহাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হইতে দিবে না, বরং অবশ্যই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে। সুতরাং আপনি সেইজন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪৮)।

অতঃপর মিকদাদ ইব্‌ন 'আমর (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যাহা দেখাইয়াছেন (ভিন্ন বর্ণনায় যাহার নির্দেশ দিয়াছেন) সেইদিকে আমাদিগকে লইয়া চলুন। আমরা আপনার সঙ্গেই থাকিব। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনাকে সেইরূপ বলিব না, মূসা (আ)-কে বানূ ইসরাঈল যেইরূপ বলিয়াছিল। আল্লাহর বাণী ঃ

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

"তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব" (৫ঃ ২৪); বরং আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধ করিব। এক বর্ণনায় ইহাও আছে, আমরাও আপনার ডানে-বামে, অগ্রে-পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিব" (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২৬; কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪৮)। তিনি আরও বলিলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আমাদিগকে 'বারকুল গিমাদ' (ইয়ামানের, মতান্তরে হাবশার একটি স্থান) নামক স্থানেও লইয়া যান তবুও আমরা সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত আপনার সহিত চলিতে থাকিব। ইহা

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৭-৫৮; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৮)।

ইহার পরও রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ওহে লোকসকল! আমাকে পরামর্শ দাও। ইহা দ্বারা তিনি আনসারদের পরামর্শই কামনা করিতেছিলেন। কারণ তাহারা ছিল সংখ্যায় বেশী। উপরন্তু বায়'আতে 'আকাবার সময় তাহারা যে শপথ করিয়াছিল তাহাতে বলিয়াছিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের গৃহে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা আপনার দায় দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আপনি যখন আমাদের নিকট পৌঁছিবেন তখন আপনার দায়দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাইবে। আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি ও মহিলাদিগকে যেভাবে রক্ষা করি আপনাকেও সেভাবে রক্ষা করিব"। তাই রাসূলুল্লাহ (স) আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন যে, মদীনার বাহিরে যেসব শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিবে সেইসব শত্রুর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহায্য করা আনসারগণ নিজেদের জন্য জরুরী মনে করিবে না। আর তাঁহারও উচিৎ নহে তাহাদিগকে নিজ দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লইয়া যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথা শুনিয়া সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মনে হয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ। সা'দ (রা) বলিলেন, আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, আপনাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন তাহাই সত্য। এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে আমাদের পক্ষ হইতে শ্রবণ ও আনুগত্য করার অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছি। তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন। আমরা আপনার সঙ্গেই থাকিব। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আমাদিগকে লইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন তবে আমরাও আপনার সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িব। আমাদের মধ্য হইতে একজন লোকও পিছনে থাকিবে না। আমরা ইহা অপছন্দ করিব না যে, আপনি আগামী কাল আমাদিগকে আমাদের শত্রুর সম্মুখে হাজির করিবেন। আমরা যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যশীল, সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। হয়তোবা আল্লাহ আপনাকে এমন জিনিস দেখাইবেন যাহাতে আপনার চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ্র রহমত ও বরকতে আমাদিগকে লইয়া চলুন।

হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) ইব্ন মারদুয়ায়হ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ইহাও বলিয়াছিলেন, আপনি যদি আমাদিগকে ইয়ামানের বারকুল গিমাদেও লইয়া যান তবে আমরা অবশ্যই আপনার সহিত যাইব। আমরা তাহাদের মত হইব না যাহারা মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল, "তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকব" বরং আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের অনুসরণ করিব। আপনি হয়তোবা এক কাজের জন্য বাহির হইয়াছিলেন, আল্লাহ্ তদস্থলে অন্য এক কাজের

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখুন। আল-উমাবী তাঁহার মাগাযীর বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সা'দ (রা) বলিয়াছিলেন, আমাদের সম্পদ হইতে যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন, আর যাহা ইচ্ছা আমাদিগকে দিন। তবে আমাদের নিকট হইতে আপনি যাহা গ্রহণ করিবেন তাহাই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় যাহা আমাদের জন্য রাখিয়া দিবেন তাহার তুলনায়। আপনি আমাদিগকে যে কোনও আদেশ দিবেন আমরা তাহা মান্য করিব। আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি বারকুল গিমাঁদেও পৌছিয়া যান, আমরাও আপনার সহিত যাইব (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ আমাকে দুইটি দলের একটির অঙ্গীকার করিয়াছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি যেন এখনই কুরায়শ কওমের পরাজয় দেখিতে পাইতেছি (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৬২; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৭-৫৮)। সহীহ মুসলিম-এর রিওয়ায়াতে এই বক্তব্য খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, গাযওয়া বদর, হাদীছ নং ৪৪৭০)।

তবে ইহা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর বক্তব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইব্ন ইসহাক, মূসা ইব্ন উকবা, ইব্ন সা'দ প্রমুখ ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন উকবা ও ইব্ন ইসহাক তাঁহাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। আল-ওয়াকিদী, ইবনুল কালবী ও আল-মাদাইনী তাঁহাকে বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা হইল, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সকলের ঘরে ঘরে গিয়া তাহাদিগকে বাহির করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় আর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সা'দ যদিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই তবুও সে উহাতে যোগদানে আগ্রহী ছিল (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ৬১৪; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৮৯)।

কোনও কোনও বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে গনীমাতের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সুপ্রমাণিত নহে। যুদ্ধ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত যাহারা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের কেহই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি উহুদ ও খন্দকসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ১৮৯)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যাফিরান হইতে রওয়ানা হইয়া 'আল-আসাফির' নামক উপত্যকার নিকট দিয়া চলিলেন। তারপর আসাফির ও বদর-এর মধ্যে অবস্থিত আদ-দাব্বা নামক একটি শহরে অবতরণ করিলেন। ডানে রহিল পর্বতের ন্যায় বিশাল হান্নান নামক একটি

বালুকার ঢিবি। তিনি বদরের নিকটবর্তী এক স্থানে অবতরণ করিলেন। অতপর তিনি ও আবূ বাক্র (রা) কুরায়শদের খবরাখবর লইতে বাহনে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা আরবের এক বৃদ্ধলোকের নিকট আসিয়া থামিলেন। কুরায়শ এবং মুহাম্মাদ ও তাঁহার সাথী-সঙ্গীদের সম্পর্কে তাহার নিকট কি সংবাদ আছে তিনি তাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধলোকটি বলিল, তোমরা কাহারা, সেই কথা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে কোনও সংবাদই দিব না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আপনি যখন আমাদিগকে উক্ত সংবাদ বলিবেন তখন আমরাও আপনাকে বলিব যে, আমরা কাহারা। বৃদ্ধ বলিল, ইহা কি উহার বিনিময়ে? তিনি বলিলেন, হাঁ।

বৃদ্ধ বলিল, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁহার সাথী-সঙ্গীবৃন্দ অমুক অমুক দিন বাহির হইয়াছে। সংবাদদাতা সত্য হইলে তাহারা আজ অমুক অমুক স্থানে আছে। যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন, লোকটি সেই স্থানের কথাই বলিল। সে আরও বলিল, আমার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, কুরায়শগণ অমুক অমুক দিন বাহির হইয়াছে। সংবাদদাতা যদি আমার নিকট সত্য বলিয়া থাকে তবে তাহারা আজ অমুক অমুক স্থানে আছে। ঠিক যেখানে কুরায়শগণ ছিল বৃদ্ধ লোকটি সেখানকার কথাই বলিল। লোকটি তাহার সংবাদ প্রদান করিয়া বলিল, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমরা পানির নিকট হইতে আসিয়াছি। অতঃপর তাহারা বৃদ্ধের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ তখন বলিতেছিল, কোন্ পানির নিকট হইতে? ইরাকের পানি? ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে উক্ত বৃদ্ধের নাম ছিল সুফয়ান আদ-দামরী (আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫৮-৬৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি আলী ইবন আবী তালিব, আয-যুবায়র ইব্নুল 'আওওয়াম ও সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা)-কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর-এর কূপের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা কুরায়শদের উটের পানি পান করাইবার স্থানে পৌছিয়া বানূ হাজ্জাজের দাস আসলাম ও বানুল 'আস ইব্ন সাঈদের দাস 'আবীদ আবূ ইয়াসারকে পাইয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। দাসদ্বয় বলিল, আমরা কুরায়শদের পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাহাদের জন্য পানি সংগ্রহের নিমিত্ত তাহারা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম তাহাদের এই সংবাদ অপছন্দ করিলেন। তাঁহারা সন্দেহ করিতেছিলেন যে, ইহারা আবূ সুফ্য়ানের লোক। তাই তাঁহারা উহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহারের মাত্রা বাড়িয়া গেলে তাহারা বলিল, আমরা আবূ সুফয়ানের লোক। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম প্রহার বন্ধ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) রুকূ-সিজদা সমাপ্ত করিয়া সালাম ফিরাইয়া বলিলেন, ইহারা যখন তোমাদের নিকট সত্য কথা বলিয়াছিল তখন তোমরা প্রহার করিয়াছ, আর যখন মিথ্যা কথা বলিয়াছে তখন ছাড়িয়া দিয়াছ। আল্লাহ্র কসম! তাহারা সত্য বলিয়াছে। তাহারা কুরায়শদের

লোক। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে কুরায়শদের সংবাদ দাও। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম! তাহারা এই বালুর টিবির অপর প্রান্তে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগকে বলিলেন, উহাদের সংখ্যা কত? তাহারা বলিল, বহু। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহাদের সংখ্যা কত? তাহারা বলিল, আমরা জানি না। তিনি বলিলেন, তাহারা প্রতি দিন কতটি পশু যবেহ্ করে? উহারা বলিল, একদিন নয়টি, একদিন দশটি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাদের সংখ্যা হইবে নয় শত হইতে এক হাজারের মধ্যে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাদের মধ্যে কুরায়শ নেতা কে কে আছে? তাহারা বলিল, উতবা ইবন রাবী'আ, শায়বা ইবন রাবী'আ, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিযাম, নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ, আল-হারিছ ইব্ন 'আমের ইব্ন নাওফাল, তু'আয়মা ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল, আন-নাদ্র ইব্নুল হারিছ, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, উমায়্যা ইব্ন খালাফ, নুবায়হ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ ও সুহায়ল ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আব্দ উদ্দ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কা তাহার কলিজার টুকরাগুলিকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯০-৯১; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৭-২৮)।

দূতদ্বয়ের সংবাদ সংগ্রহ ঃ বাসবাস ইব্ন 'আমর ও 'আদী ইবন আবিয-যাগবা (রা) পূর্বেই কুরায়শদের তথ্যানুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা বদর প্রান্তরে আসিয়া অবতরণ করিয়া পানির নিকটবর্তী একটু উঁচু ভূমিতে তাঁহাদের উট বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তাঁহারা পানি আনিবার জন্য পানির মশক সঙ্গে লইলেন। মাজদী ইব্ন আমর আল-জুহানী তখন পানির নিকট ছিলেন। 'আদী ও বাসবাস শুনিতে পাইলেন যে, পানির নিকটেই স্থানীয় দুইজন দাসী ঝগড়া করিতেছে, এক দাসী অপরজনকে পাকড়াও করিয়াছে। পাকড়াওকৃত দাসী তাহার সঙ্গিনীকে বলিতেছে, আগামী কাল বা পরশু এখানে একটি কাফেলা আসিবে। তখন তাহাদের কাজ করিয়া আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করিয়া দিব। তখন মাজদী বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিল। 'আদী ও বাসবাস ইহা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা তাহাদের উটের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন এবং সেখান হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া যাহা তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬০)।

কাফেলাসহ আবূ সুফ্য়ানের পলায়ন ঃ অপরদিকে আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব মুসলমানদের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে তাহার কাফেলার আগে ভাগে অগ্রসর হইয়া উক্ত পানির নিকট আগমন করিল। এখানে আসিয়া সে মাজদী ইব্ন 'আমরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে কাহারও আগমন টের পাইয়াছ? সে বলিল, আমি তো অপরিচিত কাহাকেও দেখি নাই। তবে দুইজন আরোহীকে দেখিয়াছি, যাহারা এই উঁচু ভূমিতে তাহাদের উট বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের মশকে পানি ভরিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন আবূ সুফ্য়ান তাহাদের উট বাঁধার স্থানে

গমন পূর্বক উটের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিল, অতঃপর উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং উহাতে খেজুরের আঁটি পাইয়া বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্‌র কসম! ইহা ইয়াছরিবের খেজুরের আঁটি। এক বর্ণনামতে সে উহা শুকিয়া দেখিয়া এই মন্তব্য করিয়াছিল, অতঃপর দ্রুত তাহার সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং কাফেলাকে লইয়া বদর প্রান্তর বাম দিকে রাখিয়া পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলের দিকে চলিয়া গেল। কাফেলাসহ সে খুব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। এইভাবে একরাত একদিন চলিবার পর তাহারা মুসলমানদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২২৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৫)।

কুরায়শদের নিকট আবূ সুফ্য়ানের সংবাদ প্রেরণ ঃ আবূ সুফয়ান যখন দেখিল যে, সে তাহার কাফেলাসহ মুসলিম বাহিনীর নাগালের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। কাফেলার সবাই এখন নিরাপদ, তখন কায়স ইব্ন ইমরুউল কায়স-এর মাধ্যমে কুরায়শদের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, তোমরা তো তোমাদের কাফেলা, তোমাদের লোকজন ও তোমাদের সম্পদ রক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলে। অথচ আল্লাহ উহা রক্ষা করিয়াছেন। তাই তোমরা ফিরিয়া আস। এই সংবাদ পাইয়া আবূ জাহল ইব্ন হিশাম বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা বদর প্রান্তরে অবতরণ না করিয়া ফিরিবনা। বদর প্রান্তরে আরবদের মেলা বসিত। প্রতি বৎসর এখানকার বাজারে আরবের সকলে একত্র হইত। তাই আবূ জাহল বলিল, আমরা এইখানে তিনদিন অবস্থান করিব। উট যবেহ করিব, খাওয়া-দাওয়া করিব এবং মদ পান করিব, আর গায়িকা দাসীরা আমাদিগকে গান শুনাইবে। সমস্ত আরবের লোকজন আমাদের আগমন সমাগমের কথা শুনিবে। ফলে ইহার পর হইতে তাহারা সর্বদা আমাদিগকে ভয় করিবে। তাই চল, আমরা তথায় গমন করি।

কিন্তু বুদ্ধিমান নেতৃবর্গ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অপছন্দ করিতেছিল। যাহারা পিছুটান দিতেছিল তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলঃ আল-হারিছ ইব্ন 'আমের, উমায়্যা ইব্ন খালাফ, 'উতবা ও শায়বা ইবন রাবী'আ, হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বাখতারী, 'আলী ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খালাফ, আল-'আস ইব্ন মুনাব্বিহ প্রমুখ। কিন্তু আবূ জাহল তাহাদিগকে কাপুরুষতার অপবাদ দিতে লাগিল। আর এই কাজে উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত ও আন-নাদর ইবনুল হারিছ ইব্ন কালদা তাহাকে সহযোগিতা করিতে লাগিল। অবশেষে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হইল (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ২৯)। উল্লেখ্য যে, কুরায়শগণ এই সময় আল-জুহফায় অবস্থান করিতেছিল। এই সময় যুহ্‌রা গোত্রের মিত্র আল-আখনাস ইব্ন শারীক যুহ্‌রা গোত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে যুহরা গোত্র! আল্লাহ তোমাদের সম্পদ রক্ষা করিয়াছেন, তোমাদের সঙ্গী মাখরামা ইব্ন নাওফালকে ছাড়াইয়া আনিয়াছেন। আর তোমরা তো বাহির হইয়াছিলে তাহাকে ও তাহার সম্পদ রক্ষা করিতে। তাই আমার উপর কাপুরুষতার দায়ভার চাপাইয়া ফিরিয়া চল। কারণ ধ্বংস ও যুদ্ধের জন্য বাহির হওয়ার এখন আর কোনও প্রয়োজন নাই। সে (আবূ জাহল) যাহা বলিতেছে এইরূপ করার কোনই প্রয়োজন নাই। যুহরা গোত্র

তাহাকে খুবই মান্য করিত। তাই তাহার কথামত তাহারা ফিরিয়া গেল। ফলে যুহরা গোত্রের কেহই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। অনুরূপভাবে 'আদী ইব্ন কা'ব গোত্রেরও কেহ উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই।

মক্কা হইতে বাহির হইবার সময় সকল গোত্রের লোক কুরায়শদের সঙ্গী হইলেও কা'ব ইব্ন 'আদী গোত্রের কেহই তাহাদের সহিত বাহির হয় নাই। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে তাহারা কুরায়শদের সঙ্গে ছিল কিন্তু ছানিয়্যা লাফ্‌ত (বা লিফাত) নামক স্থানে আসিবার পর শেষ রাত্রে উপকূল দিয়া তাহারা মক্কায় ফিরিয়া যায় (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪)। ফলে বানূ যুহরা ও বানূ কা'ব এই দুই গোত্রের কেহই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। আবূ তালিবের পুত্র তালিবের সহিত কুরায়শদের কাহারও কাহারও দ্বন্দ্ব ছিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, হে বানূ হাশিম! আমরা জানি যে, তোমরা যদিও আমাদের সহিত আসিয়াছ, তোমাদের হৃদয় অবশ্যই মুহাম্মাদের দলে শামিল আছে (আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৪৩৯)।

বদর প্রান্তরে উভয় পক্ষের অবতরণ

কুরায়শদল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উপত্যকার দূরপ্রান্তে বাতনে ওয়াদী ও উঁচু বালুর টিবির পিছনে অবতরণ করিল। আর রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ উপত্যকার নিকট প্রান্তে বালুকাময় প্রান্তরে অবতরণ করিলেন। উহা ছিল নরম ভূমি। ফলে মানুষের পা ও জন্তু-জানোয়ারের ক্ষুর ডাবিয়া যাইতেছিল। প্রথমদিকে কাফিরগণ পানির নিকটবর্তী ছিল। ফলে তাহারা উহা সংরক্ষণ করিল। আর পুরাতন কূপও তাহারা সংস্কার করিয়া লইল। অপরদিকে কূপ হইতে দূরে থাকায় মুসলমানদের খুবই অসুবিধা হইল। তাহারা পিপাসার্ত রহিলেন। তাহাদের উযূ-গোসলেরও সমস্যা দেখা দিল। তখন শয়তান তাহাদের কতকের অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করিয়া দিল এবং এই বলিয়া কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, তোমরা ধারণা কর, তোমরাই হকের উপর আছ। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী আছেন, আর তোমরা আল্লাহর বন্ধু। অথচ মুশরিকগণ পানির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। তোমরা তৃষ্ণার্ত রহিয়াছ। তোমরা একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করিতেছ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই দিন রাত্রে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন যাহাতে সমস্ত উপত্যকা প্লাবিত হইল। উহাতে মুশরিকদের ভীষণ অসুবিধা হইল। তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ইহা রহমতস্বরূপ হইল। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র করিলেন, শয়তানের কুমন্ত্রণার ক্লেদ দূর করিলেন। বৃষ্টিপাতের ফলে তাহাদের ভূমি সমতল হইল। বালু আঁটিয়া মজবুত হইয়া গেল। ইহাতে তাহাদের পা শক্ত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ বদরের পানির নিকট গিয়া অবতরণ করিলেন। প্লাবনের পানি দ্বারা মুসলমানগণ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, উযূ-গোসল সম্পন্ন করিলেন সওয়ারীগুলিকে পানি পান করাইলেন এবং নিজেদের পানপাত্রগুলি পূর্ণ করিয়া রাখিলেন (আল-মাওয়াহিবুলাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৫৩)। ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কুরআন কারীমের এই আয়াতে ঃ

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ.

"স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন। উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখিবার জন্য" (৮ : ১১)।

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে মুসলিম বাহিনীর আল-হুবাব ইবনুল মুনযির ইবনুল জামূহ এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন, যাহা মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই মঙ্গলজনক। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এই অবরতণস্থল কি আল্লাহই আপনাকে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যাহা হইতে আমরা আর সম্মুখে বা পিছনে যাইতে পারিব না; নাকি ইহা শুধু নিজেদের অভিমত এবং যুদ্ধের কৌশল মাত্র? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা নিছক নিজেদের অভিমত ও যুদ্ধের কৌশল মাত্র। হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমাদের অবরতণস্থল নহে; বরং লোকজনসহ সম্মুখে চলুন, যাহাতে আমরা শত্রুপক্ষ হইতে পানির নিকটতর হইতে পারি। আমরা সেখানে অবতরণ করিব, অতঃপর পিছনের অন্যান্য কূপ নষ্ট করিয়া দিব। আর আমরা সেখানে একটি হাউজ নির্মাণ করিয়া উহাতে পানি পূর্ণ রাখিব। অতঃপর আমরা শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিব। তখন আমরা পানি পান করিতে পারিব আর উহারা পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি সঠিক মত ব্যক্ত করিয়াছ। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হুবাব যাহা বলিয়াছে তাহাই সঠিক (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫)। হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুবাবের পরামর্শের সময় জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডান পাশে ছিলেন। তখন এক ফেরেশতা আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তিনিই সালাম, তাঁহার হইতেই আসে সালাম এবং তাঁহার প্রতিই সালাম। ফেরেশতা বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হুবাব ইবনুল মুনযির যে পরামর্শ দিয়াছে তাহাই সঠিক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে জিবরীল! তুমি কি ইহাকে চিন? জিবরীল (আ) বলিলেন, আকাশের সকলকে আমি চিনি না, তবে সে সত্যবাদী, শয়তান নহে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৭)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। মধ্য রাত্রিতে তাঁহারা শত্রুপক্ষ হইতেও পানির নিকটতর স্থানে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তাঁহার নির্দেশে কূপগুলি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা যে কূপটির নিকট অবতরণ করিয়াছিলেন উহাতে হাউজ নির্মাণ করিয়া পানি পরিপূর্ণ করা হইল। অতঃপর তাঁহারা উহা হইতে

নিজেদের পাত্রসমূহ পূর্ণ করিয়া লইলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬২-৬৩; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯৩-৯৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য 'আরীশ নির্মাণ

আরীশ হইল তাঁবু সদৃশ যাহার উপরে ছাউনী থাকে, তবে আকৃতিতে ছোট। একজন লোক ভালভাবে তাহার নিচে অবস্থান করিতে পারে। বদর প্রান্তরে পৌঁছিবার পর আনসার নেতা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) বলিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার জন্য একটি 'আরীশ নির্মাণ করিয়া দিব যাহার মধ্যে আপনি অবস্থান করিবেন এবং আপনার নিকটেই আমরা আপনার উট প্রস্তুত রাখিব, অতঃপর আমরা গিয়া শত্রুর মুকাবিলা করিব? আল্লাহ যদি আমাদিগকে সম্মানিত করেন এবং শত্রুর উপর বিজয়ী করেন তবে তাহাই হইবে আমাদের পছন্দনীয় ও কাম্য। আর যদি ভিন্ন ফয়সালা হয় তবে আপনি উটে আরোহণ করিয়া মদীনায় যাহারা থাকিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইবেন। হে আল্লাহ্র নবী! আপনার পিছনে তো এমন একটি দল রহিয়া গিয়াছে, আমাদের চেয়েও যাহারা আপনাকে বেশী ভালোবাসে। তাহারা যদি অনুমান করিতে পারিত যে, আপনি যুদ্ধের সম্মুখীন হইবেন তবে কখনও তাহারা আপনার পিছনে পড়িয়া থাকিত না। আল্লাহ তাহাদের দ্বারা আপনাকে হেফাজত করিবেন। তাহারা আপনাকে সৎপরামর্শ দিবে, আপনার সহিত একত্রে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে।"

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রশংসা করিলেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর তাঁহার জন্য যুদ্ধের ময়দানের দিকে মুখ করিয়া একটু উঁচু জায়গায় আরীশ বানানো হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করিয়া দু'আ করেন এবং সময় সময় যুদ্ধের ময়দানে গিয়া তদারকি করেন। এক বর্ণনামতে আরীশে তাঁহার সহিত আবূ বাক্র (রা)-ও ছিলেন এবং সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি সজ্জিত অবস্থায় দরজায় দাঁড়াইয়া প্রহরা দেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৮)।

মুসলিম ও কাফির বাহিনীর সমরোপকরণ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, ঘোড়া ২টি, এক বর্ণনামতে তিনটি, উট ৭০টি এবং পতাকা ছিল তিনটি। কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা বাহির হওয়ার সময় ছিল ১৩০০, কিন্তু পথে কিছু সৈন্য চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০। তাহাদের ঘোড়ার সংখ্যা ১০০, লৌহবর্ম ৬০০, অসংখ্য উট এবং পতাকা ছিল ৩টি (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২২৬-২২৮)।

প্রভাতবেলায় কুরায়শগণ হিংসা ও ক্রোধভরে সম্মুখপানে অগ্রসর হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বালুর টিবি হইতে উপত্যকার দিকে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! এই কুরায়শদল তাহাদের অহংকারীদিগকে লইয়া আগমন করিয়াছে, তোমাকে চ্যালেঞ্জ

করিয়াছে এবং তোমার রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে। হে আল্লাহ! তুমি যে সাহায্যের অঙ্গীকার আমার সহিত করিয়াছ সেই সাহায্য নাযিল কর। হে আল্লাহ সকাল বেলায় উহাদিগকে ধ্বংস কর"। তাহাদের দলের মধ্যে 'উতবা ইব্ন রাবী'আকে একটি লাল উটে আরোহী দেখিয়া তিনি বলিলেন, কওমের ভিতর কাহারও মধ্যে যদি কল্যাণ থাকিয়া থাকে তবে লাল উটের আরোহীর মধ্যে আছে। উহারা যদি উহার অনুসরণ করিত তবে সঠিক পথের সন্ধান পাইত (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৪)। এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিলেন, হে আলী! হামযাকে ডাক। তিনি ছিলেন মুশরিকদের নিকটাত্মীয়। লাল উটের আরোহী কে? 'আলী (রা) বলিলেন, সে উতবা। সে কাফিরদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছিল এবং তাহাদিগকে ফিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিতেছিল, হে আমার কওম! তোমরা আমার মাথায় দোষ চাপাইয়া দিয়া বল যে, 'উতবা ভীরু-কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবূ জাহল তাহা অস্বীকার করিল (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩১)।

খুফাফ ইব্ন ঈমা ইব্ন রুহাদা আল-গিফারীর নিকট দিয়া কুরায়শ দলের গমন করার সময় সে স্বীয় পুত্রকে দিয়া কিছু যবেহকৃত জন্তু হাদিয়া পাঠাইল এবং বলিয়া পাঠাইল, তোমরা সম্মত হইলে আমরা তোমাদিগকে অস্ত্র ও লোকবল দিয়া সাহায্য করিব। ইহার উত্তরে কুরায়শগণ বলিয়া পাঠাইল, তোমার সহৃদয় বার্তা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করিয়াছ। আমাদের জীবনের কসম! আমরা যদি মানুষের সহিত যুদ্ধ করি তবে তাহাদের তুলনায় আমাদের কোনও দুর্বলতা ও অক্ষমতা নাই। আর যদি আল্লাহ্র সহিত যুদ্ধ করি, যেমনটি মুহাম্মাদ ধারণা করে, তাহা হইলে তো আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাহারও কোনও শক্তি নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬৮)।

কুরায়শদল যখন তাহাদের অবস্থানস্থলে অবতরণ করিবার পর তাহাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউযের নিকট আসিল। তাহাদের মধ্যে হাকীম ইব্ন হিযামও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাদিগকে আসিতে দাও। আজ তাহাদের যে ব্যক্তিই এই হাউয হইতে পানি পান করিবে সে নিহত হইবে, তবে হাকীম ইব্ন হিযাম নিহত হইবে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বাণী সত্য হইয়াছিল। হাকীম ইব্ন হিযাম পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খাঁটি মুসলমানরূপে জীবন যাপন করেন। অতঃপর তিনি যখনই খুব জোরদার কসম করিতে চাহিতেন তখন বলিতেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদর যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)।

কুরায়শদের গুপ্তচর প্রেরণ

কুরায়শগণ তাহাদের স্থানে অবতরণ করিয়া সব কিছু গুছাইয়া লইবার পর 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব আল-জুমাহীকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা জানিবার জন্য প্রেরণ করিল। 'উমায়র তাহার ঘোড়া লইয়া মুসলিম বাহিনীর চতুর্দিকে চক্কর দিল। অতঃপর তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া

বলিল, তাহাদের সংখ্যা তিন শত পুরুষ। সামান্য বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে। তবে আমাকে আরও একটু সময় দাও। আমি দেখিয়া আসি যে, তাহাদের আত্মগোপন করিবার কোনও জায়গা বা তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিছু আছে কিনা। অতঃপর সে পূর্ণ উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইল, এমনকি বহু দূর পর্যন্ত চলিয়া গেল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সে কুরায়শদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। তবে হে কুরায়শদল! আমি দেখিয়াছি কিছু উট যাহা মৃত্যু বহন করিতেছে। ইয়াছরিবের পানি বহন করার উট নিশ্চিত মৃত্যু বহন করিতেছে। একমাত্র তরবারি ব্যতীত উহাদের প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ করিবার এবং আশ্রয় লইবার আর কিছুই নাই। আল্লাহ্র কসম! আমার ধারণামতে তাহাদের এক ব্যক্তিও নিহত হইবে না তোমাদের একজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত। তাহারা যখন তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সমসংখ্যক লোক হত্যা করিবে তখন তাহার পর কল্যাণকর যিন্দেগী আর কি থাকিবে? কাজেই তোমাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া দেখ ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯৫; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৫)।

অতঃপর কুরায়শগণ আবূ সালামা আল-জুশামীকে প্রেরণ করিল। সে তাহার ঘোড়ায় করিয়া মুসলমানদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি কোনও শক্তিমত্তা দেখি নাই; অস্ত্রশস্ত্র বা অশ্বের পালও দেখি নাই। তবে এমন এক জাতিকে দেখিয়াছি যাহারা তাহাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার কামনা করে না। তাহারা এমন কওম যাহারা মৃত্যুর দিকে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়। তরবারি ব্যতীত তাহাদের প্রতিরক্ষা করিবার বা আশ্রয় লইবার আর কিছুই নাই। তাহাদের চক্ষুর পুতলি যেন ঢালের নিচে থাকা পাথর। তাই তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া দেখ (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩২)।

হাকীম ইব্ন হিযামের প্রস্তাব ও আবূ জাহলের প্রত্যাখ্যান

হাকীম ইব্ন হিযাম 'উতবা ইব্ন রাবী'আর নিকট গিয়া বলিল, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কুরায়শদের মধ্যে বয়বৃদ্ধ ও মান্যবর নেতা। আপনি কি শেষ যমানা পর্যন্ত সর্বদা সুনামের সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিতে চাহেন? উতবা বলিল, তাহা কিভাবে, হে হাকীম! হাকীম ইব্ন হিযাম বলিলেন, আপনি লোকজনসহ প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং আপনার মিত্র 'আমর ইবনুল হাদরামীর বিষয়টি নিজের যিম্মায় লইবেন। উতবা বলিল, আমি অবশ্যই তাহা করিব। আর তুমি আমাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে। সে তো আমার মিত্র, তাই তাহার রক্তপণ দেওয়া এবং তাহার সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব আমারই উপর। তুমি একটু হানজালিয়ার পুত্রের (আবূ জাহল) নিকট যাও। কারণ লোকের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি ভয় করি না।

অতঃপর 'উতবা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিল।সে বলিল, ওহে কুরায়শদল! আল্লাহ্র কসম, তোমরা মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাত করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না।

আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা তাহাকে পরাস্ত কর তবে অবশ্যই তোমাদের কেহ এমন লোকের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, যে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অপছন্দ করে। সে হয়ত বা তাহার চাচাতো ফুফাতো মামাতো ভাইকে অথবা তাহার নিজের পরিবারের কাহাকেও হত্যা করিবে। তাই তোমরা ফিরিয়া চল। আর বিষয়টি মুহাম্মাদ ও অন্য সকল আরবের মধ্যে ছাড়িয়া দাও। তাহারা যদি তাঁহাকে পরাস্ত করে তবে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। আর যদি অন্য রকম কিছু হয় তবে সে তোমাদেরকে এমন অবস্থায় পাইবে যে, তোমরা তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ খারাপ পদক্ষেপ গ্রহণ কর নাই, যাহা তোমরা চাহিতেছ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭০)।

এক বর্ণনামতে সে ইহাও বলিয়াছিল, আমি এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী। তোমরা তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমাদের মঙ্গল হউক। হে আমার কওম! আজ তোমরা আমার মাথায় সমস্ত দোষ চাপাইয়া দাও এবং বল যে, 'উতবা কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে কাপুরুষ নহি (ইউসুফ সালিহী আল-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩২)।

হাকীম ইব্ন হিযাম বলেন, অতঃপর আমি আবূ জাহলের নিকট গেলাম। সে তখন তাহার লৌহবর্ম পরিধান করিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবুল হাকাম! উতবা আমাকে এই বলিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে (যাহা সে বলিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিলাম)। তখন সে বলিল, "আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ ও তাহার সঙ্গীদিগকে দেখিয়া উতবা ভীত হইয়া পাড়িয়াছে। কখনও না, আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনও প্রত্যাবর্তন করিব না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোনও ফয়সালা করিয়া দেন। উতবা যাহা বলিয়াছে তাহার অন্য কোনও কারণ নাই, বরং সে দেখিয়াছে যে, মুহাম্মাদ আর তাঁহার সঙ্গীবৃন্দ একটি উটের খোরাক। আর তাহাদের মধ্যে তাহার পুত্রও রহিয়াছে। তাই সে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে"।

আবূ জাহল উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবার জন্য মুসলমানদের হাতে নিহত 'আমর ইবনুল হাদরামীর ভ্রাতা 'আমের ইবনুল হাদরামীর নিকট লোক পাঠাইয়া বলিল, তোমার মিত্র এই উতবা লোকজনসহ ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। অথচ তুমি স্বচক্ষে তোমার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছ। উঠ এবং কুরায়শদের কতক প্রদত্ত অঙ্গীকার মুতাবিক তোমরা তাহাদের নিকট সাহায্য চাও এবং তোমার ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ দাবি কর।

অতঃপর আমের ইবনুল হাদরামী দাঁড়াইয়া গেল। সে পরনের কাপড় খুলিয়া 'হায় আমর! হায় আমর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইহার ফলে রণোম্মাদনা সৃষ্টি হইল। লোকজনের মনোভাব কঠোর হইল এবং তাহারা যে অমঙ্গলের উপর ছিল তাহার প্রতি আরও সুদৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হইল। আর উতবা যে সিদ্ধান্তের প্রতি তাহাদিগকে আহবান জানাইয়াছিল তাহা ভণ্ডুল হইয়া গেল।

অতঃপর উতবার নিকট যখন তাহার সম্বন্ধে আবূ জাহলের উক্তি পৌঁছিল তখন সে বলিল, 'নিতম্বে হলুদ রংকারী' অতি সত্বর জানিতে পারিবে যে, কাহার নাড়ি ফাটিয়াছে, আমার না তাহার? অতঃপর 'উতবা মস্তকে পরিধান করিবার জন্য শিরস্ত্রাণ তালাশ করিল, কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন কোনও শিরস্ত্রাণ মিলিল না যাহা দ্বারা সে স্বীয় মস্তক আচ্ছাদিত করিতে পারে। ইহা দেখিয়া সে তাহার চাদর মস্তকে জড়াইয়া লইল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৬-৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সঙ্গীদের সংখ্যাস্বল্পতা দেখিয়া কুরায়শদের নেতা আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, 'উতবা ইব্ন রাবীআ, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম প্রমুখ বলিতে লাগিল, غَرَّ هٰؤُلاَءِ دِيْنُهُمْ (উহাদের দীন উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে)। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মনে করিয়াছিল, সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই বিজয় নিহিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ধারণা খণ্ডন করিয়া এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلاَءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে, ইহাদের দীন ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। কেহ আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করিলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়" (৮ ঃ ৪৯)।

ইব্নুল মুনযির ও ইব্ন আবী হাতিম (র) ইব্ন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহ্ল দাঁড়াইয়া গর্বভরে বলিল, উহাদিগকে কায়দামত পাকড়াও কর এবং রশি দ্বারা মজবুত করিয়া বাঁধ, উহাদের একজনকেও হত্যা করিও না। তখন নাযিল হইল:

اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ.

"আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে" (৬৮ ঃ ১৭)।

সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সমবেত সাহাবীদিগকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যাহার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন আমিও তাহার প্রতি তোমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছি এবং তিনি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন আমিও তাহা নিষেধ করিতেছি। আল্লাহ মহান, তিনি হকের নির্দেশ দেন, সত্য পছন্দ করেন, সৎকর্মপরায়ণকে তাহার কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা দান করেন। তোমরা হকের মনযিলে পৌঁছিয়াছ। তিনি কেবল সেই আমলই কবুল করেন যাহা তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য করা
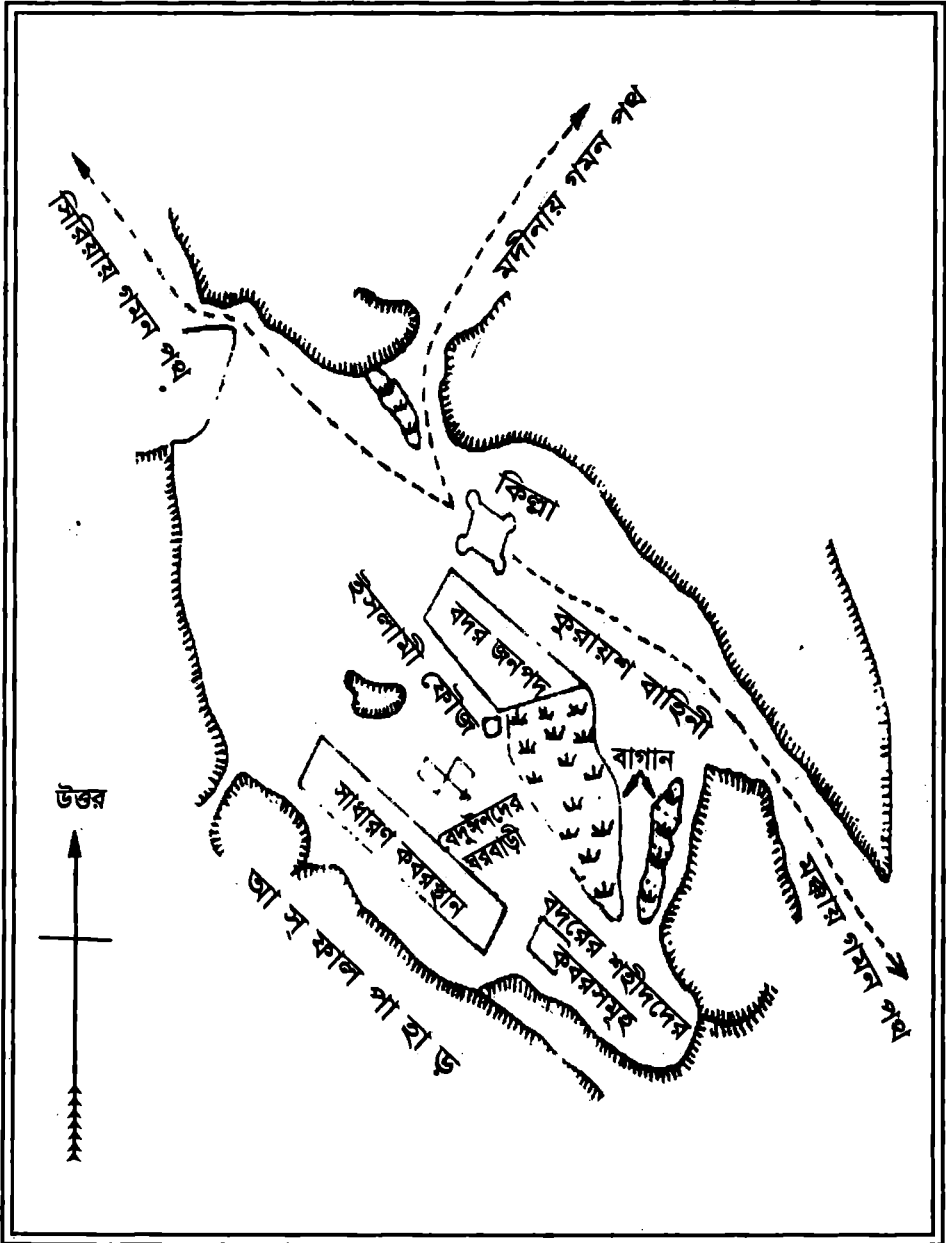
বদর যুদ্ধের মানচিত্র (তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে, আধুনিক প্রকাশনী)

হয়। নিরাশার সময় ধৈর্যধারণ করিলে আল্লাহ উহার দ্বারা মুশকিল আসান করিয়া দেন এবং দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করেন। আখিরাতে উহার বিনিময়ে তোমরা মুক্তি পাইবে। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী আছেন। তিনি তোমাদিগকে সতর্ক করেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দেন। তাই আজ তোমরা এমন কাজ করিতে লজ্জাবোধ করিও যাহা দেখিলে তিনি রাগান্বিত হন। কারণ তিনি ইরশাদ করিয়াছেন (৪০ ঃ ১০)।

لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ.

"তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক" (৪০ ঃ ১০)।

আল্লাহ তাঁহার কিতাবে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও, উহা মজবুতভাবে ধারণ কর। তাহা হইলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তোমাদের প্রতি রহমত ও মাগফিরাতের যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা তোমরা লাভ করিবে। কারণ তাঁহার ওয়াদা হক, তাঁহার কথা সত্য এবং তাহার শাস্তি কঠোর। আমি ও তোমরা মহান আল্লাহ্‌র সহিত রহিয়াছি। তাঁহার নিকটই আমরা আশ্রয় চাহি, তাঁহারই উপর ভরসা করি এবং তাঁহারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদিগকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪)।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর কাতারবন্দী

অতঃপর ১৭ই রামাদান শুক্রবার প্রভাতে রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে ছিল ছোট একটি তীর। উহা দ্বারাই তিনি কাতার সোজা করিতেছিলেন। বানূ আদী ইবনুন নাজ্জার-এর মিত্র সাওওয়াদ ইব্‌ন গাযিয়্যা নামক জনৈক সাহাবী কাতার হইতে একটু সম্মুখে বাড়িয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তীর দ্বারা তাহার পেটে মৃদু খোঁচা দিয়া বলিলেন, সোজা হইয়া দাঁড়াও হে সাওওয়াদ! তখন সাওওয়াদ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ব্যথা দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে সত্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দিন। রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পেট হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, লও, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সাওওয়াদ তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পেটে চুমা দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন এমনটি করিলে হে সাওওয়াদ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ঘটিতেছে তাহা আপনি দেখিতেছেন। তাই আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমার ত্বক আপনার ত্বকের স্পর্শে ধন্য হইবে, ইহাই হউক আপনার সহিত আমার শেষ অবস্থা। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য দু'আ করিলেন। এক বর্ণনামতে তিনি নিহত হইবার আশংকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৩৯)।

আগে আক্রমণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়া বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কেহ যুদ্ধ শুরু করিবে না, অগ্রে আক্রমণ করিবে না। তাহারা তোমাদের নিকটবর্তী হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে তীর নিক্ষেপ করিবে। তোমাদিগকে ঘিরিয়া না ফেলা পর্যন্ত তরবারি চালনা করিবে না। তীরগুলিও সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৭৪; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরীশে প্রবেশ ও আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত ঃ মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করার পর রাসূলুল্লাহ (স) 'আরীশে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কেবল আবূ বাক্র (রা), আর কেহই সেখানে ছিল না। তিনি সেখানে কাকুতি-মিনতি সহকারে মহান আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দু'আ করিতে লাগিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি দু'আ করিলেন। কখনও সিজদায় পড়িয়া, কখনও উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া। দু'আর মধ্যে তিনি বলিলেন ঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها فى الأرضِ.

"হে আল্লাহ! এই দলটি যদি আজ ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলে আর পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হইবে না" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৯)।

তিনি আরও বলিলেন ঃ

أنجزلى ما وعدتنى اللهم نصرك.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য পাঠাও"।

আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া তিনি এই দু'আ করিতেছিলেন। ইহাতে এক পর্যায়ে তাঁহার উভয় কাঁধ হইতে চাদর পড়িয়া গেল। আবূ বাক্র (রা) তাঁহার পিছনে থাকিয়া চাদর তুলিয়া দিতেছিলেন এবং তাঁহার অধিক কান্নকাটির কারণে সমবেদনা ও সান্ত্বনাদান পূর্বক বলিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষান্ত হউন। আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা সীমিত করুন। কারণ অতি সত্বর তিনি আপনাকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করিবেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭২)। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আবূ বাক্র! আল্লাহ্র সাহায্য আসিয়া গিয়াছে। এই হইল জিবরীল, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সম্মুখে ধূলা উড়াইয়া উহাকে হাঁকাইয়া আসিতেছে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৯; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯৮)।

এই সময় 'আরীশে আল্লাহ্র নিকট তাঁহার দু'আ ও কান্নাকাটির যে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, বিভিন্ন রিওয়ায়াতে তাহা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলী (রা) বলেন, আমি

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দৌড়াইয়া আসিলাম, তিনি কি করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য। তিনি সিজদায় পড়িয়া বলিতেছেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّـوْمُ (হে চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক), ইহার বেশী আর কিছুই নহে। অতঃপর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি সিজদায় পড়িয়া ইহাই বলিতেছেন। আমি আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলাম। আবার আসিয়া দেখিলাম, তিনি সিজদায় পড়িয়া উহাই বলিতেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁহাকে বিজয় দান করিলেন (আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৬)।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) এই দু'আ করেন ঃ

اللهم انى انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করেন তবে আপনার ইবাদত করা হইবে না"।

অতঃপর ফিরিয়া উৎফুল্ল চিত্তে তিনি বলিলেন, আমি যেন মুশরিকদের নিহত হইবার স্থানসমূহ দেখিতে পাইতেছি (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩৭; ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৭৬)।

উমার (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহারা ছিল সংখ্যায় এক হাজার, আর তাঁহার সাহাবীগণ ছিলেন ৩১৯ জন। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হইয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রতিপালকের নিকট এই বলিয়া দু'আ করিতে লাগিলেন ঃ

اللّٰهمّ انجزلى ما وعدتنى اللهم اتنى ما وعدتنى اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فى الارض.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট যাহার ওয়াদা করিয়াছ তাহা আমাকে দাও, হে আল্লাহ! মুসলমানদের এই দলটিকে যদি তুমি ধ্বংস করিয়া দাও তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হইবে না"।

অতঃপর এইভাবেই তিনি কিবলামুখী হইয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া অবিরত তাঁহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিতে থাকিলেন, এমনকি তাঁহার কাঁধ হইতে চাদর পড়িয়া গেল। আবূ বাক্‌র (রা) আসিয়া তাঁহার কাঁধে চাদর তুলিয়া দিলেন, অতঃপর তিনি চাদর আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার প্রতিপালকের নিকট চাওয়া যথেষ্ট হইয়াছে। অতি সত্বর তিনি আপনাকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করিবেন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত (৮ ঃ ৯) নাযিল করিলেনঃ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ...مُرْدِفِيْنَ. (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩৭-৩৮)।

উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুসলমানদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিলেন। মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখিয়া তিনি দুই রাক্‘আত সালাত আদায় করিলেন। আবূ বাক্‌র তাঁহার ডান পাশে দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের মধ্যে বলিলেন ঃ

اللهم لا تودع منى اللهم لا تخذلنى اللهم انشدك ما وعدتنى.

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে আল্লাহ! আমাকে অপদস্থ করিও না। হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট যাহার অঙ্গীকার করিয়াছ আমি তাহাই চাহিতেছি"।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (স) উঁচু স্থানে (কুব্বায়) থাকিয়া বলিতেছিলেন ঃ

اللهم انى انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تشأ لم تعبد.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন চাহিতেছি। হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করিলে আজিকার পর আর কখনও তোমার ইবাদাত করা হইবে না" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নং ৩৯৫৩)।

ইব্ন আব্বাসেরই অপর বর্ণনায় আছে, তিনি আরও বলিতেছিলেন ঃ

اللهم ان ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك وما يقوم لك دين.

"হে আল্লাহ! তাহারা যদি এই দলের উপর বিজয়ী হয় তবে শিরকের প্রসার ঘটিবে এবং তোমার দীন প্রতিষ্ঠিত হইবে না"।

তখন আবূ বাক্‌র (রা) দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি বেশী দু‘আ করিয়াছেন (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৩৭-৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) দ্রুত লৌহবর্ম পরিধান করিলেন এবং বলিলেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ.بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ.

"এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাহাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর" (৫৪ ঃ ৪৫-৬)।

আবূ জাহলের বদদু‘আ ঃ উভয় পক্ষ মুখামুখী হইলে কুরায়শ নেতা আবূ জাহল আল্লাহ্‌র নিকট এই বলিয়া দু‘আ করিয়াছিল ঃ

اللهم أقطعنا الرحم واتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة.

"হে আল্লাহ! সে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদের নিকট এক অপরিচিত বিষয় লইয়া আসিয়াছে। তাই আগামী কালই তুমি তাহাকে ধ্বংস কর" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭০; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০০)।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনামতে আবূ জাহল তাহার অভিশাপের মধ্যে ইহাও বলিয়াছিল ঃ

اللهم من كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم.

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট যে প্রিয় এবং তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট অদ্য তাহাকেই তুমি সাহায্য কর" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৩৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪৬)।

এই বদদু'আ তাহার নিজের উপরই পতিত হইয়াছিল এবং সে নিজেই ধ্বংস হইয়াছিল। এই সম্পর্কেই নাযিল হয় ঃ

اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ.

"তোমরা মীমাংসা চাহিয়াছিলে তাহা তো তোমাদের নিকট আসিয়াছে" (৮ ঃ ১৯)।

কাফিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি

নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে কাফিরদের আল-আসওয়াদ ইবন 'আবদিল আসাদ আল-মাখযূমী নিজের হিংসা ও একগুয়েমীর কারণে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আল-আসওয়াদ ছিল এক দুশ্চরিত্রের লোক। সে বাহির হইয়া বলিল, আমি আল্লাহ্র নামে কসম করিতেছি যে, আমি অবশ্যই মুসলমানদের হাউয হইতে পানি পান করিব অথবা উহা নষ্ট করিয়া দিব অথবা উহার সামনে মৃত্যুবরণ করিব। সে উক্ত সংকল্প করিয়া বাহির হইলে মুসলিম বাহিনীর হামযা ইব্ন আবদিল মুত্তালিবও তাহাকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। উভয়ে মুখামুখী হইতেই হামযা (রা) তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার পা নলার মধ্যভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সে তখন হাউযের সম্মুখে ছিল। ফলে সে চীৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার পা দিয়া তখন তীরবেগে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। সে হামাগুড়ি দিয়া হাউযের দিকে অগ্রসর হইল এবং উহার মধ্যে গিয়া পড়িল। ইহা দ্বারা সে তাহার শপথ পূর্ণ করার ইচ্ছা করিল। হামযা (রা)-ও তাহার অনুসরণ করিলেন এবং হাউযের মধ্যে তাহাকে হত্যা করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৬৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪০)।

মুসলমানদের প্রথম শহীদ

নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর দুইজন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাত লাভ করেন

মুহাজির সাহাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুক্তদাস মিহজা' (রা)। শত্রুসৈন্য 'আমের ইবনুল হাদরামী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি তীর বিদ্ধ হইয়া তিনি শহীদ হন। অতঃপর আনসারদের মধ্যে আদী ইবনুন নাজ্জার গোত্রের আল-হারিছা ইব্ন সুরাকা তীরবিদ্ধ হন। হাউয হইতে পানি পান করিবার সময় একটি তীর আসিয়া তাঁহার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হইলে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। হিব্বান ইবনুল আরিকার নিক্ষিপ্ত তীরে তিনি শহীদ হন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬-১৭; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ১৬৯)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদাওসের বাসিন্দা বলিয়া ঘোষণা করেন।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধশেষে হারিছার মাতা আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিছা সম্পর্কে আমাকে বলুন। সে যদি জান্নাতী হয় তবে আমি ধৈর্য ধারণ করিব। আর তাহা না হইলে আল্লাহ দেখিবেন আমি কি করি (অর্থাৎ বিলাপ করিয়া কাঁদিব ও মাতম করিব। উল্লেখ্য যে, তখনও ইহা নিষিদ্ধ হয় নাই)। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, ধিক তোমাকে! জানিয়া রাখো, জান্নাত আটটি। তোমার পুত্র সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাওসে পৌঁছিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৪)।

যুদ্ধের সূচনায় মল্লযুদ্ধ

আল-উমাবীর বর্ণনামতে আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আবদিল আসাদ আল-মাখ্যূমী নিহত হওয়ার ফলে কুরায়শ নেতা উতবা ইব্ন রাবী'আ উত্তেজিত হইয়া পড়িল এবং স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিতে চাহিল। সে স্বীয় ভ্রাতা শায়বা ইব্ন রাবী'আ ও পুত্র আল-ওয়ালীদকে লইয়া প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হইল। তাহারা উভয় সেনাদলের কাতারের মধ্যখানে আসিয়া মল্লযুদ্ধের আহবান জানাইল। তখন আসনারদের মধ্য হইতে তিন ব্যক্তি তাহাদের মুকাবিলায় বাহির হইলেন। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে, তাহারা হইলেন 'আওফ ইবনুল হারিছ, মু'আয ইবনুল হারিছ ও মু'আওবিয ইবনুল হারিছ নামক ভ্রাতৃত্রয়। ইহাদের মাতার নাম ছিল 'আফরা (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৭)। ইব্ন কাছীর-এর বর্ণনামতে তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৩)। উতবা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাঁহারা উত্তর দিলেন, আমরা আনসারদের লোক।

উতবা বলিল, আমাদের তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। এক বর্ণনামতে তাহারা বলিল, সম্মানিত সমতুল্য ব্যক্তিবর্গ। তবে আমাদের চাচার বংশের লোকজনকে আমাদের নিকট বাহির করিয়া দাও। তাহাদের একজন ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমতুল্য লোকদিগকে আমাদের নিকট পাঠাও। তখন নবী (স) বলিলেন, উঠ হে 'উবায়দা ইবনুল হারিছ! উঠ হে হামযা! উঠ হে আলী! ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ হাশিমকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, হে বানূ হাশিম! তোমরা উঠ। হক প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ কর যাহা লইয়া আল্লাহ তোমাদের নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন। উহারা তো বাহির হইয়া আসিয়াছে আল্লাহ্র নূরকে

ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরের একটি খেজুর বাগান।

মদীনা মুনাওয়ারা হইতে আশি মাইল দূরত্বে অবস্থিত বদর যুদ্ধের ঐতিহাসিক ময়দান। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

নিভাইয়া দেওয়ার জন্য। তখন হামযা ইবন আবদিল মুত্তালিব, আলী ইব্‌ন আবী তালিব ও উবায়দা ইবনুল হারিছ উঠিয়া ময়দানে গিয়া দাঁড়াইলেন (ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত)।

আল-উমাবী ও ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে আনসারগণ মুকাবিলার জন্য বাহির হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহা অপসন্দ করেন। কারণ এই প্রথম তিনি শত্রুর মুকাবিলা করিতেছেন। তাই তিনি চাহিতেছিলেন, মুকাবিলাকারী তাঁহারই পরিবারের লোক হউক। তাই তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কাতারের মধ্যে ফেরত যাইবার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁহার পরিবারের এই তিনজনকে বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন (ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৩)।

অতঃপর ইহারা উঠিয়া ময়দানে কাফিরদের নিকটবর্তী হইলে উতবা বলিল, তোমরা কথা বল, যাহাতে আমরা চিনিতে পারি। তাহাদের পরনে লৌহ-শিরস্ত্রাণ ছিল। সেইজন্যই উতবা এরূপ বলিয়াছিল। তখন হামযা (রা) বলিলেন, আমি হামযা ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব; আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সিংহ। উতবা বলিল, সম্মানিত সমতুল্য ব্যক্তি আর আমি মিত্রবর্গের সিংহ। তোমার সহিত এই দুইজন কাহারা? হামযা (রা) বলিলেন, আলী ইবন আবী তালিব ও উবায়দা ইবনুল হারিছ। উতবা বলিল, উভয়েই সম্মানিত সমতুল্য ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে 'উবায়দা ইবনুল হারিছ ছিলেন বয়বৃদ্ধ। অতঃপর 'উবায়দা উতবার সহিত, হামযা (রা) শায়বার সহিত এবং আলী (রা) আল-ওয়ালীদের সহিত মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইহা ইব্‌ন কাছীর-এর বর্ণনা (দ্র. আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৩-৭৪)। ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে, হামযা (রা) উতবার সহিত এবং উবায়দা (রা) শায়বার সহিত মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন (ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত)। অতঃপর হামযা (রা) নিমিষেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শায়বাকে হত্যা করেন। আলী (রা)-ও নিমিষেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ওয়ালীদকে হত্যা করেন। 'উবায়দা (রা) ও 'উতবা উভয়ে আঘাত পাল্টা আঘাত হানিতে লাগিলেন। উভয়েই উভয়কে ঘায়েল করিয়া ফেলিলেন। ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে, শায়বা 'উবায়দার একটি পা কাটিয়া ফেলে। অতঃপর হামযা ও আলী (রা) উভয়ে তরবারি চালাইয়া দ্রুত তাহাকে হত্যা করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গী উবায়দাকে বহন করিয়া সাহাবীদের মধ্যে লইয়া আসেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পার্শেই তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পাখানি তাহাকে দেখাইলেন। উবায়দা (রা) উক্ত পায়ের উপর স্বীয় মুখ রাখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ তালিব যদি আমাকে দেখিত তবে অবশ্যই বুঝিতে যে, আমিই তাহার এই কবিতার যোগ্য ব্যক্তি ঃ

كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل

ونسلمه حتى نصرع دونه ونزهل عن ابنائنا والحلائل.

"তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ, আল্লাহ্র ঘরের কসম! মুহাম্মাদকে ছিনাইয়া লওয়া বা তাঁহার উপর বিজয়ী হওয়া যায় না, যখন আমরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে বল্লম ও তীর নিক্ষেপ করি।

আমরা তাঁহাকে সমর্পণ করিব না, এমনকি আমরা তাঁহার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িব এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের কথা ভুলিয়া যাইব।"

অতঃপর যুদ্ধশেষে ফিরিবার পথে তিনি ইনতিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি শহীদ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৩-৭৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৫-৩৬)।

বদর যুদ্ধের দিন মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ তথা 'উবায়দা (রা), হামযা (রা) ও আলী (রা) এবং উতবা ইবন রাবীআ, শায়বা ইবন রাবীআ ও আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ.

"ইহারা দুইটি বিবদমান পক্ষ, তাহারা তাহাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" (২২ঃ ১৯)।

আলী (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত আছে (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নং ৩৯৬৫, ৩৯৬৭, ৩৯৬৯)।

আবুল আলিয়া হইতে বর্ণিত যে, কাফিরদের তিনজন মল্লযুদ্ধে যখন নিহত হইল এবং মুসলমানদের তিনজন ফিরিয়া গেল তখন আবূ জাহল ও তাহার সঙ্গীবৃন্দ বলিল, আমাদের 'উয্‌যা (দেবতা) রহিয়াছে, তোমাদের কোনও 'উয্‌যা নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে এক ঘোষক বলিয়া উঠিল, আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোনও অভিভাবক নাই (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৩৬)।

সাহাবীকে সম্মুখ সমরে উদ্বুদ্ধকরণ এবং 'উমায়র-এর শাহাদাতবরণ

রাসূলুল্লাহ (স) আরীশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহাবায়ে কিরামকে সম্মুখ জিহাদে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিলেন। তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আজ কোনও ব্যক্তি যদি এমনভাবে যুদ্ধ করে যে, সে ধৈর্য ধারণকারী, ছওয়াবের প্রত্যাশী, সম্মুখে অগ্রসরমান, পশ্চাতে নহে, এই অবস্থায় যদি সে নিহত হয় তবে আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৭০)।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা এমন এক জান্নাতের জন্য উঠ যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনসম। তখন উমায়র ইবনুল হুমাম আল-আনসারী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন জান্নাত যাহা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত! তিনি বলিলেন, হাঁ। উমায়র (রা) বলিলেন, বাহ্ বাহ্! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'বাহ, বাহ বলিতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিল? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শুধু এই আশায়ই যে, আমি উহার অধিবাসী হইব।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি উহার অধিবাসী। তিনি তখন কিছু খেজুর বাহির করিয়া খাইতেছিলেন। অতঃপর বলিলেন, এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি তবে তাহা তো অনেক দীর্ঘ সময়! এই বলিয়া তিনি খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইলেন। যুদ্ধ করিবার সময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

ركضا إلى الله بغير زاد   الا التقى وعمل المعاد

والصبر فى الله على الجهاد   وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

" আমি আল্লাহ্র প্রতি দৌড়াইয়া যাইতেছি পাথেয় ছাড়া। তাকওয়া, পরকালের আমল এবং জিহাদের জন্য আল্লাহ্র প্রতি ধৈর্য ধারণ ছাড়া। আর তাকওয়া, সৎকাজ এবং সোজা পথে বিচরণ ব্যতীত অন্য সকল পাথেয়ই বিলীন হইয়া যাইবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৭; হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ৪১৬-১৭)।

'আওফ ইবনুল হারিছের শাহাদাত ঃ 'আওফ ইবনুল হারিছ আল-আনসারী, যাহার মাতা ছিলেন 'আফরা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দার কোন্ কাজে তাহার প্রতিপালক (আনন্দের আতিশয্যে) সন্তুষ্ট হন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, বর্মহীন অবস্থায় শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ায়। অতঃপর তিনি শরীর হইতে বর্ম খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং তরবারি হাতে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইলেন (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৪৮-৪৯; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯৯-৩০০)।

ফেরেশতাদের অবতরণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাহারা অবতরণ করিয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কুরআন ও হাদীছে ইহার বিশদ বর্ণনা আসিয়াছে। পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আরীশে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) মাথা উঠাইয়া আবূ বাক্র (রা)-কে সুসংবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্র সাহায্য আসিয়া গিয়াছে। এই যে জিবরীল ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া হাঁকাইয়া আসিতেছে (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৬৯)। কুরআন কারীমে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা আসিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

"স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। তিনি উহা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে" (৮ ঃ ৯)।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে এক হাজার ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনায় ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁহার নবী ও মুমিনদিগকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন। ডানদিকে পাঁচ শত ফেরেশতার নেতৃত্বে ছিলেন জিবরীল (আ) এবং বামদিকের পাঁচ শত ফেরেশতার নেতৃত্বে ছিলেন মীকাঈল (আ)। ইহাই প্রসিদ্ধ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৫)। অন্য এক আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার কথা বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ.

"স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনগণকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন" (৩ ঃ ১২৪)!

'আলী (রা) হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানদিকে অবতরণ করেন। সেইদিকে ছিলেন আবূ বাক্র (রা), আর মীকাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বামদিকে অবতরণ করেন, সেইদিকে ছিলাম আমি। ইমাম বায়হাকী (র) আলী (রা) হইতে উক্ত রিওয়ায়াতে আরও বর্ণনা করেন যে, ইসরাফীল (আ)-ও এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; তু. সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৮)।

আলী (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, আমি বদরের কূপের নিকট বিচরণ করিতেছিলাম। তখন এমন প্রবল বেগে এক বায়ু প্রবাহিত হইল যাহা ইতোপূর্বে আমি আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর তাহা চলিয়া গেল। আবার প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইল, যাহা আমি কখনও দেখি নাই পূর্বের ব্যতীত। ইহার পর পুনরায় প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইল। প্রথমবারের বায়ু ছিলেন জিবরীল (আ), যিনি এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করেন। দ্বিতীয়বারের বায়ু মীকাঈল (আ), যিনি এক হাজার ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানে অবতরণ করেন। আবূ বাক্র (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানদিকে, আর তৃতীয় বায়ু ছিলেন ইসরাফীল (আ), তিনি এক হাজার ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বামদিকে অবতরণ করেন। আমি ছিলাম তাঁহার বামদিকে। আল্লাহ্ তাঁহার শত্রুদিগকে পরাজিত করার পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার ঘোড়ায় তুলিয়া নিলেন। ঘোড়াটি লম্ফঝম্ফ করিলে আমি উহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলাম, অতঃপর আমার প্রতিপালককে ডাকিলাম। তিনি আমাকে রক্ষা করিলেন। আমি বগলে আঘাত পাইলাম (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩৮)।

মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-আসলামী হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সেই দিন বলিলেন, এই হইল জিবরীল, বায়ু হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে। সে যেন দিহ্য়াতুল কালবী। আমাকে পূর্বের

হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। আর আদ জাতি পশ্চিমের হাওয়ায় ধ্বংস হইয়াছে (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪০)।

ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করিবার এবং শত্রুদিগকে আঘাত করিবার পদ্ধতি জানিতেন না বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে শত্রুদের ঘাড়ের উপর এবং প্রতি হাড়ের জোড়ায় আঘাত করিবার নির্দেশ দেন। এই সম্পর্কে কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ (৮ ঃ ১৩)

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সহিত আছি। সুতরাং তোমরা মুমিনগণকে অবিচলিত রাখো। যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব। সুতরাং তোমরা তাহাদের স্কন্ধে এবং আঘাত কর তাহাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগ" (৮ ঃ ১২)।

ফেরেশতাগণ ছিল পুরুষের আকৃতিতে সাদা-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়ায় আরোহী সাদা পোশাক পরিহিত। তাঁহাদের মস্তকে ছিল সাদা পাগড়ী, যাহার প্রান্তভাগ উভয় কাঁধের মধ্যখানে ঝুলন্ত ছিল (আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের পাগড়ী ছিল সাদা, আর হুনায়নের যুদ্ধে ছিল সবুজ (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৫)। তাঁহার অপর এক বর্ণনায় আছে যে, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের ছিল কালো পাগড়ী, আর হুনায়নের যুদ্ধে সবুজ। তবে শেষোক্ত বর্ণনাটির সনদ খুবই দুর্বল বিধায় ইহা গ্রহণযোগ্য নহে (প্রাগুক্ত)।

ফেরেশতাদের আগমন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়াছেন গিফার গোত্রের এক লোক। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, গিফার গোত্রের এক লোক আমাকে বলিয়াছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই কি ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। তখন আমরা মুশরিক ছিলাম। কাহাদের পরাজয় হয় আমরা সেই অপেক্ষায় ছিলাম, যাহাতে বিজয়ী দলের লুটপাটের সময় আমরাও কিছু লুটপাট করিয়া লইতে পারি। আমরা পর্বতে আরোহণ করিতেছিলাম, হঠাৎ একখানি মেঘখণ্ড আমাদের নিকটবর্তী হইল। আমরা উহার মধ্য হইতে অশ্বের ডাক শুনিতে পাইলাম। অতঃপর আমি শুনিলাম, উহার মধ্য হইতে কে একজন বলিতেছে, "হায়যূম! সম্মুখে অগ্রসর হও" ইহা শ্রবণ করিয়া আমার চাচাতো ভাই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করিল। আর আমিও প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, একটু পরই সম্বিত ফিরিয়া পাইলাম (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৭৪-৭৫; আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬২-৬৩)। এক বর্ণনামতে হায়যূম জিবরীল (আ)-এর ঘোড়ার নাম। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কারণ অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়,

রাসূলুল্লাহ (স) জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, বদর যুদ্ধের দিন "হায়যূম! সম্মুখে অগ্রসর হও" এই কথা কোন্ ফেরেশতা বলিয়াছিল? উত্তরে তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আকাশের সকল অধিবাসীকে তো আমি চিনি না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮১)।

অনুরূপ একটি ঘটনা মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-আসলামী (র) আবূ রুহ্ম আল-গিফারী (রা) হইতে, তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই হইতে বর্ণনা করেন। তাহার চাচাতো ভাই বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই বদরের কূপের নিকট বিচরণ করিতেছিলাম। আমরা মুহাম্মাদের সঙ্গীদের সংখ্যা কম এবং কুরায়শদের সংখ্যা বেশী দেখিয়া বলিলাম, এই দুই দল যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে, আমরা মুহাম্মাদ ও তাহাদের সৈন্যদের কাছাকাছি থাকিব। তাই আমরা তাহাদের বামদিকে গেলাম। আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, ইহারা তো কুরায়শদের চার ভাগের এক ভাগ! অতঃপর আমরা যখন তাহাদের বামদিকে চলিতেছিলাম তখন হঠাৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া আমাদিগকে ঢাকিয়া লইল। আমরা চক্ষু তুলিয়া উহার দিকে তাকাইলাম। আমরা পুরুষদের কণ্ঠস্বর ও অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনিতে পাইলাম। আমরা শুনিলাম, এক ব্যক্তি তাহার ঘোড়াকে বলিতেছে, "হায়যূম! সম্মুখে অগ্রসর হও।" ইহার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানদিকে অবতরণ করিল। অতঃপর অনুরূপ আরও একটি দল আসিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত অবস্থান করিল। এইবার তাহারা কুরায়শদের দ্বিগুণ হইয়া গেল। অতঃপর আমার চাচাতো ভাইটি মৃত্যুবরণ করিল। আর আমি সম্বিত ফিরিয়া পাইলাম। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইহা অবহিত করিলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৯)।

ফেরেশতাদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত বহু মুশরিককে মুসলিম সেনাগণ প্রত্যক্ষ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। মুসলিম বাহিনীর এক লোক তাহার সম্মুখস্থ এক মুশরিককে প্রবল বেগে ধাওয়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার উপর চাবুকের আঘাতের আওয়ায এবং একজন অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। অশ্বারোহী বলিতেছিল, হায়যূম! সম্মুখে অগ্রসর হও। তখন তিনি সম্মুখস্থ মুশরিক ব্যক্তিটির দিকে তাঁকাইয়া দেখিলেন, সে ঢলিয়া পড়িতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিলেন তাহার নাক ও চেহারায় চাবুকের আঘাত। সেই আঘাতের জায়গা সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। উক্ত আনসারী সাহাবী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই ঘটনা বিবৃত করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, ইহা তৃতীয় আকাশ হইতে আগত সাহায্য (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৯)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আবূ দাঊদ আল-মাযিনী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। তাহার প্রতি আমার তরবারি পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার মস্তক লুটাইয়া পড়িল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, অন্য কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৫; আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪০)।

আর-রবী' ইব্ন আনাস (রা) বলেন, লোকে ফেরেশতাগণ কর্তৃক হত্যাকৃত ব্যক্তিকে চিনিত তাহার কাঁধের উপর ও জোড়ার উপর আঘাত দেখিয়া তাহা যেন আগুনে পোড়া চিহ্নের ন্যায় (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮১)।

সুহায়ল ইব্ন আমর (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি বহু লোককে দেখিলাম সাদা পোশাক পরিহিত, সাদা-কালো মিশ্রিত রংয়ের ঘোড়ার উপর আরোহী, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল জুড়িয়া ছিল এবং যাহা ছিল বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাহারা হত্যা ও বন্দী করিতেছিল (প্রাগুক্ত)। কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ গিরিগুহা হইতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন—

আবূ উসায়দ (রা) তাহার চক্ষু অন্ধ হইবার পর বলিতেন, এখন যদি আমি তোমাদের সহিত বদর প্রান্তরে থাকিতাম এবং আমার চক্ষু ভাল থাকিত তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে সেই গুহা দেখাইতাম যেখান হইতে ফেরেশতাকুল বাহির হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আমি কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় পোষণ করি না (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৫)।

আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি তিনটি মস্তক আনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, ইহার দুইটি মস্তকধারীকে আমি হত্যা করিয়াছি। আর তৃতীয় মস্তকধারীকে আমি দেখিলাম সাদা লম্বা এক লোক হত্যা করিল। অতঃপর আমি তাহার মস্তক লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে (হত্যাকারী সাদা লম্বা লোকটি) অমুক ফেরেশতা (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪১)।

আস-সাইব ইব্ন আবী হুবায়শ (রা) উমার (রা)-এর খিলাফাত আমল বর্ণনা করিতেন, আল্লাহ্র কসম! মানুষের মধ্যে কেহই আমাকে বন্দী করে নাই। তাহাকে বলা হইল, তবে কে (আপনাকে বন্দী করিয়াছে)? তিনি বলিলেন, কুরায়শগণ যখন পরাজিত হইল তখন আমিও তাহাদের সহিত পরাজিত হইলাম। তখন লম্বা এক লোক, যিনি সাদা ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন, অপর এক বর্ণনামতে সাদা এক লোক, যিনি সাদা-কালো রংয়ের ঘোড়ার পিঠে আরোহী ছিলেন, তিনি আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। ইতোমধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আসিয়া আমাকে বাঁধা অবস্থায় পাইলেন। তিনি সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য চীৎকার দিয়া বলিলেন, এই লোককে কে বন্দী করিয়াছে? কেহই ইহার উত্তর দিল না। এইভাবে তিনি আমাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে বন্দী করিয়াছে? আমি বলিলাম, আমি তাহাকে চিনি না। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা তাঁহার নিকট বিবৃত করিতে অপছন্দ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাকে এক ফেরেশতা বন্দী করিয়াছেন। আর হে ইব্ন আওফ! তোমার বন্দীকে লইয়া যাও (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪০-৪১)।

হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বলেন, বদরের দিন আমরা দেখিলাম আকাশ হইতে একটি সেলাইকৃত কাপড় পতিত হইল যাহা আকাশের প্রান্তসীমা বন্ধ করিয়া দিল। তখন উপত্যকা পিপীলিকায় পূর্ণ হইয়া গেলে আমার মনে হইল, ইহা আকাশের কোনও জিনিস যাহা দ্বারা মুহাম্মাদকে সাহায্য করা হইতেছে। অতঃপর শত্রুর পরাজয় হইল। আর উহা ছিল ফেরেশতা (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত)। জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮২)।

আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাঁহাদের একজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানে এবং একজন বামে থাকিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পিছনে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। একটু পরই চতুর্থ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত)।

ইব্ন আব্বাস ও আলী (রা) হইতে বর্ণিত। আব্বাসকে বন্দী করেন আবুল ইয়াসার। তিনি ছিলেন হাল্কা-পাতলা আর আব্বাস ছিলেন মোটাতাজা ও ভারী। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আবুল ইয়াসার! তুমি আব্বাসকে কিভাবে বন্দী করিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই কাজে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে যাহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং পরেও দেখি নাই। তাঁহার আকৃতি এইরূপ এইরূপ...। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাকে এই কাজে সাহায্য করিয়াছে একজন সম্মানিত ফেরেশতা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)।

আতিয়্যা ইব্ন কায়স বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বদর যুদ্ধ শেষ করিলেন তখন জিবরীল (আ) একটি লাল রংয়ের উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার পরনে ছিল লৌহবর্ম এবং সঙ্গে ছিল তীর। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন আপনার নিকট হইতে পৃথক না হই। আপনি কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর জিবরীল (আ) চলিয়া গেলেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪১)।

ঘোরতর যুদ্ধ শুরু

মল্লযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া লড়াই শানিত ও জোরদার করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বীরত্বের সহিত শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিজেদের মধ্যে দেখিয়া তাহারা আরও প্রেরণা লাভ করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আবূ বাক্র (রা)-ও। তাঁহারা আরীশে আল্লাহ্র দরবারে যেমন বিনয় সহকারে দু'আ করিতেছিলেন তেমনি প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনেও আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং মুসলমানদিগকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করিতেছিলেন (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৪৫)। আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের আগে আগে ছিলেন। আমরা তাঁহার

আড়ালে ছিলাম। সেই দিন তিনি সকলের চেয়ে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমাদের কেহই তদপেক্ষা মুশরিকদের নিকটবর্তী ছিল না (প্রাগুক্ত; ইব্ন সাদ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৩)।

ইমাম আহমাদ (র)-এর বরাতে ইউসুফ সালিহী তাঁহার সুবুলুল হুদা গ্রন্থে ইহা ছাড়া আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বদরের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছিলেন (৪খ., পৃ. ৪৬)। তিনি বলিতেছিলেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে" (৫৪ঃ ৪৫)। এক পর্যায়ে তিনি একমুষ্ঠি কঙ্করযুক্ত মাটি উঠাইয়া شاهت الوجوه (মুখমণ্ডলগুলি কদাকার হউক) বলিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। ফলে এমন কোন কাফির অবশিষ্ট রহিল না যাহার চোখে, মুখে ও নাকে গিয়া উহা না পৌছিল। ফলে তাহারা চক্ষু মুছিতে লাগিল। আর এই সুযোগে মুসলিমগণ তাহাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। ইহার কথাই বলা হইয়াছে আল-কুরআনের এই আয়াতে ঃ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى "এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন" (৮ ঃ ১৭)।

বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদের প্রতি কংকরই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম-এর বর্ণনামতে, তিনি তিনটি কংকর লইয়া একটি শত্রুবাহিনীর ডাইনদিকে একটি বামদিকে এবং আর একটি তাহাদের সম্মুখভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেনঃ شاهت الوجوه ইহার ফলে তাহারা পরাজিত হইল (আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬৪)।

হাকীম ইব্ন হিযাম (রা), যিনি পরে মুসলমান হন, বলেন, বদরের দিন আমরা উভয় দল যখন মুখামুখী হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলাম তখন আমি তস্তরিতে পাথর পড়িলে যেইরূপ শব্দ হয় সেইরূপ একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম যাহা আকাশ হইতে মাটিতে পড়িল। আর রাসূলুল্লাহ (স) একমুষ্টি মাটি উঠাইয়া নিক্ষেপ করিলেন, ফলে আমরা কাফিরগণ পরাজিত হইলাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৩)।

নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ-দীলী বলেন, আমরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলাম, কারণ আমরা আমাদের অন্তরে এবং আমাদের পিছনে তস্তরিতে পাথর পতনের ন্যায় একটি শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। ইহা আমাদের সবচেয়ে ভীতির কারণ হইয়াছিল (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮৩-৮৪)।

অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের গতি পাল্টাইয়া গেল। মুসলমানদের বিজয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। বিশিষ্ট কুরায়শ নেতাগণ নিহত হইল। অবশেষে মুসলমানগণ শত্রু সৈন্যদিগকে ব্যাপকভাবে বন্দী করিতে শুরু করিল। অধিকাংশ কাফিরই রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪২-২৪৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৯১)। এই যুদ্ধে ৭০জন কাফির নিহত এবং ৭০জন বন্দী হয়। আর মুসলমানদের পক্ষে ১৪জন

শাহাদাত লাভ করেন, তম্মধ্যে ৬ জন মুহাজির এবং ৮জন আনসার (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০০; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৬৯)।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইবলীসের পলায়ন ও আবূ জাহলের সান্ত্বনাবাণী

কুরায়শগণ যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলে ইবলীস পথিমধ্যে বাক্র গোত্রের নেতা সুরাকা ইব্ন মালিকের আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল এবং বিভিন্ন রকমের আশ্বাসবাণী শুনাইতেছিল। সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল ঃ

لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ.

"আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইবে না। আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকিব" (৮ ঃ ৪৮)।

অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে সে যখন ফেরেশতাদের ভূমিকা ও কাফিরদের প্রতি তাহাদের আক্রমণের ভয়ানক অবস্থা দেখিল তখন তাহার হস্ত ছিল এক মুশরিকের হাতে ধরা অবস্থায়। সে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। তখন সেই লোকটি এবং অন্যান্য মুশরিক সৈন্য তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় যাইতেছ হে সুরাকা! তুমি না বলিয়াছিলে, তুমি আমাদের পার্শ্বেই থাকিবে, আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না!" তখন সে বলিল,

اِنِّىْ بَرِيْئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"তোমাদের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি উহা দেখিতেছি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর" (৮ ঃ ৪৮)।

তখন আল-হারিছ ইব্ন হিশাম তাহাকে সুরাকা মনে করিয়া ধরিয়া ফেলিল। ইবলীস তখন হারিছের বুকে ঘুষি মারিলে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সুযোগে ইবলীস আর ডানে-বামে ও অগ্রে-পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোজা গিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৩) এবং উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে উহা পূরণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার প্রতি তোমার বিশেষ দৃষ্টি কামনা করিতেছি।" সে ভয় পাইতেছিল যে, যুদ্ধ বুঝি সম্প্রসারিত হইয়া তাহার নিকট পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৩)।

আবূ জাহল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, ওহে লোকসকল! সুরাকা ইব্ন মালিকের অপদস্থ অবস্থা তোমাদিগকে যেন ঘাবড়াইয়া না দেয়। কারণ সে ছিল মুহাম্মাদের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর শায়বা, উতবা ও আল-ওয়ালীদের হত্যাও যেন তোমাদিগকে বিচলিত না করে। কারণ

তাহারা বেশী তাড়াহুড়া করিয়াছিল। আল-লাত ও আল-উয্যার কসম! মুহাম্মাদ ও তাহার সঙ্গীদিগকে রশি দ্বারা না বাঁধিয়া আমরা ফেরত যাইব না। তোমরা তাহাদিগকে জীবিত পাকড়াও কর, যাহাতে আমরা তাহাদেরকে তোমাদিগকে ত্যাগ করা ও লাত-'উয্যাক অবমাননা করা প্রভৃতি অপকর্মের প্রতিফল বুঝাইয়া দিতে পারি (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪২-৪৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৩)। এই সময় আবূ জাহ্ল কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল ঃ

ما تنقم الحرب الشموس منى + بازل عامين حديث سنى

لمثل هذا ولدتنى أمى

"উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত যুদ্ধক্ষেত্র, দুই বৎসর বয়স্ক নবীন উট আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে না। এই ধরনের কাজের জন্যই আমার মাতা আমাকে জন্মদান করিয়াছে" (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

বর্ণিত আছে যে, কুরায়শগণ পরে সুরাকাকে মক্কায় দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, হে সুরাকা! তুমি যুদ্ধের কাতার ভঙ্গ করিয়াছ এবং আমাদের মধ্যে পরাজয়ের সূত্রপাত করিয়াছ। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের বিষয়ে শুরু হইতে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না। আমি উপস্থিতও ছিলাম না, জানিও না কিছু। কিন্তু মুশরিকগণ উহা বিশ্বাস করিল না। অতঃপর এক সময় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা শুনিল। তখন তাহারা জানিতে পারিল যে, ইবলীস তাহার আকৃতি ধারণ করিয়াছিল (সুবুলুল হুদা)।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর বিশেষ সংকেত

যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে চিনিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন গোত্রের জন্য বিভিন্ন সংকেত নির্ধারণ করিয়া দেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজিরদের জন্য 'ইয়া বানী আবদির রাহমান', খাযরাজ গোত্রের জন্য 'ইয়া বানী আবদিল্লাহ' ও আওস গোত্রের জন্য 'ইয়া বানী উবায়দিল্লাহ' সংকেত নির্ধারণ করিয়া দেন। এক বর্ণনামতে মুসলমানদের সকলের সংকেত ছিল يا منصور أمت "হে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি! মারিয়া ফেল" (ইব্ন সাদ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪)। যায়দ ইব্ন আলীর বর্ণনামতে ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংকেত (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪৪)। ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে বদর যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কিরামের সংকেত ছিল 'আহাদুন আহাদ' (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৬)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ঘোড়ার নামকরণ করেন খায়লুল্লাহ তথা আল্লাহ্র ঘোড়া (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৭৪)।

শত্রুসৈন্যদেরকে ধরপাকড় এবং সাদ ইব্ন মু'আয-এর অসন্তুষ্টি

রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধ শুরু করিবার নির্দেশ দেওয়ার পর এবং কাফিরদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করিবার পর কাফিরগণ পরাজিত হইতে শুরু করিল। রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় আরীশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আবূ বাক্র (রা)। সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ও তাঁহার সঙ্গী আরও কিছু আনসার তরবারি সজ্জিত অবস্থায় আরীশের দরজায় দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রহরা দিতে লাগিলেন। শত্রুসৈন্যদের পুনরায় ফিরিয়া আসার আশঙ্কায় তাঁহারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিমগণ যখন ব্যাপক হারে শত্রুসেনাদের বন্দী করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, হে সাদ! মুসলিম বাহিনী যাহা করিতেছে মনে হয় উহা তুমি অপছন্দ করিতেছ। তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে এই প্রথম আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ সংঘটিত করিয়া দিয়াছেন। তাই মুশরিক সৈন্যগণকে বাঁচাইয়া রাখার পরিবর্তে হত্যা করিয়া ফেলাই আমার নিকট পছন্দনীয় ছিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭০-২৭১; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০০)।

শত্রুসেনাদের কতককে হত্যা করিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষেধাজ্ঞা

শত্রু সেনাদের সকলেই যে স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। সকলেই যে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত তাহাও নহে। এমনও অনেক লোক ছিল যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছিল। পরিস্থিতির শিকার হইয়া বা নেতৃবৃন্দের চাপে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এইসব লোককে হত্যা করিতে নিষেধ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) সেই দিন তাঁহার সাহাবীদিগকে বলিয়া ছিলেন, আমি জানি যে, বানূ হাশিমের কিছু লোক এবং অন্যান্যদিগকে জোর-জবরদস্তিমূলক তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর হইতে বাহির করা হইয়াছে। আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের কোনও প্রয়োজন নাই। তাই তোমাদের কেহ বানূ হাশিমের কোনও লোকের মুখামুখী হইলে তাহাকে হত্যা করিবে না। আর যে আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম ইবনুল হারিছ ইব্ন আসাদের সাক্ষাত পাইবে সে যেন তাহাকে হত্যা না করে। কারণ তাহাকে জোর করিয়া আনা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের সাক্ষাত পাইবে সে যেন তাহাকে হত্যা না করে। কারণ তাহাকেও জোর করিয়া আনা হইয়াছে। তখন আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা ইব্ন রাবী'আ বলিলেন, আমরা কি আমাদের পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাদের হত্যা করিব, আর আব্বাসকে ছাড়িয়া দিব? আল্লাহ্র কসম! আমি যদি তাহার সাক্ষাত পাই তবে অবশ্যই তরবারি দ্বারা তাহাকে হত্যা করিব। এই কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি উমার (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ হাফস! (উমার বলেন, এই

প্রথম তিনি আমাকে উপনামে সম্বোধন করিলেন) রাসূলাল্লাহ্‌র চাচার চেহারা তরবারি দ্বারা আঘাত করা হইবে। উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি তরবারি দ্বারা তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। আল্লাহ্‌র কসম! সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। আবূ হুযায়ফা (রা) বলিলেন, সেই দিন আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার দরুন স্বস্তি লাভ করিতে পারি নাই। সর্বদা আমি শংকিত ছিলাম যে, আমার এই উক্তি কি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা হইতে ফিরাইয়া দেয়? অতঃপর তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৪-৮৫; ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭১)।

আবুল বাখতারীকে হত্যার ঘটনা

আবুল বাখতারীকে রাসূলুল্লাহ (স) হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার কিছু কারণ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবুল বাখতারীকে হত্যা করিতে এইজন্য নিষেধ করেন যে, মক্কায় থাকিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কোনরূপ নির্যাতন করা হইতে বিরত থাকিতেন। তিনি তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। তাহার পক্ষ হইতে এমন কোনও আচরণ প্রকাশ পায় নাই যাহা রাসূলুল্লাহ (স) অপছন্দ করেন। বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকে বয়কট করিয়া যে পত্র প্রণয়ন করা হয় উহা ছিড়িয়া ফেলার উদ্যোগ গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আবুল বাখতারী নিহত হন। বলা যায় যে, এক রকম স্বেচ্ছায়ই তিনি নিহত হন।

তাহার হত্যার ঘটনার বিবরণ এই যে, আনসারদের মিত্র আল-মুজাযযির ইব্‌ন যিয়াদ আল-বালাবী যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবুল বাখতারীর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে হত্যা করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। আবুল বাখতারীর সহিত লায়ছ গোত্রের জুনাদা ইব্‌ন মুলায়হা নামে তাহার এক সঙ্গী ছিল, যে মক্কা হইতেই তাহার সহিত একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল। আবুল বাখতারী বলিলেন, আর আমার সঙ্গীকে? মুজায্‌যির (রা) তাহাকে বলিলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার সঙ্গীকে ছাড়িব না। রাসূলুল্লাহ (স) কেবল তোমাকেই হত্যা না করার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। আবুল বাখতারী বলিলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! তাহা হইলে আমি ও সে একত্রে মৃত্যুবরণ করিব যাহাতে মক্কার মহিলাগণ আমার সম্পর্কে বলিতে না পারে যে, আমি জীবনের আশায় আমার সঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আল-মুজায্‌যির-এর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সময় আবুল বাখতারী এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

لن يسلم ابن حرة زميله–حتى يموت أو يرى سبيله.

"স্বাধীন মহিলার পুত্র কখনও তাহার সঙ্গীকে (শত্রুর হাতে) সমর্পণ করে না, যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে অথবা তাহার পথ দেখিয়া লয়।"

আর মুজায্‌যির (রা) আবুল বাখতারীকে হত্যা করার সময় এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اما جهلت أو نسيت نسبي + فاثبت النسبة انى من بلى

الطاعنين برماح اليزنى + والضاربين الكبش حتى ينحني

بشر بيتم من ابوه البختري + او بشرن بمثلها منى بنى

انا الذى يقال اصلى من بلى + اطعن بالصعدة حتى تنثنى

واعبط القرن بعضب مشرفى + ارزم للموت كارزام المرى

فلا ترى مجذرا يفرى فرى

"তুমি কি আমার বংশ সম্পর্কে অজ্ঞ রহিয়াছ না ভুলিয়া গিয়াছ? তাহা হইলে সম্বন্ধটি ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, আমি বালিয়্যি গোত্রের, যাহারা আল-ইয়াযানী বর্শা দ্বারা আঘাতকারী এবং যাহারা বকরীকে প্রহারকারী যতক্ষণ না উহা বাঁকা হইয়া যায়। আবুল বাখতারী যাহার পিতা, তাহাকে ইয়াতীম হওয়ার সুসংবাদ দাও অথবা আমার পক্ষ হইতে আমার পুত্রদিগকে অনুরূপ সুসংবাদ দাও। আমি সেই লোক যাহার গোড়া হইল বালিয়্যি বংশ। আমি বর্শা দ্বারা আঘাত করি উহা বাঁকা হওয়া পর্যন্ত। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করি ধারালো মাশরিফী তরবারি দ্বারা। আমি মৃত্যুর জন্য ক্রন্দন করি কষ্টের সহিত দোহনকৃত উষ্ট্রীর ক্রন্দনের ন্যায়। তাই তুমি মুজাযযিরকে কোনও অদ্ভুত রকমের কাজ করিতে দেখিবে না।"

অতঃপর মুজাযযির রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন! আমি তাহাকে বন্দী করিয়া আপনার নিকট লইয়া আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে আমার সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত আর কিছুতেই সম্মত হয় নাই। অবশেষে আমি তাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। অতঃপর আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭২-৭৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৫)।

কেহ কেহ বলেন যে, আবুল ইয়াসার (রা) তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ সীরাতবিদের মতে আল-মুজায্যির (রা)-ই তাহাকে হত্যা করেন। ইব্ন সায়্যিদিন নাস বলেন, নিঃসন্দেহে আবূ দাউদ আল-মাযিনী তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। আবুল বাখতারীর তরবারি আবূ দাউদ আল-মাযিনী (রা)-এর পুত্রদের নিকট রক্ষিত ছিল, যাহা তাহার কোন এক পুত্র আবুল বাখতারীর পুত্রের নিকট বিক্রয় করেন ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০১)।

উমায়্যা ইব্ন খালাফকে হত্যার ঘটনা

উমায়্যা ইব্ন খালাফ ছিল কুরায়শ নেতৃবৃন্দের অন্যতম। সে নও মুসলিমগণকে ভীষণভাবে নির্যাতন করিত। বিলাল (রা) ছিলেন তাহার ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের কারণে উমায়্যা ইব্ন খালাফ তাহাকে তপ্ত মরুভূমিতে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়া

অমানুষিক নির্যাতন করে। বদর যুদ্ধের সময় বিলাল (রা) আনসার সাহাবীদের একদলসহ তাহাকে হত্যা করেন। তাহার নিহত হওয়ার বিবরণ দিয়াছেন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা)। তিনি বলেন, উমায়্যা ইব্ন খালাফ মক্কায় থাকিতে আমার বন্ধু ছিল। আমার নাম ছিল আব্দ আমর। ইসলাম গ্রহণের পর আমার নাম রাখা হয় আবদুর রাহমান। মক্কায় থাকিতে সে একদিন আমার সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিল, হে আব্দ আমর! তুমি কি তোমার মাতা-পিতার রাখা নাম পরিত্যাগ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, আমি রাহমান কে তাহা চিনি না। তাই আমার ও তোমার মধ্যে এমন একটি কিছু ঠিক কর যাহা দ্বারা আমি তোমাকে ডাকিতে পারি। তুমি তো তোমার পূর্বের নামে ডাকিলে সাড়া দিবে না, আর আমিও এমন নামে ডাকিব না যাহাকে আমি চিনি না। সে যখন আমাকে হে আব্দ আমর বলিয়া ডাকিত, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিতাম না। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবূ আলী! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই একটা কিছু ঠিক করিয়া লও। সে বলিল, তাহা হইলে তুমি আবদুল ইলাহ্। আমি বলিলাম, হাঁ। অতঃপর আমি যখন তাহার নিকট দিয়া যাইতাম তখন সে আমাকে ডাকিত, হে আবদুল ইলাহ্! আমি ইহাতে সাড়া দিতাম এবং তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম।

এমনিভাবে বদর যুদ্ধের দিন আমি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। সে তাহার পুত্র আলীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার সঙ্গে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল যাহা আমি শত্রুসেনাগণকে পরাস্ত করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছিলাম। আমি উহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। সে আমাকে দেখিয়া বলিল, হে আব্দ আমর! আমি ইহার উত্তর দিলাম না। অতঃপর সে ডাকিল, হে আবদুল ইলাহ! আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, তুমি কি আমার প্রতি মনোযোগ দিবে? আমি তো তোমার সহিত যে লৌহবর্ম আছে তাহা হইতে উত্তম। আমি বলিলাম, হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ্র কসম!

অতঃপর আমি আমার হাত হইতে বর্মগুলি ছুড়িয়া ফেলিলাম এবং তাহার ও তাহার পুত্রের হাত ধরিলাম। সে বলিতেছিল, আজিকার দিনের মত (ভয়াবহ দিন) আমি আর কখনও দেখি নাই। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন আছে? ইহা দ্বারা সে অধিক দুধেলা উষ্ট্রী উপঢৌকনের দিকে ইঙ্গিত করে। অতঃপর আমি তাহাদের উভয়কে লইয়া চলিতে লাগিলাম। আমি উমায়্যা ও তাহার পুত্রের মধ্যখানে উভয়ের হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম। উমায়্যা আমাকে বলিল, হে আবদুল ইলাহ! তোমাদের মধ্যে বুকে উট পাখির পালক দ্বারা সজ্জিত ব্যক্তিটি কে? আমি বলিলাম, তিনি হামযা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব। সে বলিল, ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে আজ চরম মার দিয়াছে।

আবদুর রাহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলাম এমন সময় বিলাল (রা) হঠাৎ আমার সহিত তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। সে মক্কায় থাকিতে ইসলাম গ্রহণের কারণে বিলালকে চরম নির্যাতন করিয়াছিল। বিলাল তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, কাফিরদের নেতা উমায়্যা ইব্ন খালাফ! সে পরিত্রাণ পাইলে আমার রক্ষা নাই। অতঃপর তাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। এমনকি তাহারা গোলাকার বৃত্তের ন্যায় করিয়া ফেলিল।

আমি তাহার উপর হইতে আঘাত প্রতিহত করিয়াছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি তরবারি বাহির করিয়া তাহার পুত্রের পায়ে আঘাত করিল। ফলে সে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া উমায়্যা এমন জোরে চীৎকার দিয়া উঠিল যাহা আমি ইতোপূর্বে আর কখনও শুনি নাই। আমি বলিলাম, এখন নিজে বাঁচো, তোমাকে বাঁচাইবার আর কোনও পথ নাই। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কোনওই উপকার করিতে পারিব না। অতঃপর তাহারা উভয়কেই তরবারি দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পরবর্তী কালে আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) বলিতেন, আল্লাহ বিলালের প্রতি রহম করুন। আমার বর্মগুলিও গেল এবং আমার বন্দীর কারণে আমাকে কষ্টও ভোগ করিতে হইল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৩-৭৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৬)। এক বর্ণনামতে এই সময় আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর পায়ে তরবারির আঘাত লাগিয়াছিল। উহার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮৭; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৪৭)।

আবূ জাহ্লকে হত্যা ঘটনা

এই যুদ্ধে কুরায়শদের শীর্ষ নেতা আবূ জাহল ইব্ন হিশাম নির্মমভাবে নিহত হয়। ইমাম বুখারী (র) তাহার হত্যার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এইরূপঃ আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সৈন্যদের লাইনে দাঁড়াইয়া আমি ডানে, বামে তাকাইয়া দেখিলাম, আমি আনসারদের অল্পবয়স্ক দুই যুবকের মধ্যখানে অবস্থিত। আমি মনে মনে কামনা করিলাম, আমি যদি ইহাদের তুলনায় দুইজন শক্তিশালী লোকের মধ্যখানে থাকিতাম। তাহাদের একজন আমাকে একটু খোঁচা দিয়া বলিল, 'চাচাজী! আপনি কি আবূ জাহলকে চিনেন? আমি বলিলাম, হাঁ। তাহাকে দিয়া তোমার কি প্রয়োজন হে ভ্রাতুষ্পুত্র? সে বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাহাকে দেখিতে পাই তবে আমাদের মধ্যে তাড়াহুড়াকারী ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাহার হইতে পৃথক হইব না। ইহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অতঃপর অপরজনও আমাকে একটু খোঁচা দিয়া অনুরূপ কথা বলিল।

ইতোমধ্যে আমি আবূ জাহলকে দেখিলাম, সে লোকদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি বলিলাম, দেখ! তোমরা যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ঐ সেই ব্যক্তি। অতঃপর তাহারা উভয়ে ছুটিয়া গিয়া দ্রুত তরবারি চালনা করিতে লাগিল।' বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে, তাহারা বাজ পাখির ন্যায় দ্রুত গিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে হত্যা করিল। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া এই সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে? উভয়ে বলিল, আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছিয়া ফেলিয়াছ? তাহারা বলিল, না। অতঃপর তিনি তাহাদের উভয়ের তরবারির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়াছ। তাহার

পরিত্যক্ত সম্পদ মু'আয ইব্ন আমর ইবনুল জামূহ-এর। তাহাদের নাম ছিল মু'আয ইব্ন 'আফরা ও মু'আয ইব্ন 'আমর ইব্নুল জামূহ (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু ফারদিল খুমুস, হাদীছ নং ৩১৪১; কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নং ৩৯৮৮)।

আবূ জাহল নিহত হওয়া সম্পর্কে ইব্ন হিশামের বর্ণনা এইরূপঃ বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহল সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল আর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল ঃ

ما تنقم الحرب العوان منى + بازل عامين حديث سنى

لمثل هذا ولدتنى أمى

"প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; দুই বৎসর বয়স্ক নবীন উট আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে না। এই ধরনের কাজের জন্যই আমার মাতা আমাকে জন্ম দান করিয়াছে।"

যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) নিহতদের মধ্যে আবূ জাহলকে খুঁজিবার নির্দেশ দিলেন। ইব্ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাক্র (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাহারা সালামা গোত্রের সদস্য মু'আয ইব্ন আমার ইব্নুল জামূহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবূ জাহল ছিল এমন এক বৃক্ষের ন্যায় যাহার নিকট পৌঁছা যায় না। আমি কাফিরদিগকে বলাবলি করিতে শুনিলাম যে, আবুল হাকামকে বাগে পাওয়া যায় না। ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে হত্যা করার সংকল্প করিলাম, তাই আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। অতঃপর সুযোগ পাইয়া আমি তাহাকে আক্রমণ করিলাম। আমি তাহাকে এমনভাবে আঘাত করিলাম যে, তাহার পা নলার মধ্যখান হইতে উড়িয়া গেল। আল্লাহ্র কসম! আমি উহার উদাহরণ এইভাবে দিলাম যে, খেজুরের আঁটি ভাঙ্গার যাতার নিচ হইতে আঁটি যেমন সটকাইয়া পড়ে তেমনি। তাহার পুত্র ইকরিমা আমাকে আমার কাঁধের নিচে আঘাত করিল। ইহাতে আমার হাত কাটিয়া আমার পার্শ্বদেশের চামড়ার সহিত ঝুলিতে লাগিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের কারণে আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। উক্ত হাত পিছনে ঝুলাইয়া আমি যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ইহাতে যখন আমার বেশী কষ্ট হইতে লাগিল তখন আমি উক্ত ঝুলন্ত হাত পায়ের নিচে রাখিয়া সজোরে টান দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহার পর তিনি উছমান (রা)-এর কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অতঃপর আবূ জাহল আহত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তখন মু'আওবিয ইব্ন আফরা তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তাহাকে আঘাত করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলেন। তখনও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল। মুআওবিয পরে যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইলেন। অতঃপর যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ জাহলকে খুঁজিবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন, নিহতদের মধ্যে তাহাকে চিনিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইলে তোমরা তাহার হাঁটুতে যখমের চিহ্ন দেখিবে। কারণ বালক বয়সে একদিন আমি ও সে আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আনের বাড়িতে দাওয়াত খাইতে গিয়া বিবাদ করিয়াছিলাম। আমি ছিলাম তদপেক্ষা সামান্য বড়। অতঃপর আমি তাহাকে ধাক্কা

দিলে সে পড়িয়া হাঁটুতে ভর করিল। সে এক হাঁটুতে এমন আঘাতপ্রাপ্ত হইল যাহার চিহ্ন এখনও পর্যন্ত তাহার হাঁটুতে রহিয়া গিয়াছে।

লোকজন তাহার সন্ধানে বাহির হইল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাকে এমন অবস্থায় পাইলেন যে, তাহার শ্বাস শেষ পর্যায়ে। তিনি বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। আমি তাহার ঘাড়ের উপর পা রাখিলাম। মক্কায় থাকিতে একবার সে আমাকে থাপ্পড় মারিয়া ব্যথা দিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ্ কি তোমাকে অপদস্থ করিয়াছেন, হে আল্লাহ্র দুশমন? সে বলিল, কিসের দ্বারা আমাকে অপদস্থ করিবেন? আমি কি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে লজ্জাবোধ করিব যাহাকে তোমরা হত্যা করিয়াছ? (এক বর্ণনামতে যাহাকে তাহার কওম হত্যা করিয়াছে)? আমাকে বল, বিজয় কাহাদের হইয়াছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের। অতঃপর সে ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিল, তুমি তো বহু শক্ত স্থানে আরোহণ করিয়াছ হে বকরীর রাখাল! ইব্ন মাসউদ (রা) মক্কায় থাকিতে বকরী চরাইতেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাহার মস্তক কর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট লইয়া আসিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আল্লাহ্র দুশমন আবূ জাহলের মস্তক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোনও ইলাহ নাই? তিনবার তিনি ইহা বলিলেন। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কসম। আমি বলিলাম, হাঁ, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনও ইলাহ নাই। অতঃপর আমি মস্তকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলাম। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৬-৮৮)। এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন ঃ

الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্যে রূপায়িত করিয়াছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং অনেক শত্রুদলকে একাই পরাস্ত করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, আমার সহিত চল, তাহাকে দেখাইয়া দিবে। আমরা চলিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহার লাশ দেখাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, এই হইল বর্তমান উম্মতের ফিরআওন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৬; ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮৯)।

আ'মাশ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি আবূ জাহলের নিকট পৌঁছিলাম। সে তখন ধরাশায়ী অবস্থায় ছিল। তাহার মাথায় ছিল লোহার শিরস্ত্রাণ এবং সঙ্গে ছিল উত্তম তরবারি। আর আমার সঙ্গে ছিল সাধারণ তরবারি। আমি তাহার মস্তকে আমার তরবারি দ্বারা খোঁচা দিতেছিলাম এবং স্মরণ করিতেছিলাম যে, মক্কায় থাকিতে সে এমনিভাবে আমার মস্তকে খোঁচা দিত, তাহার হাত দুর্বল হইয়া যাওয়া পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাহার তরবারি লইলাম। সে মাথা উঠাইয়া বলিল, বিজয় কাহাদের হইয়াছে, আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে? তুমি না মক্কায় আমাদের রাখাল ছিলে! তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাহাকে হত্যা

করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া এই সংবাদ দিলাম (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৮৮-৮৯)।

এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ আফরার পুত্রদ্বয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাহারা এই উম্মতের ফিরআওন ও কাফিরদের মধ্যমণিকে হত্যায় শরীক ছিল। কেহ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে হত্যায় আর কে তাহাদের শরীক ছিল? তিনি বলিলেন, ফেরেশতা ও ইব্ন মাসউদ (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯)।

মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনামতে ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাকে লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় পাইলেন। সে একদিকে পড়িয়াছিল, কোনরূপ নড়াচড়া করিতে পারিতেছিল না। তিনি ধারণা করিলেন যে, সে বুঝি আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি তরবারি দ্বারা খোঁচা মারিলেন কিন্তু সে অসাড় অবস্থায় পড়িয়াই রহিল, কোনওরূপ নড়াচড়া করিল না। অতঃপর তিনি তাহার কাঁধের নিচ হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিয়া তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহাতে তাহার মস্তক তাঁহার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল। তিনি সজোরে টানিয়া তাহার লৌহবর্ম খুলিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাহার দিকে তাঁকাইয়া দেখিলেন তাহার শরীরে কোন যখম নাই। তিনি তাহার ঘাড়ে কালো দাগ এবং তাহার উভয় হাত ও কাঁধে চাবুকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া এই সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, উহা ফেরেশতাদের আঘাত ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৫১)।

বায়হাকী আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সিজদাবনত হইলেন। অপর এক বর্ণনায় তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বিজয়ের সংবাদ এবং আবূ জাহলের মস্তক আনয়নের সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৯)।

এক রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, আবূ জাহলকে কিয়ামত পর্যন্ত বদর প্রান্তরে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন আবিদ দুন্য়া শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি বদর প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছিলাম। তখন দেখিলাম, এক লোক মাটির অভ্যন্তর হইতে বাহির হইতেছে এবং অন্য এক লোক তাহাকে চাবুক মারিতেছে। ইহাতে সে মাটির ভিতর অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অতঃপর পুনরায় সে মাটির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে এবং পুনরায় তাহার সহিত অনুরূপ আচরণ করা হইতেছে। কয়েকবারই এইরূপ করা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে হইল আবূ জাহল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮৯-৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৫২)।

যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ অলৌকিক ঘটনাবলী

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু মু'জিযা সংঘটিত হইয়াছিল। আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ-এর মিত্র ছিলেন উককাশা ইব্ন মিহ্সান আল-আসাদী। বদরের দিন যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাকে বৃক্ষের একটি শুষ্ক কাণ্ড দিয়া বলিলেন, হে উক্কাশা! ইহা দ্বারা যুদ্ধ কর। তিনি উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই উহা তাহার হাতে দীর্ঘ মজবুত ও তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। তিনি উহা দ্বারা মুসলমানদের বিজয় হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উক্ত তরবারির নাম রাখা হয় আল-'আওন (সাহায্য)। ইহা উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রা)-এর নিকটই রক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি উহা দ্বারা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফত আমলে রিদ্দা যুদ্ধে ভণ্ড নবী তুলায়হা আল-আসাদীর হাতে শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৭৮; ইব্ন আবদিল বার্র, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, পৃ. ১১৪)।

আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের ময়দানে সালামা ইব্ন আসলাম ইব্নুল হুবায়শ (রা)-এর তরবারি ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি নিরস্ত্র হইয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে খেজুরের কাঁদির একটি ডাল দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা যুদ্ধ কর। সঙ্গে সঙ্গে উহা একটি উন্মুক্ত তরবারি হইয়া গেল। আবূ উবায়দার নেতৃত্বে পুল (জাসর)-এর যুদ্ধে (১৪/৬৩৫ সন) শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত তরবারি তাঁহার নিকট ছিল (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৯৩-৯৪; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০৬)।

কাতাদা ইবনুন নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন তাহার চোখে আঘাত লাগিয়া চক্ষুগোলক বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। লোকজন উহা কাটিয়া ফেলিতে চাহিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, না, উহা কাটিও না। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সাধারণভাবে উহা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিলেন। অতঃপর উহা এমনভাবে ভাল হইয়া গেল যে, পরবর্তী কালে তিনি বুঝিতেই পারিতেন না যে, তাহার কোন চক্ষুতে আঘাত লাগিয়াছিল। এই বর্ণনামতে সেইটিই হইয়াছিল তাহার সবচাইতে ভাল চক্ষু (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯১; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, ৪খ., পৃ. ৫৩)।

মুসলমানদের হাতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কে কোথায় নিহত হইবে পূর্বের দিনই রাসূলুল্লাহ (স) সুনির্দিষ্টভাবে উহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আবূ তালহা, আনাস, আইশা, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) পূর্বের দিন বিকালবেলা কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কে কোথায় নিহত হইবে উহা তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আগামী কল্য ইনশাআল্লাহ এই স্থানে অমুক ধরাশায়ী হইবে; এই হইল আগামী কল্য ইনশাআল্লাহ অমুকের ধরাশায়ী হওয়ার স্থান; ইহা হইল অমুকের ধরাশায়ী হওয়ার স্থান— ইহা বলিয়া তাঁহার হাত

মাটিতে রাখিয়াছিলেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেই স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। উমার (রা) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি তাঁহাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যে সীমানা নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার একটুও এদিক সেদিক হয় নাই। সেখানেই তাহারা নিহত হইয়া পড়িয়া ছিল। অতঃপর তাহাদিগকে বদরের অভিশপ্ত কূপে একজনের উপর একজনকে ফেলিয়া রাখা হয় (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, ৪খ., ৫৪; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০৬)।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের লাশ বদরের কূপে নিক্ষেপ

বদর যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (স) নিহত কুরায়শ নেতৃবৃন্দের লাশ বদরের কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী ২৪ জনের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৩)। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু কথা বলেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাহাদিগকে (কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে) কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। তবে তাহাদের এক নেতা উমায়্যা ইব্ন খালাফ-এর বিষয়টি ছিল ভিন্ন। কারণ তাহার লাশ লৌহবর্মের মধ্যে ফুলিয়া উহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাহাবীগণ উহা ধরিয়া নাড়া দিতেই তাহার গোশ্ত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল । সেইজন্য তাহারা উহা ঐভাবে রাখিয়া মাটি ও পাথরচাপা দিলেন। অন্যদেরকে কূপে নিক্ষেপের পর রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে কূপবাসিগণ! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়াছিলেন তাহা সত্যরূপে পাইয়াছ? আমি তো আমার প্রতিপালক আমাকে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবে পাইয়াছি। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মৃত লোকদের সহিত কথা বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহারা জানিতে পারিয়াছে যে, উহাদের প্রতিপালক উহাদের সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সত্য (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮০; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০৬)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কিরাম মধ্যরাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিলেন, হে কূপবাসী, হে উতবা ইব্ন রাবী'আ! হে শায়বা ইব্ন রাবী'আ! হে উমায়্যা ইব্ন খালাফ! হে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম! এইভাবে কূপে যাহাদেরকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সকলের নাম লইয়া বলিলেন, তোমরা কি ... (পূর্বের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা)। তখন মুসলমানগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি এমন এক কওমকে আহবান করিতেছেন, যাহারা গলিত লাশ হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহা তাহাদের তুলনায় তোমরা বেশী শ্রবণকারী নহ। তবে তাহারা আমার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নহে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮০-৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯২)। এই ব্যাপারে আনাস ইব্ন মালিক, আবূ তালহা, ইব্ন উমার (রা) প্রমুখ হইতে আরও দীর্ঘ রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সকল রিওয়ায়াত একত্র করিলে উহার মর্ম দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যুদ্ধে কোনও কওমের উপর বিজয়ী হইলে তিনদিন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন। বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর নিয়ম মাফিক তৃতীয় দিবসে তিনি সওয়ারী প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিলেন। সওয়ারী প্রস্তুত হইলে তিনি রওয়ানা হইলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, মনে হয় তিনি কোনও প্রয়োজনে কোথায়ও যাইতেছেন। অতঃপর তিনি উক্ত কূপের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলেন। আনাস (রা)-এর এক বর্ণনামতে তখন ছিল রাত্রিবেলা। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া নিহত কাফির নেতৃবৃন্দের নাম ও পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! আনাস (রা)-এর এক বর্ণনায় তাহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিলেন, হে উমায়্যা ইব্ন খালাফ! হে আবূ জাহল ইব্ন হিশাম! হে উতবা ইব্ন রাবীআ! হে শায়বা ইব্ন রাবী'আ! তোমাদের জন্য কি ইহা খুশীর বিষয় ছিল না যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিতে! আমরা তো আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই পাইয়াছি। তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা সত্যরূপে পাইয়াছ?

এক বর্ণনামতে এই সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের নবীর খারাপ আত্মীয় ছিলে। তোমরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছ, অথচ অন্যরা আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়াছ, অথচ অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ, অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের কৃত অঙ্গীকার বাস্তবে পাইয়াছ? তখন উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তিন দিন পর উহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন? উহারা কি শুনিতে পাইবে?

এক বর্ণনামতে তিনি ইহাও বলিলেন, আপনি কিভাবে এমন কিছু লাশের সহিত কথা বলিতেছেন, যাহাদের মধ্যে প্রাণ নাই? তাহারা কিভাবে শুনিবে বা উত্তর দিবে যখন তাহারা গলিত লাশ হইয়া গিয়াছে! তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহা তাহাদের তুলনায় তোমরা বেশী শুনিতেছ না। তবে তাহারা উত্তর দিতে সক্ষম নহে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৯২-৯২; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৫৫)।

মৃত ব্যক্তি শুনিতে পায় কিনা

উক্ত হাদীছের দ্বারা এই কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত লাশগুলি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহবান শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, لَقَدْ عَلِمُوْا (তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে)। এই কথা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তাহারা এখন জানিতে পারিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই সত্য।

মৃতগণ যে শুনিতে পায় না ইহার সমর্থনে তিনি কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى.

"মৃতকে তো তুমি কথা শুনাইতে পারিবে না" (২৭ ঃ ৮০)।

وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ.

"তুমি শুনাইতে সক্ষম হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে" (৩৫ ঃ ২২)।

কিন্তু বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত লাশগুলি যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহবান ভালভাবে শুনিতে পাইয়াছিল এই ব্যাপারে সহীহ হাদীছসমূহে সুস্পষ্ট বর্ণনা (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) থাকায় বেশীর ভাগ সাহাবী ও তাবিঈ তাহাদের শুনিবার পক্ষে মত ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯২)।

কুরআন কারীমের আয়াত ও সহীহ হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে উলামায়ে কিরাম কিছু ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ তাহাদিগকে ঐ সময় জীবিত করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা এই ধমক, অপমান, শাস্তি ও আক্ষেপ অনুভব করিতে পারে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৫৫; আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬৭; ইব্‌নু কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৯৩)।

আল-ইসমাঈলী (র) বলেন, আইশা (রা)-এর মেধা ও হাদীছ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের বিষয়টি স্বীকার করিয়া লইয়াও বদরের মৃতদের শুনিতে পাওয়া সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করা যায় না, যতক্ষণ না অনুরূপ শক্তিশালী রিওয়ায়াত দ্বারা উহা মনসূখ (রহিত) হওয়া বা সুনির্দিষ্ট (খাস) হওয়া প্রমাণিত হয়। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। তাহা এইরূপে যে, আয়াত اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী انهم الان ليسمعون (তাহারা এখন অবশ্যই শুনিতেছে)-এর পরিপন্থী নহে। কারণ শুনাইবার অর্থ হইল বক্তার আওয়ায শ্রোতার কর্ণে পৌঁছানো। তাই রাসূলুল্লাহ (স) নহেন, বরং আল্লাহ্ই রাসূলের আওয়ায বদর প্রাঙ্গণে অভিশপ্ত নিহতদের কর্ণে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সামর্থ্যবান (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬৮)।

আস-সুহায়লী (র) বলেন, আইশা (রা) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তাই যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের কথাই গ্রহণযোগ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাহারাই ভালভাবে শ্রবণ ও হিফাজত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুজিযার অন্তর্ভুক্ত, সাহাবীদের প্রশ্নের দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, أتخاطب قوما قد جيفوا (আপনি কি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করিতেছেন, যাহারা গলিত লাশ হইয়া গিয়াছে?) তিনি আরও বলেন, আইশা (রা) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তাহারা

জানিতে পারিয়াছে" ইহার অর্থ তাহারা শুনিতে পাইয়াছে। আর শ্রবণ দুইভাবে হইতে পারে ঃ (১) তাহাদের শরীরের কান দ্বারা। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তাহাদের রূহ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন; (২) অন্তরের বা রূহের কান দ্বারা (প্রাগুক্ত; আর-রাওদুল উনুফ, ৫খ., পৃ. ১৭৫-৭৬)। মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বান সেই দিন বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত কুরায়শ নেতৃবৃন্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

আবূ হুযায়ফা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্ত্বনা দান

রাসূলুল্লাহ (স) যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দের লাশ বদরের কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন তখন উতবা ইব্ন আবী রাবী'আর লাশ কূপের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) উতবার পুত্র সাহাবী আবূ হুযায়ফা (রা)-এর চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ দেখিতে পাইলেন। তিনি এতই দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে স্নেহভরে ডাকিয়া বলিলেন, হে আবূ হুযায়ফা! তোমার মনে হয়তবা তোমার পিতা সম্পর্কে কোনও আঘাত লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার পিতা সম্পর্কে বা তাহার নিহত হওয়া সম্পর্কে বেদনাহত নহি। তবে আমি আমার পিতার সঠিক সিদ্ধান্ত, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে জানিতাম। তাই আমি আশা করিতাম যে, তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাই তাহাকে ইসলামে দীক্ষিত করিবে। আমার এইরূপ আশাবাদী থাকার পর তাহার এই পরিণতি দেখিয়া এবং তাহার কুফরীর উপর নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮২; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৫৬-৫৭)।

কতিপয় কুরায়শ যুবকের পরিণতি

এই যুদ্ধে কাফির কুরায়শদের সহিত তাহাদের কিছু যুবক নিহত হয়, যাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا.

"যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তাহারা বলে, আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করিতে? ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কত মন্দ আবাস" (৪ ঃ ৯৭)!

তাহারা হইল ঃ (১) আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা ইব্ন কুসায়্যি গোত্রের আল-হারিছ ইব্ন যামআ ইব্নুল আসওয়াদ; (২) মাখযূম গোত্রের আবূ কায়স ইবনুল ফাকীহ ইব্নুল মুগীরা, (৩) একই গোত্রের আবূ কায়স ইবনুল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা; (৪) জুমাহ গোত্রের আলী ইব্ন উমায়া ইব্ন খালাফ; (৫) সাহম গোত্রের আল-আস ইব্ন মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ।

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় থাকিতেই ইহারা ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন ইহাদের বাপ-দাদা ও নিকটাত্মীয়রা ইহাদিগকে মক্কায় আটক করিয়া রাখে এবং নির্যাতন ও চাপ প্রয়োগ করিয়া দীন ইসলাম ত্যাগ করায়। অতঃপর তাহারা তাহাদের কওমের সহিত বদর প্রান্তরে আগমন করে এবং যুদ্ধে সকলেই নিহত হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩৯৬; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩০৭)।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) লাভ ও উহার সুষ্ঠু বণ্টন

এই যুদ্ধে কাফিরদের নিকট হইতে মুসলমানগণ প্রচুর গনীমত লাভ করেন। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) সেগুলি একত্র করার নির্দেশ দেন। অতএব তাহা একত্র করা হয়। উক্ত সম্পদের মধ্যে ছিল ১৫০টি উট, বহু আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় ও চামড়া যাহা মুশরিকগণ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে লইয়াছিল, ১০টি ঘোড়া, বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং আবূ জাহলের উট যাহা পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটই থাকিত। তিনি উহাতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। মাদীক ও নাযিয়া-র মধ্যবর্তী সায়র নামক স্থানে পৌঁছিয়া গনীমতের সম্পদ বণ্টন করা হয় (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬২)।

এই সময় ইহার বণ্টন লইয়া মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাফিরগণ যখন পরাজয় বরণ করিতেছিল তখন মুসলমানগণ তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন। একদল পলায়নপর কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বন্দী ও হত্যা করিতেছিলেন। একদল তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ ও জড়ো করিতেছিলেন। আর একদল কাফিরদের পুন আক্রমণের আশংকায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন।

অতঃপর রাত্রিবেলা যখন সকলে একত্র হইলেন তখন যাহারা উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারা বলিলেন, উহা আমাদেরই প্রাপ্য।

আর যাহারা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হত্যা ও বন্দী করিয়াছিলেন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা না হইলে তোমরা ইহা পাইতে না। আমরা তাহাদিগকে তোমাদের হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি, তাই তোমরা উহা লাভ করিয়াছ।

আর যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রহরায় ছিলেন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা উহাতে আমাদের তুলনায় অধিক হকদার নহ। আল্লাহ যখন আমাদিগকে বিজয় দান করেন তখন ইচ্ছা করিলে আমরা শত্রুদিগকে হত্যা করিতে পারিতাম। আমরা ইচ্ছা করিলে সম্পদ

সংগ্রহও করিতে পারিতাম, যখন উহাতে বাধা দেওয়ার কোনও লোকই ছিল না। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে আশংকা করিয়াছিলাম যে, দুশমনগণ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসে কিনা। তাই আমরা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিলাম।

সুতরাং উক্ত গনীমতের ব্যাপারে তোমরা আমাদের তুলনায় অধিক হকদার নহ। এই মতবিরোধ ও বাদানুবাদের অবসান ঘটাইয়া আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিলেন যে, ইহার মালিক আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৩)। আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও" (৮ ঃ ১)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহা বন্টনের দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ন্যস্ত করিলেন। এই বিষয়ে আল্লাহ আরও ইরশাদ করিলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"তোমরা আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাহাতে যাহা মীমাংসার দিন (বদর যুদ্ধের দিন) আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করিয়াছি, যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান" (৮ ঃ ৪১)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সকল সাহাবীর মধ্যে তাহা সমভাবে বন্টন করিলেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-কে গণীমত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, বদর যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কেই গনীমতের আয়াত নাযিল হয়, যখন আমরা গনীমত লইয়া মতবিরোধ করিতেছিলাম। এই ব্যাপারে আমাদের স্বভাব কলুষিত হইতেছিল। তখন উহার কর্তৃত্ব আল্লাহ আমাদের হাত হইতে নিয়া তাঁহার রাসূলের উপর ন্যস্ত করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে উহা বন্টন করিলেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ২৮৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০১-৩০২)। এক বর্ণনামতে

খাব্বাব ইবনুল আরাত্ (রা)-কে তিনি উহা বন্টনের দায়িত্ব প্রদান করেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬২)।

রাসূলুল্লাহ (স) গনীমত সমভাবে বন্টনের নির্দেশ দিলে সা'দ ইব্ন মুআয (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি জাতিকে রক্ষাকারী অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে ও দুর্বলদিগকে একই সমান অংশ প্রদান করিবেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার মাতার পুত্রবিয়োগ ঘটুক! দুর্বলদের কারণেই তো তোমাদিগকে সাহায্য করা হইয়াছে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬২)।

যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে একজন লোক ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি কোনও শত্রুসৈন্যকে হত্যা করিবে, সে সেই নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা সম্পদ পাইবে। যে কাহাকেও বন্দী করিবে সে সেই বন্দীটির মালিক হইবে। ঐ সূত্র অনুযায়ী হত্যাকারীকে তিনি নিহত ব্যক্তির সম্পদ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া যেসব সম্পদ যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া গিয়াছে অথবা বিনা যুদ্ধে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছে উহাই সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়।

গনীমতের সম্পদ ৩১৭ ভাগে বন্টন করা হয়। মুজাহিদ ছিল ৩১৩ জন। অশ্বারোহীর দুইভাগ, দুইজন অশ্বারোহী থাকায় তাহাদের ৪ ভাগ। এতদ্ব্যতীত ৮ জন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিলেও রাসূলুল্লাহ (স) সঙ্গত কারণেই তাহাদিগকে অংশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে তিনজন মুহাজির। তাঁহারা হইলেন ঃ (১) উছমান ইব্ন আফফান (রা) যাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় অসুস্থ কন্যা রুকায়্যার সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া যান। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) যেদিন বিজয়ের সুসংবাদ লইয়া মদীনায় আগমন করেন সেই দিন তিনি ইনতিকাল করেন। (২) তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ ও (৩) সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা); রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে মুশরিকদের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর পাঁচজন আনসার, তাহারা হইলেনঃ (১) আবূ লুবাবা ইব্ন আবদিল মুনযির (রা), রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনার শাসক বানাইয়াছিলেন; (২) আসিম ইব্ন আদী (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে কুবাবাসী ও মদীনার উচ্চ ভূমির শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; (৩) আল-হারিছ ইব্ন হাতিব (রা), রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বানূ আমর ইব্ন আওফ-এর তদারকির দায়িত্ব দিয়াছিলেন; (৪) আল-হারিছ ইবনুস সিম্মা ও (৫) খাওওয়াত ইব্ন জুবায়র (রা); বদর রওয়ানা হওয়ার পথে আর-রাওহা নামক স্থানে পৌছিবার পর তাহাদের উভয়ের পা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে তাঁহারা বাধ্য হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর এক বর্ণনামতে সা'দ ইব্ন উবাদা ও সা'দ ইব্ন মালিক আস-সাইদী এবং আনসারদের অপর দুই ব্যক্তিকেও গনীমতের অংশ প্রদান করা হয় (প্রাগুক্ত)।

মদীনায় বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ

বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর মদীনায় উহার সংবাদ প্রেরণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে মদীনার উচ্চ ভূমিতে এবং যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে মদীনার

নিম্নভূমিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আল-আকীক নামক স্থান হইতে পৃথক হইয়া গেলেন এবং উভয়ে রবিবার বেলা বিদ্বপ্রহরের পূর্বেই মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার সওয়ারীতে থাকিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিরাপদ আছেন এবং মুশরিকগণ নিহত ও বন্দী হইয়াছে। রাবী'আর পুত্রদ্বয় (উতবা ও শায়বা), আল-হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় (নুবায়হ ও মুনাব্বিহ), আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, যাম'আ ইব্নুল আসওয়াদ ও উমায়্যা ইব্ন খালাফ নিহত হইয়াছে এবং সুহায়ল ইব্ন আমর বন্দী হইয়াছে। আসিম ইব্ন আদী (রা) বলেন, আমি তাঁহার মুখামুখী দাঁড়াইয়া বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা কি ঠিক হে ইব্ন রাওয়াহা? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম! আগামী কালই রাসূলুল্লাহ (স) বন্দীদের লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। তিনি মদীনার উচ্চভূমিতে অবস্থিত আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়া এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন। বালকগণও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল এবং বলিতেছিল, পাপিষ্ঠ আবূ জাহল নিহত হইয়াছে। এইভাবে তিনি বনূ উমায়্যা ইব্ন যায়দ-এর বাড়ি পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৫৭; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৪)।

অপরদিকে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর আল-কাসওয়া বা আল-আদবা নামক উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করিয়া মদীনার নিম্নভূমিতে বসবাসকারী সাহাবীদিগকে সুসংবাদ শুনাইতে লাগিলেন। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, আমরা তখন জান্নাতুল বাকীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা রুকায়্যার কবরের মাটি সমান করিতেছিলাম। তিনি উছমান (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ও উছমান (রা)-কে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। তখন আমাদের নিকট সংবাদ আসিল যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) আসিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি তখন মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন, আর লোকজন তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন, উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, আবুল বাখতারী, আল-আস ইব্ন হিশাম, উমায়্যা ইব্ন খালাফ, নুবায়হ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ নিহত হইয়াছে এবং সুহায়ল ইব্ন আমরসহ অনেকে বন্দী হইয়াছে। উসামা (রা) বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে পিতা! ইহা কি সত্য? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম হে বৎস (প্রাগুক্ত)।

এক বর্ণনামতে কিছু লোক যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর কথা বিশ্বাস করিতেছিল না। তাহারা বলিতেছিল, যায়দ পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মুসলমানগণ রাগান্বিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, ইহার ফলে আমি বন্দীদিগকে না দেখা পর্যন্ত তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এক মুনাফিক আবূ লুবাবা ইব্ন আবদিল মুনযিরকে বলিল, তোমাদের সঙ্গীগণ এমনভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কখনও একত্র হইতে পারিবে না। আর তাঁহার নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ নিহত হইয়াছে। মুহাম্মাদ নিহত হইয়াছে। এই তাঁহার উষ্ট্রী, উহা আমরা চিনি। আর এই যায়দ, ভয় ও আতঙ্কের কারণে কি

বলিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। সে পরাজিত হইয়াই আসিয়াছে। আবূ লুবাবা (রা) বলিলেন, আল্লাহ তোমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুন। ইয়াহূদীগণও বলিত লাগিল, সে পরাজিত হইয়াই আসিয়াছে।

উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, আমি একান্তে আমার পিতার নিকট গিয়া বলিলাম, হে পিত! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা কি সত্য? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য হে বৎস। তখন আমি মনে একটু শক্তি পাইলাম এবং উক্ত মুনাফিকের নিকট আসিয়া বলিলাম, তুমিই রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের সম্পর্কে অপপ্রচারকারী। রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিয়া আসিলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাঁহার সম্মুখে হাযির করিব এবং তিনি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিবেন। তখন সে বলিল, হে আবূ মুহাম্মাদ! ইহা লোকজনের মুখে আমার শোনা কথা (সুবুলুল হুদা, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৫৭-৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধ শুরু হয় দ্বিতীয় হি. ১৭ই রামাদান শুক্রবার সকালবেলা। সূর্য হেলিয়া পড়িবার পূর্বেই মুসলমানগণ বিজয়লাভ করেন। তিনদিন সেখানে অবস্থানের পর সোমবার রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে লইয়া রওয়ানা হন। উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তিনি বদরের কূপের নিকট দাঁড়াইয়া কুরায়শ নেতৃবন্দকে সম্বোধন করেন। অতঃপর বন্দী ও গনীমতসহ তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। বন্দীদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন জারীর আত-তাবারী ৪৪ জনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, পৃ. ৪৫৯)। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ৭০ জন। বন্দীদের মধ্যে উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত ও আন-নাদর ইবনুল হারিছ ইব্ন কালাদাও ছিল। অতঃপর তিনি মাদীক ও নাযিয়া-এর মধ্যবর্তী সায়র নামক স্থানে একটি বড় বৃক্ষের নিচে অবতরণ করিয়া গনীমত বন্টন করেন। অতঃপর সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া আস-সাফরা নামক স্থানে আসিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে বন্দী আন-নাদর ইব্নুল হারিছকে হত্যা করা হয়। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) তাহাকে হত্যা করেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৫)। পরবর্তী কালে তাহার কন্যা কুতায়লা বিনতুন নাদর স্বীয় পিতার শোকে এক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। তাহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল এবং অশ্রুতে তাঁহার দাড়ি মুবারক ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি আবূ বাক্র (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আমি পূর্বে তাহার এই কবিতা শুনিলে তাহার পিতাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিতাম না (সুবুলুল হুদা, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬৩-৬৪)।

অতঃপর ইরকুজ জাব্য়া নামক স্থানে পৌছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) অপর এক বন্দী উকবা ইব্ন আবী মু'আয়তকে হত্যার নির্দেশ দেন। উকবা বলিল, হে মুহাম্মাদ! বাচ্চাদের কে দেখাশুনা করিবে? তিনি বলিলেন, জাহান্নামের আগুন। আসিম ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা) ইব্ন হিশাম-এর এক বর্ণনামতে আলী (রা) তাহাকে হত্যা করেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ.

২৮৬)। হত্যার জন্য আসিম ইব্ন ছাবিত প্রস্তুত হইতেই উকবা বলিল, ওহে কুরায়শ দল! আমি কিসের অপরাধে তোমাদের সম্মুখে নিহত হইতেছি? আসিম (রা) বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন তখন উকবা বলিল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি কুরায়শদের সম্মুখেই আমাকে হত্যা করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তোমরা কি জান, এই লোক আমার সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছিল? আমি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সিজদারত ছিলাম। সে আমার ঘাড়ে পা রাখিয়া এমন জোর চাপ দিতে ছিল যে, আমি মনে করিলাম, আমার চক্ষুদ্বয় বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

"আর একদিন আমি সিজদারত থাকা অবস্থায় সে বকরীর নাড়ীভুঁড়ি আনিয়া আমার মাথার উপর ফেলিয়া রাখিল। অতঃপর ফাতিমা আসিয়া উহা সরাইয়া ফেলে এবং আমার মাথা ধুইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই ব্যক্তি ছিল আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট নরাধম এবং ইসলামের প্রতি সর্বাধিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী, ইসলাম ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ব্যঙ্গকারী কাফির। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) ইহাদিগকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই দুইজন (অপর এক বর্ণনামতে তুআয়মা ইব্ন আদীসহ ৩ জন বন্দী) ব্যতীত অন্য কোনও বন্দীকে এইভাবে হত্যা করা হয় নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৫-৩০৬; সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৬৩-৬৪)।

এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) ফারওয়া ইব্ন আমর আল-বায়াদীর দাস আবূ হিন্দ-এর সাক্ষাত পান যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষৌরকার। তিনি খেজুর, ছাতু ও ঘি সমন্বয়ে তৈরীকৃত হায়স নামক খাবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা গ্রহণ করেন। আবূ হিন্দ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সম্পর্কে আনসারদিগকে ওসিয়াত করিয়া বলেন, আবূ হিন্দ আনসারদেরই লোক। তোমরা তাহাকে বিবাহ করাও এবং তাহার নিকট বিবাহ দাও। আনসারগণ এই নির্দেশ পালন করেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণসহ আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিলে মদীনার মুসলমানগণ বিজয়লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ও বিজয়ী বীরদের স্বাগত জানাইতে থাকে। অতঃপর সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক্শ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কিসের জন্য আমাদিগকে স্বাগত জানাইতেছ? আল্লাহ্র কসম! আমরা তো রক্তপণে দেওয়া মোটাসোটা পশুর ন্যায় একদল বৃদ্ধকে পাইয়াছিলাম, যাহাদের মস্তকের সম্মুখভাগের চুল পড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদিগকে আমরা যবেহ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! উহারা তো কওমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নেতা (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৫৯; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬২-৬৪)।

উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা) স্বাগত জানাইতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে সফলতা দান করিয়াছেন এবং আপনার চক্ষু শীতল করিয়াছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই ধারণা করিয়া বদর যুদ্ধ হইতে পিছাইয়া থাকি নাই যে, আপনি শত্রুদের মুকাবিলা করিবেন, বরং আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, আপনি বাণিজ্য কাফেলার মুখামুখী হইবেন। যদি জানিতাম যে, শত্রুসৈন্যের মুকাবিলা করিবেন, তবে কখনও আমি পিছাইয়া থাকিতাম না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৫)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা হইয়া বন্দীদের পৌঁছিবার একদিন পূর্বেই মদীনা পৌঁছিলেন। মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল শত্রু তাঁহাকে ভয় পাইতে ও সমীহ্ করিয়া চলিতে লাগিল এবং মদীনার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিল। এই সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলও বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়াহূদীগণ বলিল, আমরা নিশ্চিত হইলাম যে, তিনি সেই নবী যাঁহার প্রশংসা আমরা আমাদের তাওরাত কিতাবে পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) ২২শে রামাদান বুধবার ছানিয়্যাতুল-ওয়াদা হইতে মদীনায় প্রবেশ করেন। মদীনার বালক-বালিকাগণ দফ বাজাইয়া এই শ্লোক গাহিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে লাগিল ঃ

طـلـع البـدر علينا + مـن ثنـية الوداع
وجب الشكر علينا + مـا دعا لـله داع

"পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র ছানিয়্যাতুল ওয়াদা হইতে আমাদের নিকট উদিত হইয়াছে। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক ঐ আহবানকারীর জন্য যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করিয়াছেন" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬৪)।

বন্দীদের মদীনায় উপস্থিতি

অতঃপর মদীনায় পৌঁছিবার একদিন পর ২৩ রামাদান বন্দীদের মদীনায় আনয়ন করা হয়। তাহারা যখন মদীনা পৌঁছিল তখন উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিন্‌ত যাম্‌'আ (রা) আফরা পরিবারের নিকট ছিলেন। তাহারা আওফ ও মুআওবিয ইব্‌ন আফরার শাহাদাতে মাতম করিতেছিল। ইহা ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। সাওদা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাদের নিকট থাকিতেই সংবাদ পাইলাম যে, বন্দীদিগকে আনা হইয়াছে। আমি আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে ছিলেন। আমি আসিয়াই দেখিলাম, আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্‌ন আমর হুজরা প্রাঙ্গণে উভয় হাত গলার সহিত রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় রহিয়াছে। আবূ ইয়াযীদকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি আমার নফসকে সংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, হে আবূ ইয়াযীদ! তোমাদিগকে হাত দেওয়া হইয়াছে, তোমরা কি সম্মানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতে পার না? আল্লাহ্‌র কসম! তখন গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীই আমার সম্বিত ফিরাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, হে সাওদা! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের

সিদ্ধান্তের উপর তুমি কি তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন! আমি আবূ ইয়াযীদকে তাহার হস্তদ্বয় গলার সহিত বাঁধা অবস্থায় দেখিয়া আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারি নাই, তাই যাহা ইচ্ছা বলিয়া ফেলিয়াছি (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৬০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৬-৮৭)। এক বর্ণনায় ইহাও আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬৫)। আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্ন আমরকে দেখিয়া উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি লোকজনকে ছারীদ (গোশতের ঝোল মিশ্রিত রুটি) আহার করাইত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই আবূ ইয়াযীদ লোকজনকে খাদ্য প্রদান করিত ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্র নূর নির্বাপিত করার চেষ্টাও করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করাইয়াছেন (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬৫-৬৬)।

বন্দীদের সহিত সদ্ব্যবহার

বন্দীগণ মদীনায় পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) সঙ্গীদের হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিলেন এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন বন্দীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে। মদীনার প্রথম দাঈ ও মু'আল্লিম মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর সহোদর (এক বর্ণনামতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) আবূ আযীয ইব্ন উমায়র ইব্ন হিশাম ছিলেন একজন বন্দী। তিনি বলেন, আমার ভ্রাতা মুস'আব ইব্ন উমায়র আমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন আনসারদের এক লোক আমাকে বাঁধিতেছিল। মুস'আব সেই আনসারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার উভয় হস্ত তাহার সহিত মজবুত করিয়া বাঁধ। কারণ তাহার মাতা সম্পদশালিনী। সে হয়ত বা মোটা অংকের পণ দিয়া তোমার নিকট হইতে উহাকে ছাড়াইয়া লইবে। আমি বলিলাম, হে ভ্রাত! আমার তুলনায় ইহারাই কি তোমার আপনজন? মুস'আব বলিলেন, তুমি ছাড়া সে-ই আমার ভাই। অতঃপর তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল যে, একজন বন্দীর বিনিময়ে সর্বোচ্চ কত পণ দেওয়া হইয়াছে? তাহাকে বলা হইল, চার হাজার দিরহাম। অতএব তিনি তাহার পণস্বরূপ চার হাজার দিরহাম পাঠাইয়া দিলেন। আবূ আযীয বলেন, আমাকে যখন বদর প্রান্তর হইতে লইয়া আসা হয় তখন আমি আনসারদের একটি দলের সহিত ছিলাম। দুপুর এবং রাত্রের খাবার যখন দেওয়া হইত তখন আমাকে রুটি প্রদান করিয়া তাহারা কেবল খেজুর খাইত। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাদের কাহারও ভাগে এক টুকরা রুটি মিলিলে সে তাহা আমাকে দিয়া দিত। ইহাতে আমি লজ্জাবোধ করিয়া তাহাদের কাহাকেও উহা ফেরত দিতাম। কিন্তু সে উহা স্পর্শও করিত না; বরং আমাকে আবার ফিরাইয়া দিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৬; ইব্ন হিশাম, আসী-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৬-৮৭)।

বন্দীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন, এই সকল বন্দীর ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? আল্লাহ তাহাদের ব্যাপারে তোমাদিগকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাহারা গতকল্যও ছিল তোমাদের ভাই। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আপনার আহ্ল ও আপনার কওম। আল্লাহ আপনাকে সফলতা দান করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর আপনাকে বিজয় দান করিয়াছেন। উহারা আমাদের চাচার বংশধর, নিকটাত্মীয় ও আপনজন। তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন। আমার মত হইল, তাহাদের নিকট হইতে ফিদ্য়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ করা হউক। তাহাদের নিকট হইতে আমরা যাহা গ্রহণ করিব তাহা কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জন্য শক্তি হইবে। আর হয়ত বা আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাহাদিগকে হিদায়াত দান করিবেন, যাহার ফলে তাহারা আপনার জন্য সাহায্যকারী হইবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি বল, হে ইবনুল খাত্তাব? উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা আপনাকে বহিষ্কার করিয়াছে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। আবূ বাক্র (রা) যেমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমার মত তাহা নহে। আমার মত হইল, অমুকের (উমার-এর নিকটাত্মীয়) ব্যাপারে আমাকে ক্ষমতা দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। আলীকে আকীলের ব্যাপারে ক্ষমতা দিন, সে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিক। হামযাকে অমুকের (তাহার ভ্রাতা) ব্যাপারে ক্ষমতা দিন, সে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিক যাহাতে জানিতে পারেন যে, মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি নাই। ইহারা কুরায়শদের সরদার, নেতা ও নীতি নির্ধারক। তাই ইহাদের গর্দান উড়াইয়া দিন।

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন একটি উপত্যকা খোঁজ করুন যেখানে বহু কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে। ইহাদিগকে সেখানে নিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিন। আব্বাস (রা) তাহার কথা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিলে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৬-৯৭; ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬০)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন কিছু লোক বলিল, তিনি উমার (রা)-এর মতই গ্রহণ করিবেন। আর কিছু লোক বলিল, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর মতই গ্রহণ করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের অন্তর নরম করিয়া দেন, এমনকি তাহা দুধের তুলনায়ও নরম হইয়া যায়। আবার আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের অন্তর শক্ত করিয়া দেন, এমনকি তাহা পাথরের তুলনায়ও শক্ত হইয়া যায়। হে আবূ বাক্র! ফেরেশতাদের মধ্যে তোমার উদাহরণ হইল

মীকাঈল (আ); তিনি রহমতসহ নাযিল হন এবং নবীদের মধ্যে তোমার উদাহরণ হইল ইবরাহীম (আ)। তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১৪ ঃ ৩৬)।

আবূ বাক্র! তোমার আরও উদাহরণ হইল ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা। আর তুমি যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)।

আর হে উমার! ফেরেশতাদের মধ্যে তোমার উদাহরণ হইল, জিবরীল (আ)। তিনি আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি কঠোর। তিনি প্রতিশোধের মনোভাব লইয়া অবতরণ করেন। আর নবীদের মধ্যে তোমার উদাহরণ হইল নূহ (আ)। তিনি বলিয়াছেন ঃ

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا.

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না" (৭১ ঃ ৩৬)।

নবীদের মধ্যে তোমার আরও উদাহরণ হইল মূসা (আ)। তিনি বলিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না" (১০ ঃ ৮৮)।

তোমরা উভয়ে যদি একমত হইতে তবে আমি তোমাদের মতের খেলাফ করিতাম না। তোমরা ছায়াতুল্য। তাই তোমাদের কেহ মুক্তিপণ অথবা হত্যা করা ব্যতীত ছাড়িবে না। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুহায়ল ইব্ন বায়দা ব্যতীত। কারণ আমি তাহাকে ইসলামের কথা বলিতে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ইহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িলাম এই কারণে যে, আমার উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হয় কিনা! অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সুহায়ল ইব্ন বায়দা ব্যতীত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৭-৯৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬০-৬১)।

অতঃপর মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্র পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত" (৮ ঃ ৬৭-৬৮)।

পরদিন সকালবেলা উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন যে, তিনি ও আবূ বাক্র উভয়ে কাঁদিতেছেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কিজন্য কাঁদিতেছেন? তাহা শুনিয়া আমার যদি ক্রন্দন আসে তবে আমিও কাঁদিব, আর না আসিলে আপনাদের ক্রন্দনের কারণে আমি ক্রন্দনের ভান করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইবনুল খাত্তাবের মতের বিরোধিতা করার কারণে আমাদের উপর প্রায় আযাব আসিয়াই পড়িয়াছিল! যদি আযাব আসিয়াই পড়িত তবে ইবনুল খাত্তাব ব্যতীত আর কেহই রক্ষা পাইত না। তিনি নিকটবর্তী একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, শাস্তি আমার নিকট পেশ করা হইয়াছিল যাহা ছিল এই বৃক্ষ হইতেও নিকটবর্তী (সুবুলুল হুদা, ৪খ, ৬১)।

বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায়

বন্দীদের সকলের নিকট হইতে একই হারে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয় নাই, সামর্থ্য অনুযায়ী ইহার তারতম্য হইয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের জন্য চারি শত দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন। ইহা ছিল সর্বনিম্ন মুক্তিপণ। আর সর্বোচ্চ মুক্তিপণ ছিল চারি হাজার দিরহাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৯)। সর্বপ্রথম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয় আবূ ওয়াদা'আ ইব্ন দুবায়রা আস-সাহমীর। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, মক্কায় তাহার একজন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী পুত্র রহিয়াছে। সে-ই হয়তবা তোমাদের নিকট তাহার পিতার মুক্তিপণ লইয়া আসিবে।

অতঃপর কুরায়শগণ পরস্পর আলোচনা করিল এবং বলিল, তোমরা তোমাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিও না। তাহা হইলে মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীবৃন্দ তোমাদের নিকট বেশী বেশী মুক্তিপণ দাবি করিবে। আল-মুত্তালিব ইব্ন আবী ওয়াদা'আ (ইহার প্রতিই রাসূলুল্লাহ (স) ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ

করেন) বলিলেন, তোমরা সত্য বলিয়াছ, তাড়াহুড়া করিও না। অতঃপর রাত্রিবেলা তিনি চুপেচুপে মদীনা চলিয়া আসিলেন এবং চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে স্বীয় পিতাকে মুক্ত করিয়া লইয়া গেলেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৯০; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৬৪-৬৫)।

অতঃপর মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌স ইবনুল আখয়াফ আসিল সুহায়ল ইব্‌ন আমরের মুক্তিপণের জন্য যাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন বানূ সালিম ইব্‌ন আওফ-এর ভ্রাতা মালিক ইবনুদ দুখশুম (রা)। সুহায়লের উপরের ঠোঁট ছিল কাটা। তিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার সম্মুখের দন্তদ্বয় উপড়াইয়া ফেলি যাহাতে তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং জীবনে আর কখনও আপনার বিরুদ্ধে কোথায়ও বক্তৃতা দিতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি কাহারও অঙ্গহানি করিতে চাই না যাহার ফলে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করিয়া দিবেন, যদিও আমি নবী হই না কেন। সে হয়তবা এমন এক অবস্থানে পৌঁছিবে যে, তুমি আর তাহাকে মন্দ বলিবে না। অতঃপর মিকরায তাহার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করিল এবং একটি সন্তোষজনক পরিমাণ মুক্তিপণ নির্ধারিত হইল। মুসলমানগণ উক্ত পরিমাণ দাবি করিলে মিকরায বলিল, আমাকে তাহার স্থলে আটক রাখিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। সে তোমাদের নিকট তাহার মুক্তিপণ পাঠাইয়া দিবে। অতঃপর মুসলমানগণ মিকরাযকে নিজেদের নিকট আটক রাখিয়া সুহায়লকে ছাড়িয়া দিল (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩১০; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৬৫)। হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুহায়লের যে অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেন তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর আরবের লোকজন যখন মুরতাদ্দ হইয়া যাইতেছিল তখন সুহায়ল ইব্‌ন আমর (রা) মক্কায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া লোকজনকে দীনে হানীফের উপর অটল রাখেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১০)।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারব-এর পুত্র 'আমরও ছিল। আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। আবূ সুফ্‌য়ানকে বলা হইল, তোমার পুত্র 'আমরের মুক্তিপণ দাও। তিনি বলিলেন, আমি কি জান ও মাল উভয় দিক হইতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব? তাহারা হানজালাকে (আবূ সুফ্‌য়ানের পুত্র) হত্যা করিয়াছে। আবার আমরের মুক্তিপণও দিব? রাখ, উহাকে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দাও। যত দিন ইচ্ছা তাহারা উহাকে বন্দী করিয়া রাখুক। অতএব সে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বন্দী জীবন কাটাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে বানূ আমর ইব্‌ন আওফের ভ্রাতা সা'দ ইবনুন নু'মান ইব্‌ন আক্কাল তাহার ছোট এক কন্যাকে লইয়া 'উমরা করিবার জন্য মক্কা গমন করিলেন। তিনি ছিলেন মদীনার নিকটবর্তী নাকী নামক স্থানে বসবাসকারী একজন বৃদ্ধ মুসলমান। সেখান হইতেই তিনি রওয়ানা হন। তাহার সহিত পরে যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে তাহার কোনও আশংকাই ছিল না। তিনি ধারণাই করিতে পারেন নাই যে, মক্কায় তাহাকে বন্দী করা হইবে। কুরায়শদের একটি অঙ্গীকার ছিল যে,

কেহ হজ্জ বা 'উমরা করিতে মক্কায় গমন করিলে তাহারা তাহার সহিত কোনরূপ খারাপ আচরণ করিবে না। কিন্তু আবূ সুফ্য়ান ইহা ভঙ্গ করিয়া তাহার পুত্র আমরের বদলে সা'দকে বন্দী করিল। আম র ইব্ন আওফের লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া ঘটনা অবহিত করিল এবং আবূ সুফ্য়ানের পুত্র 'আমরকে তাহাদের নিকট অর্পণ করিতে আবেদন করিল যাহাতে তাহারা তাহার বিনিময়ে তাহাদের বৃদ্ধকে ছাড়াইয়া আনিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাই করিলেন। অতঃপর তাহারা আমরকে পাঠাইয়া দিলে আবূ সুফ্য়ানও সা'দকে ছাড়িয়া দেন (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪৬৬-৬৭; ইব্ন হিশাম, আসী-সীরা, ২খ., পৃ. ২৯২-৯৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আব্বাস ছিলেন বন্দীদের অন্যতম। আবুল ইয়াসার নামক এক আনসার সাহাবী তাহাকে বন্দী করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বন্দীদিগকে মজবুত করিয়া বাঁধা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রের প্রথমভাগে ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে যে, ঘুমাইতে পারিতেছেন না? তিনি বলিলেন, আমি আমার চাচা আব্বাসের (জোরে বাঁধার কারণে) ক্রন্দনের আওয়ায শুনিতে পাইতেছি। তখন তাহারা তাহার বন্ধন ঢিলা করিয়া দেন। ইহাতে তিনি চুপ হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-ও নিদ্রা গেলেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৯৯)।

ইব্ন উমার (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, আব্বাসকে একজন আনসার সাহাবী বন্দী করিয়াছিলেন এবং আনসারগণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই। আনসারগণ তাহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। উমার (রা) বলিলেন, আমি কি তাহাদের নিকট যাইব? তিনি বলিলেন, হাঁ! অতএব উমার (রা) আনসারদের নিকট গিয়া বলিলেন, আব্বাসকে ছাড়িয়া দাও। তাহারা বলিল, না, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহাকে ছাড়িব না। উমার (রা) তাহাদিগকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হন? তাহারা বলিল, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে উহাকে লইয়া যাও। অতঃপর উমার (রা) তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। আব্বাস তাঁহার হাতে থাকিতে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে আব্বাস! ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ হইতেও তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট বেশী আনন্দদায়ক হইবে। ইহা এইজন্য যে, আমি অনুভব করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) তোমার ইসলাম গ্রহণে খুশী হইবেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬০)। উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে সম্ভব যে, প্রথম বর্ণনাটি যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শেষোক্ত ইব্ন উমার (রা)-এর বর্ণনাটি মদীনায় পৌঁছিবার পরের।

মদীনায় আনয়নের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, হে আব্বাস! আপনি আপনার নিজের, দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকীল ইব্ন আবী তালিব ও নাওফাল ইবনুল হারিছ-এর এবং মিত্র 'উতবা ইব্ন 'আমর-এর পক্ষ হইতে মুক্তিপণ প্রদান করুন। কারণ আপনি সম্পদশালী। তিনি

বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মুসলমানই হইয়াছিলাম, কিন্তু কওম আমাকে জোর করিয়া যুদ্ধে লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ই আপনার ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানেন। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে আল্লাহ আপনাকে উহার বিনিময় দান করিবেন। তবে আপনার বাহ্যিক অবস্থান তো আমাদের বিপক্ষে ছিল। তাই আপনার মুক্তিপণ প্রদান করুন। এই সম্পর্কে কুরআন কারীমের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিতে চাহিলে তাহারা তো পূর্বে আল্লাহ্র সহিতও বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের উপর শক্তিশালী করিয়াছেন; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৮ ঃ ৭০-৭১)।

ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিকট হইতে ২০ উকিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আব্বাস বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মনে করিয়াছি উহাই বুঝি আমার মুক্তিপণ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, উহা তো আল্লাহ আপনার নিকট হইতে আমাদেরকে প্রদান করিয়াছেন। আব্বাস বলিলেন, আমার তো আর কোনও সম্পদ নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আপনি মক্কা হইতে বাহির হইবার সময় উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিছের (আব্বাসের স্ত্রী) উপস্থিতিতে যে সম্পদ মাটির নিচে রাখিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়া আসিয়াছেন, এই যাত্রায় যদি আমি নিহত হই তবে ফযলের জন্য এত...এত..., আবদুল্লাহর জন্য এত...এত..., কুছাম-এর জন্য এত....এত..., এবং উবায়দুল্লাহর জন্য এত...এত..., সেই সম্পদ কোথায়? তখন আব্বাস বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন! ইহা আমি ও উম্মুল ফাদ্ল ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর আব্বাস নিজের পক্ষ হইতে দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও মিত্রের পক্ষ হইতে এক শত উকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯৯; তারীখ, তাবারী ২খ., পৃ. ৪৬৫-৬৬)। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে ৪০ উকিয়ার কথা উল্লেখ আছে (ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭১)। উহা সম্ভবত শুধু তাঁহার নিজের মুক্তিপণ ছিল। আর সকলের পক্ষ হইতে সম্মিলিত মুক্তিপণ ছিল ১০০ উকিয়া।

যয়নব (রা)-র স্বামী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা আবুল আস ইবনুর রাবী' ইব্ন আবদিল উয্যাও বন্দী হইয়া আসেন। বানূ হারাম-এর খিরাশ ইবনুস সিম্মা (রা) তাহাকে বন্দী

করেন। আবুল আস ছিলেন মক্কাবাসীদের সম্পদ আমানত রক্ষক ও অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার মাতা হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর ভগ্নী। নবূওয়াত লাভের পূর্বেই খাদীজা (রা)-এর প্রস্তাবক্রমে তাঁহার সহিত যয়নব (রা)-র বিবাহ হয়। খাদীজা (রা) ও তাঁহার সকল কন্যা ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু আবুল আস মুশরিকই থাকিয়া যান।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসলাম প্রচার শুরু করিলে মুশরিকগণ তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলিবার এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করিবার জন্য তাঁহার কন্যাগণকে তালাক দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। উতবাকে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলার সহিত বিবাহ দেওয়ার কথা বলিলে সে রুকায়্যাকে তালাক দেয়। অতঃপর উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাঁহাকে বিবাহ করেন। অনুরূপভাবে তাহারা আবুল আসকেও কুরায়শদের সর্বাধিক সুন্দরী মহিলার সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রালাভন দেখাইয়া যয়নব (রা)-কে তালাক দিতে বলে। কিন্তু তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যয়নবকে তালাক দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর যয়নব (রা) তাঁহার নিকটই থাকিয়া যান।

বদর যুদ্ধে আবুল আস মুশরিকদের সহিত অংশগ্রহণ করিয়া বন্দী হন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর হেফাজতে থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসিগণ যখন বন্দীদের মুক্তিপণ প্রেরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নব (রা)-ও স্বামী আবুল আসের মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু সম্পদ প্রেরণ করেন যাহার মধ্যে তাঁহার বিবাহের সময় খাদীজা (রা) কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণের একটি হারও ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) উহা দেখিয়া খুবই আবেগপ্রবণ হইয়া পড়েন এবং বলেন, তোমরা যদি তাহার বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে এবং তাহার সম্পদ ফেরৎ দিতে ভাল মনে কর তবে তাহা করিতে পার। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহা অনুমোদন করিলাম। তারপর তাহারা আবুল আসকে ছাড়িয়া দিল এবং যয়নব (রা) প্রেরিত সম্পদও ফেরত দিল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) আবুল আসের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন অথবা তাহার মুক্তির জন্য শর্তারোপ করিয়াছিলেন যে, মক্কায় পৌঁছিয়া তিনি যয়নবকে মদীনায় পাঠাইয়া দিবেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স) ও তাহার মধ্যে গোপন ছিল। আবুল আস মক্কায় রওয়ানা হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ও অন্য একজন সাহাবীকে পাঠাইয়া বলিলেন, তোমরা ইয়াজাজ উপত্যকায় অবস্থান করিবে। যয়নব তোমাদের নিকট আসিবে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট চলিয়া আসিবে। ইহা ছিল বদর যুদ্ধের একমাস বা উহার কাছাকাছি সময়ের কথা।

আবুল আস মক্কায় পৌঁছিয়া যয়নব (রা)-কে তাঁহার পিতার নিকট চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যয়নব (রা) সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেবর কিনানা ইবনুর রাবী'র সহিত দিনের বেলা রওয়ানা হইলেন। কিন্তু কাফির কুরায়শগণ সংবাদ পাইয়া প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিল, এমনকি বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে আহত করিল। ফলে তাঁহার গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে আবূ সুফ্‌য়ানের পরামর্শে রাত্রিবেলা তাঁহারা রওয়ানা হন এবং মদীনায়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছেন। মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যয়নব (রা)-কে তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৯৩-৩০০, তারীখ, তাবারী ২খ., পৃ. ৪৬৭-৪৭২)।

যুদ্ধবন্দীদের কিছু লোককে রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন এবং বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেন। তন্মধ্যে একজন হইলেন আবূ আয্যা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ আল-জুমাহী। তিনি ছিলেন দরিদ্র ও অধিক সন্তানের জনক। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কতটুকু সম্পদ আছে তাহা আপনি জানেন। আমি দরিদ্র ও অনেক সন্তানের জনক। তাই আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহাকে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেন। তবে এই ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কাহাকেও সে সাহায্য করিবে না। অতঃপর আবূ আয্যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করে।

কিন্তু পরবর্তী কালে আবূ 'আযযা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ধোঁকা দিয়া এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া কাফিরদের পক্ষে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পুনরায় মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। সেইবারও তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তোমাকে এইভাবে ছাড়িব না যে, তুমি তোমার গণ্ডদ্বয় স্পর্শ করিবে আর বলিবে, আমি মুহাম্মাদকে দুইবার ধোঁকা দিয়াছি। এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত হইতে দুইবার দংশিত হয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১২; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩০১)।

ওয়াহ্ব ইব্ন উমায়র ইব্ন ওয়াহ্বকেও রাসূলুল্লাহ (স) মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেন। ওয়াহ্ব-এর পিতা 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। সাফওয়ান ইবন উমায়্যার সহিত মক্কায় সে শলাপরামর্শ করে। সাফওয়ান তাহার ঋণ পরিশোধ এবং পরিবার-পরিজনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উমায়র রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য রওয়ানা হয়। মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার গোপন তত্ত্ব তথা সাফওয়ানের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা ফাঁস করিয়া দিলে তিনি খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার পুত্র ওয়াহ্বকে বিনা মুক্তিপণেই ছাড়িয়া দেন। অতঃপর উমায়র মক্কা পৌঁছিয়া ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন (তারীখ, তাবারী, ২খ., পৃ. ৪৭২-৭৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, ৩১৩-১৪)।

মক্কায় পরিজনদের নিকট বদরের সংবাদ ও আবূ লাহাবের মৃত্যু

বদর যুদ্ধে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়ের বিপর্যয়কর সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে মক্কাবাসীরা খুব ভাঙ্গিয়া পড়ে। মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনামতে, এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে মহিলারা মাথার চুল কাটিয়া ফেলে; বহু ঘোড়া ও বাহনের পা কাটিয়া ফেলা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,

৩খ., পৃ. ৩০৮)। আল-কাসিম ইব্ন ছাবিত তাহার দালাইল গ্রন্থে সুলায়মান ইব্ন আবদিল আযীয ইব্ন ছাবিত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধ যেদিন সংঘটিত হয় সেই দিন মক্কার উচ্চভূমিতে নেপথ্য হইতে এই কবিতাগুলি শোনা গিয়াছিল ঃ

ازار الحـنيـفـيون بـدرا وقيعة + سينقض منها ركن كسرى وقيصرا

ابادت رجالا من لؤى وأبرزت + خـرائـد يـضـربـن الـترائب حسّرا

فياويح من أمسى عدو محمد + لـقـد جار عن قصد الهدى وتحيرا.

"একত্ববাদিগণ বদর যুদ্ধে এমন অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছেন যাহার ফলে অতি সত্ত্বর কিসরা ও কায়সার-এর প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। লুআই-এর বহু পুরুষকে তাহারা হত্যা করিয়াছে এবং কুমারী মহিলাকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিয়াছে, যাহারা মুখমণ্ডল হইতে ওড়না খোলা অবস্থায় বুকের হাঁড় পদদলিত করিয়াছে। হায় আফসোস! যে মুহাম্মাদের শত্রু হইয়াছে সে হিদায়াতের ইচ্ছা হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং পেরেশান হইয়াছে" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬৬; ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩০৮)।

মক্কায় সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বিপর্যয়ের সংবাদ পৌছান আল-হায়সুমান ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন ইয়াস আল-খুযাঈ (পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন)। তিনি মক্কায় পৌছিলে লোকজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, সেখানে নিহত হইয়াছে উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, আবুল হাকাম ইব্ন হিশাম (আবূ জাহল), উমায়্যা ইব্ন খালাফ, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, নুবায়হ ও মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল-বাখতারী ইব্ন হিশাম। তিনি যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নাম এক এক করিয়া গণনা করিতেছিলেন তখন হারাম শরীফে উপবিষ্ট সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা বলিল, আল্লাহ্র কসম! এই লোকটির বুদ্ধি যদি ঠিক থাকে তবে তাহাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিল, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা কি করিয়াছে? হায়সুমান বলিলেন, সে তো এইখানে হারাম শরীফে বসিয়া আছে। আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার পিতা ও ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়াছি (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ৬৬; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৮; তারীখ তাবারী ২খ., পৃ. ৪৬১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো ভাই আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদিল মুত্তালিবও এই সংবাদ মক্কায় পৌছান। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্তদাস আবূ রাফে' (রা) হইতে দীর্ঘ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের দাস ছিলাম। আমাদের আহলে বায়ত-এর মধ্যে পূর্বেই ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল। উম্মুল ফাদল ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমিও। আব্বাস তাঁহার কওমকে ভয় করিতেন এবং তাহাদের বিরোধিতা করা অপছন্দ করিতেন। তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি বহু সম্পদের মালিক ছিলেন যাহা তাহার কওমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায়

ছিল। আবূ লাহাব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। সে তাহার পরিবর্তে আল-আস ইব্ন হিশামকে পাঠাইয়াছিল। বদরের বিপর্যয়কর সংবাদ দ্বারা আল্লাহ্ তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। আর আমরা উহাতে মনে মনে উৎসাহ বোধ করিলাম।

আমি একজন দুর্বল লোক ছিলাম। আমি তীর বানানোর কাজ করিতাম। যমযমের নিকটস্থ একটি কুঠরিতে উহা ঠিক করিতাম। আল্লাহ্র কসম! আমি সেখানে বসিয়া আমার তীর ঠিক করিতেছিলাম। উম্মুল ফাদল আমার নিকট বসা ছিলেন। আমাদের নিকট যে সংবাদ পৌছিয়াছিল তাহাতে আমরা আনন্দিত ছিলাম। এমন সময় আবূ লাহাব খুব খারাপ মনোভাব লইয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে আমাদের দিকে আসিল। সে কুঠরির কিনারায় আসিয়া বসিল। তাহার পিঠ আমার পিঠের দিকে ছিল। সে উপবিষ্ট থাকিতেই লোকজন বলিয়া উঠিল, এই যে আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব আসিয়াছে। আবূ লাহাব বলিল, আমার নিকট আস। আমার জীবনের কসম! তোমার নিকটই সঠিক খবর আছে। অতঃপর আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ তাহার নিকট গিয়া বসিল। আর লোকজন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আবূ লাহাব বলিল, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! সেখানে কিভাবে কি ঘটিয়াছে তাহা আমাকে অবহিত কর। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! আর কিছুই নহে, কেবল আমরা তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া আমাদের স্কন্ধ তাহাদের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলাম। তাহারা আমাদিগকে যেভাবে ইচ্ছা হত্যা করিতেছিল, যেভাবে ইচ্ছা বন্দী করিতেছিল। আমরা বহু সাদা লোকের মুখোমুখি হইয়াছিলাম, যাহারা সাদা-কালো ঘোড়ায় আরোহী এবং আকাশ ও পৃথিবী জুড়িয়া ছিল। আল্লাহ্র কসম! তাহারা কিছুই অবশিষ্ট রাখিতেছিল না এবং তাহাদের সম্মুখে কিছু দাঁড়াইতেও পারিতেছিল না।

আবূ রাফে' (রা) বলেন, আমি তখন কুঠরির প্রান্ত ধরিয়া বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! উহারা ফেরেশতা। অতঃপর আবূ লাহাব আমার মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড জোরে এক চপেটাঘাত করিল। আমি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। সে আমাকে উঠাইয়া মাটির উপর আছাড় মারিল। অতঃপর আমার উপর উঠিয়া বসিয়া আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি ছিলাম দুর্বল ব্যক্তি। তখন উম্মুল ফাদল উঠিয়া কুঠরির একটি খুঁটি লইয়া তাহা দ্বারা আবূ লাহাবের মস্তকে সজোরে আঘাত করিয়া বলিলেন, তাহার মালিকের অনুপস্থিতিতে তুমি তাহাকে দুর্বল পাইয়াছ! ইহার ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। অতঃপর সে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। আল্লাহ্র কসম! সাতদিন পরই আল্লাহ্ তাহাকে বসন্তরোগে আক্রান্ত করিলেন। ইহাতেই তাহার মৃত্যু হইল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৮-৮৯; তারীখ তাবারী ২খ., পৃ. ৪৬১-৬২; ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩০৯-৩০৯)।

আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রদ্বয় তিনদিন পর্যন্ত তাহার লাশ ঐভাবে ফেলিয়া রাখে, এমনকি তাহার লাশ পচিয়া গলিয়া যায়। কারণ কুরায়শগণ মহামারীর ন্যায় উক্ত রোগ হইতেও

দূরে থাকিত। অতঃপর কুরায়শদের এক লোক তাহার পুত্রদ্বয়কে বলিল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা কি লজ্জাবোধ করিতেছ না যে, তোমাদের পিতার লাশ গৃহাভ্যন্তরে পচিয়া যাইতেছে, অথচ তোমরা তাহাকে দাফন করিতেছ না? তাহারা বলিল, আমরা উহাতে ভয় পাইতেছি। লোকটি বলিল, চল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। তাহারা উহাকে গোসল করাইল না, বরং দূর হইতে কিছু পানি ছিঁটাইয়া দিল। অতঃপর তাহাকে বহন করিয়া মক্কার উচ্চভূমিতে লইয়া গেল এবং একটি দেওয়ালের নিকট ফেলিল এবং উহার উপর পাথর ফেলিয়া তাহা দ্বারা ঢাকিয়া দিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৯; আর-রাহীকূল মাখতূম, পৃ. ২৫১; তারীখ তাবারী ২খ., পৃ. ৪৬২)।

কুরায়শগণ তাহাদের নিহত স্বজনদের জন্য প্রথমদিকে বিলাপ করিয়াছিল কিন্তু পরে তাহারা বলিল, তোমরা মাতম করিও না। কারণ তাহা মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা তোমাদিগকে লইয়া হাসি-তামাশা করিবে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৯)। আল -আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিবের পুত্র-পৌত্রসহ মোট তিনজন নিহত হইয়াছিলঃ পুত্র যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, 'আকীল ইবনুল আসওয়াদ ও পৌত্র আল-হারিছ ইব্ন যামআ। এক বর্ণনায় শেষোক্তজনকেও তাহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল-আসওয়াদ কিছুতেই অন্তরকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিল না, তাই শোকে বিলাপ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল। একরাত্রে সে বিলাপের স্বর শুনিতে পাইল। তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে স্বীয় দাসকে বলিল, দেখ তো! বিলাপ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কিনা। কুরায়শগণ তাহাদের নিহতদের জন্য বিলাপ করিতেছে কিনা? তাহা হইলে আমি আবূ হাকীমা অর্থাৎ পুত্র যামআর জন্য বিলাপ করিব। কারণ আমার ভিতরটা পুড়িয়া গিয়াছে। দাসটি অনুসন্ধান শেষে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক মহিলা তাহার হারানো উটের জন্য বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছে। উহা সেই বিলাপধ্বনি। আল-আসওয়াদ তখন একটি কবিতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিলাপ করিয়া মনকে কিছু হাল্কা করিয়া লওয়ার প্রয়াস পাইল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৮৯-৯০; ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩০৯-৩১০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬৭-৬৮)।

اتــبــكى أن يضل لها بعـير + ويمنعها من النوم السهود

فــلا تبكى على بكر ولـكن + على بدر تقاصرت الجدود

على بدر سراة بنى هصيص + ومخزوم ورهط ابى الوليد

وبـكى ان بكيت على عقيل + وبــكى حارثا اسد الاسود

وبــكيهم ولا تــسمى جميعا + وما لابى حكيمة من نديد

الا قــد ساد بعـدهم رجـال + ولــولا يوم بدر لم يسودوا.

"সে কি এইজন্য ক্রন্দন করিতেছে যে, তাহার উট হারাইয়া গিয়াছে এবং উহাই তাহাকে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছে? তুমি নবীন উটের জন্য ক্রন্দন করিও না, বরং বদরের জন্য ক্রন্দন কর, যেখানে সৌভাগ্য ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। বদরের জন্য ক্রন্দন কর, হুসায়স ও মাখযূম গোত্রের নেতৃবৃন্দ এবং আবুল ওয়ালীদের দলবলের জন্য। তুমি ক্রন্দন করিলে আকীলের জন্য কর, হারিছের জন্য ক্রন্দন কর যাহারা ছিল শ্রেষ্ঠতর সিংহ। উহাদের জন্য ক্রন্দন কর, সকলের ব্যাপারেই তুমি অতিষ্ঠ হইও না। আর আবূ হুকায়মার তো কোন সমতুল্যই নাই। জানিয়া রাখ! উহাদের পর বহু লোক নেতা হইয়াছে, বদর যুদ্ধ না হইলে তাহারা নেতা হইতে পারিত না।"

বদর যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া হাবশার বাদশাহ নাজাশী খুবই আনন্দিত হন এবং সেখানে অবস্থিত মুহাজির মুসলমানদিগকে ডাকিয়া তাহা অবহিত করেন। বায়হাকী আবদুর রাহমান সূত্রে সানআর অধিবাসী এক লোকের বরাতে বর্ণনা করেন যে, নাজাশী একদিন জাফর ইব্ন আবী তালিব ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি তখন একটি গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পরনে ছিল পুরাতন কাপড়, তিনি মাটিতে বসিয়াছিলেন। জাফর (রা) বলেন, তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের দয়া হইল। তিনি আমাদের চেহারা দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি সুসংবাদ দিব যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইবে। আমার এক লোক তোমাদের দেশ হইতে আগমন করিয়াছে। সে আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, আল্লাহ তাঁহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার অমুক অমুক শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছেন। তাহারা একটি উপত্যকায় মুকাবিলা করিয়াছিল, যাহার নাম বদর। উপত্যকাটি অধিক কাঁটাযুক্ত বৃক্ষে পূর্ণ। আমি যেন উহা দেখিতে পাইতেছি। আমি সেখানে আমার মনিবের উট চরাইতাম, যিনি ছিলেন বানূ দামরার লোক।

তখন জাফর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, আপনার কি হইয়াছে যে, মাটিতে বসিয়া আছেন? আপনার নিচে কোন গালিচা নাই, আবার আপনার পরনেও পুরাতন কাপড়? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা পাইয়াছি যে, আল্লাহ্র বান্দাদের উচিত তাহারা যখন কোনও নিয়ামত লাভ করিবে তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়াবনত হইবে। তাই আল্লাহ যখন তাঁহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন তখন আমি এইরূপ বিনয়াবনত হইয়াছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০৭-৩০৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৬৮)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের তালিকা

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে ৩০৭, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৪ ও ৩১৯ জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত ৩১৩ জন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-সহ ৩১৪ জনের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সঠিক ও প্রসিদ্ধ। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ বলাবলি

করিতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা তালূত-এর সঙ্গীদের সমান যাহারা তাঁহার সহিত নদী পার হইয়াছিলেন। মুমিন ব্যতীত আর কেহ নদী পার হইতে পারে নাই, তাহারা ছিল ৩১০-এর উপর বেজোড় সংখ্যক (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতুবুল মাগাযী, বাব ইদ্দাতি আসহাবে বাদর, হাদীছ নং ৩৯৫৮ ও ৩৯৫৯)।

আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় থাকিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি অনুমোদন কর যে, আমরা বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশে বাহির হইব— হয়তবা আল্লাহ আমাদিগকে গনীমতের মাল দিবেন? আমরা বলিলাম, হাঁ। অতঃপর আমরা বাহির হইলাম। একদিন বা দুই দিন পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে লোক গণনার নির্দেশ দিলেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, আমরা ৩১৩ জন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমাদের সংখ্যার সংবাদ দিলে তিনি খুশী হইলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ইহা তালূত বাহিনীর সংখ্যা (সুবুলুল হুদা, বায়হাকী, তাবারানী প্রভৃতির বরাতে, ৪খ., পৃ. ৭৩)। ইব্ন সা'দ উবায়দা সূত্রেও ৩১৩ জনের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২০)। ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটিতে উক্ত ৩১৩ জনের বিস্তারিত জীবনচরিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে ৮৩ জন মুহাজির সাহাবী এবং ২১৩ জন আনসার সাহাবী। আনসারদের মধ্যে আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৪৫)। বুখারীর এক বর্ণনায় ইহার একটু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আল-বারাআ (রা) হইতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৬০-এর কিছু অধিক। আর আনসারদের সংখ্যা ছিল ২৪০-এর কিছু অধিক (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩০৫৬)। তবে সঠিকভাবে গণনা করিলে দেখা যায়, মুহাজিরদের সংখ্যা ৮৬ (রাসূলসহ), আওস ৬১ এবং খাযরাজ ১৭০; মোট ৩১৭ জন। যাহারা বিশেষ কারণে যুদ্ধ যোগদান করিতে পারেন নাই তদসত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ও গণীমত লাভ করিয়াছিলেন তাহারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৯৪-৯৫)। আওসদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ ছিল তাহারা মদীনার উচ্চ ভূমিতে বসবাস করিত। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল, যাহারা এই মুহূর্তে প্রস্তুত আছে তাহারাই কেবল বাহির হইবে। আর ঘোষণাকারীও হঠাৎ ঘোষণা প্রদান করেন। তাই দূরে বসবাসকারী আওস গোত্রের লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইজন্য তাহাদের বেশী সংখ্যক লোক শরীক হইতে পারে নাই (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৯১)। বাংলা আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের একটি নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মুহাজিরগণ

১. আবু বাক্র আস-সিদ্দীক (রা), ২. আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), ৩. আনাস, মাওলা রাসূলুল্লাহ (স) হাবশী, ৪. আকিল ইবনুল বুকায়র, ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে আবুল বুকায়র

(রা), ৫. আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা), ৬. আবূ কাবশা ফারসী (রা), ৭. আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা ইব্ন রাবী'আ (রা), ৮. আবূ সিনান ইব্ন মিহসান আল-আসাদী (রা), ৯. আবূ সালামা ইব্ন 'আবদিল আসাদ (রা), ১০. আবূ সাবরা ইব্ন আবী রুহম (রা), ১১. আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা), ১২. আবূ মাখশী সুওয়ায়দ ইব্ন মাখশী আত-তাই (রা), ১৩. 'আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা), ১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশ আল-আসাদী (রা), ১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ আল-হুযালী (রা), ১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজউন আল-জুমাহী (রা), ১৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাখরামা ইব্ন 'আবদিল উযযা (রা), ১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর (রা), ১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সুরাকা আল-আদাবী (রা), ২০. 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির আল-আন্যী (রা), ২১. 'আমর ইব্ন সুরাকা আল-'আদাবী (রা), ২২. 'আমর ইবনুল হারিছ ইব্ন যুহায়র আল-ফিহরী (রা), ২৩. 'আমর ইব্ন আবী সারহ আল-ফিহরী (রা), ২৪. 'আমের ইব্ন ফুহায়রা মাওলা আবী বাক্র (রা), ২৫. 'আমের ইব্ন রাবী'আ আল-'আন্যী (রা), ২৬. 'আমের ইবনুল বুকায়র, এক বর্ণনা মতে আবুল বুকায়র (রা) ২৭. আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম আল-মাখযূমী (রা)।

২৮. 'ইয়াদ ইব্ন যুহায়র আল-ফিহরী (রা), ২৯. ইয়াস ইব্নুল বুকায়র, এক বর্ণনামতে আবুল বুকায়র (রা)।

৩০. 'উক্কাশা ইব্ন মিহসান আল-আসাদী (রা), ৩১. 'উকবা ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন রাবী'আ আল-আসাদী (রা), ৩২. 'উছমান ইব্ন মাজউন আল-জুমাহী (রা), ৩৩. 'উতবা ইব্ন গাযওয়ান ইব্ন জাবির (রা), ৩৪. 'উমার ইব্ন আওফ মাওলা সুহায়ল ইব্ন 'আমর, এক বর্ণনামতে 'আমর ইব্ন আওফ (রা), ৩৫. উমায়র ইব্ন আবী ওয়াক্কাস আয-যুহরী (রা), ৩৬. 'উবায়দা ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব (রা), ৩৭. 'উমার ইবনুল খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল (রা)।

৩৮. ওয়াকিদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল-ইয়ারবূঈ আত-তামীমী, ৩৯. ওয়াহ্ব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ (রা)।

৪০. কুদামা ইব্ন মাজউন আল-জুমাহী (রা)।

৪১. খাওয়ালিয়্যি ইব্ন আবী খাওয়ালিয়্যি (রা), ৪২. খুনায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স, ৪৩. খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত (রা), বানূ যুহরার মিত্র, ৪৪. খাব্বাব মাওলা 'উতবা ইব্ন গাযওয়ান (রা), ৪৫. খালিদ ইবনুল বুকায়র, এক বর্ণনামতে আবুল বুকায়র (রা),

৪৬. ছাক্ফ ইব্ন 'আমর আস-সুলামী (রা)।

৪৭. তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ আত-তায়মী (রা), ৪৮. তুফায়ল ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব (রা)।

৪৯. বিলাল ইব্ন রাবাহ আল-মু'আযযিন (রা)।

৫০. মালিক ইব্‌ন 'আমর আস-সুলামী, মতান্তরে আল-'আদাবী (রা), ৫১. মালিক ইব্‌ন আবী খাওয়ালিয়্যি আল-জুদী (রা), ৫২. মা'মার ইবনুল হারিছ ইব্‌ন মা'মার (রা), ৫৩. মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ আল-গানাবী (রা), ৫৪. মিকদাদ ইব্‌ন আমর বা ইবনুল আসওয়াদ আল-বাহরাঈ (রা), ৫৫. মিদলাজ ইব্‌ন আমর আল-আসলামী (রা), এক বর্ণনামতে মুদলিজ, ৫৬. মাসউদ ইব্‌ন রাবী'আ আল-কারী (রা), ৫৭. মিসতাহ্ ইব্‌ন উছাছা ইব্‌ন 'আব্বাদ (রা), ৫৮. মিহজা' ইব্‌ন সালিহ, মাওলা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), ৫৯. মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা), ৬০. মু'আত্তিব ইব্‌ন আওফ আস-সালূলী (রা), ৬১. মুহরিয ইব্‌ন নাদলা ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল-আসাদী (রা), ৬২. মুস'আব ইব্‌ন উমায়র আল-খায়র (রা)।

৬৩. যায়দ ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন শুরাহবীল (রা), মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (স), ৬৪. যায়দ ইবনুল খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়ল, উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের ভ্রাতা, ৬৫. যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (রা), ৬৬. যুশ-শিমালায়ন, উমায়র ইব্‌ন আব্‌দ আমর (রা)।

৬৭. য়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ ইব্‌ন রিআব আল-আসাদী (রা)।

৬৮. রাবী'আ ইব্‌ন আকছাম ইব্‌ন সাখবারা আল-আসাদী (রা)।

৬৯. শাম্মাস ইব্‌ন 'উছমান ইবনুশ শারীদ আল-মাখযূমী (রা), ৭০. শুজা' 'ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন রাবী'আ আল-আসাদী (রা)।

৭১. সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা), ৭২. আস-সাইব ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন মাজ'উন (রা), ৭৩. সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস আয-যুহরী (রা), ৭৪. সা'দ ইব্‌ন খাওলা, মাওলা বনূ 'আমের ইব্‌ন লুআই (রা), ৭৫. সা'দ মাওলা হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা), ৭৬. সাফওয়ান ইব্‌ন বায়দা ইব্‌ন রাবী'আ আল-ফিহরী (রা), ৭৭. সালিম, মাওলা আবূ হুযায়ফা (রা), ৭৮. সিনান ইব্‌ন আবী সিনান ইব্‌ন মিহসান আল-আসাদী (রা), ৭৯. সুওয়ায়বিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হারমালা (রা), ৮০. সুহায়ব ইব্‌ন সিনান আর-রূমী (রা), ৮১. সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা ইব্‌ন রাবীআ আল ফিহরী (রা)।

৮২. হামযা ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা), ৮৩. হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ আল-লাখমী (রা), ৮৪. হাতিব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন উবায়দ আল-আশজাঈ (রা), ৮৫. হুসায়ন ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব (রা)। ইহা ছাড়াও কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরবাদ ইব্‌ন হুমায়য়া বা হুমায়্যির এবং সালিহ শুকরান, মাওলা রাসূলিল্লাহ (স)-এর নামও পাওয়া যায় (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ.)।

আনসারগণ

১. আইয ইব্‌ন মাঈস ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ২. 'আওফ ইবনুল হারিছ আন-নাজ্জারী, তাঁহাকে 'আওফ ইব্‌ন 'আফ্‌রা (রা)-ও বলা হয়, ৩. আওস ইব্‌ন খাওয়ালিয়্যি ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-খাযরাজী (রা), ৪. আওস ইব্‌ন ছাবিত ইবনুল মুনযির আন-নাজ্জারী

(রা), ৫. আওস ইবনুস সামিত আল-খাযরাজী (রা), ৬. 'আনতারা (রা), মাওলা বানূ সুলায়ম, ৭. 'আদিয়্যি ইব্ন আবিয-যাগবা আল-জুহানী (রা), ৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স ইব্ন সাখর আস-সুলামী (রা), ৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর আন-নাজ্জারী (রা), ১০. আবদুল্লাহ 'উমায়র ইব্ন আদী (রা), ১১. আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল আল-খাযরাজী (রা), ১২. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইবনুন নু'মান আস-সালামী (রা), ১৩. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হারাম আস-সালামী (রা), ১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্স (রা), ১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উরফুতা ইব্ন আদিয়্যি আল-খাযরাজী (রা), ১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা (রা), ১৭. 'আবদুল্লাহ, ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ আল-খাযরাজী, (রা), ১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা আল-খাযরাজী (রা), ১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক ইব্ন মালিক আল-কুদাঈ (রা), ২০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র ইবনুন নু'মান আল-আওসী (রা), ২১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ইব্ন রাফে' (রা), ২২. 'আবদুল্লাহ ইব্নুর রাবী' ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ২৩. 'আবদুল্লাহ, ২৩. 'আবদুল্লাহ ইবনুল জিদ্দ ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ২৪. 'আবদুল্লাহ ইবনুন নু'মান ইব্ন বালদামা বা বালযামা আল-খাযরাজী ২৫. 'আবদুল্লাহ ইবনুল হুমায়্যির আল-আশজাঈ (রা), ২৬. 'আবদা ইবনুল হাসহাস আল-বাখাবী (রা), তাঁহাকে উবাদাও বলা হইয়াছে, ২৭. 'আব্দ রাব্ব ইব্ন হাক্ক, এক বর্ণনামতে আব্দ রাব্বিহ ইব্ন হাক্ক (রা), ২৮. আব্স ইব্ন 'আমের ইবন আদিয়্যি আস-সুলামী (রা), ২৯. 'আব্বাদ ইব্ন কায়স ইব্ন আমের আল-খাযরাজী (রা), ৩০. আব্বাস ইব্ন বিশর ইব্ন ওয়াক্শ আল-আওসী (রা), ৩১. আবুল 'আওয়ার আল-হারিছ ইব্ন জালিম আল-খাযরাজী (রা), ৩২. আবুল ইয়াসার কা'ব ইব্ন 'আমর (রা), ৩৩. আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (রা), ৩৪. আবুল হামরা মাওলা আল-হারিছ ইব্ন রিফা'আ (রা), ৩৫. আবূ আয়্যূব খালিদ ইব্ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৩৬. আবূ 'আকীল আল-বালাবী (রা), ৩৭. আবূ 'আব্স ইব্ন জাব্র (রা), ৩৮. আবূ 'উবাদা (রা), ৩৯. আবূ উসায়দ আস-সা'তদী (রা), ৪০. আবূ খুযায়মা ইব্ন আওস (রা), ৪১. আবূ দাঊদ আমর, মতান্তরে 'উমায়র ইব্ন 'আমের (রা), ৪২. আবূ দায়্যাহ ইবনুন নু'মান (রা),, প্রস্তরখণ্ডে আহত হওয়ার কারণে পথিমধ্য হইতে ফেরত আসেন। ৪৩. আবূ দুজানা, সিমাক ইব্ন খারাশা (রা), ৪৪. আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা), ৪৫. আবূ মুলায়ল ইবনুল আয'আর আল-আওসী (রা), ৪৬. আবূ লুবাবা ইব্ন 'আবদিল মুনযির (রা), ৪৭. আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহল (রা), ৪৮. আবূ শায়খ উবাই ইব্ন ছাবিত আল–খাযরাজী (রা), ৪৯. আবূ সালীত আল-খাযরাজী (রা), ৫০. আবূ হান্না ইব্ন মালিক ইব্ন আমর (রা), ৫১. 'আমর ইব্ন মু'আয ইবনুন নু'মান আল-আওসী (রা), ৫২. আমর ইব্ন কায়স ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ৫৩. 'আমর ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন ওয়াহ্ব (রা), ৫৪. 'আমর ইব্ন ইয়াস ইব্ন তাযীদ আল-ইয়ামানী (রা), ৫৫. 'আমর ইব্ন তাল্ক ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ৫৬. 'আমের ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৫৭. 'আমের ইব্ন মুখাল্লাদ ইবনুল হারিছ আল-খাযরাজী (রা), ৫৮. 'আমের ইব্ন সালামা ইব্ন 'আমের আল-বালাবী (রা), ৫৯. আস'আদ ইব্ন ইয়াযীদ

ইবনুল ফাকিহ আল-খাযরাজী (রা), ৬০. ‘আমের ইব্ন ‘আদিয়্যি ইব্নুল জাদ্দ আল-বালাবী (রা), ৬১. ‘আসিম ইব্ন কায়স ইব্ন ছাবিত আল-খাযরাজী (রা), ৬২. ‘আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবিল আফলাহ আল-আওসী (রা), ৬৩. ‘আসিম ইবনুল ‘উকায়র আল-মুযানী (রা)। ৬৪. ‘ইতবান ইব্ন মালিক ইব্ন ‘আমর আল–খাযরাজী (রা), ৬৫. ‘ইসমা ইবনুল হুসায়ন ইব্ন ওয়াব্‌রা (রা)।

৬৬. ‘উওয়ায়ম ইব্ন সাইদা আল-আনসারী (রা), ৬৭. ‘উকবা ইব্ন আমের আল-জুহানী (রা), ৬৮. ‘উকবা ইব্ন উছমান ইব্ন খালাদা আল-খাযরাজী (রা), ৬৯. উতবা ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন সাখ্‌র আল-খাযরাজী (রা), ৭০. ‘উতবা ইব্ন রাবী‘আ ইব্ন খালিদ আল-বাহ্‌রানী (রা), ৭১. উনায়স ইব্ন কাতাদা ইব্ন রাবী‘আ আল-আওসী (রা), ৭২. উবাই ইব্ন কা‘ব ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ৭৩. ‘উবায়দ ইব্ন আওস ইব্ন মালিক আল-আওসী (রা), ৭৪. ‘উবায়দ ইব্ন আবী ‘উবায়দ আল-আওসী (রা), ৭৫. ‘উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন ‘আমের আল-খাযরাজী (রা), ৭৬. ‘উবায়দ ইবনুত তায়্যিহান (রা), আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান-এর ভ্রাতা, ৭৭. ‘উবাদা ইব্ন কায়স ইব্ন কা‘ব (রা), ৭৮. ‘উবাদা ইবনুস সামিত ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ৭৯. ‘উমারা ইব্ন হাযম ইব্ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৮০. ‘উমায়র ইব্ন মা‘বাদ ইবনুল আয‘আর আল-আওসী (রা), কেহ কেহ তাঁহাকে ‘আমর ইব্ন মা‘বাদ বলিয়াছেন ৮১. ‘উমায়র ইব্ন হারাম ইবনুল জামূহ আল-খাযরাজী (রা), ৮২. ‘উমায়র ইব্নুল হারিছ ইব্ন লাবদা আল-খাযরাজী, মতান্তরে ‘আমর ইবনুল হারিছ, ৮৩. ‘উমায়র ইব্নুল হুমাম ইবনুল জামূহ আল-খাযরাজী (রা), ৮৪. ‘উসায়মা মতান্তরে ‘ইসমা আল-আসাদী (রা), ৮৫. ‘উসায়মা মতান্তের ‘ইসমা আল-আশজাঈ (রা)।

৮৬. ওয়াদী‘আ ইব্ন ‘আমর ইব্ন জারাদ আল-জুহানী (রা), ৮৭. ওয়াযাফা ইব্ন ইয়াস মতান্তরে ওয়াদকা ইব্ন ইয়াস ইব্ন ‘আমর আল-খাযরাজী। ৮৮. কাতাদা ইবনুন নু‘মান ইব্ন যায়দ আল-আওসী (রা), ৮৯. কা‘ব ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ৯০. কায়স ইব্ন আবী সা‘সা‘আ ‘আমর ইব্ন যায়দ আল-মাযিনী (রা), ৯১. কায়স ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন ছা‘লাবা আল-খাযরাজী (রা), ৯২. কায়স ইব্ন মিহ্‌সান ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী (রা), ৯৩. কায়স ইবনুস সাকান ইব্ন ‘আওফ আন-নাজ্জারী (রা), ৯৪. কায়স ইবনুর রাবী ‘এক বর্ণনামতে।

৯৫. খাওওয়াত ইব্ন জুবায়র ইবনুন নু‘মান (রা), প্রস্তরাঘাতে আহত হওয়ায় তিনি আস-সাফরা নামক স্থান হইতে ফেরত আসেন। ৯৬. খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন আবী যুহায়র আল-খাযরাজী (রা), ৯৭. খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন ছা‘লাবা আল-খাযরাজী (রা), ৯৮. খাল্লাদ ইব্ন রাফে‘ ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ৯৯. খালিদ ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ১০০. খালীফা ইব্ন ‘আদিয়্যি ইব্ন মালিক আল- খাযরাজী

(রা), ১০১. খিরাশ ইবনুস সিম্মা ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ১০২. খুবায়ব ইব্ন ইয়াসাফ ইব্ন 'ইতাবা আল-খাযরাজী (রা), ১০৩. খুলায়দ ইব্ন কায়স ইবনুন নু'মান আল-খাযরাজী (রা)।

১০৪. ছাবিত ইব্ন আকরাম ইব্ন ছা'লাবা আল-বালাবী (রা), ১০৫. ছাবিত ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১০৬. ছাবিত ইব্ন 'খানসা ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী, ১০৭. ছাবিত ইব্ন 'খালিদ ইবনুন নু'মান আল-খাযরাজী (রা), ১০৮. ছাবিত ইব্ন ছা'লাবা ইবনুল জিয' ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১০৯. ছাবিত ইব্ন হায্যাল ইব্ন 'উমার আল-খাযরাজী (রা), ১১০. ছা'লাবা ইব্ন 'আনামা ইব্ন 'আদী আল-খাযরাজী (রা), ১১১. ছা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উবায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ১১২. ছা'লাবা ইব্ন হাতিব ইব্ন 'আমর আল-আওসী (রা)।

১১৩. জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমায়্যা আল-খাযরাজী (রা), ১১৪. জাব্র, মতান্তরে জাবির ইব্ন আতীক ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১১৫. জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম আস-সুলামী (রা), ১১৬. জাবির ইব্ন খালিদ ইব্ন মাস'উদ আল-খাযরাজী (রা), ১১৭. জুবায়র ইব্ন ইয়াস ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী (রা)।

১১৮. তামীম (রা), মাওলা বানী গানম ইবনিস সালাম ১১৯. তামীম, মাওলা খিরাশ ইবনুস সিম্মা (রা), ১২০. তামীম ইব্ন ইয়া'আর ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১২১. তুফায়ল ইব্ন মালিক ইব্ন খানসা আল-খাযরাজী (রা), ১২২. তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র মতান্তরে 'আমর (রা), শুধুমাত্র আল-ওয়াকিদী তাহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৩. দামরা ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব আল-জুহানী (রা), ১২৪. আদ-দাহ্হাক ইব্ন 'আবদ 'আমর আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা), ১২৫. আদ-দাহ্হাক ইব্ন হারিছা ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা)।

১২৬. নাওফাল ইব্ন 'আবদিল্লাহ মতান্তরে 'উবায়দিল্লাহ আল-খাযরাজী (রা), ১২৭. নাসর ইব্নুল হারিছ ইব্ন 'আবদ রাযাহ (রা), ১২৮. নু'মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), ১২৯. নু'মান ইব্ন 'আব্দ 'আমর আন-নাজ্জারী (রা), ১৩০. নু'মান ইব্ন আবী খাযমা, মতান্তরে ইব্ন খুযায়মা আল-আওসী (রা), ১৩১. নু'মান ইব্ন আমর ইব্ন রিফা'আ আন-নাজ্জারী (রা), ১৩২. নু'মান ইব্ন 'আমর ইবনিল হারিছ (রা), ১৩৩. নু'মান ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ১৩৪. নু'মান ইব্ন সিনান (রা), এক বর্ণনামতে নু'মান ইব্ন ইয়াসার মাওলা বনূ 'উবায়দ।

১৩৫. ফারওয়া ইব্ন 'আমর ইব্ন ওয়াদাফা, এক বর্ণনামতে ওয়াযাফা আল-খাযরাজী (রা), ১৩৬. আল-ফাকিহ ইব্ন বিশর ইবনুল ফাকিহ আল-খাযরাজী (রা), (ইব্ন কাছীরের বর্ণনামতে)।

১৩৭. বাশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ১৩৮. বাসবাস ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন ছা'লাবা আল-জুহানী (রা), ১৩৯. বাহ্‌হাছ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন খাযমা আল-বালাবী (রা), ১৪০. বুজায়র ইব্‌ন আবী বুজায়র আল-আবসী, মতান্তরে আল-বালাবী (রা)।

১৪১. মা'কাল ইবনুল মুনযির আস-সালামী (রা), ১৪২. মা'বাদ ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১৪৩. মা'বাদ ইব্‌ন উবাদা মতান্তরে ইব্‌ন আব্বাদ আল-খাযরাজী (রা), ১৪৪. মা'ন ইব্‌ন 'আদিয়্যি ইবনুল জিদ্‌দ (রা), ১৪৫. মালিক ইব্‌ন কুদামা আল-আওসী (রা), ১৪৬. মালিক ইব্‌ন নুমায়লা, এক বর্ণনামতে মালিক ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন নুমায়লা আল-মুযানী (রা), ১৪৭. মালিক ইব্‌নুদ দুখশুম আল-খাযরাজী ১৪৮. মালিক ইব্‌ন মাসঊদ আল-খাযরাজী ১৪৯. মাসঊদ ইব্‌ন আওস আন-নাজ্জারী, ১৫০. মাস'ঊদ ইব্‌ন আব্‌দ সা'দ, এক বর্ণনামতে মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আমির (রা), ১৫১. মাস'ঊদ ইব্‌ন খালদা আল-খাযরাজী (রা), ১৫২. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১৫৩. মুআত্তিব ইব্‌ন কুশায়র আল-আওসী (রা), ১৫৪. মু'আত্তিব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ইয়াস আল-বালাবী (রা), ১৫৫. মু'আওবিয ইব্‌ন 'আমর ইবনুল জামূহ আস-সুলামী (রা), ১৫৬. মু'আওবিয ইবনুল হারিছ বা ইব্‌ন আফরা আল-জুমাহী (রা), ১৫৭. মু'আয ইব্‌ন জাবাল আল-খাযরাজী (রা), ১৫৮. মু'আয ইব্‌ন মা'ইস আল-খাযরাজী (রা), ১৫৯. মু'আয ইবনুল হারিছ বা মু'আয ইব্‌ন আফরা আন-নাজ্জারী (রা), ১৬০. মুআয ইব্‌ন 'আমর ইবনুল জামূহ আল-খাযরাজী (রা), ১৬১. আল-মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ আল-বালাবী (রা), ১৬২. আল-মুনযির ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খুনায়স আস-সাইদী (রা), ১৬৩. আল-মুনযির ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আরফাজা আল-খাযরাজী (রা), ১৬৪. আল-মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উকবা (রা), ১৬৫. মুলায়ল ইব্‌ন ওয়াবরা আল-খাযরাজী (রা), ১৬৬. মুহরিয ইব্‌ন 'আমের আন-নাজ্জারী (রা), ১৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন সালাম (রা)।

১৬৮. যাকওয়ান ইব্‌ন 'আব্‌দ কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১৬৯. যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ছা'লাবা (রা), ১৭০. যায়দ ইব্‌ন ওয়াদী'আ ইব্‌ন 'আমর (রা), ১৭১. যিয়াদ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আমর আল-জুহানী (রা), ১৭২. যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আয-যুরাকী (রা)।

১৭৩. য়াযীদ ইব্‌ন 'আমের ইব্‌ন হাদীদা আস-সুলামী (রা),, ১৭৪. য়াযীদ ইবনুল মুনযির ইব্‌ন সারহ আস-সুলামী (রা),, ১৭৫. য়াযীদ ইবনুল মুযায়্যান, মতান্তরে য়াযীদ ইবনুল মুনযির আল-খাযরাজী (রা), ১৭৬. য়াযীদ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা)।

১৭৭. আর-রাবী' ইব্‌ন ইয়াস আল-খাযরাজী (রা), ১৭৮. রাফে' ইব্‌ন উনজুদা আল-আওসী (রা), ১৭৯. রাফি' ইব্‌ন মালিক ইবনুল 'আজলান আল-খাযরাজী (রা), ১৮০. রাফে' ইবনুল মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান আল-খাযরাজী (রা), ১৮১. রাফে' ইবনুল হারিছ ইব্‌ন সাওয়াদ আল খাযরাজী (রা), ১৮২. রাফে' ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কুরয আল-আওসী (রা), ১৮৩.

রিফা'আ ইব্ন আবদিল মুনযির আল-আওসী (রা), ১৮৪. রিফা'আ ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১৮৫. রিফা'আ ইব্ন রাফে' ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ১৮৬. রিব'ঈ ইব্ন রাফে' ইবনুল হারিছ (রা), ১৮৭. রুখায়লা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খালিদ আল-খাযরাজী (রা)।

১৮৮. সা'ঈদ ইব্ন সুহায়ল (রা), ১৮৯. সাওয়াদ ইব্ন গাযিয়্যা আল-বালাবী (রা), ১৯০. সাওয়াদ ইব্ন রাযন, মতান্তরে রাযীন আল-খাযরাজী (রা), ১৯১. সা'দ ইব্ন উবায়দ (মতান্তরে 'উমায়র) ইবনুন নু'মান আল-আওসী (রা), ১৯২. সা'দ ইব্ন খায়ছামা ইবনুল হারিছ আল-আওসী (রা), ১৯৩. সা'দ ইব্ন মু'আয ইবনুন নু'মান আওসী (রা), আওস গোত্রের নেতা, ১৯৪. সা'দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক আল-আওসী, ১৯৫. সা'দ ইবনুর রাবী' 'ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী ১৯৬. সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হুরায়স আল-আওসী ১৯৭. সালামা ইব্ন ছাবিত ইব্ন ওয়াক্‌শ আল-আওসী (রা), ১৯৮. সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক্‌শ আল-আওসী (রা), ১৯৯. সালিম ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ছাবিত আল-আওসী (রা), ২০০. সালিহ ইব্ন কায়স (রা), ২০১. সালীত ইব্ন 'আমর, মতান্তরে ইব্ন কায়স ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ২০২. সাহল ইব্ন আতীক আন-নাজ্জারী (রা), ২০৩. সাহল ইব্ন হুনায়ফ ইব্ন ওয়াহিব আল-আওসী (রা), ২০৪. সিমাক ইব্ন সা'দ ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ২০৫. সুফ্য়ান ইব্ন নাসর, মতান্তরে ইব্ন বিশ্‌র ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ২০৬. সুবায়' ইব্ন কায়স ইব্ন 'আইয আল-খাযরাজী (রা), ২০৭. সুরাকা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আতিয়্যা আল-খাযরাজী (রা), ২০৮. সুরাকা ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদিল উয্‌যা আল-খাযরাজী, ২০৯. সুলায়ত ইব্ন কায়স (রা), ২১০. সুলায়ম ইব্ন 'আমর আস-সুলামী (রা), ২১১. সুলায়ম ইব্ন কায়স ইব্ন ফাহ্‌দ আল-খাযরাজী (রা), ২১২. সুলায়ম ইব্ন মিলহান আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা), ২১৩. সুলায়ম ইবনুল হারিছ ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী, ২১৪. সুহায়ল ইব্ন রাফে' আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা)।

২১৫. হাবীব ইব্‌নুল আসওয়াদ (রা), মাওলা বানী হারাম, ২১৬. হামযা ইবনুল হুমায়্যির আল-আশজাঈ (রা), ২১৭. হারাম ইব্ন মিলহান আল-খাযরাজী (রা), ২১৮. হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন মু'আয আল-আওসী, ২১৯. হারিছ ইব্ন আনাস ইব্ন রাফে' আল-খাযরাজী (রা), ২২০. হারিছ ইব্ন 'আরফাজা আল-আওসী (রা), ২২১. হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী (রা), ২২২. হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন হায়শা (রা), (শুধু ইব্ন উমারা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন), ২২৩. হারিছ ইব্ন কাযনা, মতান্তরে খাযরামা ইব্ন 'আদী আল-খাযরাজী (রা), ২২৪. হারিছ ইবনুস সিম্মা আল-খাযরাজী (রা), ২২৫. হারিছ ইব্ন হাতিব ইব্ন 'আমর আল-আওসী (রা),, ২২৬. আল-হারিছ ইবনুন নু'মান ইব্ন উমায়্যা (রা), ২২৭. হারিছা ইব্‌নুন নু'মান ইব্ন রাফে' (রা), ২২৮. হারিছা ইব্ন সুরাকা আন-নাজ্জারী (রা), ২২৯. হিলাল ইবনুল

মু'আল্লা (রা), ২৩০. হুবাব ইবনুল মুনযির আল-খাযরাজী (রা), ২৩১. হুরায়ছ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা (রা), (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩২১-৪৫; আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, পৃ. ১২১-১৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১৫-২৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৯১-১২৪)।

উপরিউক্ত তালিকায় সর্বমোট ৩১৮ জনের নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু পথিমধ্য হইতে যে পাঁচজন সাহাবী ফেরত আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৩ (তিন শত তের) জন।

এতদ্ব্যতীত আরও ৮ অথবা ৯ জন সাহাবী যাহারা সংগত কারণে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকেও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সমমর্যাদা প্রদান করা হয়। তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধলব্ধ গণীমতের অংশও প্রদান করেন। তাঁহারা হইলেন ঃ (১) উছমান ইব্ন আফফান (রা), তাঁহার অন্তিম শয্যায় শায়িত স্ত্রী রুকায়্যা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া যান।

(২) সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল, তিনি ঐ সময় শাম-এ ছিলেন।

(৩) তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ (রা), তিনিও ঐ সময় শাম-এ ছিলেন।

(৪) আবূ লুবাবা বাশীর ইব্ন আবদিল মুনযির (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গেই রওয়ানা হইয়াছিলেন; কিন্তু আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ফেরত পাঠান।

(৫) আল-হারিছ ইব্ন হাতিব ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন উমায়্যা, তাঁহাকেও রাসূলুল্লাহ (স) পথিমধ্য হইতে ফেরত পাঠান।

(৬) আল-হারিছ ইব্নুস সিম্মা (রা), তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর-রাওহা হইতে তিনি ফেরত আসেন।

(৭) খাওওয়াত ইব্ন জুবায়র (রা)।

(৮) আবুস সায়্যাহ ইব্ন ছাবিত (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পায়ের নলায় পাথরের আঘাত লাগায় তিনি ফিরিয়া আসেন। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে অতিরিক্ত আরও একজন হইলেন—

(৯) সা'দ আবূ মালিক (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাহির হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের পর ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনামতে আর-রাওহায় তিনি ইনতিকাল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২৭)।

বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীগণের কবর। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

বদর যুদ্ধে শহীদবৃন্দ

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ১৪ জন সাহাবী শহীদ হন। তন্মধ্যে ৬ (ছয়) জন মুহাজির এবং ৮ (আট) জন আনসার। তাঁহাদের মধ্যে আওস গোত্রের ২ (দুই) জন এবং খাযরাজ গোত্রের ৬ (ছয়) জন। তাঁহাদের নাম ঃ (১) উবায়দ ইব্‌নুল হারিছ ইব্‌নুল মুত্তালিব। মল্লযুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'আস-সাফরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি ইনতিকাল করেন; (২) উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস, যিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ভ্রাতা। আল-'আস ইব্‌ন সাঈদ-এর হাতে তিনি শহীদ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৬ (ষোল) বৎসর, তাহাদের মিত্র; (৩) যুশ-শিমালায়ন ইব্‌ন 'আব্‌দ আমর আল-খুযাঈ; (৪) সাফওয়ান ইব্‌ন বায়দা; (৫) বানূ 'আদী-এর মিত্র 'আকিল ইব্‌নুল বুকায়র আল-লায়ছী; (৬) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুক্ত দাস মিহ্‌জা'।

আনসার শহীদদের ৮ (আট) জন হইলেন ঃ (১) হারিছা ইব্‌ন সুরাকা, হিব্বান ইবনুল আরিকার নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হইয়া তিনি শহীদ হন; (২) মু'আওবিয ইব্‌ন 'আফরা; (৩) 'আওফ ইব্‌ন 'আফরা; আফরা এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতার নাম, তাঁহাদের পিতার নাম আল-হারিছ ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ; (৪) ইয়াযীদ ইবনুল হারিছ, ইব্‌ন ফুসহুমও বলা হয়; (৫) উমায়র ইবনুল হুমাম আস-সালামী; (৬) রাফে' ইবনুল মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান; (৭) সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা; (৮) মুবাশ্‌শির ইব্‌ন 'আবদিল মুনযির (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৪৫-৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২৭; আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৭-১৮; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৩০-৩১)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। দুইটি ঘটনার দ্বারা জানা যায় যে, তাঁহাদের অগ্র-পশ্চাতের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করিয়াছেন এবং জান্নাতুল ফিরদাওস তাঁহাদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে।

(১) আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন হারিছা ইব্‌ন সুরাকা শাহাদাত লাভ করেন। তাঁহার মাতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও হারিছার অবস্থান সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন। সে যদি জান্নাতী হয় তবে আমি সবর করিব এবং ছওয়াবের আশা করিব। আর যদি অন্য কিছু হয় তবে দেখিবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ধিক তোমাকে! তুমি কি বলিতেছ? সে কি একটি জান্নাতে থাকিবে? সে বহু জান্নাতে থাকিবে এবং জান্নাতুল ফিরদাওসে (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাদলি মান শাহিদা বাদরান, হাদীছ নং ৩৯৮২)। এক রিওয়ায়াত অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র সর্বোচ্চ জান্নাত আল-ফিরদাওস লাভ করিয়াছে (ইব্‌ন কাছীর,
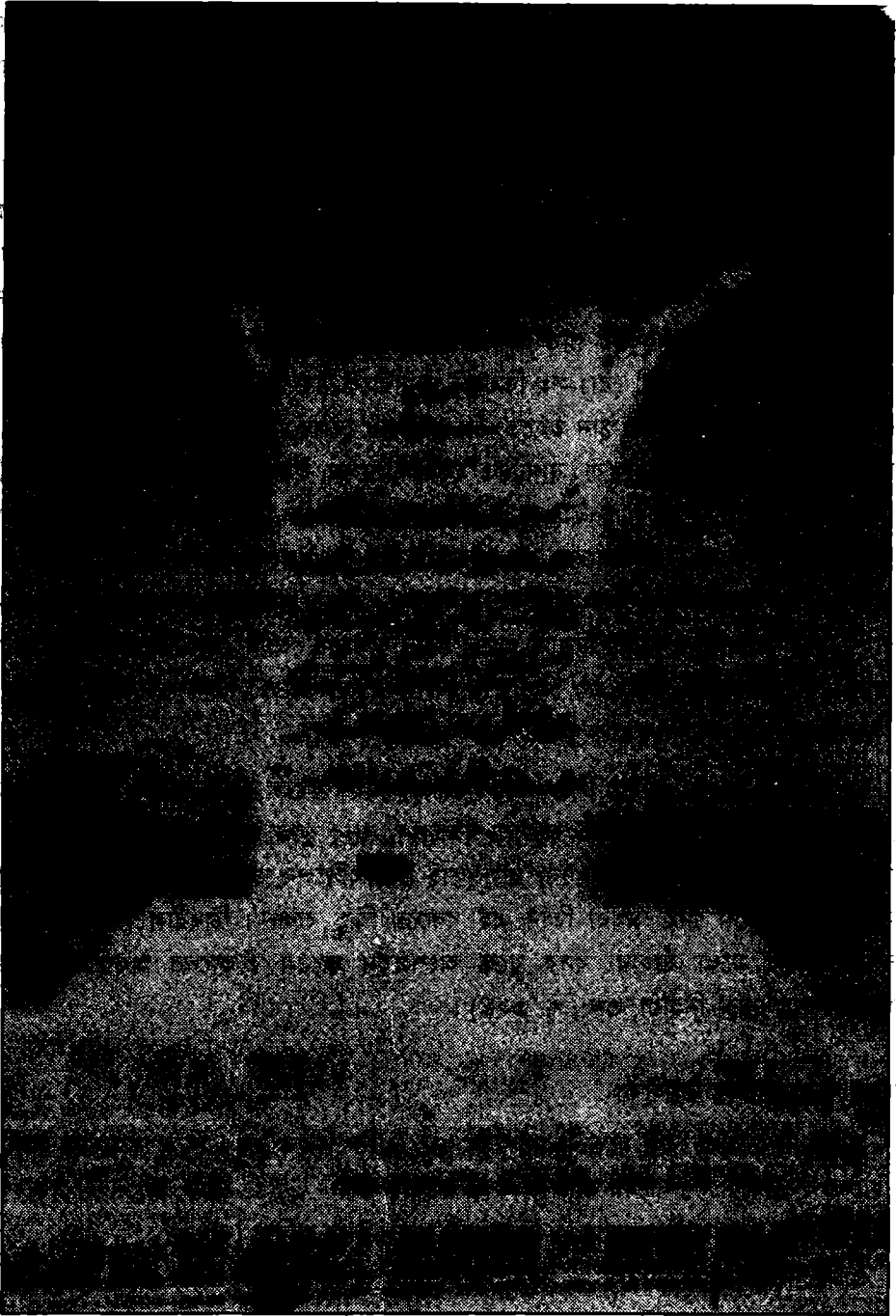
বদরের শহীদগণের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩২৯)। উল্লেখ্য যে, হারিছা (রা) হাউয হইতে পানি পান করার সময় একটি তীর আসিয়া তাঁহার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। তাঁহার যদি এত মর্যাদা হয় তবে যাঁহারা সম্মুখ সমরে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের কত মর্যাদা।

(২) মক্কা বিজয়ের বৎসর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা) মদীনার মুসলমানদের কিছু সংবাদ ও সিদ্ধান্ত একটি কাগজে লিখিয়া গোপনে বাহকের মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এই সংবাদের ফলে মুসলমানদের কোনও ক্ষতি হইবে না। তবে মক্কায় অবস্থিত তাঁহার পরিবার-পরিজন কাফিরদের নিকট হইতে কিছুটা সহানুভূতি লাভ করিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ অবহিত হইয়া আলী (রা)-সহ তিনজন সাহাবীকে উক্ত পত্র উদ্ধারকল্পে প্রেরণ করেন। 'তাঁহারা রাওদা খাখ' নামক স্থান হইতে এক মহিলার চুলের বেণীর মধ্য হইতে উহা উদ্ধার করিয়া ফেরত আসিলে উমার (রা) রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। কারণ সে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের খেয়ানত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নহে? আল্লাহ হয়তবা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর দিকে তাঁকাইয়া বলিবেন, তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত করিয়া দিয়াছি অথবা তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। অতঃপর উমর (রা)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন (আল-বুখারী, আস-সাহীহ)।

রাফে' আয-যুরাকী, যাঁহার পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তিনি বলেন, জিবরীল (আ) একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আপনারা আপনাদের মধ্যে কিরূপ মর্যাদা দেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমরা তাহাদিগকে সর্বোত্তম মুসলমানের মর্যাদা দেই অথবা তিনি এই ধরনের কিছু বলেন। জিবরীল (আ) বলিলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে যাঁহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তাঁহাদের অবস্থাও অনুরূপ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২৯)।

নিহত কুরায়শদের তালিকা

প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে এই যুদ্ধে কুরায়শদের ৭০ ব্যক্তি নিহত হয়। নিম্নে তাহাদের নাম ও তাহাদের হত্যাকারীদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

১। হানজালা ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান— হত্যাকারী যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)।

২। আল-হারিছ ইবনুল হাদরামী— আন-'নুমান ইব্‌ন আমর (রা)।

৩। 'আমের ইবনুল হাদরামী— আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৪। উমায়র ইব্‌ন আবী উমায়র ও তাহার (৫) পুত্র— সালিম (রা) মাওলা আবী হুযায়ফা।

৬। উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আস—আয-যুবায়র ইব্‌নুল আওওয়াম (রা)।

৭। আল-'আস ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস—আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

৮। উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত— আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্নুল আফলাহ (রা), এক বর্ণনামতে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

৯। উতবা ইব্ন রাবীআ ইব্ন আব্দ শামস—উবায়দা ইব্নুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব, হামযা ও আলী (রা)-ও এই হত্যায় অংশগ্রহণ করেন।

১০। শায়বা ইব্ন রাবী'আ ইব্ন আব্দ শামস—হামযা ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

১১। আল-ওয়ালীদ ইব্ন উতবা ইব্ন রাবী'আ—'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

১২। 'আমের ইব্ন 'আবদিল্লাহ—আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

১৩। আল-হারিছ ইব্ন আমের ইব্ন নাওফাল—খুবায়ব ইব্ন ইসাফ (রা)।

১৪। তু'আয়মা ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল—আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), এক বর্ণনামতে হামযা ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

১৫। যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব—নাবত ইব্ন জিয', এক বর্ণনামতে হামযা, 'আলী ও ছাবিত (রা) ইহাতে শরীক ছিলেন।

১৬। আল-হারিছ ইব্ন যাম'আ—'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)।

১৭। 'আকীল ইবনুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব—হামযা ও আলী (রা) সম্মিলিতভাবে।

১৮। আবুল বাখতারী আল-'আস ইব্ন হিশাম—আল-মুজায্যির ইব্ন যিয়াদ আল-বালাবী (রা)।

১৯। নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ—'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

২০। আন-নাদর ইবনুল হারিছ ইব্ন কালদা—আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

২১। যায়দ ইব্ন মুলায়স, উমায়র ইব্ন হাশিমের ক্রীতদাস—বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা), এক বর্ণনামতে মিকদাদ ইব্ন আওফ (রা)।

২২। 'উমায়র ইব্ন 'উছমান ইব্ন 'আমর—আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), এক বর্ণনামতে আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা)।

২৩। 'উছমান ইব্ন মালিক ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ—সুহায়ল ইব্ন সিনান (রা)।

২৪। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম— মু'আয ইব্ন 'আমর ইবনুল জামূহ তাহার পা কর্তন করেন। মু'আওবিয ইব্ন আফরা তাহাকে ধরাশায়ী ও বেহুঁশ করিয়া ফেলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন।

২৫। আল-আস ইব্ন হিশাম—উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)।

২৬। ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ—আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)।

২৭। আবূ মুসাফি' আল-আশ'আরী—আবূ দুজানা আস-সাইদী (রা)।

২৮। হারমালা ইব্ন 'আমর— খারিজা ইব্ন যায়দ (রা), এক বর্ণনামতে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

২৯। মাস'উদ ইব্‌ন আবী উমায়্যা—'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

৩০। আবূ কায়স ইবনুল ওয়ালীদ-ইবনুল মুগীরা—হামযা ইব্‌ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

৩১। আবূ কায়স ইবনুল ফাকিহ ইবনুল মুগীরা— আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), এক বর্ণনামতে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৩২। রিদা'আ ইব্‌ন আবী রিদা'আ ইব্‌ন 'আবিদ—সা'দ ইবনুর রাবী' (রা)।

৩৩। আল-মুনযির ইব্‌ন আবী রিফা'আ ইব্‌ন 'আবিদ—মা'ন ইব্‌ন 'আদী ইবনুল জাদ্দ (রা)।

৩৪। আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুনযির ইব্‌ন আবী রিফা'আ—'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

৩৫। আস-সাইব ইব্‌ন আবিস সাইব ইব্‌ন 'আবিদ—আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা)।

৩৬। আল-আসওয়াদ ইব্‌ন আবদিল আসাদ —হামযা ইব্‌ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

৩৭। হাজিব ইবনুস সাইব ইব্‌ন 'উওয়ায়মির—আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

৩৮। 'উওয়ায়মির ইবনুস সাইব ইব্‌ন 'উওয়ায়মির— আন-নু'মান ইব্‌ন মালিক আল-কাওকালী (রা)।

৩৯। 'আমর ইব্‌ন সুফ্‌য়ান—ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ (রা)।

৪০। জাবির ইব্‌ন সুফ্‌য়ান—আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা)।

৪১। মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমের—আবুল ইয়াসার (রা)।

৪২। 'আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ— আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

৪৩। নুবায়হ ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন আমের— হামযা ইব্‌ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

৪৪। আবুল 'আস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আদী—আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), এক বর্ণনামতে আন-নু'মান ইবন মালিক আল-কাওকালী, মতান্তরে আবূ দুজানা (রা)।

৪৫। 'আসিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন দুবায়রা— আবুল ইয়াসার (রা)।

৪৬। উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ— আনসারদের মাযিন গোত্রের জনৈক সাহাবী, এক বর্ণনামতে মু'আওবিয ইব্‌ন 'আফরা, খারিজা ইব্‌ন যায়দ ও খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ (রা) সম্মিলিতভাবে।

৪৭। 'আলী ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ—আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৪৮। আওস ইব্‌ন মি'য়ার ইব্‌ন লাওযান— আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), এক বর্ণনামতে আল-হাসায়ম ইবনুল হারিছ ও উছমান ইব্‌ন মাজউন (রা) সম্মিলিতভাবে।

৪৯। মু'আবিয়া ইব্‌ন 'আমের— আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), অপর এক বর্ণনামতে উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা)।

৫০। মা'বাদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব—খালিদ ও ইয়াস ইবনুল বুকায়র ভ্রাতৃদ্বয়, এক বর্ণনামতে আবূ দুজানা আনসারী (রা) (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৪৭-৫২)।

ইব্‌ন ইসহাক উক্ত ৭০ জনের মধ্যে নামোল্লেখ করেন নাই এমন আরও কয়েকজনের নাম হইল ঃ

৫১। ওয়াহ্‌ব ইবনুল হারিছ।

৫২। আমের ইব্‌ন যায়দ।

৫৩। উকবা ইব্‌ন যায়দ।

৫৪। 'উমায়র।

৫৫। নুবায়হ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুলায়স।

৫৬। 'উবায়দ ইব্‌ন সালীত।

৫৭। মালিক ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ— তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা)-এর ভ্রাতা। তাহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় সে মারা যায়। তাহাকেও নিহতদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৫৮। 'আমর ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন।

৫৯। হুযায়ফা ইব্‌ন আবী হুযায়ফা ইবনুল মুগীরা— সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াককাস (রা) তাহাকে হত্যা করেন।

৬০। হিশাম ইব্‌ন আবী হুযায়ফা ইবনুল-মুগীরা— সুহায়ব ইব্‌ন সিনান (রা) তাহাকে হত্যা করেন।

৬১। যুহায়র ইব্‌ন আবী রিফা'আ— আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রাবীআ (রা) তাহাকে হত্যা করেন।

৬২। আস-সাইব ইব্‌ন আবী রিফা'আ—'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা)।

৬৩। 'আইয ইবনুস সাইব ইব্‌ন 'উওয়ায়মির—সে বন্দী হয়। মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত হইয়া রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত আঘাতের কারণে সে মারা যায়। আঘাতটি করিয়াছিলেন হামযা ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা)।

৬৪। উমায়র।

৬৫। খিয়ার।

৬৬। সাবুরা ইব্‌ন মালিক।

৬৭। আল-হারিছ ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ— সুহায়রবইব্‌ন সিনান (রা)।

৬৮। 'আমের ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন দুবায়রা— আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামা আল-আজলানী (রা), মতান্তরে আবূ দুজানা (রা) তাহাকে হত্যা করেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৫৩-৫৪)।

বন্দী কাফিরদের মধ্যে পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকা ঃ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যাহারা বন্দী হইয়াছিলেন পরবর্তী কাল তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালিস মুমিন হিসাবে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। তাহারা হইলেন ঃ

১। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আল-'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা)।

২। আকীল ইব্‌ন আবী তালিব (রা), আলী (রা)-এর ভ্রাতা।

৩। নাওফাল ইবনুল হারিছ (রা)।

৪। আবুল আস ইবনুর রাবী' (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা।

৫। আবূ 'আযীয যুরারা ইব্‌ন উমায়র আল-আবদারী (রা)।

৬। আস-সাইব ইব্‌ন আবী হুবায়শ (রা)।

৭। খালিদ ইব্‌ন হিশাম আল-মাখযূমী (রা)।

৮। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিস সাইব (রা)।

৯। আল-মুত্তালিব ইব্‌ন হানতাব (রা)।

১০। আবূ ওয়াদা'আ আস-সাহমী (রা)।

১১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন খালাফ আল-জুমাহী (রা)।

১২। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন উমায়র আল-জুমাহী (রা)।

১৩। সুহায়ল ইব্‌ন আমর আল-আমিরী (রা)।

১৪। উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা)-এর ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম্‌আ (রা)।

১৫। কায়স ইবনুস সাইব (রা)।

১৬। নিসতাস (রা) মাওলা উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ।

১৭। আস-সাইব ইব্‌ন উবায়দ (রা), বদর যুদ্ধের পরই নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৮। আদিয়্যি ইবনুল খিয়ার।

১৯। আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, তাহার ভ্রাতা হিশাম ও খালিদ মুক্তিপণ দিয়া তাহাকে মুক্ত করে। মুক্ত হওয়ার পরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাতে তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিলে তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে লোকজন এই ধারণা করিবে যে, আমি বন্দীত্বের ফলে ঘাবড়াইয়া গিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা আমি ভাল মনে করি নাই বিধায় বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করি নাই। এই অপরাধে তাহার মামার বংশ তাহাকে আটক রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) কুনূতের মধ্যে তাহার জন্য দু'আ করেন। অতঃপর সেখান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি উমরাতুল কাযার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আসিয়া মিলিত হন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৭৮-৭৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা; (২) আল-বুখারী, আস সাহীহ, দারুস-সালাম, রিয়াদ ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং, কিতাবুল মাগাযী; (৩) আবূ দাউদ, আস-সুনান, মাকতাবা রাহীমিয়্যা, দেওবন্দ, ইউ. পি., তা. বি.; (৪) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুর রায়্যান, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং.; (৫) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং.; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্‌র আল-আরাবী, মিসর ১৯৫১/১৯৩২, ১ম সং.; (৭) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দার

ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (৮) আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, রাওয়াইউত তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি; (৯) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দার সাদির, বৈরূত, তা. বি.; (১০) ইব্ন 'আবদিল বারর, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, দারুল আনদালুস আল-খাদরা, কায়রো ১৪১৫/১৯৯৪; (১১) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল কুতুব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪; (১২) আবূ যায়দ আল-বালখী, কিতাবুল বাদই ওয়াত-তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং.; (১৩) ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম ফী তারীখ উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং.; (১৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং.; (১৫) ইব্ন হাযম আল-আনদালুসী, জাওয়ামি'উস সীরাতিন নাবাবিয়্যা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (১৬) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার, দারুল কালাম, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং.; (১৭) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকাতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত ১৪১২/ ১৯৯১, ১ম সং.; (১৮) মুহাম্মাদ আবূ যাহরা, খাতামুন নাবিয়্যীন, দারুত তুরাছ, বৈরূত তা. বি.; (১৯) সাফিয়্যুর রাহমান মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রাবিতাতুল আলাম আল-ইসলামী, মক্কা মুকাররামা ১৪০০/১৯৮০, ১ম সং.; (২০) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪০৭/১৯৮৭, ১ম সং.; (২১) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, সীরাতুল নাবী (স), দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১ম সং; (২২) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা (স), রাব্বানী বুকডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১ম সং.; (২৩) 'আবদুর রাউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, সামাদ বুকডিপো, দেওবন্দ, ইউ. পি., তা. বি.; (২৪) ড. সাঈদ রামাদান আল-বূতী, ফিকহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যা, দারুল ফিকর, দামিশক ১৯৯১ খৃ., ১১শ সং.; (২৫) মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ফিকহুস সীরা, আলামুল মারিফা, তা. বি (২৬) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, কাকলী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সং.; ঢাকা ২০০০ খৃ., (২৭) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১ খৃ., ২য় সং.; (২৮) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ., ১ম সং.; (২৯) Muhammad Ahmad Bcshumail, The Great Battle of Badr, Islamie book Service, New Delhi 1992.

ডঃ আবদুল জলীল

সারিয়্যা উমায়র ইব্ন আদী (১)

এই অভিযান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশেই পরিচালিত হয়। ইহা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট সারিয়্যা অভিযান। সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র একজন। তিনি হইলেন উমায়র ইব্ন 'আদী (রা)। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত অভিযানের নামকরণ করা হয় সারিয়্যা উমায়র ইব্ন 'আদী। এই সারিয়্যায় প্রতিপক্ষ ছিল এক মহিলা। সে ছিল বানূ খাতমাহ গোত্রের। নাম 'আসমা' বিন্ত মারওয়ান।

সারিয়্যা উমায়র ইব্ন 'আদী সংঘটিত হয় পঁচিশ রমযান, দ্বিতীয় হিজরী, মুতাবিক মার্চ ৬২৪ খৃস্টাব্দে আসমা বিন্ত মারওয়ান নামক এক কুলাঙ্গার মহিলাকে হত্যার উদ্দেশ্যে। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইব্ন আল-ফুদায়ল-এর বর্ণনানুসারে আসমা ছিল বানূ খাতমাহ গোত্রের ইয়াযীদ ইবন যায়দ আল-খাতমীর স্ত্রী (ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪০; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ,৪খ., পৃ. ২১৪; আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৯৯; ড: ইয়াসীন মাজহার, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৪৬)।

এই আসমা বিন্ত মারওয়ান ছিল বহু অপকর্মের হোতা। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কোন মন্দ কর্ম নাই যাহা সে করে নাই। আল্লামা যুরকানী (র) তাহার অপকর্মের বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ

كانت تطرح المحايض فى مسجد بنى خطمة فاهدر صلى الله عليه وسلم دمها ولم ينتطيح فيها غزات.

"সে বানূ খাতামাহ গোত্রের মুসলমানদের মসজিদে নাপাক ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার রক্ত মূল্যহীন বলিয়া ঘোষণা করেন। আর বলেন, কেহ তাহার হত্যার প্রতিশোধ লইতে আসিবে না এবং তাহার রক্তপণও দাবি করিবে না" (ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪; আল্লামা যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৩; আল-হালাবী আস-শাফিঈ, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৭)।

ইব্ন সা'দ, ইব্ন হিশাম প্রমুখ ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন, "আবু আফ্ক" নামক ইয়াহূদীকে হত্যার পর হইতেই আসমা' মুনাফিকী করিতে থাকে। সে তখন হইতেই ইসলামের নামে কুৎসা রটাইতেছিল। যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে নানাভাবে কষ্ট দিত, এমনকি তাঁহাকে হত্যার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করিত এবং কবিতার মাধ্যমে এই ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ দিত (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪)।

ইব্ন সা'দ-এর বরাতে আল্লামা যুরকানী বর্ণনা করিয়াছেন, তখন বদর যুদ্ধ চলিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও বদর প্রান্তরে ছিলেন। তখন আসমা বিন্ত মারওয়ান ইসলাম ও

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কুৎসাপূর্ণ কিছু কবিতা রচনা করে। তাহার কুৎসাপূর্ণ কবিতা শুনিয়া উমায়র ইব্ন আদী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বদর যুদ্ধ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করান তবে আমি আসমাকে অবশ্যই হত্যা করিব (শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৩; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ, ১৫৮)।

আসমা বিন্ত মারওয়ান যে সকল কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা রটাইত, ইমাম সুহায়লী তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

با مست بنى مالك والنبيت + وعـوف وباست بني الخزرج

اطـعـتم اتـاوى من غيركم + فـلا مـن مـراد ولا مذحج

تـرجونـه بعد قتل الرؤس + كـمـا يـرتجى مرق المنضبج

الا انــف يـبتـغـى غـــرة + فــيقـطـع من امل المرتجى

(১) "ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল বানূ মালিক, বানূ নাবীত ও বানূ 'আওফ গোত্র। আরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল বানূ খাযরাজ গোত্র। (২) ফলে তোমরা এখন তোমাদের ভিন্ন বংশোদ্ভূত অপরিচিত একজন এমন নেতার অনুসরণ করিতেছ, যে মুরাদ গোত্রেরও নয় আর মাযহিজ গোত্রেরও নয়; (৩) সমাজের নেতৃবর্গীয় লোকজনকে হত্যার পর তোমরা এখন তাহাকেই কামনা করিতেছ। অর্থাৎ এখনো তোমাদের কাম্য সেই পুরুষ যেমন তরকারীর ঝোল মানুষের কাম্য। (৪) সাবধান! সম্প্রদায় প্রধান কিন্তু সুযোগ সন্ধান করিতেছে। সুতরাং সুযোগ কামনাকারীর সকল কামনার মূলোৎপাটন করিয়া দাও" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৯৯; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪)।

আসমা' বিন্ত মারওয়ান-এর কবিতার জবাবে হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) পাল্টা কবিতা রচনা করিয়া বিন্তে মারওয়ানসহ বিধর্মীদের সকল ভর্ৎসনা, কুৎসা, বিদ্রূপ ও তিরস্কারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তাঁহার রচিত কবিতাসমূহ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইলঃ

بـنـو وائل وبـنـو واقـف + وخـطـمـة دون بنى الخزرج

متى ما دعت سفها ويحها + بـعولتها المنايا مجرى

فـهزت فـتـى مـا جدا عـرقـه + كـريم المداخل والمخرج

فـضرجـها مـن نـجـيع الدما + بـعد الهـدؤ فلم يحرج

(১) "(ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে) বানূ ওয়াইল, বানূ ওয়াকিফ ও বানূ খাতমাহ, বানূ খাযরাজ নয়। (২) যখন চিৎকার করিয়া উচ্চস্বরে ধ্বংস আর নির্বুদ্ধিতাকে আহবান করা হয় তখন কিন্তু কাংক্ষিত আহত বস্তু অর্থাৎ মৃত্যু আসিবে। (৩) সুতরাং প্রস্তুত হইয়া গেল এক নওজোয়ান ঘাম যাহার ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছিল (অর্থাৎ হত্যা করার জন্য হাপিত্তেশ

করিতেছিল), যাহার প্রবেশ ও বহির্দ্বার ছিল সম্মানিত (অর্থাৎ হত্যা করিয়া সসম্মানেই ফিরিয়া আসিল)। (৪) গাঢ় লাল রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল তাহাকে রাতের কিয়দংশ যাইতে না যাইতে। তবে ইহাতে তাহার কোন অপরাধ হয় নাই" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪০০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪- ২১৫)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কুৎসাপূর্ণ ও নিন্দাবাদের কথা শুনিতে পাইয়া বলেন ঃ

انه عليه السلام قال الا رجل يكفينا هذه فقال رجل من قومها انا فاتاها كانت تبيع التمر فقال اعندك اجود من هذا التمر قالت نعم فدخلت البيت وانكبت لتاخذ شيئا فالتفت يمينا وشمالا فلم ير احدا فضرب رأسها حتى قتلها.

"আমাদের মধ্যে এমন কেহ কি নাই যে তাহার (আসমার) জন্য একাই যথেষ্ট? তখন তাহার স্বগোত্রীয় একজন বলিয়া উঠিল, আমি আছি, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! অতঃপর সে তাহার নিকট আসিল এমতাবস্থায় যে, আসমা খেজুর বিক্রি করিতেছিল। সে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা অপেক্ষা ভাল খেজুর তোমার নিকট আছে কি? সে উত্তর দিল, আছে। এই বলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটি বলিল, আমিও তাহার পদাংক অনুসরণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম কিছু খেজুর গ্রহণ করার মানসে। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ডান-বাম ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, কেহ কোথাও আছে কিনা। সে দেখিল আশেপাশে কেহ নাই। সুতরাং ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া তাহার মাথায় ও পাঁজরে আঘাত করিল। শেষ পর্যন্ত তাহাকে সে হত্যা করিল" (শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৪; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৮)।

ইব্ন হিশামসহ অন্যান্যদের বিবরণ হইতে জানা যায়, الا اخذلى من ابنة مروان রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোষণা উমায়র ইব্ন আদী শুনিতে পান। কারণ সেই সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটেই ছিলেন।

فلما امسى من تلك الليلة جادها عمير فى جوف الليل حتى دخل عليها فى بيتها وحولها نفر من ولدها نيام وعلى صدرها صبى ترضعه فجسها بيده وكان ضريرالبصر ونحى الصبى عن صدرها ووضع سيفه على صدرها حتى انفذه من ظهرها-

"অতঃপর যখন রাতের আঁধার নামিয়া আসিল উমায়র তখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। সে দেখিল যে, তাহার পাশেই তাহার সন্তানেরা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এমনকি সে নিজেও ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মাঝে এমন একজন ছিল যে এখনও দুধ পান করিত। সে মায়ের বুকের উপর ঘুমাইয়াছিল। তখন তাহাকে সে নিজ হাতে কয়েদ করিল, দুগ্ধপোষ্য সন্তানটিকে তাহার বুকের উপর হইতে সরাইয়া দিল যেন তাহার কোনরূপ ক্ষতি না হয়। তারপর তাহার তরবারিখানা তাহার বুকে বসাইয়া দিল। ফলে তাহা তাহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল। উল্লেখ্য যে, উমায়র ছিল অন্ধ" (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৫; মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৭৮; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৭)।

উমায়র (রা) আসমা বিন্ত মারওয়ানকে হত্যা করিয়া নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়া আসেন ঃ

ثم صلى الصبح مع النبى ﷺ بالمدينة فقال يا رسول الله انى قد قتلتها فقال نصرت الله ورسوله يا عمير.

"অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মদীনায় ফজরের নামায আদায় করেন। তারপর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, হে উমায়র! তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিয়াছ" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৫০০; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪০; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৭৮; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৫; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৭)।

তারপর উমায়র রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

فقال هل على شئ من شانها يارسول الله ﷺ فقال لا ينطح فيها غزات يعنى لا يعارض فيها معارض لياخذ بثارها ولا يسال عنها اى يطلب بدمها فانها هدر.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হত্যার কোন দায়ভার কি আমার উপর বর্তাইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ না, কেহ এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসিবে না, আর কেহ ইহার রক্তপণও দাবি করিবে না। কেননা তাহার রক্ত মূল্যহীন" (শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৪; আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৫০০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৫)।

واثنى ﷺ على عميرا بعد قتله عمماً فاقبل على الناس وقال من احب ان ينظر الى رجل كان فى نصرة الله ورسوله فلينظر الى عمير بن عدى.

"আসমা বিন্ত মারওয়ানকে হত্যার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লোকজনের সম্মুখে বলেন ঃ কেহ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখিতে চায় যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-কে সাহায্য করিয়াছে, সে যেন উমায়র ইবন আদীকে দেখে"।

তিনি ছিলেন অন্ধ। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকিতেন عمير البصير (দৃষ্টিমান উমায়র)। হযরত উমার (রা) বলিতেন ঃ

انظروا الى هذا الاعمى الذى يرى فقال ﷺ مه يا عمر فانه بصير.

"দেখ ঐ অন্ধকে যে চোখে দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) উমার (রা)-কে বলিলেন, থাম হে উমার! তাহাকে অন্ধ বলিও না; বরং সে দৃষ্টিমান" (শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৪; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৮; মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ১৭৭)।

অতঃপর উমায়র নিজ কওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তাহারা তখন বিনতে মারওয়ান সম্পর্কে পর্যালোচনা করিতেছিলেন। আসমার ছিল পাঁচ সন্তান। তাহারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। উমায়র তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে খাতমাহ সম্প্রদায়ের লোকজন! জানিয়া রাখ, আসমাকে আমিই হত্যা করিয়াছি। যদি তোমরা এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও তবে তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পার। কিন্তু এই সুযোগ

কাজে না লাগাইতে পারিলে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আর পাইবে না। তারপর তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

والذى نفسى بيده لو قلتم باجمعكم ما خالت لاضربنكم بسيفى هذا حتى اموت او اقتلكم.

"ঐ সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন। যদি তোমরা সকলেও বলিতে আসমা তো মন্দ কিছুই বলে নাই, তবে অবশ্যই আমার এই তরবারি দ্বারা তোমাদের সকলকেই হত্যা করিতাম অথবা নিজেই মরিতাম" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৫০০-৫০১; শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৪; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৫; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৮)।

উমায়র (রা) সেই দিনই প্রথম তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা নিজ কওম বনূ খাতমাহ-এর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হইতে তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা নিজ কওমের নিকট গোপন করিয়া আসিতেছিলেন। আর তিনিই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী বনূ খাতমাহ গোত্রের প্রথম মুসলমান। তিনি নিজেকে কুরআন শিক্ষা দানকারী বলিয়া দাবি করিতেন। সেই দিনই ইসলামের ইজ্জত, সম্মান, শক্তি আর দাপট দেখিয়া বনূ খাতমাহ গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহাদের মাঝে عبد الله بن اوس وخزيمة ابن ثابت অন্যতম (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৫; আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৫০১; শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৪৫৪; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪০; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৫৮)।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত সারিয়্যা ছিল একটি সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক অভিযান। ফলাফল ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। উমায়র ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন আসমা বিন্ত মারওয়ানকে অতি সহজেই কতল করেন এবং নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়া আসেন। এই অভিযানে মুসলমানদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই (রাহমাতুল্লিল আলামীন, ২খ., পৃ. ২৩২; মাদারিজুন-নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ১৭৭)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন সায়্যিদিন-নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কলম, বৈরূত, প্রথম সংস্করণ ১৪১৪ হিজরী / ১৯৯৩ খৃ.; (২) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ ১৪১২ হিজরী / ১৯৯১ খৃ.; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৬ হিজরী / ১৯৯৪ খৃ.; (৪) কাজী সুলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, তাজেরান-ই কুতুব, লাহোর তা.বি.; (৫) আব্দুল হক দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়াত, আদাবী দুনিয়া, মিটিয়ামহল, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২; (৬) আবদুর রহমান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফা, তা.বি.; (৭) ডঃ মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর সরকার কাঠামো, অনু. সম্পাদনা পরিষদ, ই. ফা. বা., ১৯৯৪; (৮) আল্লামা যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৩ খৃ., ১৩৯৩ হিজরী; (৯) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী আশ-শাফিঈ, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি.।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

সারিয়্যা সালিম ইব্ন উমায়র (রা)

ইব্ন সা'দ, ইব্ন ইসহাক প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, সারিয়্যা সালিম ইব্ন উমায়র (রা) পরিচালিত হইয়াছিল আবূ 'আফ্ক নামক এক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে। তাহাকে হত্যা করাই ছিল এই সারিয়্যার উদ্দেশ্য।

সারিয়্যা সালিম ইব্ন উমায়র ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট অভিযান। সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র একজন। তিনি হইলেন সালিম ইব্ন উমায়র (রা)। আর তাহার নামানুসারেই উক্ত অভিযানের নামকরণ করা হইয়াছে سرية سالم بن عمير। আর প্রতিপক্ষও ছিল সংখ্যায় মাত্র একজন, খায়বার অঞ্চলের ইয়াহূদী গোত্রের ইসলাম ও মুসলমানদের অন্যতম দুশমন আবূ আফ্ক নামক এক ইয়াহূদী। দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস মুতাবিক এপ্রিল ৬২৪ খৃ. উক্ত সারিয়্যা সংঘটিত হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৩; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; রাহমাতুল্লিল আলামীন, ২খ., পৃ. ২৩২; রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৩৬৪; মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ১৭৮)।

উল্লেখ্য যে, সারিয়্যা সালিম ইব্ন উমায়র (রা) অভিযানের প্রতিপক্ষ ইয়াহূদী আবূ আফ্ক ছিল খায়বারের বানূ আমর ইব্ন 'আওফ গোত্রের লোক। তাহার বয়স ছিল ১২০ বৎসর। যখন রাসূলুল্লাহ (স) হারিছ ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন সামিতকে হত্যা করেন তখন হইতেই সে মুনাফিকী করিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার জন্য সে মানুষকে উৎসাহিত করিত এবং কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমান এবং ইসলামের নিন্দাবাদ প্রচার করিত (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; শারহে মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫৫)।

আবূ আফ্ক যে সকল কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা বর্ণনা করিত সেই সকল কবিতা হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

لقد عشت دهرا وما ان ارى + من الناس دارا ولا مجمعا

ابـرّ عـهـودا واوفـى لـمـن + يـعـاقد فيهم اذا مادعا

مـن اولاد قـيلة فى جمعهم + يـهـد الجبال ولم يخضعا

فـصـدعـهم راكب جاءهم + حـلال حـرام لشئ معا

فـلـو ان بـالـعز صـدقتهم + او الملك تـابعتم تبعا

(১) "আমি বহু যুগ ধরিয়া বাঁচিয়াছিলাম, তবুও মানুষের কোন ঘর কোন সমাবেশ আমি দেখি নাই।

(২) অঙ্গীকার পালনে অধিক সত্যবাদী, যখন তাহাদিগকে অঙ্গীকার পালনে আহবান করে, তাহারা যাহাদের সাথে অঙ্গীকার করিয়াছে।

(৩) কায়লা নাম্নী মহিলার সন্তানগণ, তাহারা সকলেই মানুষের অন্তরকে আকর্ষণ করিবে কিন্তু অনুগত হইবে না।

(৪) অতঃপর তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল একজন আরোহী একই সাথে হালাল-হারামের বিধান দিয়া।

(৫) তোমরা বিশ্বাস করিতে যদি সত্যিই তাহা সম্মানজনক হইত, নয়তো বাদশা হইল তোমরা 'বাদশা তুব্বার' অনুসরণ করিতে" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৯৮; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ, ২১৪)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহার মুনাফিকী ও কুৎসা রটনার কথা জানিতে পারিলেন তখন বলিলেন ঃ

من لى بهٰذا الخبيث فخرج سالم بن عمير اخو بنى عمروبن عوف.

"এমন কে আছ যে এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করিবে। তখন সালিম ইব্ন উমায়র তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন"। উল্লেখ্য যে, সালিম ইব্ন উমায়র ছিলেন গোত্রপ্রধান আমর ইব্ন আওফ-এর ভাই। সালিম ইব্ন উমায়র ছিলেন অধিক ক্রন্দনকারীদের একজন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফ্য়ান-এর খেলাফতের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৭৯; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩১১)। সালিম ইব্ন উমায়র বলিতেন ঃ

على نذر ان اقتل ابا عفك او اموت دونه فاهمل يطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة فنام ابو عفك بفناء بيته فعلم بذلك سالم فاقبل نحوه فوضع السيف على كبده.

"আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, হয়ত আবূ আফককে হত্যা করিব, না হয় নিজেই মৃত্যুবরণ করিব। তাই আমি সেই সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। অবশেষে সে একদিন সুযোগ পাইয়াও গেল। 'আবূ আফ্ক' একদিন গরমের রাতে তাহার ঘরের আঙ্গিনায় ঘুমাইতেছিল। আর সালিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহা জানিতেন। তারপর তিনি সুযোগ বুঝিয়া আস্তে আস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাহার বুকে তরবারি বসাইয়া দিলেন। আঘাত খাইয়া আল্লাহ্র দুশমন চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়া গেল। তাহার চিৎকার শুনিয়া তাহার অনুসারীরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহারা ঘরের ভিতর নিয়া গেল। অবশ্য ততক্ষণে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল" (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., প. ১৫৮)।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ আফ্‌ককে উহুদ যুদ্ধের পর হত্যা করা হয় (শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫৬)। আবূ আফ্‌ক-এর মৃত্যুর পর উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে উমামা আল-মুযায়রিয়্যা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে ঃ

تكذب دين الله والمرء احمدا + لعمر الذى امناك ان بسى ما يمنى

حباك حنين اخر الليل طعنة + ابا عفك خذها على كبر السن.

(১) "তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে আল্লাহ্‌র দীনকে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মত মহান ব্যক্তিত্বকেও । সেই জীবনের শপথ! যাহা তোমাকে আশান্বিত করিয়াছে। উহা তোমাকে যে আশা দিয়াছে তাহা কতই না মন্দ।

(২) একজন মুসলিম রাতের শেষ প্রহরে তোমাকে কৃতকর্মের প্রতিদান দিয়াছে অতি লাঞ্ছিতভাবে (অর্থাৎ তোমার জীবন প্রদীপ নিভাইয়া দিয়াছে। আর ইহাই ছিল তোমার কৃতকর্মের যোগ্য প্রতিদান)। হে আবূ আফ্‌ক! এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি তাহাই সাদরে গ্রহণ কর" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৯৯; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩৪১; ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২১৪; শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫৬)।

উক্ত সারিয়্যা ছিল একটি সফল ও সার্থক অভিযান। যাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয় সেই ইয়াহূদী আবূ আফ্‌ককে অতি সহজেই সালিম হত্যা করেন। তবে এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। সালিম তাহাকে হত্যা করিয়া নিরাপদেই ফিরিয়া আসেন (মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ১৭৮; রাহমাতুল্লিল আলামীন, ২খ., পৃ. ২৩২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কলম, বৈরূত ১৪১৪ হিজরী/ ১৯৯৩ খৃ.; (২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৫ হিজরী/ ১৯৯৫ খৃ.; (৩) আবদুর রহমান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, তা. বি ; (৪) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, তা. বি.; (৫) কাজী সুলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, তাজেরান-ই কুতুবখানা, কাশ্মীরি বাজার, লাহোর তা. বি; (৬) আবদুল হক দিহলবী, মাদারিজুন নুবুওয়াত, আদাবী দুনিয়া, মিটিয়ামহল, দিল্লী ১৯৯৮ খৃ.; (৭) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১২ হিজরী/ ১৯৯১ খৃ.; (৮) ডঃ মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, অনুবাদ, ই.ফা.বা, ১৯৯৪ খৃ.; (৯) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী আশ-শাফিঈ, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি; (১০) আল্লামা যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৩ হিজরী/ ১৯৭৩ সন।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

গাযওয়া বানূ সুলায়ম

পরিচিতি ঃ গাযওয়া বানূ সুলায়ম রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের ২৮টি গাযওয়ার মধ্যে ৮ম গাযওয়া (দ্র. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইফাবা, ১সং. ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. পৃ. ১৫৩)। বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মাঝে যে কতিপয় স্বল্প পরিসরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহার একটি হইল গাযওয়া বানূ সুলায়ম। সুলায়ম গোত্রের নামানুসারে এই গাযওয়ার নামকরণ করা হইয়াছে।

বানূ সুলায়ম মদীনার চার মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি গোত্র (দ্র. মুহাম্মাদ সফীউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৩৭)। মদীনার পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান গোত্রগুলি ছিল গাতফান, আসাদ, সুলায়ম, হাওয়াযিন, আশজা' , তায়ী, কায়স আয়লান প্রভৃতি। তম্মধ্যে বানূ সুলায়ম মূলত গাতাফানের অন্যতম শাখাগোত্র। প্রকৃতপক্ষে মদীনার নিকটবর্তী অঞ্চল হিসাবে উহার পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রগুলি প্রথম হইতেই ইসলামের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ঐ সকল গোত্রের প্রায় সকলে দীর্ঘকাল যাবত মহানবী (স) এবং তাঁহার ইসলাম প্রচারের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল। ৬২২ খৃ. মদীনায় হিজরতের পরপরই এই বিরোধিতা শুরু হয় এবং ৬৩০ খৃ.-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকে। মহানবী (স) -এর ছোট-বড় অভিযানগুলির একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রায় ৯০টি অভিযানের মধ্যে ২৮টিই মদীনার পূর্বাঞ্চীলয় গোত্রগুলীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় (মুহাম্মদ (স)- এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৬০)।

সীরাতের কিতাবসমূহে এই গাযওয়াকে একাধিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সীরাতের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের মধ্যে ইব্ন কাছীর তাঁহার আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, মাহমূদ শাকির তাঁহার আত-তারীখুল ইসলামী, সফীউর রহমান তাঁহার আর-রাহীকুল মাখতূম, মুহাম্মাদ রিদা তাঁহার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রভৃতি কিতাবে বানূ সুলায়ম গোত্রের নামানুসারে এই গাযওয়াকে গাযওয়া বানূ সুলায়ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তবে ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাতে বানূ সুলায়ম শিরোনামে একটি গাযওয়ার বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সহিত প্রসিদ্ধ ও প্রকৃত ঘটনার ভিন্নতা রহিয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধের গাযওয়ার বিবরণ-স্থলে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। সীরাতের অন্যান্য কিতাবে এই গাযওয়ার আরও একাধিক নাম পাওয়া যায়। যেমন (ক) গাযওয়া কারকারাতি আল-কুদর (দ্র. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১সং.,২খ., পৃ. ৩৫; ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩১)।

(খ) গাযওয়া কুদর (দ্র. ইব্ন খালদূন, আত-তারীখ, ২খ, (অবশিষ্টাংশ), পৃ. ২২; ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮২)।

মূল ঘটনার অঞ্চল এবং স্থানের নামের ভিন্নতার কারণেই গাযওয়ার নামে এই ভিন্নতা সৃষ্টি হইয়াছে। যেহেতু ঘটনাঞ্চলটি বানূ সুলায়ম, তদনুসারে উহার নাম গাযওয়া বানূ সুলায়ম এবং ঘটনাস্থলের নাম কারকারাতুল কুদর বা কারারাতুল কুদর অথবা শুধু কুদর, সেই অনুযায়ী গাযওয়ার নাম বিভিন্ন হইয়াছে।

গাযওয়ার তারিখ

গাযওয়া বানূ সুলায়মের তারিখের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। তবে প্রসিদ্ধ যে মতগুলি পাওয়া যায় তাহা হইল ঃ

(ক) বদরের যুদ্ধের ৭ দিন পরে ২য় হিজরীতে (দ্র. ইব্ন কাছীর, আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, ২ খ., পৃ. ১৪০)।

(খ) পহেলা শাওয়াল রাসূলুল্লাহ (স) ঈদের নামায সমাপনান্তে (দ্র. মুহাম্মাদ 'আলী, সীরাতে মুহাম্মাদীয়া; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ খ., পৃ. ৩৪২)।

(গ) শাওয়ালের প্রথম দিকে (দ্র. প্রাগুক্ত)।

(ঘ) ১১ মুহাররম, তৃতীয় হিজরী (ইমাম শিহাবুদ্দীন, মু'জামুল বুলদান, ৫খ., পৃ. ৪৪২)।

(ঙ) ইব্ন সা'দ তাঁহার আত-তাবাকাতে উল্লেখ করিয়াছেন ১৫ মুহাররম তৃতীয় হিজরী (দ্র. আত-তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৩১)। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইব্ন সা'দ গাযওয়া বানূ সুলায়ম (তাঁহার শিরোনামানুসারে গাযওয়া কারকারাতিল কুদর)-কে অন্যান্য সকল ঐতিহাসিক হইতে ভিন্নভাবে গাযওয়া বানূ কায়নুকা এবং গাযওয়া সাবীক- এর পরে উল্লেখ করিয়াছেন। গাযওয়া বানূ কায়নুকা সংঘটিত হইয়াছিল হিজরতের ২০ মাস পর ১৫ শাওয়াল শনিবার এবং গাযওয়া সাবীক হিজরতের ২২ মাস পর ২৫ যিলহজ্জ রবিবার (দ্র. আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩১)। সুতরাং ইব্ন সা'দের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, গাযওয়া বানূ সুলায়ম বা গাযওয়া কারকারাতুল কুদ্র, গাযওয়া বানূ কায়নুকা এবং গাযওয়া সাবীক-এর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক এই মতের সমর্থক নহেন, বরং সফীউর রহমান তাঁহার কিতাবে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধের পর মদীনার তথ্যবিভাগ সর্বপ্রথম যে সংবাদ সংগ্রহ করে তাহা হইল, "বানূ সুলায়ম এবং গাতাফান গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলা করিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে" (দ্র. সফীউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬০)

গাযওয়ার প্রেক্ষাপট

এমনিতেই দীন ইসলামের আবির্ভাবই যেন বজ্ররূপে পতিত হইয়াছিল পথভ্রষ্ট, ধর্মভ্রান্ত, মূর্তিপূজারী, মুশরিক, অন্ধ ও সত্য বিবর্জিত আরবীয় জনগোষ্ঠীর উপর। তাহার উপর আবার

এই সত্য দীনের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখিয়া হিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল গোটা আরব। প্রতিরোধ স্পৃহায় মাতিয়া এই দীনকে সমূলে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা মাথায় লইয়া একবার হযরতকে হত্যার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরতের পথ উন্মোচন করিয়াছে। মদীনা হিজরত সত্য দীনের উন্নতির ধারাকে আরও বেগবান করিলে মক্কাবাসী হিংসুকদের অন্তর্জ্বালা অদম্য হইয়া ওঠে। ফলে তাহারা বদর যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নেয় ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ধুলায় লুটাইয়া দিতে। সৈন্য, শক্তি ও সরঞ্জামের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এই যাত্রায়ও তাহারা কোন সুফল লাভ করিতে পারে নাই, বরং পরাজয়ের গ্লানি লইয়া বিমূঢ় হইয়া ছিটকাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল শক্তির দম্ভে উদভ্রান্ত আরব জাতি। জনবল ও ধনবল হারানোর পরিণাম লইয়া প্রত্যেকে নিজ ভূমিতে পালাইয়া কোন রকমে জান- মান বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এই পরাজয়ও তাহাদিগকে দমাইয়া সত্য দীনের প্রতি অবনমিত করাইতে পারে নাই। ক্ষোভে-জিদে উত্তেজিত হইয়া মুশরিক-ইয়াহূদী সমবেতভাবে এক প্রতিশোধ স্পৃহায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে" (৫ ঃ ৮২)। এক্ষেত্রে মক্কার মুশরিকরা হইল বদরের যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত, ইয়াহূদীরা ছিল নিজেদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকাগ্রস্ত (দ্র. আর-রাহীক, পৃ. ২৩৭)। ইহা ছাড়া বানূ সুলায়ম এবং গাতাফানসহ কতিপয় অঞ্চল ছিল মক্কায় বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার স্বীকার। ইহারা মক্কা কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক কায়কারবার দ্বারা উপকৃত হইত (দ্র. মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ৪২৫)। তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দিতে লাগিল এবং হুমকির পাশাপাশি যুদ্ধ প্রস্তুতিও শুরু করিল।

এমনি এক পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম যে সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিকট পৌঁছিল তাহা হইল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি লইয়া বানূ সুলায়ম ও গাতাফানের কুদর নামক স্থানে সমবেত হওয়া। এই সংবাদের ভিত্তিতে তাহাদের হামলার পূর্বেই হামলা করিয়া তাহাদিগকে সূচনাতেই দমাইয়া দিবার পরিকল্পনা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) গাযওয়া বানূ সুলায়মের কর্মসূচী হাতে নেন (দ্র. ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ১৮২; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরও দ্র. আর-রাহীক, পৃ. ২৬০; আত-তাবাকাত, পৃ. ২৬৫; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৪১৪)।

ঘটনাস্থল

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে গাযওয়া বানূ সুলায়ম সংঘটিত হইয়াছিল মদীনার পূর্ববর্তী অঞ্চলসমূহের অন্তর্গত বানূ সুলায়ম এলাকার কুদর নামক একটি স্থানে। কুদ্‌র الكدر-(ك বর্ণটি পেশবিশিষ্ট) প্রকৃতপক্ষে ধূসর রঙের একটি পাখি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বানূ সুলায়ম গোত্রের একটি রূপকে বুঝানো হইয়াছে। মক্কা হইতে সিরিয়া যাওয়ার বাণিজ্যিক পথে উহা অবস্থিত (দ্র. আর-রাহীক, পৃ. ২৩৮)। স্থানটিকে কুদ্‌র বলা হয় এইজন্য যে, কথিত আছে, ঐস্থানে

ঐ পাখির বাস ছিল, সেই নামেই স্থানটির নামকরণ করা হইয়াছে (দ্র. মুহাম্মাদ আলী, সীরাতে মুহাম্মাদীয়া)।

ইহা ছাড়া নির্ভরযোগ্য অন্যান্য সব বর্ণনার মধ্যে ঘটনাস্থলের নাম কারকারাতুল কুদ্‌র বা কারারাতুল কুদ্‌র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারকারাতুল কুদ্‌র-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ওয়াকিদী বলেন, উহা মা'দানে বানূ সুলায়ম (معدن بنى سليم)-এর দিকের আরহাদিয়া (ارحضية) নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি স্থান, মদীনা এবং উহার মধ্যে প্রায় ৯৬ মাইলের দূরত্ব ثمانية برد (দ্র. ইমাম শিহাবুদ্দীন, মু'জামুল বুলদান, ৫খ, ৪৪২)। কেহ কেহ উহাকে বীরে মা'উনা بئر معونة -এর নিকটবর্তী স্থান বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৪৪)।

গাযওয়ার বিবরণ

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরই রাসূলুল্লাহ (স)- এর মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর মাত্র সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় সংবাদ আসিল যে, বানূ সুলায়ম এবং গাতাফান গোত্র মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা লইয়া কুদ্‌র নামক স্থানে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের ষড়যন্ত্রকে সূচনাতেই প্রতিহত করিবার নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (স) দুই শত সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া মদীনা হইতে বানূ সুলায়ম অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় তিনি মদীনার দায়িত্বে সিবা ইব্‌ন উরফুতা (রা), মতান্তরে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে রাখিয়া যান। কাহারো মতে সিবা ইব্‌ন উরফুতা (রা)-কে রাষ্ট্রের সাধারণ কাজের এবং ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে ইমামতির দায়িত্বে রাখিয়া যান (দ্র. মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ২২১; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরও দ্র. কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮৪; আত-তারীখুল ইসলামী, ২খ., পৃ. ২২৮ প্রভৃতি)। এই অভিযানে হযরত 'আলী (রা)-এর হস্তে পতাকা ছিল এবং পতাকার রং ছিল সাদা (দ্র. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), আল-মাওয়াহিব-এর উর্দূ অনুবাদ)।

যাত্রার এক পর্যায়ে তিনি বানূ সুলায়মের কুদ্‌র নামক স্থানে পৌঁছিলেন। স্থানটি একটি সমতল ভূমি। ওয়াকিদী বলেন, তথায় রাসূলুল্লাহ (স) উটের এবং উট চলাচলের চিহ্ন পাইলেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে কাহাকেও পাইলেন না (দ্র. মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮২)। মাহমূদ শাকির বলেন, শত্রুরা অতর্কিত হামলা বুঝিতে পারিয়া পালাইয়া গেল। কারণ তাহারা এই আকস্মিক হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যাইবার সময় তাহারা উপত্যকার মাঝে ৫০০ উট রাখিয়া যায় যাহা রাসূলুল্লাহ (স) গনীমত হিসাবে লাভ করেন (দ্র. আত-তারীখুল ইসলামী, ২খ, ২১৮)। অপর বর্ণনায় ইব্‌ন খালদূন তাঁহার তারীখে বলেন, বানূ সুলায়মের লোকজনকে ঘটনাস্থলে না পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-লায়ছীর নেতৃত্বে একটি সারিয়্যা পাঠান। উক্ত সারিয়্যা শত্রুদের পরিত্যক্ত বহু সংখ্যক উট গনীমত হিসাবে লাভ করিয়া লইয়া আসে। ঐ

গনীমতের মালের মধ্যে ইয়াসার নামক একটি গোলামও ছিল (দ্র. ইব্ন খালদূন, আত-তারীখ, ২খ., পৃ. ২২)।

ইব্ন সা'দ এবং ওয়াকিদীর বর্ণনায় গনীমত লাভের প্রসঙ্গটি এইভাবে বলা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (স) ঘটনাস্থলে পৌছিয়া কাহাকেও পাইলেন না তখন তাঁহার কয়েকজন সাহাবীকে উপত্যকার উর্ধ্ব দিকে পাঠাইলেন এবং তিনি স্বয়ং তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপত্যকার মধ্যভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেখানে তিনি কতিপয় রাখালকে পাইলেন যাহাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ছিল ইয়াসার। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইয়াসার বলিল, তাহাদের সম্পর্কে আমার জানা নাই, আমরা উট চরানোর জন্য বিদেশী রাখাল মাত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উটগুলি গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন (দ্র. আত-তাবাকাত, মাগাযী, প্রাগুক্ত)।

অধিকাংশ সীরাতের কিতাবে এই অভিযানে কোন রূপ যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার কথা বলা হইলেও ইব্নুল আছীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কুদর নামক স্থানে পৌছিয়া গালিব ইব্ন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যে সারিয়্যাটি বানূ সুলায়ম ও গাতাফানের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাহাতে তিনজন মুসলমান শহীদ হন (দ্র. আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., পৃ. ৩৫)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বানূ সুলায়মে তিন দিন অবস্থান করিলেন, কাহারও মতে দশ দিন (দ্র. সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৪২)।

অতঃপর তিনি গনীমতের মালসহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। যখন তিনি মদীনা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী সিরার (صرار) নামক স্থানে পৌছিলেন তখন গনীমতের মাল বন্টন করিয়া দিলেন। ইব্ন সা'দ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স) সিরার নামক স্থানে পৌছিলেন তখন সৈন্যরা বলিলেন যে, এই উটগুলি একসাথে চালাইয়া যাওয়া আমাদের জন্য খুব কঠিন হইতেছে। যদি প্রত্যেকের অংশ হিসাবমত তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা চালাইয়া যাওয়া সকলের জন্য সহজ হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক-পঞ্চমাংশ বাহির করিয়া লইয়া বাকী চার-পঞ্চমাংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া উট পাইয়াছিলেন। যেহেতু মোট উটের সংখ্যা ছিল পাঁচ শত। ওয়াকিদীর বর্ণনায় উটের সংখ্যা অনেক বেশী। তাঁহার বর্ণনামতে প্রত্যেক ব্যক্তি ৭টি করিয়া উট পাইয়াছিল (দ্র. আল-মাগাযী, খ., পৃ. ১৮৩)। গনীমতের মধ্যে ইয়াসার নামক যে গোলামটি ছিল সে নামাযী হওয়ায় সাহাবীরা তাহাকে নবী কারীম (স) কর্তৃক গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন (দ্র. আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৬৬)। অবশেষে মদীনা হইতে বাহির হইবার পর পনের দিন অতিবাহিত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

গাযওয়া বানূ সুলায়ম সম্পর্কে প্রায় সকল ঐতিহাসিক উপরিউক্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাতে গাযওয়া বানূ সুলায়ম শিরোনামে যে ঘটনার বিবরণ উল্লেখ

করিয়াছেন তাহা উপরিউক্ত গাযওয়া বানূ সুলায়মের ঘটনার বিবরণ নয়, বরং তাঁহার "গাযওয়া বানূ সুলায়ম" শিরোনামে বর্ণিত ঘটনাটি অন্যান্য ঐতিহাসিক "গাযওয়া বুহরান" শিরোনামে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা একটি ভিন্ন গাযওয়া এবং তাহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ১২তম গাযওয়া (দ্র. রাসূল মুহাম্মদ (স)- এর সরকার কাঠামো, পৃ. ১৫৩)। অর্থাৎ ইব্ন সা'দ "গাযওয়া বানূ সুলায়ম" শিরোনাম দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গায্ওয়া বানূ সুলায়ম ২৪ জুমাদাল উলা "বুহরান" নামক স্থানে সংঘটিত হয়। ইহার কারণ এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত স্থানে সুলায়ম গোত্রের লোকদের একত্র হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন। ফলে তিনি তিন শত সৈন্য লইয়া ইব্ন উম্মে মাকতূম (র)-কে প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া মদীনা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন (দ্র. ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৫)। অপরদিকে অন্যান্য ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী, "গাযওয়া বানূ সুলায়ম" শিরোনামের বক্ষমাণ আলোচনাকে ইব্ন সা'দ "গাযওয়া কারকারাতিল কুদ্র" নামে আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩১)।

এমতাবস্থায় উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, গাযওয়া বানূ সুলায়ম সম্পর্কে প্রায় সকল ঐতিহাসিক উপরিউক্ত বর্ণনা দিলেও ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাতে গাযওয়া বানূ সুলায়ম শিরোনামে যে গাযওয়ার বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনার বিবরণ। অর্থাৎ তিনি গাযওয়া বানূ সুলায়মের বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহা ২৪ জুমাদাল উলা বুহরান নামক স্থানে সংঘটিত হয়। ইব্ন সা'দ বর্ণিত গাযওয়া বানূ সুলায়ম-এর এই বর্ণনা অন্যান্য সীরাতের কিতাবে "গাযওয়া বুহরান" শিরোনামে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণিত গাযওয়া বানূ সুলায়ম এবং ইব্ন সা'দের বর্ণিত গায্ওয়া বানূ সুলায়ম একই নামের হইলেও মূলত পৃথক দুইটি গাযওয়া, দুইটি পৃথক স্থানে সংঘটিত হওয়ার কারণে কেহ গাযওয়ার নামকরণে স্থানের নামের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। এই হিসাবে গাযওয়া দুইটির শিরোনামে ভিন্নতা সাধিত হইয়াছে। যথা গাযওয়া কারকারাতিল কুদ্র এবং গাযওয়া বুহরান। কিন্তু স্থান দুইটি একই অঞ্চল অর্থাৎ বানূ সুলায়ম অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এতদুভয়ের নামকরণে অঞ্চলের নামের অনুসরণ করাতেও কোন ত্রুটি নাই বিধায় উভয় গাযওয়াই গাযওয়া বানূ সুলায়ম শিরোনামে আখ্যায়িত হইতে পারে। এইজন্যই ঐতিহাসিক ভেদে উভয় গাযওয়াই গাযওয়া বানূ সুলায়ম নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। তবে এই কথা সত্য যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে গাযওয়া কুদ্র বা গাযওয়া কারকারাতুল কুদ্রই গাযওয়া বানূ সুলায়ম নামে প্রসিদ্ধ।

গাযওয়ার ফলাফল

গাযওয়া বানূ সুলায়ম রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাযওয়াসমূহের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের একটি গাযওয়া। এই গাযওয়ায় পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসলমান এবং কাফির সৈন্যদের

মাঝে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। কেবল গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পাঠানো সারিয়ার ব্যাপারে কিছুটা সংঘর্ষের কথা জানা যায়। তাহারা পালাইয়া যাওয়ায় মুসলিমগণ বিপুল পরিমাণে গনীমত পাইয়া আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হন। তাহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)- এর আক্রমণাত্মক পদক্ষেপে মদীনা দুশমনদের হাত হইতে রক্ষা পায়। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই আকস্মিক হামলায় কাফিররা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও বদর যুদ্ধের কারণে তাহাদের অন্তরে যে জ্বালা আরম্ভ হইয়াছিল উহা প্রশমিত হইতে পারে নাই,বরং সেই সঞ্চিত জ্বালারই প্রকাশ পরবর্তীতে বহু যুদ্ধে ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্‌নুল আছীর, আল- কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ২খ., পৃ. ৩৫; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত- তাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত, তা, বি, ২খ.; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, তা.বি, ২খ.; (৪) ঐ লেখক, আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, ৭ম সং, বৈরূত ১৪১৬/১৯৯৬, ২খ.; (৫) ইব্‌ন খালদূন, আত-তারীখ, বৈরূত, তা. বি, ২খ.; (৬) মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, বৈরূত, ৭ সং ১৪১১/১৯১১, ২খ.; (৭) মুহাম্মাদ আলী, সীরাতে মুহাম্মাদীয়া (উর্দূ অনু. আল- মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা), করাচী, ১খ.; (৮) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, লন্ডন, তা, বি, ১খ.; (৯) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত ১৪১৭/১৯৯৭; (১০) মুহাম্মাদ সফিউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, বৈরূত ১৪১/১৯৯৭; (১১) ডাঃ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর সরকার কাঠামো, অনু. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইয়া, ই. ফা. বা., ঢাকা; (১২) ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, তা. বি, ১খ., ও ৫খ.।

খান মুহাম্মদ ইলিয়াস

গাযওয়া আস-সাবীক

নামকরণ ঃ সাবীক অর্থ ছাতু। আবূ সুফয়ান ও তাহার অনুচরগণ যে সকল রসদপত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহার অধিকাংশই ছিল ছাতু। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুজাহিদদের আগমনবার্তা শ্রবণে দ্রুত পলায়ন করার সুবিধার্থে বোঝা হাল্‌কা করা এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাহারা তাহাদের ছাতুর বস্তা ফেলিয়া যায়। মুসলমানরা শত্রুদিগকে না পাইয়া ঐ ছাতু নিজেদের অধিকারে আনেন। এই কারণেই এই যুদ্ধ ইতিহাসে গাযওয়া সাবীক বা ছাতু যুদ্ধ নামে অভিহিত (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩০৪; ইব্‌ন খালদূন, ২খ., পৃ. ২২; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ১৮১-১৮২; ইব্‌নুল আছীর, ২খ., পৃ. ৩৯; ইব্‌ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩৪৪; তাবারী ১খ., পৃ. ৩০০; ইব্‌ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক আখতার ফারুক, ২খ., পৃ. ১৭৫; আব্‌দুর রউফ দানাপূরী, পৃ. ৯৯)।

কাল ঃ বদর যুদ্ধের দুই মাস পর হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের যিলহজ্জ, মতান্তরে যিলকা'দ মাসের পাঁচ তারিখ রবিবার এই অভিযান পরিচালিত হয় (ইব্ন সা'দ, উর্দু তরজমা আবদুল্লাহ্ আল-বাদী, ১খ., পৃ. ৩৩০; মুহাম্মাদ ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা; ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮১)। কাহারো মতে এই যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল (তাবারী, ১খ., পৃ. ৩০০)।

বদর যুদ্ধের পর মুসলমানগণ তাহাদের শক্তিকে আরও কিছুটা সুসংহত করার সুযোগ পায়। তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর আবূ সুফয়ান মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একের পর এক পরিকল্পনা করিতে থাকে। মক্কায় আরবদের মধ্যে সে এই প্রচারণা করিতেছিল যে, কুরায়শগণ সারা আরবদেশে এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহারা এখন যে কোন যুদ্ধে জয়ী হইতে সক্ষম।

এমতাবস্থায় একদা আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিন্তে 'উতবা বদর যুদ্ধে স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া আবূ সুফয়ানের নিকট গিয়া হযরত হাম্যা ও হযরত আলী (রা)-কে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল। তখন আবূ সুফয়ান কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল যে, বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে স্ত্রী স্পর্শ ও খোশবু ব্যবহার করিবে না। আবূ সুফয়ান এই বলিয়া মানত করিল যে, মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সে নাপাকির গোসলে মাথায় পানি ব্যবহার করিবে না

মক্কা হইতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে আবূ সুফ্য়ান কুরায়শদের উত্তেজিত করার জন্য কিছু কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল ঃ

(١) كروا على يثرب وجمعهم - فإن ما جمعوا لكم نفل
(٢) إن يك يوم القليب كان لهم - فان ما بعده لكم دول
(٣) اليت لا اقرب النساء ولا - يمس رأسي وجلدي المسل
(٤) حتى تبيروا قبائل الأوس وال - خزرج ان الفؤاد يشتعل.

১। মদীনায় উহাদের (শত্রুদের) আক্রমণ কর, উহারা যে সম্পদ লইয়া গিয়াছে তাহা তোমাদের প্রাপ্য।

২। বদরের যুদ্ধে যদিও তাহাদের জয় হইয়াছে, ভবিষ্যতে তোমাদের সকল সম্পদ ফিরিয়া আসিবে।

৩। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, স্ত্রী সহবাস করিব না এবং গোসল করিব না।

৪। যতক্ষণ পর্যন্ত আওস এবং খাযরাজ তোমাদের হাতে ধ্বংস না হয়, প্রতিশোধের জন্য আমার প্রাণ জ্বলে (তাবারী, ১খ., পৃ. ৩০০; ইব্নুল আছীর, ২খ., পৃ. ৩৬; ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩৪৪)।

অতএব সে তাহার শপথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অদম্য শোণিত পিপাসা লইয়া কুরায়শদের দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইল। তাহারা নজদের পথ ধরিয়া একটি নহরের উপরি অংশে ছাবীর পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করিল। আবূ সুফয়ান কুরায়শদের অশ্বারোহী দলকে সেখানে রাখিয়া গভীর রজনীতে বানূ নাযীরের নিকট পৌঁছিল এবং হুয়ায়্যি ইব্ন আখতাবের ঘরে আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। কিন্তু সে ভয় পাইয়া দরজা খুলিতে অস্বীকার করিল। তখন আবূ সুফ্য়ান সেখান হইতে ফিরিয়া সাল্লাম ইব্ন মিশকামের বাড়ী পৌঁছিল। সে ঐ সময় বানূ নযীরের নেতা ও সঞ্চয় তহবীলের সংরক্ষক ছিল। আবূ সুফ্য়ান নিকটে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিবা মাত্রই সে অনুমতি দিল এবং যত্নের সহিত আপ্যায়ন করিল আর মুসলমান ও মদীনার গোপন তথ্যাদি জানাইয়া দিল। তারপর আবূ সুফ্য়ান রাতের শেষাংশে সঙ্গীদের কাছে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুরায়শদের কতক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদীনার সীমান্তে উরায়েয নামক স্থানে পৌঁছিয়া সেখানকার দুইটি বাড়ী এবং একটি খেজুর বাগানে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সেখানে তাহাদের সঙ্গে দুইজন মুসলমানের সাক্ষাত হয়। তাহাদের একজন ছিলেন আনসারী যাহার নাম সা'দ ইব্ন আমর। কাহারো কাহারো মতে আনসারীর নাম ছিল মা'বাদ ইব্ন আমর আর অন্যজন ছিল তাহারই মিত্র। কুরায়শরা তাহাদের উভয়কে হত্যা করিল (ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩০৪, ৩০৫; ইব্ন সাদ, উর্দু তরজমা আবদুল্লাহ্ আল-ই মাদী ১খ., পৃ. ৩৩০; তাবারী, ১খ., পৃ. ২৯৯; ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ১৮১)।

এই ঘটনায় আবূ সুফ্য়ান ইহা ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিল যে, সে বদরের যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়ার যে শপথ করিয়াছিল তাহা বাস্তবায়িত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনে এই আশংকাও ছিল যে, মুসলমানরা তাহার পিছু ধাওয়া করিতে পারেন।

এদিকে এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স) দুই শত আনসার ও মুহাজিরের একটি বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন। মদীনার শাসনভার বাশীর ইব্ন আবদুল মুনযির ওরফে আবূ লুবাবা (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিলেন (সুহায়লী, ৫খ., পৃ. ৩৯০)।

মুহাম্মাদ (স)-এর অভিযানের কথা জানিতে পারিয়া শত্রুরা ভয়ে কম্পিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিল। রসদ হিসাবে তাহাদের সঙ্গে বহু ছাতুর বস্তা ছিল, দ্রুত পালাইবার উদ্দেশ্যে সেগুলি ফেলিয়া যায়।

মহানবী (স) "কারকারাতুল কুদর" নামক স্থান পর্যন্ত আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শত্রুরা নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি মুজাহিদ বাহিনী লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন (ইব্ন ইসহাক, সীরাত, বঙ্গানুবাদ ঃ শহীদ আখন্দ, ৩খ., পৃ. ২১৭)।

আবূ সুফ্য়ানের এই ব্যর্থ অভিযান এবং পালাইয়া যাওয়ার খবর আরবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু মদীনা হইতে দূরে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলির মধ্যে এসকল ঘটনার

তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। তাহারা মহানবী (স) ও তাঁহার অনুসারীদের এই সকল তৎপরতার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করিত না।

এই সময় আবূ সুফ্য়ানের প্ররোচনায় বানূ গাতাফান ও বানূ সুলায়ম গোত্রের ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিপক্ষে শত্রুতামূলক আচরণ আরম্ভ করে।

মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, এই অভিযানটি জিহাদ হিসাবে গণ্য হইবে? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ (ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩৪৪; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩০৫; সুহায়লী, ৫খ., পৃ. ৩৯০)।

মক্কায় ফিরিয়া যাওয়ার পর আবূ সুফ্য়ান সাল্লাম ইব্ন মিশকামের অতিথিপরায়ণতা সম্পর্কে বলে ঃ

(١) وإنى تخيرت المدينة واحدا - لحلف فلم اندم ولم أتلوم

(٢) سقانى فروانى كميتا مدامت - على عجل منى سلام بن مشكم.

(১) "আমি মদীনায় মিত্রতার জন্য এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছি, ইহাতে আমি লজ্জিত ও নিন্দিত হই নাই"। (২) "সাল্লাম ইব্ন মিশকাম আমাকে লাল ও কাল মদ পান করাইয়াছে অথচ তখন আমার তাড়াহুড়া ছিল"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, দারুল-কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, বৈরূত ১৯৮৭; (২) আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কালাম, বৈরূত তা.বি.; (৩) ইব্ন খালদূন, তারীখে ইব্ন খালদূন, বৈরূত ১৯৭৯; (৪) ইব্ন কাছীর, আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৬৬; (৫) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭২; (৬) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, দারুল-মা'আরিফ, প্রথম সংস্করণ; (৭) ইব্ন কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, দারুল কালাম, প্রথম সংস্করণ; (৮) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল-কুতুব, ১৯৮৪; (৯) ইব্ন ইস্হাক, সীরাতু রাসূলিল্লাহ, দারুল-কালাম; (১০) সুহায়লী আর-রাওদুল উনুফ; (১১) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস-সিয়ার, দেওবন্দ; (১২) মওলানা ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল-মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ.।

ড. মোঃ শামছুল হক ছিদ্দিকী

গাযওয়া বানূ কায়নুকা‘

বানূ কায়নুকা‘ (بنو قينقاع) ইয়াছরিব-এর একটি ইয়াহূদী গোত্রের নাম। কায়নুকা‘ শব্দটি আরবী নামের সহিত সংগতিপূর্ণ নয়, বরং তাহা আরবী শব্দ গঠনরূপ হইতে কিছুটা ব্যতিক্রম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিব্রু ভাষার সহিতও ইহার সাদৃশ্য নাই। যদিও বানূ কায়নুকা‘ ছিল হিব্রু বংশোদ্ভূত। এই গোত্রের নামে মদীনায় একটি বাজার ছিল যাহা বানূ কায়নুকা‘ বাজার (سوق بنى قينقاع) নামে পরিচিত। তাহারা ছিল মদীনার খাযরাজ গোত্রের মাওলা (আশ্রিত) এবং উবাদা ইব্‌নুস সামিত ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন সালূল-এর হালীফ (মিত্র)।

আরবের ইয়াহূদীদের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। তাহাদের কোন গ্রন্থ কিংবা শিলালিপিও পাওয়া যায় না, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভব। হিজাযের বাহিরের কোন ইয়াহূদী ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত কিংবা গ্রন্থ প্রণেতা আরবের ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই। কারণ এখানকার ইয়াহূদীগণ আরব উপদ্বীপে আগমনের পর তাহাদের স্বজাতি অন্যান্য গোত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে দুনিয়ার অন্যান্য ইয়াহূদীরা তাহাদেরকে নিজেদের স্বজাতিও সমাজের লোক বলিয়া মনেই করিত না। কেননা তাহারা হিব্রু (ইবরীয়) সভ্যতা, ভাষা, এমনকি নামকরণও পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষেত্রে আরবতন্ত্র গ্রহণ করে। হিজাযে প্রাপ্ত শিলালিপি কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে আরবেই য়াহূদীদের নাম চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং তাহাদের এখানে আগমন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের অধিকাংশই ইয়াহূদীগণ কর্তৃক মৌখিকভাবে শ্রুত ও সংরক্ষিত (ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা, পৃ. ১২)। এইসব বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

ক. হিজাযের ইয়াহূদীগণ দাবি করিত যে, তাহারা সর্বপ্রথম হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর জীবদ্দশার শেষ অধ্যায়ে এখানে আগমন করে। মূসা (আ) ফিরআওনের উপর বিজয় লাভ করার পর স্বীয় অনুসারীদের সমন্বয়ে কিন‘আনীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। তাহারা সিরিয়ায় আসিয়া এখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করিয়া দেয়। অতঃপর মূসা (আ) ‘আমালিকাদেরকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে হিজাযে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণকারী ব্যতীত বানূ আমালিকার সর্বশেষ ব্যক্তিটিকেও যেন হত্যা করা হয়। বানূ ইসরাঈলের এই বাহিনী হিজাযে আসিয়া মূসা (আ)-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে, এমনকি তাহাদের সম্রাট আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকামকেও হত্যা করে। কিন্তু তাহারা সম্রাটের একটি অত্যন্ত সুশ্রী সুদর্শন সন্তানকে হত্যা না করিয়া

তাহাকে বন্দী করিয়া ফিলিস্তীনে লইয়া যায়। ইতোমধ্যে মূসা (আ) ইন্তিকাল করেন। এই বাহিনী ফিলিস্তীনে ফিরিয়া আসিয়া মূসা (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত বানূ ইসরাঈলের নিকট অভিযানের বিশদ বিবরণ দেয়। ইহাতে বানূ ইসরাঈল তাহাদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং নবীর নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদেরকে ফিলিস্তীন হইতে বহিষ্কার করে। ফলে তাহারা হিজাযে আগমন করিয়া ইয়াছরিব অঞ্চলে বসবাস শুরু করে (আহমাদ ইবরাহীম আশ-শারীফ, মক্কাঃ ওয়াল্-মাদীনাঃ ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া 'আহ্দ আর-রাসূল, পৃ. ৩২৮-২৯; আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, ১৯খ., পৃ. ৯৪; ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, ৫খ., পৃ. ৮৪)। এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া হিজাযের ইয়াহূদীগণ দাবি করিত যে, তাহারা খৃষ্টপূর্ব চার শত বৎসর হইতে এইখানে বসবাস করিয়া আসিতেছে।

খ. ইয়াহূদীদের হিজায অঞ্চলে আগমন সম্পর্কিত অপর একটি বর্ণনা হইল— খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে ব্যাবিলনের সম্রাট বাখ্ত নসর বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করিয়া অনেক ইয়াহূদীকে হত্যা করে এবং অবশিষ্টদেরকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করে। ফলে অনেক ইয়াহূদী গোত্র হিজাযের ওয়াদী আল-কুরা, তায়মা, ইয়াছরিব, আয়লা, মাক্না, ফাদাক, তাবূক, খায়বার প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া পুনর্বাসিত হয়। আগত এইসব ইয়াহূদী স্থানীয় জুরহুম ও 'আমালিকাদের সাথে মিশিয়া যায়। ক্রমে ইয়াহূদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তীতে তাহারা এই দুই গোত্রকে ইয়াছরিব হইতে বহিষ্কার করিয়া মদীনায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে (আবুল হাসান আল-বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান, পৃ. ২৫)।

গ. তালমুদের বর্ণনানুযায়ী খৃস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আরবের উত্তরাঞ্চলে ইয়াহূদী বসতি ছিল। তায়মা, হিজর, খায়বার, ওয়াদী আল-কুরা, ফাদাক, মাক্না প্রভৃতি মরূদ্যানে বসবাসরত ইয়াহূদীদের সাথে মদীনাবাসী ইয়াহূদীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এইসব মরূদ্যানে তাহারা কৃষি পণ্য উৎপন্ন করিত। সম্ভবত তাহাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন বসতিগুলি সন্নিবেশিত হইয়া একটি নগরীতে পরিণত হয়। ইয়াছরিব-এর আরামী এ্যারামীয় নাম Minta (এলাকাভুক্ত ক্ষেত্র) হইতে এই মতের সত্যতা পাওয়া যায়। সাহাবী কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কবিতা হইতে জানা যায়, ইয়াহূদীগণ ইয়াছরিবে অসংখ্য দুর্গ নির্মাণ করে (হাস্সান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান, ২খ., পৃ. ৬৩)। হাররা অঞ্চলে প্রাপ্ত কারখানা ও নালা-নর্দমার ধ্বংসাবশেষ এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, এই অঞ্চলে ইয়াহূদী আওস গোত্রের সুসভ্য জাতি অবস্থান করিত (আহমাদ ইব্রাহীম আশ-শারীফ, মাক্কাঃ ওয়াল-মাদীনাঃ ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া 'আহ্দ আর-রাসূল, পৃ. ৩১২)।

ঘ. ইয়াহূদীদের ইয়াছরিব আগমন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, ৭০ খৃস্টাব্দে রোমকগণ ফিলিস্তীনে ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করিতে এবং তাহাদেরকে দেশান্তরিত করিতে শুরু করে এবং ১৩২ খৃস্টাব্দে তাহাদেরকে এই ভূখণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে।

ফলে এই সময়ের মধ্যে অনেক ইয়াহূদী গোত্র ফিলিস্তীন হইতে দক্ষিণে নিকটবর্তী হিজায অঞ্চলে আসিয়া শস্য-শ্যামল এলাকায় আশ্রয় নেয়। এই স্থানে আসিয়া তাহারা 'আয়লা, মাক্না, তাবুক, তায়মা, ওয়াদী আল-কুরা, ফাদাক, খায়বার প্রভৃতি অঞ্চলের উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বানূ কুরায়যা, বানূ নাদীর ও বানূ কায়নুকা' প্রভৃতি গোত্র এই সময় ইয়াছরিব আগমন করে (ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, পৃ. ১৪)। ক্রমে তাহারা কথা-বার্তা চাল-চলন, আচার-আচরণ এবং জীবনাচারে 'আরব বংশোদ্ভূতদের মত হইয়া যায় এবং আরবদের সাথে বিবাহ্-শাদী ও সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে, এমনকি অনেক ইয়াহূদী হিব্রু নামের পরিবর্তে 'আরবী নাম গ্রহণ করে। তাহাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্যরা হিব্রু ভাষা জানিত না। এতদসত্ত্বেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'আরবদের মাঝে বিলীন হইয়া যায় নাই। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহারা ইয়াহূদীদের আত্মাভিমানকে অক্ষুণ্ন রাখে। মূলত আরবদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাব-স্থানের জন্যই তাহারা বাহ্যত আরবত্ব গ্রহণ করে। মদীনায় বসবাসকারী এইসব ইয়াহূদী 'আরবীয় ভাবধারা গ্রহণ করিলেও নিজেদেরকে ইসরাঈলী ও ইয়াহূদী ভাবিয়া তাহারা গর্ব করিত, আর আরবদেরকে মনে করিত উম্মী (নিরক্ষর/ বেদুঈন)। ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা গোত্রের যেই সকল ব্যক্তিবাচক নাম পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই আরবী। কিন্তু এইগুলি দ্বারা তাহাদের মূল বাইবেলীয় নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ছিলেন এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. ইতিহাসবিদ্ ইয়াকূত আল্-হামাবী বলেন, ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ তাওরাত গ্রন্থে মহানবী (স)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হয়। তাহারা জানিতে পারে যে, মহানবী (স) কংকরময় মরু অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে (بين الحرتين حرة واقم فى الشرق وحرة الوبرة فى الغرب) হিজরত করিবেন যেই স্থানে প্রচুর খেজুর বাগান বিদ্যমান। সুতরাং তাহারা কংকরময় মরু অঞ্চলের খোঁজে সিরিয়া হইতে বাহির হইয়া তায়শ্নামক স্থানে আসিয়া তাওরাতের বর্ণনার সাথে উক্ত স্থানের মিল দেখিতে পাইয়া এই স্থানে বসবাস করিতে শুরু করে। পরবর্তীতে তুব্বা জাতি ও বানূ আমর ইব্‌ন আতিক আসিয়া তাহাদের সংগে যোগ দেয় (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-বুলদান, ৫খ., পৃ. ৮৪)।

ইয়াহূদীগণ যখন ইয়াছরিবে আসিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিল তখন সেখানে অন্যান্য কয়েকটি আরব গোত্রও বাস করিত। ইয়াহূদীগণ তাহাদেরকে নিজেদের অধীনস্থ বানাইয়া লইয়াছিল। ৪৫০/৪৫১ খৃস্টাব্দে ইয়ামনে সংঘটিত মহাপ্লাবনে (আল-কুরআনের সূরা আস-সাবার দ্বিতীয় রুকূতে ইহার উল্লেখ আছে) সাবা জাতির বিভিন্ন গোত্র সেখান হইতে বাহির হইয়া আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। গাসসানীরা সিরিয়ায়, লাখমীরা হীরায় (ইরাকে), বানূ খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে এবং আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়াছরিবে বসবাস করিতে থাকে। ইয়াহূদীগণ যেহেতু পূর্ব হইতেই ইয়াছরিবে প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া

রাখিয়াছিল, সেই কারণে তাহারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ দিল না। ফলে এই দুই আরব গোত্র অনুর্বর ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই স্থানে তাহাদেরকে খুব কষ্ট করিয়া জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে মালিক ইব্ন 'আজলান নামক জনৈক গোত্রপতি ইয়াহূদী নেতা ফিতয়ূনকে হত্যা করিয়া সিরিয়া চলিয়া গেল এবং গাসসানী শাসক আবূ জুবায়লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফলে সিরিয়া হইতে একটি সৈন্যবাহিনী আসিয়া যুল-হারূদ নামক স্থানে এক ভোজসভায় সকল ইয়াহূদী নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করে। এইভাবে ইয়াছরিবে ইয়াহূদীদের শক্তি কিছুটা খর্ব হয় এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে ইয়াহূদী বানূ কুরায়যা ও বানূ নাদীর নগরীর বাহিরে যাইয়া বসবাস করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বানূ কায়নুকার সাথে বানূ কুরায়যা ও বানূ নাদীরের পূর্ব হইতেই মনোমালিন্য থাকায় তাহারা নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল। এইজন্য তাহাদিগকে খাযরাজ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, পৃ. ১৪-১৬)।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় ইয়াহূদী বানূ কায়নুকার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সচ্ছল। ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার সুসভ্য অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা এমন সব শিল্পে পারদর্শী ছিল যাহা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাহাদের কোন কৃষিভূমি ও ফলের বাগান ছিল না। এই গোত্রের অধিকাংশ লোক ছিল ব্যবসায়ী। তাহারা ছিল মদীনার ধনীক শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহারা পেশায় ছিল প্রধানত স্বর্ণকার। ইহা ছাড়াও তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য, লৌহজাত সামগ্রী ও তৈজসপত্র নির্মাণ শিল্পে দক্ষ ছিল। এই কারণে তাহাদের অধিকাংশ লোকই ছিল সশস্ত্র। আর্থিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্য প্রভৃতি কারণে মদীনার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনে তাহাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল বলিয়া এই গোত্র মদীনার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিত। ফলে মদীনার রাজনীতিতে এই গোত্রের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাহারা একদিকে সূদের উপর টাকা লগ্নি করিত, অপরদিকে ইয়াছরিবে বসবাসকারী গোত্রসমূহের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে বিবদমান গোত্রসমূহকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ঋণের দায়ে জর্জরিত করিয়া ফেলিত। এইভাবে তাহারা আরবদের উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলে আরবগণ সিরীয়দের সহযোগিতায় তাহাদের শক্তি খর্ব করে। ফলে তাহারা খাযরাজ গোত্রের আশ্রয়ে ইয়াছরিব নগরীর অভ্যন্তরে বসবাস করিতে থাকে। খাযরাজ গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহারা বুআছ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এইখানে বসবাসকারী অপর প্রধান দুই ইয়াহূদী গোত্র তথা বানূ কুরায়যা ও বানূ নাদীর-এর সাথে তাহাদের প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু হয়। বানূ কায়নুকা ইয়াছরিব নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মুসাল্লার নিকটবর্তী ওয়াদী বুতহান-এর উপরস্থিত সেতুর সন্নিকটে বাস করিত। সেই স্থানে তাহারা দুইটি সুরক্ষিত দুর্গের অধিকারী ছিল। ইব্ন খালদূন বলিয়াছেন, বানূ কায়নুকা মদীনার এক প্রান্তে বসবাস করিত।

মহানবী (স) ইয়াছরিব তথা মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলে ইয়াছরিবের ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। হিজরতের পর মহানবী (স) মদীনায় যেই সনদ জারী করেন তাহাতে মুসলিম সম্প্রদায় ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সুস্পষ্ট কতিপয় শর্ত ছিল যাহা মান্য করার স্বীকৃতি প্রদান করিয়া মদীনার ইয়াহূদীগণ তাহাতে স্বাক্ষর প্রদান করে। এই সনদ জারীর সময় ইহাতে যেই সব ইয়াহূদী গোত্রের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে বানূ কায়নুকার নাম উল্লেখ নাই। এই সনদে সকল গোত্র ও তাহাদের মিত্র শক্তিকে এবং যাহারা পরবর্তীতে সংযুক্ত হইবে তাহাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা হয়। সম্ভবত বানূ কায়নুকা' পরবর্তীতে এই সনদের সাথে সংযুক্ত থাকিবার কারণে তাহাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়। এই সনদ কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে মদীনার মুসলিম সম্প্রদায় ও ইয়াহূদীগণ একটি অভিন্ন উম্মাহ্ তথা জাতিরূপে অভিহিত হয়। এই সনদে এই উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ কলহ দেখা দিলে তাহা মীমাংসার দায়িত্ব মহানবী (স)-এর উপর অর্পণ করা হয়। এই সনদে আরো নিশ্চিত করা হয় যে, মদীনার মুসলিম সম্প্রদায় বহিঃ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে মুসলিম ও ইয়াহূদী উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করিবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষ স্ব স্ব ব্যয়ভার বহন করিবে (দ্র. ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ১১৯-১২৩)।

রামাদান ২ হি./মার্চ ৬২৪ সালে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা মহানবী (স), ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ শুরু করে। ইহার মূলে প্রধান কারণ ছিল চারটি ঃ

এক ঃ মহানবী (স)-এর দাওয়াতের বিশ্বজনীন আবেদন তাহাদের বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ধারাকে তৃণ খণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার নবুওয়াতের আওতা ও পরিধি সুপ্রশস্ত হইতেছিল। ইহাতে ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা'র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সংকোচন পরিলক্ষিত হইতেছিল।

দুই ঃ ইয়াহূদী বানূ কায়নুকাসহ অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্র এতদিন বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে মদীনায় যেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ ভোগ করিয়া আসিতেছিল মদীনা সনদের মাধ্যমে ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তাহাদের সেই সুবিধাসমূহ চিরতরে তিরোহিত হওয়ার উপক্রম হইল।

তিন ঃ ইসলামে আয়-উপার্জন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক লেনদেন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সূদ ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার ফলে ইয়াহূদী বানূ কায়নুকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় সুনিশ্চিত হইয়া পড়িল।

চার ঃ ইয়াহূদীদের কিবলা হইল বায়তুল মুকাদ্দাস, যাহা ২ হিজরী সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিমদেরও কিবলা ছিল। মহানবী (স)-এর মদীনা হিজরতের ১৬/১৭ মাস পর মুসলমানদের

কিবলা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পরিবর্তিত হইলে ইয়াহূদীরা রুষ্ট হয় এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করিতে থাকে।

উপরোল্লিখিত কারণে ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা মহানবী (স), ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করাকে নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করে। তাহারা একদিকে মুসলিমদের দৈহিকভাবে অপদস্থ করার পথ বাছিয়া লয়, অপরদিকে সরলপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির মানসে বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা চালাইতে থাকে। সমাজে অশান্তি ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাহারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যি প্রমুখ মুনাফিকের সহিত হাত মিলায়। মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য তাহারা নানা অপকৌশল অবলম্বন করে। ইয়াহূদীদের এইসব অপতৎপরতা ছিল ইতোপূর্বে সম্পাদিত মদীনা সনদের সুস্পষ্ট লংঘন।

মুসলমান ও কুরায়শদের মধ্যে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর মুসলমান মদীনায় ইয়াহূদীদের মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের কারণে ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে শুরু করে। ক্রমে তাহাদের এই মনোভাব প্রকাশ্য বৈরিতার রূপ নেয়। আল-ওয়াকিদী বলেন, ইয়াহূদীরা বিদ্রোহ করিল এবং তাহাদের ও মহানবী (স)-এর মধ্যে বিদ্যমান চুক্তি ভংগ করিল (আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৭৬)। আর এই বৈরী মনোভাব প্রকাশ্য রূপ লাভের পিছনে কতিপয় ঘটনা ক্রিয়াশীল ছিল। ঘটনাগুলি হইল ঃ

১। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা হযরত আবূ আওন সূত্রে বর্ণনা করেন। আবূ আওন বলেন, বানূ কায়নুকার ঘটনাটি ছিল এই, জনৈকা আরব মহিলা (তিনি জনৈক আনসারীর স্ত্রী) তাহার অলংকার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বানূ কায়নুকার বাজারে উপস্থিত হন এবং জনৈক স্বর্ণকারের নিকট গিয়া বসেন। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাকবুল আল্-বালাযুরী নামক জনৈকা মুসলিম মহিলা বানূ কায়নুকার জনৈক ইয়াহূদী স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণালংকার তৈয়ারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। আবার কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে, জনৈকা আরব মহিলা দুধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গমন করেন (ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৬)। এই স্থানে শব্দগত পার্থক্যের কারণে অর্থগত পার্থক্য সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শব্দটি মূলত حلية (অলংকার), حلبة (দুধ) নয়। মুদ্রণজনিত (نساخ) ভুলের কারণে এই পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

স্বর্ণকার লোকটি মহিলাটির মুখের নেকাব খুলিয়া তাহার চেহারা দেখিতে চায়। কিন্তু মহিলাটি তাহাতে সম্মত হন নাই। লোকটি কৌশলে মহিলার কাপড়ের একটি অংশ পিছনের একটি আংটার সাথে বাঁধিয়া দেয়। আল-ওয়াকিদীর মতে, অপর এক ইয়াহূদী আসিয়া মহিলার

পিছনে বসে, যাহা মহিলাটি জানিত না। সে মহিলার কাপড়ের একটি অংশ পিছনের একটি আংটার সাথে বাঁধিয়া দেয় (আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৭৬)। মহিলাটি বসা হইতে উঠিতে গেলে তাহার কাপড় খুলিয়া যায়। ইহাতে তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য অংগ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে স্বর্ণকারসহ উপস্থিত অন্যান্য ইয়াহূদীরা আট্টহাসিতে মাতিয়া উঠে। এই সময় মহিলাটি চিৎকার দিয়া উঠিলে একজন মুসলিম তাহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসেন এবং স্বর্ণকারের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। যেহেতু নিহত লোকটি ছিল ইয়াহূদী তাই অন্যান্য ইয়াহূদীরা উক্ত মুসলমানের উপর আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করে। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে এবং অন্যান্য মুসলিমদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে ইয়াহূদীদের উপর আক্রমণ করিবার জন্য আহবান জানায়। এইভাবে মদীনার মুসলিম সম্প্রদায় ও ইয়াহূদী বানূ কায়নুকার মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৪৮)। এই ঘটনার মাধ্যমে মদীনা সনদের ধারা লংঘিত হয় এবং প্রকারান্তরে কৃত চুক্তি ভংগ হইয়া যায়। ইতিহাসবিদ্ ইব্ন ইসহাক, ইব্ন সা'দ এবং ইব্ন জারীর আত-তাবারী প্রমুখ তাঁহাদের গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করেন নাই। অপর দিকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মহিলা নিহত ইয়াহূদী এবং শহীদ মুসলিম লোকটির নাম উল্লেখ করে নাই।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা চুক্তি ভংগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মহানবী (স) এই গোত্রের লোকদেরকে একটি স্থানে সমবেত করিয়া তাহাদেরকে উপদেশ প্রদান করার চিন্তা করেন। মহানবী (স) বানূ কায়নুকার উন্মুক্ত বাজার এলাকায় এই সমাবেশের আয়োজন করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেইসব শাস্তিকে ভয় কর যাহা বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উপর আপতিত হইয়াছে। তোমাদের উপর তাহা আপতিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা ইসলাম কবুল কর। কেননা ইতোমধ্যেই তোমরা জানিয়াছ যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল। তোমরা তোমাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবেও এই বিষয়টি পাইয়া থাকিবে।

মহানবী (স)-এর এই বক্তব্য শুনিয়া বানূ কায়নুকার ইয়াহূদীরা বলিল, হে মুহাম্মাদ! সম্ভবত আপনি আমাদেরকে আপনার জাতি তথা কুরায়শ সম্প্রদায়ের মতই মনে করিয়া থাকেন। বিষয়টি যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। আপনি এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করিয়াছেন যাহাদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই। আপনি এই সুযোগটি গ্রহণ করিয়াছেন। আর আমাদের অবস্থা হইল, আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন আমাদের শৌর্যবীর্য এবং শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু (আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৭৬)। মদীনা সনদের ধারা অনুযায়ী ইয়াহূদীগণ মহানবী (স)-এর নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব প্রদান করিয়া প্রকারান্তরে

মহানবী (স)-কে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানীর মতে, ইহা হাসান হাদীছ (ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৩২)।

এই হাদীছের সনদে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মাদকে ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী অজ্ঞাত রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (তাকরীবুত-তাহযীব, ২খ., পৃ. ২০৫)। ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, তিনি হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর মাওলা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মাদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র অথবা ইকরিমা সূত্রে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে কুরায়শদেরকে পরাজিত করিবার পর মহানবী (স) বানূ কায়নুকার ইয়াহূদীদেরকে বানূ কায়নুকা বাজারে একত্র করিয়া তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জনান। তাহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দম্ভ দেখাইয়া ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে 'ইকরিমা রিওয়ায়াত করেন, আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ.

"যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে একত্র করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল'! দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতেছিল; অন্য দল কাফির ছিল; উহারা তাহাদিগকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে" (৩ ঃ ১২-১৩)।

অর্থাৎ বানূ কায়নুকা প্রথম গোত্র যাহারা বদর যুদ্ধের পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই মদীনা সনদের ধারা লংঘন করে। ইব্‌ন ইসহাক 'আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা সূত্রে রিওয়ায়াত করেনঃ

ان بنى كينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ وحاربوا فيما بين بدر وأحد.

"বানূ কায়নুকা প্রথম ইয়াহূদী গোত্র যাহারা মহানবী (স) ও তাহাদের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তি ভংগ করে এবং বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়" (ইব্‌ন হিশাম, আল-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৫১)।

উল্লিখিত কারণে মহানবী (স) মদীনা ফিরিয়া আসিয়া আবূ লুবাবা বশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির আল-আনসারীকে মদীনায় তাঁহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করেন এবং ইয়াহূদী বানূ কায়নুকাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশে মুসলিম মুজাহিদদেরকে সংগে লইয়া বানূ কায়নুকা অবরোধ করেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩-৪)। এই অভিযানে সাদা পতাকা বহন করেন হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। আল্‌-ওয়াকিদী বলেন, মহানবী (স) মদীনায় হিজরতের ২০ মাসের মাথায় শাওয়াল মাসের মধ্যভাগে শনিবার তাহাদিগকে অবরোধ করেন। আর এই অবরোধ যুল-কা'দা মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল্‌-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৭৭; আল্‌-বায়হাকী, দালাইলুন-নুবুওয়া, ৩খ., পৃ. ১৮৩)। এই অবরোধের মেয়াদ ছিল ১৫ দিন।

বানূ কায়নুকা মদীনার খাযরাজ গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আওস ও খাযরাজ গোত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বানূ কায়নুকা খাযরাজ গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিত। ইব্‌ন হিশাম বলেন, মহানবী (স)-এর সাথে বানূ কায়নুকার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পিছনে সম্ভবত ইহাই কারণ ছিল যে, তাহারা মহানবী (স) দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাদের মিত্রশক্তি তথা খাযরাজ গোত্রের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। বাস্তবিকপক্ষে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যি ব্যতীত আর কাহারও নৈতিক সমর্থন তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। বানূ কায়নুকার এই আচরণের কারণে মহানবী (স) তাহাদের পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ ، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

"যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভংঙ্গকারীদিগকে পসন্দ করেন না" (৮ ঃ ৫৮)।

এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া মহানবী (স) বানূ কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। অবরোধ চলাকালীন বানূ কায়নুকা দুর্গে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে তাহারা তাহাদের সকল মিত্র শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের কেহ বাহিরে আসিতে পারে নাই এবং বাহির হইতেও কেহ তাহাদের জন্য খাবার পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন। অবস্থার নাযুকতা উপলব্ধি করিয়া তাহারা এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তাহাদের সাথে থাকিবে এবং তাহাদের ধন-সম্পদ মহানবী (স) ও মুসলমানদের হইবে।

মহানবী (স) তাহাদেরকে বন্দী করেন এবং তাহাদের দুই হাত পিছনের দিক হইতে বাঁধিয়া ফেলার নির্দেশ দেন। তিনি এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন বানূ আসলাম গোত্রের মুনযির ইব্‌ন কুদামার উপর। তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত শত। চার শত ছিল বর্ম বিহীন এবং তিন শত

ছিল বর্মধারী। মুনাফিক নেতা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি-এর সাথে মৈত্রীচুক্তি থাকার কারণে এই সময় সে তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে। সে মুনযিরকে বলে, ইহাদেরকে ছাড়িয়া দাও। মুনযির বলেন, "আমি কি এমন জাতিকে ছাড়িয়া দিব যাহাদেরকে বাঁধিবার নির্দেশ স্বয়ং মহানবী (স) দিয়াছেন? আল্লাহ্‌র শপথ! যেই ব্যক্তি তাহাদেরকে ছাড়াইয়া নেওয়ার জন্য আগাইয়া আসিবে আমি তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিব।" তখন সে বানূ কায়নুকার লোকদের মুক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য মহানবী (স)-এর নিকট সুপারিশ করে এবং বলে, হে মুহাম্মাদ! মিত্র গোত্রের লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। মহানবী (স) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তখন সে মহানবী (স)-এর লৌহ বর্মের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দেয়। মহানবী (স) বলেন ঃ আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই সময় মহানবী (স)-এর চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি বলিল, আমি ছাড়িয়া দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত মিত্র গোত্রের লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করা না হয়। তাহারা আমাকে বিভিন্ন সময় সাহায্য করিয়াছে। আপনি কি তাহাদেরকে এত শীঘ্রই ধ্বংস করিয়া দিবেন? হে মুহাম্মাদ ! আমি বিপদের আশংকা করিতেছি। মহানবী (স) বলিলেন ঃ "তাহাদেরকে ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি-এর উপরও লা'নত বর্ষণ করুন"।

রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কায়নুকার ইয়াহূদীদেরকে হত্যা না করিয়া মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং এই নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহাদেরই মিত্র গোত্রের অন্তর্গত উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর উপর, যিনি তখন বানূ কায়নুকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদেরকে সন্তান-সন্ততিসহ মদীনার 'যুবাত' পর্বত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বলেন, তোমরা অনেক দূরে চলিয়া যাও। তখন তাহারা সিরিয়ার 'আযরি'আত' নামক এলাকায় চলিয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ধন-সম্পদ, সমুদয় সমরাস্ত্র এবং স্বর্ণলংকার নির্মাণের সকল যন্ত্রপাতি গনীমত হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সম্পদ হস্তগত করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা আল-আনসারী (রা)-র উপর। তাহাদের ধন-সম্পদ পাঁচ ভাগ করা হয়। চার ভাগ মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হয়। অপর একভাগ মহানবী (স) গ্রহণ করেন। এইগুলি হইল মহানবী (স) কর্তৃক গ্রহণকৃত সর্বপ্রথম গনীমতের সম্পদ। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ৩ টি ধনুক ও দুইটি লৌহবর্ম। ধনুকগুলির নাম হইল ১. আল-কাতূম (الكتوم) এইটি উহূদ যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া যায়, ২. আল-রাওহা (الروحاء), ৩. আল-বায়দা (البيضاء)। লৌহবর্ম দুইটির নাম হইল ঃ আস-সাগদিয়া (الصغدية) ও আল-ফিদ্দাহ (الفضّة)। বর্ণিত আছে যে, আস-সাগদিয়া হইল সেই বর্ম যাহা জালূতের সাথে যুদ্ধ করিবার সময় হযরত দাঊদ (আ) পরিধান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) একটি বর্ম মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে এবং অপরটি সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইব্ন

মাসলামা বলেন, মহানবী (স) আমাকে একটি বর্ম প্রদান করেন, আর একটি প্রদান করেন সা'দ ইব্ন মু'আযকে।

এই অভিযানে মহানবী (স) তিনখানি তরবারিও হস্তগত করেন। এইগুলির মধ্যে একটির নাম কালাঈ (قلعى), অপর একটির নাম বাত্তার (بتار)। তৃতীয়টির নাম পাওয়া যায় না (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ২খ., পৃ ২৮-৩৩; আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৭৮-৭৯)। বানূ কায়নুকা অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণের পাশাপাশি হযরত সাফিয়্যা (রা)-কেও গ্রহণ করেন (আত-তাবারী, তারীখ আল-উমাম্ ওয়াল-মুলূক, ১খ., পৃ. ১৭৪)।

মহানবী (স) বানূ কায়নুকাকে বহিষ্কার করার দায়িত্ব অর্পণ করেন উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর উপর। বানূ কায়নুকা বলিল, আমরা কি আওস ও খাযরাজ গোত্রের নিকট হইতে চলিয়া যাইব? আমরা তো আপনার মিত্রপক্ষ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মিত্রদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ "হে আবুল হুবাব! হৃদয় পরিবর্তন হইয়াছে, ইসলাম সকল চুক্তি বাতিল করিয়াছে। তাহারা আগামী কালই চলিয়া যাইবে"। বানূ কায়নুকা বলিল, লোকদের নিকট আমরা অনেক ঋণ পাওনা আছি। মহানবী (স) বলিলেন, তাহাদেরকে তাড়াতাড়ি যাইতে বল। ইব্নুল আছীর বলেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাহাদেরকে 'যুবাব' পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। অতঃপর তাহারা 'আযরি'আত' চলিয়া যায়। 'আযরি'আত' হইল সিরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। এইটি 'বালকা' ও 'আম্মান সংলগ্ন একটি স্থান (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ১খ., পৃ. ১৬২১)। কিছুকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায় (ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৩৮)। সাবরাহ্ বলেন, আমি সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'আকীক উপত্যকায় 'ফালজাহ' নামক স্থানে ছিলাম। আমি এই স্থানে বানূ কায়নুকা'র সাক্ষাত পাইলাম। তাহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনকে উটের পিঠে উঠাইয়া পুরুষরা হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মুহাম্মাদ আমাদেরকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের ধন-সম্পদ রাখিয়া দিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এখন কোথায় যাইবে? তাহারা বলিল, আমরা সিরিয়া যাইব। সাবরাহ্ বলেন, তাহারা ওয়াদী আল-কুরায় অবতরণ করিয়া এই স্থানে একমাস অবস্থান পূর্বক শক্তি সঞ্চয় করে। অতঃপর তাহারা আযরি'আতে চলিয়া যায় এবং সেই স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু সেখানেও তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮০)।

উবাদা ইব্ন সামিত বলেন, বানূ কায়নুকা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিবাদে জড়াইয়া পড়ে তখন তাহাদের মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি তাহাদের সহযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেলেও

তাহাদের অপর মিত্র আওফ ইব্ন আল-খাযরাজ গোত্রের উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাহাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেন। উবাদা (রা) বলেন, "আমি বানূ কায়নুকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সংগের সম্পর্ককে গ্রহণ করিলাম এবং মহান আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিলাম, আর কাফিরদের সঙ্গে ইতোপূর্বের সকল সহযোগিতা ও মিত্রতার চুক্তি ছিন্ন করিলাম। অতঃপর উবাদা ইব্ন সামিত (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এবং যাহাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সত্বর তাহাদের সহিত মিলিত হইতে দেখিবে এই বলিয়া, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে।' হয়তো আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে। এবং মু'মিনগণ বলিবে, 'ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা তোমাদের সংগেই আছে? তাহাদের কার্য নিষ্ফল হইয়াছে; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য

কেহ দীন হইতে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে। তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে; তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ—যাহারা বিনীত হইয়া সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। কেহ আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হইবে" (৫ ঃ ৫১-৫৬)।

উক্ত আয়াতসমূহে فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (তুমি দেখিবে সেই সমস্ত লোককে যাহাদের অন্তঃকরণে রোগ রহিয়াছে) বলিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যিকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ সে বলিয়াছিল, اِنِّىْ اَخْشَى الدَّوَائِرَ (আমি বিপদের আশংকা করিতেছি) যাহা বিবৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ("তাহারা বলে,আমরা আমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের আশংকা করিতেছি")। পক্ষান্তরে وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ("আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদার লোকদিগকে নিজের বন্ধু বানাইবে") শীর্ষক আয়াত দ্বারা উবাদা ইব্ন সামিতকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বানূ কায়নুকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিলাম (আল-বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়া , ৩খ., পৃ. ৭৩-৭৫; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৪৭-৫০)।

বানূ কায়নুকা গোত্রের কতিপয় লোক দীন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহারা মদীনাতেই থাকিয়া যায়। ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে ৩০ জন বানূ কায়নুকার তালিকা প্রদান করেন। হয়ত ইহা দ্বারা নির্বাসন-পূর্ব সময়কে বুঝান হইয়াছে। তালিকার ৫/৬টি নাম ওয়াকিদীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। ৯/৬৩১ সালে ইব্ন উবায়্যি-এর দাফনের সময় বানূ কায়নুকা এবং অন্য গোত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ভিড় ঠেলিয়া লাশের খাটিয়া পর্যন্ত গিয়াছিল (Wellhausen, পৃ. ৪১৫)। কায়নুকা গোত্রের আরেক ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (প্রকৃত নাম আল-হুসায়ন)। ইনি ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ইব্ন ইসহাক কর্তৃক প্রদত্ত তালিকার উপসংহারে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। Horovitz বলেন যে, তিনি হিজরতের ৮ বৎসর পর এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইনতিকালের দুই বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্ন হাজার, ইসাবা, ২খ., পৃ.৭৮০-২১)।

বানূ কায়নুকার যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকও সীরাত রচয়িতাগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল-বালাযুরী, ইব্ন খালদূন প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। কিন্তু ইব্ন কাছীর বলেন যে, ইহা হিজরী ৩য় সালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই

বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের পর ও উহুদ যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। কোন এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৩য় হিজরীর মুহাররাম মাসে গাতাফান গোত্রের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার ফলে আমররা-র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) উছমান ইব্ন আফফান (রা)-কে মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং স্বয়ং নাজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সেইখানে সফর মাস অতিবাহিত করেন এবং বিনা যুদ্ধেই প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ৩য় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে একদল সৈন্য লইয়া হিজাযে বুহরান নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু কুরায়শদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তথায় কিছু দিন অতিবাহিত করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যেহেতু বানূ কায়নুকার যুদ্ধ ইহার পর সংঘটিত হয়, সেহেতু ইহার তারিখ ৩য় হিজরী নির্ধারিত করা যাইতে পারে।

মহানবী (স) কর্তৃক বানূ কায়নুকা অভিযান পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি এই গোত্রের ইয়াহূদীদিগকে ইসলাম কবুল করার ও তাঁহার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান। বিষয়টি তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতেও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের পাশাপাশি মদীনায় অবস্থান করিত। তাহারা ছিল মদীনা সনদের আওতাভুক্ত গোত্রসমূহের অন্তর্গত। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা মহানবী (স)-এর আহ্বানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জওয়াব দেয়, নিজেদের বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রকাশ করে এবং এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমীহ ও সৌজন্য প্রকাশ করে নাই। ইহার মাধ্যমে বাহ্যত মনে হয়, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংঘর্ষে জড়িত হওয়ার জন্য মানসিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই ক্ষেত্রে তাহারা মিত্রশক্তি খাযরাজ গোত্রের সহযোগিতার উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিল। নতুবা বানূ কায়নুকার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র গোত্র মুসলমানদের কুরায়শদের বিপক্ষে বিজয়ী ও মদীনার শাসনকার্য পরিচালনাকারী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করার সাহস দেখাইতে পারে না।

কেবল ইসলাম কবুল করিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কায়নুকাকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার সংগত কোন কারণ নাই। কেননা মদীনা সনদের ভিত্তিতে ইয়াহূদীগণকে মুসলিমদের পাশাপাশি মদীনায় শান্তিতে বসবাস করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। আর এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইসলাম কবুল করিবার কোন শর্ত আরোপ করা হয় নাই,বরং মদীনা সনদে তাহাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইয়াছিল। আমরা মনে করি, বদর যুদ্ধে কুরায়শদের পরাজয় বরণ করিবার পর মদীনার ইয়াহূদীদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ইহার প্রকাশ ঘটে তাহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আগ্রাসী জওয়াব প্রদানের মধ্য দিয়া। ইহার মাধ্যমে মদীনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিধিমালা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সনদের শর্ত অনুযায়ী মহানবী (স) নিরংকুশ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ প্রকারান্তরে মদীনা সনদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। মহানবী (স) উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইয়াহূদীদের সংগে মদীনায় একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাহারা মদীনার অভ্যন্তরে বসবাস করিত বলিয়া

তাহাদের এই মনোভাব যেন অন্যান্য গোত্রে সম্প্রসারিত হইতে না পারে সেইজন্য মহানবী (স) ইয়াহূদী বানূ কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া তাহাদিগকে অবরোধ করেন এবং তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করেন। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মদীনায় অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্রের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠীও এখানে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিবার সাহস প্রদর্শন করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহমদ ইবরাহীম আশ-শরীফ, মাক্কা ওয়াল-মাদীনা ফিল-জাহিলিয়্যাতি ওয়া আহ্দ আর-রাসূল, কায়রো ১৯৮৫ খৃ.; (২) আকরাম জিয়া আল-উমারী, বাংলা অনু. রাসূলের (স) যুগে মদীনার সমাজ ঃ রূপ ও বৈশিষ্ট্য, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.; (৩) আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, মিসর ১৯২৯ খৃ.; (৪) আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. থিসিস, চ. বি., ১৯৯৯ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, সীরাতু সাইয়িদিল মুরসালীন, চট্টগ্রাম ২০০১ খৃ.; (৬) শায়খ ইনায়াত উল্লাহ্, উর্দু অনু. তারীখ ইব্ন খালদূন, লাহোর, ১৯৬৫ খৃ., ১খ.; (৮) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, বৈরূত, ১৯৫৭ খৃ., ২খ.; (৯) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ২খ.; (১০) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, মিসর ১৯৮০ খৃ., ৩খ.; (১১) ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৮২ খৃ., ৪খ.; (১২) ইব্ন হাজার আল্-আস্কালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত তা. বি.; (১৩) ঐ লেখক, আত-তাকরীব আত-তাহযীব, মিসর তা. বি., ৭খ., পৃ. ৩২২; (১৪) ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৮৯, ৭খ.; (১৫) উর্দূ ইনসাইক্লোপেডিয়া, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (১৬) আল-ওয়াকিদী, সম্পা. Marnden Jones, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ., ১খ.; (১৭) আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল্-মুলূক, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ২খ.; (১৮) দিয়ার বাকরী, তারীখ আল-খামীস, কায়রো ১২৮৩ হি.; (১৯) আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, ১খ., সম্পা. হামীদুল্লাহ্, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; (২০) আল-বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., ৩খ.; (২১) মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন সুরূর, কিয়াম আদ-দাওলাহ্ আল-আরাবিয়্যা আল-ইসলামিয়্যা ফী 'আহ্দ আন-নুবূওয়াহ, কায়রো ১৯৫২ খৃ.; (২২) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, আযমগড়, ইন্ডিয়া ১৯৬২ খৃ.; (২৩) রশীদ রিদা, মুহাম্মাদ (স), বৈরূত ১৯৭৫; (২৪) ইমাম বুখারী, সাহীহ্ আল-বুখারী, ১খ., ২খ.; (২৫) ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, ১খ., ২খ.; (২৬) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (২৭) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.।

ডঃ আ. ক. ম. আবদুল কাদের

গাযওয়া যী-আম্‌র

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বাধীনে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় সামরিক অভিযান। এই সমরাভিযান তৃতীয় হিজরীর মুহররম মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইব্‌ন সা'দ বলেন, এই অভিযান মদীনায় হিজরতের পঁচিশ মাসের মাথায় অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৪)। ইব্‌ন ইসহাকের মতে ইহা তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে অনুষ্ঠিত হয় (ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত, ৩খ., পৃ. ২১৯)।

হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলেন, তৃতীয় হিজরীর ১৩ রবীউল আওয়াল বৃহস্পতিবার মহানবী (স) এই সমরাভিযানে রওয়ানা হন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩; আল- ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৯৮)। এই যুদ্ধকে গাযওয়া নাজদও বলা হয়। হাকিম এই যুদ্ধের নাম গাযওয়া আনমার (غزوة أنمار) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সীরাতে মুহাম্মাদিয়া, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা, পৃ. ৩৫২)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, দ্বিতীয় হিজরীর যুল-হিজ্জা মাসে সংঘটিত সাবীক নামক যুদ্ধাভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় বা তাহার আশেপাশে অবস্থান করেন। ইহার পর গাতাফানের উদ্দেশে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধে রওয়ানা হন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৬৪৮; যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৮৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৮)। ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী বলেন যে, ইহাই গাযওয়া যী আমর বা যু আম্‌রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

যুদ্ধাভিযানের কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) গোপন সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, বনী ছা'লাবা এবং বনী মুহারিব গোত্রদ্বয়ের এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদিগকে পরাজিত ও নিঃশেষ করিবার দৃঢ় সংকল্পে যু-'আম্‌র নামক স্থানে একত্র হইয়াছে (আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ, পৃ. ১৪২)। দু'সুর ইবনুল-হারিছ আল- মুহারিবী এই বিশাল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল। খতীব বাগদাদীর বর্ণনা হইতে এই সেনাপতির নাম গূরাছ (غورث), অন্যান্য ঐতিহাসিক ঐ ব্যক্তির নাম গূরাক (غورك) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুহারিব গোত্রের এই লোকটি অত্যন্ত সাহসী এবং বীর যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতিমান ছিল (কাসতাল্লানী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়া, পৃ. ৩৫২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের মুকাবিলায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্য সাহাবাগণকে আহ্বান জানাইলেন। সাহাবাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলে মহানবী (স)

অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়া মোট চার শত পঞ্চাশজন মুসলিম সৈন্যের এক বাহিনী এবং তৎসঙ্গে কিছু অশ্ব লইয়া গাতাফানের উদ্দেশে নাজ্‌দ ও নুখায়লের দিকে রওয়ানা হইলেন। মদীনায় উছমান ইব্‌ন আফফান (রা)-কে প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া গেলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণকে লইয়া যাত্রা শুরু করিলেন। তিনি উহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী আল-মুনাক্কা নামক স্থানের উপর দিয়া নাজদের নিকটবর্তী 'যুল-কাসসা' নামক স্থানে পৌঁছেন (ওয়াফাউল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৩৬২)। এই স্থানে আসিয়া ছা'লাবা গোত্রের জাব্বার নামক এক ব্যক্তিকে পাইয়া মুসলমানগণ তাহাকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, ইয়াছরিব। মুসলমানগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়াছরিবের তোমার কি প্রয়োজন? সেই ব্যক্তি বলিল, আমি নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তুমি কি কোন বাহিনীর সাথে আসিয়াছ কিংবা তোমার কওমের কোন সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ? সে বলিল, না। তবে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, দু'সুর ইব্‌নুল হারিছ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকদিগকে একত্র করিয়াছে। সাহাবীগণ তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর সমীপে উপস্থিত করিলেন। মহানবী (স) তাহাকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাইলে সে ইসলাম কবুল করিল। সে বলিল, হে নবী! শত্রুপক্ষ কখনও আপনাদের মুকাবিলা করিবার সাহস পাইবে না। তাহারা যদি আপনাদের সমরাভিযানের সংবাদ জানিতে পারে তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন পূর্বক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমি তাহাদের ঘাটির দিকে পথ প্রদর্শন করিতে আপনাদের সাথেই আছি। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দানের জন্য মহানবী (স) তাহাকে হযরত বিলাল (রা)-এর সঙ্গী করিয়া দেন। তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে শত্রুদের আবাসস্থল পর্যন্ত রাস্তা দেখাইয়া নিয়া যান (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৯৪)।

এইদিকে শত্রুরা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং আশেপাশের পাহাড়গুলিতে আত্মগোপন করে। রাসূলুল্লাহ (স) অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ শত্রুদের একত্র হইবার স্থান পর্যন্ত গমন করিলেন। ইহা ছিল মূলত একটা প্রস্রবণ যাহা যু-'আমর নামে পরিচিত। এইজন্যই এই অভিযানকে 'যু-'আমরের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। শত্রুপক্ষের কাহারও সাথেই মুসলমানদের সাক্ষাত হয় নাই। মহানবী (স) ঐ স্থানেই শিবির স্থাপন করিলেন। ঐ সময়ে প্রচুর বারি বর্ষিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) পায়খানা-পেশাব করিবার জন্য ছাউনী হইতে বাহিরে আসিলে বৃষ্টিতে তাঁহার কাপড় ভিজিয়া যায়। তিনি ভিজা কাপড় খুলিয়া শিবির হইতে নিচে আসিয়া একটি গাছের ডালে শুকাইতে দিলেন এবং নিজে ঐ গাছের নিচে শুইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রতিপক্ষ বেদুঈনরা পাহাড়ের চূড়া হইতে এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া বেদুঈনরা তাহাদের দলের সেই প্রখ্যাত যোদ্ধা ইব্‌ন হারিছ, মতান্তরে দু'সুর ইব্‌ন হারিছকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি এখন একাকী নিদ্রামগ্ন। এই অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করা মোটেই সমীচীন হইবে না। তখন সেই দু'সুর একটি তরবারি হাতে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর শিয়রের পাশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মাদ! আজ তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? নবী করীম (স) অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিলেন । ফলে তাহার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তরবারি উঠাইয়া নিয়া বলিলেন, এইবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই সাথে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আপনার উপর কখনও কোন বাহিনী জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার তরবারি ফেরত দিলেন। তিনি তাহার সাথীদের কাছে পৌঁছিলে তাহারা বলিতে লাগিল, তোমার পতন হউক। কী হইয়াছে তোমার যে, এই ধরনের মহাসুযোগ পাইয়াও মুহাম্মাদকে হত্যা করিতে পারিলে না? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি তরবারি হাতে লইয়া যখন নবী (স)-এর মাথার পাশে দণ্ডায়মান হইলাম তখন দেখিতে পাইলাম, সাদা পোশাক পরিধানকারী দীর্ঘাকৃতির এক ব্যক্তি আসিয়া আমার বুক ও পিঠ চাপিয়া ধরিলেন। ফলে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। তরবারি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমি চিনিতে পারিলাম যে, ইনি আল্লাহ্র ফেরেশতা । এই অবস্থায় আমি ক'লেমা পড়িয়া মহানবী (স)-এর হাতে ইসলাম কবুল করিয়াছি। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন বড় বাহিনীই মুসলমানদের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে না। পরে তিনি স্বগোত্রীয় লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইতে লাগিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৯৫-৯৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩)। ওয়াকিদী বলেন, এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন (কিতাবুল-মাগাযী, প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ২খ, পৃ. ৩৫)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে তাহাদের হস্ত প্রসারিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাদের হস্ত তোমাদের হইতে প্রতিহত করিয়া দিলেন। আল্লাহ্কে ভয় কর। আর মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখা" (৫ ঃ ১১)।

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরেও অত্র আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল-কুরআন আল-আযীম, ২খ., পৃ. ৩২)। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হিজরতের ৪৭তম মাসে সংঘটিত যাতুর-রিকা' যুদ্ধেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব বলা যায় যে, সম্ভবত একই ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে দুইবার সংঘটিত হইয়া থাকিবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)।

বেদুঈনদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে তাহাদিগকে ওয়াকিফহাল করাইবার জন্য মহানবী (স) সাহাবাদের লইয়া তৃতীয় হিজরীর পূর্ণ সফর মাসটি সেখানে অতিবাহিত করেন, অতঃপর মদীনায় ফিরিয়া আসেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪১; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, পৃ.৩৫)।

এই যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াই হয় নাই বিধায় ইসলামের ইতিহাসে ইহা কম আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইসলামের ভিত্তি মজবুতকরণ, প্রচার-প্রসার এবং মুসলমানদের শক্তি-সাহস সুদৃঢ় করিবার ক্ষেত্রে এই ধরনের খণ্ড খণ্ড অভিযানগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। বানূ ছা'লাবা গোত্রের জাব্বার এবং আরব বেদুঈনদের প্রখ্যাত যোদ্ধা গূরাছ বা দু'সুর ইব্ন হারিছ এই যুদ্ধাভিযানে মহানবী (স)-এর হাতে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন যাহা প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানদের বিজয় ও উত্তরোত্তর অগ্রগতির সাক্ষ্যই বহন করে। ইয়াহূদী ও বেদুঈন জাতিও ইসলামের শক্তি সম্পর্কে এই অভিযানে আরও নিশ্চিত ধারণা লাভ করে। তাহারা শত্রুতা পরিত্যাগ না করিলেও মুসলমানদেরকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করিবার সাহস হারাইয়া ফেলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম, ১০খ., করাচী, কাদীমী কুতুবখানা; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, দারুল-মানার, কায়রো, ১৪১০/১৯৯০; (৪) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুত তাবারী, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৮৭৯ খৃ.; (৫) ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল ফীত-তারীখ, ২খ., দারুল-কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, বৈরূত, ১৪০৭/ ১৯৮৭; (৬) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, তাহকীকঃ ডাঃ মার্সডিন জোন্স, মুয়াসসাসাতু আল-আ'লামী লিল মাতবূ'আত, বৈরূত, ১৯৬৬ খৃ.; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, দারুল আদিয়ান লিত-তুরাছ, ১ম সং. ১৪০৮/১৯৮৮; (৮) শায়খ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাকর আল-খতীব আল-কাস্তাল্লানী আশ-শাফিঈ, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিব লাদুন্নিয়্যা, উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার খান আসাফী, করাচী, মুহাম্মদ আলী কারখানা, ১৩৩৮ হি; (৯) ইমাম ইব্ন জাওযী, ওয়াফাউল ওয়াফা বিআহওয়ালি মুস্তাফা, তাহকীক আব্দুল ওয়াহিদ, আল-মাকতাবাতু আন-নুরিয়্যাহ, পাকিস্তান ২য় সং, ১৩৯৭/ ১৯৭৭; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ২খ., বৈরূত, দারুল-ফিকর; (১১) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মাকতাবাতু দারুস-সালাম, রিয়াদ, ১৪১৪/১৯৯৪; (১২) ইব্নুল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, যাদুল মা'আদ, ২খ, মুআসসাসাতু আর-রিসালাত, ১৫ সং, বৈরূত, ১৪০৭/১৯৮৭।

ডঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম

গাযওয়া বুহ্‌রান

বুহ্‌রান (بحران) শব্দটি দুইভাবে পঠিত হইয়া থাকে ঃ (ক) বাহ্‌রান (بحران) অর্থাৎ প্রথম হরফে যবর এবং দ্বিতীয় হরফ সাকিন যোগে (আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., ১৪২)। (খ) বুহ্‌রান (بحران) অর্থাৎ প্রথম বর্ণে পেশ এবং দ্বিতীয় বর্ণে সাকিন যোগে। ওয়াকিদী (র)-এর বর্ণনামতে বুহ্‌রান শব্দটি মূলত ছিল নাজরান (نجران), কিন্তু হাদীছে গাযওয়া বুহ্‌রান' (غزوة بحران) ব্যবহৃত হইয়াছে (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., ১৯৬)।

বুহ্‌রান বা বাহ্‌রান হইল মদীনার ফুরু' (الفرع)-এর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। ফুরু' হইতে মদীনার দূরত্ব আট বুরুদ (برد) বা আট মাইল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ৩৫)। অন্য বর্ণনামতে, হিজাযের ফুরু' সীমান্তে অবস্থিত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি স্থানের নাম বুহ্‌রান (তারীখুত তাবারী, ২খ., ১৭৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৭৩)। রাসূলুল্লাহ (স) গাতাফান যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয় হিজরীর রবীউল আওওয়াল মাস মদীনায় অতিবাহিত করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ৪)। এমতাবস্থায় নবী করীম (স)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, হিজাযের খনি সমৃদ্ধ 'বুহ্‌রান' নামক স্থানে বানূ সুলায়ম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্র হইয়াছে এবং ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, ৩৫)। এই খবর শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের ২৭ মাসের মাথায় রবী'উল আখির, মতান্তরে জুমাদাল উলা মাসে তিন শত মুসলিম সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য 'বুহ্‌রান' নামক স্থানের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন (ওয়াফাউল ওয়াফা, ২খ., ৬৮৩; নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১২৪)। যেহেতু 'বুহ্‌রান' নামক স্থানে এই যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয় সেইজন্য এই যুদ্ধকে 'গাযওয়া বুহ্‌রান' বলা হইয়া থাকে। সুলায়ম গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেহেতু এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে, সেইজন্য কেহ কেহ এই যুদ্ধকে 'গাযওয়া বানূ সুলায়ম' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন (সীরাতে মুহাম্মদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৩৫৩)। এই যুদ্ধাভিযানে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর উপর অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য মদীনার বিচারকার্য, সালাতের ইমামতী প্রভৃতি কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান (সীরাতুল মুস্তফা, ২খ., ১৭৫; সীরাতু মুহাম্মাদিয়্যা, ৩৫৩)।

ওয়াকিদী বলেন, মা'মার ইব্‌ন রাশিদ ইমাম যুহ্‌রী (র) হইতে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, বানূ সুলায়মের মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিন শত সৈন্যের বাহিনী বুহ্‌রান পৌঁছিতে আর মাত্র এক দিনের পথ বাকী থাকিতে বানূ সুলায়মের এক ব্যক্তির সহিত পথিমধ্যে তাঁহাদের সাক্ষাত হয়। মুসলমানগণ সুলায়ম গোত্র, তাহাদের রণপ্রস্তুতি এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি এই বলিয়া সংবাদ দিল যে, সুলায়ম

গোত্রের সমবেত সৈন্যদল গতকালই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ স্থলে ফিরিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নবী করীম (স) সৈন্যবাহিনী লইয়া বুহ্‌রান নামক স্থানে পৌঁছিলেন, কিন্তু তথায় বিপক্ষ দলের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., ১৯৬)। রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধ বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ ঐ স্থানে ১০ (দশ) দিন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ৪; আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., ১৪২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ৩৬), মতান্তরে ১৬ জুমাদাল উলা পর্যন্ত অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (ফাতহুল-বারী, ৭খ, ২৫৯; সীরাতুল মুস্তফা, ২খ., পৃ. ১৭৫)। কোন কোন বর্ণনায়, মুসলিম সৈন্যবাহিনী রাবীউল-আখির ও জুমাদাল উলা এই দুই মাস তথায় অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা , ৩খ, ৫; তারীখুত তাবারী, ২খ., ১৭৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭৩)। এই অভিযানে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে কোন প্রকার যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কাফির বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকিত হইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল (সীরাত ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ, ২১৯; যাদুল মা'আদ, ২খ, ৯১; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., ৫; Majid Ali Khan, Muhammad the Final Messenger, p.177)।

এই সমরাভিযানে প্রত্যক্ষ লড়াই সংঘটিত না হইলেও ইসলামের প্রচার-প্রসার ও কাফিরদের হতবিহ্বল করিবার ক্ষেত্রে ইহার ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাফিরদের পলায়ন মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি করিয়াছিল, ইসলামের জয়যাত্রা ও উত্তরণের পথকে করিয়াছিল সুগম ও সুসংহত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, বৈরূত, দারুল-ফিক্‌র; (২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., বৈরূত, দারুল-জিল, নূতন সংস্করণ; (৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ, তাহ্‌কীক্ঃ ড. মার্সডিন জোন্স, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (৪) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., বৈরূত ১৪০২ / ১৯৮২; (৫) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., বৈরূত, তা. বি.; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., বৈরূত; (৭) আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-খাতীব আল-কাস্তাল্লানী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা ঃ মাওয়াহিব লাদুন্নিয়্যা, উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার খান আসাফী, করাচী ১৩৩৮ হি.; (৮) ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত রাসূলুল্লাহ্ (স), অনু. শহীদ আখন্দ, ৩খ., ইফাবা, ঢাকা ১৯৯২; (৯) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা মুকাররমা, ৫ম সং, ১৪১৫ / ১৯৯৪; (১০) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭খ , বৈরুত তা. বি.; (১১) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., ১ম সংস্করণ, মিসর ১৩৪৭ / ১৯২৮; (১২) ইব্‌নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তাফা, ২খ., তাহকীকঃ 'আব্দুল ওয়াহিদ, ২ সং, পাকিস্তান ১৩৯৭ / ১৯৭৭; (১৩) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, মিসর, তা. বি.; (১৪) ইদরীস কানদেহলভী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., লাহোর ১৪০৬ / ১৯৮৫; (১৫) Dr. Majid Ali Khan, Muhammad the Fimal Messenger, Lahore 1983.

ড়ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম

সারিয়্যা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)

(কা'ব ইবনুল আশরাফের হত্যা)

পরিচয়

কা'ব ইবনুল আশরাফ ছিল বানূ নাযীর গোত্রের প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী কবি। তাহার পিতা 'আশরাফ' ছিল আরবের তাঈ গোত্রের উপশাখা বানূ নাব্হানের সদস্য। জাহিলী যুগে সে মদীনায় আসিয়া বানূ নাযীর গোত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। সে নিজ যোগ্যতায় তাহাদের বিশ্বাসভাজন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইয়াহূদী নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবূ রাফে' ইব্ন আবুল হুকায়ক-এর কন্যাকে বিবাহ করে। কা'ব এই কন্যারই গর্ভজাত সন্তান (তারীখুল খামীস, পৃ. ৪৬৪; শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., ২৩৬)।

কা'ব-এর পিতৃকুল আরব এবং মাতৃকুল ইয়াহূদী হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিল। অনন্য কাব্য প্রতিভার সুবাদে সকল গোত্রের উপর, বিশেষত নিজ কওমের উপর ছিল তাহার যথেষ্ট (প্রভাব শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., ২৩৬)।

কবি হিসাবে আরবে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে 'ফাহলুন ফাসীহী' (অলংকার ও মার্জিত ভাষী) উপাধিতে ভূষিত ছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ., ৬২৮)। উপরন্তু অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে সে ইয়াহূদীদের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সে ছিল বেশ লম্বা ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী (ফাতহুল বারী, ৩খ., পৃ. ৩৩৭)। মদীনার দক্ষিণে বানূ নাযীর গোত্রের আবাস ভূমির পশ্চাতে তাহার দুর্গ অবস্থিত ছিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৯)।

কা'ব ইবনুল আশরাফ দীন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তীব্র শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করিত। সে প্রকাশ্যে সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকিত। সে ইয়াহূদী ধর্মগুরুদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করিত। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর কোন ইয়াহূদী পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে সে তাহার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিত (শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৯)।

বদর যুদ্ধে কুরায়শদের পরাজয়ে কা'ব-এর প্রতিক্রিয়া

বদর যুদ্ধে (২য় হি.) মুসলমানদের বিজয় এবং কুরায়শদের পরাজয়ের সংবাদ লইয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মদীনার নিম্নভূমির লোকদের নিকট এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) উচ্চ ভূমির লোকদের নিকট আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার মুসলমানদের কাছে বিজয়বার্তা এবং মুশরিক নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রেরণ করিলেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ.,

পৃ. ৭)। কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার খবর শুনিয়া কা'ব আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, সত্যিই কি এইরূপ ঘটিয়াছে? ইহারা তো আরবের সম্ভ্রান্ত লোক এবং জনগণের রাজা। আল্লাহ্র শপথ! যদি সত্যিই মুহাম্মাদ (স) তাহাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে তবে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উহার উপরিভাগ হইতে উত্তম (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ.১৭৮; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৮; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., ১৭৫; তাফহীমুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ৩৪৭)। কা'ব যখন নিশ্চিত হইল যে, বদর যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয় ও নেতৃবর্গের নিহত হওয়ার সংবাদ সত্য, তখন সে ক্ষোভে, দুঃখে ও বিদ্বেষে ফাটিয়া পড়িল। সে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের ভর্ৎসনা ও নিন্দা করিতে এবং ইসলামের শত্রুপক্ষের প্রশংসা ও তাহাদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে তাহার তৎপরতার অংশ হিসাবে মক্কায় গমন করিয়া আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আবী ওয়াদা'আর গৃহে উঠিল, তাহার স্ত্রী আতিকা বিন্ত আবু আয়াস ইব্ন উমায়্যা কা'বের যথেষ্ট সেবা-যত্ন ও সমাদর করিল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে কুরায়শদিগকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। সে বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়শ নেতাদের সম্পর্কে শোকগাথা রচনা করিয়া তাহাদের শোকাভিভূত আত্মীয়-স্বজনদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৯)। বদরে নিহত কুরায়শ সর্দারদের এবং পর্বতের গুহায় নিক্ষিপ্ত তাহাদের লাশসমূহ সম্পর্কে তাহার রচিত শোকগাথার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

طحنت رحى بدر لمهلك أهله + ولمثل بدر تستهل وتدمع

قتلت سراة الناس حول حياضهم + لا تبعدوا ان الملوك تصرع

كم قد اصيب به من ابيض ماجد + ذي بهجة يأوي اليه الضريع

طلق اليدين أذا الكواكب اخلفت + حمال اثقال يسود ويربع

ويقول اقوام اسر بسخطهم + ان ابن الاشرف ظل كعبا يجزع

صدقوا فليت الارض ساعة قتلوا + ظلت تسوخ بأهلها وتصدع

صار الذي اثر الحديث بطعنة + او عاش اعمى مرعشا لايسمع

نبئت أن بنى المغيرة كلهم + خشعوا لقتل ابى الحكيم وجدعوا

وابنا ربيعة عنده ومنبه + ما نال مثل المهلكين وتبع

نبئت ان الحارث ابن هشامهم + فى الناس يبنى الصالحات ويجمع

وليزور يثرب بالجمعو وانما + يحمى على الحسب الكريم الأروع.

"বদরের যাতা আপন লোকদিগকে পিষিয়া মারিল। বদরের অনুরূপ ঘটনায় চক্ষুগুলি অশ্রু ঝরায় এবং ঝরিতে থাকে। জনগণের নেতৃবৃন্দ নিজেদেরই হাওযের পাশে নিহত হইল। তবে ইহা অস্বাভাবিক কিছু মনে করিও না, কারণ বাদশাহ্গণও পরাজিত হইয়া থাকে। কত সম্ভ্রান্ত, শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্ত হইয়াছে যাহাদের কাছে নিঃস্ব লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনাবৃষ্টির সময় (দুর্ভিক্ষে) দুই হাতে দানকারী অন্যের বোঝা নিজের মাথায় বহনকারী সর্দার, যাহারা খাজনা আদায় করিয়া থাকে।

জাতির লোকেরা বলে যে, তাহাদের ক্ষোভে আমি সন্তুষ্ট হই (ইহা মোটেই ঠিক নয়, বরং) কা'ব ইব্ন আশরাফ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সত্যই বলিয়াছে, কিন্তু যখন তাহারা নিহত হইয়াছিল, তখন যমীন যদি তাহার লোকদিগকে ধ্বসাইয়া দিত এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইত তাহা হইলে কতই না উত্তম হইত!

এই কথা সে প্রচার করিয়াছে, হায়, যদি সে-ই বর্শার লক্ষ্যবস্তু হইয়া যাইত কিংবা অন্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকিত অথবা বধির হইয়া যাইত, কিছুই শুনিতে না পাইত, কতই না ভাল হইত!

খবর পাইয়াছি যে, আবুল হাকামের নিহত হওয়ার কারণে গোটা মুগীরা বংশের নাক কাটা গিয়াছে এবং তাহারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। আর রবী'আর দুই পুত্রও তাহার নিকট চলিয়া গিয়াছে, আর মুনাব্বিহও। এই নিহত ব্যক্তিরা ছিল এমন যে, কেহ তাহাদের মত (মর্যাদা ও গুণ) অর্জন করিতে পারে নাই, আর না (ইয়ামানের বাদশাহ) তুব্বা'ও। শুনিলাম, তাহাদের মধ্যকার হারিছ ইব্ন হিশাম জনতার মধ্যে সৎকর্ম করিয়াছে এবং লোকদিগকে একত্র করিয়াছে, সৈন্যদল লইয়া ইয়াছরিবের (মদীনা) মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে। সত্য কথা এই যে, অভিজাত মহৎ লোকেরাই পিতৃপুরুষের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৮; ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ২২৩)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সভাকবি হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) কা'বের কবিতার জবাবে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

ابـكـى لـكـعـب ثـم عـل بعبرة + مـنـه وعـاش مـجدعـا لايـسمـع

ولـقـد رايـت ببطـن بـدر مـنـهم + قـتـلى تـسح لها اليـعون وتدمع

فـابكى فقد ابـكيت عبدا راضعا + شبه الكعليب الى الكعليبة يتبع

ولقد شفى الـرحمن مـنـا سـيـدا + واعـانـى قـومـا قاتـلوه وصرعوا

ونـجـا وافـلت مـنـهم من قلبه + شـغـف يـظـل لـخـوفـه يتصدع

"কা'ব তাহার শোকগাথা পাঠ করিয়াছে। ইহার পরও তাহাকে আবার অশ্রু ঝরাইতে হইয়াছে এবং সে এমন লাঞ্ছিত জীবন অতিবাহিত করে যে, সে কিছুই শুনে নাই।

আমি বদরের নিম্ন ভূমিতে তাহাদের নিহতদিগকে দেখিয়াছি যাহাদের জন্য চক্ষু ক্রন্দন করিতেছে এবং অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

তুমি তো ইতর গোলামদিগকে অনেক কাঁদাইলে, এইবার তুমি নিজেই কাঁদ, যেমন ছোট কুকুর ছোট কুকুরীর জন্য চীৎকার করিয়া ডাকে।

দয়াময় আল্লাহ আমাদের নেতৃবৃন্দের হৃদয় শান্ত করিয়া দিয়াছেন, আর যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহারা পরাজিত হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে যে বাঁচিয়া পালাইয়া গিয়াছে তাহার অন্তর দগ্ধিভূত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে" (ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ২২৪; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯)।

ইব্ন হিশাম বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলি হাসসান (রা)-এর নয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৩খ, পৃ. ৯)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বানূ বালীর শাখা বানূ মুরাদ-এর মায়মূনা বিন্ত আবদুল্লাহ নাম্নী এক মুসলিম মহিলা কা'বের কবিতার প্রতিউত্তরে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

تحنن هذا العبد كل تحنن + يبكى على قتلى وليس بناصب

بكت عين من يبكى لبدر وأهله + وعلت بمثليها لوى بن غالب

فليت الذين ضرجوا بدمائهم + يرى ما بهم من كان بين الاخاشب

فيعلم حقا عن يقين ويبصروا + مجرهم فوق اللحى والحواجب

"এই গোলাম নিহতদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীমূলক বিলাপ করিয়াছে এবং অন্যদিগকেও কাঁদাইয়াছে, আসলে সে মোটেই চিন্তিত ও দুঃখিত নয়। বদর ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের যাহাদের জন্য সে কাঁদিতেছে, তাহাদের চক্ষু তো কাঁদিয়াছে, কিন্তু লুওয়ায় ইব্ন গালিবদের তাহাদের অশ্রুর দ্বিগুণ দান করানো হইয়াছে।

হায়! যাহারা স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, মক্কার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোকেরা যদি তাহাদের দুরবস্থা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিতে সক্ষম হইত এবং তাহারা তাহাদের অধঃমুখে উপুড় অবস্থায় দেখিতে পাইত" (ইব্ন ইসহাক, ৩খ.?)।

অবশ্য অনেকেই এই কবিতাগুলি কা'বের উদ্দেশ্যে এবং মায়মূনার রচিত নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ.৯)।

কা'ব ইব্ন আশরাফ মায়মূনার কবিতার উত্তরে যে কবিতা রচনা করে উহার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

"শোন! আপন নির্বোধদিগকে তিরস্কার কর, যাহাতে এমন সকল উক্তি হইতে বাঁচিতে পার যাহা অসঙ্গত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সে কি আমাকে এইজন্য তিরস্কার করিয়াছে যে, আমি ঐ

সম্প্রদায়ের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিয়াছি, যাহাদের প্রতি আমার ভালবাসা কৃত্রিম নয়? আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন কাঁদিবই এবং তাহাদের গুণাবলী স্মরণ করিবই যাহাদের শান-শওকত মক্কার প্রতিটি স্থানে সুস্পষ্ট" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯)।

এমনিভাবে একের পর এক কাব্য রচনার মাধ্যমে কা'ব কুরায়শদিগকে বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য উত্তেজিত করে। আবূ সুফ্য়ান ও মুশরিকরা তাহাকে মক্কায় অবস্থানকালে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট আমাদের ধর্ম বেশী পছন্দনীয়, না মুহাম্মাদ ও তাহার সাথীদের ধর্ম? কা'ব বলিল, তোমরাই তাহাদের চাইতে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম (আল-বিদায়া ২খ., পৃ. ৭)। এই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন (কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ২৪৯)ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا.

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদিগের সম্বন্ধে বলে, 'ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর" (৪ ঃ ৫১)।

ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, অত্র আয়াতে "আল-জিব্ত" ও "আত-তাগূত" বলিতে কা'ব ইব্ন আশরাফ ও হুয়াই ইব্ন আখতাবকে বুঝানো হইয়াছে (আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, ৫খ., পৃ. ২৪৮)।

কা'ব-এর প্ররোচনায় আবূ সুফ্য়ান হারাম শরীফের পর্দা ধরিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ৬২৮)। অন্য বর্ণনা মতে, মক্কার চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবূ সুফ্য়ানের নিকট গিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলে আবূ সুফ্য়ান সকলকে লইয়া হারাম শরীফে আসিয়া কা'বা ঘরের পর্দা ধরিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিল। এমনকি তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে গুপ্তহত্যা করিবারও সংকল্প করিল (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৫৯; সীরাতে শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২৩৭)।

ইহার পর কা'ব ইব্ন আশরাফ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করিতে লাগিল এবং লোকদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে শুরু করিল। আবূ দাঊদের বর্ণনা ঃ

وكان كعب بن الاشرف يهجو النبى ﷺ واصحابه ويحرض عليه كفار قريش.

(সুনান আবূ দাঊদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল-ইমারা, বাব কায়ফা কানা ইখরাজুল ইয়াহূদ মিনাল মাদীনা, ২খ., পৃ. ৪২২, নং ৩০০০)।

সে মুসলিম মহিলাদের দুর্নাম করিয়া অত্যন্ত আপত্তিজনক কবিতা রচনা করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে ভীষণভাবে কষ্ট দিতে শুরু করিল (আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., পৃ. ১৪৩; আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, ৩খ., পৃ. ৩০৩)। A Guillaume এই সম্পর্কে বলেন, Then he composed amatory verses of insulting nature about the Muslim women (The Life of Mohammad, P. 367)।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন এবং ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন (কিতাবুল মাগাযী, ১৮৪) ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا.

"তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে" (৩ ঃ ১৮৬)।

ইমাম যুহরী বলেন, এই আয়াতে وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا দ্বারা কা'ব ইব্ন আশরাফকে বুঝান হইয়াছে (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৩; তাফসীরে কুরতুবী, ৩খ., পৃ. ৩০৩)।

আল্লামা ইয়া'কূবী তাঁহার তারীখ গ্রন্থে বলেন ঃ

كعب بن الاشرف اليهودى الذى اراد ان يمكر رسول الله ﷺ.

"ইয়াহূদী কা'ব ইবনুল আশরাফ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ধোঁকা দিয়া হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল" (শিবলী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ২৩৭)।

আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন, কা'ব ইবনুল আশরাফ মহানবী (স)-কে বিবাহভোজের অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত দিল এবং কয়েক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিল যে, মহানবী (স) আগমন করিলে তাহারা তাঁহাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলিয়া হত্যা করিবে (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৩৮)। এখানে ঘটনাটি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

কা'ব ইব্ন আশরাফ হত্যার পরিকল্পনা

কা'ব ইব্ন আশরাফ রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদিগকে অব্যাহতভাবে ভর্ৎসনা ও কাব্যিক কটূক্তির মাধ্যমে ভীষণভাবে কষ্ট দিতে লাগিল। তাহার সীমাহীন কাব্যাত্যাচার ও দুর্ব্যবহারে অতীষ্ঠ হইয়া তিনি বলিলেন : "কা'ব ইব্ন আশরাফকে কে দমন করিতে পারিবে? সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে কষ্ট দিয়াছে" (বিদায়া, ২খ., পৃ. ৬)।

বনূ আবদুল আশহালের মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি কি তাহাকে হত্যা করিব? নবী করীম (স) বলিলেন, সম্ভব হইলে তাহাই কর (আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., পৃ. ১৪৩)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ফিরিয়া আসিয়া চিন্তিত অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া তিন দিন অতিবাহিত করিলেন। ইহা অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পানাহার ত্যাগ করিলে কেন? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সামনে একটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা বাস্তবায়ন করিতে পারিব কিনা জানি না। নবী করীম (স) বলিলেন, চেষ্টা করাই শুধু তোমার দায়িত্ব (তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ১৭৯; ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০)।

পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) আওস গোত্রীয় আরও চার ব্যক্তিকে সঙ্গে লইলেন। তাহারা হইলেন ঃ মিলকান ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াক্‌শ আবূ নাইলা, কা'ব ইব্‌ন আশরাফের দুধভ্রাতা; 'আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকশ (রা); হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয এবং আবূ 'আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র (রা) (তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩২; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৫১-৩৫২; ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০)।

কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের যেই বর্ণনা হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে (সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে) উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يارسول الله اتحب ان اقتله قال نعم قال فأذن لى ان اقول شيئا قال قل فاتاه محمد بن مسلمة فقال ان هذا الرجل قد سالنا صدقة وانه قد عنانا وانى قد اتيتك استسلفك قال وايضا والله لتملّنّه. قال انا قد اتّبعناه فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى شيئى يصير شأنه وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين فقال نعم ارهنونى قالوا اى شيئى تريد قال ارهنونى نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب قال فارهنونى ابناءكم قالوا كيف نرهنك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللامة يعنى السلاح فواعده ان ياتيه فجاءه ليلا ومعه ابو نائلة وهو اخوكعب من الرضاعة فدعاهم الى الحصن فنز اليهم فقالت له مرأته اين تخرج هذه الساعة فقال انما هو محمد بن مسلمة واخى ابو نائلة قالت اسمع صوتا كأنه يقطر الدم قال انما هو اخى محمد بن مسلمة ورضيعى ابو نائلة ان الكريم لو دعى الى طعنة بليل لاجاب قال ويدخل محمد بن مسلمة قال عمرو جاء معه رجلين وقال غير عمرو ابو عبس بن جبر والحارث بن اوس وعباد بن بشر فقال اذا ماجاء فانى قائل بشعره فأشمه فاذا رايتمونى استمكنت من راسه فدونكم فاضربوه فنز

اليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رايت كاليوم ريحا اى اطيب فقال اتاذن لى ان اشم رأسك قال نعم فشمه ثم اشم اصحابه ثم قال اتأذن لى قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم اتوا النبى ﷺ فاخبروه.

"জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফের (নিধনের) জন্য কে আছে? কারণ সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে খুবই কষ্ট দিতেছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাহাকে হত্যা করি তবে তাহা কি আপনি পছন্দ করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমাকে কিছু উল্টাপাল্টা বলিবার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, বলিও। অতএব মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) তাহার নিকট গিয়া বলিল, এই লোকটি আমাদের নিকট সদাকা (যাকাত) দাবি করিয়াছে। সে আমাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি তোমার নিকট কিছু ঋণ চাহিবার জন্য আসিয়াছি। সে বলিল, আরও দেখ। আল্লাহ্‌র শপথ! সে তোমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। ইব্‌ন মাসলামা বলেন, যাহা হউক, আমরা তো তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহা না দেখা পর্যন্ত এখনই তাঁহাকে ত্যাগ করা উত্তম মনে করি না। আমি তোমার নিকট এক বা দুই ওয়াস্‌ক খাদ্যশস্য ধার চাই। সে বলিল, আচ্ছা! আমার নিকট কিছু বন্ধক রাখ। তাহারা বলিলেন, কি জিনিস বন্ধক চাও? সে বলিল, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তাহারা বলিলেন, তোমার নিকট আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে কিভাবে বন্ধক রাখিতে পারি? অথচ তুমি আরবের সর্বাধিক সুশ্রী পুরুষ। সে বলিল, তাহা হইলে তোমাদের সন্তানদিগকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তাহারা বলিলেন, আমরা কি করিয়া আমাদের সন্তানদিগকে তোমার নিকট বন্ধক রাখিতে পারি? ইহাতে তাহাদেরকে গালমন্দ করা হইবে এবং বলা হইবে, এক বা দুই ওয়াস্‌ক-এর জন্য (তাহাদেরকে) বন্ধক রাখা হইয়াছিল। ইহা আমাদের জন্য অপমানজনক; বরং আমরা তোমার নিকট আমাদের যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখিব। অতএব ইব্‌ন মাসলামা পুনরায় তাহার নিকট আসিবার ওয়াদা করিলেন।

এক রাত্রে তিনি কা'ব-এর দুধভ্রাতা আবূ নাইলা (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সে তাহাদিগকে দুর্গের মধ্যে ডাকিয়া নিল এবং সেও (উপর হইতে) তাহাদের নিকট নামিয়া আসিল। তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, এই মুহূর্তে তুমি কোথায় বাহির হইতেছ? সে বলিল, এই তো মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা এবং আমার ভাই আবূ নাইলা। স্ত্রী বলিল, আমি এই ডাকের মধ্যে রক্তের গন্ধ পাইতেছি। সে বলিল, অভিজাত ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা বর্শাবিদ্ধ করিবার জন্য ডাকা হইলেও সে অবশ্যই সাড়া দেয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) আবূ আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র, আল-হারিছ ইব্‌ন আওস ও 'আব্বাদ ইব্‌ন বিশর (রা)-কে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন। ইব্‌ন

মাসলামা বলিলেন, সে আসিয়া পৌঁছিলে আমি তাহার মাথার চুল ধরিয়া শুঁকিতে থাকিব। তোমরা যখন দেখিবে যে, আমি তাহার মাথা শক্ত করিয়া ধরিয়াছি তখনই তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে।

কা'ব চাদর পরিহিত অবস্থায় তাহাদের নিকট আসিল এবং তাহার দেহ হইতে সুগন্ধি ছড়াইতেছিল। ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, আমি আজিকার মত এত উত্তম খোশবু কখনও দেখি নাই। তিনি বলিলেন, তুমি কি আমাকে তোমার মাথার ঘ্রাণ শুঁকিবার অনুমতি দিবে? সে বলিল, হাঁ। অতএব তিনি তাহার মাথার ঘ্রাণ শুঁকিলেন, অতঃপর তাহার সঙ্গীগণকেও শুঁকাইলেন। পুনরায় তিনি বলিলেন, আমাকে পুনর্বার শুঁকিবার অনুমতি দিবে কি? সে বলিল, হাঁ। অতএব তিনি তাহার মাথা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, এবার আঘাত হানো। অতএব তাহারা তাহাকে হত্যা করিল, অতঃপর মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবহিত করিলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলি কা'ব ইবনিল আশরাফ, নং ৪০৩৭; মুসলিম, জিহাদ, বাব ঐ, নং ৪৬৬৪/১১৯; আবূ দাঊদ, জিহাদ, বাব ১৫৭, নং ২৭৬৮)।

সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উক্ত ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তদনুসারে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে আরয করিলেন, আমাকে অস্বাভাবিক কিছু বলিবার অনুমতি দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, তুমি বলিতে পার। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই কথার দ্বারা তাহারা কা'বের সহিত মিথ্যা বাক্যালাপের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন (নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১২২)। নবী করীম (স) তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। কেননা যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেয়া বৈধ (শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২৩৮)।

অতঃপর মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-কে আশ্রয় দিয়া ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়াছি। এই ব্যক্তি আমাদের নিকট সদাকা চাহিতেছে। এখন আমরা অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সে আমাদিগকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। এই কথা শুনিয়া কা'ব বলিল, আল্লাহ্র কসম! সে তোমাদিগকে আরও দুর্ভোগে ফেলিবে। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আমরা যেহেতু তাঁহার অনুসারী হইয়াই গিয়াছি, এখন আকস্মিক তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করা সমীচীন মনে করিতেছি না। অপেক্ষা করিয়া দেখি, পরিণামে কি হয়? আমি আপনার নিকট এক ওয়াসৃক বা দুই ওয়াসৃক (এক ওয়াসৃক-১৫০ কেজি) খাদ্য-দ্রব্য ধার চাহিতেছি।

কা'ব বলিল, আমার নিকট কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, তুমি কি জিনিস বন্ধক রাখা পছন্দ কর? কা'ব বলিল, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, তুমি আরবের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ। সুতরাং কিভাবে আমাদের স্ত্রীদিগকে তোমার নিকট বন্ধক রাখিতে পারি? সে বলিল, তাহা হইলে
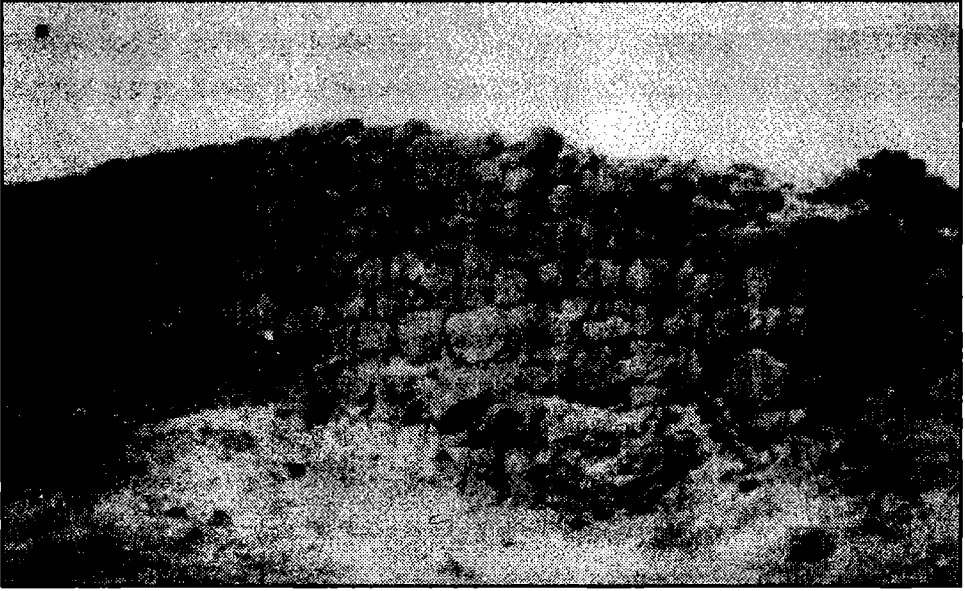
(১) কুখ্যাত ইয়াহূদী সর্দার কা'ব ইব্ন আশরাফের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

(২) কা'ব ইব্ন আশরাফের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। মদীনার জীবনে মহানবী (স) ও মুসলমানদের সবচেয়ে জঘন্য শত্রু ছিল এই কা'ব ইব্ন আশরাফ। এখানে অবস্থান করিয়া সে মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিত। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

তোমাদের পুত্রদিগকে বন্ধক রাখ। ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, এইরূপ করিলে তাহাদিগকে এক বা দুই ওয়াস্ক খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হইয়াছিল বলিয়া গালি দেওয়া হইবে। ইহা আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক হইবে। আমরা অবশ্য তোমার নিকট অস্ত্র বন্ধক রাখিতে পারি (শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যা, ২খ, পৃ. ১৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৩-৩৪)। ইহার পর উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইল যে, ইব্ন মাসলামা (রা) অস্ত্র লইয়া তাহার নিকট আসিবেন।

অপরদিকে কা'বের দুধভ্রাতা আবূ নাইলা (রা)-ও তাহার নিকট আসিয়া গল্প-গুজব শুরু করিলেন এবং একজন অন্যজনকে কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। এক পর্যায়ে আবূ নাইলা (রা) বলিলেন, ভাই কা'ব! বিশেষ প্রয়োজনে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাইলে উহা ব্যক্ত করিব। কা'ব বলিল, ঠিক আছে, বল। আবূ নাইলা (রা) বলিলেন, মুহাম্মাদের আগমন আমাদের জন্য পরীক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র আরব বিশ্ব আমাদের শত্রু হইয়া গিয়াছে। আমাদের রাস্তা-ঘাট বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পরিবার-পরিজন ধ্বংসের মুখামুখী, সন্তান-সন্ততি ভীষণ কষ্টে নিপতিত। আমাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে (সীরাত ইবন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০)।

ইহার পর তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর অনুরূপ কিছু আলোচনা করিলেন। বাক্যালাপের মধ্যে আবূ নাইলা (রা) এই কথাও বলিয়াছিলেন, আমার কয়েকজন বন্ধু আছে, যাহারা আমার মতই চিন্তাধারা লালন করে। আমি তাহাদিগকেও তোমার নিকট হাযির করিতে আগ্রহী। তুমি তাহাদের নিকটও কিছু খাদ্য বিক্রয় কর (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭১)।

মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা ও আবূ নাইলা (রা) নিজ নিজ বাক্যালাপে উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইলেন। কেননা ইহার পর সশস্ত্রভাবে তাহাদের আগমনে কা'বের কোন সংশয় থাকিবে না (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০)।

মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর নেতৃত্ব এই ক্ষুদ্র বাহিনী তৃতীয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের ১৪ তারিখ/ ৩-৪ সেপ্টেম্বর, ৬২৫ খৃ. রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একত্র হইলেন। নবী করীম (স) 'বাকীউল গার'কাদ' পর্যন্ত তাঁহাদের সহগামী হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হও। অতঃপর তিনি তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনাপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১১)।

ইব্ন মাসলামা (রা)-এর বাহিনী কা'ব ইব্ন আশরাফের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আবূ নাইলা (রা) উচ্চস্বরে তাহাকে ডাক দিলেন। সে ছিল সদ্য বিবাহিত। ডাক শুনিয়াই বাহিরে আসিতে উদ্ধত হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, তুমি একজন যোদ্ধা, আর যোদ্ধাদের এই সময় বাহিরে যাওয়া সমীচীন নয়। আমি শুনিতে পাইতেছি যে, এই আওয়াজ

হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরিতেছে। অন্য বর্ণনামতে আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার আহ্বানে অনিষ্ট অনুভব করিতেছি।

স্ত্রীর এই আপত্তি শুনিয়া কা'ব বলিল, আগন্তুক তো আমার ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা এবং দুধভাই আবূ নাইলা। সম্ভ্রান্ত লোককে সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানানো হইলে সেই ডাকেও সে সাড়া দেয়। ইহার পর সে বাহিরে আসিল। তাহার দেহ ও মাথা হইতে অপূর্ব সুঘ্রাণ বিকশিত হইতেছিল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১১)।

আবূ নাইলা (রা) তাঁহার সাথীদিগকে পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, সে বাহির হইয়া আসিলে আমি তাহার মাথার চুল ধরিয়া শুঁকিব। তোমরা যখন বুঝিতে পারিবে যে, আমি তাহার মাথা ধরিয়া তাহাকে আমার আয়ত্তে নিয়া আসিয়াছি, সেই সুযোগে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ১৭৮)।

কা'ব তাহাদের নিকট আসিবার পর বেশ কিছুক্ষণ তাহারা বিভিন্ন গল্প-গুজবে মাতিয়া থাকিল। ইহার পর আবূ নাইলা (রা) বলিলেন, হে ইব্ন আশরাফ! চল আজুয ঘাঁটি পর্যন্ত যাই। অবশিষ্ট রাত আমরা সেখানেই গল্প করিয়া অতিবাহিত করিব। সে বলিল, তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় চল। তাঁহারা কা'বকে সঙ্গে লইয়া হাঁটিতে লাগিল। পথিমধ্যে আবূ নাইলা (রা) তাহাকে বলিলেন, আজিকার মত এত উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। ইহা শুনিয়া কা'বের হৃদয় গর্বে ফুলিয়া উঠিল। সে বলিল, আমার নিকট আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী রহিয়াছে। আবূ নাইলা (রা) বলিলেন, সদয় অনুমতি পাইলে আপনার মাথাটি একটু শুঁকিব। সে বলিল, হাঁ, নিশ্চয়। আবূ নাইলা (রা) তখন কা'বের মাথায় হাত রাখিলেন, অতঃপর তাহার মাথা শুঁকিলেন এবং সঙ্গীদিগকেও শুঁকাইলেন। কিছু দূর অতিক্রম করিবার পর আবূ নাইলা বলিলেন, ভাই! আর একবার শুঁকিতে পারি কি? কা'ব ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি আবার তাহার মাথা শুঁকিলেন। ফলে সে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল (ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ২২৮)।

কিছুক্ষণ চলিবার পর আবূ নাইলা (রা) পুনরায় বলিলেন, ভাই! আর একবার শুঁকিব কি? কা'ব বলিল, হাঁ, শুঁকিতে পার। এইবার আবূ নাইলা (রা) তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে পূর্ণরূপে আয়ত্তে নিয়া আসিলেন এবং সাথীদিগকে বলিলেন, আল্লাহ ও রাসূলের এই শত্রুকে খতম কর। সকলে একযোগে তাহাকে আঘাত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের তরবারির আঘাত পরস্পরের তরবারির উপর পড়িতেছিল। ফলে কোন কাজ হইল না। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, যখন আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের তরবারিগুলি কোনই কাজে আসিতেছে না, তখন আমার তরবারিতে রাখা ছুরিটির কথা আমার মনে পড়িল। আমি উহা তাহার নাভীর নিচে পূর্ণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিলাম এবং তাহা নাভী ভেদ করিয়া পেটের ভিতর পৌঁছিয়া গেল।

আক্রান্ত হইয়া সে উচ্চস্বরে চিৎকার দিল এবং চর্তুদিকে উহার শব্দ পৌঁছিয়া গেল। এমন কোন দুর্গ বাকী ছিল না যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় নাই। কিন্তু উহা আমাদের কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই (বিদায়া, ২খ., পৃ. ৮-৯)।

এইভাবে কা'ব নিহত হইল। হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন মু'আয (রা)-ও আহত হইলেন। তাঁহার মাথা কিংবা পায়ে আমাদের তরবারির আঘাত লাগিয়াছিল। ইহার পর আমরা রওয়ানা হইয়া বানূ উমায়্যা ইব্ন যায়দ, বানূ কুরায়যা ও বু'আছ-এর এলাকা অতিক্রম করিয়া হাররাতুল উরায়জে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের সঙ্গী হারিছ ইব্ন আওস (রা) আহত হওয়ার কারণে পিছনে পড়িয়া গেলেন। আমরা তাহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে তিনি আমাদের পদচিহ্ন ধরিয়া আমাদের পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১১-২২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭১)।

রাত্রের শেষাংশে মুসলিম বাহিনী বাকী' আল-গারকাদে পৌঁছিয়া এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি দিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কা'ব নিহত হইয়াছে। সুতরাং তিনিও তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগিলেন। অতঃপর এই মুসলিম বাহিনী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেনঃ افلحت الوجوه (এই চেহারাগুলি সফল থাকুক)। তাঁহারাও বলিলেন, ووجهك يارسول الله (হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার চেহারাও সফলতা লাভ করুক)। তাঁহারা কা'বের কর্তিত মস্তক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে রাখিয়া দিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৬২; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ১৭৯; বিদায়া, ২খ., পৃ. ৯)।

অতঃপর মহানবী (স) হারিছ ইব্ন আওস (রা)-এর ক্ষত স্থানে নিজ মুখ নিঃসৃত লালা লাগাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।

ইব্ন আশরাফের নিহত হওয়ার পর কা'ব ইব্ন মালিক (রা) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

فغودر منهم كعب صريعا + فذلت بعد مصرعه النضير

على الكفين ثم وقد علته + بأيدينا مشهورة ذكور

بأمر محمد إذ دس ليلا + الى كعب اخا كعب يسير

فما كره فأنزله بمكر + ومحمود أخو ثقة جسور

"অবশেষে তাহাদের মধ্যকার কা'বকে ধরাশায়ী করা হইল এবং তাহার ধরাশায়ী হওয়ার পর বনূ নাযীর অপদস্ত হইল।

সে তথায় তাহার দুই হাতের উপর পড়িয়াছিল এবং আমাদের হাতের তীক্ষ্ণ তরবারি তাহাকে আঘাত করিয়াছিল।

যখন মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশক্রমে বনূ কা'বের জনৈক ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে গোপনে কা'বের দিকে যাইতেছিল। সে কৌশলে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিল। আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী ব্যক্তি প্রশংসার উপযুক্ত হইয়া থাকে" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১২)।

সকালবেলা ইয়াহূদীদের নিকট কা'ব ইব্ন আশরাফের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহাদের শঠতাপূর্ণ অন্তরে ভীতি, আতংক ও ত্রাসের সৃষ্টি হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন অনুধাবন করিবেন যে, শান্তি ভঙ্গকারী, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদিগকে উপদেশ দিয়া কোন ফলোদয় হইতেছে না তখন তিনি তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করিতেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। এইজন্যই ইয়াহূদীগণ তাহাদের স্বগোত্রীয় এই নেতার নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কোন কিছু করিবার সাহস পায় নাই। তাহারা একেবারে নীরব হইয়া গেল। তাহারা পুনরায় মুসলমানদিগকে অঙ্গীকার পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। প্রত্যেক ইয়াহূদী নিজ নিজ জীবনের আশংকা করিতে লাগিল। তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিল (ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ২২৯; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১২)। যেহেতু এই অভিযানে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, তাই ইহা সারিয়্যা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা নামে অভিহিত হইয়াছে।

কা'ব ইব্ন আশরাফের এই হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার বিরুদ্ধে বহিরাক্রমণের মুকাবিলা করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং মুসলমানগণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে অনেকাংশে নিরাপদ হইয়া ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করিলেন। ক্রমান্বয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা সুগম ও প্রসারিত হইল। বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি ও সাহস দুর্বল হইয়া পড়িল। বিশেষত ইয়াহূদীদের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা হ্রাস পাইল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, দিল্লী ১৯৩৮ খৃ.; (৩) আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী, সুনান আবী দাউদ, ২খ., মাকতাবা রহীমিয়্যা, দেওবন্দ ১৩৭৫ হি.; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা.বি., ৩খ.; (৫) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৫ম খণ্ড; (৬) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৩৮, বাব কাতলি কা'ব ইবনিল আশরাফ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা. বি.; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., দারুল জিল, নূতন

সংস্করণ, বৈরূত তা. বি.; (৮) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., দারুল ফিকর, বৈরূত, তা.বি.; (৯) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., তাহকীক ঃ ডঃ মার্সডিন জোন্স, মুয়াসসাসাতু আল-আ'লামী লিলমাতবূ'আত, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (১০) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., দারু সাদির, বৈরূত ১৪০২/১৯৮২; (১১) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২য় খণ্ড, মুয়াসসাসাতুল আ'লামী লিল-মাতবূ'আত, বৈরূত তা.বি.; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (১৩) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলিল্লাহ (স), অনু. শহীদ আখন্দ, ৩খ., ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৯২ খৃ.; (১৪) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., দারুল ইশা'আত, করাচী, তা.বি.; (১৫) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., মাকতাবা উছমানিয়া,লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫; (১৬) শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল জিল, মিসর, তা. বি.; (১৭) আল-কাসতাল্লানী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, উর্দু অনু. মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার খান আসাফী, ইসলামী কুতুব, করাচী ১৩৩৮ হি.; (১৮) আদ-দিয়ারবাক্‌রী, তারীখুল খামীস, আল-মাত্‌বা'আতুল ওয়াহ্‌হাবিয়া, কায়রো ১২৮৩ হি.; (১৯) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, মাতবা'আতুল আযহারিয়্যা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ.; (২০) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রাবিতা আল-'আলাম আল-ইসলামী, ৫ম সং, মক্কা মুকাররমা ১৪১৫/১৯৯৪; (২১) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ., ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪০৯/১৯৮৯; (২২) মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৪১৯/১৯৯৮; (২৩) A Guillaume, The Life of Muhammad, 8th impression, 1987, Oxford University Press, New York; (২৪) মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, রাসূলের (স) যুগের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস, ১ম সং., ঢাকা ১৪২৩/২০০২; (২৫) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ৫খ., মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ৭ম সং., দিল্লী ১৯৮২ খৃ.।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

সারিয়্যা যায়দ ইব্ন হারিছা

সারিয়্যা যায়দ ইব্ন হারিছা এই যুদ্ধাভিযানটি বিশিষ্ট সাহাবী আবূ উসামা যায়দ ইব্ন হারিছা ইব্ন শারাহীল, মতান্তরে শারাজীল-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া ছিল বিধায় ইহাকে সারিয়্যা যায়দ ইব্ন হারিছা (سرية زيد بن حارثة) নামে অভিহিত করা হয় (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৭)। ইমাম যুহ্রী বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে যায়দ ইব্ন হারিছা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন। তিনি বদরসহ ইসলামের বড় বড় জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে মূতার যুদ্ধে (৬২৯ খৃ.) সেনাপতি হিসাবে শহীদ হন (আল-ইসাবা ফী তাম্য়ীযিস সাহাবা, ২খ., পৃ. ৪৯)।

বদরের যুদ্ধে গৌরবময় বিজয় মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল এবং কুরায়শ তথা কাফির-মুশরিকদেরকে মানসিকভাবে হতবিহ্বল ও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। তাহারা মুসলমানদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ, যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ এবং নূতন ও ভিন্ন পথে বাণিজ্য বহর পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., ১৯৭; ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৬)। হাফিয ইব্ন কাছীর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধটি ৩য় হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৬)। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে ইহাই ছিল মুসলমানদের সর্বশেষ সফল সমরাভিযান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে কুরায়শরা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে শাম বা সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সময় সমাগত হইলে তাহাদের দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়া অধিক তীব্রতর হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িল। ঐ বৎসর সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে সিরিয়ায় গমনকারী বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর (দলনেতা) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাফওয়ান কুরায়শদের সমবেত করিয়া বলিল, নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার অকুতোভয় সঙ্গীরা আমাদের বাণিজ্য রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা সমুদ্র উপকূলবর্তী রাস্তাসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছে। উপরন্তু উপকূলের বাসিন্দারা তাহাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাধারণ লোকেরাও তাহাদের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাদের সহিত কিভাবে মুকাবিলা করিব বা বাণিজ্যিক ব্যাপদেশে নূতন কোন রাস্তা অবলম্বন করিব তাহা আমার

বোধগম্য হইতেছে না। আর বাণিজ্যিক সফর পরিহার করিয়া যদি আমরা নিজ নিজ বাড়ীতেই বসিয়া থাকি তবে যাইতে যাইতে এক দিন মূলধনও শেষ হইয়া যাইবে, কিছুই বাকী থাকিবে না। কারণ গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়ার সাথে এবং শীতকালে আবিসিনিয়ার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখিবার উপরই আমাদের জীবিকা নির্ভরশীল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭৪; ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৯৭)।

সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার এই উক্তি ও প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি লইয়া কুরায়শদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণা শুরু হইয়া গেল। শেষ পর্যায়ে আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব সাফওয়ানকে এই বলিয়া পরামর্শ দিল যে, তুমি উপকূলের আশংকাময় ও বিপদসংকুল রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া ইরাকের রাস্তা ধরিয়া বাণিজ্য বহর পরিচালনা কর। ইরাকের এই রাস্তাটি ছিল অত্যন্ত সুদীর্ঘ। রাস্তাটি মদীনার পূর্ব দিক দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং নাজ্‌দ হইয়া সিরিয়া পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাটি কুরায়শদের কাছে অনেকটা অপরিচিত ছিল। তাই আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব সাফওয়ানকে পরামর্শ দিল, বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের ফুরাত ইব্‌ন হায়্যানকে পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭৪)।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা ইরাকের নূতন পথ ধরিয়া সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার নেতৃত্বে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা শুরু করিল। পরামর্শ মুতাবিক তাহারা বনূ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের ফুরাত ইব্‌ন হায়্যানকে অর্থের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক হিসাবে সাথে নিল। ইব্‌ন হিশাম বলেন, ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান ছিল বানূ উজাল গোত্রের লোক ও বানূ সাহমের মিত্র (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৬৫১)।

কুরায়শদের এই বাণিজ্য সফরে আবূ সুফয়ান ইব্‌ন হারব, হুয়ায়তিব ইব্‌ন 'আবদুল উযযা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবী'আও অংশগ্রহণ করিয়াছিল। এই কাফেলায় অনেক রৌপ্য ও রৌপ্যের বাসনপত্র ছিল, যাহার ওজন ছিল ত্রিশ হাজার দিরহামের সমপরিমাণ (ইবনুল আছীর, তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ৪০; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, ৩৬)। কুরায়শদের এই অভিযানের সংবাদ সালীত ইব্‌ন নু'মানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) দ্রুত অবহিত হইলেন। ঘটনার বিবরণ এইরূপ যে, নাঈম ইব্‌ন মাসউদ মদীনায় আসিল। তাহার কাছে কুরায়শদের বাণিজ্য অভিযানের সংবাদ ছিল। সে ছিল বিধর্মী, মদীনায় আসিয়া বানূ নাযীর গোত্রের কিনানা ইব্‌ন আবুল হুকায়ক-এর সাথে সখ্যতা স্থাপন করিল। তাহাদের সাথে ছিল সম্প্রতি ইসলাম কবুলকারী সালীত ইব্‌ন নু'মান (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৬)। তাহারা এক মদ্যপানের আসরে উপস্থিত হইয়া শরাব পান করে (ঘটনাটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের)। যখন না'ঈম মাদকতায় চরমভাবে আচ্ছন্ন হইয়া হিতাহিত জ্ঞানহীন হইয়া পড়িল তখন সে নূতন পথে কুরায়শ কাফেলার বাণিজ্যিক সফর ও তাহাদের অভিপ্রায়ের কথা ফাঁস করিয়া দিল। সালীত ইব্‌ন নু'মান (রা) বর্ণনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত গতিতে নবী করীম (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ জানিতে পারিয়া সাথে সাথে আক্রমণের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। তিনি এক শতজন অশ্বারোহীর একটি বাহিনী যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে এই সমরাভিযানে অংশগ্রহণ করেন নাই। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া দ্রুত গতিতে তাহাদের পশ্চাৎধাবন করিলেন। কুরায়শ কাফেলা সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় কারাদা নামক একটি প্রস্রবণের নিকট শিবির স্থাপনের নিমিত্ত অবতরণ করিয়াছিল। কারাদা হইল যাতু-ইর্‌ক প্রান্তরের নজদ এলাকার রাবাযাহ ও গামারাহ-এর মধ্যবর্তী একটি জলাশয়ের নাম (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, ৩৬; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (বাংলা), ৩খ., পৃ. ২২১)। ইবনুল-আছীর ঐ স্থানটির নাম 'ফারদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ৪১)।

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর বাহিনী ঐ জলাশয়ের কাছে কুরায়শ কাফেলার মুকাবিলা করিলেন। অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া তাহারা কাফেলার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করিলেন। দলনেতা সাফওয়ানসহ অধিকাংশ কুরায়শ সদস্য সকল মালামাল ছাড়িয়া পালায়ন পূর্বক জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু কাফেলার পথপ্রদর্শক ফুরাত ইব্ন হায়্যান এবং কথিতমতে অন্য আরও দুইজন লোক মুসলিম বাহিনীর হাতে ধৃত হইল।

কাফেলা হইতে প্রাপ্ত আনুমানিক এক লক্ষ দিরহাম মূল্যের রৌপ্য সম্পদ মুসলমানগণ গনীমতরূপে লাভ করিলেন এবং উট বোঝাই করিয়া সমস্ত মালামাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহানবী (স) বিধি মুতাবিক এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া বাকী সম্পদ অভিযানে শরীক সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিলেন। বণ্টিত ঐ এক-পঞ্চমাংশ সম্পদের মূল্যের পরিমাণ ছিল তেইশ বা পঁচিশ হাজার দিরহাম (সীরাতে মুহাম্মাদিয়া, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., ৩৫৪)। ফুরাত ইব্ন হায়্যানকে বন্দী অবস্থায় নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডই হইবে তোমার একমাত্র শাস্তি। অতঃপর ফুরাত নবী করীম (স)-এর হাতে ইসলাম কবুল করিলেন (তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৬; তারীখুত তাবারী, ২খ, পৃ. ১৮৩)।

ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) উহুদের পর দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের ঐ ভিন্ন ও নূতন পথ অবলম্বনের কারণে ভর্ৎসনা করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

دعوا فلجات الشام قدحال دونها - جلاد كافواه المخاض الاوارك

بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم - وانصاره حقا وايدى الملائك

اذا سلكت للغور من بطن عالج - فقولا لها ليس الطريق هنالك

"তোমরা সিরিয়ার ক্ষুদ্র নির্ঝরণীগুলি এখন ছাড়িয়া দাও, কেননা তাহার (এবং তোমাদের) মাঝে এমন তীক্ষ্ণ (তরবারি) অন্তরায় হইয়া গিয়াছে যাহা পিলুবৃক্ষ ভক্ষণকারিনী অন্তঃসত্তা উটনীর মুখের ন্যায় ভয়ংকর। (সেইসব তরবারি) ঐসব লোকের হাতে রহিয়াছে যাহারা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রকৃত সাহায্যকারীদের দিকে হিজরত করিয়াছেন এবং তাহা রহিয়াছে ফেরেশতাদের হাতে। মরু এলাকার নিম্ন ভূমির দিকে যে কাফেলা চলিবে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, এই দিকে কোন রাস্তা নাই" (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩০৯)।

বদর যুদ্ধের পরে এই ঘটনাই ছিল কুরায়শদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। এই পরাজয় ও ব্যর্থতার পর তাহাদের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বহু গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা থাকে। হয় তাহারা গর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে, নতুবা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া পরবর্তী যুদ্ধে বিরাট সাফল্য অর্জন পূর্বক নিজেদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরাইয়া আনিবে এবং মুসলমানদিগকে মূলোৎপাটিত করিবে। মক্কাবাসী কুরায়শগণ এই দ্বিতীয় পথটিই বাছিয়া লইল। সুতরাং এই ঘটনার পর কুরায়শদের প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা আরও তীব্রতর হইল। তাহারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করিবার জন্য পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিল। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধের ইহাও একটি কারণ ছিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৭)।

এই যুদ্ধাভিযানের ফলে মুসলমানদের শক্তি-সাহস সকল দিক হইতে বাড়িয়া গেল। অনেক মুশরিক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইতে লাগিল। ফলে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বেগবান হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, বৈরূত, ১ম সং, ১৪০৫/১৯৮৫; (২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩০৯, কায়রো ১৪১০/১৯৯০; (৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ, বৈরূত, তা. বি.; (৪) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুত তাবারী, বৈরূত ১৮৭৯ খৃ.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ, বৈরূত; (৬) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফীত-তারীখ, ২খ, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭; (৭) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলিল্লাহ্, অনু. শহীদ আখন্দ, ৩খ., ই. ফা. বা., ঢাকা ১৪১৩/১৯৯২; (৮) শায়খ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাক্র আল-খাতীব আল-কাসতাল্লানী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিব লাদুন্নিয়্যা, উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার খান আসাফী, করাচী ১৩৩৮ হি.; (৯) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা ফী তা'মৃয়ীযিস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ; (১০) ইব্নুল আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান তা. বি.; (১১) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রিয়াদ ১৪১৪ / ১৯৯৪ ।

ডঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম

গাযওয়া উহুদ

উহুদ (أحد) 'হামযা' ও 'হা' বর্ণে পেশযোগে গঠিত, প্রসিদ্ধ এক পাহাড়বিশেষ, মদীনা হইতে তিন/সাড়ে তিন মাইল উত্তরে ইহার অবস্থান (দা. মা. ই., ২খ, ৫৬১)। মসজিদে নববী হইতে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে দীর্ঘ এই পাহাড়টি শক্ত নুড়িযুক্ত মাটি দ্বারা আবৃত। ইহার উত্তর পার্শ্ব চওড়া পাথরবিশিষ্ট, যাহা দেখিতে অনেকটা উচ্চ দেয়ালের মত মনে হয়। লাল বেলে পাথর ও শক্ত পাথরের টুকরা পাহাড়টির প্রায় সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় (দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ১৪২)। ইহার পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, যাহাকে জাবালুর রুমাত বা জাবালুল 'আয়নায়ন বলা হয়। উক্ত পাহাড়ের পূর্বে একটি প্রাচীন সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, অতীতে কোন এক সময় এখানে বন্যা হইত। ফলে শহর হইতে উহুদের শহীদদের যিয়ারতের উদ্দেশে আগত মুসলিমগণ উক্ত সেতু ব্যতীত জলাশয় পার হইতে পারিতেন না।

হযরত হারূন (আ) তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মূসা (আ)- এর সাথে হজ্জ বা 'উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকালে এখানে ইন্তিকাল করেন এবং এই পাহাড়ের পাদদেশেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। হযরত মূসা (আ)- এর কবরও এই পাহাড়ে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় (উমদাতুল কারী, ১৭খ, ১৩৭; সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ১ ও ২খ, ৩৫৪)।

এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাতায়াতের কোন রাস্তা ছিল না। মাঝখানের দৈর্ঘ্য ছিল এক-দেড় ফার্লং (৮ ফার্লং সমান ১ মাইল)। ইহার অভ্যন্তরীণ মাঠ যেহেতু সর্বদিক দিয়াই নিরাপদ ও অনেকটা সুরক্ষিত তাই উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এখানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ খ, ১৭৫)। প্রাচীন কাল হইতেই মদীনাবাসীদের নিকট উহুদ পাহাড় ছিল অত্যন্ত প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ইহা (উহুদ) একটি পাহাড়, যাহা আমাদিগকে ভালবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালবাসি" (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, কিতাবুল মাগাযী, বাব ২৪, পৃ. ৫৮৫)।

এই পাহাড়কে উহুদ নামকরণের কারণ হইল, পার্শ্ববর্তী পাহাড়সমূহ হইতে ইহা স্বতন্ত্র একটি পাহাড়বিশেষ। মদীনা নগরী হইতে দৃষ্টি দিলে ইহাকে গাঢ় লাল বর্ণের বলিয়া মনে হয়। খুব বেশী উদ্ভিদ এই পাহাড়ে জন্মায় না। তবে বর্ষায় পর্বত গুহার গর্তসমূহে পানি জমিয়া যায় এবং বেশ কিছু দিন তাহা পানিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। মহানবী (স) উহুদ যুদ্ধে আহত হইলে তাঁহার রক্তাক্ত ক্ষত স্থানসমূহ ধৌত করিবার জন্য হযরত আলী (রা) পাহাড়ের ঐ প্রাকৃতিক

গর্তসমূহ হইতে স্বীয় ঢাল পূর্ণ করিয়া পানি আনিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায় (পূর্বোক্ত, বাব ২১, পৃ. ৫৮৪)। এই ঐতিহাসিক পাহাড়ের পাদদেশে ইসলামের দ্বিতীয় বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বিধায় ইহাকে 'উহুদ যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়।

বদর যুদ্ধে মক্কার কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছিল, 'উহুদ' যুদ্ধের ইহাই অন্যতম কারণ। বদর প্রান্তরে সুসজ্জিত কুরায়শ বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিহত হওয়ায় মক্কায় কান্নার রোল পড়ে ও শোকের ছায়া নামিয়া আসে। ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের স্পৃহা তাহাদের মাঝে তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। আর আরবরা ছিল প্রতিশোধ পরায়ণ জাতি। প্রতিশোধ গ্রহণকে তাহারা তাহাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের মত একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। তাহারা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে উৎখাত করিবার অশুভ পায়তারা ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বদর যুদ্ধে সংখ্যালঘু মুসলিম বাহিনী যে অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও বল-বীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল কুরায়শ সৈন্যদের তাহা বিশেষভাবে স্মরণ ছিল। এই সকল দিকের প্রতি সার্বিক লক্ষ্য রাখিয়াই কুরায়শগণ যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনে ব্রতী হয়।

কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান বাণিজ্যিক বহরে থাকার কারণে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। কুরায়শ বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব এইবার তাহার উপরই ন্যস্ত হইল। সিরিয়া হইতে যে বাণিজ্য বহর লইয়া আবূ সুফয়ান আসিয়াছিল, তাহারা যখন দারুন-নাদ্ওয়ায় বৈঠকরত, এমন সময় কুরায়শদের মধ্য হইতে আল-আসওয়াদ ইব্নুল মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, জুবায়র ইব্ন মুতইম, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল, হারিছ ইব্ন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাবী'আ প্রমুখ এবং বদর যুদ্ধে যাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা নিহত হইয়াছিল তাহাদিগকে সাথে লইয়া আবূ সুফয়ান ও বাণিজ্য বহরে যাহাদের সম্পদের অংশ ছিল তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল ঃ

يا معشر قريش إن محمدا قدوتركم وقتل خياركم فاعينونا بهذا المال على حربه.

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তোমাদের নেতৃবর্গকে হত্যা করিয়াছে। অতএব তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই মাল দিয়া আমাদেরকে সাহায্য কর" (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ইব্ন হিশাম, ১খ, ৬০; কিতাবুল মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, ১খ, ১৯৯)।

আবেদনটি ছিল অত্যন্ত সময় উপযোগী। উত্থাপন করিবার সাথে সাথেই উহা গৃহীত হইল। ফলে বাণিজ্য বহরের পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা যুদ্ধের তহবিলে জমা দেওয়া হয়। তাহাদের ছিল আরও এক হাজার উট; ঐগুলির মূল্যও যুদ্ধের ব্যয় তহবিলে জমা করা হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৮)। অন্য বর্ণনায় তাৎক্ষণিকভাবেই আড়াই লক্ষ দিরহাম যুদ্ধ তহবিলে সংগৃহীত হয়। কুরায়শ বণিকগণ তাহাদের পূর্ণ মূলধন বা লভ্যাংশের সম্পূর্ণই যুদ্ধের ব্যয়খাতে

প্রদান করে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, পৃ. ১৭৫)। ইব্ন ইসহাক বলেন, কোন কোন আলিম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুরায়শদের সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ১০) ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ.

"আল্লাহ্র পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে, অতঃপর উহা তাহাদের মনস্তাপের কারণ হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে এবং যাহারা কুফরী করে তাহাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হইবে" (৮ ঃ ৩৬)।

যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহের পর কুরায়শ নেতৃবৃন্দ জনসমর্থন ও জনশক্তি অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী ছাড়াও তাহারা নিজেদের নকীব ও প্রতিনিধি বিভিন্ন গোত্রে প্রেরণ করিয়া তাহাদেরকে মদীনা আক্রমণ করিতে আহ্বান জানাইল। সৈন্যবাহিনী গঠন ও লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে চারটি ছোট দলও তাহারা বিভিন্ন গোত্রে প্রেরণ করিল। এই চারটি দলের নেতৃত্বে ছিল যথাক্রমে 'আমর ইব্নুল 'আস, হুবায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহ্ব, ইব্নুয যিবআরা এবং আবূ উযযা আল- জুমাহী (আল-কামিল ফীত- তারীখ, ২খ, ১৪৯)। আরববাসীদেরকে যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন অভিযানে উদ্দীপিত করিবার প্রধানতম হাতিয়ার ছিল প্রাণস্পর্শী কবিতা।

কুরায়শদের মধ্যে আবূ 'উযযা আমর আল-জুমাহী ও মুস'আব নামে প্রসিদ্ধ দুইজন কবি ছিল। আবূ 'উযযা বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিল। সে ছিল বহু সন্তানের জনক ও দরিদ্র ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে দয়াপরবশ হইয়া বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা তাহার কাছে গিয়া বলিল, হে আবূ 'উযযা! তুমি একজন নামকরা কবি। যুদ্ধে চল এবং কবিতার মাধ্যমে আমাদিগকে সহায়তা কর। সে বলিল, মুহাম্মাদ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, তাহার বিরুদ্ধে আর কবিতা রচনা করিব না। আমি ভয় করিতেছি যে, দ্বিতীয়বার তাঁহার হাতে ধৃত হইলে আর মুক্তি পাইব না (নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ১২)। সাফওয়ান তাহাকে বারবার বুঝাইতে লাগিল। বলিল, তুমি তো নিজের জীবন দিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পার। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যদি তুমি নিরাপদে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতে পার তবে সম্পদ দিয়া তোমাকে ধনী করিয়া দিব। আর যদি মারা যাও, তবে তোমার মেয়েদের আমাদের মেয়েদের সাথে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিব (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১০)। কিন্তু ইহাতেও সে সম্মত না হইলে সাফওয়ান নিরাশ হইয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সাফওয়ান ও জুবায়র ইব্ন মুত'ইম তাহার কাছে যাইয়া পূর্বের ন্যায় বুঝাইতে লাগিল। জুবায়র ইব্ন মুত'ইম বলিল, হে আবূ উযযা! আমি তোমার কাছে আসিয়াছি সহযোগিতার আশায়, তুমি তাহা অস্বীকার করিবে বা ফিরাইয়া দিবে তাহা ধারণা করি নাই। ইহাতে সে রাযী হইয়া আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। সে বানূ কিনানাকে কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানাইল ঃ

أيـها بـنى عـبد مـناة الرزام + أنـتم حـماة وأبـوكم حام

لا تعدونى نصركم بعد العام + لا تسلمونى لا يحل إسلام.

"হে অবিচল যোদ্ধা বানূ আব্দ মানাত! তোমরা হইলে গোত্র মর্যাদা রক্ষাকারী, যেমন ছিল তোমাদের পূর্বপুরুষগণ (সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সাহায্য কর)। এই বৎসরের পর আমাদের সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতির কোন প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে শত্রুদের হাতে ছাড়িয়া দিও না। কেননা এইরূপ করা আদৌ সমীচীন নয়" (কিতাবুল মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, পৃ. ২০১; আল- বিদায়া, ৩খ., পৃ. ১০)।

মুসাফি' ইব্ন আব্দ মানাফ বনূ মালিক ইব্ন কিনানার কাছে গিয়া তাহাদিগকেও রাসূলুল্লাহ (স) -এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিল। জুবায়র ইব্ন মুত'ইম তাহার হাবশী গোলাম ওয়াহ্শীকে বলিল, লোকদের সঙ্গে যুদ্ধে চল। যদি তুমি মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করিতে পার তবে দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্তি পাইবে (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৫৪)।

মক্কার চারিদিকে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িল। অল্প কালের ব্যবধানে বিভিন্ন গোত্র হইতে বহু দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধা মক্কায় একত্র হইল। এইভাবে কুরায়শগণ আবূ সুফয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট অমিততেজা বাহিনী গঠন করিল। তন্মধ্যে সাত শত ছিল লৌহ বর্মধারী, দুই শত ছিল অশ্বারোহী। ইব্ন হাজার 'আসকালানী ফাতহুল বারীতে অশ্বারোহী এক শত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৭খ, ৩৪৬; যাদুল মা'আদ, ২খ, পৃ. ৯২)। এই যুদ্ধে তাহারা তিন হাজার উট সঙ্গে আনিয়াছিল। আবূ সুফয়ান ছিল যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব ছিল খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদের উপর। তাহার সহযোগী ছিল 'ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল। যুদ্ধের পতাকা ছিল বনী 'আবদুদ দার-এর হাতে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৯)।

নারী ছিল আরবদের যুদ্ধে উন্মাদনা ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। যেই সকল যুদ্ধে নারীরা উপস্থিত থাকিত সেইগুলিতে আরব যোদ্ধারা জীবনপণ করিয়া লড়াই করিত। কেননা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে নারীদের কারণে লজ্জিত হওয়ার প্রশ্নও জড়িত থাকিত (সীরাতুন-নবী, শিবলী নু'মানী, ১খ, ২১৬)। তাই যুদ্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের জন্য তাহারা নারীদেরকেও সাথে লইল। সেনাপতি আবূ সুফয়ান স্ত্রী হিনদ বিন্ত 'উত্বাকে, 'ইকরামা ইব্ন

আবূ জাহল উম্মু হাকীম বিন্তুল হারিছকে, হারিছ ইব্ন হিশাম ফাতিমা বিনত ওয়ালীদকে, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা বারযা বিনত মাসউদকে, 'আমর ইব্নুল 'আস রীতাহ বিনত মুনাব্বিহকে, আবূ তালহা মুলাফা বিন্ত সা'দকে সাথে লইল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১০১-১০২)। এইরূপ মোট পনেরজন কুরায়শ মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৪৮-২৪৯)। সম্মিলিত সশস্ত্র এই বিশাল বাহিনী শাওওয়াল মাসে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব তখনও মক্কায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করিলেও ভাতিজা মুহাম্মাদ (স)-এর শুভাকাংখী ছিলেন। তিনি কুরায়শদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ সীল-মহরকৃত পত্রে জনৈক গিফারী দূতের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট প্রেরণ করেন। দূতকে তিনি তিন দিনের মধ্যে মদীনায় পৌঁছিয়া মুহাম্মাদ (স)-কে যুদ্ধের সংবাদ জানাইতে নির্দেশ দেন। পত্রবাহক আদেশ মুতাবিক পাঁচ শত কিলোমিটার পথ মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করিয়া মসজিদে কুবায় মহানবী (স)-কে পাইয়া পত্র হস্তান্তর করে। উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে পত্র পাঠ করিয়া শোনান। তিনি বিষয়টি গোপন রাখিতে উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-কে নির্দেশ দেন। অতঃপর নবী (স) সা'দ ইব্ন আবুর রাবী'-এর বাড়ীতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে অন্য কেহ আছে কি না? সা'দ (রা) বলিলেন, ঘরে অন্য কেহ নাই। বলুন, হুযূর! আপনার জন্য কি করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পিতৃব্য আব্বাসের পত্রের সংবাদ জানাইলেন। সা'দ (রা) সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, আমার ধারণা ইহাতে কোন মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর সা'দ (রা)-কে বিষয়টি গোপনীয়তা রক্ষা করার পরামর্শ দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দ্রুত মদীনায় চলিয়া আসিলেন (কিতাবুল মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, পৃ. ২০৪)। মক্কার কুরায়শ বাহিনী মদীনার পথে যাত্রা করিয়া বার দিনের কঠিন ও বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়া জঙ্গলের নিকট ছাউনী স্থাপন করিল। যাত্রাকালে "আবওয়া" নামক স্থানে পৌঁছিলে আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ মুহাম্মাদ (স) -এর মাতা আমিনা-এর কবর খনন করিতে বলিলে বাহিনীর নেতৃবৃন্দ অশুভ পরিণতির আশংকায় তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা মদীনার নিকটবর্তী আল-'আকীক' উপত্যকার সামান্য ডানদিকে উহুদ পাহাড় সংলগ্ন 'আয়নায়ন' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৫০)।

এইদিকে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা কুরায়শদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ মদীনায় প্রেরণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) আনাস ও মুনিস (রা) নামক দুইজন সাহাবীকে শত্রুবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, কুরায়শ সৈন্য মদীনার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের অশ্বপাল মদীনার চারণভূমির তৃণলতা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশক্রমে হুবাব ইব্নুল মুনযির (রা) কুরায়শদের সৈন্যসংখ্যা তাঁহাকে অবহিত করেন। আক্রমণের আশংকায় মদীনার চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা

করা হয়। সা'দ ইব্ন 'উবাদা ও সা'দ ইব্ন মুআয (রা) হাতিয়ার লইয়া সারা রাত মসজিদে নববীর দরজায় পাহারারত থাকেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, পৃ. ২১৭)।

পরদিন শুক্রবার প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। তিনি উপস্থিত সকলের সামনে তাঁহার দেখা এক স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া বলিলেন, আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম, আমার তরবারির অগ্রভাগের অংশবিশেষ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমার হাত একটি মজবুত লৌহবর্মে ঢুকাইয়া নিয়াছি। ইব্ন হিশাম বলেন, কোন কোন আলিম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, দেখিলাম, আমার কিছু গাভী যবাই করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন, গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য আমার কিছু সাহাবী শহীদ হইবেন। আর তরবারি ভাঙ্গন এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আমার বংশের এক ব্যক্তি শাহাদত লাভ করিবেন (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ২খ, ৬২)।

অতঃপর মহানবী (স) তাঁহার অভিমত সাহাবীদেরকে জানাইলেন যে, এইবার তাহারা মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিবেন না। যদি মক্কার বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে তবে তাহারাও পাল্টা আক্রমণ করিবেন। অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার মহিলাদিগকে বহিঃদুর্গে পাঠাইয়া দেওয়ার এবং শহরে অবস্থান করিয়া শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন। তাহাদের কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সামনে কাংখিত দিনটি আনিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আপনি আমাদিগকে লইয়া শত্রুদের দিকে বাহির হইয়া পড়ুন যাহাতে তাহারা আমাদিগকে কাপুরুষ ভাবিবার সুযোগ না পায় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৫১)।

এই উৎসুক দলের অগ্রে ছিলেন হামযা (রা), সা'দ ইব্ন 'উবাদা, নু'মান ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা (র) প্রমুখ সাহাবী। আবূ সাঈদ খুদরী (র)- এর পিতা মালিক ইব্ন সিনান (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আমরা বিজয় অথবা শাহাদাত এই দুইটি কল্যাণের যে কোন একটি অবশ্যই লাভ করিব। হামযা (রা) মদীনার বাহিরে যাইয়া শত্রুদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বর্ণিত আছে যে, হামযা (রা) রোযা অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত লাভ করেন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ২১১)।

অধিকাংশ সাহাবীর প্রস্তাব যখন মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষে আসিল, তখন মহানবী (স) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই সমর্থন করিলেন। সকলের মাঝে তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। বাদ জুমু'আ তিনি জিহাদ সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ ও উৎসাহ দিলেন। রণক্ষেত্রে দৃঢ় থাকিবার আদেশ দিতে গিয়া বলিলেন, ধৈর্য ধারণ ও যথাযথ কর্তব্য পালন করিতে পারিলে তোমরা বিজয়ী হইবে। তিনি এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

"হাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করিলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন" (৩ ঃ ১২৫)।

ঐদিন মালিক ইব্‌ন 'আমর (রা) নামে একজন আনসার ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জানাযা শেষে সকলকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলিলেন (ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত রাসূলিল্লাহ, ৩খ., ২৩৪)।

মহানবী (স) বাদ আসর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রণসাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। পর পর দুইটি বর্ম দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন। এইদিকে এক হাজার মুজাহিদ রণসাজে সজ্জিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও উসায়দ উব্‌ন হুদায়র (রা) মুসলিম সৈন্যদের বলিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের নবী করীম (স)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করা ঠিক হয় নাই। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, হুযূর (স) -এর নিকট সিদ্ধান্তের ভার ন্যস্ত করা যায় কিনা? সবাই কৃতকর্মের জন্য তখন অনুতপ্ত হইলেন। নবী করীম (স) অপূর্ব রণসাজে সজ্জিত হইয়া আবূ বাক্‌র ও উমার (রা)-কে সাথে লইয়া সাহাবীদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারা লজ্জিত, আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করা আমাদের সমীচীন হয় নাই। আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি। আপনি যুদ্ধের পোশাক খুলিয়া ফেলুন। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন ঃ

ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه.

"কোন নবীর পক্ষেই যুদ্ধের পোশাক পরিধান করিবার পর তাহা খুলিয়া ফেলা শোভনীয় নয় যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ও শত্রুদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন" (মুখতাসার সীরাতুর রাসূল , পৃ. ১১৯)।

এই যুদ্ধ কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের এগার তারিখের রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাফীউর রহমান মুবারকপুরীসহ কোন কোন আলিমের মতে শাওয়াল -এর সপ্তম রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, আবার কেহ কেহ ১৫ শাওয়ালে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা ঃ মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১- ২খ, পৃ. ৩৫৪)। মহানবী (স) এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে তিনটি দলে বিভক্ত করিলেন। (ক) মুহাজিরদের দল ঃ এই দলের পতাকা দিলেন মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র আল-আবাদী (রা) -এর হাতে। মুস'আব শাহাদত লাভ করিলে আলী (রা)-কে উহা দিবেন। (খ) আনসারদের আওস গোত্রের পতাকা দিলেন উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা)-এর হাতে। (গ) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের পতাকা দিলেন হুবাব ইবনুল মুনযির, মতান্তরে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)- এর হাতে (আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৫২)।

আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) -এর কাছে মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তিনি শত্রুর মোকাবিলায় বাহির হইলেন। মুসলিম মহিলাদিগকে সুরক্ষিত স্থানে প্রেরণ করিলেন। অবশ্য আইশা, উম্মু 'উমারা, সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব, ফাতিমা, হামনা বিনত জাহ্শ (রা) প্রমুখ দশ- পনেরজন মুসলিম মহিলা আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা, তাহাদেরকে পানি পান করানো এবং মদীনা হইতে খাবার সংগ্রহ করার জন্য যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। তম্মধ্যে একশত জন বর্মধারী, পঞ্চাশজন তীরন্দাজ, পঞ্চাশজন অশ্বারোহী, বাকী সবাই পদাতিক। মূসা ইব্ন 'উকবা (রা) বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে কোন অশ্ব ছিল না। আল-ওয়াকিদীর মতে, ইহাতে দুইটি অশ্ব ছিল। একটি রাসূলুল্লাহ (স) -এর জন্য, অপরটি আবু বুরদা (রা)- এর জন্য (ফাতহুল-বারী, ৭খ, ৩৫০)।

মদীনা সনদের শর্তানুযায়ী সেখানকার ইয়াহূদীরা বহিঃ আক্রমণ-এ মুসলমানদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাদের ধর্মীয় শাস্ত্রে "সাব্ত" তথা শনিবারে যুদ্ধ অবৈধ এই অজুহাত তুলিয়া তাহারা সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকে। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, বনূ কায়নুকার আত্মীয় কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী দুরভিসন্ধিমূলকভাবে মুসলমানদের সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিলে সন্দেহপরায়ণ হইয়া নবী করীম (স) তাহাদিগকে সৈন্যভুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, ১৭৬)।

মুসলিম বাহিনী মদীনা হইতে বাহির হইয়া যখন আশ- শায়খান নামক স্থানে পৌঁছিল তখন সৈন্য পরীক্ষা করা হইল। অল্প বয়স্ক ও যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত বলিয়া যাহাদিগকে ফেরত পাঠানো হইল তাহাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্নুল খাত্তাব, উসামা ইব্ন যায়দ, উসায়দ ইব্ন হুদায়র, যায়দ ইব্ন ছাবিত, যায়দ ইব্ন আরকাম, আরাবায়া ইব্ন যুবায়র, আমর ইব্ন হায্ম, আবূ সা'ঈদ আল- খুদরী, যায়দ ইব্ন হারিছা আল- আনসারী, সা'দ ইব্ন হুবাব, বারাআ ইব্ন হায্ম প্রমুখ (তারীখুত তাবারী, ২খ., ১৯১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪ খ, ১৬)।

আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের এমন বিস্ময়কর নমুনা ছিল যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা)-কে যখন বলা হইল, তুমি বয়সে ছোট, বাড়ী ফিরিয়া যাও, তখন তিনি পায়ের আংগুলের উপর ভর করিয়া বুক টান করিয়া দাঁড়াইলেন, যাহাতে উঁচু দেখা যায়। তাঁহার এই কৌশল ফলপ্রসূ হইল। তিনি সৈন্যবাহিনীতে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন (তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ, ১৯১)। অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাফে' (রা) অল্প বয়স হইতেই তীর নিক্ষেপে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। রাফে' (রা)- এর সমবয়সী ছিলেন সামুরা নামে অপর এক বালক। তিনি যুক্তি দাঁড় করাইলেন, আমি কুস্তিতে রাফেকে পরাজিত করিতে পারি। তাহাকে যদি যুদ্ধে নেওয়া হয় তবে আমাকেও নিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের দুইজনকে কুস্তিতে লাগাইয়া
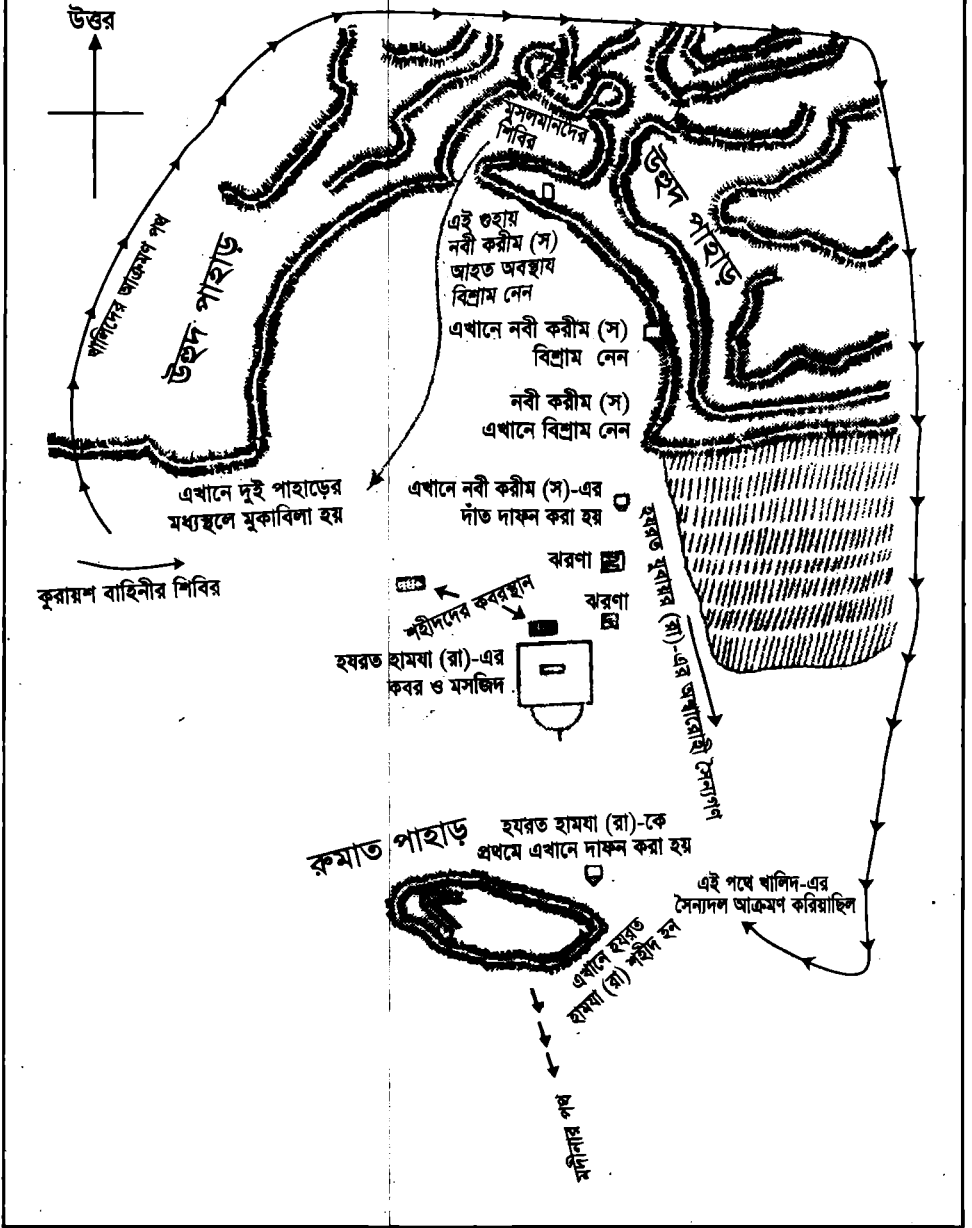
তাফহীমুল কুরআন-এর সৌজন্যে, আধুনিক প্রকাশন।

দিলেন। সামুরা রাফেকে কুস্তিতে পরাস্ত করিলে তাহাকেও সৈন্যদলে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইল (শিবলী নু'মানী, ১খ, ২১৮; আর-রাহীকূল মাখতূম, পৃ. ২৫৩)। মুসলিম বাহিনী যাত্রাকালে এই শায়খান নামক স্থানেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তাহারা মাগরিব ও পরে ইশার সালাত আদায় করিলেন এবং এখানেই রাত্রি যাপন করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা আল-আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন সৈন্যের এক বাহিনীকে রাতের পাহারায় নিযুক্ত করেন। যাকওয়ান ইব্ন আবদ কায়স বিশেষভাবে নবী করীম (স)-কে পাহারা দেন (আর-রাহীকুল- মাখতূম, ২৫৩)। নবী করীম (স) শেষরাতে আবার যাত্রা শুরু এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছিয়া ফজরের সালাত আদায় করিলেন। মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিল। উভয় বাহিনী পরস্পরকে দেখিতেছিল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি তখন তিন শত সৈন্য লইয়া এই বলিয়া দল ত্যাগ করিল যে, ماندرى علام نقتل انفسنا "আমরা জানি না কিসের জন্য নিজেদেরকে হত্যার পথে ঠেলিয়া দিব"? সে আরও যুক্তি দেখাইল যে, মুহাম্মাদ তাহার মতামত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং অন্যদের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মুনাফিক নেতার কথা ছিল দুরভিসন্ধিমূলক অর্থাৎ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ, আতংক ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। সে তাহার উদ্দেশ্যে কিছুটা সফলও হইয়াছিল। বনূ হারিছা ও বনূ সালামা গোত্রের লোকেরা অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মনকে সুদৃঢ় করেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন, আর আল্লাহর প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে" (৩ ঃ ১২২)।

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন হারাম (রা) এই কঠিন মুহূর্তে তাহাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া দিতে থাকিলেন এবং যুদ্ধে ফিরিয়া আসার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা বলিল, যদি জানিতাম তোমরা যুদ্ধ করিতে পারিবে তবে আমরা ফিরিয়া যাইতাম না। প্রত্যাবর্তন করাইতে অপারগ হইয়া আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ' হে দুশমনরা! আল্লাহ তোমাদিগকে নিজ রহমত হইতে দূরে রাখুন। অচিরেই আল্লাহ তাঁহার নবী (স)-কে তোমাদের হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৪; ইব্ন কাছীর, পৃ. ১৪)। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এই গোপন নিফাক স্পষ্ট করিয়া দিয়া ইরশাদ করেন ঃ

فَمَالَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً.

"তোমাদের কি হইল যে, মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া পড়িলে, যখন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? আর আল্লাহ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না " (৪ ঃ ৮৮)।

অবশিষ্ট সাত শত সৈন্য লইয়া মহানবী (স) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। শত্রুরা উহুদ প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিবার দরুন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এমন কে আছে যে আমাদিগকে শত্রু বাহিনীর পাশ কাটাইয়া বিকল্প পথ দিয়া গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে? তখন আবূ খায়ছামা (রা) বলিলেন, আমি পারিব । অতঃপর তিনি বনূ হারিছা গোত্রের শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়া সংক্ষিপ্ত পথে কাফির বাহিনীকে পশ্চিমে রাখিয়া সারবা ইব্‌ন কায়নাতী নামক অন্ধ মুনাফিকের খেজুর বাগানের পাশ দিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ঐ অন্ধ মুনাফিক মুসলমানদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি রাসূল হও তবে আমার বাগানে প্রবেশাধিকার তোমার নাই। মুসলমানগণ এই কথা শুনিয়া তাহাকে হত্যার জন্য উদগ্রীব হইলে মহানবী (স) বলিলেন, তাহাকে হত্যা করিও না। কারণ সে চোখ এবং অন্তর উভয় দিকেই অন্ধ।

অতঃপর হুযূর (স) উহুদ পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকায় ঐ সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া যাইয়া অবতরণ করেন। মদীনাকে সামনে রাখিয়া উহুদ পাহাড়কে পিছনে রাখিয়া এমনভাবে সৈন্য মোতায়েন করেন যে, কাফির বাহিনী মদীনা ও মুসলমানদের মধ্যখানে পড়িয়া যায় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৫৪-২৫৫)। পাহাড়ের অর্ধবৃত্ত ময়দানের অভ্যন্তরে অধিকতর সংরক্ষিত স্থানে মুসলিম বাহিনী ছাউনি স্থাপন করিলেন। সৈন্যদের তীরের ন্যায় সোজা সারিবদ্ধ করা হইল। উহুদ পাহাড়ের পূর্ব পাদদেশকে পশ্চাতে রাখা হয় যাহাতে সকালের সূর্যরশ্মি চোখে না পড়ে। জাবাল রুমাতের গিরিপথে পশ্চাদদিক হইতে আক্রমণের আশংকায় দূরদর্শী সেনানায়ক হযরত মুহাম্মাদ (স) আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র ইব্‌ন আন-নু'মান আল- আনসারী আল-আওসী আল-বদরী (রা)- এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজনের এক তীরন্দাজ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করেন। এই জাবাল রুমাতটি মুসলিম সৈন্য শিবিরের ১৫০ মিটার পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। নবী কারীম (স) তাহাদেরকে জয়-পরাজয় যে কোন অবস্থাতেই পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

إن رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا.

"যদি তোমরা দেখ যে, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছি, তাহা হইলেও তোমরা এই স্থান হইতে সরিবে না। আর যদি দেখ যে, তাহারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে, তাহা হইলেও তোমরা স্বীয় স্থান ত্যাগ করিয়া আমাদের সহযোগিতার জন্য আগাইয়া আসিবে না" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৯)।

বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে,

قال صلى اللهُ عليه وسلم إن رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل اليكم وإن رايتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتي أرسل إليكم.

"যদি তোমরা দেখ, পাখিরা আমাদের গোশত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে তবুও তোমরা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদের স্থান ত্যাগ করিবে না। আর যদি দেখ আমরা শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছি তবুও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করিবে না" (পূর্বোক্ত, কিতাবুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ৪২৬)।

বাকী সৈন্য বাহিনী হইতে মুনযির ইব্ন আমর (রা)-কে ডানপাশের এবং যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে বামপাশে দাঁড় করাইলেন। বনূ আবদুদ দারের মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের পতাকা দিলেন। যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া হামযা (রা)-এর হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যে শুধু ধর্ম প্রচারকই নন, অসাধারণ রণকুশলী এবং শ্রেষ্ঠ সমর নেতাও বটেন। উহুদ যুদ্ধে সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ করা হইতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৫৬)।

কুরায়শগণ বদরের যুদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছিল। তাই এইবার তাহারা অত্যন্ত সুশৃংখলার সাথে কাতারবন্দী হইল। দক্ষিণে খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ, পিছনে আবূ জাহলের পুত্র ইকরামাকে সসৈন্য নিযুক্ত করা হইল। কুরায়শ বংশের নামকরা ধনী সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা নিযুক্ত হইল অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালক। তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাবী'আ। পতাকা ছিল তালহার হাতে। অতিরিক্ত হিসাবে দুই শত অশ্বও প্রস্তুত রাখিয়াছিল (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী; ১খ., পৃ. ২১৮)।

যুদ্ধের প্রারম্ভে কুরায়শ মহিলারা দুফ বাজনার তালে তালে নৃত্য করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। এইসব কবিতার মূল বিষয় ছিল বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের উপর শোক প্রকাশ করা এবং তাহাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরায়শ বাহিনীকে উত্তেজিত করা। তাহাদের কবিতার শ্লোক ছিল এই ধরনের ঃ

إن تقبلوا نعانق + ونفرش النمارق.

او تدبروا نفارق + فراق غير وامق.

"যদি তোমরা অগ্রসর হও তবে তোমাদের জন্য শয্যা রচনা করিব। তোমাদেরকে আলিঙ্গন করিব। আর যদি পশ্চাদপদ হও তবে তোমাদের সহিত বিচ্ছেদ, অসন্তোষের চিরবিচ্ছেদ" (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৮)।

উভয় পক্ষ উহুদ প্রান্তরে মুখামুখী হইলে মদীনার আওস গোত্রীয় প্রবীণ ধর্মযাজক আবূ আমের প্রথম যুদ্ধের সূত্রপাত করে। সে ছিল মদীনার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। পরে মক্কায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। জাহিলী যুগে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার জন্য মদীনাবাসিগণ তাহাকে সম্মানের চোখে দেখিত। তাহার ধারণা ছিল, মদীনার আনসারগণ তাহাকে দেখা মাত্রই মুহাম্মাদের দীন ও সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তাহার অনুগত হইবে। সে যুদ্ধের ময়দানে আসিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, হে আওস সম্প্রদায়! আমি আবূ আমের, আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? আনসারগণ বলিলেন, 'হাঁ পাপিষ্ঠ! আমরা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। আল্লাহ তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রাখিবেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, পৃ. ১৯৯)।

আক্রমণের পূর্বে কুরায়শদের পতাকা বেষ্টন করিয়া হিন্দ তাহার অনুগামিনীদিগকে সাথে লইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছিল ঃ

ويها بنى عبد الدار + ويها حماة الادبار

ضربا بكل تبار.

"হে আবদুদ দারের সন্তানগণ! হে মাতৃভূমির প্রহরীগণ! শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হান" (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৮)।

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। কুরায়শ পক্ষের পতাকাবাহী তালহা ইব্ন আবূ তালহা আগাইয়া আসিয়া আহ্বান জানাইল, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে আমাকে তাড়াতাড়ি দোযখে পাঠাইয়া দিবে অথবা আমার হাতে নিহত হইয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবে"? তালহার এই ব্যঙ্গোক্তির প্রতিবাদে 'আলী (রা) আগাইয়া আসিয়া তরবারির আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন।

অতঃপর যুদ্ধের পতাকা তাহার ভাই আবূ শায়বা উছমান ইব্ন আবূ তালহা তুলিয়া লইল এবং এই বলিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইল,

إن على أهل اللواء حقا + ان يخضب الصعيدة أو تندقا.

"পতাকাবাহীর কর্তব্য হইল বল্লমকে রক্তে রঞ্জিত করা অথবা উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া" (আর-রাহীক আল-মাখতূম, পৃ. ২৫৯)।

হামযা (রা) তাহাকে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং তাহার তলোয়ারের আঘাত তাহার নাভী পর্যন্ত পৌঁছিল। ইহার পর তদীয় ভ্রাতা আবূ সা'দ ইব্ন তালহা যুদ্ধের পতাকা তুলিয়া ধরিলে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাহাকে হত্যা করিলেন। পরে মুসাফা ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা পতাকা তুলিয়া লইলে আসেম ইব্ন ছাবিত (রা) তাহাকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করিলেন। ইহার পর তাহার ভাই কিলাব ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা পতাকা উঠাইলে যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা) যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা জাল্লাস ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা পতাকা উঠাইলে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) তাহাকে আঘাত করিয়া হত্যা করিলেন। আবূ তালহা আবদুল্লাহ ইব্ন 'উছমান

ইব্ন আবদিদ দার-এর পরিবারের এই ছয়জন পতাকাধারী পর্যায়ক্রমে নিহত হওয়ার পর বনূ আবদুদ দারের আরতাত ইব্ন শুরাহাবীল পতাকা তুলিয়া ধরিলে আলী (রা), মতান্তরে হামযা (রা) তাহাকে নিহত করিলেন। পরে শুরায়হ ইব্ন কুর্য পতাকা উঠাইলে কুযমান (সে মুনাফিক ছিল, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল) তাহাকে হত্যা করিল। ইহার পর পর্যায়ক্রমে আবূ যায়দ, 'আমর ইব্ন আবদে মানাফ আল-আবদারী এবং ইব্ন হিশাম আল-'আবদারী পতাকা বহন করিলে কুযমান তাহাদের উভয়কে পরপর হত্যা করিল। বনী আবদুদ দারের আর কেহ পতাকা বহন করার মত অবশিষ্ট ছিল না। অবশেষে 'সাওয়াব' নামে তাহাদের এক হাবশী গোলাম পতাকা উঠাইয়া যুদ্ধ করিলে তাহার হাত কাটিয়া যায়। ঘাড় ও বুক দিয়া পতাক উড্ডীন রাখিতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিহত হয় (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬০)।

উভয় পক্ষের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, রাসূলুল্লাহ (স) তখন একখানা তরবারি হাতে লইয়া সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, কে আছ ইহা গ্রহণ করিবে? কে আছ ইহার মর্যাদা রক্ষা করিবে? শত শত বাহু তরবারি গ্রহণের জন্য উর্ধ্বে উত্তোলিত হইল। আবূ দুজানা বলিলেন, ইহার দাবি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন, বক্র না হওয়া পর্যন্ত দুশমনকে আঘাত করাই হইল ইহার দাবি। আবূ দুজানা (রা)-র বিশেষ আবেদনে নবী (স) তাহার হাতেই এই তরবারি অর্পণ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রথিতযশা আনসারী মুজাহিদ। উপরন্তু তাহার হাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরবারি— এই অপ্রত্যাশিত গৌরব লাভে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মাথায় রুমাল বাঁধিয়া সদর্পে বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বাহির হইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই ধরনের চলন আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয়, কিন্তু তাহা যুদ্ধের ময়দানে নয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৭)।

ইব্ন যুবায়র বলেন, আমি মনে মনে ভাবিলাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি দেখিব আবূ দুজানা কি করে? আমি তাহার পিছনে থাকিলাম। শুনিতে পাইলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও যুদ্ধের দৃঢ় মনোবল লইয়া নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন ঃ

أنـا الـذى عـاهـدنى خليلى + ونحن بالسفح لدى النخيل

أن لا أقوم الدهر فى الكيول + أضـرب بسيف الله والرسول.

"আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ স) প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং আমরা খেজুর বাগানের পাশে যুদ্ধরত আছি। আমি পিছনের সারিতে কখনও অবস্থান করিব না এবং আল্লাহ ও রাসূলের তরবারি দ্বারা আঘাত হানিব"(সীরাতে মুহাম্মাদিয়া, পৃ. ৩৫৯)।

আবূ দুজানা (রা) তরবারি লইয়া শত্রুসৈন্য নিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ দুজানা (রা) বলিয়াছেন, আমি দেখিলাম একটা লোক দুশমনদের উত্তেজিত করিতেছে, প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে। আমি তাহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তরবারি দ্বারা আঘাত করিতে গেলে সে চিৎকার দিয়া উঠিল। আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করিলাম সে

এক নারী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেওয়া তরবারির উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাই উহার দ্বারা কোন নারীকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিলাম (শিবলী নু'মানী, পৃ. ১৯৯)।

হামযা (রা) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি দুই হাতে দুইটি তরবারি লইয়া শত্রু বাহিনীর ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার নেতৃত্বে মুসলিমগণ প্রচণ্ড আক্রমণ সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করিলেন। শত্রুপক্ষের বিশৃংখলার সুযোগ লইয়া তাহাদের নিপাত করিতে করিতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেন। ইমাম বুখারীর (র)-এর বর্ণনায় ওয়াহশী বলিল, আমার মাওলা জুবায়র ইব্ন মুতইম আমাকে বলিল, তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করিতে পার তবে তুমি আযাদ। রাবী (আদী ইব্ন খিয়ার) বলেন, সেই বৎসর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আয়নায়ন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আমি সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইলাম। ইহার পর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য হইতে) সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে আসিয়া বলিল, দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহশী বলিল, তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাহার সামনে গিয়া বলিলেন, হে মেয়েদের খাতনাকারিনী উম্মু আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাথে দুশমনী করিতেছ? বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিলে সে নিহত হইল। ওয়াহশী বলিল, সেই দিন আমি একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিলাম। যখন তিনি (হামযা) আমার নিকটবর্তী হইলেন তখন আমি আমার অস্ত্র দ্বারা এমন জোরে আঘাত করিলাম যে, তাহার মুত্রথলি ভেদ করিয়া নিতম্বের মাঝখান দিয়া বাহির হইয়া গেল। এইটাই হইল তাহার শাহাদতের মূল ঘটনা (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৫৮৩)।

আবূ আমের কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল। অথচ তাহার পুত্র হানযালা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাহা পছন্দ করিলেন না। অতঃপর তিনি এক দুঃসাহসিক আক্রমণে কাফির সেনাধ্যক্ষ আবূ সুফয়ানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তলোয়ারের আঘাতে তাহাকে যখন হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ঠিক এমন সময় এক পার্শ্ব হইতে শাদ্দাদ ইব্ন আসওয়াদ দ্রুত গতিতে তাহার তরবারির আঘাতকে প্রতিরোধ করে এবং তাহার প্রতি-আক্রমণে হানযালা (রা) শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ফেরেশতাগণ হানযালা (রা)-কে গোসল দিতেছেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান কর। তাহার স্ত্রী জামীলা আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তিনি জুনুবী (তাহার উপর গোসল ওয়াজিব ছিল) অবস্থায় আসিয়া যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন (মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১২২)। মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল ও পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। 'আলী (রা), আবূ দুজানা ও তালহা (রা)-সহ অন্যান্য মুজাহিদদের বলিষ্ঠ ও দুর্জয় আক্রমণ মুসলিম ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদের অশ্বারোহী সেনাদল তিন তিনবার গিরিপথের পশ্চাত দিক হইতে আক্রমণের চেষ্টা করিল। কিন্তু মোতায়েনকৃত তীরন্দাজ বাহিনীর বলিষ্ঠ প্রতিরোধের মুখে তাহারা ব্যর্থ হইল (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৩৪৬; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬২)।

উহুদ পাহাড়ের সেই ঐতিহাসিক গুহা, যেখানে মহানবী (স) আহত অবস্থায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন।
সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

মুসলিম বাহিনী ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হইয়া উপর্যুপরি আক্রমণে শত্রুদের দিশাহারা করিয়া তুলিল। অতঃপর মুসলমানদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ (রহমত) নাযিল হইল। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হইল।

মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ হইতে বিপদের ঘনঘটা কাটিয়া যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তীব্র আক্রমণের সামনে কুরায়শ বাহিনী টিকিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহিলারাও হতোদ্যম হইয়া পিছু হটিতে লাগিল। মুসলমানগণ বিজয় প্রত্যক্ষ করিলেন। বুখারী শরীফের হাদীছে বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, আমরা তাহাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহারা পলাইতে আরম্ভ করিল। এমনকি আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মহিলাগণ দ্রুত দৌড়াইয়া পাহাড়ে আশ্রয় নিতেছে। তাহারা পায়ের গোছা হইতে বস্ত্র টানিয়া উপরে তুলিতেছে। ফলে তাহাদের পায়ের অলংকারগুলি পর্যন্ত বাহির হইয়া পড়িতেছে (সহীহ আল- বুখারী, ১খ, ৪২৬)।

অতি উৎসাহের বশে মুসলিম সৈন্যগণ পলায়নপর শত্রুদের ফেলিয়া যাওয়া মালে গনীমত আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাজ সৈন্যগণও বিজয়ের উল্লাসে তাহাদের কঠিন কর্তব্যের কথা ভুলিয়া গেলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহারাও গনীমত সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। দুনিয়া লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে দেখা দিল। মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল" (৩ ঃ ১৫২)।

তাহারা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, এই যে গনীমত। তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই স্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা সেই কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তাহাদের চল্লিশ জন সৈন্য ময়দানে নামিয়া আসিয়া গনীমত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা)-সহ মাত্র দশজন, মতান্তরে ১২ জন সৈন্য গিরিপথে অবশিষ্ট রহিলেন।

গিরিপথ শূন্যপ্রায় দেখিয়া সুচতুর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এই সুযোগ কাজে লাগাইল। তিনি পশ্চাত দিক হইতে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আকস্মিক আক্রমণ করিল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) নয়জন সৈন্য লইয়া বাধা দিতে যাইয়া শহীদ হইলেন। খালিদের অশ্বারোহী বাহিনী সজোরে চিৎকার করিয়া কুরায়শ সৈন্যদের আহ্বান জানাইল। পলায়নপর কাফির সৈন্যদল আবার ফিরিয়া আসিল। উমারা বিন্‌ত 'আলকামা আল-হারিছা মাটিতে পড়িয়া থাকা কুরায়শদের যুদ্ধ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল। একজন অন্যজনকে আহ্বান করিতে লাগিল। ফলে তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার একত্র হইল এবং মুসলিম বাহিনীকে অগ্র-পশ্চাত উভয় দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রাসূলুল্লাহ (স) তখন নয়জন সাহাবী সাথে লইয়া মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পিছনে থাকিয়া তাহাদের রণনৈপুণ্য ও কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের আকস্মিক হামলায় রাসূলুল্লাহ (স) -এর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল। (ক) হয় তিনি নয়জন সাথীকে লইয়া একটি নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করিবেন এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে তাহাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিবেন; অথবা (খ) সকলকে তাঁহার নিকট একত্র হওয়ার আহ্বান জানাইবেন এবং কাফির বাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত মুসলিম সৈন্যদেরকে উহুদে লইয়া আসার জন্য একটি রাস্তা বাহির করার শক্তি অর্জন করিবেন। এখানেই রাসূলুল্লাহ (স) - এর অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ পায়। তিনি উচ্চকণ্ঠে 'ইয়া 'ইবাদাল্লাহ' (হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ) বলিয়া মুসলমানদের আহ্বান জানাইলেন। অথচ তিনি জানিতেন যে, মুসলমানগণ তাঁহার ধ্বনি শুনিবার পূর্বেই কাফিররা শুনিতে পাইবে। কিন্তু সেইদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি এই ভয়াবহ অবস্থাতেই তাহাদেরকে আহ্বান করিলেন। কার্যত তাঁহার অবস্থানের ব্যাপারে কাফিররা জানিত পারিল এবং মুসলমানগণ তাঁহার কাছে পৌঁছার পূর্বেই কাফিরগণ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হইলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৪-২৬৫)।

আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম সৈন্যগণ বিশৃংখল হইয়া পড়িলেন। কেহ মদীনার দিকে ধাবিত হইলেন, আবার কোন দল পাহাড়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অনেকেই আবার কাফির বাহিনীর ভিতরে পড়িয়া গেলেন। এই অবস্থায় তরবারি চালাইতে গিয়া নিজ সৈন্যদের উপরও কেহ কেহ আঘাত হানিয়াছেন। শত্রু-মিত্র একাকার হইয়া গেল। এই সময় হুযায়ফা (রা) দেখিতে পাইলেন, মুসলিমগণ তাঁহার পিতা ইয়ামানের উপর আঘাত করিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! ইনিতো আমার পিতা, তাহাকে আঘাত করিবেন না। বর্ণনাকারী আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইহাতে তাহারা বিরত হইলেন না, বরং তাহাকে হত্যা করিলেন। তখন হুযায়ফা (রা) বলিলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (র) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর মনে এই ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, ৫৮১, কিতাবুল মাগাযী)। এহেন বিভীষিকাময় মুহূর্তে মুসলিম সৈন্যগণ শুনিতে পাইলেন, জনৈক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মুহাম্মাদ" নিহত হইয়াছে। এই সংবাদে মুসলমানদের মাঝে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। তাহাদের মানসিক মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। আনাস ইব্ন নাদর

(রা) যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি এক স্থানে যাইয়া দেখিলেন, উমার ও তালহা (রা) কিছু সংখ্যক সৈন্য লইয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। আল্লাহ্র রাসূল (স) দুনিয়ায় নাই, যুদ্ধ করিয়া আর কি হইবে? আনাস (রা) বলিলেন, জীবিত থাকিয়াই বা তোমরা কি করিবে। নবী কারীম (স) যেই পথে জীবন দিলেন, তোমরাও সেই পথে কুরবান হও। ইহার পর তিনি বলিলেন, যাহা বুখারীর বর্ণনায় এইভাবে আসিয়াছে ঃ

اللهم إنني اعتذر إلي مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقى سعد بن معاذ فقال أين ياسعد اني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامه أو ببنانه فيه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم.

"হে আল্লাহ! এই সমস্ত লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যাহা করিল, আমি ইহার জন্য তোমার নিকট ওযরখাহি করিতেছি এবং মুশরিকগণ যাহা করিল তাহা হইতে আমি আমার সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছি। ইহার পর তিনি তলোয়ার লইয়া সামনে অগ্রসর হইয়া শত্রুদের মাঝে ঢুকিয়া পড়িলেন। এই সময় সা'দ ইবন মু'আয (রা)-র সাথে তাঁহার সাক্ষাত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সা'দ! তুমি কোথায় যাইতেছ? আমি উহুদের অপর প্রান্ত হইতে জান্নাতের খোশবু পাইতেছি। এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ করিলেন এবং শহীদ হইলেন। যুদ্ধ শেষে তাহাকে সনাক্ত করা যাইতেছিল না। অবশেষে তাঁহার ভগ্নি তাঁহার শরীরের একটি তিল অথবা আঙ্গুলের মাথা দেখিয়া তাঁহাকে সনাক্ত করিলেন। তাঁহার শরীরে আশিটিরও বেশী বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল" (বুখারী, মাগাযী, বাব ১৭, নং ৪০৪৮; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আহ্যাব, নং ৩২০০; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩খ., পৃ. ২০১, নং ১৩১১৬)।

কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের এহেন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যেই দিন দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। অবশ্য আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল" (৩ ঃ ১৫৫)।

ছাবিত ইব্নুদ দাহদাহ (রা) তাঁহার কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আনসারগণ! মুহাম্মাদ (স) যদি নিহতও হইয়া থাকেন, আল্লাহ তো অমর, চিরঞ্জীব। তোমরা তোমাদের ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করিবেন ও বিজয় দান করিবেন। তাঁহার আহ্বানে আনসারদের একটি দল খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের একটি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু খালিদ তাঁহাকে ও তাঁহার সাথীদেরকে বর্শার আঘাতে শহীদ করিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৬)। রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শদের একমাত্র

লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইলে তিনি আল্লাহ্‌র রাহে নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছিলেন। সাহাবীগণ নবী কারীম (স)-কে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাত্র নয়জন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। ইমাম মুসলিম আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে উহুদের এই কঠিন মুহূর্তে সাতজন আনসার ও দুইজন কুরায়শ মুহাজির অবশিষ্ট ছিলেন। শত্রুবাহিনী আক্রমণ করিলে মহানবী (স) বলিলেন ঃ

من يروهم وله الجنة أو هو رفيقى فى الجنة فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة.

"কে আছ আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদেরকে প্রতিহত করিবে, বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করিবে অথবা জান্নাতে আমার বন্ধু হইবে। তখন একজন আনসার আগাইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিলেন এবং শাহাদত লাভ করিলেন। এইভাবে পরপর সাতজন আনসার শহীদ হইলেন" (সহীহ মুসলিম, ২খ, ১০৭, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার)।

আনসারদের ঐ সপ্তম ব্যক্তি ছিলেন আম্মারা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আস-সাকান। ইহার পর তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াককাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে ছিলেন। তালহা (রা) এই কঠিন বিপদে নিজের শরীরকে ঢাল বানাইয়া মহানবী (স)-কে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নবী কারীম (স) মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে চান। আর তালহা (রা) চমকিত হইয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! بأبى أنت وأمى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك. "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করিবেন না। হঠাৎ তাহাদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার শরীরে লাগিয়া যাইতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষা করিবার জন্য আমার বক্ষই রহিয়াছে" (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, ৫৮১, কিতাবুল মাগাযী)।

কাফিরগণ মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করিয়া তীর, বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উৎবা ইব্‌ন আবূ ওয়াককাসের নিক্ষিপ্ত পাথরে তাঁহার ডান পাশের একটি দাঁত (رباعية) পড়িয়া গেল এবং নিচের ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হইল। কোন কোন বর্ণনায় উপরের এবং নিচের দুইটি দাঁত অথবা চারটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। অন্য বর্ণনায় দাঁত চারটি সামান্য ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু মাড়ি হইতে পড়িয়া যায় নাই (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১-২খ,পৃ. ৩৬৩)। হাদীছে রুবাঈ দাঁত ভাঙ্গার বর্ণনা উল্লেখ আছে। আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী (র) বলেন ঃ

هى انسن التى تلى الثلية من كل جانب وللإنسان اربع رباعيات.

"ছানাইয়্যার প্রত্যেক পার্শ্বস্থ দাঁতকেই রুবাঈ দাঁত বলে। প্রত্যেক মানুষের চারটি রুবাঈ দাঁত রহিয়াছে"।

হাদীছে রুবাঈ শব্দটিকে একবচন হিসেবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, একটি দাঁতই ভাঙ্গিয়াছিল। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর

হাদীছে। উৎবা ইব্ন আবূ ওয়াককাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিচের পাটির রুবাঈ দাঁত (رباعية النبى السفلى) ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (উমদাতুল কারী, ১৪খ., পৃ.১৫৩)।

আর-রাহীকুল মাখতূমে আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিচের পাটির ডান পাশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল (আর- রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৬৭)। এই কার্যের দরুন উৎবার বংশে কোন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই এবং তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত। সন্তান হইলে এরূপ হইত যে, তাহাদের সামনের চার দাঁত উঠিত না (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ৩৬৩)।

আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব যুহরী রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কপালে আঘাত করে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন কামিয়্যা ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত হানে, পরে প্রথম বারের মত মাথার পাশে আঘাত হানে। ফলে তাঁহার শিরোস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়া উহার দুইটি কড়া তাঁহার কপালে ঢুকিয়া যায়। তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, আমার এই রক্ত যদি যমিনে পতিত হয় তবে তাহাদের উপর আকাশ হইতে আযাব নাযিল হইবে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫)। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেছিলেন ঃ

كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شئ او يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون.

"যাহারা তাহাদের নবীকে আঘাত করিয়া যখম করিয়াছে, তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, কেমন করিয়া তাহাদের কল্যাণ হইবে? তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করিতেছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নাই। কারণ তাহারা জালিম" (৩ ঃ ১২৮; বুখারী, ২খ., ৫৮২; মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৮০)।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী বলেন, তাবারানীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিতেছিলেন, যাহারা আল্লাহ্র রাসূল-এর চেহারা হইতে রক্ত ঝরাইয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব খুব কঠিন হইয়া থাকে। ইহার পর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা কর, কেননা তাহারা জানে না" (ফাতহুল বারী, ৭খ, ৩৭৩)। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে সৎপথে পরিচালিত কর, কেননা তাহারা অজ্ঞ" (কিতাবুশ শিফা বিতা'রীফ হুকূক আল-মুসতাফা, ১খ., পৃ. ৮২)।

তালহা ও সা'দ (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কুরায়শদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা উভয়ে ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ ও দক্ষ তীরন্দাজ। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস (রা)-র হাতে তীর তুলিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)

বলিলেন ঃ إرم فداك أبى وأمى "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হউক, তুমি তীর নিক্ষেপ কর" (সহীহ আল-বুখারী, ১খ., ৪০৭, ২খ., পৃ. ৫৮১, কিতাবুল মাগাযী)।

ইমাম বুখারী (র) হযরত কায়স (রা)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেন, তিনি বলেন ঃ

رايت يد طلحة شلاء وقى بها النبى (ص) يوم أحد

"আমি দেখিলাম, তালহা (রা)-র হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, তিনি ঐ হাত উহুদ যুদ্ধে নবী করীম (স)-কে রক্ষার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন" (পূর্বোক্ত, ১খ, ৫২৭, ৫৮১)। তালহা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হে আবূ মুহাম্মাদ! তোমার আংগুলে কি হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, মালিক ইব্ন যুহায়র রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্যও ঠিক ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিতে যাইয়া তীরের সামনে ঢালস্বরূপ নিজের হাত দ্বারা আড়াল করিয়া রাখি। সেই তীর আসিয়া আমার আংগুলে লাগে এবং হাড় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। ফলে আঙ্গুল কাটিয়া যায় (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ২৫৪)।

ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) তালহা (রা) সম্বন্ধে ঐ দিন বলিয়াছিলেনঃ

من ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله.

"যেই ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন শহীদকে বিচরণরত অবস্থায় দেখিতে চায় সে যেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ-কে দেখে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., পৃ. ৫৬৬; ইব্ন হিশাম, ১খ, ৮৬)।

নবী করীম (স) ইব্ন কামিয়্যা-এর প্রচণ্ড আঘাতে আবূ আমেরের খননকৃত এক গর্তে পড়িয়া যান। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলেন। তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর। নবী করীম (স) জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ করিতে নিষেধ করিলেন। ইতোমধ্যে আবূ বাক্র, 'উমার, আলী, হারিছ, সাহল ইব্ন হুনায়ফ, মালিক ইব্ন সিনান (রা) প্রমুখ মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিক্ষিপ্ত মুজাহিদগণও সংবাদ পাইয়া একত্র হইতে থাকিলেন।

আঘাতের চোটে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিরস্ত্রাণটি কাটিয়া গিয়া উহার দুইটি কড়া তাঁহার কপালে ঢুকিয়া গিয়াছিল। আবূ বাক্র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কপাল হইতে ঐ কড়াদ্বয় বাহির করিবার জন্য প্রস্তুতি নিতেছিলাম, এমন সময় আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা) বলিলেন, হে আবূ বাক্র! এই কাজটি করিবার সুযোগ আমাকে দিন। অতঃপর তিনি স্বীয় দাঁত দিয়া শক্তভাবে কড়াদ্বয় কামড়াইয়া ধরিয়া বাহির করিলেন। ইহাতে তাহার দুইটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৯৫)।

মুসলিম সৈন্যগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে বেষ্টন করিয়া কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত ও পাল্টা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সাহায্য আসিল। সহীহ বুখারীতে হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

رأيت رسول الله ﷺ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.

"আমি উহুদ যুদ্ধের দিন দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ করিতেছে। ইতিপূর্বে এবং পরে তাহাদিগকে আমি আর দেখি নাই (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, ৫৮০, কিতাবুল মাগাযী)।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আরও আছে যে, তাঁহারা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)।

এই সময় মুসলিম সৈন্যগণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উহা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। ইহাতে তাহাদের অবসাদ ও ক্লান্তি দূরীভূত হইয়া পুনরায় শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

"অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে যাহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে । যাহা তাহারা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে না তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে আর বলে, এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না। বল, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল, তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বাহির হইত। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন, অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত" (৩ ঃ ১৫৪)।

হযরত আবূ তালহা (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধে যাহাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল, আমি ছিলাম তাহাদের একজন। আমার হাত হইতে বারবার তরবারি পড়িয়া যাইতেছিল। আর আমি উহা উঠাইতেছিলাম (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২)।

শত্রুপক্ষের 'উছমান ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন আল-মুগীরা নামে এক অশ্বারোহী সৈন্য রাসূলুল্লাহ (স)- এর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, لا نجوت إن نجا "মুহাম্মাদ (স)

বাঁচিয়া গেলে আমার নিস্তার নাই"। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মুকাবিলা করিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু দেখা গেল তাহার অশ্বটি পা পিছলাইয়া একটি গর্তে পড়িয়া গেল। অতঃপর হারিছ ইব্‌ন আস-সিম্মা (রা) তাহাকে প্রতিহত করিলেন। তাহার পায়ে আঘাত করিয়া তাহাকে বসাইয়া দিলেন, এবং তাহার তরবারি কাড়িয়া নিলেন (আর-রাহীকুল-মাখতুম, পৃ.২৭৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণকে নিয়া পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিতে লাগিলেন, তখন উবায়্যি ইব্‌ন খালাফ বলিতে লাগিল, মুহাম্মাদ কোথায়? মুহাম্মাদ নাজাত পাইয়া গেলে আমি স্বস্তি পাইব না । অতঃপর এই নরাধম রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার ইচ্ছায় সামনে অগ্রসর হইতে থাকে। মুসলিম সৈন্যগণ তাহাকে বাধা দিতে চাহিলে নবী করীম (স) বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। সে নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হারিছ (রা)-এর কাছ হইতে একটা বর্শা নিয়া উহার অগ্রভাগ শুধু তাহার ঘাড়ে ছোয়াইলেন, ইহাতে সামান্য একটু আচড় লাগিল। কিন্তু তাহাতেই সে চীৎকার করিতে করিতে নিজ বাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। সকলে তাহাকে বলিতে লাগিল, কোথাও তো কোন আঘাত দেখিতেছি না, তুমি এমনভাবে চীৎকার করিতেছ কেন? উবায়্যি ইব্‌ন খালাফ উত্তরে বলিল, তোমরা জান না, স্বয়ং মুহাম্মাদ আমাকে আঘাত করিয়াছেন। তিনি যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবুও আমি মারা যাইতাম। অবশেষে সে কুরায়শ বাহিনীর সাথে মক্কা যাইবার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে মারা যায় (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, ৫৮২, কিতাবুল মাগাযী; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১০৭)। মুষ্টিমেয় মুসলিম বীর যোদ্ধার অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও অনুপম আত্মত্যাগের ফলে কুরায়শ বাহিনীর আক্রমণের বেগ প্রশমিত হইল।

মহানবী (স) সাহাবীগণকে লইয়া উহুদের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি উচ্চ ঘাটিতে আরোহণ করিলেন। সেখানেও আবূ সুফ্‌য়ান ও খালিদের একটি দল আক্রমণ চালাইল, কিন্তু নিরাপদ স্থানে আশ্রিত মুসলিম সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রস্তরাঘাতে তাহারা পিছনে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্‌য়ান নিকটস্থ এক পাহাড়ে আরোহণপূর্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বাঁচিয়া আছে কি? সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মাঝে ইব্‌ন কুহাফা (আবূ বাক্‌র) জীবিত আছে কি? এইবারও সে কোন উত্তর পাইল না। আবার প্রশ্ন করিল, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব জীবিত আছে কি? এইবারও সে কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে তো সবাই শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া উমার (রা) নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! যাহাদের কথা তুমি উল্লেখ করিলে তাঁহাদের সবাইকে আল্লাহ জীবিত রাখিয়াছেন। আবূ সুফয়ান বলিল, তোমারা নিহতদের মাঝে কতককে অঙ্গ বিকৃত অবস্থায় পাইবে। আমি এই কাজ করিতে আদেশ দেই নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্টও নই, অসন্তুষ্টও নই। অতঃপর তাহাদের অন্যতম মূর্তি হুবালকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, اعل هبل। 'হে হুবাল, তুমি উর্ধ্বে থাক।'

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি আবূ সুফ্‌য়ানের এই কথার জবাব দিবে না? তাহারা বলিলেন, ما نقول قال النبى ﷺ قولوا الله اعلى وأجل "আমরা কি বলিয়া উত্তর দিব? নবী করীম (স) বলিলেন, বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ"। আবূ সুফ্‌য়ান বলিল, لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের 'উযযা (দেবী) আছে, তোমাদের উযযা নাই"।

রাসূলুল্লাহ (স) এইবারও সাহাবীদেরকে বলিলেন, তোমরা কি ইহার উত্তর দিবে না? সাহাবীগণ বলিলেন, আমরা কি বলিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, قولوا الله مولنا ولا مولى لكم "বল, আল্লাহ আমাদের প্রভু, কিন্তু তোমাদের কোন প্রভু নাই"। আবূ সুফয়ান বলিল, يوم بيوم بدر ولحرب سجال "আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিলাম। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে"। উমার (রা) এই উক্তির জবাব দিতে গিয়া বলিলেন, لا سواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار "কখনও তোমরা আমাদের সমান নও। আমাদের মধ্য হইতে যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জান্নাতে থাকিবেন, আর তোমাদের মৃতগণ থাকিবে জাহান্নামে"।

অতঃপর আবূ সুফ্‌য়ান বলিল, হে 'উমার! আমার নিকটে আস। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, إئته فانظر ما شأنه "তাহার কাছাকাছি যাইয়া দেখ, তাহার কি অবস্থা"। উমার (রা) নিকটবর্তী হইলে আবূ সুফয়ান জিজ্ঞাসা করিল, হে উমার! তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি, আমরা কি মুহাম্মাদকে হত্যা করিতে সক্ষম হইয়াছি? উমার (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! কখনও নয়, বরং তিনি তোমার বাক্যালাপ শুনিতেছেন। আবূ সুফয়ান বলিল, أنت أصدق عندى من إبن قمية وأبر "ইব্‌ন কামিয়া হইতে তুমি আমার নিকট অধিক সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল" (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৭৯; যাদুল মা'আদ, পৃ. ৯৪)।

আবূ সুফয়ান উহুদ প্রান্তর ত্যাগ করিবার সময় মুসলমানদেরকে বলিয়াছিল, هو بيننا وبينك موعد "আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আমাদের সাক্ষাত হইবে"। রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক সাহাবীকে বলিলেন, বল, তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই প্রতিশ্রুতিই রহিল (তারীখ ইব্‌ন খালদূন, ১খ, ১১১; ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৯৪)।

কুরায়শগণ সত্যিই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে কিনা এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য নবী করীম (স) সা'দ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যদি দেখ তাহারা উটের পিঠে আরোহণ করিয়াছে তাহা হইলে বুঝিবে, তাহারা মক্কার দিকে ফিরিয়া যাইতেছে। আর যদি দেখ যে, তাহারা ঘোড়ায় সওয়ার হইতেছে তবে ধরিয়া নিবে, তাহারা মদীনা আক্রমণে আসিতেছে। তাহারা যদি মদীনার দিকে আসে তবে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিব। সা'দ (রা) ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, কুরায়শগণ মক্কার দিকে চলিয়া যাইতেছে (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৭৯)।

কুরায়শগণ মক্কার দিকে চলিয়া যাইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) আহত মুজাহিদ ও শহীদগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধশেষে সা'দ ইব্নুর রাবীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। নবী (স) আমাকে বলিয়া দিলেন, যদি তাহার দেখা পাও তবে আমার সালাম জানাইও এবং কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিও। যায়দ (রা) বলেন, আমি শহীদদের মাঝে তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম এবং মুমূর্ষু অবস্থায় সাক্ষাত পাইলাম। তাহার শরীরে তীর, বর্শা ও তরবারির সত্তরটির মত আঘাত ছিল। আমি বলিলাম, হে সা'দ! রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং কেমন আছ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমার সালাম জানাইও এবং বলিও, আমি জান্নাতের খোশবু পাইতেছি। ইহার পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৯৬)।

মদীনার অবশিষ্ট মুসলমানগণ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের সন্ধানে উহুদ প্রান্তরে আসিতে থাকে। বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা যাখন শহীদদের লাশ দেখিতেছিল, তখন স্ব-গোত্রীয় উয়ায়মিরকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তো ইতিপূর্বে ইসলামের বিপক্ষে ছিলে, কি করিয়া যুদ্ধে আসিলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, হঠাৎ আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাইল। আমি তরবারি উন্মোচন করিয়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করিলাম এবং এই অবস্থায় উপনীত হইলাম। ইহার পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, জীবনে সে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ার সুযোগ পায় নাই, তবুও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের এই বলিষ্ঠ ঈমানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জান্নাতী বলিয়া ঘোষণা করিলেন (মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১২২; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১০৮)।

শহীদদের মৃতদেহ নিয়া কুরায়শ মহিলারা এক বীভৎস দৃশের অবতারণা করিল। অপমানচ্ছলে তাহারা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বিকৃত করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, হিন্দ ও তাহার সাথীরা শহীদদের নাক, কান ও বিশেষ অঙ্গ কাটিয়া হার বানাইয়াছিল। হিন্দ খুশী হইয়া ওয়াহ্শীকে তাহার গলার সোনার হার প্রদান করিয়াছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১০৯)। হিন্দ তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী হামযা (রা)- এর বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করিয়া তাহা চিবাইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। ইব্ন মাস'ঊদ (রা) বলেন ঃ

ما راينا رسول الله ﷺ قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب.

"হযরত হামযা (রা)- এর জন্য রাসূলুল্লাহ (স) অধিক কাঁদিয়াছিলেন, এইরূপ আর কখনও তাঁহাকে কাঁদিতে দেখি নাই"।

মহানবী (স) বলিলেন, একজনের পরিবর্তে সত্তরজন মুশরিকের এই ধরনের অঙ্গ বিকৃত করা হইবে। অতঃপর তাঁহার উপর সূরা নাহলের শেষ অংশ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

عُوْقِبْتُمْ الخ নাযিল হইলে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত রহিত করিলেন। নবী (স) বলিলেন, এই যখমকৃত বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে উঠাইবেন যে, তাহাদের ক্ষতস্থান হইতে লাল রক্ত বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহার সুগন্ধ হইবে মিশকের মত (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ৩৭০)।

হযরত আইশা (রা) যেই সকল মহিলা খবর সংগ্রহের জন্য মদীনা হইতে আসিয়াছিলেন তাহাদের নিকট গেলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)- এর বোন হিন্দ বিন্তে 'আমর (রা)-এর সাথে তাঁহার সাক্ষাত হইল। তিনি তাহার শহীদ স্বামী আমর ইব্নুল জামূহ (রা), পুত্র খাল্লাদ ইবন আমর ও ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে উটের উপর বহন করিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইতেছিলেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন সংবাদ আছে কি? তোমার পিছনে কাহারা ? হিন্দ (রা) বলিলেন, সংবাদ ভাল, রাসূলুল্লাহ (স) জীবিত আছেন।

وكل مصيبة بعده جلل

"তিনি জীবিত থাকিলে সকল বিপদই তুচ্ছ"।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মধ্য হইতে অনেককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বলিলেন, ইহারা হইলেন আমার স্বামী, ছেলে ও ভাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের কোথায় নিয়া যাইতেছ? বলিলেন, মদীনায় দাফন করিবার জন্য। তিনি স্বীয় উটকে খুব তাড়া দিতে লাগিলেন, উট মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না, কিন্তু উহুদের দিকে হাঁকাইলে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। অতঃপর তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উট তো আদিষ্ট প্রাণী। 'আমর কি কিছু বলিয়াছিল? হিন্দ (রা) বলিলেন, 'আমর উহুদের দিকে যাত্রার পূর্বে কিবলামুখী হইয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اللهم لا تردنى إلى أهلى خزيا وارزقنى الشهادة.

"হে আল্লাহ! আমার পরিজনের কাছে আমাকে অপমানিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিও না, শাহাদাত আমার নসীব করিও"।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এইজন্যই উট অগ্রসর হইতেছে না। হে আনসারগণ! তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাহারা আল্লাহর নামে কোন শপথ করিলে তাহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। 'আমর ইব্নুল জামূহ তাঁহাদের একজন। হে হিন্দ! তোমার ভাই শহীদ হওয়ার পর হইতেই ফেরেশতাগণ তাহাকে ছায়া প্রদান করিতেছেন। তাহাদের (শহীদ) সকলকে জান্নাত দান করা হইবে। হিন্দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ২৬৬)।

হযরত হামযা (রা)-এর ভগ্নি হযরত সাফিয়্যা (রা) মুসলমানদের বিপর্যয়ের সংবাদ শুনিয়া মদীনা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পুত্র যুবায়র ইব্নুল আওয়াম

(রা)-কে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, সাবধান! তোমার মা যেন লাশ দেখিতে না পায়। হযরত যুবায়র (রা) নবী করীম (স)-এর এই নির্দেশ তাহার মাকে শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, ভাইয়ের শাহাদাত ও তাহার লাশ বিকৃতির সংবাদ আমি শুনিয়াছি। ইহা তো আল্লাহর রাস্তায় হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ আমি ধৈর্য ধারণ করিব। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে লাশ দেখিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি কাছে গিয়া ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত দেহটি দেখিলেন। তাহার রক্ত উথলাইয়া উঠিতে থাকিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া দো'আ করিতে থাকিলেন (তারীখ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, পৃ. ১৪২১)।

রাসূলুল্লাহ (স) উহুদের শহীদদের পবিত্র লাশ হযরত হামযা (রা)- এর লাশের পাশে একত্র করিতে বলিলেন এবং তাহাদের জানাযার নামায পড়িলেন। অবশ্য এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। উহুদের শহীদদের জানাযা পড়া সংক্রান্ত সহীহ বুখারীতে দুইটি বিপরীতমুখী হাদীছ রহিয়াছে। একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। ফলে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে শহীদদের জানাযা পড়িবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের দলীল হযরত জাবির (রা)-এর হাদীছ ঃ

كان النبى ﷺ يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول أيهم اكثر أخذا للقرآن فإذا اشر له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

"নবী করীম (স) উহুদের শহীদদের কাফন পরাইয়া বলিতেন, ইহাদের মধ্যে কাহার বেশী কুরআন মুখস্থ আছে? যখন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইত, তাহাকে আগে কবরে নামাইয়া বলিতেন, আমি কিয়ামতে ইহাদের সাক্ষী হইব। অতঃপর বিনা গোসলে রক্ত সহকারেই তাহাদেরকে দাফনের নির্দেশ দিতেন, তাহাদের জানাযা পড়িতেন না" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানাইয, ১খ., ১৭৯)।

অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আওযাঈ, ছাওরী, আহমাদ, ইসহাক (র)-এর অপর বর্ণনামতে, শহীদদের জানাযা পড়িতে হইবে। আহলে হিজায–এরও এই অভিমত। তাঁহারা উকবা (রা)-এর হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। একদা রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়িলেন, অতঃপর মিম্বরে ফিরিয়া আসিলেন (পূর্বোক্ত)। আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী বলেন, উলামায়ে আহনাফ শহীদদের জানাযা পড়িবার পক্ষে মত দিয়াছেন। তাহাদের আরও দলীল হইল যাহা ইমাম তাহাবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عن عقبة بن عامر أن النبى ﷺ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر.
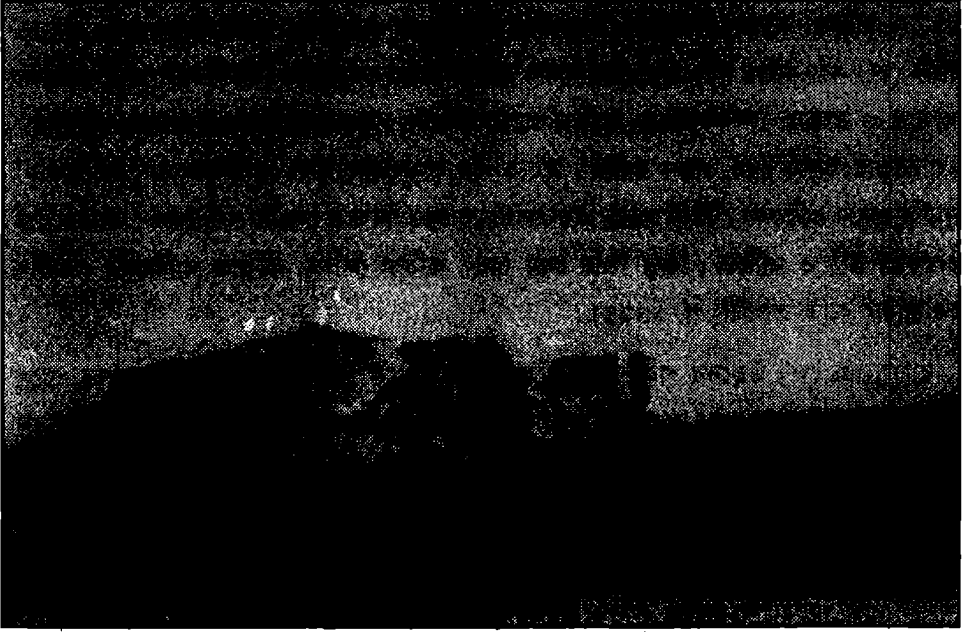
উহুদ পাহাড়ের এই স্থানে মহানবী (স)-এর দন্ত মুবারক শহীদ হয়।
সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।
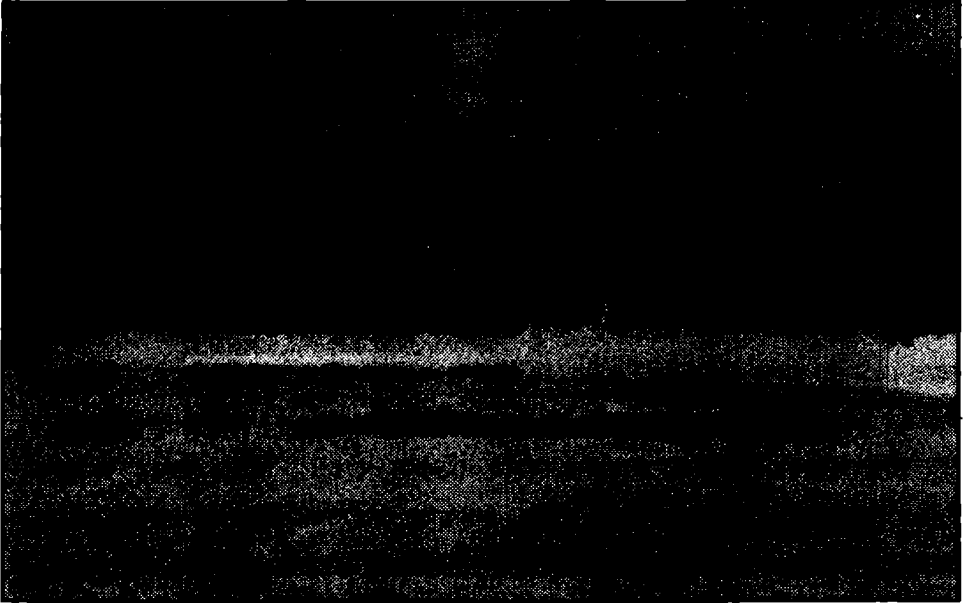
উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবায়ে কিরামের কবরস্থান। এখানে সমাহিত আছেন শহীদ প্রধান হযরত হামযা (রা)-ও। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

"একদা রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়িলেন, অতঃপর মিম্বারে ফিরিয়া আসিলেন" (পূর্বোক্ত)।

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী বলেন, ওলামায়ে আহনাফ শহীদদের জানাযা পড়িবার পক্ষে মত দিয়াছেন। তাহাদের আরও দলীল হইল যা ইমাম তাহাবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عن إبن عباس أن رسول الله ﷺ كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة ثم توضع العشرة وحمزة موضوع ثم وضع عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزه معهم.

(উমদাতুল কারী, ৮খ, ১৫৪)।

হাকেম, তাবারানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় হানাফীগণ তাহাদের মতকে নিম্নের বিষয়গুলির বিচারে প্রধান্য দিয়া থাকেন ঃ

أمر رسول الله ﷺ بحمزة يوم أحد فهئ للقبلة ثم كبر عليه سبعا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة.

(পূর্বোক্ত, ৮খ., পৃ. ১৫৫)।

উকবা ইব্‌ন আমের (রা) -এর হাদীছ ইতিবাচক, আর হযরত জাবির (রা)-এর হাদীছ নেতিবাচক । এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক হাদীছ প্রাধান্য পাইয়া থাকে।

হযরত জাবির (রা) তাঁহার শহীদ পিতা ও মামার দাফনের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাহাদেরকে মদীনায় নিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনিলেন যে, শহীদদেরকে শহীদ হওয়ার স্থানেই দাফন করিতে হইবে, তখন তিনি তাহাদের দাফনকার্য সম্পাদনের জন্য ফিরিয়া আসিতে তড়িঘড়ি করিলেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, তিনি জানাযার নামাযের সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়াই ইসলামের বিধান। ইহা ফরযে কিফায়া। যদি শহীদদের উপর জানাযা পড়িবার বিধান না থাকিত তবে নবী (স) তাহা যথেষ্ট করিয়া বলিয়া যাইতেন, যেমনিভাবে তাহাদেরকে গোসল না দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন (পূর্বোক্ত)।

খাব্বাব (রা) বলেন, হযরত হামযা (রা)-কে দাফন করিতে গেলে একটি চাদর ছাড়া অন্য কাপড় পাওয়া যাইতেছিল না। এই চাদর দিয়া তাহার মাথা ঢাকিতে গেলে পা উদলা হইয়া যায়। উদলা পা ঢাকিতে গেলে মাথা উদলা হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মাথাই ঢাকা হইল এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস রাখা হইল (মিশকাত শরীফ, ১খ, ১৪০)। অনুরূপ বর্ণনা বুখারীর হাদীছে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে মুস'আব ইব্‌ন উমায়র সম্পর্কেও বর্ণিত আছ (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, ৫৭৯-৫৮৪)।

হযরত হামযা (রা)-এর কবরে আবূ বাক্র, উমার, আলী ও যুবায়র (রা) অবতরণ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্‌শ (রা)-কে হযরত হামযা (রা)- এর কবরে দাফন করা হয়। হযরত হামযা (রা) -এর অনুরূপ তাঁহার অঙ্গও বিকৃত করা হইয়াছিল (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ৩৭০)।

'আমর ইব্নুল জামূহ (রা) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রা) - এর মাঝে বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহাদের উভয়কে এক কবরে দাফনের নির্দেশ দেয়া হয় (তারীখুল কামিল, ২খ, ১৬৩)।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, মুশরিকগণ উহুদ প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াও! আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া লই। মুজাহিদগণ কাতারবন্দী হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে দাঁড়াইলে তিনি নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করিলেন (মুসনাদে আহমাদ, ৩খ, ৪২৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৮২) ঃ

اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادى لمن أضللت ولا مضل لمن هديت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك اللهم إنى أسالك النعيم المقيم الذى لايحول ولا يزول اللهم إنى أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إنى عائذك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك.

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের মধ্য হইতে সত্তরজন সৈন্য শহীদ হইয়াছিলেন। ইহাই নির্ভরযোগ্য এবং অধিকাংশের মত। শহীদদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আনসার মুজাহিদ। তাহাদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের ৪১ জন শাহাদাত বরণ করেন। ইয়াহূদীদের মধ্য হইতে একজন এবং মুহাজিরদের মধ্য হইতে চারজন শহীদ হইয়াছিলেন। অপরপক্ষে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ীর কুরায়শদের বাইশজন সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কুরায়শদের বাইশজন নয় বরং সাঁইত্রিশজন বা আরও অধিক সৈন্য নিহত হইয়াছিল (ফাত্হুল বারী, ৭খ, ৩৫১; ইব্ন হিশাম, পৃ. ১২২-২৩)। ইব্ন মান্দা উবায়্যি 'ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনসারদের মধ্য হইতে ৫৯ জন ও মুহাজিরদের মধ্য হইতে ৬ জন, মোট ৬৫ জন মুসলিম সৈন্য শহীদ হইয়াছিলে। ইব্ন হিব্বান এই রিওয়ায়াতকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। মুশরিকদের মধ্য হইতে ২৩ জন নিহত হইয়াছিল। নবী করীম (স) নিজ হাতে উবায়্যি ইব্ন খালাফকে আঘাত করেন (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ৩৭২)।

রাসূলুল্লাহ (স) সৈন্যবাহিনী নিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। ইয়াহূদী ও মুনাফিক'রা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, তাহারা যদি আমাদের কাছে থাকিত তবে মারাও যাইত না, নিহতও হইত না (মুহাম্মাদ আল-খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ১৩৩)। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"হে মু'মিনগণ তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা কুফুরী করে ও তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাহাদের সম্পর্কে বলে, তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না। ফলে আল্লাহ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন, আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ উহার সম্যক দ্রষ্টা" (৩ ঃ ১৫৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আসিয়া এক রাত অবস্থান করিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন যে, কুরায়শগণ যেহেতু এই যুদ্ধে তেমন লাভবান হইতে পারে নাই তাই তাহারা দ্বিতীয়বার মদীনা আক্রমণ করিতে পারে। মহানবী (স) শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ মুকাবিলা করিবার জন্য মুসলিম সেনাদের আহ্বান জানাইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ لا يخرج معنا الا من شهد القتال "যাহারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে কেবল তাহারাই এই যুদ্ধে আমাদের সহিত অংশ গ্রহণ করিবে"। ক্ষত-বিক্ষত মুজাহিদগণ রাসূলুল্লাহ (স)- এর আহ্বানে সাড়া দিয়া আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বিনীত অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ঃ

يا رسول الله انى احب ان لاتشهد مشهدا الا كنت معك إنما خلفنى أبى على بناته.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রতিটি যুদ্ধেই আপনার সাথে থাকা পছন্দ করি। কিন্তু আমার পিতা তাহার কন্যা সন্তানদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়ায় উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারি নাই"। মহানবী (স) তাহার এই সংগত কারণ বিবেচনাপূর্বক তাহাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৫)।

অপরদিকে কুরায়শ বাহিনী মক্কা যাওয়ার পথে মদীনা হইতে ৩৬ মাইল দূরে 'আর-রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, তোমরা কিছুই করিতে পার নাই। মহাসুযোগ পাইয়াও উহার সদ্ব্যবহার করিতে অর্থাৎ মদীনা

আক্রমণ করিতে পার নাই। মুসলমানদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ জীবিত রহিয়াছে। তাহারা পুনরায় একত্র হইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। সুতরাং চল, আবার ফিরিয়া গিয়া তাহাদের অবশিষ্টদের খতম করিয়া আসি।

রাসূলুল্লাহ (স) সৈন্যদের নিয়া মদীনা হইতে ৮ মাইল দূরে মক্কার পথে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলেন। পুনরায় মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্তকে কুরায়শ সৈন্যদের সবাই গ্রহণ করিতে পারিল না। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা এই বলিয়া বিরোধিতা করিল যে, হে লোকসকল! তোমরা পুনরায় আক্রমণ করিও না। আমার আশংকা হইতেছে, মুসলমানগণ মদীনার অবশিষ্ট লোকদের নিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়া আসিবে এবং তোমাদিগকে পরাজিত করিবে।

কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য তাহার এই অভিমত প্রত্যাখ্যান করিয়া মদীনার দিকে পুনরায় যাত্রা শুরু করিল। আবূ সুফ্য়ানের সাথে এই সময় মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ আল-খুযাঈর সাক্ষাত হইল। তিনি ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, কিন্তু আবূ সুফয়ান তাহা জানিত না। আবূ সুফয়ান তাহার নিকট হইতে গোপন কথা জানিতে চেষ্টা করিল। মা'বাদ বলিলেন, আমি মুহাম্মাদ (স)-কে সৈন্যসহ মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মনোবল অত্যন্ত সুদৃঢ়। কৃত ভুলের জন্য তাহারা অনুতপ্ত। উহুদ যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই, এইবার তাহারাও প্রতিশোধ গ্রহণকারী এই দলে অংশ নিয়াছে। তাহাদের এই ধরনের রণপ্রস্তুতি ইতিপূর্বে আর আমি কখনও দেখি নাই।

একদিকে মা'বাদের এই পরামর্শ, অন্যদিকে পর্যুদস্ত বাহিনীর জওয়াবী হামলা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে মদীনা হইতে জোশ ও জযবার সহিত বাহির হওয়ার এই সংবাদ আবূ সুফয়ান ও মুশরিকদেরকে হতভম্ব ও ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া মক্কায় ফিরিয়া যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করিল। এই সময় আবদুল কায়স গোত্রের একটি কাফেলা মুশরিকদের নিকট দিয়া মদীনার দিকে আসিতেছিল। আবূ সুফয়ান তাহাকে বলিল, তুমি আমার পক্ষ হইতে মুহাম্মাদকে এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দাও যে, আমার বাহিনী মুসলমানদের পুনরায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন আমরা সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। ঘোষণা মুতাবিক আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে তাহাদের সঙ্গে মুকাবিলা হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন এই সকল সংবাদ পাইলেন এবং গুপ্তচরদের প্রেরিত তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিত হইলেন যে, শত্রুবাহিনী মক্কার দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন তিনি হামরাউল আসাদে তিন রাত্র অবস্থান করিয়া মদীনা ফিরিয়া আসিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, পৃ. ২২৫)। আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে এরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

"যখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে। তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল। কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ যাহাতে রাযী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল"(৩ : ১৭২-১৭৪)।

হামরাউল আসাদ হইতে ফিরিবার পথে দুইজন কুরায়শ সৈন্য মুসলমানদের হাতে ধৃত হইয়া প্রাণ হারায়। একজন হইল কবি আবূ উয্যা, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) যাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। নবী (স)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভূমিকা পালন করার দরুন তিনি তাহাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে এইবারও কাকুতি মিনতির স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন:

إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إضرب عنقه يا عاصم بن ثابت.

"মুমিন ব্যক্তি এক গর্ত হইতে দুইবার দংশিত হয় না। হে 'আসিম ইব্ন ছাবিত! তুমি তাহার শিরচ্ছেদ কর।" তিনি তাহাই করিলেন।

অপরজন হইল মু'আবিয়া ইব্নুল মুগীরা ইব্ন আবিল আস। সে তাহার চাচাতো ভাই উছমান ইব্ন 'আফফান (রা)- এর নিকট আসিয়া নিরাপত্তা চাহিলে উছমান (রা) তাহাকে নিয়া নবী করীম (স)- এর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পক্ষে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে এই শর্তে মুক্তি দিলেন যে, সে তিন দিনের মধ্যে মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেই নরাধম তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মদীনায় রহিয়া গেল এবং মুসলমানদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। মুসলমানগণ তিনদিন পর তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। সে পালাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা ও আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে তাহাকে ধরিয়া আনার জন্য প্রেরণ করেন। পরিশেষে তাহারা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া হত্যা করেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৭)।

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রণনৈপুণ্য বিভিন্ন দিক হইতে প্রমাণিত হয়। তিনি উপত্যকার পানির ঝর্ণার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মুশরিকদেরকে পানি হইতে বঞ্চিত করেন। ইহা ছিল তাঁহার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার বড় রকমের সাফল্য। সক্রেটিসের মতে একজন সফল সেনানায়কের যে গুণাবলী থাকা উচিত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে তাহা পুরাপুরি বিদ্যমান ছিল (দ্র. মহানবীর প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ২১৩)।

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক W. Montgomery Watt তাহার Muhammad: Prophet and Statesman গ্রন্থে বলেন, It (battle of Uhud) was a very serious defeat for the Muslims and a great victory for the Meccans (p.140)।

তাহার এই মন্তব্য প্রকৃত বিচারে যথার্থ নহে। এই যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম সৈন্য শহীদ হইয়াছিলেন। অপরপক্ষে কুরায়শ সৈন্য নিহত হইয়াছিল মাত্র তেইশ বা সাঁইত্রিশজন। ঐতিহাসিকদের এই ধরনের মন্তব্যের কারণেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এই যুদ্ধে কুরায়শদের বিজয় বলিয়া ধরিয়া থাকেন। অথচ তাহাদের এই পরিসংখ্যান সঠিক নহে। কেননা এই যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)- এর হাতেই ৩১ জন এবং আলী (রা)- এর হাতে আটজন কাফির সৈন্য নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ সংখ্যার বলে যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে ঈমানের বলে। বদর যুদ্ধে সৈন্যের অনুপাত ছিল ১ ঃ ৩ এবং উহুদ যুদ্ধে ১ ঃ ৪। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমান ও কাফিরদের নিহতের অনুপাত ছিল ১৪ ঃ ৭০ অর্থাৎ ১ঃ ৫। বদরী সাহাবাগণই উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ৭০ জন মুসলিম সৈন্য নিহত হইলে উহার পাঁচ গুণ কাফির সৈন্য নিহত হওয়ার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করা যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণই তাহার প্রমাণ। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ সম্পূর্ণ মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। তাহাদের ঈমানী চেতনা, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তাওহীদে উদ্বুদ্ধ আল্লাহর সৈনিকদের কাছে কুরায়শদের সুসজ্জিত বাহিনী বিপর্যস্ত হইল। উপর্যুপরি তীব্র আক্রমণের মুকাবিলায় তাহারা টিকিতে না পারিয়া দ্রুত পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। আল্লাহ পাক এই বিজয় প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ.

"আল্লাহ্ই তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে" (৩ ঃ ১৫২)।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই যুদ্ধে মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত ও সামরিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ছিল উপযুক্তভাবে যুদ্ধের জন্য উহাদের পুনর্গঠন ও সামরিক প্রশিক্ষণ এবং কোথায় কোথায় তাহাদের দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে তাহা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন। নেতার আদেশ লংঘন কিংবা উহার ভুল ব্যাখ্যাও যে অশুভ পরিণতি ডাকিয়া আনে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিল। মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে দুইটি ভুল করে ঃ (১) তীরন্দাজ বাহিনীর গিরিপথ পরিত্যাগ। তাহারা যদি গিরিপথ ছাড়িয়া না দিত তবে উহুদের ময়দান মুশরিকদের জন্য বদরের চেয়েও অধিকতর বিপর্যয়কর প্রমাণিত হইত। (২) দুশমনদের পশ্চাদপসরণের মুহূর্তে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া গনীমতের প্রতি ধাবিত হওয়া।

উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আনিয়া দেয়। বিপদের সময় কিভাবে আত্মরক্ষা করিতে হয়, কর্তব্য পালন ও ধৈর্য ধারণ করিতে হয়, মুসলমানগণ উহুদ যুদ্ধে সেই শিক্ষা লাভ করে। কুরায়শগণ এই যুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কোন বিজয় লাভ করে নাই। তাহারা যেই নিষ্ঠুরতাকে বিজয় মনে করিয়াছিল তাহা তাহাদের পাপের পিয়ালাকে পূর্ণ করিয়াছে। এই নিষ্ঠুরতা তাহাদের নিজেদের বিবেকবান ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সমর্থন হারাইতে সাহায্য করিয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত আরবের পৌত্তলিকতার ধ্বংস ডাকিয়া আনে (আবদুল হামীদ সিদ্দিকী, মহানবী, পৃ. ১৭১)। সকল নবী (আ)-কে সাময়িক বিপর্যয়ের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়, কিন্তু শেষ পরিণামফল তাঁহারই অনুকূলে থাকে। ইহার তাৎপর্য হইল, মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা। যদি নবী (আ)-গণ সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেন তবে মু'মিনদের সারিতে মুনাফিকরা অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত। তাহাদিগকে চিহ্নিত করিবার কোন সুযোগ থাকিত না। যেহেতু মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে গোপনে মিশিয়া থাকে সেহেতু এই ধরনের বিপর্যয়ের সময়ই তাহাদের আসল চেহারা ধরা পড়ে। ফলে মুসলমানগণ তাহাদের শত্রুদিগকে চিহ্নিত করিতে পারে এবং সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারে (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৯৯-১০৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৯)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ.

"যেইদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্‌রই হুকুমে, ইহা মুমিনগণকে জানিবার জন্য এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য এবং তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, 'আইস, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর'। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা যদি যুদ্ধ জানিতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম। সেই দিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই, তাহারা তাহা মুখে বলে। তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত" (৩ ঃ ১৬৬- ১৬৭)।

কুরায়শদেরকে পরাজিত করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও যে মুসলমানগণ উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বরং তাহারাই আহত হইয়াছেন, ইহাতে হয়ত মুসলমানদের মনে খানিকটা দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতেও দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে তবে অনুরূপ আঘাত উহাদেরও তো লাগিয়াছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই যাহাতে আল্লাহ মুমিনগণকে জানিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আল্লাহ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না" (৩ ঃ ১৪০)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিহত হওয়ার সংবাদে মুসলমানদের মাঝে যে হতাশা ও নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَّسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করিবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন" (৩ ঃ ১৪৪)।

আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে চান না। শুধু দলপতিদের ধ্বংস করিয়া অন্যান্য সকলকে সুপথে আনাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন। আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ.

"কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করিবার অথবা লাঞ্ছিত করিবার জন্য; ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়" (৩ ঃ ১২৭)।

বলা বাহুল্য, বদর ও উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। যেসব নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহাদের প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল। বাকী ছিল আবূ সুফয়ান, জুবায়র ইব্ন মুতইম ও হাকিম ইব্ন হিযাম। এই তিনজন পরবর্তী কালে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন। উহুদ যুদ্ধের এই বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিশেষ পরীক্ষা স্বরূপ। The Life of Muhammad গ্রন্থে বলা হইয়াছে, The day of Uhud was a day of trial, calamity and heart sourching on which God tested the believers and put the hypocrites on trial, those who professed faith with their tongue and hid unbelief in their hearts and a day in which God honoured with martyrdom those whom he willed (A Guillaume, The Life of Muhammad, p. 391)।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের পশ্চাতে শয়তানের চালবাজিও কিছুটা দায়ী ছিল। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে খাজ্জাজ (র) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, শয়তান তাহাদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যেগুলি নিয়া আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয় নাই। সেই কারণেই তাহারা জিহাদ হইতে সরিয়া পড়ে যাহাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করিয়া পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়া আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে (রূহুল মা'আনী, ৪ খ., ৯২-৯৮; তু. মা'আরিফুল কুরআন, ২খ., ২১১)।

এই যুদ্ধে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর তিন শত সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে দলত্যাগ এবং শয়তানী প্ররোচনায় মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক মতভেদের কারণে তাহাদের ঈমানী চেতনা ও মনোবলে কিছুটা ভাটা নামিয়া আসে। এই বিপর্যয়কে পাশ্চাত্য গবেষক A. Guillaume মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতার ফল বলিয়া উল্লেখ করিতে যাইয়া মন্তব্য করেন, The battle of Uhud was not a Military defeat for Muhammad, it might almost be called a spiritual defeat (Muhammad: Prophet and Statesman, P. 142)।

বিবরণটি মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। ঈমানের কঠোর এই পরীক্ষায় মুসলিম বাহিনী দৃশ্যত পূর্ণ বিজয় অর্জন করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় তাহারা ইহা হইতে লাভ করেন, যাহা পরবর্তী কালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাহাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করিতে সহায়ক হইয়াছিল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী উহুদ যুদ্ধে মদীনাবাসীদের বিপর্যয়ের কথা বলিলেও মক্কাবাসীদের পর্যাপ্ত ক্ষতির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, Abu Sufian, son of Harb, son of Ommeya, the great rival of the Hashimides, with a large army of the Meccans and their allies, entered the Medinite territories, the Muslim force which proceeded to repeat the attack, was smaller in member. The loss of the Meccans, however, was too great to allow them to attack the city and they retreated to Mecca (A Short history of the Saracens, p. 12)।

উহুদ যুদ্ধ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের এই যুদ্ধে জয় হইয়াছিল। তৎকালীন আরবের প্রথা ছিল বিজিত অঞ্চলে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া তিন দিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করা। অথচ কুরায়শ সৈন্যগণ তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই, বরং তাহারা মুসলমানগণ ময়দান পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোন দলের একক আধিপত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের বিজয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অপরপক্ষে কোন দল পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ না করা পর্যন্ত এবং যাবতীয় সৈন্য ও রসদ লইয়া ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের পরাজয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। উহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া Brigadier Gulzar

Ahmed বলেন, It is difficult to credit the Maccans victory. At best it can be said that the Muslims failed to make good initial successes gained by them and the Makkans saved themselves from a defeat (The Battles of the Prophet of Allah, p. 243-244)।

যুদ্ধের পট পরিবর্তন হওয়ার পর কুরায়শরা মুসলিম সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে নাই। পারে নাই তাহাদের কাহাকেও বন্ধী করিতে এবং কোন সম্পদও লুণ্ঠন করিতে পারে নাই। তাহাদের ব্যর্থতার কথা ও মুসলিম সৈন্যদের বিজয়ের কথা পরোক্ষভাবে তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে। মক্কার দিকে ফিরিয়া যাইবার পথে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিল ঃ

لم تصنعوا شيئا اصبتم شوكتهم وجدهم ثم تركتموهم وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لكم.

"তোমরা সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া তাহাদের কোন ক্ষতি কারিতে পার নাই, বরং তাহাদেরকে তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ, তাহাদের নেতৃবৃন্দ জীবিত রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে আবার একত্র হইতেছে" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১৯)।

মুসলমানগণ আল্লাহ্র সাহায্যে খুব শীঘ্রই তাহাদের এই ক্ষণস্থায়ী বিপর্যয় কাটিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। W. Watt যথার্থই বলিয়াছন, Muhammad had managed to hold his own aganist the Meccans and that was all he needed to do at the moment for the future much would depend on how many men he could attract to his community whether he could maetion its fighting qualities (Muhammad: Prophet and Statesman, 142)।

যুদ্ধের শেষ অবস্থার উপরই উহার ফলাফল নির্ভর করে। যেহেতু কুরায়শ বাহিনী মদীনা আক্রমণ না করিয়া ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাই এই যুদ্ধের বিজয় যে মুসলমানদের তাহা সহজেই অনুমেয়। উপরন্তু কাফির বাহিনীর মুকাবিলায় যুদ্ধের পরপরই নবী করীম (স)-এর 'হামরাউল আসাদ' অভিযান হইতে শত্রুবাহনী উপলব্ধি করিল যে, মুসলমানগণ খুব বেশী হইলেও যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিপর্যস্ত হইয়াছে, পূর্ণ যুদ্ধে নয়। প্রত্যাবর্তনরত কুরায়শ বাহিনীর পিছু ধাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) শুধু উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আহত, ক্ষতবিক্ষত মুজাহিদদেরকেই সাথে নিয়াছিলেন কাফির বাহিনীকে এই কথা বুঝাইতে যে, মুসলমানগণ পরাজিত হন নাই। তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায় নাই, যুদ্ধের সাময়িক ক্ষয় ক্ষতি তাহাদের দুর্বল করিতে পারে নাই,বরং তাহাদের শক্তি, সাহস, মনোবল সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে, যে কোন ধরনের মুকাবিলায় তাহারা পূর্ণ সক্ষম। আল্লাহর অনুগ্রহে তাহারা বিজয়ী হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মুফাসসিরকুল শিরোমনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উহুদ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর যেরূপ জয়লাভ হইয়াছিল, সেরূপ বিজয় আর কখনও ঘটে নাই (যাদুল মা'আদ, ২খ, ৩৪৫)।

অতএব উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, উহুদ যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনু. ডঃ রশীদুল আলম (নতুন সং, কলিকাতা ১৯৯৫ খৃ.); (৩) আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, ১ম সং,দিল্লী ১৪০৬ হি. , ১৭খ.; (৪) শায়খ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাক্র আল-খাতীব আল-কাসতাল্লানী আশ-শাফিঈ, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা ঃ মাওয়াহিব লাদুন্নিয়্যা, উর্দূ অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার খান আসাফী, ১ম ও ২খ.,করাচী, মুহাম্মদ আলী কারখানা, ইসলামী কুতুব, ১৩৩৮ হি.; (৫) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, উহুদ নিবন্ধ (ই. ফা. বা.,ঢাকা ১৯৮৯ খৃ); (৬) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী ২খ., মাকতাবায়ে রশিদিয়া, দিল্লী ১৯৩৮ খৃ. ; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (আরবী), ২খ. (মিসর, তুরাছ আল-ইসলাম, তা. বি.); (৮) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ, তাহকীকঃডঃ মার্সডিন জনস (মুয়াসসাসাতু আল-আলামী লিল-মাতবূআত, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.); (৯) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, (মাকতাবাতু দার আল- ইসলাম, ১৪১৪/১৯৯৪); (১০) জেনারেল আকবর খান, মহানবীর (স) প্রতিরক্ষা কৌশল, তরজমাঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকা, ই. ফা. বা.,২য় প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ.); (১১) হাফিজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৬ সং, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.); (১২) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফীত-তারীখ, ২খ. (দারু-সাদর, বৈরূত ১৪০২/১৯৮২); (১৩) মুহাম্মাদ আল- খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন (দারুল-জিল, তা. বি.); (১৪) হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭খ. (বৈরূত দারুল-মা'আরিফা, তা. বি.); (১৫) ইব্ন, কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, ২খ., আল- মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, ১ম সং, ১৩৪৭/ ১৯২৮; (১৬) আল্লামা শিবলী নু'মানী-আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী (স), ১খ., দারুল-ইশা'আত, ১ সং,করাচী, ১৯৮৫ খৃ. ; (১৭) আবুল বারাকাত 'আবদুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার (উর্দূ), দেওবন্দ, মাকতাবায়ে থানবী; (১৮) ইব্ন ইসহাক, সীরাত রাসূলিল্লাহ (স), অনু. শহীদ আখন্দ, ৩খ. (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৯৯২ খৃ.); (১৯) মাহাম্মাদ ইব্ন ' আবদুল ওয়াহহাব, মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (স) (আল- জামিয়া আল- ইসলামিয়া বিল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারা, ১৪০৮ হি.); (২০) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., (বৈরূত, মুআসসাসাতুল 'আলামী

লিল-মাতবূ'আত, তা. বি.); (২১) S. Amir Ali, The Spirit of Islam, 1st ed. 1981 (Delhi, Islamic Book Trust); (২২) সহীহ মুসলিম, ২খ., (দিল্লী, মাকতাবাতুর-রাশিদিয়া, ১৩৭৬ হি; (২৩) কাযী ইয়ায, কিতাবুশ শিফা বিতা'রীফ হুকূক আল-মুসতাফা, ১খ., (ইস্তাম্বুল, মাত বায়া উছমানিয়া ১৩১২ হি.); (২৪) আল্লামা আবদুর রহমান ইব্ন খালদূন, তারীখ ইব্ন খালদূন, ১খ., (দেওবন্দ, ইদারাতুর-রাশিদ); (২৫) W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman (Oxford University press, 1961); (২৬) আবদুল হামীদ সিদ্দিকী, মহানবী (অনু. মীজান রশিদ, আলীগড় লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৩); (২৭) A Guillaume, The life of Muhammad (8th Impression 1987, New York, Oxford University press); (২৮) Syed Amir Ali, A Short history of the Saracens (New Delhi, Kitab Bhavan, 4th ed. 1994); (২৯) মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত,মা'আরিফুল কুরআন (খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক সংরক্ষিত, মদীনা মুনাওয়ারা); (৩০) Brigadier (Retd.) Gulzar Ahmed, The battles of the Prophet of Allah, vol. I (Lahore, Islamic publications LTD, Ist Ed. 1985); (৩১) মুসনাদ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, দারুল কুতুব আল-মু'আল্লিমা, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮; (৩২) শায়খ ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আসাহহুল মাতাবি', দিল্লী তা. বি.; (৩৩) আল্লামা সায়্যিদ মাহমূদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাছানী, ৪র্থ খণ্ড (মুলতান, মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া)।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

গায্ওয়া হামরাউল আসাদ

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দক্ষিণে আট মাইল দূরের একটি প্রস্তরময় এলাকার নাম "হামরাউল আসাদ" (حمراء الاسد)। উত্তরে রিয্ওয়া পর্বত, দক্ষিণে মস্তুরা। পূর্বে সফ্রা পর্বত ও সফরা উপত্যকা, পশ্চিমে লোহিত সাগর। মদীনা হইতে মক্কার দিকে যুল-হুলায়ফার পথে বাম পার্শ্বে ইহার অবস্থান। এখানে একটি প্রাচীন মৌসুমী বাজার ছিল। প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে এখানে আরবদের বাজার ও মেলা বসিত (সীরাতে হালাবিয়্যা, ২৬খ., পৃ. ১৫; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স)ঃ সমাকালীন পরিবেশ ও জীবন, মক্কা মদীনার ভৌগোলিক চিত্র, পৃ. ৬৬১)।

প্রেক্ষাপট

১১ শাওয়াল, ৩য় হি. / ৬২৫ খৃ. ঐতিহাসিক উহুদ প্রান্তরে মুসলমান ও কুরায়শদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে ইহা উহুদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে বিজয় লাভ করিলেও কতিপয় তীরন্দাজ মুজাহিদ সাহাবীর একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধের গতি পাল্টাইয়া যায়। মুসলমানগণ কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণকারীর ভূমিকা হইতে আক্রান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ফলে মুসলমানগণ ছত্র-ভঙ্গ হইয়া যান এবং সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৪)।

রণাঙ্গনে গুটিকয়েক মুসলমান অবশিষ্ট ছিলেন। তাহারাও কম বেশী আহত হইয়াছেন। এই অবস্থায় কুরায়শ বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিলে অতি সহজেই তাহারা তাহাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাই কুরায়শগণ রণাঙ্গনে সামান্য সংখ্যক আহত মুসলমানের উপরও আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না, বরং তাহারা দ্রুতপদে রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া মক্কার দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহারা কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর রাওহা (الروحاء) নামক স্থানে পৌছিয়া যাত্রা বিরতি করিল।

দিনটি ছিল ১৫ শাওয়াল শনিবার। সন্ধ্যার পর কাফেলার অনেকেই বলিতে লাগিল, আমরা কি করিতেই বা আসিলাম আর কি করিয়াই বা ফিরিলাম। আসিলাম মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করিতে, মদীনা আক্রমণ করিয়া সর্বস্বান্ত করিতে; কিন্তু তাহা হইল কোথায়? এমন সুযোগও কি কেহ ছাড়ে? মুসলমানগণ এখন আঘাত-জর্জরিত, আর মদীনা এখন অরক্ষিত।

তবে কেন আমরা ফিরিয়া যাইতেছি? চল আমরা পুনরায় মদীনায় ফিরিয়া যাই এবং মদীনার উপর অতর্কিতে হামলা করিয়া মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করিয়া দেই।

কুরায়শদের বিশিষ্ট নেতা সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বলিল, না, মদীনায় আক্রমণ করিলে বিপদ আছে। মুসলমানগণ এখন চরম ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। দেখ নাই মুসলমানদের কি অপূর্ব শৌর্য-বীর্য? মদীনায় গেলে আর প্রাণে ফিরিতে পারিবে না; কাজেই মক্কায় ফিরিয়া চল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৬; তাফসীর রূহুল মা'আনী, ২খ., পৃ. ৩৩৭)।

কুরায়শ দলপতি আবূ সুফয়ান সকলের মতামত শুনার পর মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার মানসে পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিল।

মদীনায় পুনরায় যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা

শনিবার দিবাগত রাত্র। শাওয়ালের ১৬তম রজনী। রাসূলুল্লাহ (স) ৭০জন সাহাবীকে উহুদে দাফন করিয়া সজল নয়নে আঘাত জর্জরিত দেহে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে মাত্র মদীনায় পদার্পণ করিয়াছেন। এমন সময় তিনি ওহীর মাধ্যমে কুরায়শদের পুনরায় মদীনা আক্রমণের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) রাওহা হইতে আসিতেছিলেন। তিনি কুরায়শদের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মহানবী (স)-কে অবহিত করেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, সিরিজ, ২৬খ., পৃ. ১৩)। কেহ কেহ এই সংবাদবাহক সাহাবীর নাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর আল-মুযানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মুহাম্মাদ স.,পৃ. ২০৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদের যথার্থতা যাচাই এবং কুরায়শদের গতিবিধি জানার জন্য বানূ আসলাম গোত্রের তিনজনের একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অগ্রবর্তী দলটি হামরাউল আসাদে আসিয়া পৌঁছিলে অজ্ঞাত শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁহাদের দুইজন শাহাদাত বরণ করেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, সিরিজ, ২৬খ., পৃ. ১৬; মুহাম্মদ সা., পৃ. ২০৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিলাল (রা) -কে দিয়া মদীনায় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "এখনই সকলে প্রস্তুত হইয়া যাও। কুরায়শদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে। যাহারা উহুদ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল শুধু তাহারাই এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে।" একদিকে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা হইয়াছে, অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা এই যে, উহুদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাহাবী কোন না কোনভাবে আহত হইয়াছেন। হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা)-এর দেহে ছিল নয়টি জখম, আর হযরত তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান (রা)-এর দেহে আঘাত ছিল তেরটি। তখনও অনেকের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। সকলেই চরমভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত। ইহা ছাড়া মদীনার ঘরে ঘরে স্বজন হারাইবার বেদনায় কান্নার রোল শুনা যাইতেছিল। এমন কঠিন মুহূর্তে ঘোষিত হইল পুনঃ যুদ্ধযাত্রার আহবান! মুসলমানগণ অবনত মস্তকে রাসূলের

নির্দেশ মানিয়া লইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৪৬)। আল্লাহ তা'আলা সাহাবা-ই কিরামের এই অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"জখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে" (৩ ঃ ১৭২)।

মদীনা হইতে যুদ্ধযাত্রা

১৬ শাওয়াল রবিবার। রাসূলুল্লাহ (স) উহুদে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব ঘোষণানুসারে কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি লইলেন। তিনি হযরত ছাবিত ইব্নুদ দাহ্হাক (রা)-কে রাহবার (পথপ্রদর্শক) এবং হযরত আলী, মতান্তরে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-কে পতাকাধারী নিযুক্ত করিলেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, সিরিজ, ২৬খ., পৃ. ১৫১৬)। রসদপত্রের মধ্যে ছিল হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) প্রদত্ত ত্রিশটি উট সওয়ারী হিসাবে আর কিছু পশু কাফেলার আহারের জন্য। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল উহুদ ফেরত ছয় শত ত্রিশজন (তাফসীরে মাযহারী, ৩খ., পৃ. ১৭৫; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা হইয়া গেলেন। উহুদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজনও বাদ থাকিলেন না। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার পিতার আদেশে তাঁহার সাতটি বোনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকায় উহুদে শরীক হইতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা উহুদে শাহাদাত লাভ করেন। এইবার যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা শুনিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) শুধু তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, মুজাহিদদের মধ্যে কেবল আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে পূর্ব দিনের যুদ্ধে (উহুদে) শরীক ছিল না।

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইতোপূর্বে উহুদ যুদ্ধে যাত্রাপথ হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। সেও দরবারে রিসালাতে হাযির হইয়া এই যুদ্ধে শরীক হইবার অনুমতি চাহিল। মহানবী (স) তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৬)।

মদীনার শাসনভার হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা হইলেন। আঘাত জর্জরিত দেহ লইয়া মহানবী (স) ও সাহাবীগণ অতিকষ্টে পথ চলিতেছিলেন। যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও দৌর্বল্যের কারণে তাঁহাদের পায়ে হাঁটার শক্তি নাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদেরকে উৎসাহ দান করিয়া ইরশাদ করিলেন ঃ

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হইও না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর নিকট তোমরা যাহা আশা কর, উহারা তাহা আশা করে না; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১০৪; তাফসীরে মাযহারী, ২খ., পৃ. ১৮০)।

হামরাউল আসাদে শিবির স্থাপন

রাসূলুল্লাহ (স) হামরাউল আসাদে পৌঁছিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাত্রিতে মুসলমানগণ অগ্নিকুণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতেন। অগ্নি কুণ্ডলীর আলোয় বহু দূর আলোকিত হইয়া পড়িত। দূর হইতে মনে হইত যেন সেখানে সহস্র সহস্র সৈন্যবাহিনী অবস্থান করিতেছে। প্রতি দিন এইরূপ পাঁচ শত অগ্নিকুণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত করা হইত। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একটি দূরদর্শী রণকৌশল। ইহাতে আরও একটি উপকার ছিল এই যে, প্রত্যেক সাহাবীই কিছু না কিছু আহত ছিলেন। তাঁহারা এই আগুন দ্বারা নিজেদের ক্ষত স্থানটি সেঁক দিতেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, সিরিজ, ২৬খ., পৃ. ১৬-১৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৬)।

মা'বাদ খুযাঈর আগমন

খুযা'আ গোত্র তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। একটি সূত্রে জানা যায় যে, খুযা'আ গোত্রের সহিত রাসূলের এই মর্মে সন্ধি ছিল যে, তিহামায় যাহা কিছু ঘটিবে তাহা তাহারা রাসূল হইতে গোপন রাখিবে না। এই কারণে মুসলমানদের সহিত তাহাদের একটি হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল (তাফ্সীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

উহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের বিপদের কথা শুনিয়া খুযা'আ গোত্রের সর্দার মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ আল-খুযাঈ সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য হামরাউল আসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাসূলের খিদমতে পৌঁছিয়া বলিলেন, "মুহাম্মাদ! আপনার ও আপনার সঙ্গিগণের বিপদে আমরা মর্মান্তিক জ্বালা অনুভব করিতেছি। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অচিরেই শত্রুদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি দান করিবেন।" উল্লেখ্য যে, মা'বাদ তখনও মুশরিক ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৭)।

কুরায়শদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার

মা'বাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে কুরায়শদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়া খুবই উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং কোন ছলে ও কৌশলে কুরায়শদেরকে তাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবূ

সুফ্য়ানের নিকট গমন করিলেন। আবূ সুফয়ান মা'বাদের নিকট মুসলমানদের অবস্থা জানিতে চাহিলে মা'বাদ বলিলেন, প্রাণ বাঁচাইতে হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর পলায়ন কর। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, মুহাম্মাদ বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া তোমাদেরকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া পড়িলে তোমাদের আর রক্ষা নাই। মুসলমানগণ এখন প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে রহিয়াছেন। তাই আর বিলম্ব করিও না, পালাও। মুসলমানদের ক্ষোভ ও উত্তেজনার প্রচণ্ডতা বুঝাইবার জন্য মা'বাদ একটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩২১)।

মা'বাদের বক্তব্য শুনিয়া আবূ সুফ্য়ান ভীত হইয়া গেল এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার ও তাহার সহচরদের অন্তরে চরম ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন। ফলে তাহারা আর মদীনা আক্রমণের সাহস করিল না বরং ভীত হইয়া দ্রুতপদে মক্কার দিকে পলায়নের প্রস্তুতি লইল। এ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় কুরানের আয়াত ঃ

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ.

"অচিরেই আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র শরীক করিয়াছে, যাহার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের আবাস, কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিমদের জন্য" (৩ ঃ ১৫১; তাফসীরে বায়ানুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৬৩)।

আবূ সুফ্য়ানের চতুরতা ও মুসলমানদের দৃঢ়তা

মক্কার দিকে পলায়নকালে আবূ কায়স গোত্রের মদীনাগামী একটি কাফেলার সহিত আবূ সুফয়ানের সাক্ষাত হইল। আবূ সুফয়ান বলিল, তোমরা দয়া করিয়া আমাদের উপকারার্থে একটি কাজ করিও। তাহা হইলে আমরা আগামী দিন উকায বাজারে তোমাদেরকে বিনিময়স্বরূপ একটি উট বোঝাই কিসমিস দান করিব। কাজটি হইল,তোমরা মুহাম্মাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া ভীত করিয়া দিও যে, কুরায়শগণ মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বিরাট সমরায়োজন করিয়াছে। শীঘ্রই তাহারা মদীনা আক্রমণ করিবে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৭)।

আবূ কায়স গোত্রের লোকজন যখন মুসলমানদের এই ভীতিপ্রদ সংবাদ শুনাইল তখন মানগণ দৃঢ় কণ্ঠে সমস্বরে উত্তর করিলেনঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক" (৩ ঃ ১৭৩; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৭৯; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন,২খ., পৃ. ২৪০)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট" এই উক্তিটি আল্লাহ্র প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার এমন একটি ঘোষণা যাহা হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন যখন তাঁহাকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। আর ইহা বলিয়াছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ, যখন তাঁহাদেরকে হামরাউল আসাদে কুরায়শ বাহিনীর ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের ঈমান আরও বহু গুণ বাড়িয়া গেল (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৭৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪২৮)। এ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"ইহাদেরকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা তাহাদেরকে ভয় কর। কিন্তু ইহা তাহাদের (মুসলমানদের) বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক" (৩ ঃ ১৭৩)।

হামরাউল আসাদ বাজারে ব্যবসা ও মুনাফা অর্জন

প্রাচীন কাল হইতেই হামরাউল আসাদে আরবদের মৌসুমী বাজার বসিত। এই সময়টি ছিল বাজারের মৌসুম। বিভিন্ন বণিক কাফেলা বিচিত্র পণ্যসম্ভার লইয়া তাই এখানে সমবেত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য পাইকারী মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহা খোলা বাজারে খুচরা বিক্রয় করিলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে ইহা হইতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হইল। তিনি সমস্ত মুনাফা সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

"তারপর তাহারা আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, অনিষ্ট তাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ যাহাতে রাযী তাহারা তাহাই অনুসরণ করিয়াছিল । আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল" (৩ ঃ ১৭৪)।

তাফসীর রূহুল মাআনীতে (২খ., পৃ. ৩৪০) পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও লাভবান হওয়ার এখানেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকাংশ মুফ

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার এক বৎসর পর 'বদর সুগ্‌রার অভিযানেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই ঘটনাটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে তাহার উল্লেখ নাই (তাফসীর বায়ানুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৭৪;তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১খ, পৃ. ৩৭৯)।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ (স) হামরাউল আসাদে কুরায়শ বাহিনীর অপেক্ষায় তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) অবস্থান করিলেন। ইহার পর তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আবূ সুফ্‌য়ান তাহার দলবলসহ মক্কার দিকে পলায়ন করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া মহনবী (স) বলিলেন ঃ

والذى نفس محمد بيده لقد سومت لهم حجارة لو اصبحوا بها لكانوا كامس الذاهب.

"সেই সত্তার শপথ যাঁহর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি তাহারা সেখানে প্রভাত পর্যন্ত অবস্থান করিত তাহা হইলে তাহাদের নামাংকিত প্রস্তরাঘাতে তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত" (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩৭৯)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিরাপদে প্রচুর ব্যবসায়িক মুনাফাসহ মদীনা তায়্যিবায় প্রত্যাবর্তন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা আলূসী, তাফসীর রূহুল মা'আনী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., ২খ., পৃ. ৩৩৬-৩৪০; (২) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, নাদওয়াতুল মুআল্লিফীন, দিল্লী, ২খ., পৃ. ১৭৪-১৮৩; (৩) ইমাম রাযী, তাফাসীর কাবীর, দারুল ইহ্‌য়া, বৈরূত, ৯খ., পৃ. ৯৭-১০২; (৪) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন হালবী, সীরাত হালাবিয়্যা, ইদারা-ই কাসিমিয়্যা, দেওবন্দ সিরিজ, ২৬খ., পৃ. ১৫-২৩; (৫) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচী ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ২৩৯-২৪১; (৬) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ(স),দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, পৃ. ২০৭-২০৯; (৭) শায়খ আবুল হাসান আলী নদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুশ শরূক, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ২০৬; (৮) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৭৫-৩৮০; (৯) ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ., ৪খ., পৃ. ৪২৬-৪৩০; (১০) ইদরীস কান্দলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, আশরাফী বুক ডিপো, দিল্লী, ২খ., পৃ. ২৫৫-২৫৭; (১১) স ফিউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা, রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামী ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৩২১; (১২) আশরাফ আলী থানবী, তাফসীর বায়ানুল কুরআন, গোলাম আলী এন্ড সন্স, লাহোর ১৩৭৪ হি, ২খ., পৃ. ৬৩; (১৩) ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ.।

মাসউদুল করীম

সারিয়্যা আবূ সালামা

মহানবী (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ সালামা (রা)-এর অধিনায়কত্বে হিজরতের ৩৫তম মাসে অর্থাৎ হিজরীর মুহাররম মাসে 'কাতান' পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। উহুদ যুদ্ধে আবূ সালামা (রা)-এর বাহুতে একটি তীর বিদ্ধ হইলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মাসাধিক কাল চিকিৎসা গ্রহণের পর আহত স্থানের ঘা শুকাইলেও দেহের অভ্যন্তরভাগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তাঁহার উপর বানূ আসাদ গোত্রের এলাকায় অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছায় যে, তুলায়হা ও তাহার ভ্রাতা সালামা ইব্ন খুওয়ায়লিদ নিজেদের গোত্র এবং তাহাদের প্রভাবাধীন অন্যান্য ক্ষুদ্র গোত্রসমূহকে মদীনার উপর আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতেছে। মহানবী (স) তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের সমন্বয়ে গঠিত দেড় শত মুজাহিদের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং আবূ সালামা (র)-কে ইহার সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া 'কাতান' অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। এই অভিযানে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, উসায়দ ইব্ন হুদায়র, আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম (রা) প্রমুখ সাহাবীও অংশগ্রহণ করেন (মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ২৪৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) আবূ সালামা (রা)-এর নিকট সামরিক বাহিনীর পতাকা অর্পণের প্রাক্কালে বলেন ঃ রওয়ানা হইয়া যাও এবং আসাদ গোত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তাহাদিগকে ছত্রভংগ করিয়া দাও। মহানবী (স) তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দেন। আবূ সালামা (রা) সচরাচর ব্যবহৃত পথ দিয়া না যাইয়া ভিন্ন এক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অকস্মাৎ আসাদ গোত্রের জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসাদ গোত্র মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আবূ সালামা (রা) তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বহু দূর লইয়া যান। তিনি এখানে তের দিন অবস্থান করেন।

এই অভিযানে মুসলিম বাহিনী পর্যাপ্ত সংখ্যক উট ও ছাগল-ভেড়া গনীমত হিসাবে লাভ করে এবং তাহা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত করে। নবী (স)-এর অংশে একটি গোলাম এবং এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট গনীমত সৈনিকগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেক সৈনিক ৭টি করিয়া উট এবং কিছু ছাগল লাভ করেন। যুদ্ধের সংবাদ প্রদানকারী আসাদ গোত্রীয় ব্যক্তিকে গনীমত হইতে একটি পূর্ণ অংশ প্রদান করা হয়।

এই অভিযানে কোন লোকক্ষয় হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। তবে ইব্ন কাছীর শত্রুদের তিনজন দাস বন্দী হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন (৪খ, পৃ. ৬১)। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আবূ সালামা (রা)-এর পূর্বের ক্ষতস্থানের ঘা মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং জুমাদাল উলা মাসের ২৭ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৬১)। ইব্ন সা'দ-এর মতে তিনি যুল-কা'দা মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে তাহার ইদ্দাতশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বিবাহ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত তা. বি.,৪খ., পৃ. ৬১; (২) ইমাম যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ৭ম সং, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ২১৮; (৩) ইব্নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২৯তম সং, বৈরূত তা. বি., ৪খ., পৃ. ২১৮; (৪) আবদুর র'উফ, আসাহহুস সিয়ার, বাংলা অনু., ঢাকা ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১১৫; (৫) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, ১ম সং, ইউ. পি. ১৯৮১ খৃ., ১খ., পৃ. ৭২৮; (৬) আবদুল হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী, মদারিজুন নুবুওয়াত, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ২৪৭; (৭) সফীউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখ্তুম, ১ম সং, রিয়াদ ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ২৯০; (৮) আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৩য় সং, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., ২খ., পৃ. ১৪১-২; (৯) তালিব-হাশিমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম সং, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ.,৩খ., পৃ. ৯০; (১০) ইসলামী বিশ্বকোষ,ই.ফা.বা., ৬খ., পৃ. ৬৯ ।

মুহাম্মদ এনামুল হক

সারিয়্যা আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা)

৪র্থ হিজরীর ৫ মুহাররাম সোমবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স আল-জুহানী আল-আনসারী (রা) সুফয়ান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন নুবায়হ আল-হুযালী (মতান্তরে খালিদ ইব্‌ন সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ আল-হুযালী)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫০; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯; সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাব সালাতিত্ তালিব, পৃ. ১৯৪; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; আস্-সুনানুল কুবরা, ৯খ, পৃ. ৩৮; ৩খ, পৃ. ২৫৬; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৭; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭২)।

কোন কোন সূত্রে এই ঘটনা ৫ম হিজরীতে ইসলামের চরম দুশমন আবূ রাফে' সাল্লাম ইব্‌ন আবিল হুকায়ককে হত্যার পরপর সংঘটিত হয় বলিয়া জানা যায় (দালাইলুন নুবুওয়্যা, বায়হাকী; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৪২; মাদারিজ, ২খ., পৃ. ২৪৭-২৪৮)। তখন সে 'আরাফাত-এর নিকটবর্তী উরানা (عرنة) নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল (সুনান আবী দাঊদ, ২খ., পৃ. ১৯৪; আস-সুনানুল কুবরা, ৯খ., পৃ. ৩৮; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫০)। মতান্তরে তখন সে মক্কার অদূরবর্তী নাখলা (نخلة) নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; আস-সুনানুল কুবরা, ৩খ., পৃ. ১৭২; দালাইল আবূ নু'আয়ম, পৃ. ৪৫১; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৩৫)।

তাহার সহিত তাহার গোত্রের ও অন্যান্য গোত্রের বহু লোকজন ছিল (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫০)। তাহার এই অপতৎরতা ও চরম ধৃষ্টতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) আগাম খবর পাইয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি খবর পাইয়াছি যে, ইব্‌ন নুবায়হ্ আল-হুযালী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ্ করিতেছে। সে উরানা বা নাখলাতে অবস্থান করিতেছে। তুমি গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া আস"।

আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) এই দুশমনকে শনাক্ত করিবার উপায় হিসাবে তাহার সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তুমি যখন তাহাকে দেখিবে, তাহার হাবভাব তোমাকে শয়তানের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। তোমার তাহাকে চিনিবার আরেকটি আলামত এই যে, তাহাকে দেখিবামাত্র তোমার কাঁপুনি ধরিবে" (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; আস-সুনানুল কুবরা, ৩খ., পৃ. ২৫৬;

তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; দালাইল আবূ নুআয়ম, পৃ. ৪৫১; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৪২)। তুমি তাহাকে ভয় পাইবে, তাহার হইতে সরিয়া পড়িতে চাহিবে (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)।

ইব্ন উনায়স (রা) মনে মনে বলেন, আমি ভয় পাইবার পাত্র নহি। ইহার পর তিনি তরবারি সজ্জিত হইয়া একাকী অভিযানে বাহির হন এবং যে কোন কৌশলে শত্রু হত্যা করিবার অনুমতি লাভ করেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)। তিনি ছদ্মবেশে উরানা উপত্যকায় পৌঁছিবার পর দেখিতে পাইলেন যে, ইব্ন নুবায়হ বিভিন্ন গোত্রের বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে সামনে অগ্রসর হইতেছে (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)। সে কতিপয় রমণী পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকিয়া বিশ্রামের জন্য জায়গা খুঁজিতেছে (আস্-সুনানুল কুবরা, ৩খ., পৃ. ২৫৬; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; তারীখ তাবারী, ৪খ., পৃ. ১৭২; দালাইল আবূ নু'আয়ম, পৃ. ৪৫১; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৩৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক নির্দেশিত আলামত অনুযায়ী তিনি তাহাকে সহজেই শনাক্ত করিতে সক্ষম হইলেন এবং নিজের ভিতর সেই ভয় ও কম্পন অনুভব করিলেন যেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) পূর্বেই তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলেন। তখন আসরের সালাতের ওয়াক্ত ঘনাইয়া আসিল। ইব্ন উনায়স (রা) বলেন, "আমি আশংকা করিলাম যে, তাহার ও আমার মধ্যে এমন কিছু ঘটিতে পারে যাহা আমার সালাতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে। এইজন্য আমি অগ্রসররত অবস্থায় ইশারায় রুকূ-সিজদা করিয়া সালাত আদায় করিলাম" (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, পৃ. ১৯৪; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; আস্-সুনানুল কুবরা, ৯খ., পৃ. ৩৮; এবং ৩খ., পৃ. ২৫৬; বাযলুল মাজহূদ, ৬খ, পৃ. ৩৬৮; 'আওনুল মা'বূদ, ৪খ., পৃ. ১২৯-৩১; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭২)।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা) তাহার নিকটবর্তী হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি খুযা'আ বংশীয় (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১) একজন আরব। আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আপনার সহিত থাকিয়া আপনার এই কাজের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। ইব্ন নুবায়হ বলিল, তোমাকে স্বাগতম! আমি তো ঐ কাজই করিতেছি (সুনান আবী দাউদ, পৃ. ১৯৪; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭২; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১; দালাইল বায়হাকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া সূত্রে, ৪খ., পৃ. ১৪২)।

ইব্ন নুবায়হ তাহাকে সহযোদ্ধা ভাবিয়া কাছে টানিয়া লইল। তিনি তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। এক সময় তাহার সৈন্য-সামন্ত ও সহচররা ঘুমাইয়া পড়িল (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)। সেই সুযোগে তিনি অকস্মাৎ তরবারির আঘাতে

ইব্‌ন নুবায়হকে হত্যা করিলেন।তাহার সঙ্গিনীরা তাহার লাশের উপর মাথা ঝুঁকাইয়া কাঁদিতে থাকিল (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; আস-সুনানুল কুবরা, ৩খ., পৃ. ২৫৬; সীরাত ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৬৭২-৬৭৩; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮)।

ইব্‌ন নুবায়হ-এর সৈন্যবাহিনী ঘটনাটি বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই তিনি তাহার বিচ্ছিন্ন মস্তকসহ সরিয়া পড়িলেন এবং গহীন পর্বত গুহায় আত্মগোপন করিলেন। তাহার সৈন্যবাহিনী বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। এইভাবে তিনি দিনের বেলা গুহায় লুকাইয়া থাকিয়া এবং রাত্রিবেলা পথ চলিয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯; আর-রাহীক, পৃ. ৩২৬)। তিনি মসজিদে নববীতে আসিয়া ইব্‌ন নুবায়হ-এর বিচ্ছিন্ন মস্তকটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সম্মুখে রাখেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে দেখিবামাত্র মন্তব্য করিলেন ঃ أَفْلَحَ الْوَجْهُ "তোমার মুখমণ্ডল সফল হউক"। তিনি উত্তরে বলিলেন, أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ। "বরং সফল হউক আপনার মুখমণ্ডল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল" (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১)!

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সফল অভিযানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। তিনি নিজ গৃহ হইতে একখানি লাঠি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন এবং সর্বদা ইহা তাঁহার সঙ্গে রাখিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি লাঠিটি লইয়া সাহাবাদের সম্মুখে বাহির হইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, লাঠিটির রহস্য কি? তখন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইহা আমাকে দিয়াছেন এবং সঙ্গে রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফিরিয়া যাও এবং কেন তোমাকে ইহা দেওয়া হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া ইহা প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "এই লাঠিখানি কিয়ামতের দিন তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্কের নিদর্শন। নিশ্চয়ই সেই দিন লাঠিধারী মানুষ স্বল্প সংখ্যক হইবে (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৯৬; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯; দালাইল আবূ নু'আয়ম, পৃ. ৪৫২)।

তখন হইতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা) এই বরকতপূর্ণ লাঠিখানি তাঁহার তরবারির সহিত একত্রে মিলাইয়া নিজের নিকট রাখিতেন। এইজন্য তাহাকে যুল-মিখ্‌সারাহ (ذو المخصرة) বা যষ্ঠিধারী নামে অভিহিত করা হয় (বায্‌লুল মাজহূদ, ৬খ., পৃ. ৩৬৭)। তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ইহা তাঁহার সঙ্গেই ছিল। তিনি ৫৪/৬৭৪ সালে, মতান্তরে ৭৪/৬৯৩ সালে অথবা ৮০/৬৯৯ সালে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন (শাযারা, ১খ., পৃ. ৬০; তাহযীবুল কামাল, ১০খ., পৃ. ২৮; আল-ইসতী'আব, ৩খ., পৃ. ৮৬৯; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ১২০; তাজরীদ, ১খ., পৃ. ২৯; তাহযীবুত তাহযীব, ৫খ., পৃ. ১৩১; আল-আ'লাম, ৪খ., পৃ. ১৯৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৫৬৮)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার ওসিয়াত অনুযায়ী যষ্ঠিখানি তাঁহার কাফনের ভিতর রাখিয়া একত্রে দাফন করা হয় (মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ.

৪৯৬; আস-সুনানুল কুবরা, ৩খ., পৃ. ২৫৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; সীরাত ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৬৭৩; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭২; দালাইল বায়হাকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া সূত্রে, ৪খ., পৃ. ১৪২; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৩৬)।

ইব্ন উনায়স (রা)-এর এই সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান ১৮ দিনে সমাপ্ত হয়। তিনি চতুর্থ হিজরীর ২৩ মুহাররাম শনিবার মদীনা মুনাওওয়ারায় ফিরিয়া আসেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫১; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯; আর-রাহীক, পৃ. ৩২৬)। এই অভিযান সম্পর্কিত হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, سَنَدُهُ حَسَنٌ ইহার সনদ হাসান, উত্তম (ফাতহুল বারী, ২খ., পৃ. ৪৩৭)।

ইব্ন নুবায়হ্‌র হত্যা ও এই অভিযান প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা)-এর একটি কবিতা ইব্ন হিশাম সূত্রে জানা যায়। কবিতাটি নিম্নরূপ (অনুবাদ) ঃ

১. আমি ইব্ন ছাওরকে ফেলিয়া রাখিয়াছি উট শাবকের মত; তাহার পাশে বিলাপরত মহিলারা কামীসের বুক বিদীর্ণ করিতেছিল।

২. আমি তাহাকে আঘাত করিলাম ভারতীয় তরবারির, যাহা ঝকঝক করিতেছিল লোহার পানি সদৃশ; হাওদায় আসীন নারীরা তখন তাহার ও আমার পশ্চাতে।

৩. সেই তরবারি খণ্ডিত করে বর্মধারীদের শির, যেন জ্বলন্ত গাদা কাঠের লেলিহান শিখা।

৪. তরবারি যখন করিতেছিল তাহার মুণ্ডপাত, আমি বলিতেছিলাম তখন, আমি তো ইব্ন উনায়স, বীর অশ্বারোহী, নহি নীচ আমি।

৫. আমি তো সেই দানবীরের পুত্র যাহার বাড়ির প্রশস্ত আঙিনা, যুগ যুগ ধরিয়া নামায়নি তাহার হাঁড়ি আর ছিলেন না যিনি সংকীর্ণমনা।

৬. আমি তাহাকে বালিলাম, লও, এই একটি আঘাত সম্মানী মানুষের, যিনি একনিষ্ঠ নবী মুহাম্মাদের দীনে।

৭. আল্লাহ্‌র নবী কোন কাফিরের প্রতি হইলে উদ্যত, ঝাঁপাইয়া পড়ি আমি সর্বশক্তি লইয়া তাহার উপর (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৪৩; আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ২৩৮; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৪০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ দাঊদ, সুনান, ভারত তা. বি., কিতাবুস্ সালাত, বাব সালাতিত্ তালিব, পৃ. ১৭৪; (২) আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, মিসর ১৯৬৭ খৃ., ৩খ., পৃ৪৯৬; (৩) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, বৈরূত ১৩৫৬ হি., ৩খ., পৃ. ২৫৬, এবং ৯খ., ৩৮; (৪) ইব্ন ইসহাক, সীরাত রাসূলিল্লাহ্ (স), ঢাকা, ইফাবা, বাংলা অনু. শহীদ আখন্দ, ১৯৯২ খৃ.,৩খ., পৃ. ৬৭২-৬৭৩; (৫) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি.,

৪খ., ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯; (৬) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, লেবানন, বৈরূত, ৩খ., পৃ. ১৭২; (৭) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৫০, ৫১; আরও দ্র. ১খ., পৃ. ৯১, ৯২, ৩২০; ৩খ., পৃ. ৫৮০, ৫৮৩, ৪খ., পৃ. ৩২৪, ৫খ., ২৮২, ৭খ., পৃ. ৪৯৮, ৮খ., ৪০৭; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৮, ৪খ., ১৪২, ১৪৩; (৯) আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন নুবুওয়্যা, দাইরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যা, ১৩৯৭/১৯৭৭, পৃ. ৪৫১, ৪৫২; (১০) আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, লেবানন, তা. বি., ১খ., পৃ. ২৩৫, ২৩৬; (১১) আবদুল হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়্যা, উর্দূ অনু. গোলাম মুঈনদ্দীন নাঈমী, ভারত ১৯৯২ খৃ, ২খ., পৃ. ২৪৭,২৪৮; (১২) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, মিসর ১৯৯৪ খৃ., ৪খ., পৃ. ২৩৮; (১৩) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, লেবানন, তা. বি., ২খ., পৃ. ৩৯; (১৪) শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১৫২; (১৫) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ৪৩৭; (১৬) ঐ লেখক, তাকরীবুত তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ.; (১৭) ঐ লেখক, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, তা. বি, ৩খ.; (১৮) ঐ লেখক, তাহযীবুত তাহযীব, ৫খ., পৃ. ১৩১; (১৯) ইব্ন আব্দিল বার্র, আল-ইসতীআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, মিসর, তা. বি., ৩খ., ৮৬৯ ও ৮৭০; (২০) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা, বৈরূত, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি., ৩খ., ১১৯-১২০; (২১) আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪, ১০খ., ২৯; (২২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., পৃ. ২৯৮; (২৩) ঐ লেখক, শাযারাতুয যাহাব, ১খ., পৃ. ৬০; (২৪) খায়রুদ্দীন যিরিকলী, আল-আ'লাম, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৯৯; (২৫) ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবীর জীবন-চরিত, ঢাকা, ইফাবা, বাং. অনু., পৃ. ৩৯৪; (২৬) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৩২৬; (২৭) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, ১৯৯০ খৃ., পৃ. ১১৫; (২৮) শিবলী নুমানী, সীরাতুন নবী, ভারত ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৮৯; (২৯) মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী, 'আওনুল মা'বূদ ফী শারহি সুনান আবী দাঊদ, মদীনা মুনাওয়ারা, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১২৯, ১৩০, ১৩১; (৩০) খলীল আহমাদ সাহারানপূরী, বাযলুল মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাঊদ, বৈরূত, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯; (৩১) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, লেবানন, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ২০৯; (৩২) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা ১৪০৬/১৯৮৬, ১খ., পৃ. ৫৬৭-৫৬৮।

আহমদ আবুল কালাম

গাযওয়া (সারিয়্যা) আর-রাজী'

নামকরণ ঃ আর-রাজী' (الرجيع) একটি কূপের নাম (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৯)। ইহার অপর নাম মু'আবিয়া (দা. মা. ই., ১০খ., পৃ. ২১৫); মতান্তরে একটি খেজুর বাগানের নাম (দা. মা. ই, ১০খ., পৃ. ২১৫), মতান্তরে একটি স্থানের নাম (ইনআমুল বারী ফী শারহ সাহীহিল বুখারী, ২খ., ২৪৮; আল-'আয়নী, ৯খ., পৃ. ১১৬; মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩১)। সেইখানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কারণে ইহার নামকরণ হইয়াছে 'আর-রাজী'-এর যুদ্ধ'।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (র) ইহাকে গাযওয়া আর-রাজী' (غزوة الرجيع) নামকরণ করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৫)। ইব্নুল আছীরও এই ঘটনাটিকে غزوة الرجيع বর্ণনার অধ্যায় শিরোনামে আলোচনা করিয়াছেন (ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১১৫)। ইব্ন হিশাম ইহার নাম দিয়াছেন আর-রাজী-এর দিন (يوم الرجيع) (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮)। আল্লামা শিবলী নু'মানী বলিয়াছেন, রাজী'-এর ঘটনা (واقعة الرجيع) (শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৪)। মুবারকপুরী ও ইব্ন হাযম-এর ভাষায় ইহা আর-রাজী'-এর মিশন (بعث الرجيع) (মুবারকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৯১; ইব্ন হায্ম, জাওয়ামিউস সীরা, পৃ. ২১৪)।

মূলত এই নামগুলির কোনটিও একে অপরের সহিত সাংঘর্ষিক নয়। তবে সেখানে সাহাবীগণের (রা) সহিত যেহেতু প্রতিপক্ষের সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সেইজন্য আমরা ইহাকে আর-রাজী' যুদ্ধ হিসাবে নামকরণকে অগ্রাধিকার দিয়াছি। কেননা এই নামকরণের ভিতরেই ঘটনাটির বাস্তব চিত্র যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে উপরোল্লিখিত অন্য নামের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ সম্ভব নয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আর-রাজী' হিজাযের প্রান্তে (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৯; মুবারকপূরী, পৃ. ২৯১-২৯২), উসফান (عسفان) ও মক্কা শরীফের (مكة المكرمة) মাঝখানে (কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ৫৭৭; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫; C.E. Bosworth, vol. v, p. 40), উসফান হইতে আট মাইল (দা. মা. ই., ১০খ., পৃ. ২১৬; আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮০; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬৪) বা সাত মাইল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬; মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৪) বা যে পথ অতিক্রম করিতে দুইবার বিশ্রাম করিতে হয় অর্থাৎ দুই মনযিল দূরে অবস্থিত (আল-আয়নী, ৯খ., ১৬৮)। ইহাকে কেহ কেহ স্থানের নাম বলিলেও (কানদিহলাবী, ২খ., ৭৫৫; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১১৬; মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩১) মূলত ইহা হুযায়ল গোত্রের একটি কূপের বা খেজুর বাগানের নাম (ইব্ন হিশাম, সীরা, ৩খ., পৃ. ৯৬৯; দা. মা. ই, ১০খ., পৃ. ২১৬)। স্থানটির নাম হইল আল-হাদ'আঃ (الهدأة)
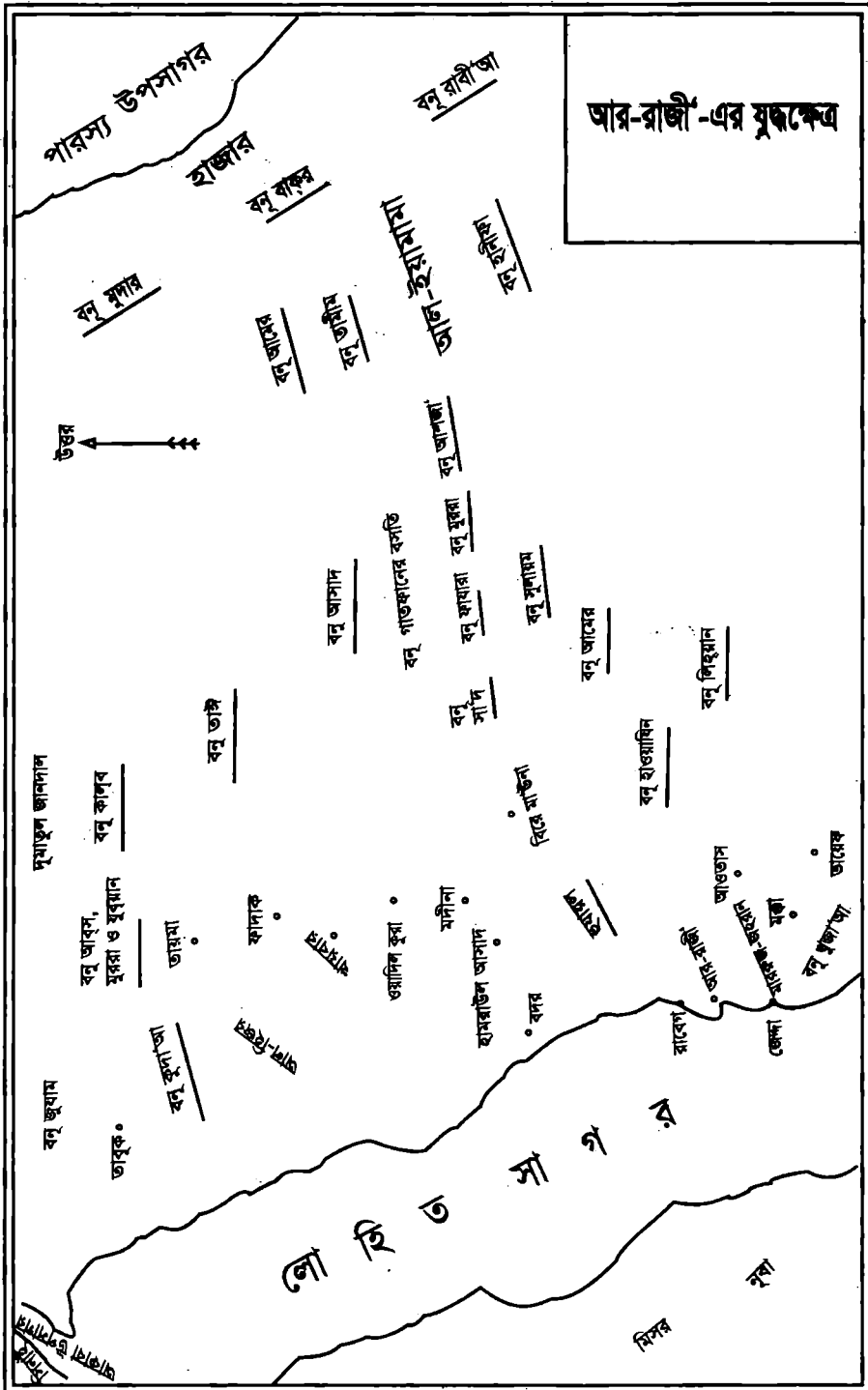
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের বসতি এলাকা। তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে (আধুনিক প্রকাশনী)।

(ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৯); ইহা কিন্তু আল-হাদাঃ (الهدة) (আল আমিদী, ১খ., পৃ. ১৫৩; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৮৪) অথবা আল-হাদ্‌দাঃ (الهدة) (ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ১২০) নয়।

উল্লেখ্য যে, উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়া (১০খ., পৃ. ২১৫) ও ইসলামী বিশ্বকোষ (২২খ., পৃ. ২১৪) আল-হাদ'আ-এর ভৌগোলিক অবস্থানকে মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী স্থলে চিহ্নিত করিয়াছে। তবে সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এই তথ্যটি ভুল। কেননা মক্কা ও তাইফের মাঝখানে অবস্থিত জায়গাটির নাম আল-হাদা (الهدة) যাহা হামযা সহকারে লিখা হয় না। আর-রাজী' যে স্থানটিতে অবস্থিত তাহা হইল আল-হাদাঃ (الهداة) যাহা হামযা সহকারে লিখা হয়। ইহার অবস্থান উসফান ও মক্কা-এর মাঝখানে। সম্ভবত উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়া ও ইসলামী বিশ্বকোষ দুইটি পৃথক পৃথক স্থানকে একই স্থান মনে করিয়া এই ভুল তথ্যটি দিয়াছে। আসলে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান। মুবারকপুরী (পৃ. ৩২৬-২৭) স্থানটি রাবিগ (رابغ) ও জিদ্দা (جدة)-এর মাঝখানে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট মানচিত্রও ইহা প্রমাণ করে যে, আর-রাজী' মক্কা হইতে কিছুটা উত্তর-পশ্চিম কোণে জিদ্দা ও রাবিগের মাঝখানেই অবস্থিত।

যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কাল ঃ এই যুদ্ধ যে উহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হইয়াছিল এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সীরাতবেত্তাগণ একমত। তবে নির্ধারিত কোন সময়ে যুদ্ধটি সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আর-রাজী' যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮; Nadwi, p. 94) শেষদিকে (ইব্নুত তীনের উদ্ধৃতি দিয়া আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৬) হিজরতের ঠিক ৩৬ মাসের মাথায় (মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৪) সফর মাসে (ইব্ন হায্ম, পৃ. ২১৪; মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৪) অনুষ্ঠিত হয়। তবে অধিকাংশ মনীষীর মতে যুদ্ধটি সংঘটিত হইয়াছিল চতুর্থ হিজরী সনের সফর মাসে (মুহাম্মাদ আল-খিদরী, পৃ. ১৫৩; মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ২১২; ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৪; মুবারকপুরী, পৃ. ২৯১; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৬; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৪)।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, উল্লিখিত দুইটি মতামতেই আর-রাজী' যুদ্ধ সফর মাসেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। মতভেদ হইতেছে কোন হিজরী সনে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়া। রাসূলুল্লাহ্ (স) নবূওয়াত প্রাপ্তির চতুর্দশ বৎসরে ২৭ সফর তারিখে মক্কা হইতে হিজরত করিয়া গারে ছাওরে পৌঁছান (মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ৪১০)। মূলত এই সন হইতে হিজরী সন গণনা করাই ছিল বাস্তবতার দাবি। এই বাস্তবতার আলোকে কোন কোন ঐতিহাসিক কিন্তু এইদিন হইতেই হিজরী সন গণনা করিয়াছেন। তবে ১৭ হিজরীতে হযরত 'উমার (রা)-এর শাসন আমলে যখন হিজরী সন প্রবর্তিত হয়, হযরত 'উছমান (রা)-র পরামর্শে সফর মাসকে হিজরী সনের প্রথম মাস হিসাবে না ধরিয়া মুহাররামকেই প্রথম মাস হিসাবে গ্রহণ করা হয় (মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ২৯২)। সুতরাং এই দুই ধারায় হিজরী সন গণনার কারণেই সম্ভবত আর-রাজী' যুদ্ধের সময়কাল নির্ধারণে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা মুহাররাম মাসকে হিজরী সনের প্রথম মাস গণ্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট আর-রাজী' যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর যাহারা হিজরত সফর মাসেই অনুষ্ঠিত হইবার কারণে সেই মাসকেই হিজরী সনের প্রথম মাস হিসাবে

গণ্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট আর-রাজী' যুদ্ধ তৃতীয় হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাহ্যিক দিক হইতে উভয় মতের মধ্যে এক বৎসরের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও মূলত কোন পার্থক্যই নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক হযরত 'উছমান (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী মুহাররাম মাসকে যেহেতু হিজরী সনের প্রথম মাস মনে করিয়াছেন এবং এই মতই সর্বত্র অনুসৃত হয়, সেই আলোকে আর-রাজী' যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হইবার মতের গ্রহণযোগ্যতা বেশী। সুতরাং এই যুদ্ধ সংঘটিত হইবার সময় হইতেছে চতুর্থ হিজরী সনের সফর মাস।

হাদীছে আর-রাজী' যুদ্ধ ঃ বুখারী শরীফে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্থানে জিহাদ, মাগাযী ও তাওহীদ অধ্যায়ে এই যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজী' যুদ্ধ অধ্যায়ে হাদীছটি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ হইয়াছে।

حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَتَبِعُوْهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى اَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوْهُ فَوَجَدُوْا فِيْهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى لَحِقُوْهُمْ فَلَمَّا اِنْتَهٰى عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَئُوْا اِلٰى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاَحَاطُوْا بِهِمْ فَقَالُوْا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اِنْ نَزَلْتُمْ اِلَيْنَا اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوْهُمْ حَتّٰى قَتَلُوْا عَاصِمًا فِىْ سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ وَبَقِىَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ فَلَمَّا اَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ نَزَلُوْا اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ حَلُّوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِىْ مَعَهُمَا هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوْهُ وَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُوالْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اِذَا اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوْسٰى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ اسْتَحَدَّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِىٍّ لِىْ فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّىْ وَفِىْ يَدِهِ الْمُوْسٰى فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا

قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُوْنِي أُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَابِيْ جَزَعٌ مِّنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ :

مَا أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلٰى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ - يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلٰى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُوْنَهُ وَكَانَ عَاصِمُ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) (কুরায়শদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য) 'আসিম ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাবের নানা 'আসিম ইব্ন ছাবিতকে দলপতি করিয়া একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করিলেন। তাহারা 'উসফান ও মক্কার মাঝখানে উপনীত হইলে বানূ লিহয়ান নামে পরিচিত হুযায়ল গোত্রের উপ-গোত্রের নিকট তাহাদের সংবাদ পৌঁছানো হইল। তখন প্রায় এক শত তীরন্দাজ তাহাদিগকে অনুসরণ করিল। তাহারা তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে এমন একটি স্থানে পৌঁছিল যাহার নিকটেই সাহাবীদের উক্ত অনুসন্ধানী দল অবস্থান করিতেছিল। তাহারা সেখানে এমন কিছু খেজুরের দানা লক্ষ্য করিল যাহা উক্ত সাহাবীগণ মদীনা হইতে সফরের পাথেয় হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারা বলিল, এইগুলি ইয়াছরিবের খেজুর। ইহার পর তাহারা তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া হযরত আছিম ও তাহার সাথীগণ (রা) একটি টিলার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতিপক্ষগণ আসিয়া তাহাদিগকে অবরোধ করিল এবং বলিল, আমরা ওয়াদা করিতেছি ও প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, যদি তোমরা নিচে নামিয়া আস তাহা হইলে তোমাদের কাহাকেও আমরা হত্যা করিব না। হযরত আসিম (রা) বলিলেন, আমি কক্ষনো কাফিরদের (কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের) আশ্রয়ে অবতরণ করিব না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সম্পর্কে আপনার নবীকে অবহিত করুন। তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখিল এবং তাহারা 'আসিমসহ তাহার সাতজন সাথীকে তীরের আঘাতে শহীদ করিল। আর খুবায়ব, যায়দ ও অন্য একজন অবশিষ্ট রহিল। হুযায়লগণ তাহাদিগকে নিরাপত্তার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দান করিল। তাহারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইয়া নিচে অবতরণ করিলেন। যখন তাহারা কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে আসিয়া গেলেন, তাহারা তাহাদের ধনুকের দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি তাহাদের দুইজনের সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন, ইহা তাহাদের

প্রথম প্রতারণা। তিনি কাফিরদের সাথে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। তাহারা খুবায়ব ও যায়দকে মক্কাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল। বানুল হারিছ ইব্ন 'আমের ইব্ন নাওফাল খুবায়বকে ক্রয় করিল। কেননা খুবায়ব হারিছকে বদরের দিন হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নিকট বন্দী অবস্থায় রহিলেন। যখন তাহারা তাঁহাকে হত্যার ব্যাপারে একমত হইল, তিনি হারিছের এক কন্যার নিকট হইতে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি ক্ষুর চাহিলেন। সে তাঁহাকে ক্ষুর দিল। সে বলিল, আমি আমার শিশুটি হইতে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলাম। শিশুটি (এই অবসরে) সিঁড়িতে উঠিল এবং খুবায়বের নিকট চলিয়া গেল। তিনি তাহাকে নিজের কোলে বসাইলেন। যখন আমি তাঁহাকে (এই অবস্থায়) দেখিলাম, আমি সাংঘাতিকভাবে আতঙ্কিত হইলাম। তিনি তাঁহার হাতে ক্ষুর থাকা অবস্থায় আমার এই আতঙ্কিত ভাব অনুধাবন করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কি ভয় পাইতেছ যে, আমি তাহাকে হত্যা করিব? আল্লাহ্র মর্জি আমি অবশ্যই তাহা করিব না। উক্ত মহিলাটি বলিত, আমি খুবায়বের মত এত ভাল বন্দী কখনও দেখি নাই। আমি তাঁহাকে লৌহ জিঞ্জির বেষ্টিত অবস্থায় আঙুরের থোকা হইতে ঐ সময় আঙুর ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি, যখন সমগ্র মক্কাতে এই ফল পাওয়া যাইত না। ইহা ছিল তাঁহাকে দেওয়া আল্লাহ্র রিযিক। তাহারা তাঁহাকে হারাম এলাকা হইতে হত্যার জন্য বাহির করিয়া লইয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে দুই রাক্আত সালাত আদায় করিবার সুযোগ দাও। তিনি সালাত আদায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সালাত দীর্ঘায়িত করিয়াছি বলিয়া তোমরা ধারণা করিতে পার, আমার এই ভয় না হইলে আমি সালাত আরো দীর্ঘায়িত করিতাম। তিনিই সর্বপ্রথম নিহত হইবার পূর্বে দুই রাক্'আত সালাত আদায় করার সুন্নাত প্রবর্তন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দু'আ' করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তাহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া দিবেন না। ইহার পর তিনি কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

"মুসলিম হইয়া মরিতেছি যবে মরনে আমার নাইক ভয়।
আল্লাহ্র তরে দানিলাম জান অন্য কিছু মুখ্য নয়।
রবের তরেতে এ ত্যাগ আমার, তাই যদি তিনি এমনই চান।
হাড়ের জোড়ায় গোশ্ত টুকরায় তিনি বরকত করিবেন দান"।

'উকবা ইবনুল হারিছ ইহার পর তাঁহাকে শহীদ করিল এবং কুরায়শদের এক দলকে 'আসিমের নিকট পাঠাইল, তাঁহার শরীর হইতে মাংস কাটিয়া আনিতে যাহাতে তাহাকে সনাক্ত করা যায়। 'আসিম বদরের দিন তাহাদের সেরা ব্যক্তিদের একজনকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ছায়ার মত একদল মৌমাছি প্রেরণ করিয়া কুরায়শদের প্রেরিত লোকদের হাত হইতে তাঁহার মৃতদেহকে হেফাজত করিলেন। সুতরাং তাহারা কিছুই করিতে পারিল না" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৫)।

এই ঘটনা এই হাদীছে যেমনভাবে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে তেমন বিস্তারিত আর কোন হাদীছে আলোচিত হয় নাই। আবূ দাঊদ শরীফে হাদীছটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে (৩খ., পৃ. ১১৫-১১৬)। তবে ঐতিহাসিক ও সীরাতবেত্তাগণ এই যুদ্ধকে আরো বিস্তারিতভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

উল্লিখিত হাদীছটি বুখারী শরীফের যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে উক্ত অধ্যায়ের শিরোনাম হইতেছে ঃ

غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه.

"আর-রাজী'", রি'ল ও যাকওয়ান এবং বি'র মা'ঊনা এর-যুদ্ধ; 'আদাল ও আল-কারা, আসিম ইব্ন ছাবিত ও খুবায়ব এবং তাঁহার সাথীদের ঘটনা"।

এই শিরোনাম কিছুটা অস্পষ্ট হইবার কারণে আর-রাজী' ও বি'র মা'ঊনা-এর সহিত উল্লেখ হইয়াছে। আর-রাজী'-এর ঘটনা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা কিনা তাহা লইয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা এখানে রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের নামকে বি'র মা'ঊনা-এর সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে আর রাজী' ও বি'র মা'ঊনা হইতেছে দুইটি পৃথক ঘটনা। আর-রাজী' যুদ্ধের সাথে 'আদাল ও আল-কারা গোত্রদ্বয় জড়িত ছিল। আর বি'র মা'ঊনা-এর ঘটনার সহিত রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয় জড়িত ছিল (আল-আয়নী, ৯খ, ১৬৬)। সুতরাং ইহা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা; একটি ঘটনা নয়। ভিন্ন দুইটি ঘটনাকে বুখারী (র) একই অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করিবার সম্ভাব্য কারণ ইহাই যে, এই দুইটি ঘটনার চূড়ান্ত সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স) একই রাত্রে পাইয়াছিলেন (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪)।

৫. আর-রাজী'র যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ঃ ইতিহাস, মাগাযী ও সীরাত গ্রন্থে আর-রাজী'র যুদ্ধের ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত আলোচিত হইয়াছে।

যুদ্ধের কারণ ঃ হিজরী চতুর্থ বর্ষের সফর মাস। রাসূলুল্লাহ (স) ছয় (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮; ইব্ন হায্ম, পৃ. ২১৪; ইব্নুল আছীর, ২খ., পৃ. ১১৫) অথবা সাত (দা.মা.ই, ১০খ., পৃ. ২১৫) অথবা দশজন (শিবলী নু'মানী, ১খ., ২২৪-২২৫; বুখারী, ৫খ., পৃ. ১১) সাহাবীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে প্রেরণের উদ্দেশ্য দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪০) গোপনে কুরায়শদের সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে তাহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল। অন্য বর্ণনায় তাঁহাদের পাঠানোর কারণ ছিল নিম্নরূপঃ

উহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা)-এর হাতে (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮) সুফ্য়ান ইব্ন খালিদ ইব্ন নুবায়হ্ আল-হুযালী নিহত হইবার পর (দামাই, ১০খ., পৃ. ২১৫) বনূ লিহ্য়ানের লোকেরা আদাল (عضل) ও আল-কারা (القارة) গোত্রদ্বয়ের নিকট যাইয়া বলিল,

এখন তোমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হইল যে, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট যাইয়া দীন ইসলাম শিক্ষার দোহাই দিয়া তাঁহার কিছু সাহাবী (রা)-কে লইয়া আসিবে। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বে আমাদের কোন লোককে হত্যা করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হত্যা করিব। আর অবশিষ্ট লোকদিগকে মক্কায় বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৪; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৫)।

সেই মুতাবিক আল-হূন ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা বংশীয় 'আদাল (عضل) ও আল-কারা গোত্রদ্বয়ের সাতজন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫০) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল ঃ

إن فيهم إسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن.

"তাহাদের মধ্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তাহারা তাহাদিগকে দীন শিক্ষা দান করিতে ও কুরআন পড়াইতে কিছু লোক পাঠাইবার অনুরোধ করিল" (ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৪; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৪-২২৫; মুবারকপুরী, পৃ. ২৯১; দা.মা.ই., ১০খ., পৃ. ২১৫; মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩২; মাজমা আল-বুহূছ আল-ইসলামিয়্যা, ১ খ., পৃ. ৪৮৩; আল-খিদরী, পৃ. ১৫৩; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৪-২২৫; আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮০)।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) ছয় (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮; ইব্ন হায্ম, পৃ. ২১৪; মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৪) বা সাত (দা.মা.ই. ১০খ., পৃ. ২১৫) অথবা দশজন (শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৪-২২৫; বুখারী, ৫খ, ১১) সাহাবীকে তাহাদের সহিত পাঠাইলেন।

উল্লেখ্য যে, 'আদাল ও আল-কারা ছিল বানুল হূনের দুইজন ইয়াহূদীর নাম (মুহাম্মাদ আমীন, ১৩১)।

সুতরাং এই দুইটি বর্ণনায় সাহাবীদিগকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুরকানীর উদ্ধৃতি দিয়া কান্ধলাবীর সীরাত গ্রন্থের হাশিয়াতে (কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ৭৫৪) উল্লিখিত হইয়াছে যে, হইতে পারে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে কুরায়শদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছিলেন। এই মুহূর্তে উল্লিখিত এই দুই গোত্রের লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে (স) দীন ও কুরআন শিক্ষা দানের জন্য লোক চাহিল। তখন তিনি দুইটি উদ্দেশ্যকে একই সাথে সংযুক্ত করিয়া উভয় লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাহাদের সহিত সাহাবীদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।

এখানে ভিন্নমুখী দুইটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা ধারণাপ্রসূত হইলেও ইহার গ্রহণযোগ্যতা উপেক্ষা করা যায় না। তবে শায়খ নায়ফ আল-আব্বাস গোপনে কুরায়শদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে তাহাদের পাঠান হইয়াছিল বুখারীর এই বর্ণনাকেই বিশুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (আল-খিদরী, পৃ. ১৫৩)।

যাহা হউক, যে কোন উদ্দেশ্যেই সাহাবীগণ (রা) যখন আর-রাজী' নামক কূপ অথবা খেজুর বাগান অথবা স্থানের নিকট পৌঁছিলেন, হুযায়ল গোত্রের বনূ লিহ্য়ান প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য (আল-আয়নী, ৯খ., ১৬৮) তাঁহাদেরকে আক্রমণ করিল (বুখারী, ৫খ., ৪০)। সুতরাং যুদ্ধটি সংঘটিত হইবার কারণ হইল উহুদ যুদ্ধে নিহত হুযায়লীদের গোত্রপতির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

বিপক্ষে অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনা ঃ 'আদাল ও আল-কারা গোত্র দুইটি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করিয়া সাহাবীদিগকে (রা) মদীনা হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, আর বানূ লিহ্য়ান তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। আদাল, আল-কারা ও হুযায়লদের বংশীয় ধারার ছক নিম্নে উপস্থাপন করা হইল।

'আদাল, আল-কারা ও হুযায়লদের বংশ-লতিকার ছক
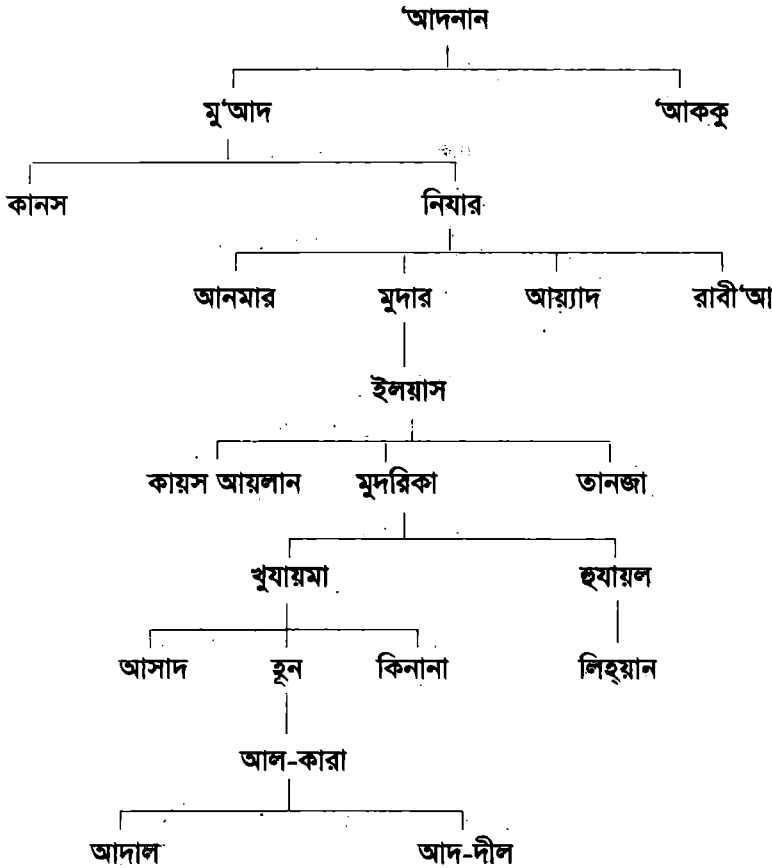
(মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ৬১-৬৩)

(লিহ্য়ানের বংশধরগণ বানূ লিহ্য়ান নামে পরিচিত। তাহারা আর-রাজী' যুদ্ধে সাহাবীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল)।

এই ছক হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আদাল ও আদ-দীল গোত্রদ্বয় আল-কারা হইতে নির্গত হইয়াছে। আল্লামা আয়নীর মতে, আদাল ও আল-কারা উভয় গোত্র হইল আদ-দীল ইব্ন মিলহান ইব্ন গালিব ইব্ন আইয়া ইব্ন ইয়াশবা' ইব্ন মালীহ ইবনুল হূন ইব্ন খুযায়মা হইতে নির্গত। তাহা হইলে ছকের শেষাংশটি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৬)

এই দুই গোত্র প্রতারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে সাহাবীদিগকে লইয়া আসিয়াছিল।

উল্লেখ্য যে, আল-কারা গোত্রের তীর চালনায় পারদর্শিতার বিষয়টি প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৩৯)।

আলোচ্য ছক হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, 'আদাল ও আল-কারা দুইটিই দীল ইব্ন মিলহান ইব্ন গালিব ইব্ন আইযা ইব্ন ইয়াশবা' ইব্ন মালিহ ইব্ন হূন ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুদার ইব্ন নিযার ইব্ন মুআদ ইব্ন আদনান হইতে নির্গত হইয়াছে। অন্যদিকে বনূ লিহ্য়ান হইতেছে হুযায়ল ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুদার ইব্ন নিযার ইব্ন মু'আদ ইব্ন 'আদনান হইতে নির্গত। তবে ঐতিহাসিক হামদানী ধারণা করিয়াছেন যে, বনূ লিহয়ান হুযায়ল হইতে নির্গত কোন গোত্র নয়, ইয়ামান হইতে আগত জুরহুম গোত্রের অবশিষ্ট অংশ, যাহারা হুযায়লদের সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহাদিগকে বনূ

লিহ্য়ান বলা হইয়া থাকে (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আল-কারা 'আদাল হইতে ভিন্ন কোন গোত্র নয়। 'আদাল গোত্রের যাহারা পাহাড়ের উঁচু কালো টিলাতে বসবাস করিত আরবীতে এই ধরনের কালো চূড়াকে আল-কারা বলিয়া কথিত হওয়ার কারণে তাহাদিগকে আল-কারা নামকরণ করা হইয়াছে (মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃ. ৩৩৪; ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৩৯)।

যাহাই হউক, আর-রাজী' যুদ্ধে সাহাবীদিগকে বনূ লিহ্য়ানই আক্রমণ করিয়াছিল এবং 'আদাল ও আল-কারা এই দুই গোত্র সাহাবীদিগকে মদীনা হইতে প্রতারণা করিয়া এই স্থানে লইয়া আসিয়াছিল।

অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণঃ এই যুদ্ধে কতজন সাহাবী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই প্রসংগে ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র)-এর আর-রাজী' অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই প্রসংগের হাদীছে সংখ্যার কথা উল্লেখ না থাকিলেও অন্যত্র (বুখারী, ৫খ., পৃ. ১১) তাঁহাদের সংখ্যা দশ উল্লেখ করা হইয়াছে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দশজন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন" (বুখারী, ৫খ., পৃ. ১১)।

তাহাদের ছয়জন ছিলেন মুহাজির ও চারজন ছিলেন আনসারী (মাজমা' আল-বুহূছ আল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৮৩)। গোলাম মোস্তফা (পৃ. ১৮৬) ও আল-উমারী (২খ., পৃ. ৩৯৮) দশজন প্রেরণের মতকে সমর্থন করিয়াছেন। The Encyclopaedia of Islam বলা হইয়াছে, ...a small body of ten of the prophet's followers was discovered and surrounded between Mecea and Usfan (C.E. Bosworth & others, vol. v, P. 40)। উর্দূ দাইরা মা'আরিফি ইসলামিয়াতে সাতজন উল্লেখ করা হইয়াছে (১০খ., পৃ. ২১৫)। ইব্‌ন হিশাম (৩খ., পৃ. ৯৬৮) ও ইব্‌ন হায্‌ম (পৃ. ২১৪) এই যুদ্ধে প্রেরিত সাহাবীদের সংখ্যা ছয়জন বলিয়াছেন। নদভী এই মতকে সমর্থন করিয়া বলেন, The Messenger of Allah sent six of his Companions including Asim ibn Thabit, Khubayb ibn Adi and Zayd ibn al-Dathinah (p. 94)। যাহারা ছয়জন প্রেরণের মতকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সেই ছয়জনের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন ঃ

১। মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ কাননায ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন য়ারবু' ইব্‌ন খারাশা ইব্‌ন সা'দ, আল-গানাবী (রা) (ইব্‌নুল আছীর, ৪খ., পৃ. ৫০০)।

২। 'আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আফিল আকলাহ (রা), তিনি ছিলেন 'আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের নানা। হযরত উমার (রা) জামিলা বিনত 'আসিম ইব্‌ন ছাবিতকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভেই 'আসিম ইব্‌ন উমার জন্মগ্রহণ করেন (ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ.

৪৪০)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, তাঁহার মাতা ছিলেন, শামূস বিন্ত আবী আমের (ই.বি. ৩খ., পৃ. ১৭২)। কাহারও মতে তিনি ছিলেন 'আসিম ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাবের মামা (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮)। তবে নানা হওয়াটাই গ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণিত হাদীছও ইহাকে সমর্থন করে (৫খ., পৃ. ১০-১১)।

৩। খালিদ ইব্ন বুকায়র ইব্ন 'আবদ ইয়ালীল ইব্ন নাশিব আল-লায়ছী (রা) আল-কিনানী (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৯১)। তিনি ৩৪ বৎসর বয়সে শহীদ হন।

৪। খুবায়ব ইব্ন 'আদী আল-আনসারী।

৫। যায়দ ইব্নুদ দাছিনা ইব্ন মু'আবিয়া আল-বায়াদী।

৬। আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক।

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব (পৃ. ৩৩৪) ও দানাপুরী (পৃ. ১১৬) ছয়জন প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ দশজন প্রেরণের তথ্যটির প্রতি জোর সমর্থন দিয়াছেন। তবে তিনি উপরোল্লিখিত ছয় ব্যক্তির সাথে শুধু সপ্তম ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮), অবশিষ্ট তিনজনের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে সপ্তম ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তিনি হইতেছেন ঃ

৭। মু'আত্তিব ইব্ন 'উবায়দ (রা) (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮) অথবা মু'আত্তিব ইব্ন আওফ (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪০)। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিকের বৈপিত্রেয় ভাই। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (পৃ. ৩৮৪), ইব্ন হাজার (৭খ., পৃ. ৪৪০) ও কান্ধলাবী (২খ., পৃ. ৭৫৫) ১০জনকে প্রেরণের প্রতি সমর্থন দিয়া উপরোল্লিখিত সাতজনের নামই উল্লেখ করিয়াছে। ইসলামী বিশ্বকোষেও এই সাতজনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৫)।

মূসা ইব্ন 'উকবা সপ্তম নম্বরে মু'আত্তিবের পরিবর্তে মুগীছ ইব্ন 'আওফ (রা)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮)। আমরা এই ব্যক্তিকে অষ্টম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিতে পারি। তাহা হইলে অষ্টম ব্যক্তি হইলেন মুগীছ ইব্ন 'আওফ (রা)।

রাহ্মাতুল-লিল আলামীন গ্রন্থে আর-রাজী'-এর শহীদদের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে সেখানে অত্র উল্লিখিত প্রথম ছয় ব্যক্তির সাথে অন্য দুইটি নাম সংযোজন করিয়া আট জনের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে (মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ২৫১)। আমরা উপরে বর্ণিত আটজন সাহাবী (রা)-এর নামের সহিত ঐ দুইটি নাম সংযুক্ত করিলে এই যুদ্ধে বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী যে দশজন সাহাবীকে পাঠান হইয়াছিল তাহাদের নামের সংখ্যা পূর্ণ হয়। উক্ত দুইজন সাহাবী হইলেন ঃ

৯। যায়দ ইব্ন মুযায়্যিন আনসারী বায়াদী (রা);

১০। মুগীছ ইব্ন 'উবায়দা ইব্ন আবী ইয়াস মালাবী (রা) (মাসসূরপুরী, ২খ, পৃ. ২৫১-২)।

এই দশজন সাহাবী (রা)-র দলপতি কে ছিলেন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহারও মতে তাঁহাদের দলপতি ছিলেন মারছাদ ইব্ন আবী মারছাদ (রা) (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৮; মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃ. ৩৩৪; দানাপুরী, পৃ. ১১৬; দা.মা.ই., ১০খ., পৃ. ২১৫)। অন্য বর্ণনায় তাঁহাদের দলপতি ছিলেন 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) (আবু দাউদ ৩খ., পৃ. ১১৬; ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৩৯; E. I.[2], vol. v, p. 40; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫; কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ৭৫৫; বুখারী, ৫খ., পৃ. ১১, পৃ. ৪০; গোলাম মোস্তফা, পৃ. ১৮৬; 'আল-উমারী, ২খ., পৃ. ৩৭৮)। ইমাম বুখারী বিশুদ্ধ বর্ণনায় যেহেতু 'আসিম (রা)-কে দলপতি করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং মূল রণাঙ্গণের যে চিত্র বিভিন্ন বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় সেখানে হযরত 'আসিম (রা)-এর অগ্রগণ্য ভূমিকাও এই কথার বাস্তব প্রমাণ যে, তিনিই ছিলেন এই যুদ্ধের দলপতি।

রণাঙ্গণ ঃ সাহাবীগণ যখন আর-রাজী' নামক স্থানে উপনীত হইলেন তখন 'আদাল ও আল-কারা গোত্রের যাহারা তাহাদের সাথী ছিল তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল। তাহারা হুযায়ল গোত্রকে তাহাদেরকে আক্রমণ করিবার জন্য চিৎকার করিয়া আহবান জানাইল। মতান্তরে তাহাদেরকে হত্যা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। ইহার পর ঐ গোত্রের সকল পুরুষ তরবারি লইয়া বাহির হইল। তাহারা ছিল সংখ্যায় দুই শত। কোন কোন বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক শত যোদ্ধা হাতে তীর-তরবারি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সাহাবীগণ (রা) সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিলেন, যোদ্ধা হিসাবে নহে। আত্মরক্ষার জন্য সামান্য কিছু সরঞ্জাম ছাড়া তাঁহাদের নিকট কিছুই ছিল না। অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া সাহাবীগণ (রা) পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (বুখারী, ২খ, মাগাযী; গাযওয়াতুর রাজী, শিবলী নোমানী, ১খ., পৃ. ২২৫)।

শত্রু পক্ষ তাঁহাদের খুঁজিতে লাগিল। এক পর্যায়ে তাহারা এক স্থানে শুধুমাত্র মদীনা মুনাওয়ারাতে উৎপাদিত খেজুরের দানা (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪০) ছড়াইয়া থাকিতে দেখিল। তাহাদের মোটেও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, শুধু মদীনাতে যে ধরনের খেজুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা সেই খেজুরেরই দানা। তখন তাহাদের ধারণা আরও পাকাপোক্ত হইল যে, আশেপাশে কোথায়ও মুহাম্মাদের সাথীরা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। অবশেষে তাহারা তাঁহাদের সন্ধান পাইল। যে পাহাড়ের চূড়াতে তাঁহারা আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থান অবরোধ করিল (মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৯)।

এই সময় শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল, "তোমরা যদি আত্মসমর্পণ কর তাহা হইলে আমরা তোমাদের কাহাকেও হত্যা না করিবার অঙ্গীকার করিতেছি (মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫; আবূ দাঊদ, ৩খ., পৃ. ১১৬)। আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তোমাদেরকে মক্কার অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি মাত্র" (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ., পৃ. ২২৫; ইব্ন হিশাম, ৩খ.,

পৃ. ৯৬৯; মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৪; আবূ যাহ্রা, ২খ., পৃ. ৮৮১)। শত্রুপক্ষের এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়া 'আসিম ইব্ন ছাবিত, মারছাদ ইব্ন আবী মারছাদ ও খালিদ ইব্ন বুকায়র (রা) বলিলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমরা কোন মুশরিকের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারি না " (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৬৯; মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫)। সাহাবীগণ আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

'আসিম (রা) তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীসহ (৭ জন) প্রাণপণে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এক সময় তীর শেষ হইয়া গেল। তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বীর বিক্রমে বর্শা দিয়া শত্রুদিগকে সজোরে আঘাত হানিত লাগিলেন। যখন বর্শা ভাঙিয়া গেল, তখন শাহাদাতের নেশায় উদ্দীপ্ত হইয়া সর্বশক্তি ব্যয় করিয়া তরবারি চালাইতে লাগিলেন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬)। প্রথমে তীর নিক্ষেপ করিয়া, পরে বর্শা ব্যবহার করিয়া, সর্বশেষে তরবারি ব্যবহার করিয়া শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করিবার এই যে অভিনব পদ্ধতি এই যুদ্ধে 'আসিম (রা) অনুসরণ করিয়াছিলেন বদরের যুদ্ধেও আসিমের এই বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধ পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ (স) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন (বিস্তাবিত বিবরণের জন্য দ্র. নিবন্ধ আসিম, ইসলামী বিশ্বকোষ)।

আল্লাহ্র শার্দূল আসিম ইব্ন ছাবিত তরবারি লইয়া বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে করিতে এক পর্যায়ে তাঁহার তরবারির হাতল ভাঙিয়া গেল। তিনি সেই ভাঙা তরবারি লইয়া লড়াই অব্যাহত রাখিলেন। দুইজন শত্রুকে শক্ত আঘাত হানিয়া আহত করিলেন, অন্য একজনকে হত্যা করিলেন। সবশেষে শত্রুরা তাহাকে তীক্ষ্ণ বর্শার নির্মম আঘাতে জর্জরিত করিল। আল্লাহ্র এই নির্ভীক সৈনিক জান্নাতের সুগন্ধ স্পর্শ করিলেন। তখন তিনি দু'আ করিলেন ঃ

اللهم أخبرنا رسول الله اللهم حميت دينك أول نهارى فاحم لحمى اخره.

"হে আল্লাহ্! আমাদের অবস্থার সংবাদ আপনার রাসূল (স)-কে পৌঁছাইয়া দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার দীনকে দিনের প্রথম অংশে রক্ষা করিয়াছি, আপনি আমার দেহকে দিনের শেষে রক্ষা করুন" (ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ১১৫; মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫; E.I.[2], vol.v, p. 40-41; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬; কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ২৪৮)। উল্লেখ্য যে, তিনি যেইদিন শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন এই দু'আয় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁহার শাহাদাতের খবর রাসূল (স)-কে তৎক্ষণাৎ পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন (ইব্ন হাজার, ৭খ., ৪৪১; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫)।

'আসিম (রা) এইভাবে শাহাদাত লাভ করিলেন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬)। তাঁহার পর মু'আত্তিব ইব্ন 'উবায়দ মরণপণ লড়িয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি শত্রুদের তরবারির আঘাতে আহত হইলেন। সুযোগ পাইয়া শত্রুরা তাঁহাকেও শহীদ করিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭)। তাঁহারা দুইজনসহ আটজন (গোলাম মোস্তফা, পৃ. ১৮৬), ৪জনকে (Nadbi, p. 94-95) অথবা ৬ জন (আল-উমারী, ২খ., পৃ. ৩৯৯; C.E. Bosworth & others, vol.v,

40), মতান্তরে সাতজনকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করিল (মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্হাব, পৃ. ৩৩৫; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫)। এই শহীদদের ৪জনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন— 'আসিম, মারছাদ, খালিদ ও মু'আত্তিব (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৫)। প্রতিশোধপরায়ণ শত্রুরা আসিম ব্যতীত অন্য শহীদদের শাহাদাত বরণের পর তাঁহাদের শরীর হইতে কাপড় খুলিয়া ফেলিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬)।

এক অলৌকিক ঘটনা ঃ উহুদের যুদ্ধে সুলাফার দুই পুত্র আসিম কর্তৃক নিহত হওয়ায় সুলাফা শপথ করিয়াছিল যে, সে আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করিবে। এইজন্য যে তাঁহার মাথা তাহাকে আনিয়া দিবে তাহাকে এক শত উট পুরস্কার দিবে বলিয়া সে ঘোষণা দেয় (বিস্তারিত দ্র. আসিম প্রবন্ধ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফা. ২খ.; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬)। 'আসিম (রা) ছিলেন আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারবের স্বগোত্রীয় চাচাত ভাই। কথিত আছে যে, এই ঘোষণার পর জনৈক ব্যক্তি আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারবকে বলিল, "তোমারই চাচাত ভাইয়ের মাথার খুলিতে অন্যে মদপান করিবে ইহা কেমন করিয়া হয়! বংশের তো একটা মর্যাদা রহিয়াছে।" এতদসত্ত্বেও কুফরীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আবূ সুফ্য়ানের মনে এই কথা কোন রেখাপাত করিল না (আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮১)। লোভনীয় এই পুরস্কারের খবর সমগ্র আরব গোত্রের মধ্যে বাতাসের বেগে ছড়াইয়া পড়িল। এই মহামূল্য পুরস্কারের লোভে অনেক কাফিরই 'আসিমকে হত্যার জন্য আসিমের মাথা অর্জনের আকাঙ্খায় প্রহর গুণিতেছিল।

সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। হুযায়লগণ শহীদ 'আসিমের মাথা সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার শবদেহের নিকট উপস্থিত হইল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১)। কুরায়শরাও তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে 'আসিমের মাথা সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইল (শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫)। মহান আল্লাহ্র কি অপূর্ব শান! তাঁহার দীনের জন্য আত্মোৎসর্গকারী 'আসিমের মাথা মুবারক অপবিত্র মুশরিকদের হাত হইতে হিফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'আসিমের দু'আ "হে আল্লাহ! দিনের প্রথম অংশে আমি আপনার দীনকে হিফাজত করিয়াছি। আপনি ইহার শেষাংশে আমার দেহকে হিফাজত করুন" কবুল করিলেন। অত্যন্ত অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ একদল ভীমরুল অথবা পুরুষ মৌমাছি পাঠাইলেন। তাহারা 'আসিমের শহীদি লাশকে ঘিরিয়া ধরিল। বিষাক্ত দংশক ভীমরুলের ভয়ে তাহারা তাঁহার মাথা সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইল।

রাত্রিতে এই পোকাগুলি অবশ্যই চলিয়া যাইবে, সুতরাং প্রত্যুষে এই মহামূল্য মাথা সংগ্রহ করিতে তাহাদের মোটেও অসুবিধা হইবে না। এই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা সকলে প্রস্থান করিল। পরের দিন প্রত্যুষে নির্বিঘ্নে 'আসিমের মাথা সংগ্রহ করিবার আকাংখায় যখন তাহারা সমবেত হইল তখন দেখিল, রাত্রিতে প্রবল বর্ষণের ফলে পানি আসিমের পবিত্র দেহকে নির্ধারিত স্থান হইতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা তাঁহার লাশ আর খুঁজিয়া পাইল না

(আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫; মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৫; C.E. Bosworth & others, vol.v, 40; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৫; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১)।

পুরুষ মৌমাছি, ডাঁশ বা ভীমরুল জাতীয় এই ধরনের প্রাণীকে আরবীতে আদ-দাবর (الدبر) বলা হইয়া থাকে। মহান আল্লাহ্ যেহেতু আসিম (রা)-কে তাঁহার এই আদ-দাবর সৈনিকদের মাধ্যমে হিফাজত করিয়াছিলেন সেইজন্য ইসলামের ইতিহাসে আসিম (রা)-কে হামিয়্যুদ দাব্র বা মৌমাছি কর্তৃক রক্ষিত বলা হইয়া থাকে (মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩৩-১৩৪; দা.মা.ই., ১০খ., পৃ. ২১৬; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৫)।

হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) যখন শুনিতে পাইলেন, মৌমাছিরা আসিম (রা)-এর মৃতদেহ পাহারা দিয়াছিল তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহার মু'মিন বান্দাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। 'আসিম (রা)-এর দু'আ ছিল, তাঁহার জীবদ্দশায় যেন কোন মুশরিক তাহাকে স্পর্শ না করিতে পারে। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরেও মুশরিকদের হইতে তাঁহার মৃতদেহকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৬-৩৫৭; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১, কান্দহলাবী, ২খ., পৃ. ৭৬১; ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ৬৭)।

যাহা হউক, জানবায এই দশজন সাহাবী (রা)-এর মধ্য হইতে সাতজন শাহাদাত লাভে ধন্য হইলেন। অবশিষ্ট রহিলেন তিনজন ঃ যায়দ ইব্নুদ দাছিনা, খুবায়ব ইব্ন 'আদী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা)

অবশিষ্ট তিন জন পাহাড়ের চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া দুর্বৃত্ত কাফিরদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক এই কাফিররা আত্মসমর্পণের পরও সামান্য দয়া তো দেখায় নাই, বরং পাষণ্ডরা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁহাদিগকে শহীদ করে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা)-এর শাহাদাত ঃ যায়দ ইব্নুদ দাছিনা ও খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা)-কে অর্থলিপ্সু কাফিররা মক্কা নগরীতে বিক্রয় করিবার পূর্বেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিককে শহীদ করিল। তবে তাঁহাকে কোথায় কিভাবে শহীদ করা হইল তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। কাফিরদের অভয়বাণী ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া যায়দ ইব্নুদ দাছিনা, খুবায়ব ইব্ন 'আদী ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) কাফিরদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কাফিররা তাঁহাদিগকে নিজেদের আওতায় পাইয়া ধনুকের রশি খুলিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁধা শুরু করিল (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪০)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) তাহাদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে বুঝিতে পারিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন, "আমাদেরকে তোমরা যে এখনই বাঁধিয়া ফেলিতেছ ইহাই হইতেছে তোমাদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।" ঘটনাটি জাহরান নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা সেখানেই আল্লাহ্র এই আপোষহীন মুজাহিদকে শহীদ করিল (ইবনুল আছীর, ২খ., ১১৫; আবূ দাঊদ, ৩খ., পৃ. ১১৬; মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্হাব, ৩৩৫)। ইব্ন হাজার পাহাড়ের চূড়া হইতে অবতরণের সাথে সাথেই আবদুল্লাহকে হত্যা করিবার বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মত দিয়াছেন

(ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪১)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, যায়দ ইব্ন দাছিনা, খুবায়ব ইব্ন 'আদী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) পাহাড়ের চূড়া হইতে নিচে অবতরণ করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। বাঁধা অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিবার জন্য মক্কায় লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে আজ-জাহরান (الظهران) (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১), মতান্তরে মাররুজ জাহরান (مر الظهران, ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৫; ইব্ন হাযম, পৃ. ২১৬) নামক স্থানে আসিলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক তাঁহার হাতের বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজের তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। তখন কাফিররা তাঁহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে শহীদ করিল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১; আবূ যাহরা, ১খ., পৃ. ৮৮২; দানাপুরী, পৃ. ১১৬; ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪১; ই.বি., ২২খ., পৃ. ২২৫)। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, কাফিররা তাঁহাদিগকে না বাঁধিয়াই মক্কাতে লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে আজ-জাহরান (الظهران) নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সতর্কতার জন্য ধনুকের রশি ছিঁড়িয়া তাহা দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) বলিলেন ঃ

هذا أول الغدر والله لا أصاحبكم إن لى فى هؤلاء لأسوة.

"ইহাই হইতেছে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের সাথে যাইব না। নিশ্চয় ঐ সমস্ত শহীদের মধ্যেই আমার অনুকরণীয় আদর্শ নিহিত রহিয়াছে" (আল-ওয়াকিদী, ১খ, ৩৫৭)।

তিনি এক পর্যায়ে তাঁহার নিজের হাত বাঁধনমুক্ত করিলেন, উন্মুক্ত করিলেন নিজের তরবারি। দুর্ধর্ষ শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিল। তাহারা পুনরায় তাঁহাকে বাঁধিবার চেষ্টা চালাইল। তিনি সুকৌশলে তাহাদের হাত হইতে ছুটিয়া গেলেন। তখন কাফিররা তাঁহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া নির্মমভাবে শহীদ করিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; ইব্ন হাযম, পৃ. ২১৬)। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তারিকের কবর উক্ত আজ-জাহরানেই অবস্থিত (দামাই, ১০খ., পৃ. ২১৬; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১)। অবশেষে কাফিররা অবশিষ্ট দুইজন যায়দ ইব্নুদ দাছিনা ও খুবায়ব ইব্ন 'আদীকে মক্কাতে লইয়া গেল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭১)।

যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-এর শাহাদাত ঃ কাফিরগণ যায়দ ইবনুদ দাছিনাকে লইয়া মক্কা নগরীতে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার নিকট ৫০টি উটের বিনিময়ে (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪১; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; শিবলী নু'মানী, ১খ., ২২৬), মতান্তরে মক্কাতে অবরুদ্ধ হুযায়লদের বন্দীর বিনিময়ে (দানাপুরী, পৃ. ১১৬) বিক্রয় করিল। খুবায়ব ও যায়দ দুইজনকে হুযায়লদের দুই বন্দীর বিনিময়ে বিক্রয়ের কথাও অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে (আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮৩)। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খালাফ তাঁহাকে তাহার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ক্রয় করিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ.

৯৭২)। উমায়্যা ইব্ন খালাফ মুসলমানদের হাতে বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। যখন যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-কে বিক্রয় করা হইয়াছিল তখন ছিল যুল-কা'দা মাস। এই মাসে হত্যাকে তাহারা বৈধ মনে করিত না। সেজন্য সাফওয়ান ইব্ন 'উমায়্যা যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-কে তাহার ক্রীতদাস নাসতাস-এর নিকট (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭) অথবা বনূ জুমাহ্-এর কিছু লোকের নিকট বন্দী করিয়া রাখিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭)।

নিষিদ্ধ মাস যুল-কা'দা অতিবাহিত হইল। মক্কার হারাম শরীফের বাহিরে লইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা নাসতাসের হাতে তাঁহাকে অর্পণ করিল। নাসতাস হারাম শরীফের বাহিরে তানঈম নামক স্থানে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া গেল। শত্রু নিধনের তামাশা উপভোগ করিবার জন্য বেশ কিছু কুরায়শ তানঈমে একত্র হইল। তাহাদের মধ্যে আবূ সুফয়ান ইব্ন হারবও ছিলেন। তিনি তখনও ছিলেন অমুসলিম। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইবার পূর্বে আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

أنشدك الله يا زيد أتحب ان محمدا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وانك فى أهلك.

"আল্লাহ্ শপথ করিয়া আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি হে যায়দ! তুমি কি পছন্দ কর যে, মুহাম্মাদ (স) তুমি যেখানে এখন রহিয়াছ তোমার স্থলে হউক এবং আমরা তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেই, আর তাহার বিনিময়ে তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়া যাও?" অন্য বর্ণনায় এই কথাটি নাসতাসের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ১১৬)। ঈমানের তেজে দীপ্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি অনাবিল ভালবাসার চূড়ান্ত নমুনাস্বরূপ যায়দ (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিলেন ঃ

والله ما أحب أن محمدا الآن مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى جالس فى أهلى.

"আল্লাহ্র শপথ! যেই স্থানে মুহাম্মাদ (স) এখন অবস্থান করিতেছেন, তিনি যদি সেখানেই অবস্থান করেন আর তাঁহাকে এমন একটি কাঁটা আঘাত হানে যাহা তাঁহাকে কষ্ট দিবে এইটুকুর বিনিময়েও আমাকে আমার পরিবারের সাথে বসিবার সুযোগ গ্রহণকে আমি পছন্দ করি না"। তাঁহার এই বলিষ্ঠ বক্তব্য শুনিয়া আবূ সুফয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন ঃ

ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.

"আমি কখনও একজন মানুষকে অন্যকে এত বেশী ভালবাসিতে দেখি নাই, মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীদিগকে যেমন মুহাম্মাদকে ভালবাসিতে দেখিয়াছি" (ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৫৮; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২)।

আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব ও যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-এর মধ্যকার বাক্যবিনিময় কি তাহাদের দুইজনের মধ্যেই হইয়াছিল, না আবূ সুফয়ান ও খুবায়ব ইব্ন আদী (রা)-এর মধ্যে

হইয়াছিল তাহাতে ইব্ন হাযম সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন (ইব্ন হাযম, পৃ. ২১৬)। সম্ভবত আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব-এর এই একই কথোপকথন খুবায়ব ইব্ন 'আদী ও যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা) উভয়ের সাথেই হইয়াছিল (ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৬৮)। অবশেষে নাসতাস অত্যন্ত নির্মমভাবে আল্লাহ্র এই শার্দূল মুজাহিদকে শহীদ করিল (দানাপুরী, পৃ. ১১৭; ইবন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৬; কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ৭৫২; মাজমা আল-বুহূছ আল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ৮৩)। উল্লেখ্য যে, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার এই ক্রীতদাস নাসতাস পরে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা)-এর শাহাদাত ঃ যায়দ ইবনুদ দাছিনা (রা)-এর সহিত জাহজাবী ইব্ন যুলফা ইব্ন 'আমর ইবন আওফ গোত্রের (আল-আয়নী, ৯খ, ১০০) খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা)-কেও হুযালীগণ মক্কাতে লইয়া আসিল। তাঁহাকে হুদায়র ইব্ন আবী ইহাব আত-তামীমীর ভ্রাতুষ্পুত্র (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭) 'উকবা ইবনুল হারিছ ইব্ন 'আমের ইব্ন নাওফালের নিকট একটি কালো ক্রীতদাসী (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৩৮১, বৈরূত তা. বি.; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮) অথবা আশি মিছকাল স্বর্ণ বা পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে বিক্রয় করা হইল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭, আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১০০)। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে হুযালীগণ মক্কায় তাহাদের গোত্রের একজন বন্দীর বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল (দানাপুরী, পৃ. ১১৬)। আরও কথিত আছে যে, তাঁহাকে আল-হারিছ ইব্ন নাওফলের এক কন্যার নিকট এক শত উটের বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭)। এখানে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে কিসের বিনিময়ে তাঁহাকে বিক্রি করা হইয়াছিল ও কে ক্রেতা ছিল তাহা লইয়া মতপার্থক্য সৃষ্টি হইলেও তাঁহাকে যে বিক্রয় করা হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই।

খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) বদরের যুদ্ধে 'উকবা-এর পিতা হারিছ ইব্ন 'আমের ইব্ন নাওফালকে হত্যা করিয়াছিলেন (দানাপুরী, পৃ. ১৭৭; মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫; E.I.^{2}, vol. v, p. 40)। খুবায়বকে হত্যা করিয়া হারিছের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্যই তাহারা তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; শিবলী নু'মানী, ১খ., পৃ. ২২৫)। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, যাহাদের পিতারা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হইয়াছিল তাহারা সকলে মিলিয়া সম্মিলিতভাবে তাহাদের পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় খুবায়বকে ক্রয় করিয়াছিল। তাহারা হইল আবূ ইহাব ইব্ন 'আযীয, 'ইকরামা ইব্ন আবী জাহল, আল-আখনাস ইব্ন শারীক, 'উবায়দা ইব্ন হাকীম ইবনিল আওকাস, উমায়্যা ইব্ন আবী 'উতবা, ইবনুল হাদরামী, শু'বা ইব্ন আবদিল্লাহ ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (আল-আয়নী,৯খ., পৃ. ১০০; ইব্নুল আছীর, উসদুল গাবা, ২খ., ১০৪)। হযরত খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) উল্লিখিত সকল কুরায়শ-এর পিতাদিগকে হত্যা করেন নাই। তিনি শুধু 'উকবা ইব্ন হারিছের পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহাদের পিতাগণ মুসলমানদের

হাতেই নিহত হইয়াছিল সেহেতু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহারা খুবায়বকে হত্যা করিবার আকাঙ্ক্ষায় ক্রয় করিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিক খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক দিময়াতী বলিয়াছেন , খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন আওস গোত্রের লোক। যে খুবায়ব হারিস ইব্ন 'আমেরকে হত্যা করিয়াছিলেন তিনি হইলেন খুবায়ব ইব্ন ইসাফ। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৩৮২; মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩৪; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮)। দিময়াত-এর এই ধারণা ঠিক নহে। বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত যে, খুবায়ব ইব্ন 'আদী বদরের যুদ্ধেই হারিছ ইব্ন আমের ইব্ন নাওফালকে হত্যা করিয়াছিলেন (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪১)। বিশুদ্ধ এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, খুবায়ব ইব্ন 'আদী বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

অন্য একটি যৌক্তিক কারণেও এই বাস্তব সত্য প্রমাণিত হয়। অসংখ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধে হত্যাকারী হিসাবেই প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে খুবায়ব ইব্ন 'আদীকে মক্কাতে হত্যা করা হইয়াছিল। দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হন্তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিশোধ-মূলকভাবে কাহারও হত্যা আরবদের সেই সমাজে প্রচলিত ছিল না। যেহেতু কুরায়শরা তাঁহাকে হত্যাকারী হিসাবে প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া হত্যা করিয়াছিল, সেহেতু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুবায়ব ইব্ন 'আদী বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাদের কাহাকেও না কাহাকে হত্যাও করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সমস্ত বর্ণনা ও দিময়াতীর মতামতের এই পার্থক্যকে দূর করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, "এমনও হইতে পারে যে, খুবায়ব ইব্ন 'আদী ও খুবায়ব ইব্ন ইসাফ উভয়েই হারিছ ইব্ন আমেরকে হত্যা করিয়াছিলেন (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৩৮২)। বাহ্যত এই কথাটি দুইটি সাংঘর্ষিক মতকে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে হইলেও ইহার কোন প্রমাণ কোন গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় না পাওয়া যাওয়ার কারণে তাহা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না।

যুল-কা'দা মাস নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এই সময় খুবায়ব ইব্ন 'আদীকে হত্যা না করিয়া তাহারা তাঁহাকে হারিছ ইব্ন আমেরের বাড়িতে বন্দী করিয়া রাখিল (মানসূরপুরী, ১খ., পৃ. ১২২)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, তাঁহাকে বানূ আবদে মানাফের হুদাইর ইব্ন আবী ইহাবের ক্রীতদাসী (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২) মাবীয়া (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২; মুহাম্মাদ আমীন, পৃ. ১৩৩), মতান্তরে হুজায়ন ইব্ন আবী ইহাবের ক্রীতদাসী মারিয়া (ইব্ন হাজার, ৭খ., আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮), ইব্ন বাত্তালের বর্ণনানুযায়ী হুজায়ন ইব্ন আবী ইহাবের ক্রীতদাসী জুওয়ায়রিয়া (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪২; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮)-এর গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। মারিয়া পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২)।

মারিয়া বলিয়াছেন, খুবায়ব ইব্ন 'আদী সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া সালাতুত তাহাজজুদ আদায় করিতেন। আশেপাশের মহিলারা তাঁহার আকর্ষণীয় এই তিলাওয়াত বিমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। ধীরে ধীরে তাহারা খুবায়বের প্রতি কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহারা তাঁহার প্রতি নমনীয় ব্যবহার শুরু করিল। আমি ছিলাম তাহাদের অন্যতম। আমি দয়ার্দ্র হইয়া খুবায়বকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে খুবায়ব! আপনি কি কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন? প্রয়োজনে আমি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি সুমিষ্ট পানির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। আশা করি তুমি তাহা আমাকে সরবরাহ করিবে। আমি আরো আশা করি যে, শুধু আল্লাহ্র নামে যবেহকৃত পশু ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমাকে কখনও খাওয়াইবে না। আর তাহারা আমাকে যখন হত্যা করিবার সময় নির্ধারণ করিবে, তুমি আমাকে তাহা আগাম জানাইয়া দিবে (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৩৮২; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭-৩৫৮)। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, খুবায়ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তিনি উপযাচক হইয়া হারিছ ইব্ন আমেরের ক্রীতদাস মাওহাব-এর নিকট হইতে এই তিনটি জিনিস চাহিয়াছিলেন (মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৮৫)।

কুরায়শগণ বন্দী অবস্থায় খুবায়ব ইব্ন 'আদীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিত। অতিষ্ঠ হইয়া এক সময় খুবায়ব (রা) বলিলেন, "হায়! সম্মানিত লোক বলিয়া যাহারা নিজেদেরকে দাবি করে তাহারা কি তাহাদের বন্দীর সহিত ভাল আচরণ করিতে পারে না"? খুবায়ব (রা)-এর এই নীতিবাক্য তাহাদের বিবেককে কশাঘাত করিল। বাধ্য হইয়া তাহারা খুবায়ব (রা)-এর প্রতি ভাল ব্যবহার শুরু করিল এবং তাঁহার দেখাশুনা করিবার জন্য একজন নারীকে পরিচারিকা হিসাবে নিয়োগ করিল (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৩৮২)। সম্ভবত সেই মহিলাটি হইল উপরোল্লিখিত মারিয়া।

খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) লৌহ বেষ্টিত ঘরে বন্দি জীবন যাপন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। যয়নব বিনত হারিছ ইব্ন 'আমের ইব্ন নাওফাল (কান্ধলাবী, ২খ., পৃ. ৭৫৬; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮), মতান্তরে হুজায়ন ইব্ন আবী ইহাবের ক্রীতদাসী মাবিয়া অথবা মারিয়া হঠাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিল, তিনি মানুষের মাথার মত বড় আঙুরের থোকা হইতে সুন্দর সুন্দর আঙুর ভক্ষণ করিতেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় মক্কাতে এ ধরনের কোন ফল পাওয়া যাইত না। এমনকি ভূ-পৃষ্ঠে উৎপাদিত কোন আঙুর হইতে এই আঙুর ছিল একেবারেই ভিন্ন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭; দানাপুরী, পৃ. ১১৭; মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫)। নিঃসন্দেহে ইহা একটি অলৌকিক ঘটনা। এই আঙুর আসলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। যাহারা আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত, আল্লাহ্র দীনের জন্যই যাহারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে এই ধরনের সম্মানিত রিযিক সরবরাহ করা অস্বাভাবিক কিছু নহে।

ইব্‌ন বাত্তালের মতে খুবায়ব (রা)-কে আল্লাহ্ পক্ষ হইতে রিযিক সরবরাহ আল্লাহ্‌র কুদরতের ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবুওয়াতের আকাট্যতা প্রমাণের জন্য একটি জ্বলন্ত নিদর্শন ছিল। তবে সচরাচর সংঘটিত হয় না নিয়ম বহির্ভূত এমন যে কোন অলৌকিক ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়, যাহা এমন আশ্চর্য যে, মানুষের চক্ষুকে স্থির করিয়া ফেলে, এ ধরনের কোন ঘটনা নবীরা ব্যতীত অন্যদের নিকট হইতে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইব্‌ন হাজারের দৃষ্টিতে ইব্‌ন বাত্তালের এই মতামত দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বয় করিয়াছে। তিনি যেমন কারামাতকে অস্বীকার করেন নাই, আবার আহলুস-সুন্নাহ আল-জামা'আতের যে কোন কারামাত সংঘটিত হওয়া সম্ভব, মতামতকেও গ্রহণ করেন নাই (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৩)। একজন মহিলা এই আঙ্গুর তাঁহাকে খাইতে দেখিয়াছিল, বুখারী শরীফে উক্ত মহিলার নাম উল্লেখ করা হয় নাই (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪০)। ইবনুল আছীরও তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই, শুধু একজন মহিলার কথা বলা হইয়াছে (২খ., পৃ. ১১৫-১১৬)। অপরদিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন মহিলার নাম, কোথাও যয়নব বিনত হারিছ, কোথাও ক্রীতদাসী মাবিয়া, মতান্তরে মারিয়া-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে (কানধাহলাবী, ২খ., পৃ. ২৫৮; আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৭)। ইব্‌ন হাজার ভিন্নমুখী এই দুই বর্ণনাকে এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন যে, হইতে পারে যয়নব বিনত হারিছ ও ক্রীতদাসী মারিয়া উভয়েই খুবায়বের হাতে আঙ্গুর দেখিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে, খুবায়বকে উক্ত ক্রীতদাসীর ঘরে বন্দী করা হইয়াছিল আর যয়নব বিনত হারিছকে তাঁহাকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল (ইব্‌ন হাজার, ঐ, ৭খ., পৃ. ৪৪২)।

আশহুরুল হুরুম (যে সকল মাসে যুদ্ধ ও হত্যা নিষিদ্ধ) অতিবাহিত হইলে (ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪২) খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা) ক্রীতদাসীর মাধ্যমে জানিতে পারিলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা তাহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৮)। তখন তিনি যয়নব বিনত হারিছ (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৩)-এর নিকট ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া পবিত্র হইবার জন্য একটি ক্ষুর চাহিলেন। তাঁহাকে ক্ষুর সরবরাহ করা হইল। মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবুল হুসায়নের দাদা আবুল হুসায়ন ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল তখনও ছিলেন শিশু (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১৬৮)। তাহার মাতা দেখিল, খুবায়ব (রা) -এর হাতে ক্ষুর শোভা পাইতেছে আর তাহার এই শিশু ছেলেটি খুবায়ব (রা)-এর একটি রানের উপর বসিয়া রহিয়াছে। মায়ের অমনোযোগিতার সুযোগেই শিশুটি নিজেই খুবায়ব (রা)-এর নিকট গিয়াছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর হাতে ধারাল ক্ষুর। এমনি অবস্থায় শত্রু পক্ষের কোন শিশু তাঁহার হাতে মোটেও নিরাপদ হওয়ার কথা নয়। যে কোন মুহূর্তে তাহাকে হত্যা করিয়া বন্দী প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। শিশুটির মাতা নিজের কলিজার ধন শিশুকে এমন একটি বিপদের মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া সাপ দেখিবার মত চমকাইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন সাহাবী খুবায়ব (রা) মহিলাটির এই সন্ত্রস্ত অবস্থা উপলব্ধি করিলেন। তিনি ছেলেটিকে এই বলিয়া দৌড় দিতে বলিলেন, তোমরা আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত লইয়াছ। এই অবস্থায় তোমার মাতা আমার হাতে

ক্ষুর থাকার পরেও তোমাকে আমার কাছে কি করিয়া পাঠাইল! তোমার মাতা কি আমার পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় পায় নাই? তাঁহার এই কথা শুনিয়া ছেলেটির মাতা বলিল, আমার ছেলেকে তো হত্যা করিবার জন্য আপনাকে ক্ষুর সরবরাহ করা হয় নাই। খুবায়ব (রা) বলিলেন ঃ

أتخشين أن أقتله ماكنت لأفعل ذلك وما تستحل فى ديننا الغدر.

"তুমি কি ভয় করিতেছ যে, আমি তাহাকে হত্যা করিব? আমি কখনও তাহা করিব না (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪১)। আমাদের দীন ইসলাম এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ মনে করে না" (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৮; আল-'উমারী, ২খ., পৃ. ৩৯৯)।

অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ছেলেটি খুবায়ব (রা)-এর নিকট যখন গিয়াছিল তখন তাঁহার হাতে ক্ষুর ছিল বলিয়া ছেলেটির মাতা চমকিয়া উঠে নাই, বরং ছেলেটি নিজেই একটি ধারালো ছুরি লইয়া খেলিতে খেলিতে মায়ের অমনোযোগিতার সুযোগে খুবায়ব (রা)-এর নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছিল। বন্দী অবস্থায় বন্দীর পাশে ছুরি হাতে নিজের শিশু ছেলেকে দেখিয়া তাহার মাতা সন্তানের আশু বিপদ উপলব্ধি করিয়া আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল (মানসূরপুরী, ১খ., পৃ. ১২৩)। তখন খুবায়ব (রা) উপরোল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

খুবায়ব (রা) ক্ষুর পাইয়া ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া পবিত্রতা অর্জন করিলেন। কুরায়শরা তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য হারামের বাহিরে তানঈম নামক স্থানে লইয়া আসিল (ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৫; মুবারকপুরী, পৃ. ২৯২; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২)। লোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখিবার জন্য মক্কা নগরী হইতে অনেকে তানঈমে উপস্থিত হইল (আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৫৮)। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাহারা ছিল তাহারা হইল, ইহাব ইব্ন 'আযীয, আল-আখনাস ইব্ন শারীক, 'উবায়দা ইব্ন হাকীম আস-সুলামী, উমায়্যা ইব্ন 'উতবা (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪৩), ইবনুল হাদরামী, সা'ঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৮০), আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব ও তাহার পুত্র মু'আবিয়া (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭২)।

কুরায়শরা খুবায়ব (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে কিনা জানিতে চাহিল (মানসূরপুরী, ১খ., পৃ. ১২৩)। দুই রাক'আত সালাত আদায় করিবার জন্য তখন তিনি অনুমতি চাহিলেন। তাহারা তাঁহাকে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিবার অনুমতি দান করিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৩; E.I.^{2}, vol. v, p.40; ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৫; আবূ দাঊদ, ৩খ., পৃ. ১১৬)। তানঈমে যে প্রসিদ্ধ মসজিদ পরে নির্মিত হইয়াছে তিনি ঐ স্থানটিতেই উক্ত সালাত আদায় করিয়াছিলেন (ইব্ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪৩)। প্রশান্তচিত্ত ও উদ্বেগহীন মন লইয়া সালাত শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সালাত দীর্ঘায়িত করিয়াছি বলিয়া তোমরা ধারণা করিতে পার; যদি আমার এই ভয় না হইত তাহা হইলে আমি সালাত আরও

দীর্ঘায়িত করিতাম (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪১; মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৫; শিবলী নু'মানী, ৫খ., পৃ. ৪১; ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৫; মানসূরপুরী, ১খ., পৃ. ১২৩; আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮৩; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৩)। খুবায়ব (রা) মুসলমানদের কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে চাহিলে মৃত্যুর পূর্বে দুই রাক্'আত সালাত আদায়ের সুন্নত প্রবর্তন করিলেন (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪০)। সুহায়লী বলিয়াছেন, হুজর ইব্ন 'আদী ইবনুল আদবার (রা)-ও খুবায়ব (রা)-এর মত মৃত্যুর পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়াছিলেন।

যখন খুবায়ব (রা)-কে শূলে চড়াইবার জন্য শক্ত করিয়া বাঁধা হইল তখন তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার রাসূল (স)-এর রিসালাতকে যথাযথভাবে পৌঁছাইয়াছি। তাহারা আমার সহিত যে অমানবিক আচরণ করিতেছে তাহার সংবাদ আপনি আপনার রাসূল (স)-কে পৌঁছাইয়া দিন" (ইব্ন হিশাম, ৩খ, পৃ. ৯৭৩)। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন বসা অবস্থায়ই ছিলেন। তাঁহার নিকট খুবায়ব (রা)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পৌঁছানো হইল। তিনি বলিলেন, "হে খুবায়ব! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক" (ইব্ন হাজার, ৭খ, পৃ. ৪৪৩)।

যখন তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিবার জন্য উচু কাঠে উঠানো হইল, তিনি দু'আ করিলেন ঃ

اللهم احصهم عددا وأقتلهم بردا ولا تغادر فيهم أحدا.

"হে আল্লাহ! আপনি তাহাদের সংখ্যা গণনা করুন এবং তাহাদিগকে পৃথক পৃথকভাবে হত্যা করুন। তাহাদের কাহাকেও আপনি ছাড়িবেন না" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৩; ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ১১৬; ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৫; মুবারকপুরী, পৃ. ২৯২; আবূ যুহরা, ২খ., পৃ. ৮৮৩)।

এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মুশরিক লোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ডের সকল আয়োজন স্বচক্ষে দেখিয়াও খুবায়ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও না যে, তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দেই, আর মুহাম্মাদ তোমার এই করুণ পরিণতির স্থানে উপনীত হউক"? খুবায়ব (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই জানেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ করিয়া তাহার বিনিময়ে আমি খুবায়ব প্রাণে বাঁচিয়া যাইব; আমি তাহা কখনও চাহি না" (মানসূরপুরী, ১খ., পৃ. ১২৩; মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৩৬)। তিনি কবিতা পাঠ করিলেন যার প্রতিটি ছন্দে ঈমানী জযবার বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে ঃ

لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع

وكلهم مبدي العداوة جاهد على لأنى فى وثاق بمصيع

وقد جمعوا أبناء هم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع

إلى الله أشكو غربتى ثم كربتى وما أرصد الاحزاب لى عند مصرعى

فذا العرش صبرنى على ما يراد بى فقد بضعوا لحمى وقد ياس مطمعى

وذلــك فــى ذات الإلــه وإن يـشـأ   يــبارك عــلى أوصــال شلو ممزع

وقـد خـيـرونـى الكـفر والمـوت دونه   وقــد هـمـلت عيناى من غير مجزع

ومـا بـى حـذار المـوت إنـى لميـت   ولـكن حـذارى جـحـم نـار ملفع

فـو الـلـه مـا أرجـو إذا مـت مسـلما   عــلى أى جنب كان فى الله مصرعى

فـلـست بمبد لـلـعـدو تـخـشـعـا   ولا جـزعـا إنـى إلـى الله مرجعى.

* আমার চতুর্দিকে অনেক দল একত্র হইয়াছে, তাহারা তাহাদের গোত্রগুলিকে প্রতিটি লোকালয় হইতে সমবেত করিয়াছে।

* তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শনকারী, সর্বশক্তি দিয়া আমাকে কষ্ট দানকারী। কেননা আমি তো বন্দীদশায় এমন ধ্বংসোম্মুখ একটি অস্ত্রে আবদ্ধ আছি যাহা আমার চামড়া ছিন্ন করে।

* তাহাদের সন্তান ও স্ত্রীদিগকে তাহারা একত্র করিয়াছে, নিষিদ্ধ লম্বা কাঠের (শূলের) নিকট আমাকে উপস্থিত করা হইয়াছে।

* আমি আমার দেশ হইতে দূরে, বিপদগ্রস্ত ও বধ্যভূমিতে আমার জন্য দলগুলি যাহা তৈরি করিয়াছে তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিতেছি।

* হে আরশের অধিপতি! তাহারা আমাকে লইয়া যাহা করিতে চায় সে বিষয়ে আপনি আমাকে ধৈর্য দিন। তাহারা আমরা মাংস টুকরা টুকরা করিয়াছে, আমার আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে।

* ইনি আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে, তিনি চাহিলে হাড়ের প্রতিটি গিরায় ও মাংসের প্রতিটি অংশকে বরকতময় করিবেন।

* তাহারা আমাকে কুফরী এখতিয়ার করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকে উহার তুলনায় আমি সহজ মনে করিলাম। আমার দুইটি চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল, কোন প্রকার অস্থিরতা ছাড়া।

* আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলাম না; কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবে জাহান্নামের দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জলিত আগুনকেই আমি ভয় করি।

* আল্লাহ্র শপথ! আমি মুসলিম অবস্থায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই যদি মারা যাই তাহা হইলে আমি বধ্যভূমিতে কোনপাশে পড়িয়া মারা গেলাম সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নাই।

* আমি শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিব না, অস্থিরতাও প্রকাশ করিব না। কেননা আমার প্রত্যাবর্তন হইতেছে আল্লাহ্র নিকটে (ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ৬৯; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৯৭৬-৯৭৭; ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৫)।

ইহার পর 'উকবা ইব্‌ন হারিছ তাঁহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিল (বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪১; ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪৫)। অন্য বর্ণনায় আছে, 'উকবা ইব্‌ন হারিছ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি খুবায়বকে হত্যা করি নাই। তবে বানূ আবদিদ দারের আবূ মায়সারা আল-আবদারী (ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪৫) একটি বর্শা আমার হাতে উঠাইয়া দেয়। আমি বর্শা ধরিয়া রাখিলাম, আর সে আমার হাতে ধরিয়া থাকা বর্শা দ্বারাই খুবায়ব ইব্‌ন আদীকে আঘাত করিয়া হত্যা করিল (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১০১; ইব্‌ন হাজার, ৭খ., পৃ. ৪৪৫; ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৪)।

৪০ দিন পর্যন্ত খুবায়ব (রা)-এর লাশ শূলে ঝুলান ছিল (মানসূরপুরী, ২খ., পৃ. ৩০২)। রাসূলুল্লাহ (স) এই মর্মান্তিক খবর পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন । তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেনঃ

أيكم ينزل خبيبا من خشبته وله الجنة.

"তোমাদের মধ্যে যেই খুবায়বকে শূল হইতে নামাইবে সেই জান্নাত লাভ করিবে" (আল-আয়নী, ৯খ., পৃ. ১০১)।

যুবায়র (রা) ও মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই গুরুদায়িত্ব পালন করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের দুইজনকে শূল হইতে খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহ নামাইবার জন্য মক্কাতে পাঠাইলেন। তাঁহারা যখন তাঁহার মৃতদেহের অবস্থানস্থল মক্কার তানঈমে পৌঁছিলেন তখন চল্লিশজন লোককে এই মৃতদেহ পাহারা দিতে দেখিলেন। তাঁহারা সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ঘুমাইয়া গেল। আল্লাহ্‌র পথে শহীদ খুবায়ব (রা)-এর এই মৃতদেহ প্রায় চল্লিশ দিন পরেও ছিল অবিকৃত তো বটেই, এমনকি একেবারে তরতাজা। আল-কুরআনের ভাষায়, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদিগকে তোমরা মৃত বলিও না" (২ ঃ ১৫৪)-এর জাজ্জ্বল্য প্রমাণ ছিল খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহ। সুযোগ বুঝিয়া যুবায়র (রা) ও মিক্‌দাদ (রা) খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহকে শূল হইতে নামাইয়া ঘোড়ার পিঠে লইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। কাফিররা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহ না দেখিয়া তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল ও খোঁজাখুঁজি শুরু করিল। এক পর্যায়ে তাহারা যুবায়র (রা) ও মিকদাদ (রা)-কে দূর হইতে এই মৃতদেহ লইয়া যাইতে দেখিল। তাহারা তাঁহাদের নিকট হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া লইবার জন্য তাঁহাদের পশ্চাত অনুসরণ করিল। যুবায়র (রা) আশু বিপদ উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত মৃতদেহটি ঘোড়ার পিঠ হইতে মাটিতে নামাইলেন। আল্লাহ্‌র সৈনিক খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহকে আল্লাহ্ অপবিত্র কাফিরদের হাত হইতে হিফাজত করিলেন। আকস্মিকভাবে সেই স্থানের মাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া খুবায়ব (রা)-এর মৃতদেহকে মাটি নিজের বুকের মধ্যে এমনভাবে ধারণ করিল যে, এখানে যে এই মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হইল তাহা বুঝিবার কোন উপায় অবশিষ্ট রহিল না। খুবায়ব (রা)-কে সেইজন্য বালী'উল আরদ অর্থাৎ মাটি যাঁহাকে

ভক্ষণ করিয়াছে উপাধিতে ভূষিত করা হয় (আল-'আয়নী, ৯খ., পৃ. ১০১; কান্দেহলাবী, ২খ., পৃ. ৭৬১)। যুগ যুগ ধরিয়া খুবায়ব (রা)-এর এই কবর অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) খুবায়ব (র)-কে শূল হইতে নামাইয়া গভীর রাত্রিতে অত্যন্ত সংগোপনে দাফনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (ইব্ন কায়্যিম, ৩খ., পৃ. ২৪৬; মুবারকপুরী, পৃ. ২৯২; দানাপুরী, পৃ. ১১৮)।

খুবায়ব ও যায়দ (রা)-কে একই দিন হত্যা করা হইয়াছিল (আবূ যাহরা, ২খ., পৃ. ৮৮৪)। খুবায়ব ও যায়দ (রা) হইলেন আর-রাজী' যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ। এইভাবে তাঁহারা সকলেই শাহাদাত বরণ করিলেন।

তদানীন্তন মুসলিম সমাজে এই যুদ্ধের প্রভাব

এই যুদ্ধের সকল মুজাহিদের শাহাদাত লাভ মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। 'জান দেওয়া যায় তবুও বাতিলের সাথে আপোষ করা যায় না', এই শাশ্বত সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষী হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানদের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিয়াছেন এই যুদ্ধের অমর শহীদগণ। শত্রুপক্ষ এই যুদ্ধের মুজাহিদগণের সাথে অমানবিক ও বর্বরোচিত আচরণ করিয়া তাহাদিগকে শহীদ করিয়াছিল। এই ঘটনার খবর তদানীন্তন মদীনা মুনাওয়ারায় মুসলিম সমাজে পৌঁছিলে সারামদীনায় শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। সমগ্র পরিবেশ দীর্ঘ দিন যাবত ছিল শোকার্ত ও বেদনা বিধুর। প্রায় একই সময়ে সংঘটিত বি'র মা'উনা (بئر معونة) -এর ঘটনাও ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। সেই ঘটনায়ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হইয়া শহীদ হইয়াছিলেন প্রায় সত্তরজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ (রা) এই দুইটি ঘটনায় এত বেশী শোকার্ত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘ প্রায় একটি মাস ধরিয়া তাঁহারা এই উভয় ঘটনার সাথে জড়িত বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রত্যহ বদদু'আ করিতেন (দা. মা. ই., ১০খ., পৃ. ২১৬)। তিনি আর-রাজী' ও বি'র মা'উনার শহীদদের জন্যও দু'আ করিতেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ., পৃ. ২২৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) আর-রাজী'-এর ঘটনায় খুবই মর্মাহত হন। ইব্ন ইসহাক বলিয়াছেন, হাসসান (রা) শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি শোকগাথা (الرثاء) রচনা করেন ঃ

صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا

رأس السرية مرثد وأميرهم وابن البكير إمامهم وخبيب

وابن الطارق وابن دثنة منهم وافاه ثم حمامه المكتوب

والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالى إنه لكسوب

منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب.

* "আর-রাজী'-এর দিন যাহারা পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা সম্মানিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সওয়াব দান করা হইয়াছে।

* মারছাদ ছিলেন তাহাদের দলপতি, সম্মুখে ছিলেন ইব্ন বুকায়র আরো ছিলেন খুবায়ব, ইব্ন তারিক, ইব্ন দাছিনা, তাহাদের উপর নির্ধারিত মৃত্যুই আসিয়া পড়িল।

* তাহাদের সহিত আরো ছিলেন 'আসিম যিনি রাজী'-তে শহীদ হইলেন, যিনি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিলেন এবং তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদার আগ্রহী।

* শত্রুরা তাহার নাগাল পাইবে তিনি সেরূপ আত্মসমর্পণকে গ্রহণ না করিয়াই তরবারি পরিচালনা করিলেন। আর তিনি হইলেন মহৎ ও সম্ভ্রান্ত" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৮৫-৯৮৬)।

উল্লেখ্য যে, ইব্ন হিশাম বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ মনীষী এই শোকগাথাটি হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) রচিত বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৮৬)। এই কবিতাংশে মারছাদকে দলপতি বলা হইলেও আসলে দলপতি ছিলেন 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা),যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) যেমন আর-রাজী'-এর যুদ্ধে শহীদদের শোকে শোকার্ত হইয়া শোকগাথা রচনা করিয়াছেন, তেমনি যাহারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় লইয়া আল্লাহ্র এই সকল নিবেদিতপ্রাণ সৈনিককে শহীদ করিয়াছিল তাহাদের জন্যও বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ কবিতাও (الهجاء) রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কিছু চরণ এখানে উল্লেখ করা হইলঃ

لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم

أحاديث لحيان صلوا بقبيحها ولحيان جرامون شر الجرائم

أناس هم من قومهم في صميمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم

هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم

رسول رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم

فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الجرائم

أبابيل دبر شمس دون لحمه حمت لحم شهاد عظام الملاحم

لعل هذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لماتم.

* আমার জীবনের শপথ! হুযায়ল ইব্ন মুদরিককে কলংকিত করিয়াছে সেইসব আচরণ যাহা তাহারা খুবায়ব ও আসিমের সঙ্গে করিয়াছে ।

* লিহ্য়ানদের আচরণের পরিণতি তাহারা ভোগ করিয়াছে। আর লিহ্য়ানরা তো জঘন্য অপরাধে অপরাধী।

* লিহ্য়ানরা যদিও মূল হুযায়লদের অংশ তাহার পরও তাহারা অন্যদের তুলনায় পশুর সম্মুখ পায়ের পশমের মতই নিকৃষ্ট।

* তাহারা আর-রাজী'র দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। পবিত্র ও উচ্চ বংশীয়দের সহিত প্রতারণা করিয়া তাহারা নিজেদের বিশ্বস্ততাকে জলাঞ্জলি দিয়াছে।

* তাহারা আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর দূতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আর হুযায়লরা তো নিষিদ্ধ হারাম থেকে কখনও বাঁচিয়া থাকে নাই।

* শীঘ্রই তাহারা একদিন দেখিবে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করা হইতেছে এমন মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে যাহার লাশকে অপরাধীদের হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

* তাহার মাংসে ভোমরার দল পাহারা দিয়াছে যিনি বড় বড় রণাঙ্গনে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

* হুযায়লগণ অন্যদেরকে আহত করিয়াছে, সম্ভবত তাহারা তাহার পরিবর্তে নিজেদেরকে নিহতের বধ্যভূমি অথবা শোক প্রকাশের স্থলে দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ তাহাদের অনেকেই অল্প দিনের ভিতরেই নিহত হইবে" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., ৯৮২-৯৮৩)।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ

আর-রাজী'-এর হৃদয়বিদারক ঘটনাকে লইয়া মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকার আজেবাজে কথাবার্তা বলিতে লাগিল। একদিকে তাহাদের এই অবাঞ্ছিত কথাবার্তার কঠোর প্রতিবাদ, অপরদিকে এই ঘটনায় যাহারা শাহাদাত বরণ করিয়াছেন তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কুরআনের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মক্কা ও মদীনার মাঝে আর-রাজী' নামক স্থানে যখন খুবায়ব (রা)-এর সাথীগণ (তাবারী, ২খ., পৃ. ৩২৫), যাহাদের মধ্যে মারছাদ, 'আসিম ইব্ন ছাবিত ও ইব্নুদ দাছিনা ছিলেন (আবূ হায়্যান, ২খ., ১২২), তাঁহারা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে মুনাফিকরা বলিতে লাগিল ঃ

يا ويح هولاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لاهم قعدوا فى بيوتهم ولاهم أدوا رسالة صاحبهم.

"ঐ সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর ধ্বংস অনিবার্য যাহারা এইভাবে ধ্বংস হইয়া গেল। না তাহারা নিজেদের ঘরে বসিয়া রহিল, না তাহারা তাহাদের সাথীর (রাসূলুল্লাহ) দেওয়া দায়িত্ব পালন করিল।"

তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাহাদের প্রচারণার প্রতি-উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করিলেন (তাবারী, ২খ., ৩২৫; ইব্ন কাছীর, ৪খ., ৬৯; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৯৭৮; আবূ হায়্যান, ২খ., ১২২) ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

"মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা সম্পর্কে আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে ফিরিয়া যায় তখন সে পৃথিবীতে কি করিয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে, কি করিয়া শস্য ক্ষেত ও বংশ ধ্বংস করিবে সেই চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অথচ আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। এই ব্যক্তিকে যখন বলা হয়, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপের মধ্যে লিপ্ত রাখে। সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। নিশ্চয় তাহা অত্যন্ত খারাপ স্থান। মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যে কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল" (২ ঃ ২০৪-২০৭)।

মূলত এখানে শেষ আয়াতটিতে ইব্ন 'আব্বাস-এর বর্ণনা অনুযায়ী আর-রাজী'-এর শহীদদের আত্মত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে (তাবারী, ২খ., পৃ. ৩২৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম ; (২) আবূ হায়্যান আল-আনদালুসী, তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ., ২খ., ১২২; (৩) ইব্ন হাযম আল-আনদালুসী, জাওয়ামি'উস সীরা আন-নাবাবিয়্যা, আল-আযহার, কায়রো ১৪১৩ হি., পৃ. ২১৪-২১৫; (৪) আবূ দাঊদ, সুনান, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯২ খৃ., ৩খ, ১১৫-১১৬; (৫) মুহাম্মাদ আবূ যুহরা, খাতামুন নাবিয়্যীন (স), বৈরূত, তা. বি., ২খ., ৮৮০-৮৮৩; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল বারী 'আলাশারহিল বুখারী, প্রথম মুদ্রণ, কায়রো ১৯৮৬ খৃ., ৭খ., ৪৩৮-৪৪৫; (৭) বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, বৈরূত তা. বি., ৯খ., ৯৮-১০১, ১৬৬-১৬৯; (৮) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, কায়রো তা. বি., ২খ., ৯১, ১২০-১২২, ৪খ., ৫০০, ৫খ., ২৪৪; (৯) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তা'রীখ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১১৫-১১৬; (১০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া

ওয়ান-নিহায়া, তা. বি., ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., ৪খ., ৬৪-৭১; (১১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো তা. বি., ৩খ., ৯৬৮-৯৮৬; (১২) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., ২২খ., পৃ. ২২৪-২২৫; (১৩) আল-'উমারী ড. আকরাম দিয়া, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সাহীহা, ২য় মুদ্রণ, রিয়াদ ১৯৯৬ খৃ., ২খ., ৩৯৮-৪০০; (১৪) আল -ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৪ খৃ., ১খ., ৩৫০-৩৬৩; (১৫) মুহাম্মদ ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা (স), দেওবন্দ তা. বি., ২খ., পৃ. ৭৫৪-৭৬৩; (১৬) মুহাম্মদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সিরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, ৭ম মুদ্রণ, বৈরূত ও দামিশক ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ১৫৩-১৫৪; (১৭) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, ২৬তম মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ১৮৬-১৮৭; (১৮) ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়া, যাদুল মা'আদ, ২৬তম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯২ খৃ., ৩খ., পৃ. ২৪৪-২৪৬; (১৯)ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল-কুরআন, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৩২৫; (২০) আবুল বারাকাত 'আবদুর রাউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ তা. বি., পৃ. ১১৬-১১৭; (২১) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নাবী (স), লাহোর ১৪০৮ হি., ১খ., ২২৪-২২৬; (২২) ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, ২য় মুদ্রণ, ইসতাম্বুল ১৯৯২ খৃ., ৫খ., ১১-১২, ৪০-৪১; (২৩) ড. আবদুর রাহমান রিফাত পাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৩৭৭-৩৮৩; (২৪) মাজমা'উল বুহূছ আল-ইসলামিয়া বিল-কাহিরা, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১৯৮৬ খৃ., ১খ., ৪৮৩; (২৫) কাদী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসূরপূরী, রাহমাতুল লিল-আলামীন, ১ম মুদ্রণ, করাচী ১৪১১ হি., ১খ., পৃ. ১২২-১২৪, ২খ., ৬০-৬৩; (২৬) সফিউর রহমান, মুবারকপূরী আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ২৯১-২৯২; (২৭) মুহাম্মাদ আমীন, ইন'আমুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, ইদারা ইশা'আত দীনিয়াত, চট্টগ্রাম ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ১৩১-১৩৪; (২৮) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল (স), ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ৩৩৪-৩৩৬; (২৯) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৮৪-৩৮৫; (৩০) The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden E. J. Brill, 1986, v. v , P. 40-41; (৩১) Nadwi, Sayyed Abul Hasan Ali, Mohammad The Last Prophet, Academy of Islamic Research & Publications, Lacknow, 2nd Edition 1994, p. 94-95.

ডঃ আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম

সারিয়্যা আল-কুররা (বি'র মা'উনা)

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ বি'র (بئر) শব্দটি একবচন, ইহার বহুবচন আবার (أبار)। আলোচ্য শব্দের আভিধানিক অর্থ কূপ। মা'উনা নজ্‌দ তথা বর্তমান স'উদী আরবের একটি বিশেষ স্থানের নাম। এই স্থান তৎকালীন আরবীয় গোত্র বানূ আমের (بنو عامر) ও বানূ সুলায়ম-এর অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এই কূপের উপর বানূ সুলায়মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কূপটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও কালক্রমে বি'র মা'উনা হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। কূপটির নিকট হিজরী চতুর্থ সালের সফর মাসের ২০ তারিখে মহানবী (স)-এর মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাগণের, যাঁহাদের অধিকাংশ হাফিযে কুরআন ছিলেন, একটি প্রতিনিধি দল শহীদ হইয়াছিলেন। কাফিরগণ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত এই মহান সাহাবাদিগকে এই কূপের নিকটবর্তী স্থানে নির্মমভাবে শহীদ করে (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১১)।

ঘটনার বিবরণ

উহুদের যুদ্ধে (হি. ৩/৬২৫ খৃ.) মুসলমানগণ সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এই সুবাদে খোদাদ্রোহী কাফির ও মুনাফিকগণের ঔদ্ধত্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তাই তাহারা দীন ইসলামকে শৈশবেই গলা টিপিয়া হত্যার হীন প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা পবিত্র কুরআন হিফয্‌কারী হাফিয ও ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার হীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই হীন পরিকল্পনার শিকার হিসাবে ইয়াওমুর রাজী' (يوم الرجيع)-তে শাহাদাত বরণকারী শহীদগণকেও গণ্য করা হয় (বিশদ জানিবার জন্য দ্র. জাওয়ামি'উস-সীরা; সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ১খ.; তারীখ ইব্‌ন খালদূন ইত্যাদি)।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসের কোন একদিন বানূ 'আমেরের প্রতাপশালী নেতা আবূ বারা'আ আমের ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জাফর মহানবী (স)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি 'মুলা'ইবুল-আসিন্না' (ملاعب الأسنة) অর্থাৎ বর্শার ক্রীড়াবিদ বা বর্শা খেলায় পারদর্শী নামেও পরিচিত ছিলেন। মদীনায় আসিয়া তিনি মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখে ইসলামের আহ্বান শুনিয়া প্রথমে চুপ রহিলেন, কোন প্রকার অনুকূল সাড়াও দিলেন না, আবার মহানবী (স)-এর এই আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুইটি ঘোড়া ও দুইটি উট উপহার দিতে চাহিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, আমি কোন মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। পরে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের খিদমতে আরয করিলেন, "ইসলাম আমার কাছে বেশ ভাল লাগে; কিন্তু আমার আপন গোত্রীয় লোকদিগকে ছাড়িয়া একা

ইসলামে দীক্ষিত হইতে আমার সাহস হয় না। যদি আপনি দয়া করিয়া আমার সাথে কয়েকজন সুদক্ষ মুবাল্লিগ পাঠাইয়া দেন হয়ত তাহাদের উপদেশ শুনিয়া আমার গোত্রের লোকগণ দীন ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে" (ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৮৩)।

আবুল বারাআর ভ্রাতুষ্পুত্র আমের ইব্ন তুফায়ল ছিল বনী আমের গোত্রের সরদার। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইতোপূর্বে বলিয়াছিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি নিম্নোক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

১। আপনি পল্লী অঞ্চলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করুন, আর 'আরবের শহরসমূহ আমার অধিকারে ছাড়িয়া দিন।

২। নতুবা সমগ্র আরবের ওপর আপনারই অধিকার থাকুক; কিন্তু আপনার ওফাতের পর সারা আরব আমার অধিকারে আসিবে ও আমি আপনার খলীফা হইব।

৩। অন্যথায় আমি গাতাফান গোত্রের দুই হাজার দুর্ধর্ষ ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধা সহকারে আপনার উপর আক্রমণ করিতে বাধ্য হইব।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উক্ত প্রস্তাবগুলির কোন একটিতেও সম্মতি দেন নাই। এইজন্য তিনি তাহার সম্বন্ধে আশংকা পোষণ করিতেন (সাহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৬)। উক্ত কারণে মহানবী (স) আবুল বারাআ-এর আবেদনের উত্তরে বলিলেন, "আমি নজ্দবাসীদের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত নহি। তাহাদের পক্ষ হইতে আমার সাহাবাগণের জন্য সমূহ বিপদের আশংকা হইতেছে"। আবুল বারাআ মহানবী (স)-কে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "হুযুর! কোন ভয় নাই। সেখানে আমরাই নেতৃস্থানীয়। বানূ 'আমেরের সরদার 'আমের ইব্ন তুফায়ল আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনার মুবাল্লিগগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। প্রয়োজনে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার আশ্বাস দিতেছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহাদিগকে আমার সাথে প্রেরণ করিতে পারেন।"

একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি এহেন প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এবং সাহায্য করিবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করায় মহানবী (স) আশ্বস্ত হইলেন। তিনি নজ্দ অভিমুখে সত্তরজন বিশিষ্ট সাহাবীর একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মুন্যির ইব্ন আমর আল-খাযরাজী (যাদুল মা'আদ, আস্-সাহীহুল বুখারী)। আল-মুহাব্বার গ্রন্থে উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ত্রিশ বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২৬জন আনসার ও ৪জন মুহাজির (পৃ. ১১৮)। তবে আনসাবুল আশ্রাফ (১খ., ৩৭৫) গ্রন্থে এ সংখ্যা চল্লিশ অথবা সত্তর বলিয়া উল্লেখ আছে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মহানবী (স)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা সারাদিন জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই আয় দ্বারা সুফ্ফার নিঃসম্বল সাহাবীগণের পানাহারের সংস্থান করিতেন। আর সারা রাত্রি কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান এবং নামায ও অন্যান্য 'ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই হাফিযে কুরআন ছিলেন (সহীহুল বুখারী, ২ খ., ৫৮৬; মাওলানা শিবলী নু'মানী, পৃ. ৩৯১-৯২)। তাঁহাদের যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ 'আমের-এর নেতা 'আমের ইব্ন তুফায়লের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া তাহাদের হাতে দেন।

আবুল-বারাআ আল্লাহ্ প্রেমিক কারী সাহাবীগণের এ প্রতিনিধি দলের পূর্বেই নজ্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং এই দলকে তিনি যে নিরাপত্তা দিয়াছেন তাহা নিজ গোত্রকে অবহিত করিলেন। এই প্রতিনিধি দল বি'র মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছিলে তাহাদের মধ্য হইতে হারাম ইব্ন মিলহান আন্-নাজ্জারীকে বানূ 'আমেরের সরদার 'আমের ইব্ন তুফায়লের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হারাম তাঁহার সাথে আরও দুইজন সাহাবীকে লইয়া পত্র পৌঁছাইতে চলিলেন। আমের বংশের সরদারের বাড়ির নিকটে গিয়া হারাম তাঁহার সাথীদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা এখানেই দাঁড়াইয়া থাক, আমি একাই যাই। কারণ, বিপদ হইলে তিনজনের প্রাণ দিয়া কি লাভ? অন্যথায় তোমরা পরে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইও। আর যদি তাহারা আমাকে হত্যা করে তাহা হইলে তোমরা অবশিষ্ট লোকদিগের কাছে ফিরিয়া যাইবে" (সাহীহুল বুখারী, ২খ., ১৮৪;১৮)।

হযরত হারাম পত্র লইয়া আমের ইব্ন তুফায়লের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্বৃত্ত আমের মহানবী (স)-এর পত্রখানা পড়িয়াই নিকটস্থ জনৈক অনুচরকে আঘাত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। অনুচরটি ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র মহানবীর দূতকে পশ্চাৎ দিক হইতে বর্শা মারিয়া হত্যা করিয়া ফেলিল। নিহত হইবার প্রাক্কালে মহানবীর দূত হযরত হারাম উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, الله اكبر فزت ورب الكعبة "আল্লাহু আকবার, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি সফল হইলাম"।

অতঃপর 'আমের ইব্ন তুফায়ল অবশিষ্ট মুসলিম মুবাল্লিগদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বানূ আমেরকে নির্দেশ দিল। কিন্তু সেই গোত্রেরই অপর নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি আবূ বারাআ উক্ত প্রতিনিধি দলের দায়িত্ব ও নিরাপত্তাভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পূর্বেই অবহিত ছিল বলিয়া বানূ 'আমের তাহাদের সরদারের আহবানে সাড়া দিল না। কিন্তু সে উহাতেও নিবৃত্ত হইল না। পার্শ্ববর্তী সুলায়ম বংশের বানূ 'উসায়্যা (بنو عصية), বানূ-রি'ল ও বানূ যাকওয়ানকে প্ররোচিত করিয়া প্রায় ২০০জনের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া বি'র মাউনার দিকে গেল।

তাহাদিগকে দেখিয়া বীর সাহাবীগণ তাঁহাদের বিশ্রামস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছ কেন? আমরা তো যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা এখানে অবস্থান করিতেও চাহি না"। কিন্তু নরপিশাচগণ তাঁহাদের কোন কথাই শুনিল না। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই বাহিনী নিরস্ত্র মুসলিমদের এই মুষ্টিমেয় জামা'আতের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ করিল। তাঁহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা সকলেই শহীদ হইলেন। শুধু কা'ব ইব্ন যায়দ আন-নাজ্জারী নামক একজন সাহাবী কঠোরভাবে আহত হইয়া নিহতদের সাথে পড়িয়াছিলেন। কাফিরগণ তাঁহাকে মৃতজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখিল। তিনি কোনমতে বাঁচিয়া যান ও পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন (সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ১খ., ১৭৪; ইব্ন হিশাম, ৩খ., ১৮৫)।

আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী ও মুন্যির ইব্ন উকবা এবং আল-হারিছ ইব্নুস সিম্মা আনসারী আল-বাদ্রী নামক দুইজন সাহাবী নিজ দল হইতে দূরে উটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে ধূলা উড়িতে দেখিয়া এইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আরও দেখিলেন, আকাশে পাখি জড়ো হইয়াছে। বিষয়টি বুঝিতে

তাঁহাদের আর বাকী রহিল না। 'আমর বলিলেন, "চল আমরা মদীনায় যাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সংবাদ জানাই।" মুন্‌যির বলিলেন, "আমরা না গেলেও সংবাদ পৌঁছা বাকী থাকিবে না; কিন্তু সাথীগণ সকলে শহীদ হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। শুধু আমরা দুইজন এই সৌভাগ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইব কেন? অগ্রসর হও, শত্রুদিগকে আক্রমণ কর।"

অতঃপর তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তখন নরপিশাচ যালিমদের তরবারি নিষ্পাপ সাথী সাহাবাগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। হানাদার অশ্বারোহীগণ তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বীর বিক্রমে অসি চালাইয়া তাঁহারা শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইজন শত্রুকে হত্যা করিয়া বন্দী হইলেন। হযরত মুন্‌যির শহীদ হইতে না পরিয়া বিচলিত হইলেন এবং বন্দী অবস্থায় দুইজন কাফিরকে হত্যা করিয়া কাফিরদের হাতে শহীদ হইলেন (সুহায়লী, ৬খ., ১৯১)। শুধু হযরত 'আমর ইব্‌ন উমায়্যা আদ-দাম্‌রী জীবিত রহিলেন। শত্রুপক্ষের নেতা 'আমের ইব্‌ন তুফায়ল যখন জানিতে পারিল যে, ইনি মুদার বংশের লোক, তখন সে তাঁহাকে হত্যা করা নিরাপদ মনে না করিয়া তাঁহার মাথার সম্মুখ দিকে একগুচ্ছ চুল কাটিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিল যে, "কোন কারণে একটি গোলামকে মুক্তি দেওয়া আমার মাতার মানত ছিল। সুতরাং আমি তোমাকে আমার মাতার পক্ষ হইতে মুক্তি দিয়া এই মানত পূর্ণ করিলাম" (মাওলানা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসূত্রে বি'র মা'উনার লোমহর্ষক ঘটনায় শাহাদাতপ্রাপ্ত কয়েকজন সাহাবার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

১। সা'দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কা'ব আন-নাজ্জারী আল-খায্‌রাজী আল-আনসারী; ২। আল-হারিছ ইব্‌নুস্‌ সিম্মা ইব্‌ন 'আমর আন-নাজ্জারী আল-বাদরী; ৩। কুতবা ইব্‌ন 'আব্‌দ 'আমর আন-নাজ্জারী; ৪। সুলায়ম ইব্‌ন মিল্‌হান আন-নাজ্জারী; ৫। খালিদ ইব্‌ন আবূ সা'সা' আন-নাজ্জারী; ৬। আল-মুন্‌যির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উকবা আল-আওসী আল-আনসারী; ৭। রাফে' ইব্‌ন ওয়াররাক আল-খুযা'ঈ; ৮। 'উরওয়া' ইব্‌ন কায়সান; ৯। হাকাম ইব্‌ন কায়সান; ১০। রাফে' ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা আল-খুযা'ঈ; ১১। হারাম ইব্‌ন মিল্‌হান আন-নাজ্জারী; ১২। আমের ইব্‌ন আল-বুকায়র; ১৩। আল-মুনযির ইব্‌ন দামরা ইব্‌ন খুনায়স আল-খাযরাজী আসে-সা'ইদী, আল-বাদ্‌রী, আল-আকাবী; ১৪। আমের ইব্‌ন ফুহায়রা আল-বাদ্‌রী; ১৫। নাফি' ইব্‌ন বুদায়ল; ১৬। মু'আয ইব্‌ন মাইস; ১৭। তুফায়ল ইব্‌ন সাদী; ১৮। আনাস ইব্‌ন মু'আবিয়া; ১৯। আবূ শায়খ উবায়্যি ইব্‌ন ছাবিত; ২০। আতিয়্যা ইব্‌ন 'আব্‌দ আমর; ২১। মালিক ইব্‌ন ছাবিত; ২২। সুফ্‌য়ান ইব্‌ন ছাবিত। আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন (আল-ওয়াকিদী, ১খ., ৩৪৫-৪৭)।

হযরত 'আমর ইব্‌ন উমায়্যা শত্রুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে বানূ সুলায়মের অধিকারভুক্ত কারকারাতুল কু'দর নামক স্থানে পৌঁছিয়া একটি গাছের নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে সেস্থানে বানূ আমের বংশের দুইজন লোক উপস্থিত হন। তাঁহাদের নিকট মহানবী (স)-এর পক্ষ হইতে নিরাপত্তা পত্র ছিল, কিন্তু হযরত

'আমরের সেকথা জানা ছিল না। আগন্তুকদ্বয় পথ-শ্রান্তির কারণে অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। আমর ইব্ন উমায়্যার অন্তরে তাঁহার শহীদ সাথীদের বেদনা বিধুর স্মৃতি জাগরূক ছিল। তাই তাঁহার অন্তরে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রামগ্ন উক্ত আগন্তুকদ্বয়কে তরবারির আঘাতে হত্যা করিলেন। শত্রুবংশের লোক দুইটিকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্তরের দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হইল। তিনি মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সত্যের পথে নিবেদিতপ্রাণ কারী ও হাফিযে কুরআন দলের হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) খুবই মর্মাহত হইলেন। তবুও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) আমর ইব্ন উমায়্যা কর্তৃক বানূ 'আমেরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিবার বিষয়টি সমর্থন করিলেন না। 'আমের ইব্ন তুফায়ল মুসলিম দূত ও নিরপরাধ সত্তরজন সাহাবীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠই আন্তর্জাতিক নীতি বিরোধী হওয়ার দোহাই দিয়া উক্ত দুইজন নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দাবি করিল। আল্লাহ্‌র রাসূল (স) এই দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া নিহতদের রক্তপণ বাবদ উপযুক্ত অর্থ ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় সামগ্রী বনূ 'আমেরের নেতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১০৯-১১; সাহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৪-৫৮৬; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৮; ইব্ন কাছীর, পৃ. ১৩৯-১৪৪, তাবারী, পৃ. ৩৩; ইব্নু সায়্যিদিন নাস, পৃ. ৪৬; শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ.৭৪,৭৯)।

বি'র মা'উনার ঘটনার কিছুদিন পূর্বে (চতুর্থ হিজরীর সফর মাসের প্রারম্ভে) আর-রাজী' প্রান্তরের হৃদয়বিদায়ক ঘটনায় দশজন বিশিষ্ট সাহাবী শহীদ হইয়াছিলেন (ইব্ন সায়্যিদিন নাস)। এই কারণে মহানবী (স) দারুণ ব্যথিত ছিলেন। তাই প্রায় একমাস অবধি তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযে বি'র মা'উনা ও রাজী' প্রান্তরের শহীদগণের হন্তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন। সাহীহুল বুখারীতে (২ খ., কিতাবুল মাগাযী) এই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, বি'র মা'উনায় যাহারা সাহাবীগণকে হত্যা করিয়াছিল, নবী করীম (স) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাহাদের বিরুদ্ধে বদ্‌দু'আ করিলেন। এভাবে দু'আ কুনূত পড়া শুরু হয়। ইহার পূর্বে আমরা দু'আ কুনূত পড়িতাম না।

সর্ববাদী সম্মত মত হইল যে, বি'র মা'উনার বিষাদপূর্ণ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (স) এক মাস পর্যন্ত সাহাবীদের হত্যাকারীদের উপর ফজরের সালাতের রুকূর পর বদ'দু'আ এবং অভিসম্পাত করেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বি'র মা'উনার সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, এই বিষাদময় ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (স) একমাস পর্যন্ত ফজরের সালাতের পর হন্তা গোত্রসমূহকে বদ'দু'আ করেন। তিনি আরো বলেন, তখন হইতে সর্বপ্রথম কুনূতের সূচনা হয়, ইহার পূর্বে আমরা কুনূত পাঠ করিতাম না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) একমাস পর্যন্ত এই দু'আ পাঠ করেনঃ "হে মহান আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে মহান আল্লাহ্! তুমি দুর্বল অসহায় মুমিনদেরকে নাজাত দাও। হে মহান আল্লাহ! তুমি মুদার

গোত্রের উপর তোমার আঘাতকে আরও কঠিন কর এবং তাহাদের উপর এই কঠোরতা যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত রাখ, যেমন আমার মধ্যে এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।" তারপর একদিন এই দু'আ পাঠ বন্ধ করিয়া দেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দেখিতেছ না এইসব লোক ত আসিয়াই গিয়াছে।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফজরের সালাতে যখন কিরাআত পড়া শেষ হইত তখন তিনি তাকবীর বলিয়া রুকূতে গমন করিতেন, তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া রাব্বানা লাকাল হাম্দ' পাঠ করিতেন এবং এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ "হে মহান আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ, সালামা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবীআ এবং দুর্বল অসহায় মুমিনদিগকে নাজাত দাও। হে মহান আল্লাহ্! তুমি মুদার গোত্রের উপর তোমার আঘাতকে আরো কঠিন কর এবং এই কঠোরতা তাহাদের উপর যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত রাখ, যেমন আমার ও হযরত ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে যুগের ব্যবধান। হে মহান আল্লাহ্! তুমি লিহ্য়ান, রি'ল, যাক্ওয়ান ও উমায়্যা গোত্রসমূহের উপর অভিসম্পাত কর। তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিয়াছে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই বদদু'আ পাঠ বন্ধ করিয়াছেন তখন আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমার কিছুই করার নাই। তিনি (আল্লাহ্) হয় তাহাদের তওবা কবুল করিবেন, অন্যথায় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। কারণ তাহারা বড় জালিম" (৩ ঃ ১২৮)।

এই বর্ণনা হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই উভয় দু'আর সময়কাল ছিল একই, যদিও সাহাবীগণ কখনও শুধু দুর্বল সাহাবীগণের জন্য দু'আর কথা উল্লেখ করেন, আবার কখনও শুধু কাফিরদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণের বদদু'আর কথা উল্লেখ করেন।

হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, এইটি ছিল কুনূতের সূচনা। ইহার পূর্বে কখনও রাসূলুল্লাহ্ (স) সালাতে এই ধরনের দু'আ পাঠ করেন নাই এবং এই উভয় বর্ণনা হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই ধরনের দু'আ পাঠের সময়সীমা এক মাসের অধিক ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউস (রা)-এর রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই সময়সীমার পরেও এই ধরনের কুনূত পাঠ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল আছার-এ উল্লেখ করেন, "আবূ হানীফা (র) আমার নিকট হাম্মাদ হইতে এবং তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের সালাতে একমাস কাল ব্যতীত তাঁহার পার্থিব জীবন হইতে তিরোধান পর্যন্ত আর কখনও কুনূত পাঠ করেন নাই। ঐ সময় তিনি জীবিত মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বদ-দু'আ পাঠ করেন। তিনি ইহার পূর্বে বা পরে কখনও কুনূত পাঠ করেন নাই"। মুসনাদ ইমাম আযম (র)-এর রিওয়ায়াতে এই বর্ণনার সনদ বিদ্যমান আছে, "আবূ হানীফা, তিনি ইবরাহীম হইতে, তিনি আলকামা থেকে এবং তিনি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে"। এই বর্ণনাসূত্র পরম্পরার প্রেক্ষিতে ইব্ন আমীরুল হাজ্জ উল্লেখ করেন, এই রিওয়ায়াত কোন দোষে দুষ্ট নয়।

অন্যান্য হাদীছ বিশারদগণও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) হইতে এই ধরনের রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উহার ভাবার্থ হইতেছে, রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের সালাতে আমৃত্যু কখনও কুনূত পাঠ করেন নাই, শুধুমাত্র এক মাস পাঠ করিয়াছেন। একমাস পর যখন রাসূলুল্লাহ (স) কুনূত পাঠ বন্ধ করেন তখন আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বলদের জন্য দু'আ বন্ধ করা হইয়াছে এইজন্য যে, তাহারা তো ইতোমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং দু'আর আর প্রয়োজন নাই এবং মুশরিকদের জন্য বদ-দু'আ বন্ধ করিবার কারণ হইতেছে আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন, "তোমার করিবার কিছু নাই। তিনি (আল্লাহ) হয় তাহাদের তওবা কবুল করিবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। নিঃসন্দেহে তাহারা জালিম" (৩ : ১২৮)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের উপর কুনূত পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর সময় মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি কুনূতের দু'আ পাঠ করেন। হযরত উমার (রা) আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার সময় কুনূতের দু'আ পাঠ করেন। হযরত আলী (রা) এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) পরস্পর যুদ্ধের সময় উভয়ই কুনূতের দু'আ পাঠ করেন এবং অনেক সাহাবীদের পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়াতসমূহে কুনূত পাঠ এবং পাঠ না করা উভয় প্রকারের বক্তব্য পাওয়া যায়। এসব রিওয়ায়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, তাঁহারা সব সময় ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করিতেন না কিন্তু বিপদগ্রস্ত হইলে তখন পাঠ করিতেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) তাঁহার শারহু মা'আনিল আছার গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত উমার (রা), হযরত 'আলী (রা), হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণের এই নীতি ছিল এবং ইহার প্রমাণের জন্য অনেক রিওয়ায়াত পেশ করিয়াছেন। এই কারণেই এই কথা বলা ঠিক যে, হানাফী 'আলিমগণ বিপদাপদের সময় কুনূত (নাযিলা) পড়ার পক্ষপাতী।

বাহরুর রাইক গ্রন্থে গায়েতাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হইত তাহা হইলে ইমাম যেসব সালাতে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা হয় তাহাতে কুনূত পাঠ করিতেন এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র) এবং ইমাম আহমাদ (র)-ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অধিকাংশ আহলে হাদীছের মতে বিপদকালীন অবস্থায় সব সালাতেই কুনূত পাঠ করা শরী'আতসম্মত। হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-সহ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ এই মত পোষণ করিতেন। হানাফী ফকীহগণ বিপদের সময়ে কুনূত নাযিলা পড়া সিদ্ধ মনে করেন।

'আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদের সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে দীর্ঘ এক হাদীছে নবী করীম (স) বি'র মাঊনার শহীদগণের হত্যাকারীদের জন্য এক মাস অবধি ফজরের নামাযে বদ্দু'আস্বরূপ দু'আ কুনূত পড়িবার কথা উল্লেখ আছে। আরও উল্লেখ আছে যে, হযরত আনাস বলেন, বি'র মা'উনার শহীদগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ কিছু আয়াত আমরা তিলাওয়াত করিতাম, অবশ্য পরে ইহার তিলাওয়াত মওকুফ হইয়া গিয়াছে। উক্ত আয়াত ও ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا.

"আমাদের কওমের লোকদিগকে তোমরা জানাইয়া দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।"

বি'র মা'উনার করুণ কাহিনী মুসলমানগণের অবিচল ঈমানী চেতনা, অসীম বীরত্ব এবং খোদাদ্রোহী শক্তির বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঈমানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সত্যপন্থীকে আল্লাহর রাহে অবিচল থাকিবার ও প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য এই ঘটনা অনুপ্রেরণা দেয়। অপরদিকে খোদাবিমুখ, বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী তাগূতী শক্তির প্রতি ঘৃণা ও কলঙ্কের কালিমা লেপন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, লণ্ডন ১৯৪৬ খৃ., অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১ খ., ৩৪৬-৫৪; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, কিতাবুল-জিহাদ, বাব ৯, ১৮৪;কিতাবুল মাগাযী, বাব ১৮; (৩) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., ই. ফা. অনু. মাহমুদুল হাসান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী,পৃ. ১৭৪-১৮১; (৪) আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, মিসর ১৩৭২ হি., ২ খ., ১০২; (৫) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩৩; (৬) আত-তাবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ৩৩; (৭) আদ-দিয়ারবাকরী, তারীখুল খামীস, ১খ., পৃ. ৪৫১; (৮) আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, কায়রো ১৯৫৯, ১খ., পৃ. ১৯৪, ২৫০-২৭৫; (৯) আল-মাকরিযী, ইমতাউল আসমা, পৃ. ১৭০; (১০) আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ১খ., পৃ. ১৭৪; (১১) আয-যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, মিসর ১৩২৫, ২খ., পৃ. ৭৪-৯৫; (১২) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, মিসর ১৯২৮, ২খ., পৃ. ১০৯-১১০; (১৩) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ও বৈরূত, ৪খ., পৃ. ৭১-৭৪; (১৪) ইবন খালদুন, তারীখ (উর্দূ অনুবাদঃ ইনায়েত উল্লাহ), লাহোর ১৯৬০, ১ খ., পৃ. ২৪২-৩৪৪; (১৫) ইবন সাদ, আত-তাবাকাত, ১/২ খ., পৃ. ৩৬, ২৩, ৭১, ১/৪খ., ১৭৩, ২৪ ঃ ৮৯; (১৬) ইবন সায়্যিদিন্ নাস, উয়ূনুল আছার, ১৩৫৬ হি., কায়রো, ২খ., পৃ. ৪৬; (১৭) ইবন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., পৃ. ১১৮-৪৭২; (১৮) ইবন হাযম, জামহারাতু আনসাবিল আরাব, ১৯৬২; (১৯) ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর ১৯৫৫, ৩খ., পৃ. ৮৩-১৮৯ (মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ও আওলাদুহূ); (২০) ইবন হাযম, জাওয়ামি'উস্ সীরা, কায়রো ১৯৫৪, পৃ. ১৭০-১৮০; (২১) ঐ লেখক, আল-ইবার ফী খাবরি মান গাবার, কুয়েত ১৯৬০, ১ খ., ৬ (মুদ্রণঃ সা'লাহ্ উদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ); (২২) কুরআনুল করীম, সূরা ৩; (২৩) মাওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্ নবী, আযমগড় ১৯৯৫, মাতবা' মা'আরিফ।

ড. আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক
আ.ম. কাজী হারুনুর রশীদ

গাযওয়া বানী নাযীর

বানূ নাযীর পরিচিতি

বানূ নাযীর শব্দটির (নাদীর) আরবী মূল রূপা হইল بنو النضير। নাযীরকে কোন গোত্রের দিকে ইঙ্গিত করিতে চাহিলে نضرى (নাদরিয়্যু) বলিতে হইবে। বানূ নাযীরের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তবে তাহাদের মূল বক্তব্য প্রায় একই রকম। যেমন লিসানুল আরব আভিধানিক বলেন,"তাহারা হযরত হারূন (আ)-এর উত্তরসুরি বংশধর। তাহারা কোন এক সময় আরবে আসিয়াছিল এবং খায়বারে ইয়াহূদীদের একটি গোত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এইভাবে "আল্-মুনজিদ অভিধানের রচয়িতা বলেন, "বানূ নাযীর মদীনায় ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের একটি গোত্র। তাহারা মহানবী (স)-এর সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল। সেই কারণে মহানবী (স) তাহাদিগকে মদীনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মালিকানাভুক্ত সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন" (ইয়াকূবী, ১ খ., ৪৯)। ইয়াকূবী বলেন, তাহারা ছিল জুযামী আরবদের একটি সম্প্রদায়, যাহারা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অন্য এক মতে তাহারা ছিল আদিতে ইয়াহূদী এবং খায়বারস্থিত ইয়াহূদীদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল (সীরাত আল-হালাবিয়্যা, ৩ খ., ২)।

বানূ নাযীর নাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি মত পাওয়া যায় যে, প্রথমে তাহারা আন-নাযীর নামক পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, এজন্যই তাহাদিগকে বানূ নাযীর বলা হয় (সীরাত আল-হালাবিয়্যা, ৩ খ., ২)।

তাহারা কোন সময়ে মদীনায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকেই মনে করেন, তাহারা রোমান আমলে কোন এক অজ্ঞাত সময়ে ফিলিস্তীন হইতে ইয়াছরিব (পরবর্তীতে মদীনা) আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল (ইয়াকূবী, ২খ., ৪৯)।

কোন কোন আরব ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাদের মাঝে আরবী রক্তের সংমিশ্রণ থাকাও সম্ভব। মদীনায় অন্যান্য ইয়াহূদীদের ন্যায় তাহারা আরবী নাম গ্রহণ করিত, কিন্তু নিজেদের স্বকীয়তাও বজায় রাখিত এবং একটি নিজস্ব উপভাষায় কথা বলিত। তাহারা কৃষিকাজ, ঋণ প্রদান, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারের ব্যবসা দ্বারা নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

সামাজিকভাবে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাহারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধিবদ্ধ হইত এবং প্রয়োজনে সন্ধিবদ্ধ গোত্রের সহযোগিতা গ্রহণ করিত। মদীনার আওস গোত্রের সহিত তাহাদের

ছিল মিত্রবন্ধন। এই মিত্রবন্ধন ও সন্ধিবদ্ধতা থাকার কারণে খাযরাজ গোত্রের সহিত বিবাদের সময় তাহারা আওসের সহিত যোগ দিত। অবশ্য মহানবী (স)-এর হিজরতের পর হিজরী প্রথম বর্ষে আওস ও খাযরাজসহ মদীনার অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্রের সঙ্গে মহানবী (স) প্রদত্ত মদীনা সনদে স্বাক্ষর করিয়াছিল।

বানূ নাযীরের তদানীন্তন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রপতি হুয়াই ইব্ন আখতাব-এর কন্যা সাফিয়্যা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করিয়াছিলেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বা.,পৃ. ১০৮)।

তাহাদের আবাসভূমি

বানূ নাযীর বহু কাল যাবত এখানে প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছিল। মদীনার বাহিরে তাহাদের গোটা জনবসতি একসাথেই ছিল। নিজ গোত্রের লোকজন ছাড়া অপর কোন গোত্রের লোকজন তাহাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তাহারা একটি দুর্গে রূপান্তরিত করিয়াছিল। সাধারণত বিশৃংখলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এলাকায় ঘর-বাড়ি যেইভাবে নির্মাণ করা হইয়া থাকে, তাহাদের ঘর-বাড়িও ঠিক তেমনিভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল। এইগুলি ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাহা ছাড়া তাহাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যা হইতে কম ছিল না। এমনকি মদীনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিত। তাই মুসলমানগণও কখনও এই আশা করে নাই যে, লড়াই ছাড়া শুধু অবরোধের কারণেই দিশেহারা হইয়া তাহারা নিজেদের বসতভিটা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বানূ নাযীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও এই কথা কল্পনা করে নাই যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাহাদের হাত হইতে এই জায়গা ছিনাইয়া লইবে (সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৬ষ্ঠ জিল্দ, পৃ. ১৫, বাংলা , ৭ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর)।

বানূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গ

মদীনায় ইসলামের দ্রুত প্রসার হইতে থাকিলে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পাইতে থাকে। ফলে মদীনায় অন্যান্য ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের সহিত বানূ নাযীরও প্রথমে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে মদীনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করিয়া মহানবী (স) ও তাঁহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ সীমিত পর্যায়ে তাহারা বদর যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব হইতেই শুরু করিয়াছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ কুরায়শদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করিলে তাহারা এবং তাহাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরও অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তাহারা আশা করিয়াছিল, এই যুদ্ধে কুরায়শ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইয়া মুসলমানরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌঁছাইবার পূর্বেই তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু ও মুসলমানদের পরাজয়ের গুজব ছড়াইতে থাকে। কিন্তু ফলাফল তাহাদের আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে তাহারা রাগে

ও দুঃখে ফাঁটিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বানূ নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফ চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ যদি আরবের এই সকল সম্মানিত নেতাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এইভাবে সে মক্কায় যাইয়া শোকগাঁথা রচনা করিয়া তাহাদিগকে উস্কানি দিতে থাকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা ও পরবর্তীতে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরায়শরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি লইয়া মদীনা আক্রমণ করিলে ইয়াহূদীরা দেখিল, তিন হাজার কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র এক হাজার মুসলিম সৈন্য। আবার তাহাদের পক্ষ হইতে তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন তাহারা স্পষ্টভাবে প্রথমবারের মত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বসিল এবং সুযোগ বুঝিয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা করিল (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)।

বানূ নাযীরের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধ

উহুদের পর বি'র মা'উনার ঘটনায় মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা আরও বেশী আনন্দিত হইল। তাহারা এইসব ঘটনায় মুসলমানদের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এইদিকে মুসলমানদের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া মদীনাবাসীদের জন্য ভয়ের কারণ ছিল। তাহা ছাড়া মদীনার আশেপাশের রাষ্ট্রগুলি মদীনার অভ্যন্তরের এই পারস্পরিক বিরোধের খবর জানিতে পারিলে তাহারাও মদীনা আক্রমণ করিয়া বসিবে। এমনি অবস্থার পাশাপাশি ইয়াহূদীরাও সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছে, মহানবী (স) তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। শিবলী নু'মানী বলেন, কুরায়শগণ পত্র লিখিয়াছিল, মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা কর। অন্যথায় আমরা নিজেরাই আসিয়া তোমাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিব।

বানূ নাযীর প্রথম হইতেই ইসলামের শত্রু ছিল। কুরায়শদের এই বার্তা পাইয়া তাহারা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ পাঠাইল, আপনি ত্রিশজন লোক লইয়া আসুন, আমরাও আমাদের পাদ্রীদের সঙ্গে রাখিব। আপনার কথা শুনিয়া যদি আমাদের পাদ্রীগণ বিশ্বাস করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার ধর্ম গ্রহণ করিবার ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিধা থাকিবে না। ইয়াহূদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) লিখিয়া পাঠাইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একটি চুক্তিপত্র না লিখিয়া দিবে ততক্ষণ আমি তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু তাহারা এই প্রস্তাবে রাজি হইল না।

রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের বন্ধু বাভাপন্ন বানূ কুরায়যার নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে চুক্তিপত্র পুনঃস্বাক্ষর করিতে বলিলে তাহারা পুনরায় স্বাক্ষর করিল। বানূ নাযীরের জন্য ইহা একটা হুমকিস্বরূপ ছিল যে, তাহাদের বন্ধুগণ সন্ধি করিল কিন্তু তাহারা করিতে পারিল না

(আল্লামা শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী গ্রন্থে আবূ দাঊদ শরীফের রেফারেন্সে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, পৃ. ৪০৭-৪৯৮)। তদুপরি তাহারা পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বার্তা পাঠাইয়াছিল আপনি তিনজন লোক লইয়া আসুন, আমরাও তিনজন আলিম লইয়া আসিতেছি। এই আলিমগণ যদি আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তাহা হইলে আমরাও আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলেন, ইয়াহূদীগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) সেখানে উপস্থিত হইলেই তাহাকে হত্যা করা হইবে (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ১৫৫)।

তাই রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের অবস্থা জানিবার সিদ্ধান্ত লইলেন। তিনি ইতোপূর্বে বানূ কিলার গোত্রের ভুলবশত দুই ব্যক্তির হত্যার ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার ব্যাপারে আলাপ ও পরামর্শের জন্য মদীনা শহরের দুই মাইল দূরে কুবার উপকণ্ঠে বানূ নাযীরের বসতীতে গমন করিলেন। এই সময় মহানবী (স)-এর সহিত দশজন সাহাবী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বাক্র, হযরত উমার, হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। মহানবী (স) মূল উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বানূ নাযীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আচ্ছা বানূ কিলাব গোত্রের একজন নিহত ব্যক্তির হত্যার ক্ষতিপূরণ কি হওয়া উচিত" (মূল ড ঃ মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন-চরিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.)।

গাযওয়া বানূ নাযীর-এর সময়কাল

হিজরী ৪র্থ সালের প্রথমদিকে গাযওয়া উহুদের পরে ও গাযওয়া আহ্যাব-এর পূর্বে গাযওয়া বানূ নাযীর সংঘটিত হয়। ইব্ন ইসহাকের মতে, বি'রে মা'উনা ও উহুদের পর গাযওয়া বানূ নাযীর সংঘটিত হয়। ইমাম যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়রের উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইব্ন সা'দ, ইব্ন হিশাম ও বালাযুরী ইহাকে হিজরী চতুর্থ সনের রবীউল আওয়াল মাসের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাই সঠিক বলিয়া মনে করা হয়। কারণ সমস্ত বর্ণনা অনুসারে এই যুদ্ধ বি'রে মা'উনার দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বি'রে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনা উহুদ যুদ্ধের পরে ঘটিয়াছিল (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক হুঁশিয়ারি

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বনূ নাযীর সম্প্রদায়কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার জন্য ১০জন সাহাবীকে পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমাদিগকে দশ দিনের সময় দেওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা মদীনা

ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, অন্যথায় দশ দিন পর তোমাদের মধ্যে হইতে যাহাকেই মদীনার ত্রি-সীমানার ভিতরে পাওয়া যাইবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে।"

তাহারা মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল (মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পা. ডঃ এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৫৮৪)। এই সময় মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই সংবাদ পাইয়া ইয়াহূদীদিগকে এই বলিয়া প্ররোচনা দিল, তোমরা তোমাদের অবস্থানে অবিচল থাক, প্রয়োজনে আমি তোমাদের লোকবল দিয়া সহযোগিতা করিব। এইভাবে বানূ নাযীরের সর্দার মহানবী (স)-এর নিকট চিঠি লিখিল, আমরা কোনভাবেই মদীনা ত্যাগ করিব না, আপনার যাহা করিবার তাহা করিতে পারেন। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন, ইয়াহূদীদের ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন (হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, কিতাবুল মাগাযী, ৭খ., পৃ. ৩৮৪)।

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বানূ নাযীরের যুদ্ধ ছিল মূলত মহান রাব্বুল আলামীনের সহিত। যেমন কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ.

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদিগের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৫৯ ঃ ১-২)।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বানূ নাযীরের যুদ্ধ হইয়াছিল মূলত আল্লাহ্র বিরুদ্ধে। প্রকৃত ব্যাপারও ছিল তাহাই। ইয়াহূদী জাতির মানসিকতা ও শত শত বৎসরের ঐতিহ্য এই যে, তাহারা এমন এক অদ্ভুত জাতি যাহারা জানিয়া শুনিয়া মহান আল্লাহ্র মুকাবিলা করিয়া আসিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্র রাসূলদিগকে আল্লাহ্র রাসূল জানিয়াও হত্যা করিয়াছিল এবং অহংকারের সহিত বলিয়াছে, আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবী আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) কর্তৃক নিহত বানূ আমেরের দুইজন লোকের জন্য রক্তপণ আদায় করিবার ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে বানূ নাযীরের কাছে গেলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। বানূ নাযীর ও বানূ আমেরের মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বানূ নাযীরের কাছে গেলেন তখন তাহারা তাহাকে স্বাগত জানাইল এবং রক্তপণের ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহাদের মনে এক কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা জাগিল। তাহারা গোপনে শলাপরামর্শ করিতে লাগিল, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হত্যা করা যায়। তাহারা মনে করিল, এমন মোক্ষম সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (স) একটা প্রাচীরের পাশে বসাছিলেন। তাঁহার সাথে ছিলেন হযরত আবূ বাক্র, হযরত উমার ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

বানূ নাযীরের লোকেরা পরস্পর শলাপরামর্শ করিল। তাহারা বলিল, কে আছ যে পাশের ঘরের ছাদে উঠিয়া বড় একটি পাথর মুহাম্মাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারিবে এবং তাহার কবল হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিবে? বানূ নাযীরের এক ব্যক্তি আমর ইব্ন জাহ্‌শ ইব্ন কা'ব এই কাজের জন্য প্রস্তুত হইল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর পাথর ফেলিয়া দেওয়ার জন্য ছাদের উপর আরোহণ করিল। সালাম ইব্ন মিশকাম নামের এক ইয়াহূদী বলিল, "সাবধান! এমন কাজ করিও না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের ইচ্ছার খবর আল্লাহ্‌র রাসূল পাইয়া যাইবেন। আল্লাহ পাকই তাঁহাকে খবর দিবেন। তাহা ছাড়া মুসলমানদের সাথে আমাদের যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তাহাও লংঘন করা হইবে"। কিন্তু দুর্বৃত্ত স্বভাবে দুর্ভাগা ইয়াহূদীরা কোন কথাই কানে তুলিল না। তাহারা নিজেদের অসদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অটল রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) পূর্ব হইতেই এসব ব্যাপার গভীরভাবে ও সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এইদিকে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রিয় রাসূলের নিকট হযরত জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল দ্রুত সেই জায়গা হইতে উঠিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সঙ্গী সাহাবীগণ তখনও টের পান নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) কোথায় গিয়াছেন। কিন্তু বানূ নাযীরের লোকেরা ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের সহিতও একই ব্যবহার করিবে কিনা তাহা লইয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়িল। তাহাদের একটি অংশ ভাবিল, "আমরা যদি মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণের সহিতও একই ব্যবহার করি, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।" তাহারা আরও ভাবিল যে, "যদি তাহার সাথীগণ নিরাপদে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাহারা হয়ত আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝিতেই পারিবেন না। তাহাতে মুসলমানদের সহিত আমাদের পুরাতন চুক্তি বহাল থাকিবে (মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, পৃ. ৪০০)।

এদিকে সাহাবীগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিতেছেন না, তখন তাঁহারা তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে পাইলেন, যে মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্ধান চাহিলেন। সে বলিল, "রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমি মদীনায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি।" অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, "আমি মহানবী (স)-কে মসজীদে নববীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি" (ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, পৃ. ৪০০)।

সাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এত দ্রুত চলিয়া আসিলেন যে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) কুচক্রী ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাহবীদিগকে অবহিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বানূ নাযীরের উপর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর আল্লাহ্র রাসূল (স) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে বানূ নাযীর গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাদিগকে এই নোটিশ দেন, "তোমরা অবিলম্বে মদীনা হইতে বাহির হইয়া যাও। এইখানে তোমরা আমাদের সহিত থাকিতে পারিবে না। তোমাদিগকে দশ দিনের সময় দেওয়া হইল। ইহার পর তোমাদের মধ্যে যাহাকে পাওয়া যাইবে তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে।"

এই চরম নির্দেশ শুনিয়া বানূ নাযীর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখে কোন কথা আসিল না। তাহারা শুধু এতটুকুই বলিল, হে ইব্ন মাসলামা! আওস গোত্রের কোন লোক এইরূপ চরম সংবাদ আমাদের নিকট লইয়া আসিবে এই কথা আমরা কোন দিন কল্পনাও করি নাই। এই উক্তির মাধ্যমে আওস গোত্রের সহিত তাহাদের সম্পাদিত একটি অতীত চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মহানবী (স) মদীনায় আসার আগে খাযরাজদের বিরুদ্ধে আওস গোত্র ইয়াহূদীদের সহিত উক্ত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। সেই সময়ে ইয়াহূদী ও আওসরা ছিল একে অপরের মিত্র। ইয়াহূদীদের মন্তব্যের জবাবে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) শুধু এতটুকুই বলিলেন, "এখন আর মনের অবস্থা সেইরূপ নাই"।

এই নোটিশ পাওয়ার পর ইয়াহূদীরা বহিষ্কার হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। কয়েক দিনের মধ্যে তাহারা সফরের প্রস্তুতি শুরু করিল। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইয়াহূদীদের খবর পাঠাইল, তোমরা নিজেদের জায়গায় অটল থাক, বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইও না। আমার নিয়ন্ত্রণে দুই হাজার যোদ্ধা রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করিবে। তাহারা তোমাদের নিরাপত্তায় জীবন পর্যন্ত দিয়া দিবে। ইহার পরও যদি তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরাও তোমাদের সাথে বাহির হইয়া যাইব। তোমাদের ব্যাপারে কাহারও হুমকিতে আমরা প্রভাবিত হইব না। যদি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করা হয় তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করিব। বানূ কুরায়যা এবং বানূ গাতাফান তোমাদের মিত্র। তাহারাও তোমাদের সাহায্য করিবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই প্রেরিত এই খবর পাইয়া ইয়াহূদীরা দ্বিধান্বিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আবদুল্লাহ্‌র কথার প্রতি আস্থা ছিল না। কারণ ইহার পূর্বে বানূ কায়নুকাকে বহিষ্কারের প্রাক্কালে আবদুল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া নিজের পথ ধরিয়াছিল। তাই তাহারা তাহাদের সন্ধিচুক্তি থাকায় অপারগতা প্রকাশ করিল। তাহারা চিন্তা করিল, "আমাদেরকে যদি মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হইতেই হয় তাহা হইলে আমরা খায়বার কিংবা মদীনার আশেপাশে কোন স্থানে গিয়া বসবাস করিব যাহাতে মদীনায় আমাদের বাগানগুলি হইতে ফল-ফলাদি সংগ্রহ করিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় মদীনা হইতে নির্বাসিত হইলে আমাদের খুব একটা ক্ষতি হইবে না" (ড ঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১)।

ইয়াহূদীদের একাংশ যখন এই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিল ঠিক এই সময় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, বহিষ্কৃত হওয়ার পরিবর্তে তাহারা যুদ্ধ করিবে। ইয়াহূদী নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাব আশা করিয়াছিল যে, মুনাফিক নেতা তাহার কথা রাখিবে। তাই তাহাদের সবচেয়ে বড় নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাব বলিল, "না, তাহা হইবে না, আমি মুহাম্মাদকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি কখনও ত্যাগ করিব না, বিষয়-সম্পত্তিও ছাড়িব না। আমাদের বিরুদ্ধে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন" (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৪০২)।

ইয়াহূদীদের ঔদ্ধত্যের কারণ

বানূ নাযীরের ঔদ্ধত্যের বহু কারণ ছিল। তাহারা অত্যন্ত মজবুত দুর্গে অবস্থান করিত, যাহা অবরোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বার্তা পাঠাইয়াছিল, তোমরা আত্মসমর্পণ করিও না। বানূ কুরায়যা তোমাদের সহযোগিতা করিবে এবং আমিও দুই হাজার লোক লইয়া তোমাদের সাহায্যের জন্য আসিব (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৪০৮)। আল-কুরআনে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ. لَئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ.

"তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদের সেইসব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদেরকে সাহায্য করিবে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক অবুঝ সম্প্রদায়" (৫৯ ঃ ১১-১৩)।

ইয়াহূদীদের রণপ্রস্তুতি

ইয়াহূদী নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাব তাহার সঙ্গী-সাথীদের লইয়া দুর্গবন্দী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করিল এবং তাহার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলিল, "আস! আমরা সবাই নিজ নিজ দুর্গ মজবুত করিয়া সেখানে বসিয়া পড়ি। দুর্গ অবরোধকারীদের উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য ছাদে ছাদে পাথরের টুকরা জমা করিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের অবরোধ করা হইলে তাহাতে ভয়ের কিছু নাই। কারণ আমাদের গোলাভরা খাদ্যশস্য রহিয়াছে। এক বৎসরেও এইসব শেষ হইবে না। পানির প্রাকৃতিক উৎসও আমাদের দখলে রহিয়াছে। মুহাম্মাদ (স) এক বৎসর পর্যন্ত আমাদের অবরোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না" (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৪০২)।

রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বানূ নাযীরকে অবরোধ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাঁধিয়া দেওয়া দশ দিন সময় শেষ হইয়া গেল। এইদিকে ইয়াহূদীরা তাহাদের নিজ নিজ ঘর হইতে আর বাহির হইল না। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূমকে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৫৫)। মহানবী (স)-এর নির্দেশে মুসলমানগণ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া ইয়াহূদী বসতি অবরোধ করিলেন। ইতোমধ্যে মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের কোন বাড়ি বা ইমারত দখল করিলে ইয়াহূদীরা উহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ইমারত বা বাড়িতে যাইয়া আশ্রয় নেওয়া শুরু করিল। অবশেষে মহানবী (স) নির্দেশ দিলেন তাহাদের খেজুরের বাগানগুলি কাটিয়া জ্বালাইয়া দাও। ইহাতে আর্থিক ক্ষতির চিন্তায় তাহারা শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিবে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইয়াহূদীরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহারা ফরিয়াদ করিয়া বলিল, " হে মুহাম্মাদ! আপনি তো অন্যদের বিশৃংখল হইতে বারণ করেন, এখন আপনি নিজেই আমাদের খেজুরের বাগানগুলি কাটিয়া জ্বালাইয়া দিতেছেন। ইহা কোন ধরনের ইনসাফ? (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৪০২)।

লীনা নামক খেজুর বৃক্ষ কর্তন

মহানবী (স)-এর নির্দেশ পাইয়া সাহাবীগণ ইয়াহূদীদের দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে যে খেজুর বাগান ছিল উহা হইতে কিছু গাছ কাটিয়া ফেলিলেন। ইহা ছিল এক ধরনের খেজুর গাছ যাহার ফল আরবরা সাধারণত ভক্ষণ করিত না। রাওদাতুল উনুফ গ্রন্থে সুহায়লী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেজুর গাছ কর্তনকে যাহারা শত্রুদের গাছ কাটা জায়েয বলিয়া মনে করেন, ইহা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের অফলবান বৃক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন, কোথাও ফলবান উন্নত জাতের গাছ কাটা হয় নাই (সীরাতুন-নবী, শিবলী নো'মানী, পৃ. ২০৫)। আর ইহা হইয়াছিল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশক্রমে। মূলত সমস্ত খেজুর গাছ কাটা হয় নাই। 'লীনা' নামের এক প্রকার বিশেষ ধরনের খেজুর গাছই শুধু কাটা হইয়াছিল। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ.

"তুমি যে খেজুর (লীনা) বৃক্ষ কাটিয়াছ এবং যাহা রাখিয়া দিয়াছ সবই আল্লাহ্র হুকুমে হইয়াছে। তাহা এই জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে অপমানিত করিবেন" (৫৯ ঃ ৫)।

গাছ কর্তনের কারণ সম্পর্কে ইমাম আহ্মাদ (র) মন্তব্য করেন, সম্ভবত গাছের আড়াল হইতে সংবাদ আদান-প্রদান করা হইত, যাহার কারণে উহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। ইহা ছাড়া বৃক্ষাদি তখনই কাটা হইয়া থাকে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উহা কাটার প্রয়োজন হইয়া থাকে (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪০৯)। ইব্ন ইসহাক বলেন, যদি দুশমনরা গাছের আড়ালে অবস্থান লইয়া থাকে তাহা হইলে বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা সুন্নাত। তবে এমনও হইতে পারে যে, এই সকল গাছের কাণ্ড দ্বারা তীর নিক্ষেপের সুবিধাজনক ঘাটি বানানো হইয়াছিল। আর ইহাও উদ্দেশ্য ছিল যে, অবরোধের মাঝে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে (শিবলী নো'মানী, সীরাতুন্-নবী, পৃ. ২০৫-২০৬)।

বানূ নাযীর, বানূ আওফ ও খাযরাজ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি,যথা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল, তাহার আমানত রক্ষক মালিক ইব্ন আবূ কাওফাল সুওয়াইদ ও দায়িমদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের অপেক্ষায় থাকিয়া আত্মসমর্পণ বা মুকাবিলা কোনটাই করিল না। আর শেষ পর্যন্ত কোন সাহায্যও আসিল না। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই দুই হাজার সৈন্য লইয়া আগাইয়া আসে নাই এবং আরবের অন্য কোন গোত্রও তাহাদের এই বিপদে চোখ তুলিয়া তাকায় নাই। আল্লাহ তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ২০০)। অবরুদ্ধ অবস্থায় পনের দিন কাটাইবার পর ইয়াহূদীগণ প্রমাদ গণিতে লাগিল। তাহাদের রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিল। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, বিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ

অব্যাহত থাকে (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৪০২)। আবার কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ৪র্থ হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের অবরোধ করিলেন। আর এই অবরোধ মাত্র ছয় দিন স্থায়ী ছিল (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)।

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ.

"তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন একদিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়ি ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৫৯ ঃ ২)।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حاربت قريظة والنضير فاجل بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبى ﷺ فامنهم وأسلموا.

"হযরত ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি বানূ কুরায়যা ও বানূ নাযীর গোত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, অতঃপর বনূ নাযীরকে উচ্ছেদ করিলাম এবং বনূ কুরায়যাকে (কর প্রদানে সম্মত হওয়ায়) বহাল রাখিলাম। তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করা হইল। অতঃপর বনূ কুরায়যা যুদ্ধ শুরু করিল। তখন তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা করা হইল, তাহাদের নারীগণ, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদসমূহ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। আর তাহাদের অল্প সংখ্যক মহানবী (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলেন ও পরবর্তীতে তাহারা দীন ইসলামে দীক্ষিত হইল" (ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী বিশারহিল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৭খ., বানূ নাযীর অধ্যায়, পৃ. ৩৮৫)।

দুর্গের ধ্বংসসাধন

যে দুর্গের মধ্যে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল মুসলমানগণ তাহা বাহির হইতে অবরোধ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে শুরু করিল। আর ভিতর হইতে তাহারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করিবার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসাইল এবং সেইজন্য নিজেদের ঘর-দরজা ভাঙ্গিয়া আবর্জনা জমা করিল। ইহার পরে যখন তাহারা নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, এই জায়গা ছাড়িয়া তাহাদেরকে চলিয়া যাইতে হইবে তখন তাহারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করিতে শুরু করিল, যাহাতে উহা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় আগ্রহ করিয়া তাহারা এইসব বাড়িঘর নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার পর তাহারা যখন এই শর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সন্ধি করিল যে, তাহাদের প্রাণে বধ করা হইবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাহাই তাহারা লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে লইয়া যাইতে পারিবে, তখন যাওয়ার বেলায় তাহারা ঘরের দরজা-জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উটের পিঠে তুলিয়া লইয়া গেল (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

لاَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا إِلاَّ فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ. كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ إِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاؤُا الظَّالِمِيْنَ.

"ইহারা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া। পরস্পরের মধ্যে উহাদিগের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদিগের মনের মিল নাই। ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ইহারা সেই লোকদের মত যাহারা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে, ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ইহারা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'। অতঃপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। তথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই জালিমদের কর্মফল" (৫৯ ঃ ১৪-১৭)।

অবশেষে যখন তাহারা নিশ্চিত হইল যে, অবরোধ দীর্ঘায়িত হইলে ইহার পরিণাম তাহাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে, তখন তাহারা দূত পাঠাইয়া

রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনুরোধ করিল, "রক্তপাত করিবেন না; বরং আমাদের বহিষ্কার করুন। আমরা আমাদের সব অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া যাইব। অস্থাবর সম্পত্তির যতটুকু প্রত্যেকের উট বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, ততটুকুই লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমাদের প্রতি তিনজনে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য ও অন্য যে কোন সম্পদ তোমরা ইচ্ছা করিবে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে" (মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৪০৩)।

বানূ নাযীরের খায়বার গমন

বানূ নাযীরের প্রস্তাব অনুসারেই অনুমতি দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ (স) এমন বিশ্বাঘাতকদিগকেও কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। শুধু এই শর্তটি জুড়িয়া দিলেন, "দেশত্যাগের সময় যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না।" সুতরাং তাহারা মালামাল উটের উপর বোঝাই করিয়া মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া গেল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৯০-১৯১)। তাহারা উটের পিঠে বহনোপযোগী অস্থাবর সম্পদ লইয়া গেল। যাহারা খায়বার গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকায়ক, কিনানা ইব্ন রাবী ইব্ন আবিল হুকায়ক ও হুয়াই ইব্ন আখতাব। খায়বারের অধিবাসীরা তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা করিল (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ২০০)। তাহাদের কিছু সংখ্যক খায়বারে বসতি স্থাপন করে আর কিছু সংখ্যক সিরিয়ার এজরাট (আযরিয়াত) জনপদে চলিয়া যায় (মহানবী (স) জীবন চরিত, পৃ. ৪০৩)। খায়বারের লোকেরা তাহাদের এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহারা খায়বারের সর্দার নিযুক্ত হইল। এই ঘটনা মূলত পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত খায়বার যুদ্ধের সূচনা-পর্ব ছিল (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪১০)।

বানূ নাযীর দেশ ছাড়িয়া যাইতেছিল। আর তাহাদের গায়িকারা তবলা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছিল। তাহাদের পুরুষরা উটের পিঠে চড়িয়া বাজনা বাজাইয়া গায়িকা রমণীদের উৎসাহিত করিতেছিল। মদীনাবাসীদের বক্তব্য, এমন ধন-সম্পদ বহনকারী সওয়ারী ইতোপূর্বে কখনও তাহাদের চোখে পড়ে নাই (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪১০)। তাহাদের প্রস্থানের সময় যাহা সমস্যা হইয়া দেখা দিল উহা হইল আনসারদের যে সকল সন্তান-সন্ততি ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইয়াহূদীরা তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিল, আর আনসারগণ তাহাদিগকে যাইতে বাধা দান করিতেছিলেন (সুনান আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৯)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ "দীন সম্পর্কে যবরদস্তি নাই" (২ঃ২৫৬)। আবূ দাঊদে باب فى الاسير يراه على الإسلام শিরোনামে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪১০)। এই আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকার তোমাদের নাই। যাহার ইচ্ছা হয় থাকুক, আর যাহার ইচ্ছা হয় ইয়াহূদীদের সঙ্গে চলিয়া যাউক" (সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৫৮৬)।

মহানবী (স)-এর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

ইহারা দেশান্তরিত হওয়ার ফলে মুসলমানদিগের অসুবিধা দূর হইল। ইসলাম বিরোধী যে শক্তি ভিতরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহা তিরোহিত হইল। কুরায়শদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে মুসলমানদের প্রতিপত্তিও অনেকখানি বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের অধিকারে আসায় তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইল (সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৫৮৫)।

মহানবী (স)-এর ওহী লেখক পরিবর্তন

এতদিন মহানবী (স)-এর ওহী লেখক ছিল একজন ইয়াহূদী যুবক। সে হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষায় মহানবী (স)-এর চিঠিপত্র লিখিত। কিন্তু বানূ নাযীরের সঙ্গে এই লোকটিও দেশত্যাগ করিয়া চালিয়া গেল। ইহা ছাড়া মহানবী (স) ওহী লেখার ব্যাপারে কোন অমুসলিমের উপর নির্ভর করা সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিতকে হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষা শিখিয়া লইবার নির্দেশ দিলেন (ড ঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪)।

ফায় লাভ ও কুরআনের বাণী

বানূ নাযীরের নির্বাসনের পর অনেকগুলি খাদ্যশস্য ভর্তি গোলা, ফলের বাগান ও আবাদি জমি মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহা ছাড়া ৫০টি বর্ম এবং তিন শত চল্লিশটি তরবারি পাওয়া যায় (ডঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, পৃ. ৪০৩)। শিবলী নো'মানীও তাঁহার সীরাতুন্নবীতে একই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪১০)। এইসব সম্পত্তি মহানবী (স)-এর ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি বানূ নাযীর হইতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদও মুহাজিরদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন যেন আনসার সাহাবীদের উপর তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার লাঘব হয়। ইহার কিছু অংশ হযরত মুহাম্মাদ (স) বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) রাখিয়া দিলেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ., পৃ. ১০৯)। ইহা ছাড়া ঐ সকল লোকদিগকেও কিছু অংশ দিলেন যাহারা মক্কা শরীফে ও আরবের অন্যান্য এলাকা হইতে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)।

বানূ নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এই সকল মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। বানূ নাযীরের এলাকা বিজিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এখন একটা বন্দোবস্ত হইতে পারে এইভাবে যে, তোমাদের বিষয় সম্পদ এবং ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলাইয়া একত্র করিয়া সম্পূর্ণটি তোমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করিয়া দাও। আরেকটা বন্দোবস্ত হইতে পারে এইভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল কর। আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করিয়া দাও। আনসারগণ সমস্বরে বলিলেন, এই সকল সহায়-সম্পদ আপনি

মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করুন। আর চাহিলে আমাদের বিষয়-সম্পদের যতটাই ইচ্ছা তাহাদের দিয়া দিতে পারেন। ইহাতে হযরত আবূ বাক্র (রা) উচ্চস্বরে বলিলেন, "জাযাকুমুল্লাহু ইয়া মা'শারাল আনসারি খায়রান" হে আনসারগণ! আল্লাহ্ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন (ইয়াহইয়া ইব্ন আদম, বালাযুরী)। এইভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল (সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)।

অবশ্য আনসারদের মধ্যে হযরত আবূ দুজানা এবং সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফকেও মুহাজিরদের সমপরিমাণ অংশ দেওয়া হয়। কারণ তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। এই সময় দুইজন ইয়াহূদী দীন ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহাদের সম্পত্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া হইল (ড ঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবীর (স) জীবন চরিত, পৃ. ৪০৩)। কাহার কাহার বর্ণনা অনুসারে হযরত হারিছ ইব্ন নেসাকে অংশ দেওয়া হইয়াছিল। কারণ তিনিও অত্যন্ত গরীব ছিলেন (বালাযুরী, ইব্ন হিশাম, রূহুল মা'আনী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত, মার্চ ১৯৮৬; (২) সায়্যিদ কুত্ব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৬খ., দারুশ শারক, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ.; (৩) আবূ দাঊদ, সুনান আবী দাঊদ, দেওবন্দ, মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৭৫ হিজরী, ২খ.; (৪) হাফিজ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী বিশারহিল বুখারী, ৭খ., দারুর রায়্যান লিত্-তুরাছ, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৪০৯/ ১৯৯৮; (৫) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ; (৬) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা অনুবাদ, খাদিজা আক্তার রেজায়ী, আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, ৩য় প্রকাশ, মার্চ ২০০১; (৭) ইব্ন হিশাম, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৯; (৮) আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্বী, সীরাতুন্ নবী (স), ১খ., অনুবাদ ঃ এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ২য় সং, জানুয়ারী ১৯৯০; (৯) ডঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ১৯৯৮; (১০) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ডঃ এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন; (১১) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; (১২) ডঃ সৈয়দ মাহ্মুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী ঢাকা, জুন ১৯৯৯ খৃ.।

আবদুল্লাহ আল-মীযান

গাযওয়া যাতুর-রিকা‘

এই গাযওয়ার প্রসিদ্ধ নাম হইল "গাযওয়া যাতির-রিকা"। এই ব্যাপারে ইমাম বুখারীর অভিমত হইল غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبَ خَصْفَةَ "গাযওয়া যাতুর-রিকা‘ হইল গাযওয়া মুহারিব খাসফা" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯২)।

আল্লামা হালাবী বলেন, এই গাযওয়ার নাম হইল গাযওয়া যাতির-রিকা, গাযওয়াতুল আ‘আজিব (غزوة الاعاجب), গাযওয়া মুহারিব, গাযওয়া বানী ছা‘লাবা ও গাযওয়া বানিল আনমার। এই নামগুলির মধ্যে হালাবী কেবল গাযওয়াতুল আ‘আজিব নামের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, যেহেতু এই গাযওয়ায় বিস্ময়কর অনেকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এইজন্য উহাকে এই নামে অভিহিত করা হয় (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা.বি., ২খ., পৃ. ২৭০)। যাতুর-রিকা‘ নামকরণের অনেকগুলি হেতু সীরাতবিদগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াকিদী বলেন, উহা হইল এমন একটি পাহাড় যাহার কিছু অংশ লাল, কিছু কাল এবং কিয়দংশ শ্বেত বর্ণের। বহু বর্ণযুক্ত কোন বস্তুকে আরবীতে রিকা‘ বলা হয়। উক্ত অভিযানকে এই কারণেই যাতুর-রিকা‘ বলিয়া নামকরণ করা হয়। আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ হইতে উক্ত নামকরণের ভিন্ন হেতু উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটির প্রাসঙ্গিক অংশটি হইল ঃ

بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِيْ فَكُنَّا نَكُفُّ عَلَى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى اَرْجُلِنَا ·

"আমাদের নিকট মাত্র একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে উহার উপর সওয়ার হইতাম। ফলে আমাদের পাগুলি ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার উভয় পা ফাটিয়া গিয়া পায়ের নখগুলি পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। ফলে আমরা আমাদের পাগুলিতে কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া নিয়াছিলাম। এই কারণে এই অভিযানকে যাতুর-রিকা‘ বলা হয়" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া যাতির-রিকা‘, ২খ., পৃ. ৫৯২)।

আল্লামা ইবন সায়্যিদিন নাস বলেন, যাতুর-রিকা‘ হিসাবে এই যুদ্ধের নাম প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হইল, এই যুদ্ধের পতাকায় অনেকগুলি তালি সংযুক্ত ছিল। ইহাও কথিত আছে যে, সেখানকার একটি বৃক্ষের নাম ছিল রিকা‘। এইজন্য উহাকে এই নামে অভিহিত করা হয় (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৫২)। গাযওয়া মুহারিব, গাযওয়া বানী ছা‘লাবা এবং গাযওয়া বানূ আনমার এই সকল নাম গোত্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান

বানূ মুহারিব ও বানূ ছা'লাবা ছিল গাতাফান গোত্রের দুইটি উপগোত্র। উহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল (যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৯১)। ওয়াকিদী বলেন, জনৈক আগন্তুক মদীনায় কোন একটি জিনিস ক্রয় করিতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমি আনমার ও ছা'লাবা গোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে দেখিয়া আসিয়াছি। অথচ আপনারা এই ব্যাপারে গাফিল রহিয়াছেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি চারি শত সাহাবী সঙ্গে লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা করিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল সাত শত। আবার কেহ বলিয়াছেন, সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল আট শত (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)।

যুদ্ধের সময়-কাল

এই যুদ্ধের মাস ও সন নির্ধারণ একটি জটিল ব্যাপার। কেননা এই ব্যাপারে সর্বজনস্বীকৃত কোন অভিমত পাওয়া যায় না। প্রথমত, মাস নির্ণয়। এই সম্পর্কে তিনটি অভিমত রহিয়াছে। ওয়াকিদীর মতে, একাদশ মুহাররম রাসূলুল্লাহ (স) এই অভিযানে রওয়ানা করিয়াছিলেন (কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত)। ইব্ন ইসহাকের মতে, বানূ নাযীর গোত্রের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) রবীউল আওয়াল মাস মদীনায় অবস্থান করিবার পর এই যুদ্ধে রওয়ানা করেন। সেই হিসাবে তাহা ছিল রবীউছ ছানী মাস। আল্লামা হালাবী বলেন, ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্যরা বলিয়াছেন, বানূ নাযীর গোত্রের সহিত যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (স) রবীউল আওয়াল ও রবীউছ ছানী ও জুমাদাল উলা মাসের কিছুদিন পর এই যুদ্ধে রওয়ানা করিয়াছিলেন। এই উক্তি অনুযায়ী এই যুদ্ধ জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত হইয়াছিল (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

এই যুদ্ধ হিজরী কোন সনে এবং কোন যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতেও মতভেদ রহিয়াছে। কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) এই অভিযানে রওয়ানা করেন (হালাবী, প্রাগুক্ত)। ওয়াকিদীর মতে, এই গাযওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) মুহাররাম মাসে রওয়ানা করিয়াছিলেন আর তাহা ছিল মুহাররমের দশ তারিখ (কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত)। এই গাযওয়া কোন সনে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনেককে এইরূপ অভিমতও পোষণ করিতে দেখা যায় যে, গাযওয়া যাতির-রিকা' ছিল দুইটি গাযওয়ার নাম। একটি সংঘটিত হইয়াছিল খায়বার যুদ্ধের পর। মাগাযী সম্পর্কিত বেশীর ভাগ গ্রন্থের বিবরণমতে এই যুদ্ধ বানূ নাযীর যুদ্ধের দুই বা তিন মাস পর হিজরী চতুর্থ সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতের বিপরীতে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য

বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, ইহা খায়বার যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ এই কথা স্বীকৃত যে, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) খায়বার যুদ্ধের সময় মদীনায় ফিরিয়াছিলেন। উহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাবশায় অবস্থানরত ছিলেন।

এই মতপার্থক্য নিরসন করিতে গিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুহারিব বা যাতুর-রিকা' নামে দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। একটি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে আর অপরটি খায়বার যুদ্ধের পরে। আবার কেহ কেহ সীরাতবিদদের অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়া বলিয়াছেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) আসলে এই যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করেন নাই, বরং তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন (হালাবী, প্রাগুক্ত)। কিন্তু এই উক্তি একেবারে বাস্তবতা বিরোধী। কারণ তাঁহার বিবরণের ভাষা হইল এইরূপঃ আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত রওয়ানা করিলাম। আমাদের মাত্র একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে তাহার উপর সওয়ার হইতাম (বুখারী, প্রাগুক্ত)। ইমতা' গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ اَرَّخَ اَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ اَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ فَوَاحِدَةً كَانَتْ قَبْلَ الْخَنْدَقِ وَاُخْرٰى بَعْدَهَا اَىْ بَعْدَ خَيْبَرَ.

"কতক ঐতিহাসিকের মতে যাতুর-রিকা' যুদ্ধ একাধিকবার সংঘটিত হইয়াছিল। একবার খন্দক যুদ্ধের পূর্বে আর অন্যবার খন্দক তথা খায়বার যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছিল" (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

মদীনায় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তি

এই অভিযানে রওয়ানা করিবার প্রাককালে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আবূ যার আল-গিফারী (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া যান। মতান্তরে হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। ইব্ন আবদিল বারর বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত হইল, উছমান (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। কেননা আবূ যার (রা) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহার স্বগোত্রীয় আবাসভূমিতে চলিয়া যান। অতঃপর বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সুতরাং তাঁহার খলীফা নিযুক্ত হইবার অভিমত সংশয়মুক্ত নয়। এই অভিমতের ব্যাপারে হালাবী বলেন, ইব্ন আবদিল বারর-এর এই সংশয় কেবল তখনই প্রাসঙ্গিক হইবে যখন এই কথা মানিয়া লওয়া হইবে যে, যাতুর-রিকা যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। উহা খন্দক ও খায়বার পরবর্তী ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিলে তো আর সংশয় সৃষ্টির অবকাশ নাই (হালাবী, প্রাগুক্ত)। মদীনা হইতে রওয়ানা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আল-মুদীক নামক জনপদে যাত্রা বিরতি করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে

আশ-শুকরা উপত্যকায় পৌঁছিয়া তথায় একদিন অবস্থান করিলেন। সেখান হইতে যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য লোক প্রেরণ করা হয়। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে খবর দিল যে, সেখানে তাহারা কোন মানুষ দেখিতে পায় নাই। তবে এলাকা ত্যাগ করিবার নূতন নূতন পদক্ষেপ তাহারা দেখিতে পাইয়াছে (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)।

সালাতুল খাওফের বিধান প্রবর্তন

অধিকাংশ সীরাত ও হাদীছবিদের অভিমত এই যে, সালাতুল খাওফের বিধান এই যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কেহ কেহ দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। এই মতানৈক্যের ভিত্তি হইল যাতুর-রিকা যুদ্ধের সময় নির্ধারণের উপর। যেহেতু এই যুদ্ধের সময় নির্ধারণে প্রবল মতপার্থক্য রহিয়াছে, ফলে রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পড়িয়াছিলেন উহার ব্যাপারেও সর্বসম্মত কোন অভিমত নাই।

আল্লামা নাওয়াবী বলেন, সালাতুল খাওফ গাযওয়া যাতুর-রিকা অথবা গাযওয়া বানূ নাযীরে প্রবর্তিত হইয়াছিল (আবদুর রউফ দানাপূরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১২৬)। ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, যাতুর-রিকা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম সালাতুল খাওফ পড়িয়াছিলেন এইরূপ উক্তি ঠিক নয়। কারণ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ আবূ আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) সূত্রে এবং ইমাম তিরমিযী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (স) গাযওয়া উসফানে সালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছিলেন (দানাপূরী, প্রাগুক্ত)।

আল্লামা ইব্নুল কায়্যিমের এইরূপ উক্তির মূলে রহিয়াছে তাঁহার এই অভিমত যে, গাযওয়া যাতুর-রিকা গাযওয়া উসফান ও গাযওয়া খায়বারের পরবর্তী ঘটনা। যদি বাস্তবে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার কথার সার হইল, সালাতুল খাওফের বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে 'উসফান যুদ্ধে, আর দ্বিতীয়বার তাহা আদায় করা হয় যাতুর-রিকা যুদ্ধে।

কিন্তু কয়েকটি হাদীছ এইরূপও বর্ণিত পাওয়া যায় যাহার দ্বারা এই সালাত সর্বপ্রথম যাতুর-রিকা যুদ্ধেই প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ওয়াকিদী জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ فَكَانَ اَوَّلُ مَا صَلَّى يَوْمَئِذٍ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَخَافَ اَنْ يُغِيْرُوْا عَلَيْهِ وَهُمْ فِى الصَّلاَةِ وَهُمْ صُفُوْفٌ.

"তিনি বলেন, এই দিনই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স) সালাতুল খাওফ আদায় করেন। তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, শত্রুপক্ষ সালাতে কাতারবদ্ধ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে" (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)।

ইমাম বুখারী স্বীয় সালিহ ইব্ন খাওয়াত সূত্রে একাধিক সনদে এই সম্পর্কিত যেই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, সালাতুল খাওফের বিধান সর্বপ্রথম এই যুদ্ধেই প্রবর্তিত হইয়াইছিল। হাদীছটি হইল ঃ

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

(বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৫৯২)।

এই হাদীছে সালাতুল খাওফ আদায় করিবার বর্ণনার সহিত উহা আদায় করিবার পদ্ধতির কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। যদি উহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন যুদ্ধে এই সালাত আদায় করা হইত তাহা হইলে এখানে তাহা আদায় করিবার বিস্তারিত নিয়মের অবতারণার প্রয়োজন হইত না।

হালাবী বলেন, গাযওয়া হুদায়য়িয়ার প্রাককালে 'উসফান নামক স্থানে সালাতুল খাওফ আদায় করিবার কথাও বর্ণিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন বিপত্তি নাই। কারণ সালাতুল খাওফের ঘটনা একাধিক বার সংঘটিত হইতে পারে। এই সম্ভাবনাকেও নাকচ করা যায় না যে, কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল বিধায় সালাতুল খাওফ একাধিক ঘটনার সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, সালাতুল খাওফের বিধান প্রথমে যাতুর-রিকা যুদ্ধে প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। যদি যাতুর-রিকা যুদ্ধ খায়বার অভিযানের পরবর্তী ঘটনা হয় তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রথমে এই যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পড়িয়াছিলেন, এইরূপ অভিমত যথার্থ হইবে না। কারণ উহার আগে উসফান নামক স্থানে তাহা আদায় করিবার প্রমাণ রহিয়াছে। আর যদি তাহা খায়বারের পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তাহা হইলে সালাতুল খাওফ প্রথমে এই যুদ্ধে আদায় করিবার অভিমত যথার্থ।

সর্বপ্রথম কোন ওয়াক্তে সালাতুল খাওফ আদায় করা হইয়াছিল এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যুহরের সালাতে যখন মুসলিম বাহিনীকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) দাঁড়াইয়াছিলেন তখন মুশরিকরা আক্রমণ করিবার মনস্থ করিয়াছিল। ইত্যবসরে জনৈক মুশরিক পরামর্শ দিল যে, আসরের সালাত মুসলমানদের নিকট তাহাদের সন্তানাদির চেয়েও প্রিয়। সুতরাং তখনই আক্রমণ করা হউক। তাহাদের এই পরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ওহীসহ প্রেরণ করেন। ওহী লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স) আসরের ওয়াক্তে সালাতুল খাওফ আদায় করেন (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নৈশ-প্রহরী

অভিযানশেষে মদীনায় ফিরিবার পথে কোন একটি ঘাটিতে রাসূলুল্লাহ্ (স) রাত্রি যাপন করিলেন। সেখানে তিনি শত্রুগণের অতর্কিত আক্রমণের আশংকা করেন। উপস্থিত সাহাবীদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আজ রাত্রে আমাদের প্রহরা নিয়োজিত থাকিতে কাহারা আগ্রহী? সে রাত্রে প্রচণ্ড বেগে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা) ও হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা সর্বাত্মকভাবে আপনাদের পাহারায় নিয়োজিত থাকিব'। অতঃপর তাহারা দুইজন ঘাটির প্রবেশ দ্বারে অবস্থান নিলেন।

রাত্রি কিয়দংশ অতিক্রান্ত হইলে আবব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) বলিলেন, আমি রাত্রির প্রথমভাগে পাহারার জন্য একাই যথেষ্ট। আপনি শেষভাগে পাহারা দিবেন। পাহারার সময় ভাগ- বন্টন করিবার পর 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ঘুমাইয়া পড়িলেন। অতঃপর আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) একাগ্রতার সহিত সালাতে দাঁড়াইয়া গেলেন।

শত্রুপক্ষের অনুসরণকারী এক ব্যক্তি 'আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা)-এর ছায়া দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে তীর ছুড়িল। তীরটি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইলে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। অতঃপর শত্রু আরও একটি তীর মারিল। তিনি তাহাও খুলিয়া ফেলিলেন। পরপর তিনটি তীর বিদ্ধ হইবার পর তাঁহার শরীর দিয়া ফিনকি দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর রুকূ-সিজদার মাধ্যমে সালাত শেষ করিয়া তিনি আম্মার (রা)-কে ডাকিয়া জাগ্রত করিলেন। আম্মার (রা)-কে জাগ্রত দেখিয়া তীর নিক্ষেপকারী শত্রুটি পালাইয়া গেল। আম্মার (রা) জাগ্রত হইয়া আব্বাদ (রা)-কে তাঁহাকে পূর্বেই না জাগানোর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথম তীর নিক্ষেপের সময়ই যদি আমাকে জাগাইতেন, তাহা হইলে কি এমন অবস্থা হইত? আব্বাদ (রা) জওয়াবে বলিলেন, আমি সালাতে সূরা আল-কাহ্ফ পাঠ করিতেছিলাম। আমি উহার তিলাওয়াত পরিহার করিয়া অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করাকে পসন্দ করি নাই। এইজন্য আমি আপনাকে জাগ্রত করি নাই (হালাবী, প্রাগুক্ত)

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শত্রুর আশংকা হইয়াছিল কেন এবং শত্রু মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণে উদ্যত হইয়াছিল কেন? এই সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থাবলীর ভাষ্য এক রকম নহে। আল্লামা দানাপুরী বলেন, অভিযানশেষে ফিরিবার প্রাক্কালে জনৈক মুসলিম ব্যক্তি একটি কাফিরের স্ত্রীকে কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। লোকটি তখন বাড়ীতে ছিল না। সে বাড়ীতে ফিরিবার পর যখন বিষয়টি জানিতে পারিল তখন সে শপথ করিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে হত্যা করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিবে ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হইবে না। এই সংকল্পেই সে রাসূলুল্লাহ্ (স) ও সাহাবীগণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত)।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রহরী দুই সাহাবীর একজনের নাম ছিল উমারা ইব্ন হাযম (রা)। তবে ওয়াকিদী বলেন, আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রামাণ্য অভিমত হইল, তিনি আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-ই ছিলেন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হত্যার উদ্যোগ

গাতাফান গোত্রের এক লোকের নাম ছিল গওরাছ। মতান্তরে শব্দ সংকোচনের (تصغير) মাধ্যমে তাহার নাম ছিল গুওয়ায়রিছ ইব্নুল হারিছ। সে একদা তাহার গোত্রীয় লোকদের বলিল, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে মুহাম্মাদকে হত্যা করি? তাহারা বলিল, হাঁ, করিতে পার। তবে তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে? সে বলিল, তিনি যখন অসতর্ক অবস্থায় থাকিবেন তখন অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাহাকে খতম করি। এই উদ্দেশ্য লইয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিল। সঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিক্ষিপ্তভাবে বৃক্ষরাজির শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, এমতাবস্থায় আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে একাকী রাখিয়া নিজ নিজ সুবিধামত স্থানে আশ্রয় লই। রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় তরবারি গাছের সহিত ঝুলাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়েন। আমরা সবাই ঘুমাইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আহবান করেন। আমরা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, এক বেদুঈন উপবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি ঐ লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, সে আমার তরবারি ছিনতাই করিয়াছে। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় সে তাহা হাতে লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমার হাত হইতে আপনাকে এখন কে বাঁচাইবে'? আমি বলিলাম, আল্লাহ। সে তিনবার তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল এবং তিনবারই আমি একই উত্তর দিলাম। ইহারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল। তখন আল্লাহ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন" (৫ ঃ ১১)।

হালাবী বলেন, যদিও এই ব্যাপারে উক্তি রহিয়াছে যে, আয়াতটি বানূ নাযীর গোত্রের জনৈক লোক যখন পাথর নিক্ষেপ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার পায়তারা করিয়াছিল তখন অবতীর্ণ হয়। এই উভয় উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ একটি আয়াত একাধিক ঘটনার সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই লোকটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেন কেন? উহার উত্তর এই যে, উহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স) ইসলামের

প্রতি অবিশ্বাসীদের আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়াছিলেন (হালাবী, প্রাগুক্ত)। বাস্তবেও লোকটি মুক্তিপ্রাপ্তির পর তাহার গোত্রের কাছে ফিরিয়া গিয়া বলে, আমি দুনিয়ার সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া একজন সাহাবীর মর্যাদা লাভ করে।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গেই ছিলাম। ইত্যবসরে আমরা দেখিতে পাইলাম একজন সাহাবী একটি পাখির ছানা ধরিয়া লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ছানাটির দিকে তাকাইতেছিলেন। ছানাটি এই সাহাবীর হাতে থাকা অবস্থায় উহার মাতা-পিতা কিংবা উহাদের যে কোন একজন তাহার সম্মুখে আসিয়া শুইয়া পড়িল। লোকজন এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা পাখিটির তদীয় ছানার প্রতি দয়ামায়া দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই পাখি তাহার ছানার জন্য যতটুকু দয়ামায়া দেখাইতেছে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের প্রতি ইহা হইতে অধিক দয়াবান (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ১০; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৫৯২; (৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৯৫; (৪) হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ২৭০; (৪) আকবর শাহ খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ১৭২; (৫) আবদুর রঊফ দানাপূরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১২৫; (৬) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৪৬৮; (৭) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, ২খ., পৃ. ৫২; (৮) ইব্‌নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুবি'ল ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১/২খ., পৃ. ১১০; (৯) আবদুর রহমান আল-জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, দারুল কুতুবিল হাদীছা, বৈরূত, ২খ., ৬৯১; (১০) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, ২খ., পৃ. ৬১; (১১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ, ২/৪খ., ৮৪; (১২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, ৩খ, পৃ. ১২৫।

ফয়সল আহমদ জালালী

গাযওয়া বদর আল-আখিরা

উহুদ যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ান বলিয়াছিল, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে ওয়াদা রহিল যে, আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে আবার মুকাবিলা হইবে। মুসলমানগণ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল মুসলমানদের প্রস্তুতিও চলিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবা কিরাম সিদ্ধান্ত লইলেন যে, আবূ সুফ্য়ান এবং তাহার কওমের সহিত মুকাবিলা করিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, মুসলমানরা দুর্বল নহে এবং মুখের ফুৎকারে আল্লাহর মনোনীত এই দীনকে নির্বাপিত করা যাইবে না।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) হিজরী চতুর্থ সালের শা'বান অথবা যুল-কা'দা মাসে (৬২৫ খৃ.) বদর প্রান্তরে যাত্রার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রস্তুতির অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর উপর মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করিলেন । ইব্ন হিশামের মতে মদীনার দায়িত্বভার 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর উপর অর্পণ করা হয়। দেড় হাজার জানবায যোদ্ধা ও দশটি ঘোড়া সমভিব্যাহারে বদর অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। হযরত আলী (রা)-র হস্তে সোপর্দ করা হয় সেনাবাহিনীর পতাকা (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১২৩; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১২)।

যুদ্ধের জন্য বাছাইকৃত দশটি ঘোড়া দশজন বিশিষ্ট যোদ্ধার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এইসব অশ্বারোহীগণ হইলেন ঃ (১) রাসূলুল্লাহ (স); (২) হযরত আবূ বাক্র (রা); (৩) হযরত উমার (রা); (৪) হযরত আবূ কাতাদা (রা); (৫) হযরত সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (রা); (৬) হযরত মিকদাদ (রা); (৭) হযরত হুবাব (রা); (৮) হযরত যুবায়র (রা); (৯) হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা); (১০) অজ্ঞাত ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৮২)। নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)- এর নেতৃত্বে সাহাবীগণের বদর অভিমুখে যাত্রা করিবার সংবাদ কুরায়শদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, পরবর্তীতে অবশ্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ান আসলে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সে এমন কোন ওজরের অপেক্ষায় ছিলেন যাহাতে যুদ্ধে যাইতে না হয়। তিনি নু'আয়মকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তুমি যদি মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসলমানদেরকে যুদ্ধাভিযান হইতে বিরত রাখিতে পার আমি তোমাকে দশটি অথবা বিশটি উট পুরস্কার প্রদান করিব।

আবূ সুফ্য়ান নু'আয়ম ইব্ন মাস'উদকে একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করাইয়া বলিলেন, আমি এই মুহূর্তে সেনাদল লইয়া বদর প্রান্তরে যাত্রা করা সঠিক মনে করি না। যদি মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধের জন্য আসেন আর আমি উপস্থিত না হই তাহা হইলে মুসলমানদের সাহস বাড়িয়া যাইবে। তাই আমি চাই যুদ্ধের ভয়ে আমরা প্রাণ বাঁচাইয়াছি এই কথা না বলিয়া বরং জনগণ

বলুক, যুদ্ধের ভয়ে মুসলমানরা নিজেরাই পশ্চাতে হটিয়াছে। সুতরাং আমি চাই, তুমি মদীনা যাও এবং মুসলমানদের বল, আমি এক বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছি যাহার মুকাবিলা মুসলমানরা করিতে পারিবে না। সুহায়ল ইব্ন 'আমরের মাধ্যমে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুত উটগুলি প্রদান করিব। নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ সুহায়ল ইব্ন আমরের নিকট আসিয়া বলিল, উক্ত উটের ব্যাপারে তুমি যদি যামিন হও তবে আমি মদীনা গিয়া মুহাম্মাদ (স)-এর বাহিনীর অগ্রাভিযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। সুহায়ল এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে নু'আয়ম দ্রুত মদীনা রওনা হইয়া গিয়া মুসলমানদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি এইমাত্র মক্কা হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আবূ সুফ্য়ান বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি লইতেছে। তোমরা তাহাদের মুকাবিলায় যুদ্ধের ময়দানে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

নু'আয়ম মুসলমানদেরকে জনে জনে এই কথা বুঝাইয়া ভীতি-বিহ্বলতা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চালাইল। এই অপপ্রচারে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের মনোবল দুর্বল হইয়া পড়িল। মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীগণ মুসলমানদের এই ভীতিপ্রদ অবস্থায় উৎফুল্ল হইল।

হযরত আবূ বাকর (রা) ও হযরত উমার (র) নেতিবাচক এই প্রচারণা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাঁহার দীনকে বিজয়ী করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। শত্রুগণ আমাদের সহিত মুকাবিলা করিবার প্রস্তুতি লইয়াছে—এইজন্য আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারি না। কারণ ইহাতে তাহারা আমাদের ভীরু ও কাপুরুষ মনে করিবে। সুতরাং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলুন। আল্লাহ্র শপথ! ইহাতেই রহিয়াছে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।'

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয়ী বক্তব্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ

والذى نفسى بيده لاخرجن وان لم يخرج معنا احد.

"ঐ সত্তার কসম যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ! আমার সহিত কেহ না আসিলেও মুকাবিলার জন্য আমি অবশ্যই রওয়ানা হইব" (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৭৫; তাফসীর মাযহারী, ২খ., পৃ. ২৭৮-৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই দৃপ্ত ঘোষণার ফলে মুশরিকগণ মুসলমানদের অন্তরে যে অহেতুক ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, আল্লাহ তা'আলা তাহা দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে লইয়া বদর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং সেইখানে পৌঁছিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন (সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২৭৯-২৮০)।

এইদিকে আবূ সুফ্য়ান কুরায়শদের ডাকিয়া বলিলেন, আমরা নু'আয়মকে মদীনায় পাঠাইয়াছি যাহাতে সে মুহাম্মাদ (স)-এর বাহিনীর যুদ্ধযাত্রাকে স্থগিত করিতে পারে। কিন্তু আমাদেরও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যাত্রা করা দরকার, তবে বদর প্রান্তর পর্যন্ত যাইব না। এক বা দুই রাত সফর করিবার পর আমরা ফিরিয়া আসিব। যদি মুহাম্মাদ (স) মদীনা হইতে বদর

অভিমুখে যাত্রা না করেন এবং এই খবর তাঁহার নিকট পৌঁছে যে, আমরা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি অথবা আমাদের যুদ্ধযাত্রার খবর শুনিয়া মুসলমানগণ মাঝপথ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তবে আমাদের মাথা উঁচু হইবে আর মুসলমানদের মাথা অপমানে অবনত হইয়া যাইবে। মুসলমানগণ যদি সত্য সত্য মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে আমরা এই কথা বলিয়া পিছনে হটিয়া যাইব যে, এখন খরা, দুর্দিন ও দুর্ভিক্ষের সময়। অনুকূল পরিবেশ ও সুদিন ছাড়া যুদ্ধ করা সমীচীন নহে। জনগণ আবূ সুফ্য়ানের এই বক্তব্য গ্রহণ করিল (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৭৯; মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৮৭-৯)।

অতঃপর আবূ সুফ্য়ান দুই হাজার সৈন্য ও পঞ্চাশটি ঘোড়াসহ বদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মক্কা অঞ্চলের যাহরান (ظهران) -এর নিকটবর্তী মাজান্না (مَجَنَّة) নামক উপত্যকায় পৌঁছিয়া তাহারা শিবির স্থাপন করে। আরেক বর্ণনায় আছে, উসফান (عُسْفَانٌ) নামক স্থানে তিনি ক্যাম্প স্থাপন করেন। আবূ সুফ্য়ান অতঃপর কুরায়শদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন ঃ

يا معشر قريش انه لا يصلحكم ان عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيهااللبن وان عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا.

"হে কুরায়শের জনগণ! সচ্ছল ও সজীব মওসুমে যুদ্ধে যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, যখন বৃক্ষরাজি সবুজ পাতায় ভরিয়া উঠিবে, যাহা পশুরা মনের আনন্দে ভক্ষণ করিতে পারিবে, তোমরাও তাহাদের দুগ্ধ পান করিতে পারিবে। এখন ত দুর্ভিক্ষ ও খরা মওসুম (এই সময়টা যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী)। তাই আমি ফিরিয়া চলিলাম, তোমরাও ফিরিয়া চল।"

এমনিতে কুরায়শ সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আবূ সুফ্য়ানের বক্তব্যে তাহারা যুদ্ধের আগ্রহ হারাইয়া ফেলিল। পরিশেষে তাহারা মক্কার পথে ফিরিয়া চলিল। মক্কাবাসিগণ এই অভিযানের নাম দিল 'জায়শুস-সাবীক (جيش السويق) বা ছাতু বাহিনী। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা তো আসলে ছাতু খাওয়ার জন্য গিয়াছিলাম, যুদ্ধ করিবার জন্য যাই নাই (ইব্ন হিশাম, আস সীরাতুন নাবাবিয়া, ২খ., পৃ. ১২৩; তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৫৫৯; ইব্ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১২; উয়ূনুল আছার, ২খ, পৃ. ৮২; দানাপূরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১২৮; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৯৯)।

এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) আট দিন যাবত বদর প্রান্তরে শত্রুসৈন্যের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন। তখন বদরে সপ্তাহব্যাপী বাণিজ্যমেলা বসিয়াছিল। মুসলমানগণ সেই সুযোগে ব্যবসা করিয়া বিপুলভাবে লাভবান হন। মেলায় আগত লোকদের নিকট যখন মুসলমানগণ কুরায়শদের ব্যাপারে জানিতে চাহিত তখন তাহারা বলিত, কুরায়শগণ তোমাদের মুকাবিলায় বিপুল বাহিনী জমায়েত করিয়াছে। মুসলমানগণ এই জবাব শুনিয়া বলিত ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের জন্য উত্তম যিম্মাদার" (৩ ঃ ১৭৩; শায়খ আবদুল্লাহ, মুখতাসার সীরাতি রাসূলিল্লাহ, পৃ. ২৬৫; আল-হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়া, ৪খ., পৃ. ২৭৯-২৮০)। বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (স) যখন প্রতীক্ষারত অবস্থায় ছিলেন তখন

মাখশী ইব্ন আমর আদ-দামরী (مخشى بن عمرو الضمرى) তাঁহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, যিনি এক যুদ্ধে দামরা গোত্রের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)- এর সহিত সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! কুরায়শদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এই জায়গায় বসিয়া রহিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

نعم يا اخا بنى ضمرة وان شئت مع ذلك رددنا اليك ماكان بيننا وبينك ثم جادلناك حتى يحكم الله بيننا وبينكم.

"হে দামরা গোত্রের ভাই! তুমি যদি চাও তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে যেই অনাক্রমণ চুক্তি হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারি। অতঃপর তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন"।

মাখশী জবাবে বলিলেন, না, না, আল্লাহর কসম! আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১২৩-৪; ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৮২; আল-হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়া, ৪খ., পৃ. ২৭৯-২৮০)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তথায় আট দিন অবস্থান করিয়া দেড় হাজার সাহাবীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কুরায়শগণ তথায় আগমন না করায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে নাই। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা কাফিরের ষড়যন্ত্র হইতে মুসলমানদের রক্ষা করিলেন (আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৪৮)। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ. اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"যখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে। ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর, কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক'। তারপর তাহারা আল্লাহর নি'মাত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ যাহাতে রাযী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ইহারাই শয়তান, তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর" (৩ ঃ ১৭২-১৭৫)।

عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القى فى النار وقالها محمد ﷺ حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলিয়াছেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক')-ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। আর মুহাম্মাদ (স)-ও এই কথাই বলিয়াছিলেন যখন লোকজন তাঁহাকে আসিয়া খবর দিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ভয় কর। এই কথা শুনিয়া তাহাদের ঈমান আরও মযবুত হইয়া গেল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৫৫)।

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে উল্লিখিত আয়াত গাযওয়া হামরাউল আসাদ উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধ ছাড়াই যদিও রাসূলুল্লাহ (স) বদর প্রান্তর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তাহার পরও এই অভিযানের প্রভাব ও ফলাফল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ইহার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শক্তি তৎকালীন শক্তিধর কুরায়শগণ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিল। ইহার দ্বারা শাণিত হয় সাহাবাদের ঈমানী চেতনা ও সমরশক্তি। আল্লাহর উপর ভরসা, ঈমানের দৃঢ়তা, প্রচণ্ড কর্মশক্তি, বাতিলের প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিধ্বস্ত করিয়া দিবার অদম্য স্পৃহা তৎকালীন পরিস্থিতিকে মুসলমানদের অনুকূলে লইয়া আসে।

মুসলমানদের ভয়ে কুরায়শদের যুদ্ধ ছাড়া মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া মুসলমানদের জন্য উহুদের পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিগণিত হয়। অপরদিকে কাফিরদের এইভাবে ফিরিয়া যাওয়াটা বৎসরের প্রথম যুদ্ধে তাহাদের পরাজয়ের চাইতে কম অবমাননাকর ছিল না। তাহা সত্ত্বেও কুরায়শরা আগামী বৎসরের জন্য যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন ছিল না। কুরায়শদের পৃষ্ঠ প্রদর্শনে রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া নূতন কৌশল অবলম্বন করেন। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি সাহাবীদের গোয়েন্দা তৎপরতায় নিয়োজিত রাখেন (Dr. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, translated by Dr. Ismail Razi Al Faruqi. p. 243)।

ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধ' (بدر الموعد), বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ (بدر الثانية), বদরের শেষ যুদ্ধ (بدر الاخيرة), বদরের ছোট যুদ্ধ (بدر الصغرى) ও ছাতুর যুদ্ধ (جيش السويق) নামে পরিচিতি (তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৫৫৯; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৯৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল- কুরআন, সূরা আল ইমরানঃ ১৭১-৫; (২) বুখারী, আল-জামি, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী, ২খ., পৃ. ৬৫৫; (৩) ইব্‌ন হিশাম, আস- সীরাতুন নাবাবিয়্যা,

বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ৩খ., পৃ. ১২৩; (৪) ইব্নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, বৈরূত, ২খ., পৃ. ১১২; (৫) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ., পৃ. ১৭৫; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, ২খ., পৃ. ৮৭-৯; (৭) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার, মাকতাবা দারুত তুরাছ, মদীনা ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ৭২; (৮) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, যুক্তরাজ্য ১৯৬৬ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৭৫-৮; (৯) ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, ৪র্থ সংস্করণ, ২খ., পৃ. ৫৫৯; (১০) বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়্যা, কুতুবখানা কাসিমী, দেওবন্দ, তা.বি., ৪খ., পৃ. ২৭৯-২৮০; (১১) শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসার সীরাতির রাসূল, মাকতাবা আস-সালাফিয়া, লাহোর ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ২৬৫; (১২) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, করাচী ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৪২৬-৭; (১৩) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দারুল ইশায়াত, কলিকাতা ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১২৮; (১৪) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, মজলিশ-ই নাশরিয়াত-ই ইসলাম, করাচী ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ২৪৮; (১৫) Dr. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, Translated by Dr. Ismail Razi Al-Faruqi, USA 1976 ce, P. 243.

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

গাযওয়া দূমাতুল জানদাল

গাযওয়া দূমাতুল জানদাল (عزوة دومة الجندل) হিম্সের নিকটস্থ একটি গ্রাম যাহা দামিশক হইতে পাঁচ দিনের এবং মদীনা হইতে ১৫ দিনের ভ্রমণের দূরত্বে অবস্থিত। দূমাতুল জানদালের অধিবাসীদের জন্য সেখানে একটি বড় বাজার ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র দূমান বা দূমা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানটির এই নামকরণ করা হইয়াছে (মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ৮৩৭-৮; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২০৬, ই.ফা.বা.)। মতান্তরে দূমাতুল জানদাল একটি পাহাড়ের নাম (মাদারিজুন নুবূওয়াত, ২খ., পৃ. ৩১৮; মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ৪৮৭-৮)।

পঞ্চম হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে, মতান্তরে রবীউল আখির (নাবাবীর তারীখ) মহানবী (স)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, উক্ত এলাকার মুশরিক জনগোষ্ঠী মদীনা আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে সংঘবদ্ধ হইতেছে এবং ঐ এলাকার মধ্য দিয়া যাতায়াতকারীদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৯২; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৮৫)।

নবী (স) পঞ্চম হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে, 'সিবা' ইব্ন উরফুতা আল-গিফারী (রা)-কে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করিয়া এক হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ

দূমা অভিযানে রওয়ানা হইলেন এবং বানূ উয্‌রা গোত্রের মাযকূর নামে এক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে লইলেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২২৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রিবেলা গন্তব্যস্থলের দিকে পথ চলিতেন এবং দিবসে যাত্রাবিরতি করিতেন। দূমাতুল জানদালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভিযানের সংবাদ পৌছিলে মুশরিক দল তথা হইতে পলায়ন করে। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে পৌছিয়া স্থানটি মানবশূন্য দেখিতে পান। তিনি সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা মুশরিকদের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৮৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) দূমাতুল জানদালে পৌছিলে পথপ্রদর্শক জানাইল যে, বানূ তামীমের মেষপাল ও রাখাল উক্ত এলাকায় আছে। তিনি তথায় অভিযান চালান। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) ইহাদের একজনকে গ্রেফতার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহাকে তাহার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে জানায় যে, তাহারা গতকাল পলায়ন করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই অভিযানে মাসাধিক কাল অতিবাহিত করেন (আল-বিদায়া, ২খ., পৃ. ৯২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা ত্যাগের পর হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মাতা ইন্তেকাল করেন। সা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৯২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত তা. বি., ৪খ.; (২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ২খ.; (৩) ইব্নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, কুয়েত ১৯৯৬ খৃ., ৩খ.; (৪) আবদুর রাঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দিল্লী তা. বি.; (৫) ইদরীস কান্ধলহবী, সীরাতুল মুসতাফা, ১ সং, দিল্লী ১৯৮১, ২খ.; (৬) আবদুল হক্ক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবূওয়াত, ১ম সং দিল্লী ১৯৯২, ২খ.; (৭) শিহাবুদ্দীন আল-বাগদাদী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত তা. বি, ২খ.।

মুহাম্মদ এনামুল হক

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ/১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬(উ)/৩২৫০

সংশোধন ঃ সীরাত বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ডে ৩৫৯ পৃষ্ঠায় মিম্বারের যে ছবি দেয়া হইয়াছে উহা পরবর্তী কালে নির্মিত। তবে উহা মহানবী (স)-এর মিম্বারের স্থানে স্থাপিত।